প্ল্যানচেট

সুশীলকুমার সিংহ

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০ ৭৩

PLANCHET
A Bengali Novel
By
Sushil Kumar Sinha

গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে এস. বি. নায়ক কর্তৃক
প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যাণ্ড প্রসেস, ১১৪এন ডাঃ এস. সি.
ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত

প্ল্যানচেট
প্ল্যানচেট
প্ল্যানচেট

(এক)

শাশ্বতীকে দেখে এবারও পছন্দ হল না। পাত্রপক্ষ চলে যেতেই ঝড় উঠল চাটুজ্জের ঘরে। ঝাপট মেরে মুখ ঝামটে বলে উঠল জ্ঞানদা, —কি করে পছন্দ হবে শুনি। মেয়ের তোমার যেমনি গড়ন তেমনি বরণ। শুধুমাত্র গালভরা নাম রাখলেই আর সকলের কাছে মুখভরা গুণ গাইলেই মেয়ে পছন্দ হয় না, বুঝলে। রূপ থাকা চাই—রূপ? কারো এমন মাথা ফাটেনি যে তোমার ওই কালো কুৎসিৎ মেয়েটাকে বিয়ে করতে যাবে।

—তাহলে কি সতীর বিয়ে দেব না বলছো? বেশ একটু রাগত স্বরেই স্ত্রীকে বলে উঠল রাখু চাটুজ্জে।

—তাই কি আমি বলছি? বলে উঠল জ্ঞানদা—যেমন বিছানা তেমনি পা মেলাই ভাল। বড়ত্বাই করে মক্কা ঢাক্কা থেকে এত বড় ঘর, ভাল ঘর হাতড়ানোর কি দরকার বাপু। এই নিয়ে কত পাত্র ঘুরে গেল খেয়াল আছে? এমনি করে কি গাঁটের ধন, হাঁড়ির কড়ি দেখাশোনার পিছনেই খরচ করে শেষে আমাকে হাভাত করবে? এবারও তো কনে দেখতে আসা লোকগুলোর পিছনে চব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়র ব্যবস্থা করতে গিয়ে তিন-চারশ টাকা ফুটালে। ফল কি পেলে শুনি?

—সত্যি নূতন বৌ, ওরা মুখের উপর যে এমন ভাবে জবাব দিয়ে যাবে কল্পনাও করতে পারিনি। পাত্রের বাবা নিজে আমাকে মুখ ফুটে বললেন—রূপ নিয়ে তো আমি ধুয়ে খাব না বা শো-কেশে, কাঁচের আলমারিতে সাজিয়েও রাখবো না। ওসব সুন্দরী মেয়েদের ভিতর বাইরের নানা কেচ্ছা-কাহিনী দেখে-শুনে রূপবতীদের উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে, সন্দেহ জেগে গেছে তাদের চরিত্রের উপর। আমি আপনার মেয়ের মতই ওমনি শান্ত-শিষ্ট সুশীলা গৃহকর্মে নিপুনা গাঁয়ের মেয়েই চাই রাখহরি বাবু। কোন চিন্তা নেই আপনার। ছেলেকে নিয়ে আমার ছোট জামাই, বড় জামাই যখন একবার দেখতে চাইছে তখন কনে দেখার ব্যবস্থা করুন গিয়ে আপনি। ঘাবড়াবার কিছু নেই। রং একটু কালো, গড়ন একটু-আধটু ইতর-বিশেষ হলে কি হবে। কানা-খোঁড়া বা কালা-বোবা মেয়ে নয় তো আপনার। তবে আর ভয় কি? কিন্তু বার বার যাওয়া আসা তোষামোদ খোশামোদ করার পর শেষে এত আশা পেয়েও নিরাশ হতে হল আমাকে!

—ছেলের বাপ তো আর বিয়ে করবে না, আর আজকালকার ছেলে যখন তখন তাঁরা টিপে কাঁঠাল পাকাতেও পাববেন না। অন্যান্য বাপের মত এরা যে ঘরে গিয়ে চিঠিতে মতামত জানাবো বলে পাশ কাটিযে চলে যাই নি এই রক্ষা। নইলে তোমার দৌড়-ঝাঁপ আরো বাড়তো। মুখের উপর জবাব দিয়ে গেল, খুব ভাল করল ওরা।

—এখন কি করব বলতে পাব নূতন-বৌ?

—কি আর করবে, বলে উঠল জ্ঞানদা, —কতবার তো বলেছি পাশের গ্রামের ওই হর গাঙ্গুলীর ছেলের সঙ্গে কিংবা চড়াডি'র ওই কালী চরণের বেটাব সঙ্গেই দিয়ে দাও বিয়েটা। এক পয়সা পণ ও দিতে হবে না বা বিয়েতে তেমন খাই-খরচাও লাগবে না। যেচে এসে বলছে তারা বার বার।

—তা বলে ওই গোবেট, আধপাগলা হাভাতে ছেলেগুলোর সঙ্গে দেব আমি সতীর বিয়ে! কি বলছো তুমি?

—ওদের সঙ্গে না দেবে তো এই গাঁয়েরই কত বামুন ঘরের এঁড়ে—দামড়া পাঁঠা-পাংড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদেরই একটা ধরে না হয় গছিয়ে দাও তোমার মেয়েটাকে।

—ফলটা কি হবে ভেবেছো? বলে উঠলেন রাখহরি বাবু,—শেষে সব শুদ্ধ ঘাড়ে এসে পড়বে আমার, সে খেয়াল আছে? এত তাড়াহুড়োর কি আছে। দেখে-শুনে একটু ভেবেচিন্তে বিয়ে না দিলে মেয়েটার ভবিষ্যৎটা যে নষ্ট হয়ে যাবে নূতন-বৌ।

—কিন্তু এধারে যে আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে সে কথা ভেবেছো? পনের পেরিয়ে মায়া ষোলতে পড়ল। তোমার মেয়ের মত মায়াকে আমি কুড়ি বছর পর্য্যন্ত থুবড়ি হয়ে থাকতে দেব না। বুঝলে?

—শাশ্বতী কি তোমার মেয়ে নয়?

—না, বেশ জোর গলায় বলে উঠল জ্ঞানদা, —ও হল আমার সতীনের কাঁটা। মাগী মরল—, এ মুখপুড়িটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারল না? হারামজাদী আমার হাড়মাস খেতে পিছনে একটা শূলী রেখে গেল। পেত্নী মুখপুড়ি আজ পর্য্যন্ত নিজেকে কারো চোখে লাগাতে পারল না।

—মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ কর না তো। বলে উঠলেন রাখহরিবাবু,—যাও এখন। মন মতলব খারাপ আমার। একটু একলা চুপচাপ থাকতে দাও।

—তুমি মেয়ের বাবা হয়ে চুপচাপ থাকতে পার কিন্তু আমি মেয়ের মা হয়ে চুপচাপ থাকতে পারব না। ঝংকার দিয়ে বলে উঠল জ্ঞানদা,—তোমার বড় মেয়ের বিয়ে হোক বা না হোক, আসছে ফাগুনেই কিন্তু আমার মায়ার বিয়ে দিতে হবেই তোমাকে। নইলে ঘরে তোমার আমি আগুন লাগিয়ে বাপের বাড়ী পালাব। মনে থাকে যেন।

—কি মুস্কিল। লোকে কি ভাববে বলতো? মা-মরা বড় মেয়েটাকে ফেলে রেখে আমি আমার ছোট মেয়েটার বিয়ে দেব? লোকে ছি-ছি করবে না আমাকে? দোষ দেবে না তোমাকে?

—এতে দোষের কি আছে? মুখ ঝামটে বলে উঠল জ্ঞানদা,—সংসারে একটা মেয়ের বিয়ে হল না বলে কি ঘরশুদ্ধো সব মেয়েগুলোকেই আইবুড়ো থাকতেহবে? মায়ার সঙ্গী বুলি-টুকীরা ছেলের মা হল। ওর চেয়ে কম বয়েসী পরী-মীনাদেরও আজ অনেকদিন হল বিয়ে হয়ে গেল। আর আমার মায়া রূপ-গুণ থাকতেও তোমার মত গোঁয়ার-গোবিন্দ বাপের পাল্লায় পড়ে—

—আঃ, মায়া তো ওদের মত তোমার সাধারণ মেয়ে নয়। বলে উঠল রাখহরি চাটুজ্জে—ও যখন লেখাপড়া শিখছে শিখুক না। মাধ্যমিকটা পাশ করুক। তারপর—

—তোমার ওই এককথা। এসব ঠেকনা দেওয়া বুলি তোমার আমি অনেকবার শুনে আসছি। বিয়ের কথা বললেই তুমি ওমনি লেখাপড়ার কথা বলে আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখছো। এসব তোমার চাল। আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দি। আমি কিন্তু সাফ বলে দিচ্ছি, তোমার মেয়ের বিয়ে হোক বা না হোক আগামী বছরের মধ্যেই কিন্তু আমার মায়ার বিয়ে তোমাকে দিতেই হবে। মনে থাকে যেন। বেশ ঝাপট মেরে কথাগুলো বলে ঝড়ের মত বেগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জ্ঞানদা সুন্দরী।

বসে বসে ভাবতে লাগলেন রাখহরি বাবু। এজগতে মেয়ের বাবা হওয়া বিশেষ করে কুরূপা মেয়ের পিতা হওয়া যে কত বড় শাস্তি, কত বড় পাপ তা বেশ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছেন তিনি। মজ্জায় মজ্জায় টের পাচ্ছেন সন্তান থাকতে দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করা কত বড় অন্যায়, কি ভীষণ ঝকমারি। তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী কমলা এমন উগ্রচণ্ডা, বদ-মেজাজী ছিল না। স্বামীর উপর কথা বলা তো দূরের কথা কোনদিন রুক্ষভাবে তাকাত না পর্য্যন্ত তার দিকে। রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী হয়ে ঘরে এসে তার সংসারটাকে লক্ষ্মীবন্ত করে তুলেছিল সে। আত্ম-পর সকলের সঙ্গে কি মিষ্টি মধুর ব্যবহার ছিল তার। আচার-আচরণে মুহূর্ত্তে সে সকলের মন জয় করে নিত। পরকে করত নিমেষে আপন। তার সেই পতিব্রতা, সেবা পরায়ণা মূর্ত্তিটা এখনও স্মৃতিপটে উদয় হলে সমস্ত মনটা ব্যথাতুর হয়ে উঠে রাখহরি চাটুজ্জের। মন্দভাগ্য না হলে সে এমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রীকে হারাবে কেন। শাশ্বতীও বড় কপাল মন্দ করে এসেছে এ সংসারে। নইলে অকালে এমন মাকে হারাবে কেন সে। আর কেনই বা তার মায়ের উল্টোপিঠ এমন সৎমাকে পাবে সে জীবনে। সবই অদৃষ্ট তার। সে আর কি করবে যতই গুণ থাক, এ জগতে রূপ ছাড়া তো কোন কদর্ নেই মেয়ের।

কিন্তু কমলার যে প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের ধন ছিল শ্বাশ্বতী। বড় সাধ করে সে তার মনের মত ডাক-নাম রেখেছিল তার সতী। সতীর গুণে সব সময় মুখর হয়ে থাকত সে। বলতো—দেখবে গো দেখবে। এই আমি বলে রাখলুম সতী আমার বড় হলে সতী-সাবিত্রী পার্ব্বতীর মত লক্ষীবন্ত পয়মন্ত হবে। ছোটতেই যখন এত শান্তশীলা সে তখন বড় হয়ে সত্যিই তোমার মুখ উজ্জ্বল করবেই।

এখনও মনে পড়ে চাটুজ্জে-মশায়ের কমলার সেই মৃত্যুদিনের কথাটা। বোধহয় বুঝতে পেরেছিল যে সময় তার হয়ে এসেছে। তাই মুমূর্ষ অবস্থায় হাতটা ধরে তার শেষ শক্তিটুকু টেনে অতি কাতরভাবে মিনতি করে বলেছিল—সতী আমার বাপ-নেওটা মেয়ে। আমি মারা গেলেও সে তোমাকে দেখে সব শোক ভুলে থাকবে। তুমি কিন্তু তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিও না। দেখবে তাকে। মনে কষ্ট দিও না তার। ভালভাবে রাখবে তাকে।

—কি যে বল তুমি। উত্তর দিয়েছিলেন তাকে রাখহরি বাবু—সতী কি কেবল তোমার মেয়ে? আমার মেয়ে নয়? তাকে দেখবার জন্য এত অনুরোধ করে বার বার বলতে হবে কেন তোমাকে? আশ্বস্ত করে বলেছিলেন তাকে,—ভেঙে পড়ছ কেন, এত নিরাশ হবার কি আছে। মরবে কেন তুমি? ডাক্তার দেখছে, ওষুধ খাচ্ছো। দেখবে তুমি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে। আমি বলছি। কোন ভয় নেই তোমার। নিশ্চিন্ত থাক তুমি।

কিন্তু এই আশা দেওয়াই সার হয়েছিল চাটুজ্জে মশায়ের। উল্টে তাকে নিরাশ করে কমলা তাকে ছেড়ে চলে গেছল পরপারে। তার প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ শাশ্বতীকে রেখে গেছল তার কাছে। ছোট মেয়ে সতীকে নিয়ে একা সংসার-সমুদ্রে বড় হাবুডুবু খাচ্ছিলেন রাখহরিবাবু। বিশেষ করে তাকে দেখাশোনা করার বড় একটা মায়ের প্রয়োজন হচ্ছিল তার। ঘর সংসারের তার হাল দেখে গাঁয়ের পাড়া-প্রতিবেশীরাই তাকে বিয়ে করতে বলে বার বার। দেখতে-শুনতে তেমন না হলেও পুরন্দরপুরের পবন চক্রবর্ত্তীর মেয়ে বয়সে বেশ বড়। অবস্থা খারাপ বলে চক্রবর্তী মশায় বিয়ে দিতে পারেন নি জ্ঞানদার। বলতে গেলে একরকম বিনা পণেই রাখহরি চাটুজ্জে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে- ছিলেন বুড়ো বামুনকে। কিন্তু বিয়ের পর প্রথম প্রথম জ্ঞানদা এতটা বদ-রাগী, হট্-মেজাজী ছিল না। দিব্যি সতীকে নিয়ে ঘর করছিল তার। কিন্তু মায়া তার কোলে আসতেই কেমন যেন স্বার্থপর হয়ে উঠল সে। শাশ্বতীকে দেখতে লাগল বিষ নজরে। যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল মায়া, ততই যেন আক্রোশটা তার বাড়তে লাগল সতীর উপর। ঠারে-ঠোরে শুরু হল তার উপর নির্য্যাতন। পান থেকে চুন খসলেই তার রাগে হত অগ্নিশর্মা। মার-ধমক গাল-মন্দও চলতে লাগল তার পুরোদমে। বেচারী শাশ্বতী সৎ-মায়ের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত সর্বক্ষণ। গাধার খাটুনি খাটাত তাকে জ্ঞানদা। শুধু ঘর-দোর পরিষ্কার, এঁটো বাসন-কোসন মাজা নয়। গোয়াল ফেলা, হাটবাজার করা এমনকি ধান-সিদ্ধ, চাল করা ঢেঁকিতে পাহার দেওয়া সবকিছু করতে হত তাকে। নিষেধ করবে কি, চাটুজ্জে মশায়ের সেই বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার মত অবস্থা। কোন কিছু কথা বলতে গেলেই ঠিক সে তার উপর ফোঁস করে—ঘরের কাজ ঘরের মেয়ে করবে না-তো কি পরের মেয়ে করবে। আমার সংসারে আমি কাকেও ঘরে বসে বসে খেয়ে গতর ফাঁপাতে দেব না। মেয়েছেলে হয়ে আলসে, কুঁড়ের বাদশা হলে ওর শ্বশুর ঘরের লোক যে তোমাকে শাপান্ত করবে সে খেয়াল আছে?

—কিন্তু প্রত্যেকের বাড়ীতেই তো কাজ করবার জন্য একটা করে কামিন আছে। বলতে গেলেই ওমনি চটপট জবাব—একপয়সা নেই ঝুলিতে ঝাঁপ দিচ্ছে কুলিতে। আর বড়লোকি ঠাট্ দেখাতে হবে না। সামান্য কাজের জন্য ওসব কামিন-টামিন রেখে টাকা খোয়াতে পারব না আমি। আর তোমার ওই সাধের বিটিটিকেও ঘরে বসে পায়ের উপর পা দিয়ে খেতে দেব না কোনদিন।

কিন্তু মায়াও তো একটা মেয়ে। তাকে কিন্তু সংসারের এধারের কুটোটি ওধারে করতে দেবে না কখনও। কারণ লেখাপড়া শিখছে যে সে, পড়াশোনার ক্ষতি হবে যে তার। শুধু তাই নয় কাজ করলে তার নাকি বুদ্ধি মোটা হবে। গায়ের রঙ্ কালো হবে ইত্যাদি-নানা অজুহাত। কাজ করতে অবশ্য কোনদিন পিছু পা হত না শাশ্বতী। সংসারের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সমস্ত খুঁটি-নাটি করে যেত সে মুখ বুজে। কিন্তু মুস্কিল হল কি—সেই বলে না যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা। সামান্য একটু কাজের ত্রুটি হলেই বা সময়ের একটু ইতর বিশেষ হলেই ওমনি তিলকে তাল করত জ্ঞানদা। মুখ দিয়ে তার ছুটত তখন জ্বলন্ত কামানের গোলা—বড় লোকের বিটি, মা-খাকি, সব্বনাশী, আমাকেও খেতে বসে আছে। বাপ তোর সেবা করার জন্য গোটা কতক সেবাদাসী রাখুক হারামজাদী। বাপরে বাপ্ গলার চোটে পাড়ামাত করে ছাড়ত সে। তার ওই অগ্নিবৃষ্টির মাঝে মুখ ফসকে একটা যদি কারো কথা বেরিয়ে যেত তবে আর রক্ষে থাকত না তার। পঞ্চমে তার গলা চড়িয়ে চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে তবে হাঁফ ছাড়ত সে। কে পারবে বাবা ওসব দজ্জাল, জাঁদরেল মেয়ের সঙ্গে। তাই পাড়া প্রতিবেশী চুপ করে থাকত।

চুপ করে থাকত কেলেঙ্কারীর ভয়ে, রাখহরি চাটুজ্জেও। কিন্তু তার এই চুপ করে থাকাটাই জ্ঞানদাকে গাই থেকে ষাঁড়ে পরিণত করেছিল। তার এই দুর্ব্বলতায় ক্রমশঃ মাথার উপরে উঠে নাচতে শুরু করেছিল সে। সব সহ্য করতে হচ্ছিল তাকে একমাত্র শাশ্বতীর বিয়ের অপেক্ষায়। চামুণ্ডাকে শান্ত রেখে সতীর যদি একটা মোটা ভাত মোটা কাপড়ের পাত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তবে চট-জলদি বিয়েটা দিয়ে তার হাড় জুড়ান তিনি। গায়ে বাতাস লাগে তার। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট মেয়েটার আজ পর্য্যন্ত তা জুটাতে পারা গেল না। বড় আশা করেছিলেন তিনি মেদিনীপুরের এ সম্বন্ধটার উপর। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে রাজি করিয়েছিলেন তিনি বিরিঞ্চিবাবুকে। কিন্তু তীরে এসে তরী ডুবে গেল তার। এবার, কার হিল্লে ধরে, কিভাবে আবার তার মেয়ের গতির সন্ধানে বেরুবেন তিনি সেই কথাটাই ভাবছিলেন। হঠাৎ দরজা গোড়ায় সতী এসে দাঁড়িয়ে তেমনি শান্ত সুরে ধীর-নম্র গলায় ডেকে উঠল তাকে, —বাবা।

ভাবনায় ছেদ পড়ল রাখহরি বাবুর। ফিরে তাকিয়ে আদর করে তাকে ডেকে উঠলেন তিনি,—আয় কাছে আয়।

সত্যি মেয়েটাকে দেখলে বড় মায়া হয় রাখহরি বাবুর। মুখটা দেখলেই তার কমলা, তার সমস্ত স্মৃতি নিয়ে ভেসে উঠে। কাছে আসতেই মাথায় তার হাত বুলিয়ে বলে উঠলেন তিনি,—কিছু বলবি মা?

—একটা কথা বলছিলাম বাবা।

—কি কথা বল।

—বললে তুমি শুনবে তো সে কথা? বলেই আবার বিশেষভাবে অনুরোধ করে উঠল শাশ্বতী—কিন্তু একথা তোমাকে রাখতেই হবে বাবা।

—কি মুস্কিল। বলে উঠলেন রাখহরি বাবু—কি কথা বলবি তো আগে।

—তুমি এভাবে আর আমার সম্বন্ধ দেখে বেড়িও না বাবা। তোমাকে আগেও অনেকবার বলেছি, এবারও বলছি বিয়ে আমি করব না।

—দূর পাগলী! চাপা একটা ধমক দিয়ে উঠলেন রাখহরি বাবু—তাই বললে কি চলে। মেয়ে মানুষ হয়ে যখন জন্মেছিস মা, তখন বিয়ে তোকে করতেই হবে। আমি তোর অপদার্থ বাবা তাই এখনও তোকে পাত্রস্থ করতে পারলাম না।

—আমি যদি বিয়ে না করি, তবু তুমি জোর করে দেবে আমার বিয়ে?

—তাই কি কখনও হয় পাগলী। বলে উঠলেন রাখহরি বাবু, —বাবা হয়ে আমার একটা কর্ত্তব্য আছে না। তুই যদি বিয়ে না করিস তবে ত্যের পিতা হয়ে আমার কি অবস্থা হবে ভেবেছিস? লোকে তো ছি ছি করবেই উপরন্তু আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রেখে মরলে নরকেও আমার স্থান হবে না তা জানিস। ও কথা তুই বলিস না শাশ্বতী। বিয়ে তোকে করতেই হবে।

—বেশ, তাহলে মায়ার বিয়ে দাও, তুমি আগে। খুব ধূমধাম করে বড় ঘর, ভালোপাত্র দেখে!

—তাই কখনও সম্ভব? বড় থাকতে ছোটর বিয়ে দিতে পারি আমি কোনদিন? এ কথা আমি তোর শুনব না সতী। পাঁচজনের কাছে আমি তাহলে মুখ দেখাতে পারব না। তোর মায়ের কাছেও আমি চির অপরাধী থেকে যাব। মরণের পর তার সামনে গিয়ে আমি তাহলে দাঁড়াব কি করে সতী? না-না, এ হবে না। তোকে আগে পাত্রস্থ না করে কিছুতেই আমি মায়ার বিয়ে দিতে পারব না।

চুপ হল সতী। কি যেন ভাবতে লাগল সে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল সে, —বেশ, সেটাই যদি তোমার ইচ্ছা বাবা তাহলে পাশের গ্রামের ওই হর গাঙ্গুলীর ছেলের সঙ্গে কিংবা চড়াড়ির ওই কালীচরণ না কি নাম তার বেটার সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ ঠিক কর বাবা। ওখানেই আমি বিয়ে করব।

বাবার মুখে আর কথা সরল না। মেয়ে কিন্তু দিব্যি আবার বলল,—পাগল বোকাটে যাই হোক না তারা, আমার কপালে যা থাকে তাই তো হবে। তুমি এ নিয়ে আর কোন চিন্তা কর না বাবা। দুঃখ কর না কোনদিন। আমি তোমাদের আশীর্বাদে সব মানিয়ে নিতে পারব।

হঠাৎ শাশ্বতীর কাঁপা গলার সঙ্গে ছলছলে চোখ দুটো নজর পড়তেই যেন চমকে উঠলেন রাখহরিবাবু। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাকে—তোর কি হয়েছে বলতো?

উত্তর দিতে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে প্রবেশ করল জ্ঞানদা,—হবে আর কি ? মুখপুড়ির এত বাড় ! নিজের মনে মনস্তাপে দুটো কথা বলেছিলাম আর সব্বনাশী কাজের নাম করে একা তোমাকে তাই লাগাতে এসেছে এখানে ? দেখি হারামজাদী তোর কোন বাপ তোকে রক্ষা করে। বলেই চুলের মুঠিটা ধরে শাশ্বতীকে এক হেঁচকায় আছড়ে ফেলল মেঝেতে।

ধমকে উঠলেন চাটুজ্জে মশায়—এ কি করছো তুমি ?

—করব না মানে ? শুনলে না বড় মেয়ের আক্কেল ? কাজ-কম্ম ছেড়ে দিয়ে এতক্ষণ আড়ি পেতে শোনা হচ্ছিল আমাদের কথাবাৰ্ত্তা। কুড়ি পেরিয়ে বুড়ী হতে চলল হারামজাদী, একটু লজ্জা-শরম নেই গো! ঘরের ভিতর আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে কি সব কথাবাৰ্ত্তা হচ্ছে সে সব শোনা! ভেবেছিস কি মুখপুড়ি বাপকে, তার সৰ্ব্বস্ব খুইয়ে রাজপুত্র আনা করাবি ? ক্ষেপা হোক পাগলা হোক, গোবেট-মুখ্য-ক্যাবলাকান্ত যাই হোক না কেন—চড়াড়ির ওই কালীচরনের ছেলেকেই বিয়ে করতে হবে তোকে।

—চাটুজ্জে মশায়। হঠাৎ বাইরের সদর দরজা থেকে ভেসে এল ঘটক ঠাকুরের গলা। কি ব্যাপার! মেদিনীপুরের কনে দেখা দলটার সঙ্গেই বিদেয় হয়েছিলেন তিনি আবার ফিরে এলেন কেন! কপাট খুলতেই দেখলেন তিনি শুধু ঘটক মশায় নন, তার সঙ্গে ফিরে এসেছেন সেই পাত্রটি সমেত তার জামাইবাবুরাও। জিজ্ঞাসু চোখে চাইতেই তাকে বলে উঠলেন ঘটক ঠাকুর—বাস ফেল করে বা ট্রেন পাবেন না বলে ফিরে আসেনি ইনারা। আমি আপনার কথামত এনাদের ভালভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে আবার ফিরিয়ে এনেছি আপনার কাছে। চলুন বলছি সব কথা।

—আসুন, আসুন! বলে চাটুজ্জে মশায় আবার তাদের সসম্মানে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। যথারীতি চা-জলখাবার দিয়ে পরম আগ্রহে তাকিয়ে রইলেন তাদের বক্তব্য শোনবার জন্য। ভদ্রলোকদের ফিরে আসার কথাটা চাউর হতেই বেড়-বাখুলের দু-চারজন মান্য-গণ্য লোকও এসে জুটল। জ্ঞানদাও কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজার বাইরে।

ঘটক মশায়ই প্রথম পাড়লেন কথাটা। মেয়ে নাকি তাদের পছন্দ হয়েছে তবে চাটুজ্জে মশায়ের বড় মেয়েকে নয়। ছোট মেয়ে ওই মায়াকে। পাত্র নিজের মুখেই জানিয়েছে এ কথাটা। পীড়াপীড়ি করতেই সে স্পষ্ট নাকি বলেছে তাদের যে, রাখহরি বাবুর সম্মান বাঁচাতে ও তার বাবার কথা রাখতে সে এই ঘরেই বিয়ে করতে পারে, তবে তার ওই ছোট মেয়েকে। বড় মেয়েকেই দেখার সময় তার নাকি নজর পড়েছিল মায়ার উপর। কথাটা সে তখন বলতে পারে নি। তাই যেতে যেতে তার জামাইবাবুদিকে জানিয়েছে সে তার মনের কথা। কিন্তু জামাইবাবুবা তো আর তেমনভাবে তখন দেখেনি তার ছোট মেয়েকে। তাই আবার কখন তাদের আসা হয় বা না হয়, তাই এই যাত্রাতেই তার ছোট মেয়েকে একেবারেই দেখে যেতে চান তারা। সুতরাং চাটুজ্জে মশায়ের যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে ছোট মেয়েকে তার চট্ করে একবার দেখাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। কারণ পরের ট্রেনেই ফিরে যেতে চান তারা।

একি কথা! আশ্চর্য্য হলেন রাখহরি বাবু! একথায় রাজি হবেন তিনি কি ভাবে। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীরা তার সোচ্চার হয়ে উঠল এক সঙ্গে—খুব ভাল কথা, বড় আনন্দের কথা। কার বিয়ের ফুল কখন ফুটে তা তো বলা যায় না। পরেই বা হল বড়র বিয়ে। তা বলে তো আর দুটো মেয়েকে মাথায় করে সাধারণ গৃহস্থের কোন বাবা চুপ করে বসে থাকতে পারে না। বিয়ের ব্যাপারে পাত্রের মনই হল বড় কথা। সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম।

কিন্তু যে যতই বলুক মনে কথাটা বেশ সায় দিল না রাখহরি চাটুজ্জের। কিন্তু স্বামী বেয়াক্কেলে হলে তার স্ত্রী জ্ঞানদা তো কখনও চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তার গোঁয়ার্তুমিতে যাচা বর, মাগা কনে সে ছাড়বে না কিছুতেই। তাছাড়া ছেলেটি দেখতে শুনতেও মোটামুটি ভাল। বিদ্যে-বুদ্ধিও আছে। সদ্য আবার তার বাপের চাকরিটাও পাবে সে, ঘরে জমি-জায়গাও বেশ। মাথার উপর বর্তমানে আর কোন লাগ দায়িত্ব নেই। বোন-দুটোও উদ্ধার হয়ে গেছে তার। তবে কি হবে আর মায়ার লেখাপড়া নিয়ে। শ্বশুর ঘরের লোক চায় তো বিয়ের পর তারা বৌকে তাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখাবে। এমন পাত্র ছাড়াও যা মাথার লক্ষ্মী পায়ে ফেলাও তা। থাক স্বামী তার বেয়াড়া ঝোঁকটা নিয়ে। সে মেয়ের মা। স্বামীর বোকামির সঙ্গে যোগ দিয়ে সে তার

মেয়ের ভবিষ্যৎ কিচ্ছুতেই নষ্ট করতে পারবে না। সুতরাং অগ্রণী হয়ে জ্ঞানদা নিজেই মায়াকে তার দেখাবার ব্যবস্থা করতে লাগল।

পাঠাল শাশ্বতীকে সুলতাদের বাড়ী। সেখানে নাকি বান্ধবীর সঙ্গে অঙ্ক কষতে গেছে মায়া। অঙ্ক না কচু। শাশ্বতী তাকে আনন্দে ডাকতে গিয়ে দেখল দু-জনে মিলে তাকে দেখতে আসা লোকগুলোকে বেনামী একটা চিঠি ছাড়ার ব্যবস্থা করছে তারা। কড়া চিঠি। আসলে এই ভদ্রলোকগুলো তার বাবার মুখের উপর এত লোকের সামনে শাশ্বতীর গড়ন-বরণ নিয়ে অভদ্রভাবে যে কুমন্তব্যগুলো করে গেছল ও চিঠি তারই জবাব। একটুতেই বড় উত্তেজিত হয় মায়া। বিশেষ করে তার দিদিকে কেউ কিছু বললে তার মেজাজ উঠে টঙে। যতক্ষণ না তাকে গালের উপর চড় দিতে পাচ্ছে সে ততক্ষণ স্বস্তি পায় না সে মনে। সেখানে শোনা অবধি গা-টা রি-রি করছিলো তার। অভদ্রগুলোকে মুখের উপরেই বেশ দু-কথা শুনিয়ে দেবার ইচ্ছা হয়েছিল তার। পারেনি বাবার ভয়ে। তাই এখানে গোপনে এসে—বান্ধবীতে শলা-পরামর্শ করে চিঠির মাধ্যমে গায়ের ঝালটা ঝাড়তে উদ্যত হয়েছিল সে। দিদি আসতেই আর হল না। না হোক। শাশ্বতীর মুখে সব কথা শুনে আনন্দে চুটকি বাজিয়ে উঠল মায়া। বলে উঠল সে সুলতাকে—এই মওকা, চল সুলি, ঘুরে যখন দেখতে এসেছে ওরা আমাকে তখন এবার গালের উপর কেমন চড়টা দিতে হয় দেখিয়ে দিই ওদের।

শাশ্বতী তো অবাক! মেয়ে ঘাবড়ে যাবে কি পুরুষালী তার কেতা দেখে দস্তুর মত ভয় পেয়ে গেল সে। বলে উঠল মায়াকে অনুরোধ করে, —দেখ বোনটি, বেয়াদপি কিছু করিস না, বাবা দুঃখ পাবেন। ভদ্রলোকরা দয়া করে ফিরে এসেছেন যখন, তখন ভদ্র আচরণ করে তাদের মন জয় করবি। বুঝলি?

—তুই আর উপদেশ দিতে আসিস না তো দিদি। ধমকে উঠল মায়া, স্কুল-মাষ্টার আর মা-বাবার উপদেশ শুনতে শুনতে কানগুলো আমার ঝালাপালা হয়ে গেল। এর উপর তোর আর ঠাকুরদিদি-গিরি ভাল লাগে না।

—তা বলে তুই কিন্তু যা-ইচ্ছে তাই করতে পাবি না। মনে রাখবি ওরা বাইরের লোক। গাঁয়ের ছেলে-ছোকরা নয় যে ইয়ার্কি ফাজলামি করে কাটাবি। ওদের অনুগ্রহ আমাদের দরকার।

—তা বলে কি তুই বলতে চাস আমিও তোর মত, ভেড়ার মত, গোবেচারা হয়ে বসে থাকবো? সাফ কথা—আমার দ্বারা ওসব হবে না।

—বেশ বাবা, চল তো তুই আগে। দেরী করলে মা আবার ছুটে আসবেন। তোকে মনের মত করে সাজিয়ে তাদের সামনে হাজির করে দিলেই আমার ছুটি। বলেই শাশ্বতী ঘরে আনল মায়াকে। সঙ্গে শুধু সুলতা নয় এল তার সাথে আরোও বান্ধবীর দল। ব্যাপারটা গাঁয়ে রাষ্ট্র হয়ে যেতেই উঠোনে তাদের জমে গেল অনেক দর্শনার্থী।

কনে সাজাতে শাশ্বতী গাঁয়ের মধ্যে ছিল সেরা পারক মেয়ে। নিজের রূপ না থাকলে কি হবে অপরকে রূপবন্ত করে তুলতে তার জুড়ি মেলা ছিল ভার। সত্যিই, মায়াকে যখন হলদে ফিতায় বেনী বেঁধে গোলাপী রঙের শাড়ী পরিয়ে তাদের সামনে এনে হাজির করল তখন ভদ্রলোকদের চক্ষু চড়ক গাছ! পাত্ররত্ন চাকচাঁদা! জামাইবাবুরা মনে মনে বোধহয় তারিফ করতে লাগলেন তাদের শ্যালককে। সত্যি পরিমলের চোখ আছে। মাল চিনতে পারে সে ভাল। সবাই নির্বাক-নিস্পন্দ। ভদ্রলোকদের চুপ দিয়ে বসে থাকতে দেখে মায়াই হঠাৎ বলে উঠল, — কি, আপনারা কিছু কি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না আমিই আপনাদের কিছু জিজ্ঞেস করব?

সবাই তো অবাক! মেয়ে আবার কথা বলবে কি! তার তো ধীর-স্থির শান্ত-শীলা হয়ে বসে থাকার কথা। মায়ার কথায় মনে হয় ঘাবড়ে গেছলেন ভদ্রলোকরাও। তাই আমতা আমতা করে তাদের বড় জামাইবাবু বলে উঠলেন,—তোমার কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করতে পার।

স্পষ্ট গলায় নির্ভীক ভাবে জিজ্ঞেস করে উঠল মায়া, —আপনারা দিদিকে দেখে বিদেয় হয়ে মাঝপথ থেকে আবার হঠাৎ ফিরে এলেন কেন?

উত্তর দিলেন ঘটক মশায়,—তোমাকে দেখতে মা। তখন তো তোমাকে ভালভাবে দেখা হয়নি তাই পছন্দ হয়েছে বলে জামাইবাবুরা তোমাকে ভালভাবে দেখতে এলেন।

—এ কি কথা! অবাক হয়ে বলে উঠল মায়া,—একজনকে দেখতে এসে আর একজনকে পছন্দ করলেন! আমাকে দেখে যেতে যেতে পথের মাঝে যদি আবার আর একজন মেয়েকে পছন্দ করে বসেন তখন?

আচ্ছা বাচাল মেয়ে তো! ঘটকমশায় একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,—তুমি কি বলতে চাও স্পষ্ট করে বলতো।

—আমি বলতে চাই আপনাদের পাত্রটিকে। বলে উঠল মায়া,—তিনি কি মনে করেন তিনি খুব সুপুরুষ।

বলে উঠলেন তাদের ছোট জামাইবাবু—এ কথার কোন মানে হয়?

—কেন হয় না? বলে উঠল মায়া—তিনি যদি মনে করেন তিনি কাঁচা কার্ত্তিক তবে তিনি আমাকে দয়া করতে এসেছেন। আমি কারো দয়া চাই না। আর উনি যদি মনে করেন আমি সুন্দরী তবে তো তাকে আমার দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। তা পারবেন উনি?

চুপ করে ছিলেন রাখহরিবাবু কিন্তু মায়ার জ্যাঠা-কাকারা ধমকে উঠলেন তাকে, —মায়া, কি সব যা-তা কথা বলছিস? একটু সমীহ করে চল। পছন্দ হয়েছে বলেই তো তোকে ফিরে আবার দেখতে এসেছেন এরা।

—কিন্তু আমাদেরও একটা পছন্দ—অপছন্দ আছে তো কাকা। বলে উঠল মায়া, —ওই রঙ-দাবা দাঁত-উঁচু পাত্রটিকে যদি আমার পছন্দ না হয় তবু কি তাদের খেয়ালের বশে আমাকে জোর করে বিয়ে করতে হবে?

আচ্ছা ঠোঁটকাটা মেয়ে তো মায়া! গুঞ্জন উঠল দেখতে আসা গ্রাম-প্রতিবেশী পাড়ার মাসি-পিসিদের মধ্যেও। এই সেদিনের মেয়ে, পুরুষদেরও যে এমন কানকাটা হতে পারে কে জানে। কেউ বলল—ইচঁড় পাকা, কেউ বলল—ফাজিল। কেউ কেউ আবার বলল—লেখাপড়া শিখে আজকালকার মেয়েরা দিনের পর দিন এমনিই হচ্ছে। জ্ঞান-আক্কেল হলে কি হবে ধরাকে সরা দেখছে সব। লজ্জা-সরম ঝেঁটিয়ে বিদেয় করছে সব নিজেদের আচরণ থেকে। হত-চকিত ভাবটা কাটাবার জন্য তাদের মধ্যে বড় জামাইবাবু বলে উঠলেন, —এ কথাটা আগে জানালেই হত। তাহলে এমন ঘটা করে দেখতে বসতাম না।

—তার সুযোগ দিলেন কই আপনারা। মায়ার তেমনি কথা।

রেগে উঠলেন বোধ হয় ছোট জামাইবাবু—চল দাদা, পরিমল যতই বলুক এখানে তার আর বিয়ে হতে দেব না।

সমান স্বরে উত্তর দিয়ে উঠল মায়া—ও কথা তো আমি বলব। কারণ আমি বিয়ে না করলে উনি বিয়ে করবেন কি করে?

ওধারে মায়ার মা বোধহয় আর স্থির থাকতে পারল না। তার শ্বশুর-ভাসুর যতই সেখানের আসর জমিয়ে বসে থাক সেই কথায় বলে না বানর কখনও পোয়াল জাঁকা থাকে না সেই হল জ্ঞানদার। ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচের মত সে স্বামীর প্রায় সামনে এসে হাত নেড়ে মুখ ঝেড়ে বলতে লাগল, —ভিজে বেড়ালের মত বসে আছ যে—মেয়েটা যে সমানে তোমার এত লোকের মাঝে বেয়াল্লাগি করে চলেছে কান থাকতেও শুনতে পাচ্ছো না? চোখ থাকতেও দেখতে পাচ্ছো না? এভাবে মেয়ের বিয়ে কখনও হবে তোমার? মুখ নেই ধমকাবার? শাসানি দিয়ে মেয়েটার বকবকানিটা বন্ধ করতে পাচ্ছো না?

—চল পরিমল। টানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্যালক-পাত্রটিকে বলে উঠলেন বড় জামাইবাবু—এখানে আর থাকাটা বোধ হয় আমাদের ঠিক হবে না।

—সেই ভাল। সঙ্গে সঙ্গে তার কথার উপর বলে উঠল মায়া—কারণ দিদিকে দেখতে এসেছিলেন বলে দিদি আপনাদের রান্না-বান্না, চব্য-চুষ্য লেহ্য পেয়র ব্যবস্থা করতে সকাল থেকে গাধার খাটুনি খেটে ছিলেন। আমাকে দেখতে এসেছেন বলে আমার দ্বারা ওসব হবে না কিন্তু। ওসব হাতা-খুন্তি আমি ধরিনি কখনও, ধরবও না। সুতরাং সময় থাকতে আপনাদের কেটে পড়াই ভাল। কারণ রাস্তার মোড়ে বিকেলের বাসটা পেয়ে গেলে সন্ধ্যার ট্রেনটা ধরেই আপনারা মেদিনীপুরে পৌঁছতে পারবেন।

এবার মুখ খুললেন রাখহরি বাবু,—মায়া, এভাবে কথা বলা উচিত নয় তোর। ওরা আমাদের সম্মানীয় অতিথি। ভদ্রভাবে কথা বল। এসব হচ্ছে কি তোর?

—কেন বাবা। বলে উঠল মায়া—এসব আচরণ তো আজই আমি ওদের কাছেই শিখলাম। দিদিকে দেখার পর ওরা যদি আপনার মত বয়স্ক সম্মানীয় লোকের কাছে অভদ্রভাবে শালীনতা বর্জ্জিত হয়ে দিদির

রঙ-ঢঙ গড়ন-বরণ ইত্যাদি তুলে অপছন্দের কথা বলতে পারে—তার বাপের কাছে। আমি তবে তাদের কাছে আমার অপছন্দের কথাটা বলতে পারব না কেন? তাদের কি আমরা খেয়াল-খুশির দাস?

ছোট জামাইবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। মায়ার কথা শুনেই তিনি —চল দাদা, চল পরিমল। বলেই হাত ধরে টেনে উঠালেন বড় জামাইবাবু ও তার শ্যালক পরিমল পাত্রটিকে, —যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর নয়। দাঁড়ালে কেন? আক্কেল সেলামী তো চরম পেলে। এবার বাড়ী চল।

—সে কি কথা! বলে উঠলেন রাখহরি বাবু—আর একবার চা-জলটা অন্তত খেয়ে যান আপনারা।

—আর মশায় আপনার চা-জল, বলে উঠলেন বড় জামাইবাবু—যা খাওয়াটা খাইয়েছে আপনার মেয়ে সেটা হজম করতে আমাদের বেশ দু-একদিন লাগবে। এর উপর আবার চা-জল? বাপরে বাপ্! পাড়া গাঁয়ের মেয়ে যে এমন হয় ধারণা ছিল না আগে। এ যে দেখছি আপনার বড় মেয়ের ঠিক উল্টো-পিঠ।

—যদিও ও পিঠটি আপনার উদ্ধার হয় তবু এ পিঠটি আপনার উদ্ধার হবে না চাটুজ্জে মশায়। হাত নেড়ে বেশ রাগত ভাবেই বলে উঠলেন ঘটকঠাকুর—এই আমি বলে রাখলুম। মেয়েছেলে যতই লেখাপড়া শিখুক—একটু লাজ-লজ্জা থাকা দরকার। শুধু রূপ থাকলেই হয় না চাটুজ্জে মশায় একটু মুখ-মিষ্টি হওয়াও প্রয়োজন। মেয়েদের এমন চোখা-চোখা কথা খোঁচা-খোঁচা বান ভাল নয় রাখহরি বাবু, বিয়ে দেওয়া ভার হবে।

—তার জন্যই বোধ হয় আপনি এঁদের আবার ঘুরিয়ে আনলেন? তেমনি ঠোঁটকাটা স্বভাবে বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গীতে বলে উঠল মায়া—আচ্ছা ঘটককাকা, সম্বন্ধটা ফিরিয়ে আনলে বাবা আপনাকে কতটাকা বকশিস দেব বলেছিলেন?

—দেখছেন চাটুজ্জে মশায়, শুনছেন আপনার মেয়ের কথা? যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ঘটকমশায়। প্রায় হাত জোড় করে বলে উঠলেন তিনি মায়াকে, —ঘাট হয়ে গেছে মা, মস্ত অন্যায় হয়ে গেছে আমার, ওদের ফিরিয়ে আনা। ভাল করতে এসে যে তোমার এমন গুঁতোনি খাব ভাবিনি কখনও।

তার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলে উঠলেন ছোট-জামাই বাবু, —আমাদের ফিরে আসাটা মোটেই উচিত হয়নি। ঠিক হয়নি এভাবে পুনরায় কনে দেখতে আসাও।

—এতক্ষণে বুঝলেন? মাথা নেড়ে বলে উঠল মায়া।

—আঃ মায়া! ধমকে উঠলেন রাখহরি বাবু—কে তোকে এমন কথার উপর কথা বলতে বলছে? যা তো তুই এখন এখান থেকে।

—এই আদেশটাই তো চাইছিলাম। বলেই মায়া প্রায় ঘোড় দৌড়ের মত ছুটে চলে গেল তার নিজের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে সুলতা, কেয়া, যুথিকা মানসী, মেনকা ইত্যাদি তার বান্ধবীর দলও ছুটে এল তার পিছনে ভনভনিয়ে তারপর হা-হা, হো-হো, হি-হি, হি-হি, ফিক-ফিক সেকি হাসি! গরম গরম বেশ দেওয়া হয়েছে বাছাধনদের। সুলতা বলল, —সত্যি ভাই, তোর আচ্ছা গালের মত চড় দেওয়া হয়েছে ভদ্রলোকদের। এই না হলে টাইট দেওয়া।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠল মায়া,—হতচ্ছাড়ারা দিদিকে খোঁটা দেয়। রঙ-ঢঙ্ তুলে অপমান করে যায় বাবার সামনেই। তখন থেকেই ওদের ছুঁচো মুখগুলো বুচো করার জন্য রাগে গা-টা আমার রি-রি করছিল। মকা পেলাম যখন তখন ঝাল ঝাড়তে ছাড়ব কেন বল?

বলে উঠল যূথিকা, —সত্যি ভাই, তোর পেটে যে এত গুণ জানতেম না আগে। বাহাবা পাবার তুই অধিকারী। পঞ্চমুখে তোকে প্রশংসা করতে হয় মায়া।

শাশ্বতী কিন্তু চুপ। সকলের সব প্রশংসার শেষে গম্ভীরভাবে সে বলে উঠল মায়াকে, —এতগুলো পুরুষমানুষের সামনে তোর এমন বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক হয়নি মায়া। মোটেই উচিত হয় নি তোর ওভাবে অপমানকর কথা বলার। কেন, শান্ত-শিষ্ট হয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত বসেই থাকতিস যদি তবে এমন কি ক্ষতি হোত তোর?

—দেখ দিদি, গম্ভীর ভাবে বলে উঠল মায়া, —জ্ঞান দিতে আসিস না তুই। বুড়ো মানুষ, বাবার সামনে

ওদের কি শান্ত-শিষ্ট হয়ে কথা বলা, সমীহ করে আচরণ করা উচিত ছিল না? তোকে যে একের পর এক এতসব অবান্তর, অপমানকর প্রশ্ন করে গেল ওরা, ওটা কি ওদের ঠিক হয়েছিল? কথার খোঁচায় যখন ওরা নাস্তানাবুদ করছিল তোকে তখন কি বুঝতে পারিস নি তুই যে তোকে ওরা অপছন্দ করছে? ওদের অপছন্দের উত্তর তখন আমার মত পাল্টা প্রশ্ন করে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তোর যে তুইও তাদের অপছন্দ করছিস। সেটা তুই জানাসনি বলেই তো তোর কাজটা আমাকে করতে হল।

—এটা কিন্তু তুই ঠিক করলি না মায়া। বলে উঠল শাশ্বতী—যতই হোক, ওঁরা ভদ্রলোক। বাইরে থেকে এসেছেন। আমাদের অতিথি। এভাবে অপমান করা আমাদের উচিত হয়নি। কি ভাবল বলতো ওরা?

—কি আর ভাববে? বলে উঠল মায়া,—বরং একটা ভাল ধারনা নিয়ে গেল ওরা আমাদের সম্বন্ধে যে পাড়া গাঁয়ের মেয়েরা তাদের শহুরে মেয়েদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এ যুগে যে যেমন কুকুর তাকে তেমন মুগুর দিতে না পারলে চিরকাল ভ্যাবা-গঙ্গারাম হয়ে থাকতে হবে-তা তুই জানিস? নে, দিদি-গিরি আর ফলাসনে তো এখন। সাজিয়ে আসরে পাঠিয়েছিল যখন তখন প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য শেষ করে এসেছি। এবার সাজ-পোশাকটা খুলে দে তো-একটু হাল্কা হয়ে নিই।

—কিন্তু ওধারে তো খুব বাহাদুরী দেখিয়ে এলি এধারে কাকীমা—জ্যাঠাইমা, পিসি-মারা সব ছি-ছি করছে তোকে সে খেয়াল আছে। বলে উঠল শাশ্বতী—মা তোর ওপরে রেগে আগুন।

—তাহলে তো এক্ষুনি নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হল বলে। বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে বলে উঠল মায়া,—থাক, ড্রেসটা তবে আর খুলতে হবে না। পাঠটা তাহলে একেবারে চুকিয়েই আসি।

কিন্তু মায়াকে আর যেতে হল না। মায়া-জননী জ্ঞানদাদেবীই রণ-রঙ্গিনী মূর্ত্তিতে প্রবেশ করলেন। ক্রোধন্মত্ত অবস্থায় বলে উঠলেন তিনি মায়াকে—হারামজাদী, এতলোকের সামনে বাপের তোর মুখপোড়াতে লজ্জা করল না? লেখাপড়া শিখে সাপের পাঁচ-পা দেখেছিস মুখপুড়ি? কি মনে করেছিস তুই? বিয়ে না করে তোর ওই দিদি সব্বনাশীর মত চিরকাল আইবুড়ো থেকে ধিঙ্গি হয়ে ঘুরে বেড়াবি?

—তা তো আমি বলিনি মা। বলে উঠল মায়া, —মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন বিয়ে তো আমাকে করতেই হবে, কিন্তু দিদির আগে নয়। দিদির আগে ভাল বর, ভাল ঘর দেখে বিয়ে দাও তারপর আমার কথা।

—তোর ওই পেত্নী মুখপুড়ি দিদির যদি চিরকাল বিয়ে না হয় তাহলে কি তুই-ও বিয়ে করবি না?

—না, মায়ার স্পষ্ট জবাব, —একটা কথা তোমাকে বার বার কত বলব মা? আগেও যেমন বলেছি এখনও তেমনি বলছি—দিদির বিয়ে না হলে আমিও বিয়ে করব না, করব না, করব না।

—বুঝেছি, তোর ওই দিদি মুখপুড়িই মাথাটা খেয়েছে। বলে উঠল জ্ঞানদা,—তোকে ওকে ডাকতে পাঠানই আমার মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ও সব্বনাশী সুলতাদের বাড়ী গিয়ে তোকে এসব কুমন্ত্রণা দিয়ে এসেছে। তাই তুই—

—কখ্খনো না। বলে উঠল মায়া, —দিদির এসব বুদ্ধি থাকলে রাতদিন তোমার এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হত না।

—কি বললি তুই? রেগে উঠেই ওমনি আবার নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠল জ্ঞানদা, —তোর কি দোষ। ওই সব্বনাশীই তোকে মিথ্যে লাগিয়ে আমার উপর এমন বিষ নজর করছে। হতচ্ছাড়িকে বিদেয় না করলে এ ঘরে আগুন লাগাবে। আজই যদি তোর বাপকে না বলে ওই হর গাঙ্গুলী বা কালীচরনের ছেলের সঙ্গে ওর গতির কোন ব্যবস্থা করতে পারি তবে আমি পবন মুখুজ্জের মেয়েই নই।

—তবে এই সঙ্গে দিদির মত আমারও একটা হাঁদারাম ভোঁদা-রাম কেবলাকান্ত পাত্র দেখে রাখবে মা। কারণ দিদির বরের মত সমান বলদ না হলে তোমার গাড়ীর জোয়াল টানা যাবে কি করে?

যেমনি হল মেয়ের কথার ছিরি তেমনি হল তার বলার ঢং। কি যে করবে জ্ঞানদা খুঁজে পেল না। এই সতীন-কাঁটাই সংসারের কাল হয়েছে তার। একে গলায় গেঁথে তার স্বামী মরছে যেমন তেমনি দিনের পর দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে তার মেয়েটাও। এর প্রতিকার একটা করতেই হবে তাকে।

(দুই)

একটা কাণ্ড ঘটল ভূতগ্রামে। অবশ্য সেই কাণ্ডটাই পরে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে জীবনের সব অঘটনই দুর্ঘটনা নয়। কারো কারো জীবনে তার দু-একটা সুঘটনও হয়ে দাঁড়ায়। আমি বলছি ভূতগ্রামের রাখহরি চাটুজ্জের মেয়ে শাশ্বতীর কথা। "সতী" ডাকনামে মা যাকে চিহ্নিত করে অকালে তাকে চিরকালের মত ছেড়ে চলে গেছলেন পরলোকে। কাণ্ডটা ঘটেছিল ভূতগ্রামের গ্রাম্য-দেবতা বাবা ভূতনাথের মন্দিরে। মন্দিরটা ছিল গ্রামের মাথায়। এমন জায়গায় যেখানে উত্তর-পূর্ব দক্ষিণ দিক থেকে তিন পাড়ারই তিনটে কুলি এসে শেষ হয়েছে তার চত্বরে। মন্দিরের পশ্চিমটায় চড়কডাঙ্গা। তার পিছনের চড়কডাঙ্গার মাঠটা পেরুলেই শালী নদী। নদীটা মন্দিরটার সোজা বালি ধূপধূপি তার চরটাতে গ্রামের শ্মশানটাকে রেখে বয়ে গেছে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে। একপাশে জন জীবনের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের কল- কোলাহল অপর পাশে শ্মশান-ভূমির ধীর স্থির মহামৌন শান্ত-সৌম্য স্তব্ধতা। মাঝে তার দাঁড়িয়ে আছে মহাদেব মহাকালের মন্দির। মহাশূন্যে তার ত্রিশূল-চূড়া উঁচিয়ে। চারদিকে তার দাওয়া উঁচু বারান্দা। নিত্যপূজা হয় সে মন্দিরে। তবে বিশেষ পূজা হয় সোমবারে। মনোমত পতিলাভের আশায় নাকি গ্রামের প্রায় সব আইবুড়ো মেয়েছেলেরা এদিন উপোসী থেকে পূজো দিতে ভিড় জমায় বাবা ভোলানাথের মন্দিরে।

সেদিনটাও ছিল সোমবার। গোয়াল ফেলা, ঝাঁট দেওয়া ইত্যাদি ঘর সংসারের বাসিপাট সেরে পূজো দিতে আসতে শাশ্বতীর বেশ একটু দেরী হয়ে গেছল। তাই স্থান পেয়েছিল সে পূজো দিতে আসা মেয়েদের লাইনের একেবারে শেষ প্রান্তে। সুতরাং অপেক্ষা করা ছাড়া গতি ছিল না তার। কাণ্ডটা ঘটেছিল মন্দিরের এই গোড়াতেই। আবার ঘটবি ঘট সেটা গিয়ে ঘটল একেবারে ভূতনাথের ঘাড়েই। ভূতনাথ ছিল ভূত গ্রামেরই ছেলে। বলরাম বাড়ুজ্জের একমাত্র সন্তান বাপের সবে ধন নীলমণি। নিঃসন্তান বলরাম বাড়ুজ্জের স্ত্রী তিনদিন দু'রাত নাকি এই মন্দিরে বাবা ভূতনাথের পদতলে ধন্না দিয়ে পড়ে থেকে তবে পেয়েছিলেন কোলে তার এই পুত্র রত্নটিকে। বাবার আশীর্বাদে পেয়েছিলেন বলেই তিনি তার ছেলের নাম রেখে দিলেন ভূতনাথ। ভূতনাথ কিন্তু মন্দিরের ভূতনাথের মত শান্ত-শিষ্ট সদাশিব মোটেই ছিল না। বরং ঠিক ছিল তাঁর উল্টো। ঝোঁকে, রোকে, বেয়াড়া গোঁ-এ, আবদারে, ছোট থেকেই সে মা বাপকে চব্বিশ ঘন্টা নাজেহাল করে রাখত। সেই স্বভাবটাই তাকে বড়-তে করে তুলে ছিল বেয়াড়া, বেপরোয়া, বাউণ্ডুলে। তেমনি তার সঙ্গী জুটেছিল গাঁয়ের যতসব উড়নচণ্ডী, নচ্ছার বদমাশ ছেলে ছোকরার দল। তাদের নিয়ে যখন যা খুশি করে বেড়াত সে।

তোয়াক্কা করত না কাকেও। বাধাও মানত না সে কারও। ছোট বেলায় যখনই ঘোড়া তখনই চাবুকের জন্য যেমন রোক চাপত তার। বড় হয়েও তেমনি যখনই যে কাজ করব বলে ঝোঁক ধরত সে না করে ছাড়ত না। এই মস্তান-গুরু দামাল ছেলেটাকে ভয় করত না এমন মহিলা-পুরুষ বোধ হয় গোটা ভূতগ্রাম অঞ্চলটাতে কেউ ছিল না। এক কথায় ভূতনাথকে ভূতগ্রামের 'ভূত' বলেই জানত সবাই। অন্যায় কারো প্রতি কোন দিন সে নিজে না করলেও অপরের কোন অন্যায় বা বেয়াদপি সে সহ্য করতে পারত না কখনও। নিজে হোক বা দলবলকে নিয়ে হোক তার প্রতিকার না করা পর্য্যন্ত স্বস্তি পেত না সে কিছুতেই। অন্যায়ের যম ভেবে তাই ভয় করে চলত ভূতনাথকে সবাই। অপরদিকে তেমনি ন্যায় ধর্ম্মের সমর্থক ও পরোপকারী বলে তাকে ভালবাসত অনেকে। এমনকি গাঁয়ের মেয়েছেলেরা " ভূতুদা" বলে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে চলত তাকে।

সেদিন কি একটা কাজে ভূতনাথ সাইকেলে চড়ে নামপাড়া থেকে উপর পাড়া যাচ্ছিল হন্তদন্ত হয়ে। যাচ্ছিল মন্দিরের পাশে কুলি বরাবর রাস্তাটা হয়েই। হঠাৎ মন্দিরের বারান্দায় পূজো দিতে আসা মেয়েদের হৈ-হট্টগোল কানে আসতেই থমকে দাঁড়ালো সে। দাঁড়াল মন্দির সংলগ্ন রাস্তাটার পাশের বড় সাদা পাথরটার উপর পা রেখে। উপরে "মুখপুড়ি", "সব্বনাশী", "হারামজাদী" ইত্যাদি গালি-গালাজের সঙ্গে ঝুটোপুটি, মুখঝামটা, এমনকি কিল চড় চাপড়ের শব্দ পর্য্যন্ত কানে এল তার। কি ব্যাপার! তাকিয়ে দেখতেই ভূতনাথের হঠাৎ গায়ের উপর ছিট্‌কে এসে পড়ল শাশ্বতী। সাইকেল শুদ্ধো ভূতনাথ চিৎপটাং হয়ে পড়ল রাস্তার উপরে। তার বুকের উপর শাশ্বতী। পূজো দিতে আসা তার ফুল-বেলপাতা সিন্দুর কৌটো, ভোগ-নৈবেদ্য ইত্যাদি থালাশুদ্ধো সব উল্টে পড়ল ভূতনাথের পায়ের উপর।

কি কেলেঙ্কারী! কি লজ্জা! সাদা পাথরটায় শাশ্বতীর কপালটা একটু লেগেছিল কিনা কে জানে। একহাতে সে সেখানটা চেপে ব্যস্তসমস্ত হয়ে কোনরকমে ভূতুদার উপর থেকে উঠে মুখ গুঁজুড়ে বসল একপাশে। পূজো দেওয়া ছেড়ে উপর থেকে হুটোপুটি করে নীচে নেমে এল দীপালী, সন্ধ্যা, বেলা, উত্তরা ইত্যাদি তার সঙ্গী সাথীরা। কোথায় লেগেছে? কি হয়েছে দেখি। ইত্যাদি বলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাকে ঘিরে ধরতেই হাত নেড়ে তাদের বাধা দিয়ে বলে উঠল শাশ্বতী—আমায় দেখতে হবে না তোরা ভূতুদাকে দেখ। তাকে গিয়ে উঠা কোনরকমে।

কিন্তু ভূতুদাকে আর ওঠাতে হল না। নিজেই সে উঠল আস্তে-আস্তে। মহা অপরাধীর মত ভয় জড়িত কণ্ঠে তাকে বলে উঠল শাশ্বতী—কিছু মনে করো না ভূতুদা। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম তোমার উপর।

বলে উঠল পাশ থেকে দীপালী, উজ্জ্বলা সবিতা—তোর কি দোষ। তোর সৎ-মাই তোকে হনহনিয়ে ঘর থেকে রেগে এসে কিল-চড় চাপড় মেরে আচমকা তোর চুল জঁটটা ধরে এক হেঁচকায় টেনে ফেলে দিল উপর থেকে। হাঁ-হাঁ না-না কোন নিষেধ শোনা তো দূরের কথা বাধাও মানল না।

—এক্ষুনি কি হয়েছে মুখপুড়ি, তোর হাড়মাস আজ এক করে ছাড়ব আমি, উপর থেকে হঠাৎ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে বলে উঠল জ্ঞানদা। সে কি চেহারা তার। এলোচুল, কাঁকালে শক্ত করে বেড়িয়ে বাঁধা শাড়ীর আঁচলা। কোমরে হাত দিয়ে মন্দিরের দাওয়ার উপর থেকে মুখে ছুটছে তার জ্বলন্ত গোলার মত, হারামজাদী, তোর এত বড় বাড় যে আমার কথা অমান্য করে আসিস্।

এসব কথা কান না দিয়ে নম্রস্বরে ধীর গলায় বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করে উঠল শাশ্বতী ভূতুদাকে, তোমার কোথাও লাগেনি তো ভূতুদা?

ভূতুদা তার কোন কথার উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে তুলল সে তার সাইকেলটা। স্ট্যাণ্ড করে রাখল একপাশে। বলতে লাগল তাকে বেলা, সন্ধ্যা ইত্যাদি মেয়েরা,—সতীর কোন দোষ নেই ভূতুদা। উপোস দিয়ে থেকেও ঘর-সংসারের সে সব কাজ সেরে তবে এখানে পূজো দিতে এসেছে। ওর মা শুধু শুধু ওকে এখানে মারতে এল।

—শুধু শুধু? উপর থেকে মুখ ঝামটে বলে উঠল জ্ঞানদা। ঘরের এঁটো বাসনগুলো পড়ে আছে যে সেগুলো ধোবে কে? আমি কি ওর বাপের চাকর যে ওগুলো আমাকে সাফ করতে হবে?

—তোমাকে তো করতে বলিনি মা, বলে উঠল শাশ্বতী, পূজো না করিয়ে এঁটো বাসনগুলো ছোঁব না তাই—

—তাই আমাকে তোব জন্যে একটা কামিন রাখতে হবে। সব্বনাশী শিব পূজো করে পতিলাভ করবে। মুখটা বিকৃত করে বলে উঠল জ্ঞানদা,—দিনের পর দিন পালকে পাল পাত্র এসে ঘরটাকে হা-ভাত করে চলে যাচ্ছে, আর উনি পেত্নী—মুখটা নিয়ে শিব পূজা করে রাজপুত্রকে বিয়ে করবেন। যা, যা বলছি এখনো, আগে ঘরের এঁটো-কাঁটাগুলো পরিষ্কার করে আয়। তারপর অন্য-কথা।

শাশ্বতী কথা শুনবে কি নীচু দিকে মুখটা করে দাঁড়িয়ে রইলে। নির্বাক নিস্পন্দ যেন একটা কাঠের পুতুল। দেখে জ্ঞানদার পায়ের থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে গেল। রেগে সে দমদমিয়ে মন্দিরের সিঁড়ি থেকে নেমে, এর উপরও আবার মারতে আসতে লাগল শাশ্বতীকে! হারামজাদী, কথাগুলো তোর কানে যাচ্ছে না? দাঁড়া দিচ্ছি তোর খুঁড়িয়ে কানটা ছেঁদা করে।

ভূতনাথ এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বোধ হয় মজা দেখছিল সে। কিন্তু আর সহ্য করতে পারল না। জ্ঞানদা এগিয়ে আসতেই সামনে তার দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বেশ একটু ধিক্কারজনক স্বরে বলে উঠল তাকে,

—ছি ছি কাকীমা, তোমার কি লজ্জা-সরম বলতে এতটুকু কিচ্ছু নেই। মন্দিরে এসে এতলোকের সামনে এত কাণ্ড করেও আবার তুমি একটা এতবড় মেয়ের গায়ে হাত তুলতে আসছো। বোধ-আক্কেল, জ্ঞান-বিবেকের কি একেবারে মাথা খেয়ে বসে আছো তুমি?

—তুই কে রে মুখপোড়া, গর্জে উঠল জ্ঞানদা—আমার বোধ-আক্কেল টেনে কথা বলিস? সরে যা বলছি আমার সামনে থেকে।

—সরে যাব মানে? ভ্রূকুটি কুটিল ভঙ্গীতে বলে উঠল ভূতনাথ—আমার সামনে সতীকে আবার মারতে দেব নাকি? আচ্ছা কাকীমা, তোমার অন্তরে কি দয়া-মায়ার এতটুকু লেশমাত্র নেই? অন্যায় করলে মানুষের মনে অনুতাপ আসে, অনুশোচনা জাগে। তোমার তাও নেই?

ধমকে উঠল জ্ঞানদা —তোর এখানে নাক গলাতে আসার কি দরকার রে মুখপোড়া? আমি আমার মেয়েকে মারব, ধরব, বকব, যা ইচ্ছে তাই করে শাসন করব তাতে তোর বাপের কি?

—শাসন ছাড়া তুমি আর কি করবে, তুমি যে সৎমা। বলে উঠল ভূতনাথ—এতদিন শুধু এর ওর মুখে সৎ মেয়েটার উপর তোমার অত্যাচার নির্যাতনের কথা শুনেই আসছিলাম। আজ দেখলাম সত্যিই, তুমি একটা রাক্ষসী। তোমার মত দস্যি মেয়ে মনে হয় এ তল্লাটে আর অন্য কোথাও নেই।

—মুখ সামলে কথা বল হারাজাদা। বজ্রকণ্ঠে বলে উঠল জ্ঞানদা,—আমি তোর আটকুঁড়া বাপের খাই-ও না, আর তোর নির্বংশী মায়ের পরিও না। আটাশ-ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আইবুড়ো থেকে এখানে মেয়েদের মাঝে কুন্দুনি করতে আসতে তোর লজ্জা করে না নদীভরা। বেরো এখান থেকে। দূর হয়ে যা বলছি।

—এটা মন্দির, তোমার ঘর নয় যে যা ইচ্ছে তাই করবে তুমি এখানে। বেগে উঠল ভূতনাথ,—আর একটা কথা মনে রাখবে, আমি তোমার উজবুক অপগণ্ড স্বামী নই যে যা খুশি তাই বলে যাবে তুমি আর আমি তোমার ওই ভেড়া-পতির মত সব মুখ বুজে সহ্য করে যাব।

জ্বলন্ত আগুনে যেন ঘি পড়ল জ্ঞানদার। কি বললি মুখপোড়া? তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সে —আমার ঘর-স্বামী তুলে কথা! ঝেঁটিয়ে যদি তোর বিষ নামিয়ে দিতে না পারি তবে আমি পবন মুখুজ্জের মেয়েই নই। বলেই সে রেগে ওমনি মন্দিরে উঠে বারান্দার পাশে পড়ে থাকা ঝাঁটাটা তুলেই ছুটে নেমে এসে মারতে উদ্যত হল ভূতনাথকে।

—কি হচ্ছে এসব? একি করেছেন? বলেই তো মেয়েরা ধমকে উঠল তাকে। চারধার থেকে আগলে হাত মুচড়ে ঝাঁটাটা তার কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল একদিকে। সুলতা, কাকলি তো ফুঁসতে ফুঁসতে বলতে লাগল তাকে, তোমার এত বড় সাহস যে ভূতুদার গায়ে হাত তুল তুমি!

—ছেড়ে দে তোরা, বলে উঠল ভূতনাথ—আমাকে মেরে যদি ওর রাগটা কমে তো কমুক। কিন্তু সতীর গায়ে যদি আবার হাত লাগায় ও তবে ভেঙ্গে হাতটা আমি ওর এখানেই গুঁড়ো করে দেব।

—ভারী মবদ তুই, হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠল জ্ঞানদা—সতী তোর বিয়ে করা বৌ হয় তাই আটকাতে এসেছিল? কই ভাঙ্গ দেখি আমার হাত, দেখি তুই কেমন বাপের বেটা। মেয়েছেলেদের সঙ্গে উট্‌কো ঝগড়া করতে তোর সরম লাগে না হারামজাদা? তোর বাপের মুখে আগুন লাগাই, তোর মায়ের বুকে শ্মশানের ধুঁয়ো উড়াই।—

শুরু হয়ে গেল জ্ঞানদার হাত নেড়ে নেড়ে মেয়েলি গলায় গেঁয়ো-বুলির গালি-গালাজ। তার আকাশ ফাটা কর্কশ-কণ্ঠের চোটে মন্দিরের পূজো ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন পুরোহিত মশায়—এত চিৎকার চেঁচামেচি কিসের? কি হচ্ছে এসব?

উত্তর দিয়ে উঠল বেলা, সন্ধ্যা, উজ্জ্বলা, উত্তরা ইত্যাদি আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েরাই—দেখুন না ঠাকুরমশাই, কাকী-মা নিজে অন্যায় করেছেন, আর ভূতুদা তাই বলতে গেছে বলে কেমন গাল মন্দ বাপান্ত করছেন তাকে।

—চুপ কর মাগীরা। ধমকে উঠল জ্ঞানদা,—ভূতুদা তোদের ভাতার হয়, তাই তার দরদে বুকটা তোদের ফেটে যাচ্ছে।

—খবরদার বলছি কাকীমা। ধমকে উঠল তাকে মেয়েরা সব,—আজেবাজে কথা বলোনা বলে দিচ্ছি।

—বলব না তো কি? জ্ঞানদাও উঠল পাল্টা ধমকে, —ছোঁড়াটা যে তোদের সামনে আমার হাত ভা' বলল সেটা ওর দোষ হল না, আর যত দোষ হল আমার। কি ভেবেছিস হারামজাদীরা, তোদের গুণপনা আমি জানি না? গাঁয়ের জোয়ান বেটাছেলেদের সঙ্গে এধার-ওধার ধাষ্টামী করে ঘুরে বেড়াস। তেমনি জায়গা এখানটাকেও মনে করছিস না কি?

—মুখ সামলে কথা বল কাকীমা। রেগে উঠল মেয়েরা,—এরকম অবান্তর কথা বললে আমরাও কিন্তু ছেড়ে কথা কইব না।

কিন্তু জ্ঞানদার একবার মুখ খুললে কেউ যা বন্ধ করতে পারে না তা বন্ধ করবে সেদিনের এই ঢেংড়া ছুঁড়িরা? সুতরাং তার গাল-মন্দের স্রোত বাঁধভাঙ্গা ধারায় বইতে লাগল নীচু দিকে। —মুখপুড়িদের লজ্জা করে না গাঁয়ের বেটাছেলেদের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে। কুড়ি পেরিয়ে বুড়ী হতে চললি, বাপ-মুখপোড়ারা তোদের বিয়ে দিতে পারে নি বলে পূজোর নাম করে এখানটায় ঢেমনামু করতে এসেছিস ছুঁড়িরা?

—ছি-ছি-ছি-ছি! ঘৃণায়, লজ্জায়, ধিক্কারে যেন ফেটে পড়লেন ঠাকুরমশায়। বলে উঠলেন মিনতি করে জ্ঞানদাদেবীকে,—দয়া করে চুপ করুন আপনি! আমাকে পূজো করতে দেন। এটা মন্দির।

—মন্দির বলেই তো বলছি ঠাকুর মশায়। বলে উঠল জ্ঞানদা,—এটা প্রেম-পীরিতের জায়গা নয় যে পূজোর নাম করে এখানে সব রাসলীলা করতে আসবে। দূর করে দেন এদের এখান থেকে।

—এসব কি বলছো মা তুমি? অবাক চোখে বলে উঠলেন ঠাকুরমশায়।

—বলব আবার কি? মুখ ঝামটে বলে উঠল জ্ঞানদা দেবী। —মেয়েছেলেদের পূজোর সময় বেটা-ছেলেদের আপনি মন্দিরে আসতে দেন কেন? আপনার উপর বিশ্বাস করেই ঘর-সংসারের সব আইবুড়ো মেয়েগুলোকে গ্রাম ছাড়া এই মন্দিরটাতে পূজো দিতে পাঠান হয়। কিন্তু তাদের সঙ্গে এখানে যে এইসব ফচকে ফাজিল লম্পট ছেলে ছোকরারা ইঙ্গিত-ইসারা করতে আসে, ইয়ার্কি-ফাজলামি করে, দেখতে পান নি আপনি?

—তোমার কথা তো আমি কিছু বুঝতে পারছি না মা! অবাক স্বরে বলে উঠলেন বুড়ো পুরোহিত মশায়।

—তা বুঝতে পারবেন কেন আপনি, বলে উঠল জ্ঞানদা,—আপনি যে চোখ থাকতেও কানা, কান থাকতেও কালা। কিন্তু গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের নিয়ে এখানে চোখ-কান বন্ধ করে, কানা-কালা হয়ে পূজো করলে চলবে না ঠাকুর মশায়। চোখ-কান সব দিকে খোলা রাখতে হবে। আর এইসব লুচ্ছা, বদমাস, নাংটা ছেলেদের মন্দিরের ত্রিসীমানা থেকে বের করে দিতে হবে।

—এতক্ষণ ধরে অনেক কিছুই বলে গেলে কাকীমা. আমি শুধু চুপ দিয়ে শুনে গেলাম। বেশ গম্ভীর ভারিক্কি গলায় বলে উঠল ভূতনাথ, —কিন্তু মনে রাখবে মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। এসব মিথ্যা যা-তা কথা বললে—

—মিথ্যে কথা? কথার মাঝে বাধা দিয়ে তাকে মুখ ঝামটে বলে উঠল জ্ঞানদা—মন্দির গোড়ায় ওই পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে তুই ড্যাব্ ড্যাব্ করে তাকিয়ে থাকিসনি মেয়েছেলেগুলোর দিকে? কি দরকার তোর আইবুড়ো মেয়েদের পূজোর সময় এখানে আসার? এটা কি তোর ফষ্টি-নষ্টি করার জায়গা?

—মুখ সামলে কথা বল কাকীমা! গর্জে উঠল ভূতনাথ। চোখ দিয়ে তার যেন ঠিক্‌রে বেরুতে লাগল আগুন।

জ্ঞানদাও উঠল তেমনি পাল্টা গর্জন করে,—খবরদার মুখপোড়া তুই চোখ রাঙাবি আমাকে। লাল চোখ দেখাবি তো তুই ঘরে গিয়ে তোর সেই নাড়া-নাংটা মা-বাপকে দেখাগে যা। যারা তোকে আটাশ ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে না দিয়ে এধার-ওধার চরে খেতে ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়েছে দাগা—ষাঁড়ের মত গাঁয়ের সব আইবুড়ো বিটি ছেলেদেব সঙ্গে বেয়াল্লাগি করতে।

ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গল ভূতনাথের। রেগে গিয়ে সে পাশের ষ্ট্যাণ্ড করা সাইকেলটা দু-হাতে আসমানে তুলে—তবেরে, হারামজাদী বলে গায়ে ফেলে দিতে উদ্যত হল জ্ঞানদার। ওমনি শাশ্বতী দুহাতে তার জড়িয়ে ধরল পা-দুটো। বাধা দিয়ে তাকে মিনতি করে বলে উঠল সে—মাকে তুমি মারবে না ভূতুদা। শান্ত হও তুমি। অযথা উত্তেজিত হয়ে আর কেলেঙ্কারী বাড়িও না। মায়ের সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত কেউ এঁটে উঠতে পারেনি। চলে যাও তুমি।

কিন্তু একি! সতীর কপালে যে রক্ত! চিৎকার করে উঠল দীপালী। ব্যস্ত হয়ে উঠল সুলতা—কেটে গেছে কপালটা, রক্ত পড়ছে গড়িয়ে।

বেশ জোরেই লেগেছে চোটটা সতীর। ধমকে তাকে বলে উঠল কেয়া, —কি রকম মেয়ে বল দেখি তুই? এইজন্যেই কি কপালে হাত চেপে চুপ করে বসেছিলি একপাশে?

চঞ্চল হয়ে উঠল মেয়েরা সবাই। থমকে গেল ভূতনাথও। সতীর কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত দেখে। এতক্ষণ কথা কাটাকাটি ঝগড়া-ঝাটি, বাগ-বিতণ্ডায় নজর দেওয়া হয়নি তার দিকে। দেখেই ভূতনাথ সাইকেলটা নামিয়ে রাখল একদিকে। দেখি—দেখি? বলে সে ব্যস্ত হয়ে এল সতীর কাছে। সত্যিই কেটে গেছে অনেকটা। সঙ্গে সঙ্গে সে আদেশ করে উঠল তার জ্যাঠতোতো বোন দীপালীকে—যা তো দীপা, ঘরে টেবিলের উপর ফার্স্ট-এইড বাক্সটা আছে আমার। নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি।

ছুটল দীপা। ভূতনাথের কোথায় গেল উত্তেজনা, কোথায় গেল রাগ। বসল এসে সে সতীর কপালে হাতটা চেপে তার পাশেই। মেয়েরাও উঠল সব ব্যস্তসমস্ত হয়ে। বসল তারা ভূতুদা ও সতীকে ঘিরে চারপাশে। সকলের মুখেই সহানুভূতির ছাপ। কিন্তু জ্ঞানদা উঠল ফোঁস করে,—ভারি তো আবার আদিখ্যেতা। সামান্য একটু কেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে তো দরদে সবাই একেবারে ফেটে পড়ছে। আর ঢঙ্ দেখাতে হবে না হারামজাদী, উঠ—বলে উঠল সে শাশ্বতীকে উদ্দেশ্য করে, ঘরে চল, সামান্য একটু গাঁদাপাতা থেঁতো করে লাগিয়ে দিলেই ভাল হয়ে যাবে। উঠে আয় ওখান থেকে।

—আজ সতীর এটা সামান্য হবে বৈকি? সে যে সৎ মেয়ে। বলে উঠল ভূতনাথ,—সেদিন নিজের মেয়ে মায়ার যখন হোঁচট খেয়ে সামান্য একটু চোট লেগেছিল তখন তার বেলা—

—খবরদার বলছি মুখপোড়া আমার বিটিকে টেনে কথা বলবি না। ধমকে উঠল জ্ঞানদা,—সে লেখাপড়া জানা সৎ-ভদ্র মেয়ে। এসব অসভ্য ইঁচড়েপাকা ঢেমনা মাগীগুলোর মত ন্যাংটা নয় যে সামান্য কিছু ছিতুস ধরে তোর পাশে ঢলাঢলি করতে বসবে।

—বটে এতবড় কথা। রেগে উঠল ভূতনাথ। বলে উঠল সে পাশে বসে থাকা কেয়াকে,—যাতো কেয়া, ডেকে নিয়ে আয় মায়াকে। দেখে যাক সে নিজের চোখে এসে তার মায়ের কেমন কাণ্ড।

—মায়া তোর মুখে থুতু ফেলে হারামজাদা। বলে উঠল জ্ঞানদা,—সে কি এই ফাজিল মেয়েগুলোর মত তোর বাঁধা বান্দী যে তুই ডাকলেই ছুটে আসবে তোর কাছে। সে আমার মেয়ে।

—দেখি সে কেমন তোমার মেয়ে, আমার কথা শোনে কি না। বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল ভূতনাথ কেয়াকে,—বলবি এক্ষুণি আয়, তোর ভূতুদা ডাকছে।

—কিন্তু সে তো স্কুলে গেছে ভূতুদা। বলে উঠল সুলতা।

ওধারে আবার ধমকে উঠল জ্ঞানদা শাশ্বতীকে,—হারামজাদী, এখনও বসে আছিস যে চুপ করে, ঘর যেতে বললাম না? কথাটা আমার কানে গেল না—না কি? উঠ, চল বলছি বাড়ী।

—না, ওকে এখন বাড়ী যেতে দেব না আমি। বলে উঠল ভূতনাথ।

—যেতে দিবি না মানে, মুখটা নেড়ে বলে উঠল জ্ঞানদা,—ওকি তোর বিয়ে করা স্ত্রী যে আটকে রাখবি তুই নিজের কাছে।

—ধরো তাই। বলে উঠল ভূতনাথ—তা বলে এই অবস্থায় আমি ওকে যেতে দিতে পারি না।

—দেখি, ও কেমন তোর কথা শোনে। বলেই আবার ধমকে উঠল জ্ঞানদা শাশ্বতীকে,—এখনোও বলছি উঠে আয় হারামজাদী। কথা আমার না শুনলে এখানেই তোর হাড়ে হলুদ দিয়ে যাব আমি।

—আবার মারবে নাকি?

উত্তরে জ্ঞানদা ধমকে বলে উঠল ভূতনাথকে—কথা না শুনলেই মারব তাতে তোর হারামজাদার কি রে? তুই কি ভেবেছিস গাঁয়ের এইসব ফাজিল মেয়েগুলোর মত আমার ঘরের মেয়েদেরও তোর সঙ্গে লটঘট ফাজলামি করতে ছেড়ে দেব?

—বার বার এভাবে খোঁচা মেরে আমার ভিতরের পশুটাকে তুমি আর উত্তেজিত করে দিও না কাকীমা। গর্জে উঠল ভূতনাথ—মায়ার মা বলে এখনও তুমি আমার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছো। নইলে ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় এতক্ষণ কারো বেয়াদপি সহ্য করে না। বুঝলে?

হঠাৎ দীপালী এসে তার ফার্স্ট-এড বাক্সটা নিয়ে দাঁড়াতেই সতীর হাতটা ধরে টেনে তুলল ভূতনাথ। বলল—চল, মন্দিরের দাওয়ায় ওই সিঁড়িটার কাছে। দেখি তোর চোটটা কেমন লেগেছে।

—খবরদার বলছি সতী। গর্জে উঠল তার সৎমা—ভেক্ করতে আর এক দণ্ড এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস না বলছি। চলে আয় আমার সঙ্গে।

মুখ ঘুরিয়ে সতী যেতে উদ্যত হতেই ভূতনাথ টানল তার হাতটা ধরে। বলল, —চল আগে ওই সিঁড়িটার উপর। ক্ষত স্থানটা মুছে ব্যাণ্ডেজটা করে দিই। তারপর—

—না, বজ্রকণ্ঠে বলে উঠল জ্ঞানদা, —ওসব মেয়ে ভুলানো ফন্দি ফিকির বুজরুকি চাল আমার কাছে চলবে না। ঘর চল বলছি সতী, তারপর অন্য কথা।

সে কথায় ভূতনাথ কান না দিয়ে তেমনি ভাবে সতীর হাতটা ধরে টানতে লাগল তাকে মন্দিরের সিঁড়িটার দিকে, —আয় তুই, কোন ভয় নেই তোর। এর উপরও যদি তোর মা তোর গায়ে হাত তুলে তো সে দায়িত্ব আমার।

হঠাৎ তাদের ধরা হাতদুটোর উপর যেন উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্ঞানদা। হেঁচকায় ছাড়িয়ে তাদের ধমকে উঠল ভূতনাথকে—লজ্জা করে না হারামজাদা, যোয়ান মরদ বেটাছেলে হয়ে এতবড় একটা আইবুড়ো মেয়ের হাত ধরে টানাটানি করতে? বাঁদরামি করার আর জায়গা পাসনি?

—না, বলেই ভূতনাথ বেশ দাপটের সঙ্গে আবার ধরল সতীর হাতটা। টানতে লাগল তাকে মন্দিরের দিকে।

স্পর্ধা দেখে তার যেন ফেটে পড়ল জ্ঞানদা। শিকার ছাড়া বাঘিনীর মত হুঙ্কার দিয়ে উঠল সে, এক বাপের বেটা হোসতো বিয়ে করে ওর হাতটা ধরে টেনে নিয়ে যা মুখপোড়া। দেখি তোর কেমন হিম্মত।

—বলতো তাই বিয়ে করলাম আমি। উত্তরে তার বলে উঠল ভূতনাথ, —তবু এ অবস্থায় তোমার মত একটা খাণ্ডারী মেয়ের হাতে ছেড়ে দেব না আমি সতীকে।

—কি বললি হারামজাদা? গর্জে উঠল জ্ঞানদা।

—হারামজাদীদের যা বলা উচিত তাই বললাম। বলেই ভূতনাথ সতীর হাতটা তার চোখের সামনে আরো ভালভাবে ধরে বেশ দেমাকভরা চালে টেনে নিয়ে চলল তাকে মন্দিরের সিঁড়িটার দিকে।

একজিদে, নির্লজ্জ, বেহায়া ছেলেটার আস্পর্দ্ধা দেখে গায়ের রক্তটা টগবগ করে ফুটতে লাগল জ্ঞানদার। আজ পর্য্যন্ত কেউ যা পারেনি সেই জেদটাকে তার এমনভাবে মাড়িয়ে যাবে কোন এক চেংড়া ছোড়া! অপমান করবে তাকে সকলের মাঝে! কখনও না। ওমনি আবার সে ঝুঁকে গিয়ে ঝাপটে ধরল শাশ্বতীর বাম হাতটা। ধমকে উঠল তাকে,—খবরদার বলছি হারামজাদী! ওই বাঁদরটার সঙ্গে যদি আর এক পা এগোস তবে আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন। চল, চল বলছি আমার সঙ্গে। নাংটামু করতে তুই আর কারো সঙ্গ পেলি না? বলেই টানতে লাগল তাকে।

কিন্তু ভূতনাথ যাকে ধরে তাকে ছাড়ানো কি চারটি-খানি কথা। একবার কোন কাজ করব বলে ঝোঁক চাপলে তার রোধ করে তাকে কার বাবার সাধ্যি এবং বাধা দিলে তার উল্টে যায় রোকটা বেড়ে। জেদটা যায় চেপে। তাই এক ঝটকায় জ্ঞানদার হাত থেকে সতীকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধমকে উঠল সে তার সৎমাকে, —বলছি তো যাবে না সতী।

সতী প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভূতনাথের বুকের উপর। কি লজ্জা! কিন্তু বিপদের সময় লজ্জা কিসের? দুর্ব্বল মন নয়তো ভূতনাথের। কোন নীচ অভিপ্রায়ও নেই তার অন্তরে। তবে? জ্ঞানদাকে গর্জে বলে উঠল ভূতনাথ, —তোমায় আমি শেষবারের মত অনুরোধ করছি কাকী-মা, আর বাড়াবাড়ি করতে এস না আমার কাছে। যা করেছ করেছ, সতীর মাথাটায় ব্যাণ্ডেজ করে দিই তারপর যাবে সে তোমার সঙ্গে, তার আগে নয়।

—ভূতুদা, না না। মিনতি করে বলে উঠল শাশ্বতী—ছেড়ে দাও আমাকে। ও আমার কিচ্ছু হয়নি; ঘরে গিয়ে গাঁদা-পাতা থেঁতো করে লাগালেই সেরে যাবে। মায়ের সঙ্গে যেতে দাও আমাকে। নইলে—

—তোর কোন ভয় নেই সতী। অভয় দিয়ে বলে উঠল ভূতনাথ, —আজ শুধু নয় আর কোনদিন যদি তোর সৎমা ভুলেও তোর গায়ে হাত তুলে তবে সেইদিন তার কেমনভাবে প্রতিশোধ নিতে হয় দেখিয়ে দেব আমি। দেখিয়ে দেব আমি, একটা মা-মরা অসহায়া মেয়েকে বিনাদোষে দিনের পর দিন নির্যাতন করার কি শাস্তি।

গায়ে পা-পড়া কাল-নাগিনী যেমন ফুঁসে উঠে তেমনি ফোঁস করে উঠল জ্ঞানদা—কি করবি রে হারামজাদা? ভারি তুই তালেবর হয়েছিস। দেখি তুই কি করে আটকাস। নিয়ে যাবই আমি সতীকে।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে আদেশ দিয়ে উঠল ভূতনাথ কেয়া, সন্ধ্যা, বেলা, উত্তরা ইত্যাদি সঙ্গী সাথীদের—শোন তোরা। অবশ্য নাড়ু, ফটকে, বাচ্চু, হাবুল ঝন্টু-মন্টুকেও বলে রাখব আমি। আর কখনও সতীর এই দস্যি সৎমাটা যদি ভুলেও কোনদিন ওর গায়ে হাত তুলে তবে সোজা এসে আমাকে খবর দিবি। রাতে হোক, দিনে হোক, প্রকাশ্যে হোক, গোপনে হোক নজর রাখবি তোরা এই রাক্ষুসে মা-টার উপর। ভেবেছে কি ও, এ গ্রামে মানুষ নেই। সবাই রাখহরি চাটুজ্জের মত ভেঁড়া? ভয়ে ওর উপরে কেউ টুঁ-শব্দটি পর্য্যন্ত করতে পারবে না। মগের মুলুক। এটা ওর বাপের বাড়ী নয় আমাদের গাঁ। এখানে গোকুলের ষাঁড়ের মত উনি যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ালে আমরাও ওর শিংগুলো ভেঙ্গে দেব।

শিব যেন ধরল রুদ্রমূর্ত্তি। সত্যি এবার ভূতনাথের দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে গেল সবাই। শঙ্কিত হল এর উপর জ্ঞানদা দেবী কোন বাড়াবাড়ি করলে ভূতুদা কিন্তু হঠাৎ একটা হুলস্থুল কাণ্ড করে বসবে। তাই সাবধান করতে গেল সব সতীর সৎমাকেই, তুমি বাড়ী যাও কাকীমা। সতীকে পরে আমারা তোমার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—না! গর্জে উঠল রুদ্রানী—নিয়ে যাব যখন বলেছি তখন সতীকে আমিই নিয়ে যাব ওই মুখপোড়ার চোখের সামনে। দেখি ও হারামজাদা কেমন করে আটকায়, চলে আয় সতী। বলেই ধরল সে আবার সতীর হাত,—আয় আমার সঙ্গে।

ওমনি সতীর অপর হাতটা ধরে পাল্টা গর্জন করে উঠল ভূতনাথ,—না, বলছি তো ও যাবে না।

শুরু হল কেলেঙ্কারী। উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরল জ্ঞানদা। ভূতনাথও হল রুদ্র-ভৈরব। উভয়েই নাছোড়- বান্দা। উনিশ-বিশ। জেদে কেও কারো চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ধস্তাধস্তিতে হঠাৎ জ্ঞানদা ছিটকে পড়ল একদিকে। উঠেই ওমনি সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গলার স্বরটা পঞ্চমে তুলে বলে উঠল ভূতনাথকে,—কই দেখি হারামজাদা তোর কেমন মুরোদ। এক বাপের বেটা বটিশ তো মেয়েটার সিঁথিতে সিন্দুর দিয়ে হাত ধরে তুই টেনে নিয়ে যা তো নিজের ঘরে। ভেবেছিস কি বেনাহক তোকে ঢেমনামি করতে মেয়েটাকে আমি তোর হাতে ছেড়ে দেব? মেয়েছেলেদের উপর গায়ে পড়ে দরদ দেখাতে আসতে তোর লজ্জা করে না নাংটা-মিনসে? ছাড় হাত। হিম্মত থাকে তো মেয়েটার মাথায় সিঁদুর দিয়ে অধিকার ফলা। নইলে মরদানি করতে আসিস না।

থমকে গেল ভূতনাথ। এত বড় কথা! চমকে উঠল সে। তবে কি ছেড়ে দেবে সে সতীর হাতটা? না। ধরেছে যখন হাত, তখন এ হাত ছাড়লে কাপুরুষতা হবে তার। বলেছে যখন কথা তখন একথা না রাখলে অপভ্রষ্ট হবে তার আদর্শ। অপমানিত হবে তার সত্তা। আজ পর্য্যন্ত জীবনে কেও তাকে কোনদিন হার মানাতে পারে নি। এই মুহূর্তে হেরে যাবে সে সামান্য একটা মেয়ের কাছে? না কিছুতেই হার স্বীকার করে নিজেকে ছোট করতে পারবে না সে সকলের কাছে। এটা পরীক্ষা তার। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবেই তাকে। ঝড় উঠল ভূতনাথের অন্তরে। সে ঝড়ে আগুনের ফুলকি ছুটাল জ্ঞানদা—কি মুখপোড়া চুপ করে দাঁড়িয়ে, রইলি যে। এতক্ষণ তো বিয়ে করব বলে খুব ফড়-ফড় করছিলি। ফলা তোর মুখ-চাটিটা। কথার ঠিক নেই যাদের তাদের বাপেরও ঠিক নেই। তোদের মত লম্পটদের দৌড় আমার জানা আছে।

জ্বলন্ত আগুনে ঘি পড়ল ভূতনাথের। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল সে। রাগ চাপলে তার কাণ্ডা-কাণ্ডি জ্ঞান থাকে না। লোপ পেয়ে যায় তার স্থান-কালপাত্র বোধ। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান চিন্তা তার নিমেষে যায় উড়ে। শাশ্বতীর হাত থেকে পড়ে থাকা সেই পুজোর থালা সমেত ফুল-বেলপাতাগুলোর সঙ্গে নজরে পড়ল ভূতনাথের সিন্দুর কৌটোটা। হতচ্ছাড়ি সেই একটা কথাই বার বার বলবি। বলেই সে রাগে তুলে নিল সিঁদুর কৌটোটা। মুহূর্ত্ত মধ্যে খুলে সেটা তার মধ্য থেকে এক দাবড়া সিন্দুর নিয়ে লাগিয়ে দিল [illegible]—দেখ রাক্ষসী, পারি কি না, দেখ।

একি কাণ্ড, এ যে মহা সব্বনেশে ব্যাপার। হতভম্ব হয়ে গেল [illegible] জ্ঞানদারও চক্ষু চড়ক গাছ। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় ভূতনাথ যে এমন একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবে কল্পনা [illegible]রতে পারেনি কেও। কোথায় গেল হৈ-হট্টগোল, কোথায় গেল চেঁচামেচি, গণ্ডগোল, ঝগড়া। নিমেষে [illegible]ধ্যে সব যেন জল হয়ে গেল [illegible]বশটা

হয়ে গেল চুপচাপ, থমথমে। মন্দিরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে পূজার-ঠাকুরও থ। পূজো দিতে আসা মাসি পিসিদেরও মুখে রা'টি নেই। এমন কি ভূতুদা, ভূতুদা, বলে যে এতক্ষণ অস্থির হচ্ছিল কেয়া-বেলা, দীপালী সুলতার দল দেখে শুনে তাদেরও আর বাক্ সরল না মুখে। হতচকিত বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সব পটে আঁকা ছবির মত। ভূতুদার চরিত্র জানত সবাই। জানত সবাই মস্তান, গুণ্ডা যে যাই তাকে বলুক না কেন সে কখনও কারো ক্ষতি করে না। তার দ্বারা কখনও কারো অমঙ্গল হয় না। অপরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করাই তার কাজ। বিপদে ফেলতে সে কোন দিন আসেনি কাকেও। দোষ তার একটাই—সে কখনও কারো অন্যায় সহ্য করতে পারে না। স্থির রাখতে পারে না নিজেকে কারো কোন অসৎ কর্ম বা গর্হিত আচরণ দেখলে। যেই হোক না সে অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তার উপর সেই অন্যায়—অত্যাচারের প্রতিকার করতে। এটাই স্বভাব তার। তার এই স্বভাবটাকে ভয় করে চলে সবাই। তাই এড়িয়ে চলে তাকে। তটস্থ হয়ে থাকে সকলে। কিন্তু সেই ভূতুদা, আজ নিজে হঠাৎ এমন একটা কাজ করে বসল।

নির্বাক নিস্পন্দ সবাই। স্বয়ং ভূতনাথও মনে হয় নিজের হটকারিতায় নিজেও হয়ে গেছল স্তম্ভিত। ভাবতে পারে নি সে হঠাৎ উত্তেজনার বশে এমন একটা অনুচিত কর্ম করে বসবে সে। এ যে স্বপ্নেরও বাইরে তার। ধারনারও অতীত। হঠাৎ এ জেদ তার চাপল কি করে মাথায়। এ যেন কোন অদৃশ্য শক্তি। মুহূর্তে তার জ্ঞান বুদ্ধি বোধ বিবেক লোপ করে মনের অগোচরে তার হাত দুটোকে দিয়ে করিয়ে নিল এ কম্ম। এখন উপায়। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভূতনাথ।

হঠাৎ সকলের স্তব্ধতা ভঙ্গ করল শাশ্বতী। দুহাতে দুচোখ চেপে কেঁদে উঠলো ডুকরে। বোধ হয় লজ্জায়। বোধহয় আশঙ্কায়। বোধহয় তার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ চিন্তায়। একি করল তাকে ভূতুদা! কেন এমন করল সে! এ কলঙ্কের ডালি মাথায় চাপিয়ে কেন সে নষ্ট করল তার জীবনটাকে? এরপর কি হবে তার? কে দেবে তার এ কান্নার উত্তর?

মাথা নীচু করে ভূতনাথকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ দুষ্ট-বুদ্ধির দরজাটা খুলে গেল জ্ঞানদার। দুলিয়ে কোমর গা ঝেড়ে সে মুখটা নেড়ে বলে উঠল তাকে,—এবার মুখপোড়া? ভাঙ্গছি তোর চাটি-পুটি। দেখছি তোর কত রক্তের তেজ। মা-বাপের একলা সাধের বেটা হয়ে তেড়ে-ফুঁড়ে খেয়ে বেড়িয়ে কত যে তেল হয়েছে তোর বের করছি এবার সেটা। কাঁদ মুখপুড়ি। গলা ফাটিয়ে জোর করে কাঁদ। শাশ্বতীকে উদ্দেশ্য করে নির্দ্দেশ দিয়ে উঠল সে,—যতক্ষণ না আমি ফিরে আসছি ততক্ষণ মুখপোড়ার ওই মাথার সিঁদুর মাথায় রেখে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদ তুই। সাক্ষী থাকুন ঠাকুর মশায়। সাক্ষিনী থাক তোমরা সবাই। দেখলে তো সবাই সকলের চোখের সামনে এই বজ্জাত হারামজাদা থুবড়ো ছোঁড়াটা কেমনভাবে বেয়ুজ্জতি করল আমার এতবড় আইবুড়ো মেয়েটাকে। সিঁদুর নিয়ে ফাজলামি! ঝাড়ছি আমি ওর টির বিরুনীটা, যাচ্ছি এক্ষুনি গাঁয়ে। ডেকে আনছি আমি পাড়ার পাঁচজনকে। নিজের চোখে দেখে বিচার করুক তারা। ওর ছুঁচো মুখটা বুচো করে দিতে যদি না পারি তবে আমি পবন চক্রবর্তীর মেয়েই নই।

দাপটে কথাগুলো ঝাপ্‌টে বলে চলে গেল জ্ঞানদা। যেমনি তার তেজ তেমনি তার পা ফেলার ধরণ। হন হন গণ গণ। হবে না? এতক্ষণে একটা বলার মত জিনিস পেয়েছে সে। এমন মকা কি সহজে ছাড়া যায়। সুতরাং ছুটতে লাগল সে। মন্দির শুদ্ধো সবাই আশঙ্কা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দেমাক-ভরা চলনটার দিকে। হেটমুণ্ড ভূতনাথ তবু কিন্তু নিশ্চল। হয় অনুতাপ বা অনুশোচনা নীচের দিকে টেনে রেখেছিল তাঁর নজরটা না হয় কৃতকর্মের পরবর্তী চিন্তায় সে ছিল মশগুল। অথ কিম্।

(তিন)

কথায় বলে—

> মেয়ে মানুষের হাল,
> তারা তিলকে করে তাল।
> সূচ চলে না যেখানে তারা সেখানে চালায় ফাল।।

তায় আবার জ্ঞানদার মত ডাক-সাইটে মেয়ে। সেই যেমন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা বলে তেমনি

ভূতনাথের সতীর মাথায় সিঁদুর চালানো ব্যাপারটা রঙ্‌ চড়িয়ে রস চাপিয়ে চাউর করে দিল চারদিকে। ভূতগ্রামের নেড়ী-গেঁড়ী থেকে আরম্ভ করে বুড়ো বুড়ী পর্য্যন্ত কারো কান বাদ গেল না ভুতো মুখপোড়ার কাণ্ডটা। মায়া স্কুল ফেরার পথে শুনল সব কিছু সুলতার কাছে। ওই অবস্থায় সতীকে ফেলে মা তার পাড়া মাতাতে, গাঁ-গোল করতে গেলেও ভূতুদা কিন্তু ঘাবড়ে যায়নি। সতীর হাত ধরে তাকে মন্দিরের সিঁড়িতে বসিয়ে সে তার যথা কর্ত্তব্য পালন করেছে। সতীর ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করে বেঁধে দিয়েছে তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ। অভয় দিয়ে তাকে বেলা, দীপালী, সন্ধ্যা, কেয়াদের সঙ্গে করে পাঠিয়ে দিয়েছে বাড়ী। বলেছে তাকে —যা সত্য তুই তাই বলবি। সৎমাকে তোর ভয় করে চললে সে তোকে আরোও পেয়ে বসবে। সন্ধ্যা-কেয়াদেরও ভূতনাথ জানিয়ে দিতে বলেছে সতীর মাকে—তার নামে কুৎসা কেলেঙ্কারী যতই রটাক সে আপত্তি নেই। কিন্তু ফের এ মেয়েটার উপর যদি অত্যাচার করে সে তবে দলবল নিয়ে সে আগুন লাগিয়ে দেবে তাদের বাড়ীতে।

সত্যি ভয়ের কথা। ওসব উড়নচণ্ডী বেপরোয়া বাউণ্ডুলে ছেলেদের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। তাই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন রাখহরি চাটুজ্জে। কিন্তু স্ত্রী তো তার কম ধানের চাল নয়। ভূতু যেমন বুনো-ওল সেও তেমনি বাঘা-তেঁতুল। কোন ঘাটের জল কোথায় যায় এবার দেখিয়ে দেবে সে। কিন্তু গাঁয়ের সব চাষী-বাসী মানুষ তাই মাঠের কাজে ব্যস্ত থাকায় পারে নি সে তাদের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে হাতে-নাতে ভূতনাথের কাণ্ড-কারবারটা দেখাতে। তাই ষোলো আনা ডেকে সন্ধ্যেবেলায়, যেমন কুকুর তাকে তেমন মুগুর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল সে। কিন্তু এটা নিছক হটকারিতা। ছেলেমানুষী। একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এমন ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করতে বার বার জ্ঞানদাকে নিষেধ করেছিলেন রাখহরি বাবু। কিন্তু জ্ঞানদা হল সেই এক জাতের কাল-নাগিনী যাদের গায়ে একবার পা পড়লে কিছুতেই তারা ছাড়ে না প্রতিশোধ নিতে। সুতরাং ছোবল সে মারবেই। শুধু জ্ঞানদাকেই তো হারামজাদী বলে গালি দেয় নি ভূতনাথ। তার স্বামীকেও বলেছে উজবুক, অপগণ্ড, ভেঁড়া ইত্যাদি নানা অকথা কুকথা। সুতরাং তার বিষদাঁতটা না ভাঙা পর্যন্ত কিছুতেই তাকে ছাড়বে না জ্ঞানদা। আর রাখহরি চাটুজ্জেকেও থাকতে দেবে না সে বলির পাঁঠার মত। ওলাউঠার এত বড় সাহস যে গালি পাড়ে সে তাকে!

—আর তুমি? মা বাবার কথার মাঝে হঠাৎ নাটকীয় ভাবে প্রবেশ করে মায়া বলে উঠল তার মাকে—তুমি ভূতুদাকে বলতে কোন কথাটা বাকী রেখেছো শুনি? গালি-গালাজের অভিধানে এমন কোন কথা নাই যা তুমি প্রয়োগ করতে বাকী রেখেছো ভূতুদার উপর। সত্যি তুমি মা নও, রাক্ষসী। নইলে দিদির উপর ওমনি অত্যাচার তুমি মন্দিরে গিয়ে সকলের মাঝে করতে পার। ছিঃ ছিঃ! তোমার মেয়ে হিসাবে সকলের কাছে পরিচয় দিতেও আমার লজ্জা হয়।

—তা হবে বৈকি। বলে উঠল জ্ঞানদা,—সব মেয়েদের মত ওই ভূতু মুখপোড়া তোরও যে মাথাটা খাবার উপক্রম করেছে। কিন্তু খবরদার বলছি মায়া, আর কোনদিন যদি ওই অশিক্ষিত অপদার্থ ছেলেদের সঙ্গে বেলা-কেয়ার মত মিশিস্ তবে কিন্তু আমি হেস্ত নেস্ত করে ছাড়ব।

—ভূতুদা অশিক্ষিত অপদার্থ ছেলে? ঘাড় নেড়ে বলে উঠল মায়া, প্রকৃত মানুষ চিনতে তোমার অনেক বাকী মা। ভূতুদার মত ছেলে এ গ্রামটায় ছিল বলেই সেদিন মোক্ষদা পিসির ছেলেটা যমের দরজা থেকে ঘুরে এল। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বাউল বাউরীকে সারাল কে? কে সেদিন ফনী কাকাদের ঘরে পড়া ডাকাত দলটাকে ভাগিয়ে দিল। ছেলে মেয়েদের দলটাকে নিয়ে গিয়ে যে বিভিন্ন সংঘ ক্লাব প্রতিষ্ঠানে নানারকম প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়ে মানপত্র, পুরস্কার জিতিয়ে আনে সে খবর রাখ তুমি? জান তুমি দিনের পর দিন গ্রামটাকে কেমন উন্নতির দিকেনিয়ে গিয়ে তার মান-সম্ভ্রম রক্ষা করে ভূতুদা?

—চুপ দে-তুই। ধমকে উঠল জ্ঞানদা, —ক্লাবে-মাঠে মেয়েদের নিয়ে যাওয়া মানে ফচকেমি করতে যাওয়া, ফাজলামি করতে যাওয়া। তুই একটা শিক্ষিতা, জ্ঞানী, উঁচু ক্লাসে পড়া মেয়ে হয়ে কেন যাবি ওসব অশিক্ষিত বাঁদরগুলোর সঙ্গে মিশতে?

—আমি শিক্ষিত, আমি উঁচু ক্লাসের মেয়ে? বলেই কি যে ভর করল মায়ার মাথায় কে জানে সে তার হাতের স্কুলের বইপত্র খাতা-পেন্সিল ইত্যাদি রেগে মায়ের পায়ের কাছে দুম্‌দাম করে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে

বলতে লাগল—এটাই তোমার অহঙ্কার না? এই অহঙ্কারেই তুমি আমার পড়াশোনার কথা তুলে ভূতুদাকে অপমান কর? রইল পড়ে তোমার পড়াশোনা। আর কোনদিন যদি এই বই হাতে করি বা স্কুলে যাই তবে দিব্যি রইল আমাকে।

—আঃ কি মুস্কিল। অস্থির হয়ে উঠলেন চাটুজ্জে মশায়। সত্যি যেমন মা তার তেমনি মেয়ে। বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন তিনি, —তোদের কি হচ্ছে এসব বল দেখি?

—কি আর হবে। মুখ ঝামটে বলে উঠল জ্ঞানদা,—তোমার মেয়ের ঘোড়া-রোগ ধরেছে। বলেছিলাম না বিয়ে দিতে। এবার সামলাও। ওই লম্পট-নাংটা ভূতটার সঙ্গে মেয়ে তোমার অধঃপাতে যাবার রাস্তা ধরেছে।

—আমাকে যা বলার যত খুশি বল তুমি, ধমকে উঠল মায়া—কিন্তু ভূতুদা'র সম্বন্ধে যদি আর একটা কোন বাজে কথা বল তুমি তাহলে কিন্তু আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

—বটে। মুখ বিকৃতি করে বলে উঠল জ্ঞানদা,— ভারি তো তোদের ভদ্র, ভূতু, ওকে আমি আজ ষোল আনার মাঝে ঝেড়ে কাপড় পরাব। ভেবেছে কি হারামজাদা? পরের ঘরের ভর যুবতী মেয়েদের মাথায় সিঁদুর দিয়ে ও বাহাদুরী করবে? ওকে আমি আজ নাক খত দেওয়া করাব। কান-মলা খাওয়া করাব সকলকে দিয়ে তবে আমার নাম জ্ঞানদা।

—দিদির মাথায় সিন্দুর ভূতুদা দেয় নি। দেওয়া করিয়েছ তুমি। বলে উঠল মায়া।

—মানে? কি বলতে চাস তুই! ঝাঞ্জকেরে গলায় বলে উঠল জ্ঞানদা,— কে তোর মাথায় এসব মিথ্যা বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়ে ভুল বুঝিয়েছে তোকে?

—তুমি কি বলতে চাও তোমার কীর্ত্তি-কলাপ কেউ দেখেনি? তুমি কি ধোওয়া তুলসী পাতা? তোমার ভাগ্য ভাল যে ভূতুদা তোমার গায়ে হাত তুলেনি। দিদির গায়ে বার বার তুমি হাত লাগিয়ে যাতে আর অপমানিত না হও সেই অপবাদের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবার জন্যই দিদির মাথায় দিয়েছে সে সিন্দুর। এ অভিনয়টুকু না করলে ওই উত্তেজনার মুখে তুমি হয়ত একটা মারাত্মক অঘটন ঘটিয়ে বসতে। কেলেঙ্কারী রাখতে আর জায়গা থাকত না। ঘরসংসারটার মান-সম্ভ্রম ধূলোয় লুটাতো। বাবাও কারো কাছে আর মুখ দেখাতে পারতেন না। বংশটার পর্য্যন্ত মুখ পোড়াতে তুমি। এ কেলেঙ্কারীর হাত থেকে ভূতুদাই তোমাকে রক্ষা করেছে। নিজে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে রক্ষা করেছে তোমাকে খুনারু অপবাদের হাত থেকে। ভূতুদার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত।

—শুনছো, শুনছো মেয়ের কথা? রাখহরি বাবুকে নাড়া দিয়ে বলে উঠল জ্ঞানদা,—তোমার সামনে, সমানে আমাকে অপমান করে চলেছে অথচ তুমি একটা প্রতিবাদ করছ না তার! ধমকও তাকে দিতে পারছ না একটা!

—সত্যের মুখ ধমক দিয়ে কেউ কখনও বন্ধ করতে পারে না। বলে উঠল মায়া, —আর আমার কথার মধ্যে এমন একটাও কোন অন্যায় বা মিথ্যে নেই যার প্রতিবাদ করতে পারবে বাবা। এখনও বলছি মা সময় আছে। দিদির সিন্দুর দেওয়াটাকে কেন্দ্র করে যে ঝড় তুলতে উদ্যত হয়েছ তুমি তাতে তোমার ঘরটাই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। ভাল চাওতো এখনও সংযত হও তুমি। এসব ষোলআনা-টোলআনা বন্ধ করে—

—তোর ভূতুদার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব আমি। মায়ার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল জ্ঞানদা।

—অন্যায় যখন করেছো তখন ক্ষমা তো তোমাকে চাইতেই হবে। তবে তোমার ছেলের মত যখন সে, পায়ে ধরতে হবে না। বলতো আমি তাকে ডেকে আনছি আমাদের ঘরে। তুমি শুধু মুখে তার কাছে তোমার ক্ষমার কথা বল। তারপর আমি সব বাগিয়ে নিচ্ছি। ভূতুদা কত সরল, উদার, মহান তুমি জান না মা। তাই তুমি বিনা দোষে ওকে দোষী করে অযথা এমন কষ্ট দিয়েছ। একটু বোঝ মা। উপর দিকে থুতু ছুঁড়লে সে থুতু তোমার গায়েই পড়বে। তার কোন ক্ষতি হবে না মা।

—সেটা দেখবার জন্যই খেলা ঘরের সামনে তোর বাপকে দিয়ে গ্রাম ষোল আনার মিটিং ডাকিয়েছি। তার ক্ষতি-বৃদ্ধির সেইখানেই বিচার হবে। তুই গায়ে পড়ে আর জ্ঞান দিতে আসিস না আমাকে। ফেলা থুতু তোর মা কখনও চাটে না জানবি। দেখা যাবে আজ সন্ধ্যাতেই। পাঁচজনের সামনেই তোদের ভূতুদা মুখপোড়ার

কু-কীর্ত্তিগুলো সব বলব আমি। দেখব গাঁয়ের কোন ছোঁড়া-ছুঁড়িরা তাই শুনে তোর ভূতুদার কেমন সাফাই গায়।

রাগ দেখিয়ে মা চলে যেতেই মায়া অনুরোধ করতে লাগল তার বাবাকে। যেমন করেই হোক ভূতুদা'কে তার অপদস্ত করার হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু বাবা তো তার মায়ের হাতের বাঁধা কাঁকড়ি। যেদিকে টানবে সেইদিকেই তার বশে চলতে হবে তাকে। তা না হলে এমন তুচ্ছ একটা কাণ্ডকে মায়ের কথায় ঘোরালো করতে উদ্যত হয় কখনও তার বাবা। বোগাস। স্ত্রী বুদ্ধি যে প্রলয়ঙ্কারী সে বোধটুকু পর্য্যন্ত লোপ হয়ে গেছে রাখহরি চাটুজ্জের। ছুটল মায়া দিদির কাছে। রান্নাঘরের পাশের রুমের এক কোনায় নিঝুম হয়ে বসেছিল শাশ্বতী। কি ভাবছিল সে কে জানে। রুক্ষ শুষ্ক চেহারা তার। খায় নি বোধ হয়। না খাক কিন্তু ভূতুদা যে তার মাথায় ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দিয়েছিল সেটা কোথায়! জিজ্ঞেস করতেই জানা গেল মা-ই সেটা নাকি খুলা করিয়েছে তাকে। পরিবর্তে লাগা করিয়েছে সেখানে থেতো গাঁদা-পাতা। সিন্দুরটা মাথায় সেইরকমই আছে তার। কারণ ওটাই তো ভূতুদা'র অপকীর্ত্তির চিহ্ন। মায়ের কড়া নিষেধ ওটা কিছুতেই মুছতে পারবে না সে। প্রমাণ স্বরূপ ও সিন্দুর সকলের মাঝে দেখিয়ে ভূতনাথের মাথায় গুঁড়ি গুলবে সে। এমন টাইট দেবে বাছাধনকে যেন জীবনে শুধু সতীকে নয় আর কারো মাথায় সে কোনদিন আর সিন্দুর রগড়াতে না পারে।

—দিদি, ভূতুদাকে তুই বাঁচা। হঠাৎ পাশে এসে মায়া হাতটা ধরে শাশ্বতীকে বলে উঠল অনুরোধের স্বরে, — ভূতুদার কোন দোষ নেইরে। তোকে মায়ের মারার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আর অন্য কোন উপায় নেই দেখেই বাধ্য হয়ে সে তোর মাথায় সিন্দুর গুড়ি ফেলে দিয়েছিল।

—জানি আমি। বলে উঠল শাশ্বতী।

—জানিস যদি তবে এখনও তুই তোর ওই মাথার সিন্দুরটা রেখে দিয়েছিস কেন? দে, মুছে দিই আমি।

—যখন যা করার আমি ঠিক সময়েই তা করব মায়া। নিশ্চিত থাক তুই। ভূতুদা মানুষ নয় রে, — মহাদেব। ও দেবতাকে কখনও অপমানিতহতে দেব না আমি। তাতে যদি আমার জীবন যায় তাও স্বীকার। তবু ভূতুদা'র দেহে শুধু নয়, তার প্রানে-মনেও কাকেও আমি কখনও আঁচড় লাগাতে দেব না জানবি।

নিশ্চিত অবশ্য হল মায়া। কিন্তু কি যে তার পরিকল্পনা, কি চিন্তাই বা করছিল সে আপন মনে তা আর জানা হল না তার। মা এসে দিল সব ভণ্ডুল করে। কি শুনতে কি শুনে এল যে বাবার কাছ থেকে এসেই ওমনি সে ধমকে উঠল মায়াকে—শোন মায়া, যেমন মেয়ে তেমনি থাক। বাপ ভোঁদারাম তুই ইঁচড় পাকা হয়ে মাথাটা আমার খাস নে। বড়দের ব্যাপারে মাথা গলিয়ে বাচালতা করতে আসিস তো মাথাঠুকে মরব আমি।

—কিন্তু বড়র মত মন নিয়ে চলছো কই তুমি? বলে উঠল মায়া—দিদি সব মুখ বুজে সহ্য করে বলে কি তাকে নিয়ে এমন খেলায় মাতা তোমার উচিত? পরিণতিটা ভেবেছো? চিন্তা করেছো দিদির ভবিষ্যৎটা? আর বিয়ে হবে দিদির? চিরদিন তোমার ভুলের এ কলঙ্ক নিয়ে তাকে যে আইবুড়ো থাকতে হবে সে কথাটা ভেবে দেখছ একবারও?

—তার জন্যই তুই বোধ হয় এখানে তোর দিদিকে কু-মন্ত্রনা দিতে এসি? বলে উঠল জ্ঞানদা, — জেনে রাখ তুই, তোর কথা শুনে সতী যদি কিছু ষোলআনার মাঝে উল্টো-পাল্টা কথা বলে তবে এ বাড়ীর ভাত চিরকালের মত উঠবে তার। শুনে রাখ তুইও সতী—আমার শিখানো কথাগুলোর যদি এতটুকু ইতর-বিশেষ হয় তোর মুখে, তবে ও মুখ ভেঙে আমি গুঁড়ো করে দেব তোর। বাইরের একটা চেংড়া ছোঁড়া তোর জন্য আমাকে অপমান করবে জীবন থাকতে আমি তা কখনও সইব না জানবি। এই আমার শেষ কথা।

বসল সভা ষোলআনার। সন্ধ্যে না গড়াতে গড়াতে রাখহরি বাবুর বৈঠক খানার চত্বরটা ভরে গেল লোকে। গাঁয়ের বোধহয় ছেলে বুড়ো কেও বাদ গেল না। যাবেই না বা কেন। সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত সতীর উপর ভূতনাথের এই অপকম্মটি নিয়ে গুজুর-ফুসুর কি কম হয়েছে? গাঁয়ের অলি-গলি কুলি মেলায় যেখানেই দুটো মুখ এক হয়েছে সেখানেই সব কানে কানে ঢালা-ঢালি হয়েছে বলাই বাড়ুজ্জের ছেলের কাণ্ডটা। রঞ্জ-গঞ্জও হতে বোধ হয় মাঠ-ময়দানও বাদ যায় নি। মেয়েছেলে নিয়ে ব্যাপার এসব কি কম শ্রুতিকর? তার উপর আবার জ্ঞানদার প্রচার। বলাই বাড়ুজ্জের বড় নাকটা কাটার চ্যালেঞ্জ তার, এসব ব্যাপার শুনতে যেমন

মজাদার দেখতেও তেমনি রুচিকর। লোক হিসেবে বাড়ুজ্জে অবশ্য মাটির মানুষ। সাত-পাঁচ বুঝেন না তিনি। ছেলে দোষ করেছে তার তা তো আর অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ দোষ যে ভূতোর নিছক হটকারিতার তা তো মানতে হবে সকলকে। এর মধ্যে ভূতনাথের কোন কুমতলব বা খারাপ অভিপ্রায় ছিল না। ছিল না কোন অসৎ উদ্দেশ্য। স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়ে ভূতনাথ ছিল সকলের সন্দেহাতীত। নিছক একটা ঝোঁকের মাথায় জিদের বশেই এ কাজটা করে ফেলেছে সে। তৎকালীন পরিস্থিতি হিসাবে চিন্তা করতে গেলে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না ভূতনাথকে। আর গাঁয়ের একটা ছেলে হটকারিতায়, উত্তেজনার বশে যদি একটা অপরাধ করেই বসে তবে কি ক্ষমা নেই তার? এর জন্য পাঁচজনের বিচারে যা অর্থদণ্ড বা জরিমানা হবে বলাই বাড়ুজ্জে ষোলআনার হাতে তা সঙ্গে সঙ্গেই তুলে দিতে রাজি। কিন্তু ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় এগোবে কি হঠাৎ দীপালী, কেয়া, বেলা, সবিতার দল এসে আলোচনার গতিটাকে দিল অন্য দিকে ঘুরিয়ে। বলল তারা সমস্বরে—দণ্ড যদি দিতেই হয় তবে তা সতীর সৎ-মাকেই তা দেওয়া উচিত। কারণ মহাদেব-থানে এত লোকের মাঝে পূজো দিতে আসা একটা এতবড় মেয়েকে যেভাবে মার-ধর করে চুল ধরে টেনে মন্দির থেকে ফেলে দিয়েছে সে, তা কোন মানুষের কাজ নয়। মূল কারণটা বাদ দিয়ে শুধু কাজের শেষটুকু নিয়ে নির্দোষীকে দোষী করা চলবে না। সতীর সৎমায়ের আগে বিচার হোক। তারপর হবে ভূতুদার বিচার।

মেয়েদের তো অবাক সাহস! সকলের মাঝে এভাবে তাদের কথা বলা দেখে সবারকার তো চক্ষু স্থির। যুগ পাল্টাচ্ছে, দেশের হাওয়া বদলাচ্ছে এসব তো তাদের শোনা কথা। কিন্তু তাদের অজ্ঞাতে বাঁকুড়া জেলার এই অজপাড়াগাঁয়ে তাদের মেয়েছেলেদের মধ্যেই যে এ পরিবর্তনের ঢেউ এসে লেগেছে কে জানে। কে জানে কখন এসে পরিবর্তনের বাতাস মুখ খুলিয়েছে তাদের ভূতগ্রামের মেয়েগুলোর। কিন্তু সে যাই হোক—এ অন্যায়, ঘোর অন্যায়, মেয়েছেলেরা আবার মুখ খুলবে কি? বাচালতা করবে কি তারা বয়োজ্যেষ্ঠ বেটাছেলেদের মাঝে? সভার মধ্যে কে একজন বলে উঠল,—বুঝলেন মুখুজ্জে মশায় কলি, ঘোর কলি। নইলে ষোল আনার মাঝে মেয়েরা আসে।

তাই শুনে পাকামাথা তিনকড়ি মুখুজ্জে বেজায় উঠলেন চটে। বলে উঠলেন তিনি মেয়েদের দিকে ঘাড় নেড়ে, —লজ্জা করে না তোদের পুরুষ-বেটা ছেলেদের মাঝে এসে এভাবে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে?

—কিসের লজ্জা? বলে উঠল তার কথার উপর সন্ধ্যা ও দীপালী,—চোখের সামনে যা আমাদের ঘটেছে সে সত্যটা বলতে লজ্জা করব কেন?

জ্ঞানদা আর ধৈর্য্য ধরতে পারল না। মুখরা মুখপুড়িদের বলা মুখগুলো বন্ধ করতে উত্তেজনার মুখে হিড়হিড় করে টেনে আনল শাশ্বতীকে। সকলের মাঝে দাঁড় করিয়ে তাকে সেই দীপালী, কেয়াদের উদ্দেশ্য করেই বলে উঠল সে, যাকে নিয়ে কাণ্ড তার মুখেই শোন মুখপুড়িরা। ওই মন্দির পাশ দিয়ে সাইকেল চড়ে যাবার সময় ওই বাঁদর মুখপোড়াটাই সতীর শাড়ি ধরে আচ্‌কা টান মেরে তাকে মন্দির-দাওয়া থেকে নীচে গায়ে তার ফেলে নিয়ে ছিল কি না।

কি আশ্চর্য্য! এতবড় মিথ্যে কথা! মায়া প্রতিবাদ করে উঠতেই ধমকে তার মুখ বন্ধ করে দিল ঘরের কাকা-জ্যেঠারা, —তুই তো তখন ছিলি ইস্কুলে। নিজের চোখে যখন দেখিসনি তখন তুই ফড়ফড় করতে আসিস না সকলের মাঝে। চুপ কর। তোর দিদিকেই বলতে দে সব কথা।

সতীর খোলা ব্যাণ্ডেজ, রুক্ষ চুল, শুষ্ক মুখ দেখে তো আর সঙ্গী-সাথীরা সবাই অবাক। বেচারীর সমস্ত দিন পেটে কিছু গেছে কি না কে জানে। ফ্যাকাশে মুখে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠল সে,—কারো কোন দোষ নেই নারাণ-কাকা, পূজোর লাইনে টাল সামলাতে না পেরে আমিই ওমনি পড়ে গেছলাম দাওয়া থেকে। সব দোষ আমারই।

—মিথ্যে কথা। গর্জে উঠল মায়া,—মা তোকে মারেনি? মা তোকে চুল ধরে টানেনি? ঘরে মা তোকে ভয় দেখিয়ে মিথ্যে বলতে বাধ্য করেনি? কি যে বলবে মায়া খুঁজে পেল না। ধমকে উঠল রাখহরি মুখুজ্জে, —সব ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে এসে তোর এমন মুখ খুলা স্বভাবটা কেন বলতো?

—কেন হবে না? বলে উঠলো মায়া,—দিদি হয়েছে তার মায়ের মত তাহলে আমিও আমার মায়ের মত হব না কেন? দিদি তার মায়ের মত হওয়ার জন্য যদি প্রশংসা পায় তাহলে আমিও আমার মায়ের মত হওয়ার জন্য প্রশংসা পাব না কেন?

মায়ার মাথায় যখন পোকা নড়ে তখন পরোয়া করে না সে কাকেও। সত্য কথা তা সে যারই হোক না কেন স্পষ্টভাবে বলতে সে কাকেও কোন খাতির করে না। তাই চুপ দিলেন রাখহরি বাবু। কিন্তু জ্ঞানদাদেবী হয়ে উঠলেন মায়ার প্রতি গণগনে আগুনে। ঘোমটা খুলে তার সামনে মুখ ঝামটে বলে উঠলেন তিনি,— মুখপুড়ি ঘরের কথা বাইরে বলতে লজ্জা করে না তোর? সবটাতেই আমার দোষ দেখা তোর এমন স্বভাব যে পাঁচ জনের কাছে মিথ্যে-সত্যি পাঁচ কথা বলতেও তোর আটকায় না? সতীর মাথায় সিন্দুর দিয়েছিল কে? একটা আইবুড়ো মেয়ের মাথায় সিন্দুর ঘষে দেওয়া কি কম অপরাধ? ভূত চেপেছে তোদের মাথায়। তার ভরে সব দোষ দেখছিস আমার। ডাক সেই ভূতো মুখপোড়াকে বলুক সত্যি কথা—সতীর মাথায় সে সিন্দুর দিয়েছিল কিনা।

—সব দোষ আমার মা। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠল সতী।

—ও সিন্দুর আমিই আমার মাথায় লাগিয়েছি। কৌটো থেকে পড়ে যাওয়া আমার হাতে লাগা সিন্দুর অসতর্কতায় লেগে গেছে আমার মাথায়। ভূতুদার কোন দোষ নেই এ ব্যাপারে।

—মিথ্যে কথা। যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠল জ্ঞানদা—ভেবেছিস কি হারামজাদী এতগুলো লোকের মাঝে মিথ্যে কথা বলে তুই আমাকে অপমান করবি? তোর মিথ্যে কথা শোনার জন্য ষোলআনা জড়ো করেছি আমি এখানে? চল, তুই তোর বাপের পায়ে হাত দিয়ে বলবি চল যে ওই-ভূতো নদীভরা তোর মাথায় সিন্দুর দেয় নি।

ধমকে সতীকে তার বাপের কাছে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতেই হঠাৎ ধূমকেতুর মত জ্ঞানদার সামনে হাজির হল ভূতনাথ। বলে উঠল সে, —শোন কাকীমা, মহাদেব থানে সতীর মাথায় সিন্দুর দিয়েছি আমি। আমিই সেখানে সেই মন্দির চত্বরে সকলের মাঝে বলেছি তোমাকে যে সতীকে আমি বিয়ে করব। বল আর তুমি কিছু শুনতে চাও?

—সিন্দুর দেওয়াটা কি ছেলেখেলা? এটা কি তোদের যাত্রাপার্টি অভিনয় ভেবেছিস? মুখ নেড়ে তাকে ঝাঁঝাল গলায় বলে উঠল জ্ঞানদা, —এই সভার মাঝে নাক খত, কানমলা দিয়ে তোকে তোর দোষ স্বীকার করতে হবে। তবে আমি ছাড়ব।

—কিন্তু আমি তো তোমাকে ছাড়ব না কাকীমা। আমি মুখে যা বলি, কাজেও তাই করি। এই ধরলাম আমি সতীর হাত। বাবা ভূতনাথের থানে সতীকে আমি বিয়ে করব বলেছিলাম এখানে সকলের সামনে সতীকে আমি বিয়ে করেছি বলে ঘোষণা করলাম। সতীর মাথায় সিঁদুর দিয়েছি যখন তখন সতী আজ থেকে আমার স্ত্রী। এর পর যদি সামান্য একটুও অত্যাচার হয় ওর উপর তাহলে কিন্তু স্বামীর অধিকার নিয়ে আমি তার প্রতিশোধ নেব। শুধু তাই নয়, এ পর্য্যন্ত যা করেছ তুমি তারও সমস্ত কিছুর মোকাবিলা করতে হবে আমাকে তোমার সঙ্গে। মনে থাকে যেন।

কথাটা শুনে যেন চমকে উঠল জ্ঞানদা। কিন্তু পরক্ষণেই তার স্বভাবজাত ভঙ্গীমায় বলে উঠল সে—মুখে বিয়ে বললেই তো আর বিয়ে হয় না তার একটা অনুষ্ঠান আছে, বিধি ব্যবস্থা আছে।

—ওসব আমি জানি না। বলে উঠল ভূতনাথ—মহাদেবের মন্দিরে বাবা বিশ্বনাথের সামনে সতীর মাথায় সিঁদুর দিয়ে ওসব অনুষ্ঠানের ইতি ঘটিয়েছি আমি। এর উপর যদি ওসব করার ইচ্ছা থাকে তোমাদেব তবে বাবার মত নিয়ে তোমরা করতে পার। আমার ওসবের দরকার নেই। আমার যা কথা তাই কাজ।

জ্ঞানদার বলা মুখটা গেল বন্ধ হয়ে। ছোবল মারতে ওঠা কাল-নাগিনীর উর্দ্ধফণা যেন কোন মন্ত্র বলে স্তিমিত হয়ে গেল হঠাৎ। সে শুধু নয়, বিস্মিত হয়ে গেল জমায়েত গ্রাম-ষোলআনার সকলেই। এমন কি মায়া, কেয়া, বেলা, সন্ধ্যা, দীপালী সবাই কেমন যেন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পুতুলগুলোর মত। ভূতনাথের বাবা বলাই বাঁড়ুজ্জে, সেও যেন বিস্ময়ে হতবাক! সত্যিই আশ্চর্য্য হবারই কথা। কত ভাল ভাল ঘরের মেয়ের বাবারা ধন্না দিয়ে গেল তার বাড়ীতে। মত করেনি ভূতনাথ। কত সুন্দর সুন্দর মেয়ের ছবি এনে ধরা হয়েছিল তার সামনে। রাজি হয়নি সে। বিয়ের কথা বললে যে ছেলে মা-বাবার উপর রেগে হত ব্যোম—সে হঠাৎ এমন গ্রামের একটা কুরূপা অসহায়া মেয়েকে বলে বসল বিয়ে করবে। এর চেয়ে আর অবাক হবার কি আছে?

হঠাৎ ফনী চাটুজ্জে পাশ থেকে উঠলেন ফেনিয়ে। মনে হয় রসিয়ে একটু মজা করার জন্যই বলে উঠলেন

তিনি বলাই বাড়ুজ্জেকে নাড়া দিয়ে—এক মাত্র ছেলে তোমার, বিনা অনুষ্ঠানে কিন্তু তোমাকে বৌ ঘরে ঢুকাতে দেব না ভায়া। আড়ম্বরপূর্ণভাবে বেশ জাঁক-জমক করে তোমাকে বিয়ে দিতেই হবে উপরন্তু মোটা রকমের এমন একটা বৌভাত দিতে হবে তোমাকে যেন তিনদিন আমাদের কারো পেটের অম্বল না মরে। না কি বলেন সব গোঁসাই ঠাকুররা, কত্তা—বাবারা?

পাকা মুখো টেঁকো মাথা সব মুখ্যা মাতব্বরের দল এক যোগে মুখ নেড়ে, ঘাড় নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করে দিল তার কথাটা—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। জন্ম বেঁধে কর্ম্ম। এসব আনন্দ-স্ফূর্ত্তির জিনিষ। ভোজন পর্ব, উৎসব অনুষ্ঠানের কি ঘাটতি পড়লে চলে ভায়া?

বাড়ুজ্জে মশায় কিন্তু নির্বাক নিস্পন্দ। সেই কথায় বলে না—যার দুঃখ সেই বুঝে অন্য লোকের শিঙ্গা বাজে। জ্ঞানদা'ও অবশ্য এরকমটা চায় নি। স্বপ্নেও ভাবেনি সে যে ভূতনাথ ওই কাল-পেঁচী সতীকে হঠাৎ এভাবে বিয়ে করব বলে সকলের মাঝে স্বীকার করে বসবে। সে চেয়েছিল তাকে একটু টাইট দিতে। তার ছুঁচো মুখটা বুজো করে সকলের মাঝে তার ওই বাঁদরামিটার একটু শাস্তি দিতে। কিন্তু মুখপোড়াটা যে সকলের কাছে তারই মুখটা এমন করে মুড়িয়ে দেবে কে জানে। এযে কাক—তালীয় ব্যাপার। ভাবতে লাগল জ্ঞানদা এ হতে দিলে তো চলবে না। যেমন করেই হোক এ বিয়ে বন্ধ করতে হবে তাকে। এ বিয়ে দেওয়াও যা খাল কেটে তার ঘরে কুমীর আনাও তা। হঠাৎ ওধারে একটা মোক্ষম কথা বলে উঠল ফনী চাটুজ্জে। বোধহয় বলাই বাড়ুজ্জেকে টিট্‌কারি করার জন্যই—তুমি ভেবে আর কি করবে ভায়া—মিঞা বিবি রাজি তো কি করবে কাজী? আজকালকার ছেলে-মেয়ে সুতরাং ছাড় ওসব। বাবা ভূতনাথের সতী ছাড়া আর পত্নী কে জুটবে ভায়া। অতএব লাগিয়ে দাও ধুমধড়ক্কা। শুভস্য শীঘ্রম।

যেখানেই হোক, আর যেমন আসরেই হোক মজা লোটা লোকের তো কোথাও অভাব নেই। তাই ফনী চাটুজ্জের কথাটাকে টেনে সভার মাঝে ওমনি বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে বলে উঠল একদল,—বিয়ের কথা পাকা-পাকি করতে যাচ্ছি জানলে তো এ আসরে বেশ সাজ পোশাক করে আসতাম। কিন্তু আমাদের সেজে-গুজে না আসার জন্যই কি দেখা-শোনার ভোজটাও আমাদের ফাঁকি দিয়ে গেল। হায় কপাল!

হঠাৎ একটা দমকা হাসির আওলি—বাউলি হাওয়া ঘুরে গেল সমস্ত আসরটার মধ্যে। দেখে শুনে জ্ঞানদার পিত্তিটা যেন উঠল ছলকে। ন্যাক্কার জনক একটা ভাব দেখিয়ে সে ত্রস্ত-পদে চলে গেল সেখান থেকে। বলাই বাড়ুজ্জে বসে বসে হজম করতে লাগলেন সকলের ঠাট্টা বিদ্রূপ আর টিটকারীর খোঁচাগুলো। ছেলের জন্য তাকে এখানে এসে যে এমনভাবে এসব সহ্য করতে হবে সে ভাবতে পারেনি। কল্পনাও করতে পারি নি যে কোনদিন হঠাৎ ভূতনাথের এমন মতি-গতির পরিবর্তন হবে। কিন্তু থাকগে ওসব ভাবনা-চিন্তা, উপায় কি হবে এখন। এ বিয়েতে সে মত দিবে কি করে, স্ত্রীই বা তার বলবে কি। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে বসে রইল বলরাম বাড়ুজ্জে।

(চার)

আশ্চর্য্য জেদ কিন্তু ভূতনাথের। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যদি লয় পেয়ে যায় তাও স্বীকার তবু তার কথার নড়চড় হবার উপায় নেই। বাবা তাকে কত বোঝালেন—বিয়ে একটা গোঁয়ার্তুমির ব্যাপার নয়। জীবন বেঁধে কর্ম। এসব ক্ষেত্রে হটকারিতা করা উচিত নয়। গাঁয়ে বিশেষ করে ওই রাখহরি চাটুজ্জের মেয়েটাকে বিয়ে করলে সমাজে তার আর সে পজিসন থাকবে না। ওই যদু-মধু বিপিন গোপাল চাটুজ্জের মত সেও একটা খেলো মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু এসব কথা শুনলে তো ভূতনাথ। মায়ের মানাও মানল না সে। সারদা কমলা তাকে কত বোঝালেন। পরিষ্কার ভাবে জানালেন তিনি,—দেখ ভূতু, ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করতে হয়। বিয়ে-শাদির বিষয়ে অযথা এমনি ঝোঁক ধরে বোকামি করিস না। ভবিষ্যতে ছেলে-পিলের বাবা হবি তুই। মেয়েরা যদি ওই সতীর মত কালো বরন নিয়ে জন্মায় তবে পাত্রস্থ করা দায় হবে তাদের। বেয়াড়া জেদটা ছেড়ে একটু বুঝে চল।

কিন্তু ভূতনাথের সেই এক কথা। ওখান ছাড়া আর সে বিয়েই করবে না। বেশ, তাই যদি করে সে তবে রাখহরি চাটুজ্জের ছোট মেয়ে মায়াকে বিয়ে করুক। মেয়েটা দেখতে শুনতেও ভাল, আক্কেল-বুদ্ধিও আছে। কিন্তু মায়ের সে এ কথাটাও শুনল না ভূতনাথ। কারণ বলেছে যখন তখন রাখহরি চাটুজ্জের ওই বড় মেয়ে

তাই সে কাল কুৎসিত কদাকার কুরূপা যাই হোক না কেন ওই শাশ্বতীকেই বিয়ে করবে সে। ধনুকভাঙ্গা পণ তার। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা। ভূতনাথের ধাত ভালভাবেই জানে তার মা-বাবা। বিগড়ে গেলে সত্যিই হয় তো জীবনে আর সে বিয়েই করবে না। বংশ-পিণ্ড লোপ হবে তাদের। কুল দেবতার মন্দিরে পড়বে না সন্ধ্যে মাড়ুলি। পূর্ব-পুরুষরা জল না পেলে অভিশাপ দিবে তাদের। তাই বাধ্য হলেন তারা। কিন্তু ওধারে অবাধ্য হয়ে উঠল জ্ঞানদা। কারণ এতো জানা কথা —ভূতনাথ তো এ ঘরে সতীর হাত ধরে জামাই হবার জন্য ঢুকছে না। ঢুকছে সে তার গায়ের ঝালটা ঝাড়তে। প্রতিশোধ নেবে সে। সাংঘাতিকচীজ ওই ডালের বাঁদরটা। একটা স্ফুলিঙ্গ। আগুন লাগাবে সে জ্ঞানদার ঘরে। কি দরকার ওই বাউণ্ডুলে দুষ্ট ষাঁড়টাকে সংসারে ঢুকিয়ে তাদের শান্তি নষ্ট করার? সে যাই হোক জ্ঞানদার কোন আপত্তিই কিন্তু শুনল না রাখহরি চাটুজ্জে। কারণ জীবনে সে পোড় খাওয়া মানুষ, পাকা মাথার লোক। এটা একটা মস্ত বড় মকা তার। বলরাম বাড়ুজ্জের মত এমন মান্য গণ্য বড় ঘরে ঢুকতে পারা কি কম সৌভাগ্যের কথা। মাথার উপর কোন লাগ (দায়িত্ব) নেই বাড়ুজ্জে মশায়ের। আর কোন মেয়ে নেই, ছেলে নেই। ওই ভূতনাথ তাদের একমাত্র সন্তান। এমন সুপাত্র মাথা খুঁড়লেও কি পাওয়া যাবে আর? গরম থাকতে থাকতেই লৌহাকে ইচ্ছামত গড়নে আনা যায়। সুতরাং এ সুবর্ণ সুযোগ কখনও হেলায় হারাবে না, রাখহরি চাটুজ্জে। তাই পাঁচজনকে বলে কয়ে ভূতনাথের জেদের সঙ্গে সঙ্গে তার মা-বাবার দুর্ব্বলতার সুযোগটা ষোল আনা গ্রহণ করে নিলেন তিনি।

সুতরাং শাঁখ বাজলো। রাখহরি চাটুজ্জের ঘরের উঠোনে উঠল বিয়ের ছাদনা তলা। তার মধ্যে ঝাঁকের পর ঝাঁক উলুধ্বনিকে সঙ্গে করে টোপর মাথায় বলরাম বাড়ুজ্জের ছেলে এল তার মা মরা মেয়ে শাশ্বতীর গলায় বর মাল্য দিতে। একেই বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ। এধারে কনের মা রইল মুখ গোমড়া করে। ওধারে বরের মা করতে লাগল আফসোস,—

"হয় বিধাতা তোমার একি বিধি—

"সুপাত্রে কু-কন্যা দিলে তুমি নির্গুণে দিলে গুণ নিধি।"

তা নয় তো কি? কোথায় ভূতনাথ আকাশের চাঁদ আর কোথায় শাশ্বতী ধান-সিজে হাঁড়ির তলা। আকাশ-পাতাল তফাৎ। কিন্তু সে হলে হবে কি। জেদ মানুষের সাংঘাতিক জিনিস। তাতে তেলে-জলেও মিশে। সত্যি, ভূতনাথের শাশ্বতীকে বিয়ে করা দেখে অবাক হয়ে গেল গ্রাম-শুদ্ধো ছেলে-বুড়ো সবাই। মন্টু -নেপলা, ঝন্টু-বাবলা ইত্যাদি বন্ধু-বান্ধবরা পর্য্যন্ত কল্পনাও করতে পারে নি কোন দিন যে তাদের দল সর্দ্দার ভূতনাথ গুরু, আইবুড়ো কার্তিক শাশ্বতীর মত একটা মেয়েকে ধরে তার থুবড়ো নামটা এমন করে হঠাৎ ঘুচিয়ে ফেলবে। এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হল সবাই যে ঢের ঢের মরদ দেখা গেছে কিন্তু ভূতনাথের মত এমন এঁড়ে মরদ সত্যিই দুনিয়ায় দুর্লভ।

তবে ভূতনাথের সঙ্গী-সাথী মা-বাপ সবাই বিয়েতে তার খুশি বা অখুশি যাই হোক না কেন মায়া মনে হয় বিশেষ আনন্দিতই হয়েছিল। প্রমাণ পাওয়া গেল তার বাসর রাতে। দিদির চিন্তাভারাক্রান্ত গম্ভীর মুখটা খুশির জোয়ারে ও হৈ-হট্টগোলে পুরিয়ে দেবার জন্য সে তার বান্ধবী কেয়া-কাকলী ও বেলা-শ্যামলীদের নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসল বাসর জাগাতে। ভূতুদাকে দিদির পাশে বসিয়ে শুরু হল হাসি-মসকরা, আবদেবে সুরে বলে উঠল সে দিদিকে নাড়া দিয়ে—এ দিদি তোর মত শিব পূজোটা আমায় শিখিয়ে দে-না ভাই, যেন আমিও তোর মত ওমনি ঝাঁপিয়ে পড়ি।

—শুধু ঝাঁপিয়ে পড়লে চলবে না রে, বলে উঠল কেয়া, — মাথা ফাটানো চাই, নইলে তোকে সিন্দুর লেপতে কে ছুটে আসবে বল?

— ভূতুদা তো আর ছুটে আসতে পারবে না। বলে উঠল শ্যামলী,—সে তো অলরেডি বুকড্। সতীদি তাকে বেঁধে রাখবে।

—এ্যাঁ, তাই নাকি? অবাক হওয়ার স্বরে বলে উঠল মায়া,—হ্যাঁ দিদি, সত্যিই তাই? ভূতুদাকে তুই একাই নিবি আমাদের কাছে আসতে দিবিনা? না দিদি এটা তাহলে তোর সত্যিই খুব অন্যায় হবে। ছোট থেকে এতদিন তুই মণ্ডা-মিঠাই যা পেতিস আমাকে না দিয়ে খেতিস না। তবে ভূতুদাকে তুই আমাকে ভাগ দিবি না কেন?

হো-হো-হা-হা উঠল হঠাৎ হাসির ঝড়। সত্যি মায়া রসিয়ে জমিয়ে বেশ কথা বলতে পারে। মুখের চোট্-পাটে তার গাম্ভীর্য্য বজায় করে বসে থাকতে পারে এমন সাধ্য বোধ হয় কোন পাকা-মাথা বুড়ো বুড়ীরও নেই। কিন্তু এ আসর শুধু তো একজনের কথা বলার বা অপর জনের শুনে যাওয়ার আসর নয়। পালার পালা একের পর এক মুখ খুলতে হবে সকলকেই। তাই মায়ার কথাটা টেনে নিয়ে বলে উঠল কাকলি,—ভূতুদা তো দিদির তোর আর মণ্ডা-মিঠাই নয়। প্রেম নগরের পেড়া, পীরিতপুরের মধু। এ যে পায় সে একাই খায়। ভাগ দেয় না কাকেও, বুঝলি লো ছুঁড়ি?

"—ভাগ না দিক অন্তত চাটতে দিক।" বলে উঠল সবিতা, চেকে-চেটে দেখি আমরা নুন ঝাল টক মিষ্টি সব ঠিক হয়েছে কি না।

—তা হলে মায়াই প্রথমে টেস্ট করুক। সেই চেটে-চেকে বলে দিক তার দিদিকে যে মালটি কেমন হয়েছে তার।

—না বাবা না। বলে উঠল মায়া—দিদি হল গুরুজন তাকে এঁঠো করে দেব না আমি। পাপ হবে। বরং সেই এঁঠো করে দিক আমাদের সে প্রসাদ খেয়ে ধন্য হব আমরা।

উঠল হাসির ঝলক। সকলের মুখ ফোয়ারায় সে কি হাসির তোড়। লুটোপুটি খেতে লাগল সবাই পরস্পর পরস্পরের গায়ে। হঠাৎ থমকে গেল মায়া। দেখল তার দিদির চোখে জল। —এ দিদি, কাঁদছিস কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল সে।

উত্তর দেবে কি সতী তাকে উল্টো জড়িয়ে ধরে হঠাৎ যেন ভেঙ্গে পড়ল চাপা কান্নায়। ধমকে উঠল মায়া—মুখপুড়ি, সব দিবি নষ্ট করে? তোর তো কান্নার দিন শেষ হয়েছে দিদি। এবার একটু হাস। ভাবনা কি তোর? ভূতুদা তোর হাত ধরেছে। এমন সৌভাগ্য কার হলতো?

কিন্তু কি যে ভাব মুখপুড়ির কে জানে। ডুকরে কান্নায় মায়ার দেহটাকে পর্য্যন্ত দলিয়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল সে। —দিবি না চুপ? বলেই মায়া তার উপচে আসা কান্নাটাকে গাম্ভীর্য্য দিয়ে চাপা রেখে ধমকে উঠল সতীকে—তবে থাক পড়ে তুই এখানে। আমার গাটায় কেন ভূতুদার গা-টায় পড়ে কাঁদ তুই যত পারিস। চললাম আমরা। বলেই সতীকে ভূতনাথের গায়ের দিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তড়িৎ গতিতে বান্ধবীদের ইশারা করে বেরিয়ে আসতে বলে চলে গেল সে ঘরের বাইরে। শ্যামলী কেয়া সকলে উঠতেই যেন হুস হল ভূতনাথের। বলে উঠল সে কেমন যেন এক ঘোর-কাটা-স্বরে,—চলে যাচ্ছিস যে?

উত্তরে তার বলে উঠল সন্ধ্যা, —যাব না তো কি, তুমি থাকবে গম্ভীর হয়ে তাই দেখে উনি ফেলবেন চোখের জল আর তার মাঝে আমরা হাসি-মসকরা করে যাব? আমরা তো পাগল নই—সব বুঝি। আমরা থাকলে যে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে সেটা এভাবে না জানিয়ে সোজাসুজি তো বলে দিলেই পারতে। ভেগে যেতাম আমরা। আর কেন, তোমার জিনিস তুমি সামলাও। যাই আমরা।

সত্যি চলে গেল বেলা-শ্যামলী, কেয়া-কাকলির দলটা। বেরিয়েই তারা বাইরে থেকে সজোরে দিল দরজাটা বন্ধ করে। ভিতরে রইল শুধু শাশ্বতী ও ভূতনাথ। নব-দম্পতি। কিছুক্ষণ চুপ-চাপ থাকার পর প্রথমে ভূতনাথই পাড়ল কথা, কাঁদছিলি কেন? আমি কি তোর উপযুক্ত নই?

ওমনি সতী ঝড়ের বেগে জড়িয়ে ধরল ভূতুদার পা দুটো—ও কথা বলো না ভূতুদা। কোন অংশেই আমি তোমার যোগ্য নই। তবু যে তুমি আমাকে দয়া করবে, কৃপা করে—থামিয়ে দিয়ে সতীকে বলে উঠল ভূতনাথ,—ওসব কথা থাক, কাঁদছিলি কেন তুই বল?

—হঠাৎ মনটা কেমন যেন হয়ে গেল ভূতুদা। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি নিজেকে। একি স্বপ্ন না সত্যি? সত্যিই কি তুমি স্বামী হয়ে গ্রহণ করেছ আমাকে? আমি যে তোমার স্ত্রী হয়ে পাশে এসে দাঁড়াতে পারব কোনদিন তা কল্পনাতেও আনতে ভরসা পাইনি। এতো কান্না নয় ভূতুদা আনন্দাশ্রু।

—যাই হোক। গম্ভীর ভাবে বলে উঠল ভূতনাথ—আমি কারো পেনপেনানি সহ্য করতে পারি না তা জানিস? আজ থেকে কোন দিন আর চোখের জল ফেলতে পারবি না তুই। বুঝলি—?

—কিন্তু আমার যে বড় ভয় হয় ভূতুদা।

—কিসের ভয়?

—আমার প্রতি তোমার যে এত দয়া, এত করুণা টিকবে তো জীবনে আমার?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

—আমার মত এমন একটা কুরূপা কুৎসিৎ মেয়েকে যে অহেতুক কৃপা করলে তুমি, কোনদিন আবর্জনা ভেবে ফেলে দেবে না তো দূরে? ঘৃণায় কখনও কাছ-ছাড়া করবে নাতো আমাকে?

—আমার প্রতি তোর এ সন্দেহের কারণ? গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ।

বলে উঠল সতী,—তোমার প্রতি আমার সন্দেহ নেই ভূতুদা। সন্দেহ হয় আমার এই পোড়া ভাগ্যটাকে। তোমাকে পাওয়ার পর থেকে মনের ভিতর থেকে অহরহ কে যেন আমাকে টিট্‌কারী করে বলে—সতী এত সুখ তোর সইবে তো কপালে? ভূতুদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কোনদিন আমাকে ঘৃণা করে দূরে ফেলে দিও না।

—দূর পাগলী, চাপা একটা ধমক দিয়ে বলে উঠল ভূতনাথ,—কি সব অবান্তর বকছিস। ছাড় পা উঠে দাড়া—

—ছাড়ব না পা। আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল সতী,—আগে মাথায় আমার হাত দিয়ে আশীর্বাদ কর তুমি, যেন তোমাকে আমি সুখী করতে পারি জীবনে। বর দান কর আমাকে যেন আমি তোমার এই অহেতুক কৃপার জীবন দিয়েও মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারি।

—শোন সতী, হাত ধরে তাকে তুলে ভূতনাথ বলে উঠল ভরিক্কি ভাবে,—তোর ওই সব কৃপা, করুণা, দয়া, মায়া, আমি বুঝি না। ওসবের ধারও ধারি না আমি কোনদিন। তবে একটা কথা আজ থেকে আমার শুনে চলতে হবে তোকে। আমার স্ত্রী হয়েছিস যখন তুই তখন আমার মতই তোকে নির্ভীক বেপরোয়া হতে হবে। জীবনে কাকেও কোনদিন আর ভয় করে চলবি না তুই। যার কথার যা উচিত জবাব তা তার মুখের উপরই স্পষ্ট ভাবে দিতে হবে তোকে।

সতী বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে ভূতনাথের মুখটার দিকে তাকাতেই আরো পরিষ্কার করে বলে দিল সে,—আজ থেকে তোর সংমায়ের কোনো কথা শোনা চলবে না তোর। যদি শুনিস্, তবে সে যা বলবে তুই তার ঠিক বিপরীত করবি। বুঝলি? সতীর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ কপাট খুলে হাত চাপড়ে চিৎকার করে উঠল মায়ার পার্টি—জমে গেছে, জমে গেছে।

মালতী এগিয়ে এসে বেশ বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে বলে উঠল,—বাবাঃ এত গুজুর ফুসুর। প্রথমদিনেই এতটা গভীরে চলে যাওয়া তো উচিত নয় ভূতুদা।

—মালা, গম্ভীরভাবে বলে উঠল ভূতনাথ,—ফাজলামি করতে এলে মার খাবি তুই।

—মার খাব মানে? বলে উঠল মালতী,— আমি মিথ্যে কথা বলছি? কই তুমি সতীদির গায়ে হাত দিয়ে তেমনি ভাবে বল দেখি যে আমরা দুজনে একলা ঘরে গুজুর-ফুসুর করিনি।

আগ বাড়িয়ে বলে উঠল মায়া,—ওসব গুজুর-ফুসুর নয় রে, প্ল্যান-পোগ্রাম সব ঠিক করে নিচ্ছিল নিজেদের মধ্যে।

—কিসের প্ল্যান? শ্যামলী জিজ্ঞেস করতেই বলে উঠল মালতী,—মধু যামিনীর। না হয় ফুল-শয্যার রাতটা কেমন ভাবে কাটাবে তারই হয়তো পোগ্রাম হচ্ছিল দুজনের। তাই নয় ভূতুদা—?

আবার বাঁধ ভাঙ্গল হাসির। এ হাসিতে মায়া তার দিদিকে আর যোগ না দেওয়া করিয়ে ছাড়ল না।—হাস, হাস, বলছি বলে সে সেই ছোটবেলার মত তার পায়ে শুড়শুড়ি ও কাতুকুতু দিয়ে ঠেলে দিল তাকে তার ভূতনাথ জামাইদা'র দিকে।

যাক গে ওসব কথা। বাসর রাতের হাসি স্ফূর্ত্তি যেমন চিরকাল থাকে না বিয়ের সানাই ও তেমনি নূতন পথে জীবনকে ঠেলিয়ে দিয়ে কেটে পড়ে। যথারীতি শুভকর্ম সুসম্পন্ন হল শাশ্বতীর। বৌভাতের পর আবার সে ফিরে এল বাপের বাড়ীতে। এবার কোন রকমে ওই সতীনের কাঁটাটাকে শ্বশুরবাড়ী বিদেয় করতে পারলে আপদ যায় জ্ঞানদার। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে তার। সেই ব্যবস্থাই করেছিল সে। বিয়ের আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষ

হতেই সতীকে সে জোড়ে দিন করে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল পতির ঘরে। কিন্তু মুখপোড়া তার স্বামী-দেবতাই দিল সব মাটি করে। মিনসের সুখে খেতে ভূতে কিলায়। ভূতনাথের বাবা বলাই বাড়ুজ্জের হাতে পায়ে ধরে সে প্রত্যাহার করিয়ে নিল তার জোড়ে দিন করার আদেশটা। সর্ব্বনেশের চটলগ্নে পট্‌ বিয়ে দিয়ে নাকি ভারী মনে কষ্ট। তাড়াহুড়োতে নাকি সতীকে সে সাধ মিটিয়ে কিছু দিতে পারে নি। ভালভাবে ব্যবস্থা করতে পারে নি কোন কিছুর। তাই বড় ইচ্ছা তার বৎসরান্তে দিরাগমন অনুষ্ঠান করে সতীকে সে বিদেয় করতে চায়। দিতে চায় তাকে তার মায়ের রেখে যাওয়া গহনা-গাটি, দানের বাসন-পত্র। ঘষে-মেজে একটু ব্যবস্থা করে না দিলে লোকে হাসবে যে। তাই তার কাছে এই সময়টুকুর প্রার্থনা। বিনাপণে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করলেও বাপ হয়ে মেয়েকে সে কোন রকমেই ফাঁকি দিতে পারবে না। মুখুজ্জে মশায়ের অনুরোধ বাড়ুজ্জে মশায় আর না রেখে পারলেন না।

কিন্তু এধারে শুরু হয়ে গেল জ্ঞানদা বনাম রাখহরি চাটুজ্জের খিটিমিটি। দিনের পর দিন মাত্রাটা তার বাড়তেই লাগল। কেলেঙ্কারী অশান্তির মূলকারণ হল সতীর মায়ের গহনা-গাটি ও বাসন-পত্র। মোদ্দা কথা হল—এ ঘরের গিন্নি যখন জ্ঞানদা তখন ওগুলো তার। এ সবের হকদার সে। তার সংসারের জিনিস সে ভূতের ঘাড়ে কিছুতেই ফেলতে দেবে না। আর ভাব ভালবাসা করে যখন বিয়ে হয়েছে সতীর তখন এসব দেনা-পাওনার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ? মুখপোড়ার যদি এতটুকু আক্কেল বুদ্ধি থাকে। মাথার উপর নিজের মেয়ে মায়া ডাগর হয়ে যে বিয়ের জন্য লাফাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই। কোথায় সতীর মায়ের আত্মা তাকে অভিশাপ দেবে, ফাঁকি দিলে তাকে জলে ভাসতে হবে, লোকে হাসবে তাকে —যতসব অবান্তর কথা। বুড়ো বয়েসে ভীমরতি ধরেছে মিনসের। কিন্তু তার বোকামির সঙ্গে সঙ্গ দিলে তো জ্ঞানদার চলবে না। বুদ্ধি করে বাগিয়ে গুছিয়ে সংসারটাকে না রাখলে বয়ে যেতে হবে যে তাকে।

মায়া অবশ্য মা-বাবার এসব দ্বন্দ্ব-কলহে কান দিত না। এসব তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তাই গ্রাহ্যও করত না সে। সেদিন কিন্তু বাবাকে হঠাৎ মায়ের উপর যাচ্ছে-তাই কথা বলতে দেখে বড় বেশী অবাক লাগল মায়ার। সাধারণত এ রকমটা হয় না। বাবা ভেজা-বেড়ালের মত চোখ কান বন্ধ করে বসে থাকেন আর মা একের পর এক তার বাপ-ঠাকুরদা চৌদ্দ-পুরুষ তুলে ব্রহ্মাস্ত্রগুলি প্রয়োগ করে যান। হঠাৎ তার এ স্বভাবের পরিবর্তন। ব্যাপার কি?

ব্যাপার বুঝতে স্কুলের বইপত্তরগুলো রেখেই সে গেল তার দিদির কাছে। দিদি বড় ঘরের কোণায় মেঝেতে বসে পালঙ্কের উপর বালিশে মাথাটা রেখে কাঁদছিল ফুঁপিয়ে। যা বাবা! হট্‌ করে দিদি তো চোখের জল ফেলে না! কিন্তু আজ হঠাৎ হল কি তার? অবাক হয়ে মায়া গেল শাশ্বতীর কাছে। মাথাটা নেড়ে তার জিজ্ঞেস করল তাকে, —এ দিদি, কাঁদছিস কেন রে?

সতী কোন উত্তর না দিয়ে তেমনি কেঁদেই চলল ডুকরে ডুকরে।

—কি মুস্কিল! কি হয়েছে আগে বলবি তো আমাকে? মা কিছু বলেছে?

কিন্তু সতী কখনও কি তাকে এসব কথার উত্তর দেয় যে তাকেতা বলবে? অদ্ভুত ভাবে নিজেকে সব সময় গুটিয়ে রাখা স্বভাব দিদির। নিরীহ, উত্তাপহীন, গোবেচারার জীবন তার। কখনও কোন ইগো বা কায়দা বলে নজরে পড়ার মত কিছু নেই তার দিদির। তার হঠাৎ এ কান্না দেখে বড় বেশী উতলা হল মায়ার মনটা। কিন্তু কোন কিছু না বললে—কিন্তু বলতে কেন হবে তাকে। মেয়েদের এ সময়কার মনের অবস্থা বুঝবার মত কি বয়স হয় নি মায়ার? বিবাহ-মুক্তা হলেও মায়া সদ্য বিবাহিতা বান্ধবীদের অভিজ্ঞতায় এ সব সম্বন্ধে যথেষ্ট কি ওয়াকিবহাল নয় সে?

পড়েনি কে সি বই-এ শুভমিলনের পর দুষ্মন্তর শকুন্তলাকে আশ্রমে রেখে চলে যাওয়ার পর শকুন্তলার মনের অবস্থা? সত্যি, ভূতুদা-টা যেন কি। বিয়ের পর আজ প্রায় তিন-চার মাস হল দিদির কোন খোঁজ খবর নেবার নাম নেই। চাকরির সন্ধানে মামার সঙ্গে ঘুরছেন নাকি তিনি বোকারো, দুর্গাপুর। নিকুচি করেছে চাকরির। যেন উনি রোজগার না করলে ঘরে হাঁড়ি চড়বে না। এতই যদি চিন্তা তার তবে দিদির গলায় মালা দিয়েছিল কেন সে? বিয়ে করে উনি ডো-ডো করে ঘুরে বেড়াবেন আর দিদি তার ঘরে বসে বসে চোখের জল ফেলবে

তা সে কিছুতেই হতে দেবে না। হঠাৎ উঠোন থেকে কানে এল মায়ার তার মায়ের ঝাঁঝাল গলা, —বিয়ে দিলাম তো কি হবে? তা বলে কি ওই ভূতটাকে জামাই আদরে আমার ঘরে এনে আড়ম্বর করে তার নিয়মভাঙ্গাবো? কুকুরকে তুলবো মাথায়? কখনও না।

—কিন্তু সমাজ-সংসারের যা নিয়ম তা পালন না করলে লোকে হাসবে যে। বলতেই বাবা ওমনি হঠাৎ গর্জে উঠলেন মা, —নিয়ম করে কি সে বিয়ে করেছিল? দেখা-শোনা গনন-গাথন কোন কিছু তোয়াক্কা না করে যে দুম্ করে ওমনি গায়ে পড়ে হেংলার মত বিয়ে করে তার আবার বিয়ের পর এত ঘটা করে নিয়ম ভাঙ্গানো কেন? বেঁড়ে কুকুরের লেজ-নাড়া শোভা পায় না বুঝলে?

—তা বলে বিয়ে দিয়েছি জামাই ঘরে আনব না?

—না, ধমকে উঠল জ্ঞানদা, —আপনা থেকে সে যেমন বিয়ে করেছিল আপনা থেকেই সে তেমনি শ্বশুর ঘর আসুক। যার যেমন মুরোদ তার তেমনি করাই উচিত। গাঁয়ের জামাই পথের কুকুর একই জিনিস। আসবে, মাড়-ভাত ফেলে দেব। খাবে, পালাবে। ওসব জামা-জুতো হেন-তেন করে তার নিয়ম ভাঙ্গাতেও তোমাকে দেব না আর তাকে আনতেও কাকেও পাঠানো হবে না। এই আমার সাফ কথা—বুঝলে?

শুনেই মায়ার বুঝতে আর বাকী রইল না দিদির কান্নার হেতু কি আর তার মা-বাবারই আজ হঠাৎ এমন ধুমক্ষেত্র গণ্ডগোলেরই বা কারণটা কি। ভূতুদা এসেছে মনে হয় ঘরে তাকে আনতে যাবার কথা উঠতেই মা বাবার সঙ্গে শুরু করেছে তুমুল সংগ্রাম। মায়ের কথাগুলো শুনে মায়ার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন জ্বলে গেল। রেগে সে জ্ঞানদার সামনে বলল,— ভূতুদাকে ওসব কথা বলতে তোমার এতটুকু লজ্জা করে না মা? বাবার সাতপুরুষের ভাগ্য ভাল যে ভূতুদার মত এমন মহান উদার একজন ব্যক্তিকে জামাই হিসেবে সে ঘরে পেয়েছে। ভূতুদা না হলে এই ঘরটার মান-ইজ্জত আজ কোথায় দাঁড়াতো জান? সমাজে আর মুখ দেখাতে পারতো বাবা? বিয়ে করে ভূতুদা শুধু দিদির নয় বাবার বংশটার মান-সম্ভ্রম রক্ষা করেছে। আর তুমি ওইরকম একটা হৃদয়বান মানুষকে পথের কুকুর, মুরোদহীন বল? ছি-ছি-ছি-ছি—

ধমকে উঠল জ্ঞানদা,—কি বলতে চাস তুই?

—বলব আবার কি? বলে উঠল মায়া—ঘরের জামাইকে যেমন মান-সম্মান আদর যত্ন করতে হয় তেমনি সব করতে হবে ভূতুদাকেও। নিয়ম ভাঙ্গাতে হবেই তার এবং আজই এক্ষুনি তাকে আনতে হবে ঘরে।

—তোর কথায় নাকি?

—হ্যাঁ আমার কথায়। বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল মায়া,—আচ্ছা মা, তুমি কেমন মানুষ বলতো? মা হতে না পার কিন্তু দিদির দিকে মায়ের দৃষ্টিতে তাকাবার মত চোখও কি নেই তোমার?

—চুপ কর তুই। ধমকে উঠল জ্ঞানদা—খবরদার বলছি ফাজলামি করতে আসিস না আমার সঙ্গে যেমন মেয়ে তেমনি থাক।

—আগে তুমি যেমন মেয়ে তেমনি থাকতে শেখ মা তারপর আমাকে বলবে। আক্কেল বুদ্ধির মাথা খেয়ে তুমি ঘরে বসে থাকতে পার কিন্তু বাবা পুরুষ মানুষ। তাকে সমাজ-সংসারে ঘুরতে হয়, মিশতে হয়, বসতে হয়। সুতরাং তাকে আমি জীবনে এমন কিছু কাজ করতে দেব না যাতে লোকে তাকে কথা বলে, অপদস্থ করে।

—কি করবি তুই? জিজ্ঞেস করতেই জ্ঞানদা বলে উঠল মায়া, —আমি এক্ষুনি চললাম ভূতুদার বাড়ী। যেমন করেই হোক আজই আমি তাকে ধরে আনব ঘরে। কিন্তু মনে রাখবে মা তুমি, এ বাড়ীতে ভূতুদার যদি এতটুকু অসম্মান হয় তবে আমার মুখ তুমি আর দেখতে পাবে না জীবনে। এই আমার শেষ কথা।

কথাগুলো ঝেড়ে বলে দিয়ে তেড়ে চলে গেল মায়া। অবাধ্য মেয়েটার দিকে মা বাবা উভয়েই তাকিয়ে রইল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে। শুধু ঘরেই নয় বাইরেও মায়ার সমান দাপট। বিশেষ করে ভূতুদার ঘরে তো সেসব কোন ব্যাপারই নেই। ভূতুদার মাকে বলতে গেলে সেই ছোট থেকেই বড়-মা বলে সে অধিকার নিয়ে ছিল তার হৃদয়ের স্নেহ-ভালবাসার বড় একটা অংশ। সেই অধিকারেই ভূতুদাকে সে হাতে ধরে টেনে তার বড়-মার সামনে এনে তেমনি আবদেরে সুরে বলে উঠল—আমি এখন ভূতুদার শালা-শালিকা যা বলবে তাই বড়-মা। সুতরাং নিতে এলাম ভূতুদাকে। এক্ষুনিই তাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে বাড়ী। বিশেষ দরকার।

ভূতনাথ মুখে বিরক্তি এনে প্রায় ধমকের সুরে বলতে লাগল তাকে,—কি মুস্কিল, আগে দরকারটা—কি বলবি তো?

—বলছি তো বিপদ। উত্তরে বলে উঠল মায়া,—আর দেরী করো না চল তাড়াতাড়ি। সেখানে গিয়ে নিজের চোখেই দেখবে ব্যাপারটা কি।

বড়-মার সামনে একরকম টেনেই নিয়ে চলল সে ভূতনাথকে। এ মেয়েটার আবদার তার মা যেমন কখনও কাটিতে পারে নি আজও তেমনি পারল না। কিন্তু এধারে জ্ঞানদার ভূতনাথকে দেখে সত্যিই ভূত দেখার মত অবস্থা হল। ওধারে রাখহরি চাটুজ্জে মশায়ও গেলেন যাকে বলে থ হয়ে। মায়া যে ভূতনাথকে সত্যিই ধরে আনবে আর জামাই বাবাজীবনও যে তার এমনি হুট করে এসে হাজির হবে ভাবতে পারে নি সে। কোথায় গেল জ্ঞানদার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে গুম হয়ে বসে থাকা তার। উঠতে হল তাকে। কারণ সে তো এখন আর তার কাছে বলরাম বাডুজ্জের বাউণ্ডুলে গেঁয়ো ছেলে ভূতো নয়। তার জামাই-ভূতনাথ। এ নাথের ঠিকমত ব্যবস্থা করতে না পারলে মায়া হবে তার উপর খাপ্পা। বরং জ্ঞানদার মুখ ঝামটা সহ্য করা যায়। কিন্তু তার ওই ছোট মেয়েটার গম্ভীর হয়ে তার দিকে তাকানোটা সে মোটেই সহ্য করতে পারে না। বলার চেয়েও মায়ার তার উপর ওই না বলা ভাবটা বড় বেশী আঘাত করে তার অন্তরটাকে।

মায়া ভূতনাথকে সোজা এনে হাজির করল তার দিদির ঘরে। শাশ্বতীর চাপা কান্না তখনও থামেনি। তাই ভূতনাথ যখন অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, —ফাজলামি রেখে এখন বিপদটা কি বল দেখি? তখন চাপা ধমকে তাকে বলে উঠল মায়া—আমি কি জানি, শুনতে পাচ্ছো না? ফেঁসেক-ফেঁসেক করে যে বিছানার কোনায় বসে কাঁদছে তাকে গিয়ে নিজের মুখেই জিজ্ঞেস কর না, বিপদটা কি?

ভূতনাথ শাশ্বতীর দিকে ফিরে তাকাতেই মায়া চট্‌-জলদি দরজার কাছে এসে বলে উঠল তার দিদিকে উদ্দেশ্য করে,—আমার ডিউটি শেষ দিদি, এবার তোর জিনিস তুই সামলা। চললাম আমি। বলেই মায়া বাইরে থেকে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা, ধমকে উঠল ভূতনাথ—মার খাবি মায়া। বাঁদরামি করিস না বলছি। কপাট খুল—খুল বলছি।

—হুঁ-হুঁ তোমার কথায় নয়। বার থেকে বলে উঠল মায়া—যতক্ষণ না দিদি বলছে ততক্ষণ এ কপাট খোলা হবে না। বুঝলে জামাইবাবু?

বলেই মায়া শিকলটা লাগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে গেল চলে। ঘরের মধ্যে বন্ধ রইল শাশ্বতী আর ভূতনাথ। মহা মুস্কিল! মস্ত ফাজিল হয়েছে মায়া। ওর পেটে এত দুর্বুদ্ধি আছে জানলে কিছুতেই ভূতনাথ এ ফাঁদে পা দিত না। কিন্তু কি আর করবে এখন। গেল গুটি গুটি সে শাশ্বতীর কাছে, —কি হয়েছে রে তোর? জিজ্ঞেস করল তাকে, —কাঁদছিস কেন এমন করে গুমরে গুমরে?

কান্না না থামিয়েই বলে উঠল সতী, —আমাকে এখানে আর রেখো না ভূতুদা'। এখানে থাকলে মারা যাব আমি। জানি আমি কুৎসিৎ কুরূপা। কোনদিক দিয়েই তোমার যোগ্য নই আমি। তবু যখন কৃপা করেছ আমাকে তখন দয়া করে তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে চল আমাকে সেখানে আমি বরং ঝি কামিনের মত থাকবো। কোনদিন তোমার কোন কাজের বাধা হব না আমি। শুধু আমাকে তোমার মা-বাবার সেবা করতে দেবে।

অবলা আজ হঠাৎ হরবলা হয়েছে! অভিমানের সুর! আশ্চর্য্য হল ভূতনাথ। ব্যাপারটা কি! এ অভিমান কি তারই উপর? বলে উঠল সে, —শোন সতী, বিয়ে করেছি যখন তখন ওই কুরূপা সুরূপা কথাগুলো আর তুলিস না। একলা ছিলাম যখন তখন বাপ-মায়ের কাছে হাত পাততে আমার লজ্জা হত না। এখন তুই এসেছিস আমার জীবনে তাই আর নিছক বাপ-মায়ের উপর আমি নির্ভর করে থাকতে চাই না। চাকরির সন্ধানে তাই এধার ওধার ছুটে বেড়িয়েছি বলে তোর কাছে আসতে পারে নি। অবশ্য এ ছুটোছুটি সার্থক হয়েছে আমার। মামার চেষ্টায় বোকারো থার্মল পাওয়ার প্রোজেক্টে গুরমিথ্ এণ্টার প্রাইজে একটা হেলপারের কাজ পেয়েছি আমি। মামার এক পাঞ্জাবী বন্ধু পাপ্পু ধীলন সুপার ভাইজারের আণ্ডারেই আপাতত থাকতে হবে আমাকে। তারপর—

—আমি সেজন্য তোমাকে কিছু বলছি না ভূতুদা, চাকরি করবে তুমি, বড় হবে। দাঁড়াবে নিজের পায়ে। সে

তো আমার আনন্দ ভুতুদা। বাবা ভূতনাথের কাছে দিনরাত আমি প্রার্থনা করি তোমার মঙ্গলের জন্য। দেখবে, তুমি একদিন নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠবে জীবনে। তুমি এখানের আর এক কপর্দকও নিও না ভুতুদা। এমনকি আমার মায়ের গহনা, তাঁর দানের বাসন-পত্র কিচ্ছু চাই না আমরা। তোমার রোজগারের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ই হয় যেন আবার জীবনের অলঙ্কার। তুমি এখান থেকে আমাকে নিয়ে চল ভুতুদা। তোমার বাড়ীর ক্ষুদ-কুঁড়ো যা জুটবে তাই আমার স্বর্গসুধা ভুতুদা। তাতেই সুখী থাকব আমি। আনন্দিত হব জীবনে। তবু এখান থেকে আমাকে উদ্ধার কর ভুতুদা। নিয়ে চল আমাকে।

—তোর কি হয়েছে বলতো? আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ—সাত চড়ে কোনদিন রা বেরোয়নি তোর, আজ হঠাৎ এত কথা বেরুচ্ছে কেন তোর মুখে? ব্যাপার কি?

—ব্যাপার কি আমাকে জিজ্ঞেস কর না ভুতুদা। কান্না জড়ানো স্বরে বলে উঠলো সতী, —আমি বলতে পারব না। বলতে আমায় মানা আছে। তুমি আমাকে নিয়ে চল তোমাদের বাড়ীতে। এই আমার শেষ কথা।

—আশ্চর্য্য। যার পর নাই বিস্মিত হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ, —স্বামী হয়েও আমাকে তুই কোন কথা জানাবি না? অথচ কেঁদে যাবি তুই আমার সামনে এমনি করে? বল, মায়া কেন ছুটে ডাকতে গেছল আমাকে? সত্যি তোর কি কিছু হয়েছে, না কেউ কোন কথা বলেছে তোকে?

বলবে কি, উত্তরের পরিবর্তে সতী ডুকরে উঠল কেঁদে। আচ্ছা ফ্যাসাদ তো! বলে উঠল ভূতনাথ,—শোন সতী, তুই যদি আমাকে কোন কিছু না বলে এমনি করে কেঁদে যাস তবে এক্ষুনি চলে যাব আমি। কি হয়েছে খুলে বল আমাকে।

কথায় বলে না—মেয়ে মানুষের বুক ফাটে তবু মুখ ফুটে না। তেমনি চাপা কান্নায় রহস্যাবৃত করে রাখল সে ভূতনাথকে। ভূতনাথের চঙ্-চড়া স্বভাবটা উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। ধমকে উঠল সে,—কাঁদ তবে তুই পড়ে-পড়ে। চললাম আমি বাড়ী।

কয়েক পা এ[illegible] যেতেই সতী ওমনি ঝট্পট্ উঠে গিয়েই ধরল ভূতনাথের পা-দুটো। তার জোড়া পায়ের উপর মাথা রেখে ক[illegible] দিয়ে তাকে বলে উঠল মিনতি ভরে,—এভাবে আমাকে এখানে ফেলে রেখে চলে যেও না ভূতদা।

—বেশ, তবে বল কি হয়েছে তোর?

সতী এধার ওধার তাকিয়ে ইতস্তত করে উঠতেই ভূতনাথ ধরল তার হাত।

বলল—চল, কোণের ওই বিছানায়। কোন ভয় নেই তোর। ওখানে বসে নিশ্চিন্ত হয়ে বলবি চল তোর সমস্ত কথা। বলেই হাতটা ধরে টানতে লাগল তার।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য টানতেই হাতটা যু-হু করে হঠাৎ যন্ত্রনা-কাতর স্বরে বলে উঠল সতী, আঃ। লাগছে ছাড়ো হাতটা। ছাড়ো না ভুতুদা।

কি ব্যাপার? আচমকা হাত ছাড়তেই সতীর কাঁধের উপর শাড়ীর আচলটা গেল সরে। আর সরতেই কাপড়টা দেখল ভূতনাথ তার ডান-হাতটার কাঁধের নীচে পিঠের উপর দগদগে একটা পোড়া-ঘা। পোড়া-চামড়ার জল-ভর্তি বিষ ফোটগুলো গলে যেয়ে বিশ্রী করে রেখেছে সে ক্ষতস্থানটাকে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ,

—এ কি? কি করে পুড়ল তোর এ জায়গাটা?

কিন্তু সতীর উত্তরের আগেই বন্ধ-দরজার বাইরে থেকে হঠাৎ "হো-হো-হা-হা" হাসির স্বরে কানে এল সন্ধ্যা বেলা, কেয়া-কাকলিদের কাকলি। শ্যামলীই বোধ হয় ভূত-নাথের স্বরটাকে অনুকরণ করে বলছে।

—"চল কোনের ওই বিছানায়। কোন ভয় নেই তোর। ওখানে বসে" ফিক-ফিকে হাসি। কি লজ্জা। উত্তরে তার সতীর গলা নকল করে বলেছে তারই কনিষ্ঠা ভগিনী মায়া দেবীই, "আঃ লাগছে, ছাড়ো হাতটা। ছাড়োনা ভুতুদা।"

মূল পাণ্ডা মায়ারই মনে হয় কাণ্ড এ[illegible]র ঢুকিয়ে তাকে কপাট বন্ধ করে ডেকে এনেছে তার বান্ধবীদের। সকলে মিলে আড়ি পেতে কথাগুলো তাদের শুনে, নকল করে মজা লোটা হচ্ছে এখন। ফাজলামি! দিদিকে

এমনি বিপদের মুখে ফেলে তাকে ডেকে এনে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে হাসি মসকরা করতে লজ্জা করছে না মায়ার। তাদের ওমনি হৈ-হুল্লোড়ে হাসাহাসি আর বাদরামির কথা শুনে রেগে উঠল ভূতনাথ। দরজা গোড়ায় গিয়ে ভিতর থেকে কপাট চাপড়ে ধমকে উঠল তাদের,—ফাজলামি করতে লজ্জা করেন না তোদের? মায়া, খুল কপাট। কপাট খুল বলছি।

—হুঁ-হুঁ দিদি না বললে নয়। বার থেকে বলে উঠল মায়া।

—মার খাবি মায়া। গর্জে উঠল ভূতনাথ,—খোল বলছি কপাট।

কিন্তু কপাট খুলবে কি—সেই ইয়ার্কি, সেই ফাজলামি। চল বিছানায়, আঃ লাগছে, ছাড়ো না ভূতুদা ইত্যাদি তাদের নকল করা কথাগুলো আওড়ে সমানে তারা চালিয়ে যেতে লাগল তাদের হাসি-মসকরা। শ্যামলী আবার টিপ্পনী কেটে ভূতনাথকে উদ্দেশ্য করে বা'র থেকে সুর করে বলে উঠল—কত রঙ্গ জান তুমি কৃষ্ণ কানাইয়া। প্রেম-মধুতে মজলে কারো উঠে কি হিয়া? ভূতুদা পীরিতী কাঁঠালের আঁঠা লাগলে পরে ছাড়ে না।

—ও ভূতুদা, এই তুমি ব্রহ্মচারী? পিয়ালী বলে উঠতেই ওমনি ভিতর থেকে গর্জে উঠল ভূতনাথ:—এক চড়ে তোদের সকলের দাঁতপাটিগুলো দেব ঝেড়ে। কপাট খুল বলছি। নইলে ভেঙ্গে দেব দরজাটা।

মেজাজ ভাল নয়। রেগে গেছে ভূতুদা। বাড়াবাড়ি করলে হয়তো হিতে বিপরীত হবে। ভয়ে তারা তাই দিল কপাটটা খুলে, বেরিয়েই ভূতনাথ ঝাপটে ধরল মায়ার ঘাড়টা। ধরেই তাকে হিড় হিড় করে টানতে লাগল ভিতরের দিকে,—কি মুস্কিল! এমনি বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতেই বলে উঠল মায়া, দিদিকে তো দিয়েছি, আমার আমাকে টানছ কেন? আমি কি তোমার বিয়ে করা বৌ?

ধমকে উঠল ভূতনাথ,—তোর দিদির এই অবস্থায় ফাজলামি করতে লজ্জা লাগে না তোর?

—কেন, কি হয়েছে দিদির? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মায়া।

—কি হয়েছে তুই জানিস না? আমাকে ডাকতে গেছলি কেন?

—কেন আবার! বলে উঠল মায়া—দিদি কাঁদছিল বলে। তুমি ছাড়া তার কান্না থামাবে কে? তাই ডেকে আনলাম তোমাকে।

—কিন্তু কেন কাঁদছিল সে? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করতেই ওমনি মুখ বাঁকিয়ে বলে উঠল মায়া,—সেটা তুমি জানবে। ওসব ব্যাপার আমার ডিপার্টমেন্টের নয়। তোমার এক্তিয়ারের।

—আবার ফাজলামি। বলেই মায়াকে হাতটা ধরে সতীর দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতেবলতে লাগল,—আয়, কেন কাঁদছিল দেখবি আয়, সরা তো সতী তোর কাঁধের কাপড়টা।

ভয়ে সতীর মুখটা ফেকাশে হয়ে গেল। দেখাতে ইচ্ছা না থাকলেও ভূতুদার আদেশ তাই তার কথায় সে শঙ্কাভরা হাতে সরাল কাঁধের আঁচলটা। ভূতনাথ তার পিঠের পোড়া ঘাটা দেখাতেই চমকে উঠল মায়া। এ্যাঁ! কি সাংঘাতিক।

—এ কি। এভাবে কি করে পুড়লি তুই? বলে উঠল মায়া।

সতী চুপ। মায়া নাড়া দিতেদিতে তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল কান্না চাপা গলায়—বল? পিঠের দিকে পুড়েছিস যখন তখন নিশ্চয়ই তোকে কেউ পুড়িয়ে দিয়েছে। বল তোকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে পোড়ালো কে?

শাশ্বতীর মুখে তবু কোন সাড়া—শব্দ নেই।—না বলিস তো তুই আমার মাথা খাস। বল এ সব্বনাশ কে করল তোর?

—বলতে ওর মানা আছে। বেশ একটু ভ্রূ-কুটি কুটিল ভঙ্গীতে বলে উঠল ভূতনাথ—কিন্তু যেই মানা করুক পতিপরম গুরু স্বামী দেবতা যখন তখন আমি তো সকলের বড়। সেই আমি, তোকে আমার দিব্য দিয়ে বলছি—তবু বলবি না এ অবস্থা কি করে হল তোর?

পতি দেবতার দিব্যটাকে আর ঠেলতে পারল না সতী। তাই বলতে বাধ্য হল সে। উঠোনের জোলে নাকি অন্যান্য দিনের মতই ধান সিদ্ধ করছিল সে। হঠাৎ রান্না ঘরে হুড়মুড়-দুড়দাড় হাঁড়ি-কুঁড়ির হড়কে পড়ার শব্দ

উঠতেই ছুটে দেখতে গেল সতী। ভাবল হয়তো ভাতের হাঁড়ি খেতে রান্না ঘরে কুকুর ঢুকেছে কিংবা বেড়ালে দুধ খেতে গিয়ে শিকড়-হাঁড়ি-খোলা সবশুদ্ধো উল্টে ফেলেছে। কিন্তু যেয়ে যা দেখল তাতে দস্তুর মত অবাক হয়ে গেল সতী। চক্ষু হয়ে গেল তার চড়ক গাছ! কুকুর নয়, বেড়াল নয়—রান্না ঘরে তার স্বয়ং সৎ মা! আর এর চেয়েও আশ্চর্য্য লাগল সতীর দেখল মায়ের হাতে সেই লাল শালুর পুঁটুলিটা। যেটায় বাবা তার মায়ের গহনাগুলো বেঁধে রেখেছিলেন লুকিয়ে। কিন্তু এটা এদ্দিন খুঁজে পান নি বাবা। যথাস্থানে খুঁজে না পাওয়াতে প্রায় পাগলের মত হয়ে গেছলেন তিনি। দুশ্চিন্তায় খাওয়াও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছল তার। সেদিন হঠাৎ সৎমাকে সন্দেহ করাতে বাবার সঙ্গে তার ধূমক্ষেত্র গোণ্ডগোল। সে গণ্ডগোলের জের ধরে প্রায়ই চলত উভয়ের মধ্যে। নিশি দিন লেগেই থাকত ঝগড়া-ঝাটি খিটি-মিটি। আগুন ধোঁয়াতেই থাকত সারাক্ষণ। সামান্য কিছু সূত্র পেলেই ওমনি উঠত দাও দাও করে জ্বলে। কোন কালাকাল বিচার ছিল না তাদের। মানত না কোন লোকজন, বাধা বিপত্তি। দুপুর-বিকাল, সন্ধ্যা-সকাল। মা বাবার উপর বুড়ো-মিনসের মতিভ্রম হয়েছে, ঘাটের মড়ার ভীমরতি ধরেছে, নদী ভরা মনের ভুলে কোথায় কি রেখেছে তার ঠিক নেই আর দোষ দিচ্ছে আমাকে? আমাকে চোর ঠাওরালে মুখ পোড়ার মুখে আগুন দেব, বুকে শ্মশানের মুড়ো চাপাব ইত্যাদি নানা অকথা কুকথা মুষলধারায় বর্ষণ করত যতক্ষণ না বাবা সামনে তার হাত জোড় করে আত্মদোষ দোষ স্বীকার করতেন। যতক্ষণ না তিনি সমানে তার নাকখত ও নিজের হাতে কানমলা দিয়ে ঘাট হয়েছে বলে আত্মাপরাধ কবুল করতেন ততক্ষণ তার গাল মন্দ রূপ অগ্নিবৃষ্টি বন্ধ হত না। সেই গহনার পুঁটুলিটা তার সৎমায়ের হাতে দেখে দস্তুর মত ভ্যাবাচেকা খাওয়ার মত অবস্থা হয়ে গেল সতীর। দাঁড়িয়ে রইল সে অবাক বিস্ময়ে দরজা গোড়ায় নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে।

পুঁটুলিটা মনে হয় সবার অলক্ষ্যে রান্নাঘরের কোনার কোন হাঁড়ির ভিতর লুকিয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন মা। তাড়াতাড়িতে হাঁড়ি হড়কে পড়াতেই তার এই বিপত্তি। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এধার ওধার তাকাতেই দরজা গোড়ায় তার নজর পড়ল সতীর উপর। দেখেই তিনি ধমকে উঠলেন তাকে—হারামজাদী তোর বাপ কি তোকে আমার উপর চর রেখেছে যে তুই লুকিয়ে লুকিয়ে আমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? বেরো এখান থেকে।

—তা নয় মা, থতমত খেয়ে বলে উঠল সতী,—শব্দ উঠতেই ভাবলাম হয়ত ভাতের হাঁড়ি খেতে কুকুর ঢুকেছে কিংবা খোলার দুধ খেতে গিয়ে বেড়ালে শিকা ছিঁড়েছে তাই ছুটে রান্নাঘরে দেখতে এলাম আমি।

—দেখতে এলি তুই ধান সিদ্ধ ছেড়ে দিয়ে? আমার সঙ্গে চালাকি? বেরো বলছি এখান থেকে। যা, যেমন ধান সিদ্ধ করছিলি তেমনি কর গিয়ে।

কিন্তু যাবে কি সতী, সেই বাসর রাতে ভূতুদার দেওয়া নির্দ্দেশটা যে তার মনে পড়ে গেল। সৎমায়ের কোন কথা শোনা চলবে না তার। যা বলবে ঠিক তার উল্টো করতে হবে তাকে। তাই সেখান থেকে আর নড়ল না সতী। বিয়ের রাতে স্বামীর আদেশ—নির্ভীক, বেপরোয়া হতে হবে তাকে। তাই মনে হয় সে তার সৎমায়ের শত ধমক, গালমন্দ, ভয় দেখানো ইত্যাদি কোন কিছুই গ্রাহ্য করল না। দাঁড়িয়ে রইল সে তেমনি ভাবেই। জ্ঞানদার রক্ত চাপল মাথায়। রাগে লোপ পেল তার কাণ্ড জ্ঞান। ক্রধোন্মত হয়ে সে উঠোনের জোলটা থেকে গসগসে একটা জুমড়ো কাঠ বিদ্যুৎ গতিতে তুলে এনে বসিয়ে দিল সতীর পিঠটার উপর। জ্বলনে চিৎকার করে উঠল সতী। ওমনি সৎমা তার ভূতনাথের দিব্য দিয়ে বন্ধ করে দিল তার মুখটা। শুধু তাই নয় এমন নিষ্ঠুর নির্দ্দেশে নিষেধ করে দিল তাকে যে-সে যদি তার এই কাণ্ড বা গহনা চুরির ব্যাপার ভুলেও কারো কাছে প্রকাশ করে কোনদিন তবে তাকে তার ওই স্বামী ভূতনাথের মরা মুখ দেখতে হবে। সিঁথিতে আর সিন্দুর পরতে হবে না তাকে।

বলেই সতী আবার কেঁদে উঠল ঢুকরে। শুনে সবাই যারপর নাই বিস্মিত হয়ে তাকাতে লাগল পরস্পরের মুখের দিকে। ব্যাপারটা আর বুঝতে কারো বাকী রইল না। সতীর ভয়ার্তভাব দেখে গম্ভীর হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ—আর এখানে এক মুহূর্ত্তও নয়। চল তুই এক্ষুনি আমার সঙ্গে বাড়ী।

কিন্তু হঠাৎ রুদ্রমূর্ত্তি ধরল মায়া। চোখ দিয়ে তার ঠিকরে পড়তে লাগল আগুন। ক্ষোভে দুঃখে অপমানে

তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল থর থর করে। যত রাগ পড়ল গিয়ে তার মায়ের উপর। বিদ্যুৎ গতিতে তাই সে ছুটে গেল রান্নাঘরে। মায়ের তার সামনেই তাকের বাসন, কোনার হাঁড়ি, আলমারির জিনিসপত্র বের করে ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেলে একেবারে সে তছনছ করে দিতে লাগল। মা বোকে, ধমকে, বাধা দিয়ে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারল না তাকে। চিৎকারে তার ছুটে এল ওপাশের বড় ঘরের বারান্দা থেকে কেয়া, কাকলি, বেলা, শ্যামলী ইত্যাদি মায়ার বান্ধবীর দল। তাদের সামনেই মেয়েকে তার ধমকে বলে উঠল জ্ঞানদা, —এসব কি পাগলামি করছিস তুই? কি করেছি আমি তোর? কি দোষ হয়েছে আমার?

—কি দোষ হয়েছে দেখবি? ফুঁসে বলে উঠেই মায়া ছুটল উঠোনের সেই ধান-সিদ্ধ করা জোলটার দিকে। মুহূর্তে উনুন থেকে একটা আধজ্বলন্ত কাঠ তুলেই সে বসিয়ে নিল তার নিজের পেটটার উপর। সঙ্গে সঙ্গে বান্ধবীরা তার ছুটে এসে ভাগ্যে কাঠশুদ্ধো হাতটা তার নিল ধরে। নইলে রাগের মাথায় সে যে আরো কি করত কে জানে।

কেঁদে, চিৎকার করে ছুটে এল তার মা। ওধার থেকে ছুটে এল সতী, বলে উঠল সে কাঁপা গলায়—একি সর্ব্বনাশ করলি তুই?

পরিবর্তে মায়া ধমকে উঠল সতীকে,—খবরদার বলছি, ছুঁসনা আমাকে। আমি তোর কেও নই। কোন দিন তুই আর দিদিগিরি ফলাতে আসিস না আমার কাছে। দূর হয়ে যা তুই আমার সামনে থেকে। তুই আমার পর পর পর।

থমকে গিয়ে সতী বলে উঠল তাকে কান্না জড়ানো গলায়—এমন কেন তুই বলছিস আমাকে বোন? কি দোষ করেছি আমি তোর?

—দোষটা তোকে আরও আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে আমাকে? তেমনি রাগতঃ স্বরেই বলে উঠল মায়া—এত কাণ্ডের পরও তুই কিচ্ছু জানাসনি আমাকে? আমি তোর এমন পর যে জিজ্ঞাস করা সত্ত্বেও তুই ঘরের কোনায় বসে বসে বরং কাঁদতে লাগলি তবু একটা কথাও বললি না আমাকে? মুখপুড়ি, আমি তোর কি দোষ করেছিলাম বল? কেন তুই এভাবে ছোট করে দিলি আমাকে ভূতুদার কাছে? বলেই মায়া ফেটে পড়ল চাপা কান্নায়।

ভূতনাথ ওমনি মায়ার পাশে এসে বলে উঠল দরদ ভরা স্বরে, —ছিঃ মায়া কাঁদছিস কেন তুই? আমি কি তোকে কোনদিন খারাপ কিছু ভাবতে পারি?

ভূতুনাথের পা দুটো জড়িয়ে মায়া ওমনি কান্না ভরা গলায় বলে উঠল তাকে, —তুমি বিশ্বাস কর ভূতুদা, দিদি আমাকে কিছু বলেনি। এসবের কোন কিছুই জানি না আমি। তুমি ভুল বুঝ না আমাকে।

—আমি তোকে জানি মায়া। বুঝি আমি তোকে। বলে উঠল ভুতনাথ, —কেন তুই মুহূর্তের উত্তেজনায় এমন সর্বনাশ করতে গেলি বলতো? তোর কথায় কোন সন্দেহ করেছি আমি কোন দিন? তবে কেন তুই এভাবে আমার বিশ্বাস উৎপাদন করতে গেলি? ছিঃ কি সর্ব্বনাশ করলি বলতো? দেখি তোর পেটটা।

পোড়াটা সামান্য হলেও অবহেলা করার মত নয়। তাই ভূতনাথ শ্যামলী কেয়াদের আদেশ করল তাড়াতাড়ি তার ঘরের টেবিল থেকে বার্ণল ও ফাষ্ট এডের বাক্সটা আনতে। ছুটল তারা। কিন্তু মায়া এধারে মাথা ঝাঁকরে বলতে লাগল তাকে যে কোন কিছুই করতে হবে না তার। কারণ মরতে তাকে হবেই। তা না হলে-নাকি মায়ের তার এপাপের উপযুক্ত শাস্তি হবে না। যাবে না তার মৃত্যু ছাড়া দিদির উপর তার মায়ের অহেতুক আক্রোশ।

—দূর পাগলী, ধমকে উঠল ভূতনাথ,—স্বার্থপরের মত কথা বলছিস কেন! তুই কি আলাদা? আমার কাছে তোরা দুজনেই সমান। তুই মরলে আমার কি অবস্থাটা হবে বলতো? তোকে আমি মরতে দিতে পারি কখনও? ভূতুদার কথায় শান্ত হল মায়া। ওধারে খবর পেয়ে হঠাৎ রাখহরি চাটুজ্জেও ছুটে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। রাগের মাথায় এই হট্‌কারিতা করায় তিনি ধমক দিলেন জ্ঞানদাকে। কিন্তু এসব ঘরের কথা। ওপর দিকে থুতু ছুঁড়লে নিজেদেরই গায়ে পড়ে। সুতরাং ব্যাপারটাকে নিয়ে আর বেশী গোলঘাট করতে নিষেধ করলেন তিনি। ঠাণ্ডা হল বটে সবকিছু কিন্তু গোল বাঁধল হঠাৎ ভূতুদার যাবার সময়। এক্ষুনি সে চলে যাবে বাড়ী তা

শুধু নয়—সঙ্গে করে নিয়ে যাবে সে সতীকেও।

—সে কি কথা! অবাক হলেন রাখহরি চাটুজ্জে। কারণ সতীকে যে দিরাগমন করে বিদেয় করবে এ খবরটা জানে গ্রামের সবাই। ভূতনাথের মা-বাবার মত নিয়েই তার মেয়ের আনুষ্ঠানিক বিদায়ের যোগাড় যন্ত্র, ব্যবস্থা-পত্র করে চলেছে সে। হঠাৎ এখন পাঠিয়ে দিলে লোকে মনে করবে কি? গাঁয়ের লোকের কাছে যে ছোট হয়ে যাবে সে। সুতরাং নিষেধ করে উঠলেন তিন ভূতনাথকে সতীকে যেন না নিয়ে যায়।

কিন্তু জ্ঞানদা দিল চাটুজ্জেমশায়ের উপর গোমূত্র ফেলে। তার মুখ-ঝামটানো স্বভাবজ সুরে বলে উঠল সে,—মেয়ে যাবে শ্বশুর বাড়ী তাতে লোকের বলাবলির কি আছে? গাঁয়ের লোকেইবা এতে মনে করবে কি? বাপ কি মেয়ের বিয়ে দেয় চিরকাল তাকে নিজের বাড়ীতে পুষে রাখার জন্য? ধাংড়ি মেয়ে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা করবে কখন? জামাই নিয়ে যেতে চাইছে যখন বিদেয় করে দাও।

—তুমি থাম তো! ধমকে উঠলেন চাটুজ্জে মশায় তার স্ত্রীকে, বিদেয় করব বললেই তো আর ওমনি পাঠানো যায় না। প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাবে যখন তখন মেয়েটাকে তো ওমনি শুধু হাতে বিদেয় করা যাবে না। তার তো একটা ব্যবস্থা আছে?

—ব্যবস্থা মানে তো তোমার দিরাগমনে ঘরের সর্ব্বস্ব খুইয়ে লোকের কাছে আদিখ্যেতা দেখানো। মাথার উপর মায়া বড় হয়ে আছে সে খেয়াল আছে তোমার? এ সময় বড় মানুষী ঠাট দেখাতে লজ্জা করে না তোমার? গাঁয়ের একটা বেকার উড়নচণ্ডী ছেলে, জোর করে কেলেঙ্কারী করে মেয়েকে তোমার বিয়ে করেছে। তাকে এত ঘটা করে খাট পালঙ্ক সোনা-দানা দিয়ে বিদেয় করার বাহাদুরী দেখানোর কি দরকার তোমার? মুরোদের নেই সীমে, পঁচা মাছে গিমে। উনুন মুখো দেবতাদের ঘুঁটের ছাই নৈবেদ্য দিয়েই বিদেয় করতে হয়।

শেষের কথাটা যে ভূতনাথকেই উদ্দেশ্য করে বলা তা আর জানতে বাকী রইল তার। তাই নিভন্ত আগুনে আবার ঘি পড়ল ভূতনাথের। জ্বলে উঠল সে। গর্জে বলে উঠল সে সতীকে উদ্দেশ্য করে—আর এক মুহূর্ত্তও এখানে তোর থাকা চলবে না সতী। যে কাপড়ে আছিস সেই কাপড়েই তুই বেরিয়ে আয় আমার সঙ্গে। এ ঘরের কানা কড়িও যেন না আসে আর তোর সঙ্গে। থুতু ফেলি আমি তোর বাপের জিনিসে। ধমকে উঠল মায়া তার মাকে—তোমার কি কোন বুদ্ধি-শুদ্ধি বা লাজ-লজ্জার এতটুকু বালাই পর্য্যন্ত নেই মা। এত কাণ্ডের পরও তুমি এসব কথা বলতে পারছো? আমার বিয়ে দেবে তুমি? জীবনে আমি বিয়েই করব না। দেখি তোমার কোন বাপের সাধ্য যে জোর করে আমার বিয়ে দেয়। বলেই মায়া জড়িয়ে ধরল ভূতুদার পা দুটো—মায়ের কথায় তুমি কিছু মনে কর না ভূতুদা। দিদিকে তুমি নিয়ে যেও না। তোমার কাছেই তো দিদি থাকবে চিরকাল। এই পৌষমাসটা অন্তত তুমি দিদিকে আমার কাছে থাকতে দাও। শেষবারের মত বেশ জাঁক করে ঘরে আমাদের দুজনে মিলে পাতব টুসু। আড়ম্বর করে করব টুসুর জাগরণ। থাক দিদি এখন।

কিন্তু ভূতনাথের একবার মাথার পোকা নড়লে সহজে কি শান্ত হয় কখনও ? বাবা কত বোঝালেন, পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস। এ মাসে ঘরের কুকুর বেড়াল পর্য্যন্ত কাকেও তাড়াতে নেই বাবা—অমঙ্গল হয়। সতীকে তুমি অন্ততঃ এই পৌষ মাসের কটা দিন থাকতে দাও। মাঘ পড়লেই নিয়ে যাবে তুমি।

কিন্তু না। ভূতনাথের একবার মুখ থেকে কথা বেরুলে তা নড়চড় হবার নয়। বলেছে যখন সতীকে নিয়ে যাবে সে তখন নিয়ে সে যাবেই। এখন উপায়। ছুটল মায়া ভূতুদার বাড়ী। বড়-মা অর্থাৎ ভূতুদার মা ছাড়া ওই একরোকা ছেলেটার ঝোঁক সামলাতে পারবে না কেউ। মায়ার কথা শুনেই বড়-মা ভূতনাথের বাবাকে দিল পাঠিয়ে—এরকম তো ঝোঁক করা উচিত নয় ভূতোর। সত্যিই ছেলেটার কোন কিছু মানামানি নাই। উঠল বাঈ তো কটক যাই। বরের কুলবধূ সে। এই প্রথম আসবে শ্বশুর বাড়ী। দ্বিরাগমন—অনুষ্ঠানটা যদি না করতে দেয় সে না দিক। কিন্তু সব কিছুর একটা বিধি নিয়ম আছে তো? পৌষ মাস পড়ন্ত সন্ধ্যায় বৌকে ওমনি আনলেই হল! ঘর সংসারের লেগ-দস্তুরে তো তার গোঁয়ার্তুমি মেনে চললে হবে না। অনতে হয় তো মাঘমাসে সে আনবে বৌকে।

ভূতনাথের বাবাকে ঘর থেকে বের করেই মায়া এক ঝট্‌কে এসে হাজির হল আবার নিজেদের বাড়ীতে।

সতী শকুন্তলা তখন পতিগৃহে যাবার জন্য প্রস্তুত। আহা! মরি মরি কি সুন্দর বেশ তার, ঢঙ্! পরে আছে সেই আধময়লা শাড়ীটা। বগলে আছে গামছায় বাঁধা মনে হয় তারই ব্যবহৃত শায়া-ব্লাউজ ও শাড়ী দু-একটা। কিন্তু এসব দেখে মায়া ততটা আশ্চর্য্য হল না যতটা অবাক হল সে ভূতুদা'র মতের পরিবর্তন দেখে। বাগ্ বিতণ্ডায় কোন্দলটা কোথায় দাঁড়িয়েছিল কে জানে, উগ্রমূর্ত্তিতে হাত নেড়ে ভূতুদা বলে চলেছে তার মাকে,—মায়ার বিয়ে দেব আমি তবু এখানে সতীর যা আছে তার এক কর্পদকও আমি ছাড়ব না আপনাদের। শুধু সতীর মায়ের গহনা-গাটি, দানের বাসন-পত্র নয়, তার মায়ের নামে যেখানে যা জমি জায়গা আছে সে সবেব হকদার সতী। আপনি নন। সুতরাং তার জিনিস আর আপনাদের ভোগ করতে দেব না আমি।

দেখে শুনে তো তাজ্জব বনে গেল মায়া। দিদি তার পুতুলটার মত দাঁড়িয়ে, বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে কথা কাটাকাটি চলেছে শুধু মা ও ভূতুদা'র মধ্যে। ব্যাপার কি? কিছুক্ষণ পর বলে উঠলেন বাবা—পরের কথা পরে হবে বাবা, আপাতত তুমি আজকের দিনটা অন্ততঃ ক্ষান্ত দাও। দিনক্ষণ না দেখে এই কাল-সন্ধ্যায় মেয়েকে বিদেয় করলে যে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে।

মুখের কথা তার কেড়ে নিয়ে বেশ মেজাজের স্বরে বলে উঠল জ্ঞানদা—স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী যাবে তাতে এত দিন-ক্ষণ দেখার কালাকাল বিচার করার কি আছে। পর-শত্রু, ঘরের আপদ যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হয় ততই মঙ্গল।

—আঃ থামবে তুমি? ধমকে উঠলেন চাটুজ্জে মশায়,—ঘরের গরুর গাড়ী, বলদ সব আছে কিন্তু মুনিসটা ডেকে সেটা জুড়তেও একটু সময় দিবে তো।

—এপাড়া থেকে ও পাড়া যাবে তাতে আবার গাড়ী-ঘোড়া কি দরকার? তেমনি ঝাঁঝ করে গলায় বলে উঠল জ্ঞানদা—এইটুকু তো পথ, হেঁটেই যাক না। এক পয়সার পুনকো শাক—যেমন মুরোদ তেমনি থাক। উড়ে এসে জুড়ে বসে যে জমি-জায়গা ধন সম্পত্তির অংশ নেব বলে তার জন্য এত ঘটা কেন?

—নেব বইকি, নিশ্চয়ই নেব। সতীর অধিকারের সব জিনিস আমি কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়ে প্রমাণ করে দেব যে মুরোদ আমার আছে কি না। বলেই ভূতনাথ ধরল সতীর হাত। টানতে টানতে বলতে লাগল তাকে,—চলে আয় সতী, তোর অধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত আর এক পাও থাখিস না তুই এখানে।

হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল তার মায়া। পথ আগলে বলে উঠল তাকে—না ভূতুদা, দিদিকে আমি কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না তোমাকে। ধমকে উঠল সে সতীকেও—আর তুইও কেমন মেয়ে বল তো দিদি—চল বলতেই কাঁধে ঝুলি?

—তুই জানিস না মায়া। বলে উঠল ভূতনাথ—তোর মায়ের যা কথা, যা আচরণ আমার এবং তোর দিদির উপর তাতে আর এক দণ্ডও থাকা উচিত নয় এখানে।

মাথা নেড়ে উঠল মায়া—আমি কিছু জানতে চাই না আর কিছু শোনতেও চাই না ভূতুদা। বলেই অমনি সতীর বোচকাটা এক ঝট্‌কায় তার বগল থেকে ছিনিয়ে নিল মায়া, বলে উঠল সে,—দিদির যাওয়া হবে না। এই আমার সার কথা। এবং একথা রাখতেই হবে তোমাকে।

—শোন মায়া। বলে উঠতেই ভূতনাথ, মায়া দিল তার কথাটা থামিয়ে। বলে উঠল সে,—তুমি কি বলবে তা আমি জানি ভূতুদা। তাই উত্তরটা শুনে নাও আমার কাছ থেকে। এরপর থেকে দিদির সব দায়িত্ব আমার। শুধু মা কেন, এঘরে দিদির উপর আর যদি কেউ কোনদিন কিছু বলে বা করে তবে আমি তার মোকাবিলা করব ভূতুদা। নিশ্চিন্ত থাক তুমি। এবারের মত আমার কথা রাখ। দিদিকে তুমি এখন নিয়ে যেও না ভূতুদা।

—কিন্তু তুই তো জানিস মায়া, বলে উঠল ভূতনাথ—আমি কোনদিন আমার কথার খেলাপ করি না। সুতরাং বলেছি যখন তখন দিদিকে তোর নিয়ে যেতে হবেই আমাকে।

হঠাৎ ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে বলে উঠল তার বাবা, বলরাম বাড়ুজ্জে—তোর কথাই কি সব? আমাদের কি কথার কোন মূল্য নেই?

বলরাম বাড়ুজ্জের এই হঠাৎ আগমনটা সত্যিই হতচকিত করে দিল সকলকে। গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন তিনি ভূতনাথকে, শোন ভূতো, আপনার ইচ্ছায় বিয়ে করেছিস, কিচ্ছু বলিনি। কিন্তু ঘর-সংসারের নিয়ম

কাননে তোর খামখেয়ালী বা জেদ আর চলতে দেওয়া হবে না। আমি আগে মরি তারপর ঘরের মালিক হয়ে কর্ত্তাগিরি ফলাবি তুই। আমি বেঁচে থাকতে তোর যা-ইচ্ছে তাই করে বেড়ান চলবে না।

ধমকে বোধ হয় থমকে গেল ভূতনাথ। তাই নরম স্বরে বলে উঠল সে তার বাবাকে, —শোন বাবা, কর্ত্তা গিরি আমি ফলাইনি। তবে

—ফলাসনি তো নিয়মভাঙ্গার আগেই তুই আমার মত না নিয়ে শ্বশুর ঘরে এলি কেন? তেমনি গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন বলরাম বাড়ুজ্জে—আর এলিই যদি তবে আমাদের অমতে বৌকে তুই এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্য গোঁ ধরলি কেন?

—সে কথাটাই তো বলছি। শোন তুমি।

—আমি তোর কোন কথা শুনতে চাই না। ধমকে উঠলেন বাড়ুজ্জে মশায় তার ছেলেকে, —সতী এখন আমার বংশের কুলবধূ। সেই ঘরের লক্ষ্মীকে পৌষমাসের এই কাল সন্ধ্যায় নিয়ে যেয়ে তাকে অমঙ্গল ঘটাতে আমি দেব না। আমার ঘরের বৌকে আমি আর পাঁচটা ঘরের বৌ-এর প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার মত মর্য্যাদা দিয়েই সংসারে নিয়ে যাব। তোর গোঁয়ার্তুমির শিকার হতে দেব না তাকে।

—আমার কোন আপত্তি নেই। বলে উঠল ভূতনাথ—জিজ্ঞেস করে দেখ সতীকে এ যাওয়াতে ওরও মত আছে কিনা। বলতো সতী?

শুনেই সতী যেন লজ্জায় গুটিয়ে গেল। কি লজ্জা! কোন রকমে বহু কষ্টে হেট মুণ্ডে মনে হয় ভূতনাথকেই উদ্দেশ্য করেই বলে উঠল সে,—বাবা যখন বলছেন, মায়া যখন নিষেধ করছে তখন থাক না। নাই বা এখন গেলাম।

এ কথাটা বোধ হয় আশা করে নি ভূতনাথ। তাই মনে হয় রেগে গেল সে। বলে উঠল—এই যদি ইচ্ছা ছিল তোর তবে আগে জানালেই তো পারতিস?

বলেই কথাগুলো আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াল না সেখানে ভূতনাথ। ত্বরিত গতিতে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

(পাঁচ)

ভূতনাথের রাগ সৃষ্টি ছাড়া। তা নয়তো কি? তেমন কোন হেতু নেই, কারণ নেই, মাথা গরম করলেই হল? বড় হয়েছে সে, আক্কেল বুদ্ধি করে চলার মত যথেষ্ট বয়স হয়েছে তার। কিন্তু তা না। ছোট ছেলের মত ঠুনকো একটা কারণ ধরে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠা—ছিঃ! ভূতনাথের এই রগচটা স্বভাবটার জন্য বলরাম বাড়ুজ্জে বেশ তাকে দু-চার কথা শুনাল । কিন্তু বাপের ধমকে ফল হল উল্টো। ঝালটা গিয়ে পড়ল সতীর উপর। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে আর কি। শ্বশুর ঘর যাওয়া তো দূরের কথা আর ও মুখোই হল না সে।

রাখহরি চাটুজ্জে বার বার জামাইকে নিতে এসে ব্যর্থ হলেন। বুড়ো, ভূতনাথের মা-বাবার হাতে ধরে কত অনুনয় বিনয় করে গেলেন—নিয়ম ভাঙ্গাতে একবার অন্তত যেন ছেলেকে তাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মা-বাবার কথা শুনলে তো ভূতনাথ। এমন কি মায়া—সে বেচারা দিনকতক শাশ্বতীর বৃন্দাদ্যুতি হয়ে কত সাধা-সাধি করল—কিন্তু না ভূতনাথের ভূত নামল না তার মাথা থেকে। কিন্তু কি দোষ সতীর? ওই রকম অবস্থায় স্বামীর কথার উত্তরে এখন থাক বলে নিবৃত্ত হওয়া ছাড়া কি উপায় ছিল তার? সদ্য বিবাহিতা আক্কেল-বুদ্ধি সম্পন্না বড় মেয়ের পক্ষে বাবা, শ্বশুর মায়া ইত্যাদির কথা কেটে পাড়া-প্রতিবেশী পরিবার পরিজনের সামনে ওমনি মোট-বিঁড়ে বগল-দাবা করে কি বেরিয়ে আসা সম্ভব ওর পক্ষে? বিয়ের ফুল না খসতে খসতে ওমনি সকলকে অমান্য করে স্বামীর পিছন ধরে বেরিয়ে যাওয়া কি কম লজ্জার কথা? কিন্তু সে লাজ-লজ্জা বোধ থাকলে তো ভূতনাথের। সে ব্যোম-শঙ্কর, নেংটা-ভোলানাথ। ভূতনাথ দিনকতক গুম হয়ে রইল তার রুদ্র ভৈরব মূর্ত্তি ধরে। তারপর একদিন উড়ে গেল সে মামারবাড়ী। মামারবাড়ী থেকে দিনকতক পর খবর এল সে নাকি তার মামার সঙ্গে চলে গেছে বোকারো। সেখানে পাওয়ার প্রোজেক্টে গুরুমিথ এন্টার প্রাইজে কাজে ঢুকেছে সে। কি কাজ. কেমন কাজ কে জানে তবে থাকে নাকি মামার কোয়াটারেই। খাওয়া-দাওয়াও হয় সেখানেই।

ভাল কথা। বড় ছেলে বাইরে বেরুবে, কাজ করবে এর চেয়ে আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে? গাঁয়ের ছেলেরা ঘর মুখো হয়েই তো দিনের পর দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে। দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় গজাচ্ছে তাদের। এরই পরিণতি হচ্ছে তো এক টুকরো বাপতে জমি নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি, কামড়া-কামড়ি, এসব গেঁয়ো-গোয়ার্তুমি, ভাই-ভায়াদি দ্বন্দ্ব কলহ থেকে তো মুক্ত হবে ভূতনাথ। যেতে যাক সে। তার ইচ্ছানুযায়ী যেখানে যেভাবে থাকলে সুখী থাকে সে—থাকুক সুখে। কিন্তু যাবার সময় শাশুড়ী জ্ঞানদার জ্ঞানচক্ষুটা খুলে দিয়ে যাওয়া তার উচিত হয়নি। একে মা মনসা তার উপর ধুনোর গন্ধ। সতীর অধিকার তুলে সে তার মায়ের সোনা-দানা, জমি জায়গা, জিনিস পত্র ইত্যাদি কব্জা করার কথাগুলো বলে কাজটা মোটেই ভাল করে গেল না। ভূতনাথের যেমন কথা তেমনি কাজ। এগুলো যদি সত্যি সত্যি জ্ঞানদার হাতছাড়া হয়ে যায় সংসারে তবে তার তো ভাঁড়ে মা ভবানী। পেট পালতে ডালা হাতে লোকের দরজায় দরজায় ঘুরতে হবে রাখহরি চাটুজ্জেকে। না, এরকমটা হতে জ্ঞানদা কিছুতেই দেবে না। দিতে পারে না সে কখনও।

জামাই ভূতটার অহঙ্কার তো সতীকে নিয়েই। তার অধিকারেই তো সে উড়ে এসে তার বুকের উপর জুড়ে বসে দাড়ি উপড়োতে চায়? সে গুড়ে তার বালি দেবেই জ্ঞানদা। যাকে নিয়ে তার লেজ নাড়া সেই সতীনের কাঁটাটাকে সে যেমন করেই হোক উৎখাত করবেই তার জীবন থেকে। তবে প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। বাহুবলে বা বাক্য বলে নয়—ছলে বলে কৌশলে। কৌশলেই কালনাগিনী দংশন করেছিল লখীন্দরকে। মা মনসার ছেলের কাছে টিকতে পারেনি চাঁদ সদাগরের হেন্তালের বাড়ী, লোহার বাসঘর। সেই কৌশলেই সতীকে সে সরিয়ে দেবে এ পৃথিবী থেকে। তাছাড়া ওই জামাই-ভূতটা নামবে না তার ঘাড় থেকে। রক্ষা পাবে না তার সংসার। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।

সুতরাং শুরু করল জ্ঞানদার অভিনয়। সতীর সৎমা হয়ে আর রইল না সে। অবতীর্ণ হল তার মায়ের ভূমিকায়। সতী আর তার নিজের মেয়ে মায়া কি আলাদা? মা তাদের পৃথক হতে পারে কিন্তু একই বাপের তো সন্তান তারা। বইছে তো উভয়ের মধ্যে একই রক্ত একই বংশের ধারা। তবে কেন ভিন্ন হবে মায়ের হৃদয়। প্রকৃত মায়ের অন্তর কখনও দুই-দুই দেখে না কোন ছেলেকে। সতীকেও তাহলে কেন আলাদা দেখবে জ্ঞানদা? সেও তো মা। সুতরাং মায়ের আদর স্নেহ ভালবাসায় জ্ঞানদা ভরিয়ে দিতে লাগল শাশ্বতীকে।

সরল হৃদয় জানে না কোন ছল-চাতুরি। বুঝে না কোন খল-কপটতা। তাছাড়া মাতৃহারা, স্নেহ কাঙ্গালী সতী। পায়নি সে আজীবন মায়ের হাতের কোমল স্পর্শ, মায়ের সোহাগ-মাখা কথা, ভালবাসা। তাই জ্ঞানদার আদর-স্নেহ-ভালবাসা সে গ্রহণ করতে লাগল সরল মনে, উদার হৃদয়ে। রৌদ্রতপ্তা শুষ্কা ধরনী সামান্য বারি বিন্দুও যেমন আকুল আগ্রহে শুষে নেয় সতীও তেমনি তার উপর জ্ঞানদার অভিনয় করা মিষ্টি ব্যবহার, ছল-ভরা মধুর কথার টুকরোগুলো গ্রহণ করতে লাগল হৃদয় ভরে পরম আগ্রহে। সহজ মনে কোন বাঁক থাকে না। দাগ থাকে না কোন উদার অন্তঃকরনে। সতী তাই তার পিঠের উপর মায়ের দেওয়া সেই পোড়া দাগটার কথা ভুলে গেল একেবারে। মন থেকে মুছে দিল সে তার মায়ের অতীত সমস্ত অন্যায় আচরণ, রুক্ষ কথা, রূঢ় ব্যবহার। সরল-সোজা হৃদয়টায় তার সৎমাকে বসাল তার মায়ের সেই শূন্যাসনটাতে। অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা উজাড় করে ঢেলে দিতে লাগল সে জ্ঞানদা-মায়ের পা দুটোতে।

দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হলেন রাখহরি চাটুজ্জে। জীবনে এই বোধহয় ছাড়লেন প্রথম পরিতৃপ্তির নিশ্বাস। ভাবলেন তিনি করুনাময় ঈশ্বর এতদিনে মনে হয় মুখ তুলে চাইলেন তার মা-হারা মেয়েটার উপর। জ্ঞানদার হঠাৎ এই পরিবর্তন তার পাড়া প্রতিবেশীদেরও অবাক করে দিল দস্তুর মত। এমন কি বুড়োরা পর্য্যন্ত তাজ্জব বনে গেল রাখহরি চাটুজ্জের এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর তার সতীন মেয়ের উপর এমন আদর-কদর দেখে। কথাটা উঠতেই সেদিন আসর জমিয়ে বলে উঠলেন চাটুজ্জে মশায়, —জগৎই পরিবর্তনশীল। সুতরাং জগৎ-সন্তান-মানব মনের যে পরিবর্তন হবে—এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? জীবকুলের ক্রমোন্নতির স্তরে মানুষ হল উচ্চকোটির প্রাণী। ভগবান ক্রমবিকাশের শেষ ধারার তার এই শ্রেষ্ঠ জীবটিকে তো আর পশুর স্তরে চিরকাল ফেলে রাখতে পারেন না। তাই তার মধ্যে হঠাৎই এরূপ পরিবর্তন ঘটান। তিনি মঙ্গলময়।

কিন্তু সে যাই হোক—ভূতনাথ যে কেমন ধারার মানুষ কে জানে—তার মতি-গতির কিন্তু কোন পরিবর্তন

হল না। রাগ নিয়েই সে রয়ে গেল তার চাকুরী স্থল বোকারোতে। প্রায় মাস দেড়-দুই গত হল—না চিঠি, না কোন খোঁজ-খবর। এধারে ভেবে মরে সতী। মায়ের আদর স্নেহ ভালবাসাই তো আর জীবনের পরম কাম্য নয়। চায় সে স্বামীর ভালবাসা। পতির স্নেহ আদর সোহাগই তো পত্নীর পরম ধন, চরম পাওয়া। সেই ধনেই ধনী হতে চায় সে। কামনা নেই তার অন্য কিছুর। কিন্তু এমনিই দুর্ভাগ্য তার হঠাৎ অকারণে কেন যে ভূতুদা চটে গেল তার উপর কে জানে। হে ভগবান শান্ত কর তাঁকে, ঠাণ্ডা রাখ তার মন মেজাজ। যদি তার জীবন যায় তাও স্বীকার তবু যেন তার উপর কোন রাগ না থাকে তার ভূতুদার। কখনও যেন বিরূপ না হন তিনি তার উপর।

চিন্তার আগুনে পুড়তে লাগল সতী। দিনের পর দিন শুকিয়ে যেতে লাগল তার চেহারাটা। এ রোগের ওষুধ একমাত্র তো তার ভূতুদা—এ কথা জানে মায়া। তাই ব্যস্ত হয়ে উঠল সে তার দিদির এই রোগ সারাবার। চিঠির পর চিঠি দিতে লাগল মায়া—ইনিয়ে বিনিয়ে কত ভনিতা কত কাণ্ড করে। কিন্তু ভূতুদা নিরুত্তর। নিজে ব্যর্থ হলেও কিন্তু ছাড়ল না সে। বড়-মাকে দিয়ে লেখাল সে চিঠি। এমন কি ভূতুদার বাবাকে দিয়েও লেখাতে সে ছাড়ল না। অন্ততঃ একবার আসুক সে। এ মাটিতে একবার এসে সে পা দিক। তারপর দেখাবে তাকে বিয়ে করে সন্ন্যাসী হয়ে থাকাটা জীবনে তার কত বড় অপরাধ।

কিন্তু খাটল না মায়ার মায়া। ভূতনাথ পড়ল না মায়ার ফাঁদে। মা বাবার চিঠির অবশ্য উত্তর দিল সে কিন্তু বক্তব্য তার একটাই-নূতন কাজে ঢুকেছে সে। এ সময় ফাঁকি দিলে মোটেই চলবে না তার। মালিককে তোয়াজ করে চললে চট-জলদি পদোন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার। সুতরাং এখন বাড়ী যাওয়া অসম্ভব।

ওঃ ভারী তো কাজ। যেন জীবনে আর কেউ কখনও চাকরি করে নি বা কারোর পদোন্নতিও হয়নি। তাই সদ্য বিয়ে করা বৌকে ছেড়ে দিয়ে এসে মালিকের জোঁয়ালে সব খুইয়ে বাঁধা থাকতে হবে? আসলে এসব হল অজুহাত ভূতুদার। রাগটাকে তার পুষে রাখার একটা কৌশল মাত্র। এত যদি কর্মপ্রীতি তার তবে দিদির মাথায় দিতে গেছল কেন সে সিঁদুর? কেন সে যেচে এসে দিদির গলায় দিতে এল মালা? দিব্যি তো ছিল তার দিদি। এত কাণ্ড করে তার আইবুড়ো নামটা ঘুচাবার কি দরকার ছিল তার? ছিল কি প্রয়োজন জীবন নিয়ে তার এভাবে ছিনি মিনি খেলার? এতটুকু বাধে না তার মনে, তাকে দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় এভাবে শুকিয়ে শুকিয়ে মারতে? নিকুচি করেছে তার চাকরির। শুরু করল মায়া তাকে কড়া সুরের পত্রবান। সতী কিন্তু সেসবের ধারে-পাশে গেল না। তার চিঠিতে শুধু অনুরোধ। বিনয় নম্র কোমল সুরের শুধু মিনতি, শুভ্র মনের শুধু করুন প্রার্থনা—একবার তুমি এস ভূতুদা। পায়ে ধরে তোমার না ক্ষমা চাওয়া পর্য্যন্ত আমি যে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না মনে। তোমার আশীর্বাদে পেয়েছি আমি মায়ের স্নেহ-ভালবাসা। পেয়েছি আরো অনেক কিছু তোমার কৃপায়। কিন্তু তুমি ছাড়া যে আমার কাছে সব তুচ্ছ ভূতুদা, তুমি আমার উপর রাগ করে পড়ে থাকবে এটা যে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। সত্যি বলছি তুমি রাগ করবে জানলে সেইদিনেই সেই মুহূর্তেই আমি এক কাপড়েই তোমার পিছু পিছু বেরিয়ে পড়তাম। লাজ-লজ্জা, মান-সম্ভ্রম আমার সবই তো তুমি। আমি মানতাম না বাবার বাধা। এমনকি শুনতাম না তোমার বাবার কথাও। তুমি যে আমার সবচেয়ে, সবার চেয়ে বড় ভূতুদা। এবারটির মত আমাকে মাফ করে দিয়ে যাও তুমি।

কিন্তু না, এ ভূতনাথ তো তাদের ভূতগ্রামের মন্দির দেবতা বাবা আশুতোষ ভোলানাথ নয় যে সামান্য ফুল জল আর বেল পাতাতেই সন্তুষ্ট হবেন। এ খুব কড়া-ধাতের দেবতা। সহজে নরম হবার পাত্র নয় ভূতনাথ। তাই রইল সে নিজের তেজে দেমাক ভরে জেদের আসনেই আসীন হয়ে। নড়ল না একটুও। সতীর এল আবার চিঠি। করুন সুরের কাতর অনুরোধ। মিনতি-ভরা শেষ প্রার্থনা তার—আমার অপরাধের সত্যিই কি তোমার কাছে কোন ক্ষমা নেই ভূতুদা? যে ভুল আমি করেছি তার জন্য যে অহরহ অন্তরে জ্বলে-পুড়ে মরছি। আমার এ দোষ এবারের মত মাফ করে দাও তুমি। তুমিই যে আমার মহেশ্বর, সাধনার দেবতা—আশুতোষ, ভোলানাথ। আমার জীবনের সমস্ত হলাহল পান করে বিষমুক্ত করেছ তুমি আমাকে। একবার এসে পায়ের ধুলো দিয়ে এ ত্রুটি আমার মার্জনা করে যাও তুমি। সংসারের সমস্ত কাজে মন আমার পড়ে থাকে তোমার উপর। ইচ্ছে হয় ছুটে যাই, উড়ে গিয়ে পড়ি তোমার পায়ের উপর। সত্যি বলছি ভূতুদা, তুমি ছাড়া কিচ্ছু আর ভাল লাগে না জীবনে আমার। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও তুমি। কিচ্ছু চাই না আমি তোমার কাছে। শুধু সেবা করতে

চাই আমি জীবনে তোমার। দাসী হয়ে থাকতে চাই তোমার মা-বাবার সংসারে। আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ কর তুমি। আমাকে নিয়ে যাও তোমাদের ঘরে।

কিন্তু ভূতনাথের মন ভিজল না তবু। তার স্বভাব-সিদ্ধ বেয়াড়া গোঁ-টা বরং উল্টে জেদ চাপিয়ে দিল তার। মনে মনে বলতে লাগল তাকে, তখন বড্ড তোর টিরবিরুনী। সকলের মাঝে দিব্যি তার কথার উত্তরে বলা— বাবা যখন বলছেন, মায়া যখন নিষেধ করছে তখন থাক না, নাই বা এখন গেলাম। তবে থাক আরোও। মিটুক তোর সাধ। মরুক তেলটা তোর। হাড়ে হাড়ে টের পা তুই যে সামান্য মাত্র অবাধ্য হলে তার বা ইঙ্গিত ইশারায় না চললে কেমন শাস্তি পেতে হয় জীবনে।

শাশ্বতী ব্যর্থ হওয়ায় মায়া ধরল হাল অন্যভাবে। লিখল সে,—দিদি অসুস্থ। স্বামী হিসাবে একবার এসে দেখে যাওয়াও কি তুমি উচিত বলে মনে কর না ভূতুদা? দিদির জীবনের চেয়ে কাজটাই তোমার বড় হল? যদি মারা যায় দিদি তাহলে যে গোটা জীবনটা তোমাকে পস্তাতে হবে, আফসোস্ করতে হবে চিরকাল সে খেয়াল আছে?

চিঠি পড়ে হাসল ভূতনাথ। মনে মনেই বলতে লাগল সে মায়াকে উদ্দেশ্য করে—মায়াবতী, ঘাসে মুখ দিয়ে চরি না আমি যে তোমার মনের কথা বুঝতে পারব না। ওসব চালাকি তোমার খাটবে না আমার কাছে। ফন্দি-ফিকির ধোপে টিকবে না। জল পড়ার ভূত নই আমি যে তোমার চাতুরিতে ভুলবো।

কিন্তু সত্যি বলতে কি মায়ার এটা পুরোপুরি মিথ্যে কথা বা ছল চাতুরি ছিল না। সত্যিই সতী তেমন না হোক তবে অসুস্থ হয়ে একটু পড়ে ছিল। সামান্য সর্দ্দিজ্বর। ফাল্গুন চৈতে সিজন-চেঞ্জের সময় এমন শরীর খারাপ হয় এক-আধটু প্রায় সকলেরই। কিন্তু এর সঙ্গে সতীর যোগ হয়েছিল নিজের ভাগ্যটার প্রতি সন্দেহ, দুশ্চিন্তা। এ রোগের তো কোন ওষুধ নেই। তাই দুর্ভাবনায় মনের আগুনে অসুস্থতা তার বেড়েই চলছিল দিনের পর দিন।

জগৎ পরিবর্তনশীল হলেও তার আর একটা প্রকৃতি জানা উচিত ছিল রাখহরি চাটুজ্জের। সেটা হল যে পৃথিবী কখনও তার কক্ষপথ পরিবর্তন করে না। তাই বার থেকে জ্ঞানদার যতই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাক না কেন সে কিন্তু চলছিল তার নির্দ্দিষ্ট কক্ষ পথে। লক্ষ্য তার স্থির রেখে। সেই কথায় বলে না— "স্বভাব যায় না ম'লে। চরিত যায় না বলে—

মন-ময়লা যায় না কারো গঙ্গা জলে ধুলে।" —সেই হল জ্ঞানদার। ঘরের জায়গা-জমি, গহনা-বাসন হোক না কেন সতীর মায়ের—এ সমস্ত হল তার সংসারের জিনিস। এ সংসারের গিন্নি যখন সে তখন এ সমস্ত কিছুর হকদার সে। তার অধিকারের জিনিস পর হাত হতে দেবে কেন? কিন্তু বুড়ো মিনসের যখন বাঈ উঠেছে আর মুখপোড়া ওই জামাই ভূতনাথের যখন ঝোঁক চেপেছে তখন তো এসব হাত ছাড়া হবেই তার। আর এসব হাতছাড়া হলে মায়াকে সে আর উদ্ধার করতে পারবে না। স্বামী পরিবার নিয়ে মাঝ দরিয়ায় তাকে যে হাবুডুবু খেতে হবে সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। সুতরাং এসব বাঁচাতেই হবে তাকে। তার কব্জায় রাখতেই হবে সমস্ত কিছু। কিন্তু উপায় কি তার?

উপায় চিন্তা করতে অবশ্য দুষ্টু-নষ্ট লোকের শয়তান সহায় হন। অমানুষদের বুদ্ধি যোগান তিনিই সুতরাং জ্ঞানদার মাথায় ভর করতেই তিনি, বুদ্ধি তার গেল খুলে। সেদিন ছিল, মাকড়ি-সপ্তমী। গ্রাম দেবতা বাবা ভূতনাথের মন্দিরে বিশেষ আনুষ্ঠানিক পূজোর দিন। ঘর-ঘর চাল-চিঁড়ে-দুধ-গুড় আদায় করে এদিন বাবার ভোগ দালানে করা হয় পায়েস। এই পায়েস পরমান্নই এদিনে বাবার প্রধান ভোগ-নৈবেদ্য। একে বলা হয়, মনুই।

ভূতগ্রামের বাবা ভূতনাথের আদায়ী-পূজা এই মনুই-দেওয়া অনুষ্ঠান এক বিশেষ পরব বলা যেতে পারে। মোটামুটি জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ বাবার এই পূজো-পার্বনে মেয়েদের ভূমিকাই থাকে প্রধান। তাদের হাতেই বাবার এই মনুই-প্রসাদ ঘর ঘর বিলি করা হয় সেদিন। ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী সবাই এ প্রসাদ মুখে না নিয়ে নাকি জল স্পর্শ করে না। প্রতিবছরই এ দিনটায় বাবার এই সেবা-পূজায় থাকত সতী বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়ে। কিন্তু এ বছর এমনভাবে জ্বরে পড়ে রইল সে যে বাবার অনুষ্ঠানে আদৌ নিজেকে নিয়োগ করতে পারল না।

বিছানায় পড়ে পড়ে সে মায়াকে পাঠাল তার ভূতুদার নামে মানত-পূজোর ফুল নৈবিদ্য নিয়ে মন্দিরে। পূজো করিয়ে বাবার ফুল-বেলপাতা ও মনুই প্রসাদ দিদিকে এনে খাওয়াবে কি তার আবার আজগুবি সংস্কার। গঙ্গাজল মুখে মাথায় না নিয়ে সে নাকি ছোঁবে-না ও প্রসাদ। কিন্তু মায়া চঞ্চলা। ব্যস্ত সে স্কুল যাবার জন্য। তাই প্রসাদটা মায়ের হাতে দিয়ে দিদিকে খাওইয়ে দিতে বলেই তাড়াতাড়ি চলে গেল সে স্কুলে।

জ্ঞানদার হাতে পড়ল মনুই-প্রসাদ। সঙ্গে সঙ্গে চ্যাঙ্গা হয়ে উঠল তার শয়তানী বুদ্ধিটা। চিন্তা সে আগেই করে রেখেছিল। সতীনের এই কাঁটাটাকে তার জীবনের পথ থেকে চিরকালের মত সরিয়ে দিতে না পারলে রক্ষে নেই তার সংসারটার। শান্তি নেই তার জীবনে। যার দৌলতে ভুতু-জামাই খবরদারি করতে আসে তার উপর, যার বলে বলীয়ান হয়ে শাসায় সে, অধিকার ফলায় তার সতীনের গহনা-গাঠি সম্পত্তির উপর তাকে সমূলে বিনাশ করতে না পারলে কল্যাণ নেই তার। নেই কোন মঙ্গল। তাই সতীর মারণ-বিষ সে আগেই সংগ্রহ করে রেখেছিল গোপনে। সুযোগ পায়নি সে বিষ তাকে প্রয়োগ করার। কিন্তু আজ তার সুবর্ণ সুযোগ। ভক্তিমতী সতী। বাবার মনুই প্রসাদ খাবে সে আগ্রহ ভরে এবং বেশ নিষ্ঠা সহকারে। শেষ কণাটি পর্য্যন্ত ফেলে দেবে না সে। সুতরাং এ সুযোগ কি হেলায় হারানো যায়? অতএব বাবা-ভূতনাথের মনুই প্রসাদের সঙ্গে তার আনা সেই বিষ ভালভাবে মিশিয়ে দিল জ্ঞানদা। তারপর পূজোর ফুল-বেল পাতার সঙ্গে সেটা ধরে দিল সে সতীর মুখে।

যার কৃপায় অকূলে কূল পেয়েছে সতী, পেয়েছে দিশেহারা জীবনে স্বামী। যে স্বামী সৌভাগ্য কল্পনারও বাইরে ছিল তার, সেই ভূতুদার মত রূপবান স্বামীকে যিনি যোগ করে দিয়েছেন তার জীবনে তাঁর মহাপ্রসাদকে কি অবহেলা করতে পারে শাশ্বতী কখনও? সুতরাং ভক্তিভরে পরম আগ্রহ সহকারে সে প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দিল সতী—হে বাবা ভূতনাথ, ভূতুদার তুমি মঙ্গল কর বাবা। তোমার এ প্রসাদ গ্রহণে স্বামীর আমার যেন সর্ববিঘ্ন নাশ হয়। জয় বাবা মহেশ্বর।

কিন্তু একি! প্রসাদ আজ তাকে বিস্বাদ লাগছে কেন? জিহ্বা তাকে দিচ্ছে কেন বাধা? তিঁতা-কষা যাই লাগুক না কেন—এ প্রসাদ বাবার প্রসাদ, মহাপ্রসাদ। এ প্রসাদে অরুচি করা মহাপাপ। এ প্রসাদ গ্রহণে অবহেলা করলে অকল্যাণ হবে তার স্বামীর। ঘৃণা করলে তার ভূতুদার হবে অমঙ্গল। উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ফেলে দিলে বা নষ্ট করলে সেই পাপের ফল ভোগ করতে হবে তার স্বামীকেই। কারণ তারই উদ্দেশ্যে নিবেদন করা এ পূজা-নৈবেদ্য। সুতরাং সমস্ত দ্বিধা-কুণ্ঠা, জিহ্বার অরুচি বাধা ইত্যাদি জোর করে ঠেলে ফেলে দিয়ে প্রসাদের সবটুকু গলাধঃকরণ করল সতী। পাত্রের শেষ কণাটুকুও চেটে-পুটে পেটে চালিয়ে দিয়ে সম্মান জানাল সে মহাপ্রসাদকে। রক্ষা করল তার ইষ্টদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তারপর—

তারপর শুরু হল তার প্রতিক্রিয়া। বিষ তো বিষই। সে পূজোর মনুই-প্রসাদ বা বাবার পায়েস-পরমান্ন যার মধ্যে দিয়ে যাক না কেন শরীরে কাজ তো তার শুরু করবেই। সুতরাং পেট করতে লাগল তার উথাল-পাতাল। গা করতে লাগল আড়-পাড়। ছিঁড়তে লাগল যেন তার সমস্ত নাড়ি-ভুঁড়িগুলো। হরি ভক্তির কোন শক্তিতে যে প্রহ্লাদ তার পিতা হিরণ্য কশিপুর মৃত্যু-বিষ হজম করেছিল কে জানে। সতী কিন্তু তার মা জ্ঞানদা দেবীর হাতের দেওয়া জহর কিছুতেই আর হজম করতে পারল না। শুরু হল তার কাতরানি, ছটফটানি। জ্বলে যেতে লাগল তার সর্বাঙ্গ। পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি গুলোতে হতে লাগল তার যেন অসংখ্য বিষাক্ত সূঁচ ফোটানোর যন্ত্রণা। একি হল তার! টেনে আসছে কেন তার জিহ্বা? মোচড় দিয়ে আসছে কেন তার সর্বাঙ্গের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো। সে কি আর বাঁচবে না? শেষ হয়ে যাবে কি সে এই জ্বালা যন্ত্রণায়। দেখতে পাবে না সে আর তার স্বামীকে? হায় ভগবান কোথায় রইল তার ভূতুদা! যেখানেই থাক হে বাবা ভূতনাথ রক্ষা কর তাকে। তার যা হবার হোক তবু হে বাবা ভোলানাথ, মঙ্গল কর তার। কমে আসতে লাগল সতীর সমস্ত শক্তি। রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল বাক্। ক্রমশঃ বেহুঁশ হয়ে আসতে লাগল সে। এই মুমূর্ষ অবস্থায় তবুও বাবা মহেশ্বরকে স্মরণ করে ক্ষীণ কণ্ঠে নিবেদন করতে লাগল সে তার কাতর প্রার্থনা,—হে পরমেশ্বর, ভূতুদার ইহ—জীবনের পাপ, পরজীবনের পাপ; জ্ঞানের পাপ, অজ্ঞানের পাপ সব আমি নিলাম প্রভু। নিলাম আমি তার ইহ-পর জীবনের সমস্ত অন্যায়। তার সমস্ত সাজা তুমি আমাকে দিয়ে রক্ষা কর প্রভু আমার স্বামীর জীবন। কখনও তোমার চরণে যদি কোন অন্যায় করে থাকে —হে ভোলানাথ সে সবের শাস্তিও তুমি দাও আমাকে। তবু উদ্ধার কর তাকে। তার দোষ

ত্রুটি সমস্ত কিছু আমি নিয়ে রেখে গেলাম স্বামীকে আমার তোমার চরণে মহাদেব। পাপ-তাপ মুক্ত সুখী জীবনে আসীন কর তাকে। মঙ্গল কর তার। হে বাবা মহেশ্বর, জয় বাবা ভূতনাথ—শি-ব শম্ভু ম-হা-দেব।

বলতে বলতে সতীর প্রাণবায়ু ক্রমশঃ ছেড়ে যেতে লাগল তার যন্ত্রণা কাতর দেহটাকে। যাত্রা করতে উদ্যত হল সে পরলোকের পথে। কে জানে তার এ সমস্ত অন্তিম প্রার্থনা পরমেশ্বরের কানে পৌঁছুল কি না। তবে তার এই মুমূর্ষ চিৎকার শোনবার বা তার এই অন্তিম-যাত্রা অবলোকন করবার তখন বাড়ীতে কেউ ছিলনা। জ্ঞানদার এ ব্যাপারে জ্ঞানের কোন অভাব ছিল না। জানত সে যে বিষ তুলে দিয়েছে সে সতীর মুখে তাতে তাকে আর ঘুরে ঘাস খেতে হবে না। মৃত্যু তার সুনিশ্চিত। কিন্তু মরার সময় কাছে থাকা তার বিপজ্জনক। কারণ এ বিষয়ে একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল তার বাপের বাড়ীর। হারু কাকা বিষ খেয়ে মরার পর বাড়ীতে পুলিস এসে হারু-কাকীমাকে কিই না নাস্তানাবুদ করেছিল। জেরার পর জেরা করে জেরবার করে দিয়েছিল তার। শেষে থানা। সে-কি কেলেঙ্কারি। পাকা- মাথার লোক জ্ঞানদা। তাই এ ঝক্‌মারিতে তাকে যেন না পড়তে হয় তাই সে তখন সতীকে ফেলে চলে গেছল পুকুরঘাট। গোঙ্গানি তখন পুরোদমে শুরু হয়ে গেছল শাশ্বতীর। কিন্তু কে শুনবে তার চিৎকার? মায়া স্কুলে। বাপ তার বসে হয়ত আড্ডা দিচ্ছে কোথাও। ওধারে পূজো পাটিতে জোড়-কাঠিতে বাজছে পূজোর-ঢাক। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমস্বরে ভক্ত কণ্ঠে উঠছে ধরম ডাক—কাল-ভৈরব নাথমনি মহাদেব। পাতালেশ্বর নাথমনি মহাদেব। পাড়া-প্রতিবেশী ছেলে-ছোকরারা ব্যস্ত সবাই বাবা ভূতনাথের পূজো মন্দিরে। মশগুল সবাই সেখানে মনুই প্রসাদে। এসব হৈ-হুল্লোর চিৎকার ঠেলে কখনও কি কারো কানে যেতে পারে সতীর গোঙ্গানি? সুতরাং নিশ্চিন্ত জ্ঞানদা।

শাশ্বতীর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া হিম-শীতল নিষ্প্রাণ দেহটা প্রথম চোখে পড়েছিল রাখহরি চাটুজ্জের। তারই বুকফাটা আর্তনাদে এসে জুটে ছিল সব পাড়া-প্রতিবেশী, মাসি-পিসির দল। তাদের মুখেই ব্যাপারটা একটু চাউর হতেই পুকুর ঘাট থেকে ফিরে এসেছিল জ্ঞানদা। অভিনয়ে তার জানতে কারু বাকী রইল না সে নির্দোষ। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে সতী। হয় হয়—এই রকমই হয়। সেন্টিমেন্টাল অর্থাৎ আত্মসম্মানবোধ-সচেতন মানুষ যারা—তারা শেষ পর্য্যন্ত তাল সামলাতে না পেরে এমনিভাবেই নিজেকে শেষ করে দেয়। আসলে সতীকে বিয়ে তো করে নি ভূতনাথ। নিজের কেলেঙ্কারিটাকে ঢাকাবার জন্য ওটা ছিল তার একটা অভিনয়। শ্বশুর শাশুড়ীর ঘাড়ে জোর করে কাউকে ঘরের বৌ করে চাপিয়ে দিলে মনে-প্রাণে কখনও কি গ্রহণ করতে পারে কেউ? চারধারের অনাদর অবহেলাই এ পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছিল তাকে। এটা সতীর পূর্ব পরিকল্পিত। আজ একলা ঘরে সুযোগ পেয়ে সেটা কাজে লাগিয়েছে এই যা। কথায় বলে—যার মরণ যেখানে, নাও ভাড়া করে যায় সেখানে।

দুঃখ করতে লাগল সবাই। দুর্ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিল সতী। অকালে তাই মাকে হারিয়েছিল সে। মেয়ে মানুষের প্রাণ—তাই দুঃখে কষ্টে মানুষ হল যদি সাধ সাধল তার কুরূপটা। সেই কুরূপটা নিয়ে গুণবতী হয়ে তাও যদি বড় হল সে পড়ল গিয়ে ভূতনাথের মত একটা দুষ্ট-নষ্ট বাউণ্ডুলে ভূতের হাতে। গুণ থাকলে তো তার, যে গুণবতী মেয়ের মর্য্যাদা বুঝবে? সবই কপাল সতীর—"যদ্‌ধাত্রা নিজ ভাল পট্ট লিখিতং তৎ প্রোজঝিতুং কঃ ক্ষমঃ? বিধাতার লিখন যাহা, কে খণ্ডাতে পারে তাহা?

বোঝাতে লাগলেন অক্ষয় চাটুজ্জে রাখহরি বাবুকে—জন্মের ভাগী মা-বাপ হতে পারে কিন্তু তার কর্ম্মের ভাগী তো কেউ নয় ভায়া। সুতরাং ও পাতকীটার জন্য চোখের জল ফেললে আর কি হবে? তুমি তো তোমার পিতৃকর্ত্তব্য যথারীতি পালন করেছিলে। দিয়েছিল বড় ঘরে বিয়ে। করেছিল তাকে বনেদী বংশের ছেলের হাতে সম্প্রদান। সে যদি এমনি নিজের দোষে আত্মহত্যা করে তো তোমার কি দোষ? সবই তার অদৃষ্ট—

কপাল মূলং খলু সর্বদুঃখম্
কিংবা স্বয়ম্ভুঃ শিবশক্তি বিষ্ণুঃ
কপাল দুঃখং ন করোতি দূরম্।।

সে তো হল কিন্তু এখন উপায়? উপায় অবশ্য আর রাখহরি চাটুজ্জেকে চিন্তা করতে হল না। ভেবে বুঝে রায় দিলেন গ্রামের পাকা-মাথা সব মালিক মুখ্যুরাই। বাঘে ছুলে আঠার ঘা অর্থাৎ থানা-পুলিস করলে পাড়াশুদ্ধো

মেয়েছেলেকে পর্য্যন্ত নিয়ে টানাটানি করবে। কোথায় বিষ পেল? কে এনে দিল? কারোর সঙ্গে কোন মন কষাকষি বা কখনও ঝগড়া-ঝাটি হয়েছিল কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে তারা যে কি সাপ বের করবে কে জানে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ফেলে শেষে সকলের মান-ইজ্জত নিয়ে খেলবে ছিনিমিনি তারা। তার চেয়ে দরকার নেই ওসব আত্মহত্যা বলে প্রচার করার ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার। জ্বরে পড়েছিল যখন তখন সতীর এই অসুস্থতার অছিলা ধরেই জ্বালিয়ে দেওয়া হোক তার শরীরটা। যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ, পুড়বে সীতা ঘুচবে দুঃখ।

(ছয়)

নদীর এপাড় ভাঙ্গলে ওপাড়েও লাগে মনে হয় তার দোলা। পাহাড়ের এক পাশ ধ্বসলে অপর পাশেও হয় বুঝি অনুভব তার কম্পন। সরসীর এ ঘাট গেলে অন্যঘাটে লাগে বোধ হয় তার ব্যথা। তাই মনে হয় সুদূর সেই ভূতগ্রামে শাশ্বতীর মৃত্যুর ধাক্কাটা অজান্তে এসে লাগল এধারে বোকারোতে ভূতনাথের অন্তরে। চঞ্চল হয়ে উঠল তার হৃদয়। অধীর হয়ে উঠল তার প্রাণ। মনটা কেমন যেন আই-ঢাই করতে লাগল তার ফেলে আসা স্ত্রী সতীর জন্য। দিব্যি ছিল সে আপন জেদে। বেশ ছিল সে নিজের গোঁ—এ আসীন হয়ে। কিন্তু সেদিন দুপুরে হঠাৎ মনটা হয়ে উঠল তার উতলা। সতীর প্রতি কেমন যেন একটা আকর্ষণ, অদ্ভুত একটা টান অনুভব করতে লাগল সে অন্তরটাতে। তোলপাড় করতে লাগল তার হৃদয়টা। মনে পড়তে লাগল সতীর সেই হতাশা-ভরা মুখ, আশঙ্কা-ভরা আঁখি, সামান্য একটু সহানুভূতির আশায় তার দিকে তাকিয়ে থাকা তার সেই উদাস চোখের করুণ চাওনি। না জানি কেমন যেন একটা বেদনা, অজানা একটা শোক, চাপা একটা ব্যথা উঠে আসতে লাগল ভূতনাথের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। কিন্তু সেটা যে কিসের জন্য? কেন? কিচ্ছু বুঝতে পারছিল না ভূতনাথ। জানতে পারছিল না সে কিছুতেই তার প্রাণের হঠাৎ এমন ধারার ব্যাকুল হওয়ার কারণটা।

ভাবছিল সে সতীর কথাই। কে বলে সতী তার কুরূপা? কে বলে গড়নে বরণে হীন সে? তার ওই সর্ব্বংসহা ধৈর্যাশীলা চেহারাটার মধ্যে আছে এমন একটা রূপ যা বর্তমানের আধুনিকাদের মধ্যে দুর্লভ। দুর্লভ বর্তমানের মেকাপধারী সাজ-পোশাকের জৌলুস-ভারী নকল সুন্দরীদের মধ্যে। কৃত্রিমতার কোন ধার ধারে না সতী। চায় না সে কোন দিন সেজে-গুজে মেকী রূপসী হতে। এমন কি পূজা-পার্বন, উৎসব অনুষ্ঠানেও আর পাঁচটা মেয়ের মত চেহারাটাকে তার সকলের নজরে ফেলার আদৌ কখনও রুচি নেই তার। সে যা, তাই থাকতে সে চায় চিরকাল।

কিন্তু তা হলেও অরূপার ওই রূপের মধ্যে বিরাজ করত কেমন যেন লক্ষ্মী শ্রী। যা দেখে মনে হত মায়ের স্নেহ, প্রিয়ার প্রেম, দয়িতার ভালবাসা, বোনের আদর; সীতার পবিত্রতা, সাবিত্রীর পাতিব্রত্য যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে তার মধ্যে। নারীর আসল এ রূপ হালফেশনের নকল বিবিদের মধ্যে সত্যিই দুর্লভ। অবশ্য চোখ ধাঁধানো বাহ্যিক রূপের মোহের মাতাল যারা তাদের নজরে পড়বে কেন সতীর এ চেহারা? লাগবে কেন চোখে তাদের সতীর সৌম্য-শান্তি সদা-প্রসন্ন দেবীমূর্ত্তি। এ রূপ দেখার মত চোখ থাকা চাই। থাকা চাই উপলব্ধি করবার শক্তি, অনুভব করবার মত হৃদয়।

ভাবতে ভাবতে নিজেকেই নিজের অবাক লাগল ভূতনাথের। হঠাৎ আজ কেন এমন করে মনে হচ্ছে তার সতীকে! অন্তর্দৃষ্টিটা তার খুলে গেল নাকি? জ্ঞান চক্ষুটা তার হঠাৎ কি হল উন্মীলিত? নইলে মনটা এমন তার উথাল-পাথাল করবে কেন তার শাশ্বতীর সেই রূপ-মাধুর্য্য অবলোকন করার জন্য। কোথায় সতী আর কোথায় ভূতনাথ। কোথায় ভূতগ্রাম আর কোথায় বোকারো। নাইট-শিফট্ ডিউটি গেছে তার গতরাতে। উপরন্ত বেলা প্রায় বারটা পর্য্যন্ত থাকতে হয়েছে তাকে কারখানায়। বন্ধুর বেগার খাটতে। দুপুর বেলায় রাতের ঘুমটা একটু পুষিয়ে নেবে কি শুরু করেছে মনটা তার স্মৃতি টেনে দৌরাত্ম্যি করতে। কল্পনার পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে সে এখন যেতে চায় সাগর পারের রাজকন্যা সেই সতীর কাছে। তার রূপ-মাধুরী পান করবে সে। যতসব আজগুবি চিন্তা, অবাস্তব ভাবনা।

কিন্তু তাই বা হবে কেন ভূতনাথের? সে তো কাঠখট্টা, ডানপিটে, বাস্তব-বাদী ছেলে। তার তো হঠাৎ এমন

ভাবপ্রবণ, কল্পনা বিলাসী হওয়ার কথা নয়। নয় তো উচিত এখন তার দিবা-নিদ্রার বারটা বাজিয়ে সতীর স্মৃতি রোমন্থন করার। কিন্তু পারল না ভূতনাথ। কিছুতেই মন থেকেতার ফেলে দিতে পারল না সতীর চিন্তাটাকে। বার বার যেন চোখের সামনে তার ভেসে উঠতে লাগল সতীর সেই নিজেকে অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে রাখা চেহারাটা, তার সেই সদা অপরাধির মত থাকাভাব। ঘুরে ফিরে মনে ভিড় জমাতে লাগল তার অতীত দিনের নানা স্মৃতি, ফেলে আসা জীবনের নানা ঘটনা। পড়তে লাগল মনে তার সেই মন্দির-দাওয়া থেকে আচমকা তার গায়ে পড়ে যাওয়া সতীর বিপর্যয়ের ইতিহাস। যন্ত্রণা-কাতর স্বরে অথচ লজ্জারাঙ্গা মুখে কপালের ক্ষতস্থানটা চেপে সে জিজ্ঞেস করেছিল তাকে—তোমার কোথাও তো লাগেনি ভূতুদা? বার বার উদয় হতে লাগল সতীর সেই স্মৃতি—সৎমার বাঘিনী মূর্ত্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে ভীত সন্ত্রস্ত শশকিনীর মত। হঠাৎ যেয়ে ভূতনাথ তার মাথায় ঘষে দিল সিন্দুরটা। সে কি কেলেঙ্কারী! অনিশ্চিত জীবনের ভাবী চিন্তায় ব্যাকুলতার তখন কি ভয়ার্ত চেহারা। তারপর সেই ঝোঁকের মাথায় তাকে বিয়ে করা। সেই বাসর-রাত, মায়া কেয়া কাকলিদের মাঝে পাশে তার বৌ হয়ে বসে থাকা সতী। চারধারে হাসি-স্ফূর্তি-ইয়ার্কি, হৈ-হুল্লোড় ফাজলামির মধ্যে নিস্তব্ধ নিঝুম একটা দ্বীপের মত তার অবস্থান। স্মৃতির টানে পড়ল হঠাৎ মনে ভূতনাথের সেদিনের সেই ঘটনাটা। বিনা দোষে দস্যি সৎমাটা তার বসিয়ে দিয়ে ছিল ডান কাঁধে তার জ্বলন্ত কাঠের আগুন। যন্ত্রণায় কাঁদছিল সে। কিন্তু তাকে শান্ত করবে কি ভূতনাথ, লাগিয়ে দেবে কি তার ক্ষতস্থানটায় এক ফোঁটা ওষুধ— তা না, রাগ দেখিয়ে তাকে চলে এসেছিল সে তার কাছ থেকে। কিন্তু কি দোষ ছিল সতীর? কি কাজ করেছিল সে তার রাগের? বলতে না বলতেই তো তার ব্যবহার্য্য শায়া-শাড়ীগুলো বেঁধে প্রস্তুত হয়েছিল তার সঙ্গে যাবার জন্য। তার কথায় লজ্জা-সরম কোন কিছু তোয়াক্কা না করে বোচকা বগলে সে তো বেরিয়ে আসছিল তার পিছুপিছু। তবে? অপরাধ কি ছিল তার? তার শ্বশুর মশায় অর্থাৎ ভূতনাথের বাবাই তো এসে দিলেন তাকে বাধা। নিষেধ করলেন তাকে। আটকে দিলেন তার গতি। সে বাধা না শুনে যদি পিছু পিছু তার বেরিয়ে আসত সতী তবে অপমানিত হতেন বাবা। অসম্মানিত হতেন তিনি সকলের কাছে। এর জন্য দায়ী হত ভূতনাথ, নিজে। সেদিন না এসে সতী রক্ষা করেছে তাকে কেলেঙ্কারির কবল থেকে। উদ্ধার করেছে সে জীবনে তাকে অপরাধি হওয়ার হাত থেকে। এতো ত্রুটি নয় তার। নয় তার কোন অপরাধ। সেদিন কথা না শুনে তার কোনই অন্যায় করেনি সতী। ভাবতে গেলে দোষ তো তারই। জেনে-শুনে সে তাকে ফেলে এসেছে আবার সেই দস্যি সৎমাটার কাছে। জোর করে পুরে দিয়ে এসেছে তাকে ওই রাক্ষসীটার গুহায়। শুধু তাই নয় আজ পর্য্যন্ত কোন খোঁজ-খবর নেয়নি তার। দেয়নি কোন তার চিঠির উত্তর। শুনেনি তার কেনা কাতর প্রার্থনা,—আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও ভূতুদা। এখানে থাকলে আমি আর বাঁচবো না ভূতুদা। মনে হতেই সতীর কথাগুলো কানের কাছে যেন বার বার বাজতে লাগল ভূতনাথের। অন্তঃকর্ণে ভেসে আসতে লাগল যেন সতীর করুণ-কাতর আর্তনাদ।

না, এ মস্ত বড় অন্যায় ভূতনাথের। অপরাধি সে সতীর কাছে। নিজে থেকে তার কাছে দোষ ত্রুটি তার স্বীকার করে না আসা পর্য্যন্ত এ অপরাধের ক্ষমা নেই তার। যাবে সে সতীর কাছে। কিন্তু কবে? কখন? বলবে তাকে কেমন ভাবে? পাড়বে তার কাছে প্রথম কোন কথাটা? ভাবতে লাগল ভূতনাথ। চলতে লাগল মনে তার নানা জল্পনা-কল্পনা। গতরাতের সি-শিফট্ ডিউটির জেরে একলা ঘরে অলস দুপুরে চোখ দুটো তার জড়িয়ে আসছিল কি না কে জানে। হঠাৎ দেখতে পেল সে সামনে তার সতী। দাঁড়িয়ে আছে বাসর রাতের বিয়ের সেই চেলীটা পরে।

চমকে উঠল ভূতনাথ! —সতী, তুই এখানে?

কোন উত্তর নেই সতীর। ফ্যাকাশে মুখে করুণ চোখে সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। তাকিয়ে আছে তার দিকে সে অপলক নয়নে। আবার তাকে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ—কখন এলি তুই?

সতী তবু নিরুত্তর। এসব বোধ হয় তার মামী-মার কাণ্ড। ভাবল ভূতনাথ। হঠাৎ তাকে চমকে দেবার পরিকল্পনা আর কি। এসেছে বোধ হয় সেই এগারটার বাসে সতী। আচমকা তাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যই মামী-মা এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিল তাকে। আচ্ছা ধুরন্ধর মেয়ে যা হোক মামী-মা। কাজে-কম্মে কথায়-বার্ত্তায় এতটুকু টের পর্য্যন্ত পেতে দেয়নি তাকে সতীর আসার কথাটা! কিন্তু সে যাই হোক—সতী এল কার সঙ্গে? জানবার জন্য তাই সতীকে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ —কার সঙ্গে এলি তুই?

নিরুত্তর সতী। রাগ করেছে সে বুঝি তার উপর। স্বাভাবিক। এতদিন ধরে কোন খোঁজ খবর নেয় নি তার, দেয়নি তাকে সে কোন চিঠিটার উত্তর। তাই মান করেছে মানীনী। অভিমানে আছে তাই মুখটা গোমড়া করে। কিন্তু ভার মুখটা দেখে তার হাসি পেল ভূতনাথের। এক চিলকে হাসি টেনে তাই বলে উঠল ভূতনাথ—কি রে সতী, বলবি না কথা? আমার উপর রাগ করে তুই থাকতে পারবি? বেশ, কার সঙ্গে এলি, কখন এলি বলতে হবে না তোকে। কিন্তু এতক্ষণ মামী-মা তোকে আমার চোখের আড়ালে কোথায়, কিভাবে লুকিয়ে রেখেছিল বল দেখি শুনি?

সতী তেমনি নির্বাক নিস্পন্দ। কিন্তু কতক্ষণ চুপ দিয়ে থাকবে সতী? মুখ খোলাতে তার তাই কথাটাকে আবার ঘুরিয়ে বলল ভূতনাথ—এসেই আমাকে না দেখে মামী-মার কথায় গোপনে থাকতে পেরেছিলি তুই? ছটফট্ করেনি তোর মনটা? আচ্ছা মনে আছে তোর? সেই যেরে—হাসি ফুটিয়ে মুখে বলে উঠল ভূতনাথ, —বিয়ের রাতে আমাদের বাসর ঘরে ঢুকিয়ে বলে উঠেছিল তোকে মানুর দিদি-মা—জানিস দিদি-ভাই, ভাতারকে আমার একদণ্ড না দেখলে ভিতরটা আমার আকু-পাকু করে। তেমনি এখানে ঢুকেই আমাকে না দেখতে পেয়ে মনটা তোর আকু-পাকু করেনি?

কিন্তু কি আশ্চর্য্য। এমন সুন্দর একটা আমোদে কথায় সতী তার সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে হাসবে কি কাঁপতে লাগল তার ঠোঁট দুটো। চোখ-দুটোতে যেন তার আসতে লাগল জল। কাঁদবার পূর্ব লক্ষণ। তাই বন্ধ করতে সেটা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ—তুই কি মনে করিস বলতো, আমি তোর কথা ভাবি না? চিন্তা করি না কোন দিন? এই বাবা ভূতনাথের দিব্যি বলছি—এই মাত্র ভাবছিলাম আমি তোর কথা। সত্যি বলছি সতী সামনের এই রবিবারেই তিন চার দিনের ছুটি নিয়ে যেতাম আমি তোর কাছে। শনিবারে বেতনটা হয়ে গেলেই কিনতাম তোর জন্য একটা শাড়ী আর মায়ার জন্যে একটা শালোয়ার পাঞ্জাবী। অবাক হয়ে যেত মায়া। তাই না? কিন্তু তুই—ভালই হয়েছে এসে পড়েছিস যখন, এখন বলতো তুই কেমন শাড়ী, কিরকম রঙের শাড়ী কিনলে তোর পছন্দ হবে?

উত্তরের পরিবর্তে কেমন যেন বেদনা মাখা হয়ে গেল সতীর মুখ চোখগুলো। চাপা-কান্নায় যেন চঞ্চল হয়ে উঠল তার মূর্ত্তিটা।—এমন করছিস কেন? বলে উঠল ভূতনাথ,—কি হয়েছে বলবি তো আমাকে? তোর সংমা কি আবার তোর উপর কোন অত্যাচার করেছে? বলেছে কি তোকে মনে লাগার মত তেমন কোন কথা? তোর উপর আর যাতে সে কোন দিন কোনরূপ দৌরাত্মি না করে তার জন্যেই তোর মায়ের গহনা-গাঠি, বাসন-কোসন, জমি-জমা সব তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার কথা বলে এসেছিলাম আমি। আসলে ওসব মিথ্যে কথা। ভয় দেখিয়ে তাকে দমিয়ে রাখার একটা অছিলা মাত্র। ওসবে আমার লোভ নেই কোন। কিন্তু সত্যি বলছি সতী, তোর উপর ফের যদি আর সে কোন দস্যিপনা শুরু করে তবে কিন্তু আমি তোর মায়ের এক কানা-কড়িও পেতে দেব না ওকে। বল, তোকে আবার কি করেছে ওই রাক্ষুসীটা?

যতই বলুক ভূতনাথ সতীর মুখে কিন্তু কোন জবাব নেই। ধেৎ তেরী! বিরক্ত হয়ে উঠল ভূতনাথ। সে কি কোন জান যে খড়ি পেতে বুঝে নেবে যে তার কি হয়েছে? না কি সে কোন অন্তর্যামী দেবতা যে না বলা সত্ত্বেও জানতে পারবে সে তার মনের কথা? আচ্ছা মুস্কিল! বলবি তো কি হয়েছে? বলে উঠল ভূতনাথ,—না বললে বুঝবো কি করে বল তোর ব্যাপারটা কি?

সতী কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল তেমনি পটে আঁকা ছবির মতনির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে। বেশ ফেসাদে পড়া গেল তো। বলে উঠল ভূতনাথ গম্ভীর ভাবে—শোন সতী, স্বীকার করছি আমি—সেদিন তোর উপর রাগ করে তোদের বাড়ী থেকে চলে আসাটা আমার অন্যায় হয়ে গেছে। ওভাবে সকলের সামনে এরকম আচরনটা করা মোটেই উচিত হয়নি আমার। ওতে তোর কোন দোষ ছিল না সতী। ও ত্রুটি সম্পূর্ণ আমার। আমার ও দোষ ক্ষমা করে দে-তুই। চুপ দিয়ে আর থাকিস না। কথা বল।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। সতী যথা পূর্বং তথা পরং। এতে কার না রাগ হয়। তার উপর ভূতনাথ আবার রাগচটা মানুষ। যে মানুষ ছোট হয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইছে, স্বামী হয়ে স্ত্রীর কাছে দোষ স্বীকার করছে, তবু টেঁক দেখিয়ে তার কাছে গোমড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা! ধমকে উঠল সে তাকে—কথা বলবি না তো ঢঙ করতে

আমার সামনে এসে দাঁড়ালি কেন? বেরো, বেরো বলছি আমার কাছ থেকে। মামী-মা যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল তোকে থাক্‌গে সেখানে তুই গুপটি মেরে।

ধমকটা শুনে চাপা একটা বেদনায় যেন কেঁপে উঠল সতী। মুখে চোখে তার ফুটে উঠল একটা কাতর অনুরোধ। হাত নেড়ে সে মিনতি ভরা ইঙ্গিতে জানাল তাকে যেন ভূতনাথ বেরিয়ে যেতে না বলে। কিন্তু আশ্চর্য্য তো! ইঙ্গিত ইসারায় জানাতে হবে কেন তাকে। কেউ তো নেই এখানে। মামী-মা শুনতে পাবে কেন? সে তো তার নিজের ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। দুপুর না গড়ানো পর্য্যন্ত সে তো এখন মড়া। সুতরাং দিব্যি এখন কথা বলতে পারে সে তার সঙ্গে। কিন্তু অভয় দিয়ে ভূতনাথ বার বার তাকে বলতে বলা সত্বেও রা বেরুল না সতীর মুখে। কাঁহাতক আর মেজাজ ঠিক রাখা যায়। রাগ-অভিমানের একটা সীমা আছে তো। গর্জে উঠল ভূতনাথ, বোবা হয়ে থাকবি যদি তবে মরগে যা তুই। দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। ফুঁসে উঠল সে— ভারী তো তোর রাগ! বকর বকর করে স্বামী হয়ে চেঁচিয়ে মরব আমি আর উনি স্ত্রী হয়ে দেমাকটা নিয়ে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকবেন আমার সামনে। দূর হয়ে যা তুই আমার দু-চোখের সামনে থেকে! বেরিয়ে যা বলছি।

কেঁপে উঠল দাঁড়িয়ে থাকা সতীর মূর্ত্তিটা। দু-চোখ বেয়ে তার গড়িয়ে এল জল। জানে ভূতনাথ, সব সহ্য করতে পারে সতী, পারে না শুধু তার উপর ভূতুদার রাগ সহ্য করতে। কিন্তু রাগ দেখাতে না চাইলেও যে মেজাজটা ঘুচিয়ে দিচ্ছে সতী। গতরাতের ঘুম পোষাবে কি দুপুরের ঘুমেরও গেল বারটা বেজে। এর উপর রাত্রে আবার ডিউটি আছে। এতদিন পর দেখা। গায়ে পড়ে তো তারই কথা বলা উচিত। তা না, বকে যাচ্ছে উল্টো সে পাগলের মত, আর উনি বোবা সেজে মান করে আছেন তার উপর। ভূতুর ধাতে কখনও সয় এ সব? কিন্তু হঠাৎ সতীর দুঃখ-কষ্ট মাখা মুখটা কেমন যেন রাগের গতিটার পরিবর্তন করে দিল ভূতনাথের। তার জল ভরা চোখের করুণা ঘন চাওনি কেমন যেন ব্যাথাতুর করে দিল তার মনটাকে—আহা! অভাগী সতী দুঃখ নিয়েই জন্মেছে। কষ্ট নিয়েই হয়েছে সে বড়। সৎমায়ের জন্য বাপের সংসারে ভুলেও কোনদিন সুখের মুখ দেখতে পায়নি সে। মুখ বুজে সব সয়ে গাধার মত শুধু খেটেই গেছে সে। প্রশংসা পাওয়া তো দূরের কথা এতটুকু সহানুভূতি পর্য্যন্ত পায় নি সে কোনদিন কারো কাছে। মনে হয় আজ বড় জ্বালায় পড়ে এখানে এসেছে সে। হয়েছে তার উপর এমন কোন নির্যাতন যার জন্য তাকে আগে থেকে না জানিয়ে হঠাৎ চলে আসতে বাধ্য হয়েছে সে। নিশ্চয়ই কোন কিছু অসহ্য হয়েছে তার। নইলে আসত না সে? হয়ত সামান্য এক সহানুভূতি একটু ভালবাসার আশায় ছুটে এসেছে সে তার স্বামীর কাছে। ভূতনাথের তার উপর রুষ্ট হওয়া উচিত নয় মোটেই। ধমকে, বোকে দূর হতে বলে তাকে জ্বালার উপর জ্বালা দেওয়া কিছুতেই ঠিক নয় ভূতনাথের। স্বামী হয়ে যদি সে তার মনের কষ্ট না বুঝে তবে সতী দাঁড়াবে গিয়ে কার কাছে? নরম হল ভূতনাথ। গরম মেজাজটা তার ঠাণ্ডা করে শান্ত স্বরে বলে উঠল সে সতীকে,—আমার কথায় তুই রাগ করিস না সতী। নিজের রাত-ডিউটি সারার পর এক বন্ধুর আবার বেগার দিতে গেছি বেলা বারটা পর্য্যন্ত। তাই ঘুমোতে পাইনি। মন-মেজাজের আমার ঠিক নেই রে। তাই হঠাৎ ওমনি চড়া সুরে দুটো কটুকথা বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে। কিছু মনে করিস না তুই। আয় আমার কাছে। বোস সামনের এই চেয়ারটাতে।

শুনল সতী তার কথা। বসল ভূতনাথের নির্দেশ মত সামনের তার চেয়ারটাতে। তার কথায় মনে হয় ভালোবাসার ছোঁওয়া পেয়ে চাপা কান্নার ভাবটা গেল অনেকটা কেটে। অশ্রুসজল চোখ দুটো তার ভরে গেল অদ্ভুত এক শান্ত শীতল দৃষ্টিতে। বলে উঠল ভূতনাথ—জানি আমি, মনে তুই বহু কষ্ট চাপা দিয়ে রেখেছিস। নিয়ে এসেছিস সঙ্গে করে নিশ্চয়ই অনেক যন্ত্রণা, ব্যথা ও বেদনা। কিন্তু সে সব কথা প্রকাশ না করলে কি করে বুঝবো আমি-বল তোর লাঞ্ছনা-গঞ্জনাগুলো।

বলবার জন্য মনে হয় ইতস্তত করে উঠল সতী কিন্তু হঠাৎ নীচ থেকে এল মামার ডাক,—ভূতু ঘুমোলি না কিরে? কেমন যেন এক হতাশা-ভরা বিষাদ মাখা স্বর তার। ডাক শুনে মামার আশ্চর্য্য হয়ে গেল ভূতনাথ! বি. শিফট্ ডিউটিতে গেছলেন তিনি হঠাৎ এখন এলেন কেন? কাজের মাঝে আসেন না তো তিনি কোন দিন! কাজ ফেলে—, এই অসময়ে—! চঞ্চল হয়ে উঠল ভূতনাতের মনটা। কারখানায় কোন গণ্ডগোল হল নাকি! হল

নাকি হঠাৎ কোন ধর্মঘট বা লক-আউট ঘোষণা। কৌতূহলী হয়ে উঠে দাঁড়াল ভূতনাথ। —না মামা ঘুমোই নি। বলেই তাড়াতাড়ি ছুটে গেল সে দরজা গোড়ায়। জিজ্ঞেস করে উঠল সে তাকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে—কেন? কি হয়েছে মামা? ব্যাপার কি? হঠাৎ এখন এলে যে?

—নীচে আয় একবার। মামার ভারী নির্দ্দেশটা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল ভূতনাথ—তুই একটু বোস সতী শুনে আসি আমি মামা কি বলছেন। বলেই তাড়াতাড়ি সে তার ঘর থেকে গেল বেরিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে সে নেমে গেল নীচে। নীচে মামার পাশে দাঁড়িয়েছিল গোপাল। বুঝতে আর বাকী রইল না ভূতনাথের যে তাঁর এই গুণধর বন্ধুটিকেই সঙ্গে করে এখানে এসেছে সতী। তাই দেখেই তাকে হাসি মুখে বলে উঠল সে—বাঃ! চিঠিতে লেখা ঠিকানা ধরেই তুই তাহলে আসতে পারলি এখানে? তোর বুদ্ধির তাহলে তারিফ করতে হয় আমাকে?

কিন্তু কি আশ্চর্য্য—তার এই হাল্কা হাসিটার সঙ্গে কোন যোগ দিল না গোপাল! দাঁড়িয়ে রইল ঠিক সতীর মতই মুখটা ভার করে। মামাও তেমনি গম্ভীর। যা বাবাঃ। ব্যাপার কি? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ তার মামাকেই—অসময়ে হঠাৎ ডিউটি ছেড়ে চলে এলে কেন? কারখানায় কি কিছু ঘটেছে?

মামা কাছে এল তার। হাতটা রাখল ভূতনাথের কাঁধের উপর। তারপর বলে উঠল তাকে ধীর-গম্ভীর শান্ত গলায়, স্নেহমাখা স্বরে, —শোন ভূতনাথ, মানুষের জীবনে কবে যে কখন কি ঘটে বলা যায় না। ধরার বুকে রাতও আসে দিনও হয়। মেঘ এসে আকাশ ঢাকলেও কিছুক্ষণ পরে আবার সূর্য্য উঠেন হেসে, কেটে যায় মেঘ। কেউ চিরকাল থাকে না। সব ক্ষণস্থায়ী তাই ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়। কোন কিছুতেই উত্তেজিত হয়ে হট্ করে কিছু করতে নেই, সব কিছু সয়ে রয়ে চলার নামই তো জীবন না কি বলিস তুই?

কি আর বলবে ভূতু? মামার কথার মাথা-মুণ্ডু বুঝলে তো সে। আর ওসব শোনা-বোঝার এখন সময়ও নেই তার। ধন্যি যা হোক তার মামা! ভর দুপুরে ডিউটি ছেড়ে হঠাৎ তাকে এসে আবার উপদেশ দেবার বাই উঠল তার। যতসব হেঁয়ালী ভরা কথা। ওধারে সতীকে নিয়ে মামীমা যেমন ধাঁধায় ফেলতে চান তাকে এধারে তেমনি গোপালকে নিয়ে মামার ও তেমনি ফন্দি। মানে হয় কোনো? গুলি মারো ওসব উপদেশে। মুখটায় বিরক্তির ভাব এনে মুখ ঝাম্টে মামাকে তাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ—ব্যাপারটা কি আগে বলবে তো? তারপর যত পার উপদেশ শোনাবে তুমি।

—কি আর বলবো রে! বলেই মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথাটা নীচু দিকে করলেন। চুক চুক করে মুখে একটা ব্যথা-ভারাক্রান্ত ধ্বনি তুলে ঘাড় নাড়লেন তিনি। তারপর কেটে কেটে বিষাদ ভরা স্বরে বলতে লাগলেন তাকে,—বৌমা, মানে তোর স্ত্রী, মানে শাশ্বতী আর কি—বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

শুনে ভূতনাথ চমকে উঠবে কি—শোকগ্রস্ত হবে কি তার মামার কথাটাকে সে আদৌ বিশ্বাসই করল না। ধেৎ—শব্দে একেবারে তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বলে উঠল তাকে অগ্রাহ্যের স্বরে,—কি যে বল মামা তুমি? তোমার বোধহয় এখন মাথার কোন ঠিক নেই। নিশ্চয়ই কারখানায় সাংঘাতিক একটা কিছু হয়েছে তোমার। তাই মাঝে হঠাৎ ডিউটি ছেড়ে এসে এখানে গোপালকে দেখে ওমনি একটা আজগুবি ধারণা করে নিয়েছ তুমি। কেমন যে মন তোমার কে জানে।

বিষাদ-মাখা শুষ্ক মুখটা তুলে ভূতনাথের দিকে তাকিয়ে চাপা গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন তার মামা,—আমার কথা মিথ্যে হলেই ভাল হত ভূতনাথ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার যে এই নিষ্ঠুর সত্যটা বলতে হচ্ছে তোকে আমার মুখ দিয়ে।

—শুধু তোমার কেন মামা, বলে উঠল ভূতনাথ, —সতীকে আমার ঘরে না দেখে হঠাৎ গোপলাকে যদি এ চেহারায় এমন অবস্থায় প্রথমে দেখতাম আমি তবে আমারও তোমর মত ওমনি ভুল ধারনাই হত।

—কি বলছিস তুই? অবাক হয়ে বলে উঠলেন মামা—সতীকে আবার তোর ঘরে দেখবি কি?

—তুমি জান না মামা, বলে উঠল ভূতনাথ—অবশ্য কখন এসেছে ওরা আমিও তা জানি না। বোধহয় তুমি চলে যাবার পর এবং আমি ঘরে আসবার আগে। এমনি শুধু আসেনি মামা,—বৌমা তোমার সঙ্গে করে তার রাগটিকেও এনেছে। আমি ঘরে এসেছি, স্নান সেরেছি, খেয়েছি টিকিটি পর্য্যন্ত দেখায় নি সে। অবশ্য মামী-

মার কথায়। সতীকে দেখিয়ে হঠাৎ আমাকে চমকে দেবার মতলব আর কি। এমন কি ছেলে-মেয়েদেরও নিষেধ করে দিয়েছে সতীর আসার কথাটা যেন আমাকে তারা না জানায়। কেমন মজা দেখ। খেয়ে দেয়ে যখন নিজের ঘরে শুয়েছি তখন সতী আর থাকতে না পেরে উদয় হয়েছে আমার সামনে। বাপরে বাপ্—কি রাগ তার! এখনও কথাটি পর্য্যন্ত বলেনি সে আমার সঙ্গে। ওই গোপলার মতই মুখটা গম্ভীর করে এসে আছে।

—কি সব আজে-বাজে অবান্তর কথা বলছিস তুই? অবাক-বিস্ময়ে বলে উঠলেন তার মামা। গোপালেরও যেন তার কথা শুনে চক্ষু হল চড়কগাছ। ভাব দেখে তার হেসে উঠল ভূতনাথ। বলে উঠল তাকে—এ গোপ্লা, তুইও কি আচম্‌কা উদয় হয়ে আমাকে চাকচান্দা লাগাবার ফন্দিফিকির করেছিস? সে গুড়ে বালি! আর ঢঙ্ করিস না। এবার মামাকে অন্ততঃ সত্যি কথাটা বল। নইলে দেখছিস তো মামা যেরকম মানুষ শুধু সতীকে নয় তোকে শুদ্ধো মেরে বসে থাকবে। ধারনা করবে এমন সব কিম্ভূত কিমাকার যে শেষ পর্য্যন্ত সামলানো তাকে ভার হবে তোর।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এত অনুরোধ করা সত্ত্বেও গোপালচন্দ্র সেই ভ্যাবা গঙ্গারাম। তাকাতে লাগল তার মুখটার দিকে এমনভাবে যেন সে ভূত দেখছে তাকে। —এ বোকা, নির্বিকার চিত্তে, মুখ সোজা সরল হাসি ফুটিয়ে বলে উঠল ভূতনাথ, দেখবি আমাকে পরে, আগে মামাকে বল যে সতীকে সঙ্গে করে এনেছিস তুই। তারপর উঠে আয় আমার ঘরে।

গোপাল কিন্তু তেমনি হতভম্ব! মামাও ভাগনের কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক্! ধমকে উঠল ভূতনাথ এবার তার বন্ধুকে—অভিনয়টা এবার ছাড় গোপ্লা, নইলে জানিসতো তুই আমাকে? মারব এমন এক চড় যে মক্স করাটা তোর বেরুবে। সতীকে আনিস নি তুই? বল না মামাকে—

—একি আক্কেল তোর ভূতনাথ, ধমকে উঠলেন মামা—কাকে কি অবস্থায় কেমন ভাবে কথা বলতে হয় তাও তুই শিখিস নি?

—তুমি জান না মামা, বলে উঠল ভূতনাথ, গোপালটার স্বভাবটাই ওমনি। কাকেও কোন কথা সোজাসুজি বলবে না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পেঁচিয়ে নানা রহস্যে ফেলে, লোককে আকাশ-পাতাল ভাবিয়ে ধোঁকা দিয়ে ভ্যাবাচকা খাওইয়ে তবে ছাড়বে। ওতে ও মজা পায়। কিন্তু আমার কাছেও ও বাঁদরটা ফাজলামি করবে? ইয়ার্কি করবে তোমার সামনে?

—শোন ভূতনাথ, শান্ত স্বরে বলে উঠলেন মামা,—এসব ব্যাপার নিয়ে কেও কোন দিন ইয়ার্কি ফাজলামি করে না। বৌমা আর আমাদের মধ্যে নেই। কি যে দুর্মতি হয়েছিল তার কে জানে। একলা ঘরে সবার অলক্ষ্যে বাবা মহাদেবের মনুই-এর সঙ্গে বিষ খেয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। বড় পরিতাপের বিষয় রে! বড় দুঃখের কথা।

হেসে উঠল ভূতনাথ। হাসতে হাসতেই বলে উঠল সে,— দেখলে তো যা বলেছিলাম তাই। গোপলা তোমাকে বোকা বানিয়েছে। এস আমার সঙ্গে। বলেই ভূতনাথ ধরল তার মামার হাতটা। টানতে লাগল তাকে।

—কোথায় যাব? বলতেই মামা উত্তর দিল ভূতনাথ—আমার ঘরে। দেখবে এস তোমার ভাগিন-বৌ স্বশরীরে আমার রুমে কেমন বর্তমান। চোখে না দেখলে তো বিশ্বাস করবে না তুমি। সুতরাং আগে ভুলটাই ভাঙ্গি তোমার। তারপর অন্যকথা। বলেই ভূতনাথ মামাকে তার হিড়হিড় করে টেনে আনতে লাগল তার রুমটার দিকে। গোপালও বিস্ময়াভিভূত হযে যেতে লাগল তার পিছু পিছু।

কিন্তু কোথায় সতী! ঘর যে তার ফাঁকা। অবাক হওয়া ডাগর চোখে এধার ওধার বোকার মত তাকাতে লাগল ভূতনাথ। না দেখে তাকে ডাকতে আরম্ভ করল সে নাম ধরে,—সতী, কোথায় তুই সতী? গেলি কোথায় সতী?

কিন্তু থাকলে তো সতী সাড়া দেবে তাকে। ভূতনাথ কিন্তু নাছোড বান্দা। ডাকতে লাগল সে বার বার। চড়াতে লাগল সে গলার মাত্রা ধাপের পর ধাপ,—সতী, এ সতী, সতীরে, কোথায় গেলি তুই?

চিৎকার শুনে মামী-মার তার ঘুমটা গেল ভেঙ্গে। উঠে এল সে। সঙ্গে এল তার মনি, কাঞ্চন ছেলে মেয়েরা। কি হয়েছে? ব্যাপার কি? ভব-দুপুরে হঠাৎ ভূতনাথ এমন চীৎকার করছে কেন সতী-সতী ... বলে?

কিন্তু কে দেবে কথার উত্তর? সবাই হতভম্ব। বিস্মিত সবাই ভূতনাথের কাণ্ড দেখে! শুধু "সতী সতী বলে চিৎকার করাই নয়। একনাগাড়ে ডাকতে ডাকতে পাগলের মত সে খুঁজে যেতে লাগল ঘরটার এধার ওধার। কোনা, তক্তাপোষের তলা, বাক্স-পটরার আড়াল বাদ দিচ্ছে না সে দেখতে কোন জায়গাটাই। যত্র তত্র তন্নতন্ন করা সে এক অবাকে খোঁজা তার। বলবে কি আর তার মামা-মামীরা। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সবাই ভূতনাথের পাগলামিটা।

অবাক কিন্তু সবার চেয়ে হল ভূতনাথ। যার পর নাই বিস্মিত হল সে। কারণ এইমাত্র দেখল সে সতীকে। দেখা শুধু নয় কথা বলল তার সঙ্গে। কথা বলা শুধু নয়, বসাল তাকে তার বিছানার পাশের সামনের এই চেয়ারটাতে। কিন্তু এক মুহূর্তে হঠাৎ গেল কোথায় মেয়েটা। আর যাবেই বা কোথায়—এখানের কোন কিছু জানে কি সে? তার পক্ষে এটা বিঁভুই বিদেশ। সম্পূর্ণ অচেনা অজানা জায়গা। অপরিচিত সবাই। অন্য কোথাও যাওয়া তো তার পক্ষে সম্ভবই নয় মোটেই। গেঁয়ো বোকা মেয়ে সে। এঘর থেকে ওঘর গেলেইতো নজরে পড়ত তাদের। আর তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলার মেয়েও তো নয় সতী। জলজ্যান্ত মানুষ একটা হাওয়া হয়ে গেল হঠাৎ!

মামী-মাকে দরজা গোড়ায় এসে দাঁড়াতে দেখেই পাগলের মত তার কাছে ছুটে গেল ভূতনাথ, সতী কি এক্ষুনি তোমার ঘরে গেল মামী-মা? আকুলি-বিকুলি করে বলতে লাগল তাকে, —বলে দাওনা মামাকে যে সতী তার কারখানায় যাবার পরই গোপ্‌লার সঙ্গে এসেছে। গোপ্‌লা ভূতটা মজা লোটার জন্য এখনও চুপ করে আছে। আর মামাও তেমনি, কিছুতেই বিশ্বাস করছে না আমার কথাটা। বল না তুমি।

মামী মা আর বলবে কি—ভূতনাথের ব্যাপার-স্যাপার দেখে সে তো হাবাগোবার মত তাকাতে লাগল তার দিকে। ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক! এসব কি বলছে তাদের ভূতুদা। করছে কেন এমন সে পাগলের মত। দেখেশুনে মামা তার আর ঠিক থাকতে পারলেন না। চাপা ধমকে বলে উঠলেন তিনি ভূতনাথকে—তোর কি মাথাটাথা খারাপ হয়েছে ভূতু? মরার কথা নিয়ে কেউ কি কখনও ইয়ার্কি ফাজলামি করতে পারে কারোর সঙ্গে?

—কিন্তু আমি যে নিজের চোখে সতীকে দেখলাম মামা। কত কথা বললাম সতীর সঙ্গে। বসতে বলাতে সতী বসল আমার কথায়। আর তোমরা বলছো—

বাধা দিয়ে তার কথাটাকে বলে উঠলেন মামা,—দুপুর বেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলি তুই। আলস্যের ঘোরে হাল্কা ঘুমে মানুষের অবচেতন স্তরের নানা চিন্তা স্বপ্নে এমন বাস্তব রূপ ধরে চেতন স্তরে ভেসে আসে।

—না, যেন গর্জে উঠল ভূতনাথ—স্বপ্ন নয়, জলজ্যান্ত একটা মানুষকে চোখের সামনে এত স্পষ্ট করে দেখা স্বপ্ন হতে পারে না কখনও। এই যে গোপ্‌লাকে আমি চোখের সামনে দেখছি এটাকে স্বপ্ন বলতে পারবে তুমি? এই যে তোমাদের সঙ্গে এত স্পষ্টভাবে কথা বলছি এগুলোও কি মিথ্যে বলতে চাও তুমি? এই যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ তোমরা সবাই—এগুলোও কি স্বপ্ন? জাগ্রত ও স্বপ্নের মধ্যে তাহলে তফাৎটা কি? চোখে দেখা কোনটাকে তাহলে বুঝবো সত্য আর কোনটাকে ধরব মিথ্যা বলে?

শান্ত গলায় বলে উঠলেন মামা, —এত উতলা হোস-নে ভূতু। মাথাটা আগে ঠাণ্ডা কর তুই। আমি যাবার পর নয় গোপাল এই প্রথম এল আমাদের বাড়ী। বাস থেকে নেমেই সে সোজা চলে গেছল আমার কারখানায়। সেখানেই সব কথা বলে সে আমাকে। কথা শুনেই তার কাজ বন্ধ করে আমি কারখানা থেকে এইমাত্র তাকে নিয়ে এলাম আমাদের ঘরে। যে যাবার সে তো গেছেই ভূতনাথ। অযথা উত্তেজিত হয়ে তো কোন লাভ নেই। পুরুষমানুষের ধৈর্য্যই হল অলঙ্কার। শোকে-দুঃখে ভেঙ্গে পড়লে তো তোকে চলবে না বাবা। করনীয় যা তা তো করতেই হবে এবার।

কথাগুলো ভূতনাথের কেমনভাবে কানে ঢুকল কে জানে। রুখে গেল সে গোপালের দিকে। সামনে যেয়ে দুহাতে ধরল তার কাঁধ-দুটো। বলল তাকে মস্ত রকম একটা ঝাঁকরানি দিয়ে—কি রে? মামা যা বলছে তা সত্যি? সত্যি সতী মারা গেছে? সত্যিই আত্মহত্যা করছে সে?

গোপাল মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতেই ওমনি তাকে ধমকে উঠল ভূতনাথ—বল বলছি হতভাগা। নইলে এক ঘুষিতে দেব তোকে ঘুঘু উল্টো করে। বের করে দেব তোর বোবা হয়ে থাকাটা।

কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল গোপালচন্দ্র—মিথ্যে বলতে ভাই আমি আসিনি এখানে। সত্যি বলছি সতী আর নেই। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। থানা, পুলিশ, পোষ্টমর্টাম, ইত্যাদি হৈ-হুজ্জুতের ভয়ে তাড়াতাড়ি তাকে দাহ করতে শ্মশানে পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে সকলে মিলে প্রেরণ করেছে এখানে। খবরটা তোকে দেবারই জন্য। দুর্ভাগ্য আমার তাই এ কথাটা আজ বলতে আসতে হল তোকে।

—কেন আত্মহত্যা করল সতী? গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ—ঘরে কিছু ঝগড়া-ঝাটি হয়েছিল? তার সৎমায়ের সঙ্গে কোন গণ্ডগোল? বা তার বাবার সঙ্গে কোন বচসা, কথা কাটাকাটি?

—সে সব তো কিছু-শোনা যায় নি। বলে উঠল গোপাল,—তবে বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিল সে। তুইও কোন খোঁজ-খবর নিসনি। সাতে পাঁচে তাই বোধ হয় মনের ধিৎকারে—

—ওসব কথা এখন থাক গোপাল। বাধা দিয়ে তাকে বলে উঠলেন মামা—মানুষটাই যখন চলে গেল তখন ওসব কথা টেনে আর কাজ কি? আর বলেই বা কি হবে? এ সব জানবার সময় পাওয়া যাবে অনেক। মিছেমিছি এখন আর ওসব ঘেটে মন খারাপ করে কোন লাভ নেই। খবর যখন এসেছে, যেতে যখন হবেই তখন গোপালের সঙ্গে পরের বাসটা ধরেই চলে যা ভূতনাথ তুই বাড়ী। জীবনে জ্বালাযন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট প্রত্যেক মানুষই কম বেশী ভোগ করে। তা বলে সতীর কি ওমনি বোকার মত নিজেকে শেষ করে দেওয়াটা উচিত? কেও যদি নিজের ইচ্ছায় মরে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না ভূতনাথ। মন শক্ত কর তুই। স্বামী হিসাবে স্ত্রীর শেষ-কৃত্যের যা করনীয় কর্ত্তব্য তা সমাধা করে কাজে এসে আবার মন দে। ওসব ভাবনা চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দে তুই।

কিন্তু কি বুঝল ভূতনাথ কে জানে। মামার কোন কথার উত্তর না দিয়ে নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ কেমন যেন এক অভিমানের সুরে বলে উঠল সে,—যাব না আমি। বেঁচে থাকতে যখন কোনও অনুরোধ রাখলাম না তার তখন মরার পর আর তার শেষকৃত্য করার দরকার নেই আমার। ধিক্ আমাকে।

—অবুঝ হোসনে ভূতনাথ। বলে উঠলেন মামা—মৃতাশোচ শ্রাদ্ধশান্তি এগুলো তো করতেই হবে তোকে।

—আমি পারবো না। স্পষ্ট কথায় জবাব দিল ভূতনাথ,—মরা গরুতে কখনও ঘাস খায় না মামা। যা আমি মানি না তা আমাকে আর করতে বলো না তুমি। আমার দ্বারা কিচ্ছু আর হবে না। এই শেষ কথা আমার। বলেই ভূতনাথ গটগট করে বেরিয়ে গেল বাইরে।

কি আশ্চর্য্য! এ অবস্থায় যাচ্ছে কোথায় ভুতু! সকলেই বেরুল তার পিছু পিছু। মামী-মা ত্বরিত গতিতে এগিয়ে গিয়ে ধরল তার হাতটা। বাধা দিয়ে বলে উঠল তাকে,—মানিস না যখন তখন কিছু করতে হবে না তোকে। তবু এসময় কোথাও বেরুতে আমি দেব না তোকে। নিজের ঘরে থাকবি চল এখন।

—বেশ থাকছি। বলেই ভূতনাথ গণগণ করে ফিরে এসে ঢুকল তার নিজের ঘরে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মামা-মামী ইত্যাদি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল সে গম্ভীর গলায়,—কেও কিন্তু আমাকে আর কোন কথা বলো না তোমরা।

—কিন্তু—কি একটা কথা মামা এগিয়ে গিয়ে বলতে যেতেই ওমনি ভিতর থেকে দড়াম করে কপাটটা বন্ধ করে দিল ভূতনাথ। বলে উঠল মিনতি ভরা কণ্ঠে,—আমায় আর বিরক্ত করো না তোমরা। একটু একা থাকতে দাও আমাকে। দোহাই তোমাদের।

কি আর করবে মামা? মামীমাও আর বলবে কি? যে রকম ছেলে ভূতনাথ এর উপর বেশী ঘাটাঘাটি করলে হয়তো একেবারে অন্য কিছু একটা কাণ্ড করে বসবে। তার চেয়ে চুপচাপ দিয়ে থাকাই ভাল। নিজেই বুঝুক সে। গোপালকে নীচের ঘরে এনে জলটল খাওয়ালেন মামী-মা। তার মুখেই জানা গেল সমস্ত কথা। ভূতনাথের বাবা নাকি বিধান নিতে গেছলেন ভট্টাচার্যি মশায়ের কাছে। তিনি বলেছেন—এটা যখন অপমৃত্যু নয় আত্মহত্যা তখন পয়তাল্লিশ দিন পর্য্যন্ত কোন অশৌচ বা পারলৌকিক কোন ক্রিয়াকর্ম হবে না সতীর। পঁয়তাল্লিশ দিন গত হলে পর দ্বিচান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্য, নারায়ণ বলিযাগ, কুশপুত্তলিকা দাহন ইত্যাদি ক্রিয়া-কর্ম

করে ত্রিরাত্র অশৌচ পালন করতে হবে তার। তিনদিন পর শ্রাদ্ধের অধিকারীকে শ্রাদ্ধাদি কর্ম সমাপন করে প্রেত গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করতে হবে তাকে তবেই নাকি প্রেতমুক্তি হবে সতীর। আত্মার শান্তি হবে তার।

শুনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন মামা। ভূতুকে তাহলে চট্ জলদি পাঠাবার কোন প্রয়োজন নেই তার, থাক এখন ভূতনাথ। সময়ই হল মানুষের বড় প্রবোধদাতা। কালই হরণ করতে পারে তার শোক।

জীবনে বোধ হয় এতবড় আশ্চর্য্যের কখনও সম্মুখীন হতে হয়নি ভূতনাথকে! সতীকে স্বশরীরে নিজের চোখে তার দেখা সত্যটা এমনভাবে মিথ্যে হয়ে গেল সকলের কাছে! এটা যে বিশ্বাস করতে পারছে না সে কিছুতেই। এধারে বিকেল বিদেয় হয়ে এল সন্ধ্যা। সন্ধ্যা গড়িয়ে এল রাত। মামী-মার কথায় কপাট অবশ্য খুলল ভুতনাথ। সকলের সঙ্গে বসে রাতের খাবারটাও খেল সে। কিন্তু সব সময় তার একটা চিন্তাভারগ্রস্ত ভাব। কেমন যেন একরকম ঘোরে রইল সে। বললে কোন কথার উত্তর দেয়, কোন কথার আবার দেয় না। সব কথা তার কানে যায় কি না কে জানে। সদা চঞ্চল, হরবলা, স্ফূর্ত্তিবাজ ভূতনাথের এমন নিঝুম হয়ে থাকাটা সত্যিই বেমানান।

সেই গম্ভীর অবস্থাতেই তার একলা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল ভূতনাথ। ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখদুটো তার জড়িয়ে এল কে জানে। মুহূর্ত্ত মধ্যে গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হল সে। রাত তখন কতটা হবে কে জানে। তবে ভূতনাথের মনে হল প্রকাশ্যে দিবালোকে একেবারে জ্বলন্ত বাস্তবের মধ্যে অবস্থিত সে। ডিউটি থেকে এসে বাড়ীতে স্নান আহার সেরে মধ্যাহ্নের নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে সে। হঠাৎ শয্যার পাশে চেয়ারে বসা শাশ্বতী বিরক্তিভাবে বলে উঠল তাকে—তুমি কিরকম মানুষ বলতো ভূতুদা! বসতে বলেই আমাকে ঘুমিয়ে গেলে তুমি? আমি বুঝি এমনি বসে থাকবো?

ভূতনাথ গম্ভীর। কোন কথারই তার উত্তর দিলে না সে। মিষ্টি মধুর স্বরে আবার বলে উঠল শাশ্বতী,—আমার উপর রাগ করলে ভূতুদা? ও ভূতুদা—

—রাগ করবো না তো কি? ধমকে বলে উঠল ভূতনাথ—তুই মামা মামী সকলের সামনে আমাকে কেমন খেলো করে দিলি বলতো? কোথায় লুকিয়ে ছিলি এতক্ষণ।

—লুকিয়ে আবার থাকবো কোথায়? বলে উঠল শাশ্বতী, —চেয়ারটায় বসতে বললে তুমি তাই তো আমি বসে আছি।

—কিন্তু ওরা যে কেও দেখতে পেল না তোকে?

—পাবে কেন। ওদের কাছে যে আমি মরে গেছি।

—আর আমার কাছে?

—তোমার কাছে কি আমি কোনদিন মরতে পারি ভূতুদা?

—তবে আমি তোকে তখন দেখতে পেলাম না কেন?

—নাই বা দেখতে পেলে তুমি, আমি কিন্তু তোমাকে দিব্য দেখতে পাচ্ছিলাম। বলেই ফিক্-ফিক্ করে হেসে উঠল সতী। ফাজলামির হাসি,—বাবাঃ! কেমন পাগলের মত ঘরের কোনায়, তক্তার বাক্সর আড়ালে, তলে খুঁজছিলে তুমি আমাকে। যেমন আমি তোমার কত হারিয়ে যাওয়া, লুকিয়ে থাকার জিনিস।

—ফাজলামি রাখ সতী। গম্ভীর হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ—আর রহস্যে ফেলিস না আমাকে। তুই এখানে কি করে এলি বল?

—কি করে আবার। তেমনি হাসিমুখে বলে উঠল সতী, —মনে করতেই ওমনি তোমার কাছে এসে হাজির হলাম।

—ইয়ার্কি করছিস? ধমক-চাপা গলায় বলে উঠল ভূতনাথ, মনে করলেই ওমনি কেউ আসতে পারে নাকি? তার উপর আবার তোর মত মেয়ে। অচেনা জায়গা, পথ-ঘাট জানিস নে, চিরকালটা ঘরের কোনায় কাটিয়েছিস। কি যে বলিস তুই—

—সত্যি বলছি ভূতুদা, বলে উঠল সতী, —মনে করতেই তোমার কাছে চলে এলাম আমি। আমার আর পথ-ঘাট চেনা-জানার কিচ্ছু দরকার হয় না ভূতুদা। বাবা মহাদেবের মনুই-প্রসাদ খাবার পর কি যে হয়েছে

আমার, স্মরণ করা মাত্রই যেখানে খুশি তৎক্ষণাৎ সেখানে চলে যেতে পারি আমি। যাকে ইচ্ছা মনে করলেই ওমনি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই তাকে। হাজিরও হয়ে যাই চট্ করে তার কাছে।

—ওঃ তাই বুঝি তুই আমার কাছে হুট্ করে ওমনি উড়ে চলে এলি? একটু বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে বলে উঠল ভূতনাথ।

সতীও ওমনি তার ভঙ্গীটা টেনে বলে উঠল তার কথার উত্তরে,—কি আর করব বল, বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এলে না যখন তুমি তখন আমাকেই আসতে হল তোমার কাছে। কিন্তু বাবাঃ! কি রাগ তোমার! ধমকে বের করে দিচ্ছিলে আমাকে।

—ধমকাবো না কেন বল? বলে উঠল ভূতনাথ—একনাগাড়ে আমি বকর বকর করে বকে যাব আর তুই মৌনীবাবা হয়ে বসে থাকবি সেটা তো চলবে না। জানিস তো, আমি মুখ গোমড়া হাঁড়ি-মুখো লোকদের মোটেই পছন্দ করি না। তাছাড়া তুই তো বোবা নস। আমার স্ত্রী। স্বামী হয়ে তোর কাছে দোষ স্বীকার করলাম, মাফ চাইলাম তবু রাগটা ভাঙ্গল না তোর? মুখ ভার করে তাকিয়ে রইলি আমার দিকে!

—ছিঃ ভূতুদা, ওভাবে বলোনা তুমি। দুঃখ ভারাক্রান্ত ভাবে বলে উঠল সতী,—তুমি আমার কত সাধনার ধন। তোমার উপর কি কখনও রাগ করতে পারি আমি?

—তবে তখন ওমনি গম্ভীর হয়ে ছিলি কেন? বলে উঠল ভূতনাথ,—দিব্যি তো এখন ফড়ফড় করে কথা বলছিস। তখন ওমনি কথা বললে অযথা তোকে কি ধমকাতে যেতাম আমি?

বিষাদভরা স্বরে বলে উঠল সতী, তুমি বিশ্বাস কর ভূতুদা, হাজার চেষ্টা করেও তখন কথা বলতে পারিনি আমি। কি যে হয়েছিল বাবার মনুইটা খাবার পর অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে হঠাৎ বাকরুদ্ধ হয়ে গেল আমার। সেই বাকরুদ্ধ অবস্থায় কিছুক্ষণ পর সেই যন্ত্রণা-কাতর জড়দেহটা থেকে একটা ধোঁয়াটে ধূসর অবয়ব নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। জ্বালা-যন্ত্রণাশূন্য সুন্দর হাল্কা একটা শরীর হল আমার। মনে করতেই তোমাকে এ বাড়ীতে পেলাম আমি। আর দেখার সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হয়ে গেলাম তোমার কাছে। কিন্তু দেহ ছাড়ার পূর্ব-মুহূর্তের সেই বাকরুদ্ধ অবস্থাটা তখনও কাটেনি আমার তাই বোধ হয় জেরটাতে তার তখন কথা বলতে পারিনি তোমার সঙ্গে।

—তুই তাহলে সত্যিই মরে গেছিস সতী? অবাক হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ! চোখে মুখে তার বিস্ময়।

কেমন যেন একটা ব্যথাচাপা বেদনার স্বরে বলে উঠল সতী,—হ্যাঁ ভূতুদা। সেই কথাটাই বলতে এলাম তোমাকে। সুখে থাক তুমি। আনন্দময় হোক তোমার জীবন।

—আর তুই?

—আমাকে শিবলোকে যেতে হচ্ছে ভূতুদা। বাবা মহাদেবকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেছি আমি তাই বাবা তার অনুচরদের পাঠিয়েছেন আমাকে নিতে।

—না, কিছুতেই যেতে পাবি না তুই। গর্জে উঠল ভূতনাথ—আমি তোকে কিছুতেই যেতে দেবো না সতী।

—তাই কি হয় ভূতুদা? শান্ত গম্ভীর স্বরে বলে উঠল সতী,—যেতে যে আমাকে হবেই।

—আমাকে ফেলে যেতে পারবি তুই? ভুলে থাকতে পারবি তুই আমাকে?

—অবুঝ হয়োনা ভূতুদা। কান্না-চাপা গলায় বলে উঠল শাশ্বতী,—এভাবে মায়াটা বাড়িয়ে দিয়ে অযথা আর কষ্ট দিও না আমাকে। তোমাকে কি কখনও ভুলে থাকতে পারি আমি। কিন্তু যেতে যে আমাকে হবেই ভূতুদা।

—বেশ, তবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল তোর সঙ্গে।

—তা হয় না ভূতুদা।

—কেন তা হয়না? স্বামী-স্ত্রী তাহলে কি জন্য? আমি কি তোকে ভালবাসিনি? বাবা মহাদেবের সামনে আমি যে তোকে গ্রহণ করেছিলাম। জীবনে তোকে এমনি ভাবে ছেড়ে দেবার জন্য কি? শোন সতী তুই যেখানে যাবি আমিও সেখানে যাব। তোর যেখানে অধিকার আমারও সেখানে অধিকার।

বিষাদ মাখা শুকনো মুখটায় কষ্ট করে হাসি ফুটিয়ে বলে উঠল সতী,—সবই স্বীকার করলাম আমি। কিন্তু

তোমার যে এখনও সময় হয়নি ভূতুদা। অনেক কাজ পড়ে আছে জীবনে তোমার। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন ভূতুদা। যেতে আমায় অনুমতি দাও তুমি।

—না, ধমকে সতীকে বলে উঠল ভূতনাথ—আমাকে ছেড়ে কিছুতেই আমি যেতে দেব না তোকে। যতদিন বেঁচে থাকব আমি ততদিন থাকতে হবে তোকে আমার সঙ্গে এই পৃথিবীতে।

—আর আমায় টেনো না ভূতুদা। ওধারে শিবদূতরা আমাকে নিয়ে যাবার জন্য করছেন তীব্র আকর্ষণ। ভোর হয়ে এল। দু-টানায় পড়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি আমি। অনুমতি দাও আমাকে। আমি যাই।

—আর তুই চলে গেলে আমি বুঝি কষ্ট পাব না? ভুলে তোকে আমি থাকতে পারব ভেবেছিস জীবনে? না সতী, তোকে আমি কিছুতেই ছেড়ে যেতে দেব না আমাকে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! ভূতনাথের কোন অনুমতির অপেক্ষা না করেই সতী বসা অবস্থাতে উঠতে লাগল শূন্যে। আকাশের কোন সুদূর প্রান্ত থেকে বাড়ীর ছাদ ভেদ করে দেখা গেল একটা আলোর পথ। সেই পথ ধরেই না জানি কি এক আকর্ষণে আস্তে আস্তে উপরে উঠতে লাগল সতী। চিৎকার করে উঠল ভূতনাথ—আমি তোর স্বামী সতী, বলিস তোরা পতি পরম দেবতা। সেই স্বামী দেবতাই আদেশ করছে তোকে, আমাকে ফেলে যাসনি তুই।

কিন্তু সেই অমোঘ আকর্ষণে সব শক্তিই যেন হারিয়ে গেল সতীর। তাই আর কোন কথা বলতে পারল না সে। চেয়ে রইল তার দিকে বিষাদ করুণ হতাশা ব্যাকুল সে এক অদ্ভুত অপলক দৃষ্টিতে। ভূতনাথ কিন্তু চিৎকার করতে ছাড়ল না, —যাসনে সতী, আমাকে ছেড়ে যাসনে তুই। একলা ফেলে যাসনে আমাকে। এক নাগাড়ে ডেকেই চলল ভূতনাথ তাকে, —সতী, সতী, সতী—

চিৎকারে তার ছুটে এলেন মামা। মামী-মাও এলেন তার পিছু পিছু। হঠাৎ এমন রাত্রে কেন চেঁচাচ্ছে ভূতনাথ! কি হয়েছে তার? কিন্তু বলবে কি! এধার ওধার তাকাতে লাগল সে হাবাগোবার মত। কোথায় বা সতী আর কোথায় বা তার ছাদ ভেদ করে আলোর পথে চলে যাবার দৃশ্যাবলী! একলা ঘরে তার বিছানার উপর শুয়ে আছে সে। আর চারধারে তখনও রাত্রির রাজ্য—অন্ধকার।

ভূতনাথের সেই অভিভূতের ভাবটা ঝাঁকরানি দিয়ে কাটিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে উঠলেন মামা, —কিরে স্বপ্ন দেখছিলি নাকি?

হ্যাঁ, স্বপ্নই দেখছিল সে। তবে এটা দুপুর বেলায় জাগ্রত অবস্থায় দেখা স্বপ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অদ্ভুত স্বপ্ন! মামা-মামীমার দিকে বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভূতনাথ জিজ্ঞেস করে উঠল কেমন যেন এক ঘোরের সঙ্গে —সতী তাহলে সত্যিই মারা গেছে মামী-মা?

—হ্যাঁ, মারা গেছে। বেশ ভারিক্কি গলায় ধমকের সুরে বলে উঠলেন মামা, —ঘুমো তো এখন তুই। রাত আছে অনেক।

(সাত)

অতুলবাবু কত বোঝান ভূতনাথকে। মরণকে কেউ রোধ করতে পারে না। কালের করাল গ্রাস থেকে অব্যাহত পাবার কারো কোন উপায় নেই। মৃত্যু যে কখন, কাকে কেমনভাবে তার জীবন থেকে ছিনিয়ে নেয় কেউ তা জানতে পারে না। ইত্যাদি ইত্যাদি নানা আপ্তবাক্য। শোনান তিনি গীতার সেই সব মহান বাণী—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" "বাসাং সি জীর্ণানি যথা বিথায় নবানি গৃহ্নতি নরোপরানি।" কিন্তু মামার কথায় ভাগনের মন মানলে তো। জানে ভূতনাথ—"জন্মিলে মরিতে হবে"—এ পৃথিবীতে কেও অমর নয়। বুঝে ভূতনাথ, "জীবন প্রবাহ বহি, কাল সিন্ধু পানে ধায়"—কেও তা ফেরাতে পারে না। কিন্তু ফুটতে যাওয়া আশার কুসুম অকালে যদি ঝরে যায়? যায় হারিয়ে নদীর বুকে পড়ার মুহূর্তেই যদি পাহড়ের পথ কেটে আসা ঝর্ণা? দুঃখের মরুবালি ঠেলে আসা ধারা যদি সাগরে মেশার আগে শুকিয়ে যায়—তবে সে ব্যথা কি ভুলা যায় কখনও? সম্ভব কি ভূতনাথের সতীকে ভুলা? পারে কি সে কোনদিন বিস্মৃতির চির অন্তরালে শাশ্বতীকে ঠেলে দিতে? থেকে থেকে উদয় হয় তার নানা স্মৃতি। ভেসে ভেসে উঠে তার জীবনের নানা ঘটনা।

বিশেষ করে সদ্য ঘটা সেদিনে তার একলা ঘরে দুপুর বেলার ঘটনাটা—বড় বেশী উতলা করে ভূতনাথকে। ভাবিয়ে রাখে সারাক্ষণ তাকে নানা চিন্তার জটে। হিসেব করে দেখতে গেলে সময়টা ছিল তখন শাশ্বতীর মৃত্যুর ঠিক পর মুহূর্ত্ত। কোথায় ভূতগ্রাম আর কোথায় বোকারো। একেবারে স্বশরীরে সতী উদয় হল তার সামনে! সেই মুখ। সেই চোখ। অবিকল ঠিক সেই চেহারা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহাবয়বের কোথাও কোন বিকৃতি নেই। তার বরণ গড়ন যথাযথ। ভূতনাথের নিজের চোখে দেখা এই বাস্তব সত্যটাকে অবিশ্বাস করতে পারে সে কখনও? উড়িয়ে দিতে পারে কি সে এটা মামার কথায় হ্যালুসিনেশন বা দৃষ্টি-বিভ্রম বলে? অসম্ভব।

কিন্তু এমনভাবে হঠাৎ শেষ হয়ে গেল কেন সতী? কেন সে হঠাৎ এমনভাবে টেনে দিল তার জীবনের যবনিকা? তার অজ্ঞাতে, তাকে না জানিয়ে। কত আশা ছিল যে সতীর। তাকে ঘিরে ছিল কত যে তার স্বপ্ন। ছিল তার জীবনকে কেন্দ্র করে কত কামনা বাসনা। সে সব ফেলে চলে গেল সতী! গেল ছেড়ে তাকে জীবন নাট্যের শুরুতেই। ছেদ টেনে দিল তার জীবন থেকে সমস্ত সম্পর্কের। দানা বাঁধতে দিল না তার আশা-আকাঙ্খাগুলোকে। কিন্তু কেন? কেন? কেন?

ভাবতে লাগল ভূতনাথ। ভাবতে লাগল ঘরে,বাইরে, সব জায়গায়। ভাবতে লাগল কারখানার কাজে অকাজে সব সময়, সারাক্ষণ। ভাব গম্ভীর অবস্থা দেখে তার অবাক লাগতে লাগল সকলেরই। সদা-চঞ্চল, স্ফূর্তিবাজ, আমোদে ভূতনাথের এমন থাকাতো উচিত নয়। কোথা গেল তার হাসি-খুশি ভরা প্রকৃতি? কোথা গেল তার হরবোলা ভাব। মজা-লোটা স্বভাবটা তার হারিয়ে গেল কোথায়? তার হঠাৎ এমন মতি-গতির পরিবর্তন দেখে প্রমাদ গুণতে লাগল সবাই। সত্যি, কার জীবন যে কেমন ছকে বাঁধেন বিধাতা কে জানে। কে জানে তিনি কার জীবনের গুটি কখন কোন ঘরে বসিয়ে কেমন ভাবে তাকে পরিচালিত করেন। সতীর মত এমন কুরূপা পত্নীকে ভূতনাথ গ্রহণই বা করল কেন? গ্রহণ যদি বা করল তবে জীবনে তাকে এমনভাবে অগ্রাহ্যই বা করে এল কেন? আর অগ্রাহ্যই যদি করেছিল তাকে তবে তার মৃত্যু বিরহে এত কাতরই বা হওয়া কেন তার? দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। মনের গভীর গহনে মানুষ নিজের কাছেই নিজে একটা রহস্য। বাইরে থেকে অন্যে তার প্রকৃতির আঁচ করবে কে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সেদিন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসল ভূতনাথ। কাণ্ডটা ঘটল তার কারখানায়। কর্মরত অবস্থায় ছিল সে। কিন্তু তাহলে হবে কি—মন তো সেই সতী-সতী। কাজ চলছিল ইরেক্‌সন সাইডে। হায়ড্র মেশিনের সাহায্যে তোলা হচ্ছিল একটা ই.এস.পির ডাক্‌টিন। সাংঘাতিক জিনিষ সেটা। লৌহ দানব। বহরেও যেমনি, লম্বাতেও তেমনি তিন মিটার বাই পাঁচ মিটার। ওজন প্রায় তিন টন। প্রকাণ্ড সেই লৌহ দানবটাকে উপরে উঠাতে উঠাতে হঠাৎ সিলিং করল শ্লিপ। নীচেই ছিল ভূতনাথ। সতীর চিন্তায় অন্যমনস্ক। প্লেট ছেড়ে পড়তেই তাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে উঠল সবাই। কিন্তু কোন কিছু ভাববার বা করবার আগেই তার কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল কে জানে। হঠাৎ কোত্থেকে দুটো শাঁখা-চুড়ি পরা কালো হাত এসে এক ঝট্‌কায় টেনে তাকে ফেলল গিয়ে পাশের কতকগুলো গাদা করা লোহা-লক্কড় ও ভাঙা মেশিনপত্রের উপর। ভালভাবে কিছু দেখার আগেই সেই পর্বত প্রমাণ ডাক্‌টিনটা দুম করে পড়ল তার সামনেই। কেঁপে উঠল সমস্ত জায়গাটা। হায় হায় করে উঠল সবাই। মুখগুলো সকলের শুকিয়ে হয়ে গেল যেন কাঠ। হবেই না বা কেন। ওই প্লেটটার চাপে ভূতনাথের আর কি কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে? কিন্তু আশ্চর্য্য। পাশেই দেখল দিব্যি অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে ভূতনাথ। সবাই দেখে অবাক তাকে। অবাক ভূতনাথও সবাইকে দেখে। ওই চরম মুহূর্ত্তোতে কি করে সে ছিট্‌কে পড়ল এখানে? সকলের সঙ্গে ভূতনাথেরও এই একটাই প্রশ্ন। আশ্চর্য্য! কারখানায় তো কোন মেয়ে কাজ করে না। অথচ মেয়ের দুটো কালো হাত হট্ করে ধরে চট্ করে টেনে নিল তাকে কালদৈত্যটার ওই করাল গ্রাস থেকে। কে তার রক্ষাকর্তা?

এখানে আবার মেয়ে আসবে কোত্থেকে? হেসে উঠল সবাই। এ হাসি আশঙ্কা মুক্ত, বিপদ কাটা খুশির হাসি। সহজ সরল আনন্দে তারা ভাবল সবাই, নিশ্চয়ই ডাক্‌টিনটার হাওয়ার ঝটকায় ছিট্‌কে পড়েছিল ভূতনাথ বিপরীত দিকে। যাই হোক ভগবান রক্ষা করেছেন তাকে। নইলে আজ নিশ্চিত মৃত্যু ছিল তার। কিন্তু যে ভাবেই রক্ষা পাক সে আছড়ে পড়েছে তো সে জোরে নিশ্চয়ই। ছিট্‌কে পড়েছে মহাবেগে, সজোরে। আর পড়েছে

গিয়ে যত সমস্ত মেশিন ভাঙ্গা, এবড়ো-খেবড়ো ধারাল সুচালো লৌহ-লক্কড়ের উপর। সাংঘাতিক রকমের চোট লাগার কথা তার। আঘাত পাওয়ার কথা মারাত্মক ভাবে। কিন্তু কোথায় বা কি। ওসবের তো বালাই নেই-ই! এমন কি সামান্য একটু কাটা ছিটাও যায়নি তার। থেত্‌লে যাওয়া ছুলোছুটি দূরে থাক শরীরের তার কোথাও এতটুকু আঁচড় লাগার পর্যন্ত চিহ্ন নেই। অবাক! এমনকি এসব কথা জিজ্ঞেস করতেও ভূতনাথ হাবা-গঙ্গারাম। ভাবটা তার এমন—যেন আরামে এখানে নরম বিছানার উপর ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ডাকতে হাঁকতে এতক্ষণে আড়মোড়া দিয়ে উঠছেন বাবু।

যেমন ভাবেই প্রশ্ন করা হোক তাকে উত্তর তার একটাই। নিশ্চয়ই কোন মেয়ে তাকে টেনে নিয়েছিল হঠাৎ। বুকের উপর নিয়ে তাকে শুয়ে পড়েছিল ওই লোহা-লক্কড়গুলোর উপর। সুতরাং চোট লাগবার কথা তো ওই মেয়েটারই। তার আঘাত লাগবে কি করে?

যা বাবাঃ! এখানে আবার মেয়ে কোথায়! এঁড়ে ছাড়া গাই-বকনের এখানে কোন প্রবেশাধিকারই নেই। তাই হেসে উঠল সবাই। কিন্তু মোটেই এসব হাসবার কথা নয়। হঠাৎ এমন একটা কাণ্ডের মুখে মাথার কারো ঠিক থাকে কখনও। এটা হল নার্ভাসনেশ ভূতনাথের। স্বাভাবিক। নইলে ওমনি শাঁখা-চুড়ি পরা হাত দেখা, মেয়ের তাকে টেনে নেওয়া, বুকের উপর নিয়ে সে মেয়ের তাকে রক্ষে করা—এসব অবান্তর, আজগুবি কথা বলতে পারে সে? যাই হোক মস্ত একটা ফাঁড়া কাটল ভূতনাথের।

ব্যাপারটা রটে গেল কারখানার প্রায় সমস্ত সাইডেই। ভূতনাথের বিপদের কথা শুনতে না শুনতেই ছুটে এলেন তার মামা, অতুলবাবু। এলেন তার বন্ধু সুপারভাইজার পাপ্পু ধীলনও। শুনলেন তিনি সমস্ত কথা। চাপা ধমকও দিলেন তিনি একটা ভূতনাথকে—এমন অসাবধানভাবে কাজ করে কেও? কিন্তু বেহুঁস তো ভূতনাথ কোন কালেই ছিল না। সাম্প্রতিক স্ত্রীর মৃত্যুটা তাকে করে দিয়েছে ওমনি অন্যমনস্ক। সব দিক বুঝে-সুঝে এরূপ মানসিক অবস্থায় আপাততঃ ভূতনাথকে কাজে আসতে নিষেধ করলেন ধীলন সাহেব। মামা তাকে এই দিনকতকের ছুটিতে যেতে বললেন বাড়ী। কারণ ভূতগ্রামে গিয়ে বন্ধু-বান্ধব, এর-ওর সঙ্গে মেলা-মেশা করলে মনটা অনেকটা হাল্কা হবে ভূতনাথের। এ অবস্থাটা কেটে গেলেই আবাব কাজে এসে যোগ দেবে সে।

এবার কিন্তু মামার কথার আর অবাধ্য হল না ভূতনাথ। বাড়ী যেতেই মনস্থ করল সে। যাবার দিন রাত্রেই আবার সতীকে সে দেখল স্বপ্নে। স্বপ্নে দেখা জায়গাটা কিন্তু বোকারো নয়। তাদের গ্রামেব সেই বাবা ভূতনাথের মন্দির। মন্দিরের সেই অতীতঘটনাটা স্বপ্নে উদয় হল তার উল্টোভাবে। সতী নয়, মন্দিরের সেই উঁচু দাওয়াটাব উপর দাঁড়িয়ে আছে ভূতনাথ একলা। আর সতী দাঁড়িয়ে আছে সেদিনের সেই তার দাঁড়িযে থাকার জায়গাটাতে। অর্থাৎ দাওয়ার নীচে পথের পাশে সাদা বড় পাথরটার গোড়ায়। হঠাৎ কারখানাব সেই ডাকটিনটা মস্ত একটা রাক্ষসের মত বিকট শব্দে উড়ে পড়তে এল তার গায়ের উপর। আর ওমনি সতী হঠাৎ তার শাঁখা চুড়ি পরা হাত বাড়িয়ে টেনে নিল তাকে। নিজের বুকের উপব নিয়ে তাকে পড়ল গিয়ে পাথরটার উপর। তারপর কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল কে জানে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সতীর বুকের থেকে উঠল ভূতনাথ। জিজ্ঞেস করল তাকে,—তোর কোথাও লাগেনি তো সতী?

উত্তরের পরিবর্তে মুখ টিপে হাসল সতী। হাসি মুখেই সে বলে উঠল ভূতনাথকে,—কি বিপদটা এক্ষুনি ঘটিয়ে ছিলে বলতো? সব সময় এমন আমাকে কেন চিন্তা কর বল দেখি? আমি কি তোমাকে ছেড়ে চলে গেছি? তোমার কাছেই থাকি তো আমি সারাক্ষণ।

বিস্ময় ভরা চোখে ভূতনাথ দেখতে লাগল সতীকে। তারপর বলে উঠল সে আবেগ-জড়িত কণ্ঠে,—সত্যি বলছিস সতী—আমাকে ছেড়ে যাসনি তুই? সত্যিই তো দেখছি আমি তোকে আমার চোখের সামনে? ফেলে যাসনি তুই আমাকে? সত্যি বলছিস?

মুখে হাসির মুক্তা ঝরাল সতী। বলে উঠল সে,—সত্যি না হলে এই শাঁখা-চুড়ি পরা হাতদুটো আমার দেখতে পেতে কি তুমি আজ? ফেলে চলে গেলে তোমায় আজ কি কাণ্ডটাই না ঘটত বল দেখি তোমার?

—কি আর ঘটতো? মারা যেতাম। সোজা সরল স্বরে বলে উঠল ভূতনাথ, —ভালোই হত। সঙ্গী হতাম তোর। চলে যেতাম তোর কাছে।

শুভ্র হাঁসির ঝিলিক মেরে বলে উঠল সতী,—এভাবে তোমার মৃত্যু হলে সঙ্গী হতে কি আমার পারতে তুমি ভূতুদা? পারতে কি যেতে তুমি আমার কাছে? বরং ফল হত উল্টো। তোমার আমার মিলন হত সুদূর পরাহত। অপমৃত্যু হত তোমার। সূক্ষ্ম সত্তা থাকত তোমার বহুদিন সংজ্ঞাহীন মূর্চ্ছিত হয়ে। আত্মশক্তি সুদীর্ঘকাল পড়ে থাকত তোমার তন্দ্রাচ্ছন্ন। অচৈতন্য অবস্থায়। ব্যভিচারী গতিপ্রাপ্ত হত তোমার। ঘুরে বেড়াতে ঘোরে তুমি প্রেত হয়ে। সে বড় কষ্টদায়ক অবস্থা হত তোমার ভূতুদা।

—এতেও আমি তোকে হারিয়ে কম কষ্ট পাচ্ছি না সতী। বলে উঠল ভূতনাথ—মৃত্যুটা তোর কিছুতেই আমি পারছি না সহ্য করতে।

—মরে আমি যাইনি ভূতুদা। হারিয়ে আমি যাইনি তোমার কাছ থেকে। বলে উঠল সতী,—স্থূল দেহটা আমার চলে গেছে সত্যি কিন্তু সূক্ষ্ম দেহে আছি আমি তোমার কাছে। আছি ঠিক আগের মতই। এ দেহে আমি ইচ্ছামাত্র যেমন চলে যেতে পারি নীহারিকাপুঞ্জেও তেমনি আবার এ দেহ নিয়ে আমি মুহূর্তে হাজির হয়ে যেতে পারি তোমার কাছে। আমার আর কোনও কষ্ট নেই ভূতুদা'। কোন চিন্তা করো না তুমি আমার জন্য।

—কিন্তু তুই সেদিনে যে বললি শিবদূতেরা নিতে এসেছে তোকে। শিবলোকে চললি তুই।

—যেতে আর পারলাম কৈ। হাসি মুখে বলে উঠল সতী,—তোমার আদেশ অমান্য করে আমি কি যেতে পারি কোথাও? একলা আমি মুক্ত হতে চাই না ভূতুদা। মুক্তি পেতে চাই আমি তোমার সঙ্গেই।

—বেশ তো, তবে আমায় যুক্ত করে নে-না সতী তোর সঙ্গে।

—যুক্ত তো তুমি আমার সাথে হয়েই আছ ভূতুদা। মন যে তোমার আমার সঙ্গে এক সূতায় বাঁধা। তুমি আমি যে অভেদ আত্মা ভূতুদা। উভয়ের সত্তা আমাদের অভিন্ন। তাই তো তোমায় ছেড়ে অন্তর আমার কিছুতেই যেতে রাজী হল না ঊর্দ্ধলোকে।

—সত্যি বলছিস তুই? বলে উঠল ভূতনাথ,—আমায় ছেড়ে যাবি না আর? একলা ফেলে যাবি না আমাকে কোথাও?

হাসল সতী। বলে উঠল মিষ্টি মধুর স্বরে,—এতে আবার বলা কওয়ার কি প্রশ্ন থাকতে পারে ভূতুদা?

—পারে বৈ কি। কেমন যেন এক অভিমানের সুরে বলে উঠল ভূতনাথ,—তোর ওই ইষ্ট দেবতার টান? শিবলোক, ঊর্দ্ধলোক?

ভাব-গম্ভীর স্বরে বলে উঠল সতী,—তুমিই আমার ইষ্টদেবতা ভূতুদা। তুমিই আমার মহাদেব, মহেশ্বর। তোমার লোকই শিবলোক আমার। তুমি যেখানে থাকবে সেইখানেই আমার ঊর্দ্ধলোক। বাবা ভোলানাথের আশীর্বাদ পেয়েছি আমি। পেয়েছি তাঁর আদেশ। তাঁকে স্মরণ করতে করতে তোমার মঙ্গল চিন্তায় পার্থিব জড়দেহ পরিত্যাগ করেছি আমি। তাই পেয়েছি তাঁর করুণা। এ সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে তোমার সঙ্গে মর্তে যোগাযোগ করবার পেয়েছি আমি তাঁর কাছ থেকে অধিকার। সেই বাবা মহেশ্বরেরই কৃপাতে সূক্ষ্ম হাতদুটো আমার জড় রূপে মহাশক্তি ধরে আজ রক্ষা করেছে তোমাকে। এবার থেকে নিশ্চিন্ত থাক তুমি। তাঁকে স্মরণ করে তোমার কল্যাণে নিজেকে যুক্ত করতে পারব আমি। যে লোকেই আমি থাকি না কেন স্মরণ মাত্রই আসবো আমি তোমার কাছে। সব সময় অবশ্য জড়চোখে তুমি দেখতে পাবে না আমাকে। কিন্তু জানবে তুমি সদা-সর্বদা আছি আমি তোমার কাছেই।

—কিন্তু আমি এখানে যে আর থাকব না সতী। যাব আমি ভূতগ্রামে। কাল সকালেই রওনা হব বাড়ী।

হেসে উঠল সতী। বলে উঠল মিষ্টি মধুর হাসি মাখা মুখেই,—জানি আমি। সেখানে যাওয়াটা তোমার খুব দরকার ভূতুদা। মায়াটা আমার জন্য চোখের জল ফেলে বড় কষ্ট দিচ্ছে আমাকে। কোন ইচ্ছাশক্তি আমার তরঙ্গ তুলতে পারছে না তার মনে। এমন জড়ীভূত আধারটা তার যে কোন কম্পনই প্রেরণ করতে পারছি না আমি তার অন্তরে। সদাচঞ্চল এমন মন তার যে ঘুমন্ত অবস্থাতেও যে নির্দ্দিষ্ট কোন স্মৃতির সূত্র ধরে তার জড়দেহ থেকে সূক্ষ্মশরীর বের করে স্বপ্নে তাকে দেখা দিয়ে বুঝিয়ে তাকে শান্ত করব তার উপায়ও পাচ্ছি না আমি। তাই তোমার মামার মনে আমার চিন্তা প্রেরণ করে বাড়ী যেতে বলা হল তোমাকে। তুমি যেয়ে সেখানে মায়ার কান্নটা থামাও গিয়ে ভূতুদা। পারবে তুমি।

—কিন্তু সেখানে গিয়ে তোকে পাবতো? পাবোতো তোকে এমনি ভাবে দেখতে? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

বলে উঠল সতী,—কেন পাবে না। সেখানেই তো সত্তা আমার-ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের বস্তুকণা আকর্ষণ করে জড়দেহে রূপ নিয়েছিল। কিন্তু সে দেহ যখন পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেছে তখন নাই বা দেখতে পেলে আমাকে সে চেহারায়। অবশ্য ইচ্ছা করলেই দেখতে তুমি পাবে আমাকে এরূপে। তবে তার জন্য ব্যাকুল হয়ো না তুমি। প্রয়োজন হলে আমিই দেখা দেব তোমায়। যাও তুমি বাড়ী—জন্মভূমি জননীর পবিত্র স্নেহের ক্রোড়ে। যাই আমি ভূতুদা।

চলে গেল সতী। হাসি-মাখা মুখটা তার আবছা হয়ে গেল আস্তে আস্তে। গেল যে কোথায় সে বিলীন হয়ে কে জানে। ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল ভূতনাথের। অন্ধকার ঘরে অভিভূতের মত এধার ওধার তাকাতেই সম্বিৎ ফিরে এল তার। স্বপ্ন দেখছিল সে। অদ্ভুত স্বপ্ন। ঠিক একেবারে বাস্তবের মত। সেদিনের স্বপ্নে দেখা সতী আজকের স্বপ্নে উদয় হয়েছিল তার আরো উজ্জ্বল রূপে। মুখে নেই তার বিষাদের ছায়া, চোখে নেই তার হতাশার ছাপ। অবলা সতী হরবলা হয়ে বলল তাকে যে সমস্ত কথা তা এ পর্য্যন্ত কোনদিন, কারো কাছে শুনেনি ভূতনাথ। আশ্চর্য্য! এ সমস্ত জ্ঞান-গর্ভ পণ্ডিতি-কথা সতী জানল কি করে? ভূতগ্রামের অশিক্ষিত গেঁয়ো-মেয়েটা এত বিজ্ঞ হল কখন? আচ্ছা, স্বপ্ন ছাড়া সতীর কি আর বাস্তবে তার কাছে আসবার কোন ক্ষমতাই নেই? কিন্তু বলে গেল যে সে ইচ্ছা করলেই তাকে দেখতে পাবার কথা। ভূতগ্রামেই যখন জন্ম-পুষ্টি-বৃদ্ধি তার, সেই গ্রামেরই শ্মশানের বুকে যখন পঞ্চভৌতিক দেহটা তার লীন হয়ে আছে তখন দেখাই যাক না গ্রামে গিয়ে তার দেখা পাওয়া যায় কিনা। স্বপ্নে তাকে দেখা দেওয়াটা যদি সতীর সত্য হয় তবে তার বলে যাওয়া কথাগুলো নিশ্চয়ই সত্য হবে। দেখাই যাক না।

সেই স্বপ্নের ঘোরটা নিয়েই সকাল হল ভূতনাথের। সকাল হতেই সে যাত্রা করল গ্রামে। নিশ্চিন্ত হলেন মামা অতুলবাবু। বর্তমান মানসিক অবস্থায় ভূতনাথের এখানে থাকাটা সত্যিই একটা উদ্বেগের বিষয় হয়েছিল তার।

বাঁকুড়া বাস স্টপেজে নামল যখন দিনটা তখন দুপুরের দিকে। ইতিউতি করতেই বাল্যবন্ধু নেপালের সঙ্গে দেখা। এই নেপালই এককালে ডানহাত ছিল ভূতনাথের। ছিল সে তার সমস্ত কাজের সঙ্গী। একান্ত অনুগত শাকরেদ। গ্রামে যাবার সঙ্গী হল সে-ই। ঠিক হল সোজা হাঁটাপথে নদী পেরিয়ে বটতলার ঘাটটা হয়ে পশ্চিমের চড়কতলার মাঠটা দিয়ে উঠবে তারা গাঁয়ে। ঘর পৌঁছবে দুপুরের আগেই। সুতরাং হাঁটা পথেই চলল তারা। আসতে আসতে অবাক হল নেপালচন্দ্র ভূতগ্রামের ভূতের মুখ বোবা করে আসার ভাবটা দেখে। গুরুর তো এমন স্বভাব হবার কথা নয়। সতীর সঙ্গে বিয়েটা যে তার হয়েছিল তা তো নিছক ঝোঁকের মাথায়। ওরকম একটা মেয়েকে গুরুর মনে-প্রাণে গ্রহণ করার যে কথা নয় তা তার বন্ধু মহলে জানতো সবাই। প্রমাণও দিয়েছিল তার আচরণটা বিয়ের পর সতীকে এড়িয়ে চলার ব্যবহারে। তার উপরই তো রাগ করে চলে গেছল সে। তারপর কোন খবর নেওয়া দূরে থাকুক, মরার পরও একবার খোঁজ নিতে আসেনি সে। যাক গে ওসব কথা। ঘাম দিয়ে তো জ্বর ছেড়ে গেছে তার। উটকো বোঝা নেমে গেছে তো এখন তার কাঁধ থেকে। ঘাড়ে চাপা ভূত আপনি তাকে ছেড়ে পালিয়েছে চিরকালের মত। আপদ-যখন বিদেয় হয়েছে তখন ভূতনাথ আবার সেই তেমনিভাবে ফিরে আসুক না তাদের দলের গুরু হয়ে। সেই হুড়ুম দাড়ুম্ হনুমেনে কাণ্ডগুলো আবার শুরু করে দিক সে বেপরোয়াভাবে। মজা লোটার বয়সটাতো এখনও পেরিয়ে যায়নি তাদের। বোধহয় এই কথাগুলোই গুছিয়ে বলতো নেপলা। কিন্তু গ্রামের মাথায় শালী নদীর ঘাটে উঠতেই ভেস্তে গেল তার সমস্ত মতলবটা। কারণ গুরুর ভাব তখন গম্ভীর।

ঘাটের মাথায় শ্মশান পাশের ঝাঁকড়া বটগাছটার তলায় গিয়ে বসল ভূতনাথ। কেমন যেন একরকম দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল নদীর বুকের বালুচরটার শ্মশানটার দিকে। এটাই তাদের গাঁয়ের শ্মশান। নাম বটতলার ঘাট। গ্রামের সকল লোকের অন্তিম যাত্রার শেষ আশ্রয়তল এই শ্মশানঘাট। জীবনের হাসি-কান্নার সব পাট চুকিয়ে বিলীন হতে আসে সবাই এখানে—বিস্মৃতির চির অন্তরালে। সতীর দেহও নিশ্চয়ই বিলীন হয়ে আছে

এ ঘাটেই, এই শ্মশানেরই চির-মৌন স্তব্ধতার মধ্যে। জিজ্ঞেস করতেই নেপাল দেখিয়ে দিল সতীর চিতাটা। বটগাছটার পূব পাশের বালি—ধূপধুপি চরটার মধ্যে বেশ কতকগুলো ছাই, কাঠ কয়লা ও পোড়া হাড়ের টুকরো নিয়ে অবস্থিত ছিল সেটা। যেন বুকে নিয়ে রক্ষা করছিল চিতাটা সতীর শেষ অস্তিত্বটুকু। আর মাস কতক পরেই নামবে বর্ষা। বন্যা এসে ভাসিয়ে দেবে সব কিছু। তখন আর কোন চিহ্নই থাকবে না সতীর এই ধরার বুকে। ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেবে একটা মানুষের ইতিহাস চিরকালের মত। এই হয়। এটাই নিয়ম। সকলের এটাই হল শেষ পরিণতি।

কিন্তু কেন এমন হয়। বসে বসে চিন্তা করতে লাগল ভূতনাথ। বলে উঠল নেপাল,—ক্লান্ত হয়ে গেছিস তো এখানে কেন, সামনের ওই চড়কডাঙ্গার মাঠটা পেরিয়ে বাবার মন্দিরে বসেই বিশ্রাম করবি চল্।

উঠল ভূতনাথ। চড়ক তলার ডাঙ্গাটা পেরিয়ে তাই এল বাবা ভূতনাথের মন্দিরের কাছে। পশ্চিম দিক থেকে গ্রামে ঢোকার এটাই প্রধান কুলি রাস্তা। গ্রামের যে কোন লোক বাইরে যাক বা ফিরে আসুক এ মন্দিরে মাথা ঠেকাতে কেও ভুল করে না। ভূতনাথ সে ধারার ব্যত্যয় ঘটাবে কেন। তাই নেপালের সঙ্গে বাবা ভূতনাথকে প্রনাম জানাতে সেও এল মন্দির প্রাঙ্গণে। কিন্তু তারিখটা সেদিন বিশেষ কোন যোগের বা তিথির ছিল কিনা কে জানে। কারণ পূজো তখনও শেষ হয়নি। ভিড় না থাকলেও মন্দিরের দাওয়ার উপর তখনও দাঁড়িয়ে ছিল বেশ দু-চারটা মেয়ে। আর ভিতর থেকে পূজো মন্ত্রের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে উচ্চারিত হচ্ছিল পুরোহিতের কণ্ঠের গুরু-গম্ভীর ধরম ডাক—গম্ভীরের ভোলা নাথমনি মহাদেব, কালভৈরব নাথমনি মহাদেব ইত্যাদি ইত্যাদি।

মন্দিরের পাশে সেই বড় সাদা পাথরটার কাছে দাঁড়াল ভূতনাথ। এই সেই তার স্মৃতি বিজাড়িত শিলা। এমনি এক পূজোর দিনে সাইকেলের উপর বসে এই পাথরটাতেই পা রেখে দাঁড়িয়ে ছিল সে। হঠাৎ উপরের ধস্তাধস্তির মাঝখানে সতী তার পূজোর থালা শুদ্ধো ফুল-বেলপাতা নিয়ে ছিট্‌কে পড়েছিল তার গায়ের উপর। টাল সামলাতে না পেরে তাকে বুকে নিয়ে পড়েছিল সে রাস্তায়। তারপর সে কি কেলেঙ্কারি! সে সমস্ত স্মৃতির ঝাঁপি নিয়ে নজরটা তার টানতে লাগল যেন মন্দির দাওয়াটায়। তাকাতেই হঠাৎ চোখে পড়ল ভূতনাথের কেয়া, কাকলি, সবিতা শ্যামলীদের। পূজো সেরে তারা বেরিয়ে আসছিল মন্দিরের ভিতর থেকে। এরাই সতীর সেই সয়লা। তার বাসর রাতটাকে হাসি-ইয়ার্কি, ফাজলামি আর মসকরাতে ভরিয়ে রাখার সঙ্গী-সাথী ছিল এরাই। কিন্তু এমন গম্ভীর কেন এরা। দাওয়ার নীচে তাদের নজরের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ভূতনাথ। মনে হয় দেখল তাকে। তবু তারা তাকে না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছে কেন? নাম ধরে তাদের ডাকতে আরম্ভ করল ভূতনাথ,—এ কেয়া, এ কাকলী, কিরে সবিতা, শোন রে শ্যামলী।

কিন্তু কি আশ্চর্য। ডাক শুনে তারা দাঁড়ালও থমকে। তাকালও তার দিকে। কিন্তু কোন কথা বলল না। বরং সামনে দিয়ে তার পেরিয়ে যেতে হবে বলে মন্দির দাওয়ার উল্টো পাশটা দিয়ে নেমে গেল তারা। গম্ভীর ভাবে। ডাক শুনে তারা দেখেও তাকে কণামাত্র গ্রাহ্য করল না। গটগটিয়ে ত্বরিত গতিতে যে যার পাড়ার কুলির ধরল পথ। চলে গেল নিজ নিজ বাড়ী। একদৃষ্টিতে তাদের দিকে বিস্ময়াভিভূতভাবে শুধু তাকিয়ে দাঁড়িয়েই রইল ভূতনাথ। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারল না। ভাবতে লাগল সে এটা তাদের ঘৃণা না অবহেলা? তাকে তো লজ্জা করবার মত মেয়ে নয় এরা। কারণ একদিন মাঠে-ময়দানে ক্লাবে প্রতিষ্ঠানে বেপরোয়াভাবে তার সঙ্গে মিশেছে তারা। এককালে ভূতুদা-অন্ত প্রাণ ছিল তাদের। কিন্তু আজ হঠাৎ তাকে এমন তাচ্ছিল্য করে চলে গেল কেন তারা? কিসের জন্য?

শুধু কেয়া-কাকলিদের দলই নয় আসতে আসতে দেখা হল ভূতনাথের ঝন্টু মন্টু হাবলু ফটকেদের সঙ্গেও। তাদেরও কেমন যেন তার প্রতি একটা নিস্পৃহ ভাব। অথচ একদিন তাদের গুরু ছিল সে। তাদের বাউণ্ডুলে কোম্পানীটার সেই ছিল ম্যানেজার। ইঙ্গিতে তার তলার মাটি উপর করত তারা। দিন নেই, দুপুর নেই ভোঁ-ভোঁ করে ঘুরে বেড়াত তার সঙ্গে। কথায় তার হনুমেনে কাণ্ড করে বেড়াত সারাক্ষণ। ভয়ও করত তাকে যমের মত। ভূতগ্রামের সেই ভূতকে তারা ভুলে গেল নাকি? অবাক তো! চাকরি করতে যাওয়াটা কি তার পক্ষে এতই অপরাধ? নইলে কি এমন সে অন্যায় করেছে যার জন্য তাকে আজ এড়িয়ে চলছে সবাই। সত্যিই, বড় বেশী তাজ্জব বনে গেল ভূতনাথ। তার যাওয়ার মাসকতকের মধ্যে গ্রামটার যে হঠাৎ এমন একটা পরিবর্তন হয়ে যাবে কে জানে। যেন এ ভূতগ্রাম সে ভূতগ্রামই নয়।

ভাবতে ভাবতে বাড়ী এল ভূতনাথ। আসাতে তার বাবার শান্তি, মায়ের তৃপ্তি হল বটে কিন্তু তার মনটা কেমন যেন ভাব-ভারিক্কি, বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়েই রইল। তার মধ্যেই স্নান হল ভূতনাথের। হল সারা খাওয়াদাওয়া। দেওয়া হল বাবাকে তার চাকুরী সম্বন্ধীয় নানা জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর। শোনা হল তার মায়ের নানা দুঃখ কষ্ট অভিযোগের কাহিনী। যার সব কিছুর জন্যে দায়ী নাকি তার বাবাই। মায়ের একবার মুখ খুললে সহজে থামে না। অনর্গল বোকেই চলে সে। বোকতে বোকতে প্রসঙ্গক্রমে এল সতীর কথা। অকালে যারা মাকে খায় তারা নাকি যে কুলে যায় সে কুলকেও খেয়ে বসে। ভাগ্য তাদের ভাল যে ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করলেও ভূতনাথ হঠ করে তাকে জোড়ে দিন করে ঘরে আনা হয়নি। নইলে তার ওই আত্মহত্যার অপবাদটা পড়ত এসে তাদের ঘাড়েই। বাপের বাড়ীতে বিষ না খেয়ে খেত যদি এসে শ্বশুর বাড়ীতে তবে যে রকম শত্রু-পুরীতে বাস তাদের আজ হয়ত পচতে হত তাদের জেলে। ভগবান মঙ্গলময়—তাই রক্ষে পেয়েছে তারা মিথ্যা দোষারোপ, কলঙ্কের হাত থেকে। কাল বোশেখিটা চলে গেছে যা হোক রাখু চাটুজ্জের ঘরের উপর দিয়েই।

কথায় কথা বাড়ল মায়ের। এসে পড়ল মায়ার কথা। সে তো ওই সতীরই বোন। একজন যেমন চুপ-ডান অন্যজন তেমনি মুখরা। এদ্দিন মায়াকে নাকি ভালই মনে করত মা। কিন্তু সেও যে এমনি খরিশ সাপের ডেকা সতীর মৃত্যুর পর তার ফোঁসফোঁসানি দেখে মালুম হয়েছে তার। একই ঝাড়ের বাঁশ যখন তখন আলাদা কখনও কি হতে পারে? বলে কিনা মুখপুড়ি তার দিদির মৃত্যুর জন্য তাদের নাকি অনাদর, অবহেলাই দায়ী। হতচ্ছাড়ি এমন ঠোঁট-কাটা তার মুখের উপর বলে কিনা, —ভূতুদা যদি একটু খবর নিত দিদির, দিত যদি তার একটা চিঠির উত্তর তাহলে নাকি দিদি তার মরত না। এই যদি মনে ছিল ভূতুদার তবে কি দরকার ছিল দিদিকে তার বিয়ে করার? কি এমন দোষ করে ছিল তার দিদি যে মাথায় সিঁদুর দিয়ে তাকে যমের কাছে উৎসর্গ করল? দিদির মৃত্যুর জন্য নাকি তার ভূতুদাই দায়ী। এত বড় কথা বলে কিনা মায়া। রটায় এসব গ্রামে ঘরে সকল জায়গায়। মা তাই নাকি দূর করে দিয়েছেন মায়াকে তাদের বাড়ী থেকে। নিষেধ করে দিয়েছেন তাকে কোনদিন এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙ্গোতে। মরেই যখন গেছে বৌটা তখন সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়েই দিয়ে গেছে সে তাদের সঙ্গে। অযথা শুকনা খোসকে খুঁচিয়ে ঘা করবার প্রয়োজন কি আর তাদের?

বলতে বলতে মা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো কে জানে। ভাগ্যে এসে পড়লেন নাম পাড়ার মানুপিসি। তাই বলা-মুখটা বন্ধ হল তার। মানু পিসি মায়ের নিত্য-দুপুরের রামায়ণ শোনার সঙ্গী। পাঠ হয় ওপাড়ার অন্নদা পিসির ঘরেই। পড়ুয়া নাকি মা নিজেই। পুণ্য বৈশাখ মাসে এ মহাকাব্যটি সংকল্প করে তিনি ধরেছেন পাঠ করতে। সুতরাং পাঠ সাঙ্গ করতে হবে তাকেই। পাকা-মাথা পাড়ার সধবা-বিধবারা অপেক্ষা করে আছে তার জন্য রামায়ণ পাঠের আসরে। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে বলে তাকে ডাকতে এসেছেন মানু-পিসি। সুতরাং যেতে তাকে হবেই। তাই রঘুকুল শিরমণি শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে মস্ত একটা প্রণাম নিবেদন করে উঠে দাঁড়ালেন মা। বলে গেলেন তিনি ভূতনাথকে যে হয়রান হয়ে এসেছে সে সুতরাং এখন কোথাও না গিয়ে যেন বাড়ীতে থেকে সে ঘুমোয়।

বাঁচল ভূতনাথ। একটু নিরিবিলি থাকতেই চাইছিল সে। ওধারে বৈঠকখানা ঘরে দিবা-নিদ্রায় মগ্ন বাবা। এধারে তার ঘরে ভূতনাথ একা। একা হলেও কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারছিল না সে। মায়ের কথাগুলো কেমন যেন কিলবিল করছিল তার মাথায়। পর্য্যালোচনা করে সেগুলো বুঝতে আর বাকী রইল না ভূতনাথের যে তার এখান থেকে যাবার পর একটা কাণ্ড বয়ে গেছে তাদের উভয় পরিবারের মধ্যে। ঘটে গেছে এমন একটা কিছু যা চিড় ধরিয়ে দিয়েছে রাখহরি চাটুজ্জে ও বলরাম বাড়ুজ্জের হৃদ্যতার মধ্যে। ধরিয়ে দিয়েছে ফাটল। ছিটিয়ে দিয়েছে তাদের সম্বন্ধটা। কিন্তু মায়া? যতই মা নিষেধ করুক তাকে তার আসার খবর পেয়ে তো সে কখনও চুপ করে থাকবে না। নিশ্চয়ই এতক্ষণ কেয়া কাকলিরা দিয়েছে তাকে তার আসার সংবাদটা। তবে?

ব্যাপারটা কি। স্বপ্নে বলা সতীর কথাই কি ঠিক? কাঁদছে মায়া? শোক বিহুল সে? ভোলাতে হবে তার শোক। মোছাতে হবে তার আঁখি। কিন্তু কেমন করে? যাবে সে তাদের বাড়ী। কখন? ভাবতে লাগল ভূতনাথ। হঠাৎ মেঘ না চাইতেই জল। তার দরজা গোড়ায় এসে দাঁড়াল মায়া। একরাশ ভাবনার জট মুহূর্তে যেন খুলে গেল ভূতনাথের। দেখেই তাকে আকুল আগ্রহে বলে উঠল সে, —মায়া, এলি তুই! আয়। তোর কথাই ভাবছিলাম রে।

কিন্তু মায়া যেন একটা নির্বাক চিত্র। মুখটা তার গম্ভীর। চোখ দুটো তার স্থির। দরজা গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল সে একটা নিশ্চল মূর্ত্তির মত। ভূতনাথ হাল্কা হাসির মায়া খেলিয়ে বলে উঠল মায়াবতীকে—জানি আমি, আমার আসার কথা শুনে তুই থাকতে পারবি না ঘরে। আসবিই তুই। কিন্তু দরজায় এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কাছে আয় আমার।

ভূতনাথের কথার কিন্তু কোন উত্তর দিল না মায়া। এলও না তার কাছে। এমন কি দেখলেই তাকে যে ঠোঁটের কোণে ঝিলিক মেরে উঠত তার মিষ্টি মধুর হাসি সেটাও অন্তর্হিত তার। বুঝতে পারল ভূতনাথ এসব হল তার সেই মায়ের কথাগুলোরই প্রত্যক্ষ ফল। টানে তার কাছে এলেও মনে আছে তার অভিমান। ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার আগে জল-স্থলের নিশ্বাস হরণ করে সমস্ত প্রকৃতি যেমন থাকে স্থির-নিশ্চল গুমোট ভাবে, মায়ারও তেমনি থমথমে ভাব। সমানে তার দাঁড়িয়ে আছে যেন গুমোট চাপা প্রকৃতি। হাতে তার একটা পুঁটলি। লাল শালুতে বাঁধা। কি যে এনেছে তার জন্য কে জানে। সেটার দিকেই নজরটা ফেলেই বলে উঠল ভূতনাথ,—ওটায় কি এনেছিস রে আমার জন্য? চৈত-গাজনের কদমা, মিঠাই? না তোর শিব চতুর্দশীতে করা কুলের আচার? দে না খাই, অনেক দিন খাইনি এসব।

মায়া কিন্তু তেমনি নির্বাক নিস্পন্দ। মুখে হাসি টেনে বলে উঠল ভূতনাথ—বুঝেছি, কাড়িয়ে না খেলে তোর মজা হয় না। কিন্তু জানিস তো সেবারে আমের আচারটা কাড়িয়ে খেতে গিয়ে দাঁতে তোর আঙ্গুলটা কেটে দিয়েছিলাম আমি। ভালয় ভালয় দে নইলে—মনে আছে তো?

নড়ল মায়া। কয়েক পা এগিয়ে এল তার কাছে। কিন্তু সামনে এসে তার আবার দাঁড়িয়ে গেল তেমনি থমকে। তার দিকে তাকিয়ে সেই আগের মত সহজ সরল ভঙ্গীমায় বলে উঠল ভূতনাথ তাকে,—সত্যি বলছি মায়া এখানে এলাম শুধু তোর কথা চিন্তা করে। নইলে সতী মারা যাবার পর ভেবেছিলাম আমি যে এ মাটিতে আর পা-ই দেব না। কিন্তু তোর মনের অবস্থা ভেবেই ছুটে আসতে হল আমাকে। তুই না এলেও বিকেলে যেতাম আমি তোদের বাড়ী। তোর দিদির শোকের আঘাত কেমন যে লেগেছে তোর প্রাণে কেউ না বুঝলেও—আমি তা বুঝি মায়া।

কেঁপে উঠল মায়ার ঠোঁট দুটো। চোখ দুটো উঠল তার ছলছল করে। কান্নার পূর্বাভাস। মনের ব্যাথাটা যেন তার বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে লাগল চোখে-মুখে। দরদ ভরা কণ্ঠে বলে উঠল ভূতনাথ—কাঁদিসনে তুই। সতীটা যে এমনি করে আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবে—কোনদিন তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি রে। অবশ্য এর জন্য আমিই দায়ী মায়া। এ অপরাধের ক্ষমা নেই আমার। মার্জনা নেই এ ক্রটির। প্রায়শ্চিত্ত নেই আমার এ পাপের।

কিন্তু ভূতনাথ শুধু একাই বকে চলল। বর্ষণ করে চলল নানা কথা। সান্ত্বনার বাণী। মায়ার দিক থেকে তার কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না। না কোন সাড়া, না কোন শব্দ।—তুই বিশ্বাস কর মায়া আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল ভূতনাথ। তোর দিদির মৃত্যুটা দিনরাত কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। পুড়িয়ে মারছে অনুতাপের আগুনে। অনুশোচনার জ্বালায় সারাক্ষণ জ্বলে পুড়ে মরছি আমি। আমার এ ব্যথা তুই ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। চোখের জলে আর কষ্টটা বাড়িয়ে দিসনে আমার। দাঁড়িয়ে না থেকে কাছে এসে একটু আমার কাছে বোস তুই। অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

কাঁদল না অবশ্য মায়া। কিন্তু কাছে এসে বসল না তার। পাশে দাঁড়িয়ে থেকেই লাল শালু বাঁধা পুঁটুলিটা তার বাড়িয়ে দিল ভূতনাথের দিকে।

—কি আছে এর মধ্যে? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

তার কথার কোন উত্তর না দিয়েই পুঁটুলিটা মায়া হঠাৎ ভূতুদার গায়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই পালিয়ে গেল সে বিদ্যুৎ গতিতে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুঁটলিটা গেল খুলে। আর ওমনি তার মধ্যে থেকে চারধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল কতকগুলো সোনার গহনা। চুড়ি, কানের দুল, হার, বালা, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি। এতক্ষণে মনে পড়ল ভূতনাথের এই সেই লাল শালু বাঁধা পুঁটুলি যেটা সেদিন রান্নাঘরে হাঁড়ির ভিতর লুকিয়ে রাখতে গেছল তার মা, অর্থাৎ সতীর সৎমা। সতী হঠাৎ দেখতে পেতেই জ্বলন্ত চেলা কাঠ এনে সে বসিয়ে দিয়েছিল

তার পিঠে। মুহূর্ত মধ্যে সেদিনের সেই জঘন্য ঘটনাটা ভেসে উঠল ভূতনাথের চোখের সামনে। সুতরাং এ গহনাগুলো যে সতীর মায়ের বুঝতে আর বাকী রইল না তার। কিন্তু আজ হঠাৎ এভাবে এসে মায়া তার মুখটার দিকে এসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালল কেন?—মায়া, মায়া—ডেকে উঠল তাকে ভূতনাথ।

কিন্তু মায়া তখন উধাও। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সদর দরজায় উঁকি মারতেই দেখল ভূতনাথ তাদের পাড়ার কুলি পেরিয়ে মায়া নামপাড়ার গলি ধরেই অদৃশ্য হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। তার ডাকা, হাঁকা, চিৎকার কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করল না সে। এমন কি তোয়াক্কা করল না তার ধমকটাকে পর্য্যন্ত। যা বাবাঃ। এসব আবার কি কাণ্ড তার! ব্যাপার কি?

মহা মুস্কিলে পড়ল ভূতনাথ। পিছনে পিছনে তার যাবে কি খোলা ঘরের মেঝের উপর গহনাগুলো আছে পড়ে। বাবাকে উঠোবে কি—কাঁচা ঘুমটা ভেঙ্গে গেলে তার মেজাজ যাবে খচে। কি যে করবে সে ভেবে পেল না। ফিরে এল নিজের ঘরে। খোলা-মেলা গহনাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সে। নিশ্চয়ই একটা মস্ত বড় রহস্য আছে মায়ার এ ভাবে আসা, চলে যাওয়া ও গহনাগুলো ছুঁড়ে দেওয়ার পিছনে।

সেই রহস্য উদঘাটন করতেই ভূতনাথ এল মায়াদের বাড়ী। কিন্তু তাদের বেড়ে ঢুকবার আগেই দরজার সামনে এসে থমকে গেল সে। চমকে উঠল মায়ার চড়া সুরের কড়া কথা শুনে। উঁকি মারতেই দেখতে পেল সে বাড়ী-বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা-বাবাকে উদ্দেশ্য করে মুষল ধারে বর্ষণ করে চলেছে মায়া তার বাক্যবাণ—শুধু গহনা নয়. দিদিব দ্বিরা গমনে যে সমস্ত জিনিষ-পত্র দেবার কথা ছিল তোমাদের, সেই তোষক, পালঙ্ক, ড্রেসিংটেবিল সব তাদের দিয়ে আসতে হবে তোমাদের।

—দেব না কি বলছি? হাত নেড়ে মায়াকে বলতে লাগলেন তার বাবা,—তবু তুই একটু শান্ত থাক। শুধু গহনা-গাঠি জিনিস-পত্র কেন ভূতনাথকে আমি আমার সর্বস্ব দেব। ঘরের জামাইকে ঘরেই রাখব আমি। যেমন করেই হোক ওর মা-বাবার হাতে পায়ে ধরে আমি—

ধমকে উঠল মায়া,—ভেবেছো কি তোমরা? মুখ ঝামটে বলে উঠল সে,—দিদি তার জেদের শিকার হয়ে জীবনটা দিয়েছে। [illegible] কি আমিও তার গোয়ার্তুমির শিকার হতে যাব? কখনও না। বড় মা তার নিজের মনোমত পাত্রীর সঙ্গেই ভূতুদার বিয়ে দিন। তোমাকে কিন্তু তার আগেই দিদির সব জিনিস পত্র এবং তাব দ্বিরাগমনে যে সমস্ত দেবার কথা ছিল তোমার সমস্ত কিছু পৌছে দিয়ে আসতে হবে ভূতুদাদেব। তুমি যদি না দাও আমিই তাহলে একে একে—

—পাগলামি করিস না মায়া। ধমকে উঠলেন রাখহরি চাটুজ্জে—যেমন মেয়ে তেমনি থাক তুই। সব কিছুতেই আগ বাড়িয়ে আমার উপর কথা বলতে যাসনে। সেদিন ওমনি ভূতনাথের বাবার কাছে আমি তোর বিয়ের কথাটা পাড়তে গেলাম আর তুই হঠাৎ তার মাকে গিয়ে এমন কথা বললি যে আমার সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রামটাই গেল বানচাল হয়ে।

—বিয়ে আমি করব না বাবা। গম্ভীর হয়ে কথাটা বলতেই মায়ার উপর হঠাৎ গর্জে উঠলেন তার বাবা,—বিয়ে করবিনা তো কি চিরকালটা ওমনি আইবুড়ো থেকে ধিঙ্গি হয়ে ঘুবে বেড়াবি? মাথা খাবি আমার? লোকের কথা সহ্য করতে হবে আমাকে তোর জন্য মরণ দিন পর্য্যন্ত?

—আমাব জন্য তোমাকে আর কারো কোন কথা সহ্য করতে হবে না বাবা। আমাব ব্যবস্থা আমি নিজেই করব। আপাততঃ একটা শুধু অনুরোধ রাখ তুমি আমার। আর কোনদিন আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তুমি ভূতুদাদের বাড়ী যেয়ো না। তারা তাদের ইচ্ছামত বড় ঘরে ভাল কনের সঙ্গে ভূতুদার বিয়ে দিয়ে সুখী থাকুন।

ঢুকতে ঢুকতে সেই যে দরজার বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে রইল ভূতনাথ ভিতরে আর প্রবেশ করতে পারল না। মায়ার কথার চোট পাটে পা দুটো তার আটকে গেল চৌকাঠের বাইরেই। আড়ি পেতে শোনা ও আড়চোখে দেখা ছাড়া সে না পারল পিছন ফিরতে, না পারল এগিয়ে যেতে। বলতে গেলে সেই-ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। একটা জিনিস কিন্তু আশ্চর্য্য লাগল ভূতনাথের বাপ বেটিতে কথা কাটাকাটি চলতে লাগলেও তার মা কিন্তু নির্বাক। ভুলেও তাদের মাঝে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না সে। জ্ঞানদার মত দজ্জাল জাঁদরেল মেয়ের পক্ষে এমনভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা সত্যি অবাক হবারই কথা। মায়ার কথার জের টেনে বলে উঠল তার বাবা,—শোন মায়া, পাড়ার পাঁচজনকে দিয়ে আমি বাধ্য করাব বলরাম বাড়ুজ্জেকে। ওরকম বাঁধা ঘর, যাচা বর আমি

ছাড়ব না কিছুতেই। কিন্তু তোর মতলবটা কি বলতো? বিয়ের কথা বললেই ক্ষেপে উঠিস কেন? পাত্রের সন্ধানে বেরুলে রাগ করে ঘরে না খেয়ে পড়ে থাকিস ব্যাপার কি?

—বলব তারপর। বলে উঠল মায়া,—আগে দিদির দেনা-পাওনার সমস্ত জের মেটাও তুমি। লিখে দাও ওই দিদির মায়ের নামের জমিটা ভূতুদাকে। মুখে বলা কথাগুলো তোমার কাজে করে প্রমাণ দাও আগে—

—আচ্ছা, তোর কি সত্যি মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে? ধমকের স্বরে হাত নেড়ে মায়াকে বলে উঠলেন তার বাবা,—এসব নিতে আর পারে কেউ?

—নেবে না মানে? গর্জে উঠল মায়া,—দিদির কাছে তখন নেবার কথা বলে ছিল সে কেন? নিতে বাধ্য সে।

আর ভূতনাথ বাইরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। হঠাৎ তাদের কথার মাঝে এসে দাঁড়াল সে ধূমকেতুর মত। দেখেই তাকে ভূত দেখার মত চমকে উঠল জ্ঞানদা। ত্বরিত গতিতে চলে গেল সে অন্য ঘরে। চাটুজ্জে মশায় অবশ্য জামাই আদরে আপ্যায়ন করে উঠল ভূতনাথকে—এস বাবা, এস এস। তোমার কথাই হচ্ছিল।

ভূতনাথ তার অভ্যর্থনায় কোন আমল না দিয়ে সোজা এসে দাঁড়াল সে মায়ার সামনে। বলল তাকে মুখোমুখি—আমাকে তুই এত ঘৃণা করিস মায়া! এত ছোট মনে করিস তুই আমাকে?

মায়া কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইল মুখ নিচুর দিকে করে, গম্ভীর হয়ে। বলে উঠল তার ভূতুদা, এদ্দিন ধরে এই তুই আমাকে চিনলি? আমি লোভী? আমি এসব জিনিসের প্রত্যাশী তোদের কাছে? আমাকে এত নীচ বলে ধারণা করতে পারলি তুই? ছি-ছি—

—কে তোমাকে এখানে আসতে বলল ভূতুদা? রাগত স্বরে বলে উঠল মায়া,—আমাদের বাড়ীর সঙ্গে আর কি সম্বন্ধ তোমার? চলে যাও এখান থেকে।

—মায়া! ধমকে উঠল রাখহরি চাটুজ্জে—রাগ অভিমানের একটা সীমা আছে। কার সামনে দাঁড়িয়ে কাকে কি বলছিস তুই?

—যাকে যা বলা উচিত আমি তাকে তাই বলছি বাবা। এখানে কি আর আছে ভূতুদা'র? উনি উনার গোঁ-জেদ-খেয়াল নিয়ে যেখানে এদ্দিন ছিলেন সেখানেই থাকুক না গিয়ে সুখী হয়ে। এখানে তার কি?

রাগ করল না ভূতনাথ। করল না কোন অভিমান। শুধু করুন স্বরে মিনতি ভরে বলে উঠল সে,—তোদের বাড়ীতে আসার আমার আর কোন মুখ নেই মায়া। নেই আর কোন সাধ্য সামনে তোদের দাঁড়াবার। তোদের কাছে দাঁড়িযে দুটো কথা বলারও যোগ্যতা আমি হারিয়েছি। শুধু একটা অনুরোধ রাখ আমার। তোর দিদির এই গয়নাগুলো দিয়ে আর কাটা ঘায়ে আমার নুনের ছিটে দিসনে আমাকে। এগুলো ফেরৎ নে তুই।

—কার জিনিস কে ফেরৎ নেবে ভূতুদা? বলে উঠল মায়া—ভাগ্যাকাশে তোমার কৃষ্ণপক্ষ গেছে এবার শুক্লপক্ষ আসবে। তোমরা পুরুষমানুষ। তোমাদের তো বিয়ের কোন অভাব নেই ভূতুদা। পোড়া কপালী দিদি আমার এসব পরতে পারলো নাতো কি হবে? দ্বিতীয় পক্ষকে তোমার এসব পরিয়ে সাধ মেটাবে তার। এসব তোমর স্ত্রীর সম্পত্তি। নিয়ে যাও এখান থেকে।

— শোন মায়া, গম্ভীরভাবে বলে উঠল ভূতনাথ,—আমার জীবনে আর কোন পক্ষই আসবে না। বিয়ে আমি আর করব না। এসব তোর দিদির জিনিস। ছোট বোন হিসাবে এসবে তোর অধিকার। নে তুই এগুলো। কথা শোন আমার।

কথা শুনবে কি মায়া হুট্ করে ওমনি পাশের ঘরে ঢুকেই ভিতর থেকে দড়াম্ করে সজোরে বন্ধ করে দিল দরজাটা। বলে উঠল ভিতর থেকে,—তুমি এখান থেকে চলে যাও ভূতুদা। এখানে তুমি এসেছ জানলে বড়-মা আবার আমাকে নানা কথা বলবেন। আমি আর কারো অপমান খেতে চাই না। চাই না আমি পরের কোন জিনিসের অধিকারী হতে। মুক্ত কর আমাকে তোমার ওসব জিনিস ফেরৎ নিয়ে।

আশ্চর্য্য তো। বিস্মিত হয়ে ভূতনাথ জিজ্ঞেস করে উঠল রাখহরি চাটুজ্জেকে—ব্যাপারটা কি হয়েছে বলুন তো? আমি তো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কি হয়েছে এমন মায়ের সঙ্গে?

ব্যাপারটা বোধ হয় এড়িয়ে গেলেন চাটুজ্জে মশায়। শুধু হতাশা ভরে মাথা নেড়ে বিষাদ সুরে বলে উঠলেন,—সেই এলে বাবা, আর কটা দিন আগে আসতে পারলে না। তাহলে মেয়েটাও আমার মরত না আর মায়াও এমন হত না।

আচ্ছা মুস্কিল তো। চাটুজ্জে মশায়ের এসব হেঁয়ালী ভরা কথা ছেড়ে দিয়ে মায়ার দরজা গোড়ায় এসে কপাট চাপড়ে তাকে বলতে লাগল ভূতনাথ—কপাট খুল মায়া। কিছু তুই নে বা না নে আমার সামনে বেরিয়ে এসে বল তুই আসল কারণটা কি তোর?

উত্তরে তার বলে উঠল মায়া রাখহরি চাটুজ্জেকে,—ভূতুদা'কে তুমি আমাদের বাড়ী থেকে চলে যেতে বল বাবা আর নিয়ে যেতে বল তাকে চক্ষুশূল দিদির ওই গহনাগুলো।

—কিন্তু আমার বক্তব্য তোকে শুনতেই হবে মায়া। বলে উঠল ভূতনাথ—সব শুনে যদি মনে হয় তোর আমি দোষী তবে তুই যা শাস্তি দিবি সব সহ্য করব আমি। কিন্তু এভাবে আমার সম্বন্ধে কোন কিছু না জেনে কিছুতেই তুই রাগ করে থাকতে পারবি না আমার উপর।

কিন্তু মায়ার তখন কি হয়েছিল কে জানে। গরম হয়ে উঠেছিল বোধহয় তার মাথাটা। তাই গর্জে উঠল সে ভিতর থেকে—তোমাকে আমি আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না ভূতুদা। দূর হয়ে যাও তুমি। চলে যাও আমাদের বাড়ী থেকে। আমি কারো কোন কথা শুনতে চাই না। প্লীজ, আর কোনদিন আমাদের বাড়ী এস না তুমি।

(আট)

কে কার বুঝে মনের ব্যথা?
এই দুনিয়ার কেও কারো নয়।
আপন দুখটাই দেখে সবাই
পরের কষ্ট কে মনে লয়?

—কথাটা বোধ হয় সত্যি। তাই মনে হয় ভূতনাথের মনের ব্যথা বুঝল না মায়া। বুঝল না তার প্রাণের কষ্টটা। শুনল না তার কথা। সহানুভূতি দূরে থাক, দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিল তাকে তার ঘর থেকে। তার এই রূঢ় আচরণটায় মনে বড় আঘাত পেল ভূতনাথ্। তাই বাড়ীতে তাদের আর দাঁড়িয়ে না থেকে বেরিয়ে এল সে বাইরে। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাদের পাড়ার কুলি মাড়িয়ে চলে এল সে গ্রাম শেষে একেবারে বাবা ভূতনাথের মন্দিরে। এই মন্দিরেই খানিক আগে কেয়া কাকলিদের তাকে এড়িয়ে চলার কারণটা বোধহয় কিছুটা আঁচ করতে পারল সে। আন্দাজ করতে পারল কিছুটা তার প্রতি তার বন্ধু-বান্ধবদের গম্ভীর হয়ে থাকার উদ্দেশ্য। সঙ্গী শাকরেদদের তাকে তেমনভাবে গ্রহণ না করার কারণটাও। মনে হল তার যেন সতীই ছিল পুষ্পাক্ষ। আর সব সাঙ্গ-পাঙ্গ, মায়া সমেত তার সই সয়লারা সবাই ছিল তার পাপড়ি। পুষ্পাক্ষ চলে গেছে। তাই মনে হয় তার পাপড়িগুলোও ঝরে গেছে তার কাছ থেকে।

কিন্তু সত্যিই কি ভূতনাথ সতীর আত্মহত্যার জন্য দায়ী। সত্যিই কি সতীকে সে করেছিল অনাদর অবহেলা? যার জন্য চলে যেতে হল তাকে তার জীবন থেকে। বড় বেশী চিন্তান্বিত হল ভূতনাথ। আনমনে কখন যে সে মন্দির পেরিয়ে চড়ক-ডাঙ্গার মাঠটা অতিক্রম করে এসে হাজির হল শালী-নদীর শ্মশান ঘাটে কে জানে। বসল গিয়ে সে পাড়ের ঝুরি নামা বটগাছের তলায়। নদীর বুকে বালির উপর চিতাগুলোর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল সে। চিন্তা করতে লাগল মনে হয় বোকারোর কোয়াটারে তার সেই স্বপ্নটার কথা। যার জন্য তার এখানে আসা।

কিন্তু এই কি মায়ার কান্না? এই কি তার দিদির শোকে ব্যথা হত থাকার, মর্ম্মাহত হওয়ার নিদর্শন? এতো তার কাছে মায়ার সতীর শোকোচ্ছ্বাস নয় ... হল তার বহুদিনের তার উপর জমে থাকা ঘৃণার সঞ্চিত অনাদর, পুঞ্জিত অবহেলার বহিঃপ্রকাশ। এতো তার চেপে রাখা আক্রোশের নিষ্কাষণ। এ ভাবে অপমানিত হবার জন্যই কি সতী তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে প্ররোচিত করেছিল এখানে আসার জন্য? এটা কি তার প্রতিহিংসা? তার উপর

রাগ করে চলে আসার, জেদ করে থাকার এটাই কি তার প্রতিশোধ? তাহলে কি এই দুনিয়ায় সবাই সমান? সবাই এক ছাঁচে ঢালা, এক সুরে বাঁধা, একই প্রকৃতির একই স্বভাবের? গড়নে বরণে বাইরে সবাই ভিন্ন হলেও ভিতরে সবার সমান রূপ? ভাবতে ভাবতে জগৎ ও জীবনের প্রতি কেমন যেন একটা বীতশ্রদ্ধ ভাব ভর করল ভূতনাথকে। নিজেকে বিশ্লেষণ করতে করতে আবার মনে হল তার—সে একটি আস্ত নির্বোধ! বোকা না হলে কি এমনি স্বপ্নের উপর বিশ্বাস করে ছুটে আসে সে এখানে? যতসব উদ্ভট চিন্তা তার। অবাস্তব কাণ্ড কারবার। এক ধরনের পাগল সে। পাগল না হলে স্বপ্নকে কি কেউ কখনও সত্যি বলে ভাবে?

কিন্তু স্বপ্ন সেদিন দেখেনি তো ভূতনাথ। সতীকে দেখেছিল সেদিন প্রত্যক্ষভাবে। তার জাগরণে। প্রকাশ্য দিবালোকে, স্বচক্ষে। সময় হিসাবে তার মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পরেই। কিন্তু কোথায় ভূতগ্রাম, কোথায় বোকারো। সেই একলা ঘরে, দুপুর বেলায়—। ভাবতে গেলে অবাক লাগে তার। সে দেখাটা কি তার? মিথ্যা তো বলতে পারে না সে। তবে? বুদ্ধিভ্রান্তি? দৃষ্টি বিভ্রম? না মামার কথায় ওটা তার হ্যালুসিনেশন, টেলিপ্যাথি। কেও কখনও কারো চিন্তায় গভীরভাবে মগ্ন হলে মনের কল্পনা ওমনিভাবে বাস্তব রূপে উদয় হয় কারো কারো মানস দৃষ্টিতে এ দেখা দেখলেও কিন্তু তা সত্য নয়। সত্য নয় যেমন মরুভূমির মরীচিকা, আলেয়ার আলো। মিথ্যে এসব। প্রহেলিকা, কুহেলিকার এমনি বশে ঘুরলে শুধু মায়ার অপমান কেন সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হতে হবে তাকে। ওসব ভুল তার, ভুল—ভুল মস্ত বড় ভুল।

অসম্ভব। ভুল হতে পারে না তার। মিথ্যা হলে সতী তাকেকারখানায় সেই হঠাৎ পড়া ডাকটিনটার কবল থেকে রক্ষা করেছিল কেন? কে তাকে টেনে এনেছিল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে? কৌতূহল নিবৃত্ত করতে তার কে তাকে দেখা দিয়েছিল স্বপ্নে? সতী মিথ্যা হলে এমনভাবে তার বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে কেন স্বপ্নটা। সামঞ্জস্যহীনভাবে দেখা দেয় নি তো সে তাকে স্বপ্নে বা জাগরণে। বলে নি তো সে তাকে ভিত্তিহীন কোন কথা। তবে?

সত্য-মিথ্যা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় পড়ে আন্দোলিত হতে লাগল ভূতনাথের মন। বিশ্বাস—অবিশ্বাসের আওলি-বাওলি হাওয়া উতলা করতে লাগল তাকে। মনের মধ্যে চলতে লাগল তার উতরচাপানের ঝড়। পারস্পরিক বিরুদ্ধ চিন্তার ঢেউগুলো একে অপরের গায়ে আছড়ে পড়ে মেতে উঠল প্রলয় নাচনের খেলায়। কে জিতবে কে হারবে? কোন মতটা হবে প্রতিষ্ঠিত? এ নিয়ে চলতে লাগল তার মনে তীব্র প্রতিযোগিতা। ভাবতে ভাবতে সূর্য্য গেল অস্তে। সন্ধ্যে এল ঘনিয়ে। অন্ধকারের ঝাঁপি নিয়ে তাকে সহ সমস্ত দিগন্তটাকে চাপতে এল রাত। তবু ভূতনাথের খেয়াল হল না। সত্য-মিথ্যা ভাবনা-চিন্তার জটে পড়ে দিশেহারা হয়ে গেল তার মনটা। আবর্তিত হতে লাগল তার অন্তর। কি জন্য, কিসের ঘোরে যে মশগুল হয়ে সেই নির্জ্জন শ্মশান ঘাটে একা বসে রইল ভূতনাথ কে জানে। ওধারে বাড়তে লাগল রাত, এধারে বাড়তে লাগল অন্ধকার। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল থাকলে তো ভূতনাথের। কতকক্ষণ কাটত যে তার সেখানে কে জানে। হঠাৎ নেপাল তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে নাম ধরে তাকে ডাকতে ডাকতে হাঁকতে হাঁকতে এসে হাজির হল সেখানে। চারধার সব লাঠি লণ্ঠন হাতে লোকজন দেখে হুঁস হল ভূতনাথের। অবাক হয়ে তাকাতেই সে বলে উঠল নেপালচন্দ্র,—জানি আমি এখানেই থাকবি তুই। আসবার সময় এখানে বসার তোর ভাবগতিক দেখে বুঝেছিলাম। কিন্তু এত রাত পর্য্যন্ত এখানে বসে কি করছিস তুই?

ভূতনাথ তখন ভ্যাবলাকান্ত। সুতরাং কি আর উত্তর দেবে সে?—উঠে আয় এখান থেকে। বলে উঠল নেপাল,—ওধারে সবাই তোকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। মনটা হঠাৎ আমার সন্দেহ করে উঠতেই দলবল নিয়ে চলে এলাম আমি এখানে। চল চাড়াতাড়ি। মা-বাবা তোর চিন্তায় আকুল। ভাবছেন তোর জন্য। বাড়ী চল।

উঠল ভূতনাথ। ভাবনার সেই ঘোরটা নিয়ে চলে এল সে বাড়ী। কিন্তু বাড়ীতে এসে দেখল মায়ার সেই তাকে তাড়িয়ে দেবার ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমত একটা হুলস্থূল কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। যা বাবাঃ! বাতাসেরও কান আছে নাকি! শূন্যেরও আছে নাকি চোখ! তা না হলে ইতিমধ্যে তার এই ব্যাপারটা এমনভাবে রঙে রসে রাষ্ট্র হয়ে গেল কেন চারদিকে। সে এক হৈ রৈ ব্যাপার। সবাই মায়ার প্রতিপক্ষ। তাদের বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে সবাই রাখহরি চাটুজ্জের বাড়ীর দিকে মুখ করে মুষল ধারে বর্ষণ করে চলেছে তার মেয়েকে উদ্দেশ্য করে

বাক্যবান। সাপের পাঁচ পা দেখেছে—হারামজাদী। তাই বেয়াদাপিটা তার বেড়ে উঠেছে মাত্রা ছাড়া। ওই মেয়েকে গলায় গেঁথে মরতে হবে রাখহরি চাটুজ্জেকে। বিয়ে আর দিতে হবে না ওর। ওরকম বাচাল পুরুষের কানকাটা মেয়েকে বিয়ে করবে কে? সত্যি মায়ার এটা দস্তুর মত অন্যায়। যতই হোক, ভূতনাথ তার বড় ভগ্নীপোত। কাজ-কর্মের চাপে স্বামী হিসাবে করণীয় কর্ত্তব্যটা তার হয়তো করতে পারে নি সে তাবলে কি তাকে কুকুরের মত দূর দূর করে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা উচিত মায়ার? ঠিক হয়নি তার তাকে ওমনি সতীর আত্মহত্যার জন্য দোষী করা। বলতে গেলে এখনও ঘাট-শ্রাদ্ধ যায় নি সতীর। যায়নি তাই ভূতনাথের গা থেকে এখনও তাদের আত্মীয়তার গন্ধটা। সেই জামাইদা'কে মায়ার ওমনি অপমান করতে হয় কখনও? আসলে ওসব হল তার অহঙ্কার। দু-পাতা লেখাপড়া শিখে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে মুখপুড়ি। তাই ছোট বড়কে মেনে চলার জ্ঞান-গম্যি, আক্কেল বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসে আছে সে।

প্রসঙ্গক্রমে উঠল সেবারে ভূতুর রাগ করে শ্বশুর বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার কথা। পাড়া-প্রতিবেশী কাকীমা জেঠী মা-রা সায় দিতে লাগল ভূতনাথকেই। গাঁয়ের ছেলে হলেও ভূতনাথ জামাই তো বটে। নিয়ম ভাঙ্গাতে তুই মাগী যে ডেকে নিয়ে গেলি একটু মান সম্মান দেখা, আদর-আপ্যায়ন কর—তা-না। দিদির সঙ্গে গিয়েই লাগিয়ে দিলি ঠুনোঠুনি। ঝগড়া।

—বলি, এক আধটু ঝগড়া-ঝাটি, খিটিমিটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন সংসারে না হয় শুনি? বলে উঠলেন মানু-পিসি, —হাঁড়িতে হাঁড়িতেও ঠুকোঠুকি ঘষাঘষি হয়। তা বলে কি ওমনি ঠুনকো কারণে রাগ করে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে হবে? ছিঃ ছিঃ!

যে যার খুশি বলতে লাগল কথা। চড়াতে লাগল সুর। এসব আওয়াজ এপাড়া ছাড়িয়ে ও পাড়ায় গিয়ে মায়াদের ঘরে পৌঁচ্ছুছিল কি না কে জানে। ও পক্ষ কিন্তু চুপচাপ। ভূতনাথ তো দেখে শুনে সব হতভম্ব। কথায় কথায় মায়ের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল মায়ার রাগের আসল কারণটা। সতী পড়ে থাকতে মায়া যখন তার ভূতুদাকে চিঠির পর চিঠি দিয়েও কোন উত্তর পায়নি তখন একবার বাবাকে নাকি সে অনুরোধ করতে এসেছিল বাড়ীতে তাকে বোকারো যাবার জন্য। মা রাজি হন নি। মায়া গোপালকে সঙ্গে করে নিজে যেতে চেয়েছিল বোকারো। তার কাছে। মত দেবে কি শুনে মা আচ্ছা করে ধমক দিয়েছিলেন তাকে। জ্বর-জ্বালা কি কারো হয় না যে দিদির তার সামান্য অসুস্থতার সংবাদ নিয়ে মাথা খারাপ করতে যাবে সে ভূতুর। সতীর মরার পরও যখন এল না সে তখন দস্তুর মত রেগে গেছল মায়া তার বড়-মার প্রতি। এ তার নিশ্চয়ই কোন চাল। গোপালদা'কে পাঠিয়ে সে নিষেধ করে এসেছে ভূতুদাকে আসতে। নইলে কোন স্বামী তার স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে এমন চুপচাপ থাকে? এ তাদের তার দিদির উপর অন্যায়, অবিচার। কাণ্ডজ্ঞান-হীনতার পরিচয় তাদের। দায়িত্ব-জ্ঞানহীন তারা। অবিবেচক। অমানুষ।

ছোট্ট মুখে বড় কথা শুনে যার পর নাই উত্তেজিত হয়ে গেছলেন মা। উঠেছিলেন তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে,—ভারী তো বিয়ে, তার আবার স্ত্রী!

মুখ খুললে মায়াকে আটকায় কে? সে তখন মুখরা—এ কথা বলতে আপনার লজ্জা করে না বড় মা। দিদি স্ত্রী নয় ভূতুদার? তার সঙ্গে আপনি ছেলের বিয়ে দেননি?

—ওটাকে বিয়ে বলে না। রেগে বলে উঠেছিলেন মা, —ওটা তোর মা বাবার চাল। ভূতনাথকে আমার সরল পেয়ে তার নামে হঠাৎ কেলেঙ্কারি রটিয়ে জোর করে তোর দিদিকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। নইলে ওমনি কালো-কুৎসিৎ মেয়ের সঙ্গে আমার ভূতুর মত সুন্দর ছেলের বিয়ে হয় কখনও?

ঠোঁটকাটা মেয়ে মায়া। তাই গর্জে উঠল সে,—মা হয়ে একথা বলতে একটু মুখে আটকাচ্ছে না আপনার? অগ্নি সাক্ষী করে ভূতুদা দিদিকে বিয়ে করে নি? দিদিকে ছেলের বৌ হিসেবে আপনি তাকে উলুধ্বনি দিয়ে ঘরে তুলে নেন-নি?

ওসব হল তোদের জোর করে আমার ভূতুকে ডাকাতি করা। মন নেই, গণ নেই—ওমনি বিয়ে বললেই বিয়ে হয়ে গেল? ক'টাকা পণ দিয়েছিল তোর বাবা? ক'খান দিয়েছিল গহনা? সতীর মায়ের সমস্ত অলঙ্কার তাকে যে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তোর জন্য মা তোর লুকিয়ে রেখেছে সে কথা কেউ জানে না ভাবছিস? মুখ

খোলাসনে বলছি আমার। নইলে দিয়েছিস যে কত ছাই, দিতিস যে কত ঘন্টা সে সব কথা উঠলে কাদা ঘাটা যাবে তোদের।

—এই যদি মনের ইচ্ছা ছিল আপনার বলেন নি কেন আমাকে? গর্জে হঠাৎ বলে উঠল মায়া, বাবাকে বলে আপনাদের দেনা পাওনা আগে মেটা করাতাম আমি। তারপর হত বিয়ে।

মেজাজটা তখন নাকি বেজায় খচে গেছল মায়ের। তাই তার বাপের কথা বলতেই সে মুখ বিকৃতি করে বলে উঠেছিল তাকে,—ধাপ্পা বাজ বাপের তোর মত ধড়িবাজ বিটি ছাড়া আর কি হবে? দ্বিরাগমনে যে বাপ তার জামাইকে হাতী দেব, ঘোড়া দেব বলে চারধার প্রচার করে বেড়ায় তার বিটি এখন এসব কথা বলবে না তো কে বলবে? দূর হয়ে যা তুই আমার ঘর থেকে। মুখপুড়ি, তুই সেদিনের মেয়ে হয়ে আমার মুখের উপর লাজ-লজ্জা কাড়িয়ে কথা বলিস? নিজেদের কাণ্ডজ্ঞানের কথা ছেড়ে দিয়ে তুই আমাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথা বলতে আসিস? বেরিয়ে যা আমাদের ঘর থেকে।

আর নাকি কোন ক[illegible] [illegible]লতে পারে নি মায়া। মা-ও তাকে আর পারেনি নি আর সহ্য করতে। তাই যাব পর নাই অপমান করে তি[illegible] [illegible]ূর করে নাকি তাকে তাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন ঘর থেকে। নিষেধ ক[illegible]ে দিয়েছিলেন আর যেন সে কোন দিন এ বাড়ীর চৌকাঠ না মাড়ায়। মুখপুড়ির এতবড় স্পর্ধা! বলে কি না সে তার দিদিব মৃত্যুর জন্য ভূতনাথই দায়ী। দায়ী তার অনাদর, অবহেলা।

—মায়া কোন মিথ্যে বলেনি। হঠাৎ সকলের সামনে এসে কেমন যেন এক ভাবগম্ভীর স্বরে মাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল ভূতনাথ, —আমার অনাদব অবহেলাই দাযী সতীর মৃত্যুর জন্য। স্বামী হযে যা করা উচিত ছিল আমার আমি তা করিনি। দোষী আমিই মা।

বিপিন-কাকু এগিয়ে এসে ভূতনাথের পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন—কেউ কারো মৃত্যুর জন্য দায়ী নয় বাবা। কথায় বলে মরণ ধরণ পানি, বিধাতা বলে এই তিন নাহি জানি। সব আপন আপন কর্ম্মফল বাবা। দোষ নয় তোর।

মা বলে উঠলেন—ওই পুরুষের কানকাটা মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে গেছলি কেন বাবা? ধাংড়ির লঘু-গুরু জ্ঞান নেই। নেই কোন ছোট বড় বোধ। তোকে নিষেধ করা সত্ত্বেও গেছলি কেন ওদেব বাড়ী। ওদের সঙ্গে আর আমাদের সম্পর্ক কি? বৌ ছিল, মারা গেছে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেছে। দিন কতক পরে তার শ্রাদ্ধ-শান্তিটা করে দিলে লেঠা চুকে গেল। থাক ওই রাখহরি চাটুজ্জে তার ওই বাচাল বেআক্কেলে আইবুড়ি মেয়েটাকে নিয়ে। ওদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নেই আমাদের।

ভূতনাথ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে [illegible]ক বোধ হয় হজম করবার চেষ্টা করতে লাগল মায়ের কথাগুলো। সে [illegible] সতীর দুঃখে শ্মশান গেছল, মন খারাপ করে বসেছিল সেখানের বটতলায় খবরটা জানতে বোধহয় তখন [illegible] বাকী ছিল না কারোও। তাই সহানুভূতিতে ফেটে [illegible]ড়ল সবাই। প্রবোধ দিতে এলেন ফনীবাবু—গতস্য শোচনা নাস্তি। যা হবার তা হয়ে গেছে। মন থেকে ওসব ঝেড়ে ফেল বাপধন। বেটা ছেলে তুই। সামান্য একটা মেয়েব জন্য এমনি শোকে উতলা হলে চলে? শক্ত হ। চল তেমনি সেই আগের মত। জীবনে মানুষের এমন কত ঘটনা ঘটে। কত যায়, কত আসে। ওসব ধরে পড়ে থাকলে চলে না। ভুলে যা ওসব। ভেবে নে ওটা একটা স্বপ্ন ছিল তোর। স্বপ্ন ছুটে গেছে।

শুধু ফনীকাকুনয় আপন পাড়াব ও ঘর বাখুলেব আরো অনেককাকু, মুখ্যা-মুরুব্বি জ্যেঠু-দাদুব দল নানা উপদেশ বর্ষণ কবতে লাগল ভূতনাথের উপর। [illegible]নাথ কিন্তু গ্রামেব ওই মন্দির-দেবতা গম্ভীরের ভোলা নাথমনি শিব-লিঙ্গটার মত দাঁড়িয়ে রইল নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে। শুনছিল কি না এসব সে কে জানে। তবে কারো কোন কথার উত্তর দিল না সে। করল না একটু টুঁ-শব্দও।

বাঁড়ুজ্জে পাড়ায় গাল-মন্দ চাটুজ্জে পাড়ার রাখহবি চাটুজ্জের ঘরে গিয়ে পৌঁছচ্ছিল কি না কে জানে। তবে সে তরফের কাছ থেকে প্রতিবাদের কোন ভাষা কিন্তু ভেসে আসছিল না। এ পক্ষ যতই তর্জন গর্জন করুক প্রতিপক্ষ কিন্তু এক্কেবারে নীরব। রাত পর্য্যন্ত কাঁহাতক আর গলা ফাটিয়ে চেঁচানো যায়। তাই আপনা থেকেই ঠাণ্ডা মেরে গেল সব। যে যার চলে গেল বাড়ী।

বলরাম বাড়ুজ্জে ছেলেকে নিজের ঘরে এনে দিতে লাগলেন নানা উপদেশ। তত্ত্বকথা ও জ্ঞান-বিদ্যার বাণী ঝেড়ে হাল্কা করার চেষ্টা করতে লাগলেন ভূতনাথের মনটাকে। নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে তাকে ঘুমোতে বললেন নিশ্চিন্তভাবে। কিন্তু ভূতনাথের ঘুম হলে তো। মনে পড়তে লাগল তার নানা কথা, নানা ঘটনা। সেগুলো সব পর্য্যালোচনা করতে লাগল সে শুয়ে শুয়ে। সেই অবস্থাতেই সমস্ত দিনের ক্লান্তি চোখ দুটোকে যে তার জড়িয়ে দিল কখন—কে জানে।

কিন্তু ঘুম কোথায়। মনে হল ভূতনাথের নদীর পাড়ে শ্মশান ঘাটে বটগাছটার তলায় সতীর চিতাটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে সে। চিতাতো নয় সতীর যেন সেটা ফুলশয্যা। সে ফুলশয্যায় শুয়েছিল সতী। দেখেই তাকে হাসতে হাসতে উঠে এল তার কাছে। কি ভূতুদা মায়ার উপর রাগ করেছো তুমি? বোকেছে মায়া তোমাকে?

—সব সময় ছ্যাবলামী তোর আর ভাল লাগে না সতী। ফুঁসে উঠল ভূতনাথ। কি উদ্দেশ্য তোর বলতো? কেন তুই এখানে আমাকে আনলি? কান্নায় যেন ভেঙ্গে আসতে লাগল ভূতনাথের গলা।

চোখে মুখে আলতো হাসির আভাস এনে বলে উঠল সতী,—মায়ার কান্না থামাতে এসে শেষ পর্য্যন্ত তুমিই কেঁদে ফেললে ভূতুদা?

—ওটা মায়ার কান্না? গর্জে উঠে বলে উঠল ভূতনাথ,—ওটা আমাকে ওর অপমান। সে যে আমাকে কত ঘৃণা করে সেটা দেখাতেই তুই আমাকে নিয়ে এলি এখানে। এটা তোর কি উচিত হল সতী।

—ছিঃ ভূতুদা। ও কথা বলোনা। আমি কি তাই করতে পারি? আর মায়াও কি কোনদিন করতে পারে তোমাকে অপমান? ওটা ওর অভিমান ভূতুদা। মান করে আছে অভিমানী তোমার উপর। কৃষ্ণ এসে রাধার মান ভাঙ্গিয়ে ছিল আর পারলে না তুমি মায়ার মান ভাঙ্গাতে? হেরে গেলে তুমি?

—দেখ সতী, বলে উঠল ভূতনাথ, —আর ফাজলামি করিস না তুই আমার সঙ্গে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুই আমাকে ক্ষমা কর সতী। আমি মহা অপরাধি তোর কাছে। যে দোষ—, যে অন্যায়—, যে অপরাধ, বলতে বলতে কান্নায় জড়িয়ে আসতে লাগল ভূতনাথের কণ্ঠস্বর।

গড়িয়ে আসতে লাগল তার চোখ ভরা অশ্রুটা। সতী ওমনি তার মাথাটা নিজের কোলের উপর টেনে নিয়ে চোখ-দুটো তার আপন হাতে মুছাতে মুছাতে বলতে লাগল সোহাগ ভরা গলায়, —ওসব তোমার মিথ্যে ধারণা ভূতুদা। কেঁদো না তুমি। কোনো অন্যায়, কোন অপরাধ করনি তুমি আমার উপর, কোনো দোষ নেই তোমার।

—নেই মানে? অভিমানের স্বরে বলে উঠল ভূতনাথ, —স্বামী হয়ে দিইনি আমি তোকে স্ত্রীর মর্য্যাদা। অসুস্থতায় নিইনি তোর কোন খবর। এমন পাষণ্ড আমি যে রাগ করে চলে গেছি তোর উপর। তোকে ভালবাসিনি আমি। করেছি অবহেলা, করেছি অনাদর। পদে পদে করেছি আমি তোকে অপমান।

আবেগ ভরে ভূতনাথের মাথাটা বুকে জড়িয়ে বলে উঠল সতী, —ওসব লোকের কথা ভূতুদা। তোমার আমার প্রাণের মিলন কেও কখনও কি বুঝতে পারে? কে বললে আমাকে তুমি ভালবাস না? তোমার আমার সম্পর্কই তো ভালবাসার ভূতুদা। তবে এ ভালবাসা আমাদের পার্থিব ভালবাসার মত দেনা-পাওনার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। কোন কামনার কালিমা, বাসনার লালসা নেই এর মধ্যে। এ হল প্রেম। প্রেমের বন্ধনেই তুমি-আমি যে জন্ম-জন্মান্তর বাঁধা ভূতুদা। কেও আমরা একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারি না কোনদিন পারবও না কখনও। আমি যেমন তোমার শাশ্বতী, তুমিও তেমনি আমার শাশ্বত।

—তবে তুই মরতে গেলি কেন?

—কে বললে আমি মরে গেছি? এই তো আমি তোমার কাছে। তোমার মনের কাছে। তোমার প্রাণের কাছে। তোমার আত্মার কাছে। তোমার আমার যে একই স্বরূপ ভূতুদা। একই অবিনাশী সত্ত্বা আমাদের। কেও কোনদিন মরতে পারি না আমরা।

—কিন্তু তুই তো মরেছিস? আত্মহত্যা করেছিস তুই। সবাই বলে তোর মৃত্যুর জন্য আমিই নাকি দায়ী।

—আমার মৃত্যুর জন্য তুমি কেন দায়ী হবে ভূতুদা? বলে উঠল সতী, তার আত্মহত্যাই বা করতে যাব কেন আমি?

—সত্যি বলছিস তুই? অধীর আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ সতীকে—আত্মহত্যা করিস নি তুই?

—না ভুতুদা, কেমন যেন এক চাপা গম্ভীর স্বরে বলে উঠল সতী, —আত্মহত্যা যে মহাপাপ ভুতুদা। সে পাপ কি কখনও করতে পারে তোমার সতী? ওসব কথা বিশ্বাস করো না তুমি।

শুনে কথা তার অবাক-বিস্ময়ে ভূতনাথ তাকিয়ে রইল সতীর মুখটার দিকে। সতী তেমনি হাসি ভরা মুখে মাথায় তার হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগল তাকে, —আত্মহত্যা করলে কি শিবলোকে গতি হত আমার? না নিতে আসত আমাকে বাবা ভোলানাথের অনুচরেরা। তাহলে তো আমার প্রেতযোনি প্রাপ্ত হত ভূতুদা। এ চেহারা নিয়ে হাজির হতে পারতাম কি আমি তোমার কাছে? ভয়ঙ্কর প্রেতমূর্ত্তি ধরে ঘুরে বেড়াতাম আমি নানা অস্থানে-কুস্থানে। তোমার আশীর্বাদে ওসব পাপ-চিন্তা কোনদিন মনেও আসেনি আমার। বাবার কৃপা মাথায় নিয়ে মরেছি বলেই তো তার করুণায় বিদেহী অবস্থাতেও তোমার সঙ্গে যুক্ত হবার অধিকার পেয়েছি আমি। লোকে যে যাই বলুক ভূতুদা, তুমি আমার সম্বন্ধে ওসব পাপ-চিন্তা করো না কখনও।

—তা না হয় করলাম না। যারপর নাই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ সতীকে, কিন্তু আত্মহত্যা যদি না করে থাকিস তুই তবে মৃত্যুটা তোর হল কি করে?

—ওসব কথা তুমি আর জানতে চেও না ভূতুদা।

—কেন?

—ওসব জানলে মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সত্তা তোমার কলঙ্কিত হতে পারে। ধৈর্যশক্তির অভাব তোমার। তাই আধার তোমার নরম। সহনশীলতা হয়তো তোমার অসংযমী আচরণটাকে রোধ করতে সমর্থ নাও হতে পারে।

—কিন্তু জানতে যে আমায় হবেই সতী। ভূতনাথের সেই জেদী-প্রকৃতি আবার যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল।

স্নিগ্ধ হাসির ঝিলিক মেরে বলে উঠল সতী,—তোমায় কিন্তু আমি শান্ত সুন্দর দেখতে চাই ভূতুদা। নাই বা জানলে এসব। ফনীকাকু তো বলেইছেন—গতস্য শোচনা নাস্তি। ছেড়ে দাও ওসব।

একগুঁয়ে স্বভাবটা ভূতনাথের ঘাড় নাড়িয়ে বলা করাল তাকে,—না সতী, ও কথা বলিস না তুই। মিথ্যাকে কোনদিন আমি সত্যের মুখোশ পরে থাকতে দেব না। বলতে তোকে হবেই তোর মৃত্যুর কারণটা কি? কি করে মরলি তুই?

সতী বোধহয় পড়ল মহা মুস্কিলে। চোখ মুখে তাই দেখা গেল তার চিন্তা-ভারগ্রস্তের ছাপ। থেমে একটু তাকাল তার দিকে হাসিমাখা মুখে। বলে উঠল তেমনি সরল হাসিতেই—সত্য, কখনও কি গোপন থাকে ভূতুদা?

একদিন না একদিন প্রকাশ সে হবেই। সে সময়টুকুর জন্য অপেক্ষা কর তুমি। থাক ধৈর্য ধরে। অযথা নিজেকে অস্থির উতলা করে তুল না ভূতুদা, তাতে ক্ষতি হবে তোমার।

—হোক ক্ষতি। গর্জে উঠল ভূতনাথ, —তবু আমি জানতে চাই বুঝতে চাই তোর মৃত্যুর আসল রহস্যটা কি? কেন সবাই আমাকে তোর মৃত্যুর জন্য দায়ী করবে? আর এটাই বা তুই সহ্য করবি কি করে? এটা কি তোর স্বামীর অপমান নয়? না সতী, বলতেই হবে তোকে—"

গম্ভীর সতীর দু-কাঁধে দুটো হাত রেখে ঝাঁকবে তাকে নাড়া দিতে দিতে বলতে লাগল ভূতনাথ,—বল সতী, চুপ দিয়ে থাকিস না তুই। বল আমাকে। আমি তোর স্বামী। স্বামীর কথা রাখবি না তুই? শুনবি না আমার কথা? লক্ষ্মীটি আমায় বল তুই। সতী-সতী-সতী—

কথাটা যে কখন ভূতনাথের চিৎকারে পরিণত হয়ে গেছল কে জানে। শুনে ওমনি পাশের ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তার মা-বাবা। দেখলেন ঘুমন্ত অবস্থাতেই ভূতনাথ পাশবালিশটাকে দু-হাতে ঝাঁকরানি দিতে দিতে "বল সতী, বল সতী" বলে চিৎকার করে চলেছে। আশ্চর্য্য। বাবা এসে মস্ত তাকে দিলেন একটা নাড়া। মা এসে জড়িয়ে ধরে তাকে বলে উঠলেন ভয়ার্ত কণ্ঠে,—কি হয়েছে বাবা? সতী সতী বলে এমন চিৎকার করছিস কেন?

বাবার ছোঁয়ায় মায়ের চিৎকারে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল ভূতনাথের। ধড়ফড় করে উঠে বসল সে। তাকাতে লাগল এধার ওধার বোবা চোখে। বিস্ময়াবিষ্টভাবে। জিজ্ঞেসা করে উঠলেন বাবা, —স্বপ্ন দেখছিলি?

হ্যাঁ, স্বপ্নই তো দেখছিল সে! অদ্ভুত স্বপ্ন! আচ্ছা বাবা, মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন? স্বপ্নটা কি? ছোটবেলাকার একেবারে সেই বাল্যসুলভ সরলতায় জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

বলরাম বাড়ুজ্জে অবাক! অবাক হবেন না কেন? কারণ চিরকাল তো বাপের সঙ্গে বেটার পূব- পশ্চিম সম্বন্ধ। বাপকে যেমন এড়িয়ে চলত ছেলে। বাবাও তেমনি ছেলের কাছে থাকতেন গুরু গম্ভীর হয়ে। খুব ঠেকায় না পড়লে মুখ দেখা-দেখি হত না উভয়ের মধ্যে। কথাবার্ত্তা তো দূরের কথা। তাই মনে হয় আজ ভূতুর ছেলেমানুষী প্রশ্নটাকে বড় আগ্রহের সঙ্গে নিলেন বাড়ুজ্জে মশায়। বসলেন তার পাশটিতে সেই বাপের অধিকারেই। পরম স্নেহে সেই বাল্যকালের মতই বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন তাকে। বলতে লাগলেন তাকে তার এ পর্য্যন্ত শুনে আসা এ সম্পর্কে যত কথা। পড়া, জানা, বুঝা এর ওর কাছে তর্কালোচনায় আহরণ করা যত জ্ঞান। উজাড় করে ঢালতে লাগলেন সব ছেলের কাছে।

স্বপ্ন হল নাকি আমাদের এমন কতকগুলো কামনা বাসনা যা বাস্তব জীবনে পূরণ হয়নি। এমন কতকগুলো আশা-আকাঙ্খা যা অনৈতিক অসামাজিক, এমন কতকগুলো চিন্তা বা কল্পনা যা অমূলক, অবাস্তব। এ সবের কিন্তু বিনাশ হয় না কখনও। লোপ পেয়ে যায়নি কখনও আমাদের জীবনে ওঠা কোন ঢেউ-ও। আস্তে আস্তে তলিয়ে গেলেও মনের গভীর গহন স্তরে সেগুলো থাকে জমা হয়ে। সেই গুলোই ঘুমের মধ্যে সুযোগ পেয়ে উঠে আসে মানুষের চেতন স্তরে। অবচেতন মনের ধামা-চাপা কামনা-বাসনার এই চেতন স্তরে ভেসে উঠাকেই বলে স্বপ্ন। স্বপ্ন হল মানুষের চিন্তা ও কল্পনার বাস্তব রূপ নেবার প্রয়াস। আমাদের অবাস্তব অপূরণীয় ইচ্ছাগুলোর দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা।

কথাগুলো ভূতনাথের মনঃপূত হল না। কারণ তার স্বপ্নের সঙ্গে এগুলোর সামঞ্জস্য তেমন খুঁজে পেল না সে। তাই আবার পাল্টা প্রশ্ন করে উঠল সে তার বাবাকে,—স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয় বাবা?

বাবা কি বলতেন কে জানে মা কিন্তু তার হয়ে উঠল অত্যন্ত ভয়কাতুরে, উদ্‌গ্রীব। মেয়ে মানুষের এসব তত্ত্বকথা ভাল লাগবে কেন? তায় আবার মায়ের মন। স্বপ্ন দেখেছে ছেলে তার ভোর রাতে। দেখেছে আবার মরা বৌ সতীকে। সুতরাং ব্যাকুলতার কথা তার বলাই বাহুল্য। ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলেন তিনি— ওসব কথা ছাড় বাবা। রাম নাম কর তুই। ঘরে শাল গ্রাম শিলা আছেন, গ্রামের মাথায় আছেন ভূতনাথ। মহাদেবের দেওয়া ছেলে তুই। তোর আবার কিসের ভয় বাবা। মুখপুড়ি মরে আবার তোকে জ্বালাতে এসেছে। ওঝা ডেকে, গুনিন এনে সর্বনাশীর তোর পিছন নেওয়াটা ছাড়াব আমি। এ ঘরে আসার এতই যদি ইচ্ছা ছিল হতচ্ছাড়ি, তবে বিষ খেয়ে এভাবে আত্মহত্যা করতে গেলি কেন? কে তোকে জ্বালাতে গেছল নদীভরি?

—সতী আত্মহত্যা করেনি মা। গম্ভীর স্বরে বলে উঠল ভূতনাথ, —আমার ধারনা, মরেনি সে নিজে। মরতে সে চায়নি মা। তাকে মারা হয়েছে।

—মরুক, মারুক, চুলোয় যাক সে, বলে উঠলেন মা— তুই তার চিন্তা ছাড় দেখি বাপ এখন। ঠাকুরের ফুল তুলসী গঙ্গাজল খেয়ে নিশ্চিন্ত থাক তুই। ঘাট শ্রাদ্ধ পেরুলে মাগীকে গয়ায় দিয়ে তবে ছাড়বো।

কথাগুলো ভূতনাথের বোধ হয় কানে গেল না। তাই কেমন যেন এক আচ্ছন্নের স্বরে বলে উঠল সে, — সতীর এই মৃত্যুর কলঙ্ক আমাকে দূর করতে হবে মা। জানতে হবে আমাকে সত্যি আমি তার মৃত্যুর জন্য দায়ী কি না।

—কোন মুখপোড়া-মুখপুড়িরা এ অপবাদ দেয় তোকে? গর্জে উঠল সারদা— কে বলে তোকে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী? তাদের শ্মশানে পাঠাই আমি। মুখে আগুন লাগাই। কপালে ধূঁয়া উঠাই। চাপাই তাদের বুকে আমি মড়ার মুড়ো কাঠ। ইত্যাদি ইত্যাদি আবার সেই সেদিনের মত মায়াদের উদ্দেশ্য করে মায়ের শুরু হয়ে গেল নানা গাল-ফিরিস্তি।

সারদার অবশ্য ব্যাকুল হওয়ার কোন দোষ নেই। কারণ সেই থেকে ছেলে তার সত্যিই কেমন যেন হয়ে গেছ উন্মনা, উদাস। ঘুরতে লাগল সে শ্মশানে। বেড়াতে লাগল সে আনমনা। থাকতে লাগল সে একলা। কথা

বললে একটাই প্রশ্ন তার—সতী মরল কেন? সে আর কারো কাছে কিছু জানতে চায় না। কিছু বুঝতে চায় না। প্রত্যাশা করে না কোন কিছুর। চায় শুধু তার জিজ্ঞাসার উত্তর—কি করে মৃত্যু হল সতীর?

কে দেবে তার এ প্রশ্নের উত্তর। যাকে জিজ্ঞেস করে সেই মুখ ফেরায়। কেউ ভাবে হয়তো পাগলের কোটায় যাচ্ছে সে। কেউ মনে করে হয়তো বাতিকগ্রস্থ ছেলের আবার হয়তো ওমনি উঠেছে একটা বাই। এ সম্বন্ধে ছিঁটে ফোঁটাও বলা মানে তো গরম দুধে গরুমুত দেওয়া। ওসব ওদের আত্মীয় পরিজনের ব্যাপার। মরুক গে সব যে যার আপন আপন ঝামেলায়।

ভূতনাথের গোঁ একবার চাপলে নামে না কখনও। মস্ত জেদি ছেলে সে। সুতরাং কেউ তাকে কোন কিছু না বলুক, ভাবুক তাকে যে যার ইচ্ছা। সে কিন্তু নাছোড়বান্দা। সতীর মৃত্যু রহস্যের উদঘাটন করা তার চাই-ই চাই। গ্রামে, ঘরে, পাড়ায় ভূতনাথ ঘুরে বেড়াতে লাগল উদ্‌ভ্রান্তের মত। কেউ করতে লাগল টিট্‌কারী, কেউ করতে লাগল বিদ্রূপ তাকে। কেউ বলতে লাগল মেয়েটাকে অগ্রাহ্য করে মেরে এবার লোকের কাছে তার কদর দেখিয়ে নির্দোষ হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা ভূতনাথের।

শেষে চণ্ড্‌ চাপল তার এমন যে সতী হারা পতি ভূতনাথ ঘুরে বেড়াতে লাগল শ্মশানে-মশানে। ঘন্টার পর ঘন্টা সে একলা বসে কাটিয়ে দিতে লাগল সতীর সব স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোতে। শুনেছিল সে মানুষ মরে গেলে নাকি এসব স্থানগুলোতে সে নেমে আসে আবার মায়ার টানে। সতী হয়তো তেমনি একদিন উদয় হবে এসব স্থানে। তখন সতীর মুখেই শুনবে সে তার মৃত্যুর কারণ।

চিন্তাগ্রস্থ হলেন বাবা। ছেলেটার কি সত্যিই মাথা খারাপ হল। ভাবতে লাগল কেউ কেউ এ তার গভীর প্রেমের নিদর্শন। সতীর প্রতি ভূতনাথের ছিল প্রগার ভালবাসা। তা না হলে এমন শোক-পাগল অবস্থা হত না তার।

সত্যি ভূতনাথের এ অবস্থার প্রতি মায়া হল সকলের। তার প্রতি সহানভূতিতে ফেটে পড়ল সবাই। ওধারে কিন্তু মা তার বড় বেশী হয়ে উঠলেন উতলা। এসব প্রেম-ভালবাসা, শোক-কাতরতা নয় তার এমন সোনার চাঁদ রূপবান ছেলে কখনও ওমনি ধান-সিজে হাঁড়ির মত কাল কুৎসিৎ কুরূপা বৌকে ভালবাসতে পারে না। পারে না এভাবে তার কোন কালেই মাথা খারাপ হতে। এ হল তার উপ্‌রা পাওয়া। সতীর ওই প্রেতাত্মা ভর করেছে তাকে। অপমৃত্যুতে মুক্তি হয় না কারো? তাই ভূত হয়ে বৌটা ঘাড়ে চেপেছে ওর। ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে পাগলের মত। প্রতিকার না করলে এর ছাড়বে না তাকে ওই ঘাড়ের ভূতটা।

দেখে-শুনে প্রমাদ গুনলেন বলরাম বাড়ুজ্জেও। হতে পারে— এসব তো আর উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়। আক্রোশ থাকতে পারে বৌটার। মৃত্যুর পর তাই হয় তো এই ভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে সে। ভাবনাটা তার শেষপর্য্যন্ত এমন গাঢ় হল যে স্ত্রীর কথায় একদিন তিনি এনে হাজির করলেন দু-মোহানীর ঘাটের চণ্ডীতলার শ্মশান সাধুকে। তিনি এক সাংঘাতিক সাধু। সাধক, সন্ন্যাসী, কাপালিক একাধারে তিনি নাকি সমস্ত কিছু। শুধু তাই নয়, ওঝা গুনিন-জান-দেওয়াশী রূপেও ও.র নাকি খুব নাম ডাক আছে। ভূত-প্রেত অপদেবতা-উপদেবতা, ডা'ন দোষ, নজর-লাগা সব ছাড়ান তিনি। যে যেভাবে ডাকে তাকে তিনি সেই ভাবেই এবং সেই রূপেই আসেন তার কাছে। বাড়ুজ্জে মশায় যখন তাকে ভূত ছাড়াতে ওঝা রূপে ডাকলেন তখন তিনি ওঝা রূপেই এসে হাজির হলেন তাদের বাড়ী।

সে এক তুলকালাম কাণ্ড! চণ্ডীতলার শ্মশান সাধু এসেছে বলরাম বাড়ুজ্জের বাড়ী একি কম কৌতূহলের ব্যাপার? ছেলে-বুড়ো আদি করে গোটা ভূতগ্রাম এসে ভিড় জমাল বাড়ুজ্জে মশায়ের উঠোনে। ভূতে পেয়েছে নাকি ভূতগ্রামের ভূতকে। সেই ভূতনাথের ভূৎ ছাড়াবেন তিনি। সুতরাং সে এক হৈ হৈ ব্যাপার—রৈ রৈ কাণ্ড।

ব্যাপারটা বোধ হয় জানত না ভূতনাথ। তাই কৌশিক বস্ত্র পরিহিত, জটাজুট ধারী, ঝলামালা গলে কাপালিক সাধুকে দেখে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেছল সে। তারপর শুনল যখন সব। জানল যখন বাবার তার উদ্দেশ্যেই আগমন। ভূতে পেয়েছে নাকি তাকে। সে ভূতকে ছাড়াতে এসেছেন নাকি তিনি। তখন ভূতনাথ বেজায় গেল খচে। তার মেজাজ উঠল টঙে। ঝাড়ফুক, মন্ত্র-তন্ত্রের হাড় কঙ্কাল জড়ি, বুটি মেলে ভূতনাথকে যখন খড়ি আঁকা গণ্ডীর ভিতর পাতা আসনের উপর বসতে বললেন তিনি। তখন উঠল ভূতনাথ রেগে।

জিজ্ঞেস করল সে, —বসব কেন আমি? কি হয়েছে আমার? গম্ভীর ভাবে বলে উঠলেন সাধুবাবা,—ভূতগ্রস্ত তুমি। তাই ঝাড়া হবে তোমাকে।

—কি করে বুঝলেন? পাল্টাপ্রশ্ন করে উঠল ভূতনাথ,—আপনিই যে ভূতগ্রস্ত নন তার প্রমাণ কি?

সাধুবাবা, গম্ভীর চোখে তাকালেন তার দিকে পাশ থেকে বলে উঠলেন মা—ভূতে পেয়েছে তোকে কে বলল? দিন-দুপুরে সন্ধ্যা-রাতে একলা শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াস। তাই যাতে ভূত না লাগে, উপরা না পায় তোকে সেইজন্য গা-টা তোর বেঁধে দেবেন তিনি।

—উনিও তো শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ান মা। ঘুরেন শুধু নয় রাতে ভিতে একলা পড়ে থাকেন মড়া—শ্মশানে। উনাকে যদি ভূতে না পায় তবে আমাকেই বা পাবে কেন?

—উনি যে সাধু। বলে উঠলন মা,—উনাকে ওসব ভয় করে বাবা, কাছ ঠেসে না তার। পালায় তার চৌহুদ্দি ছেড়ে।

—আমি সাধুর বাবার বাবা মা। তাই আমাকে ভয় করে ভূতেরা এবং ভক্তি করে কাছে আসে। ভালবেসে বসে আমার পাশে।

কথা শুনে ভূতনাথের বলে উঠলেন সাধুবাবা,—ভক্তি শ্রদ্ধা নয় ওগুলো। ওসব ওদের ভৌতিক চাল। ভালবেসে ভুলিয়ে তোমার ক্ষতি করবে তারা।

—কেও আমার ক্ষতি করতে পারবে না। বেশ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠল ভূতনাথ, —কারণ আমি কখনও কারো ক্ষতি করি না।

—অইং হ্রীং ক্লীং ফট্ কালিকায়ৈ—বলেই হঠাৎ একটা কিম্ভুত-কিমাকার চিৎকার করে উঠলেন সাধু। তারপর আঙ্গুলগুলোকে খাড়া করে হাতদুটোকে তাঁর ঘুরোতে লাগলেন ভূতনাথের শরীরটার সামনে। বলে উঠলেন তিনি ভারিক্কি গলায়,—ছায়া লেগেছে, হাওয়া লেগেছে তোর। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোর মৃতা স্ত্রীর আত্মার নজর পড়েছে তোর উপর। সে-ই ভর করে তোকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে শ্মশানে-মশানে। আচ্ছন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে তোকে অস্থানে কুস্থানে একলা। মেরে ফেলবার জন্য। সঙ্গী চায় সে। ঘাড় মটকে তোর ওই দুষ্ট আত্মাটা সাথী করবে তোকে।

—তাই নাকি? বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলে উঠল ভূতনাথ, —দেখছি ইতিমধ্যেই সবকিছু আপনি জেনে গেছেন আমার। কন্তু এটা তো ঠিক যে মানুষই মরে ভূত হচ্ছে। ভূতই আবার জন্ম নিয়ে হচ্ছে মানুষ। ভূতের মধ্যে দয়া মায়া স্নেহ করুণা গুণগুলো না থাকলে মানুষ হয়ে সেগুলো সে পাবে কি করে? আচ্ছা, ভূতে-মানুষে পার্থক্যটা কি বলুন তো?

সাধুবাবার চক্ষু চড়ক গাছ। ভূতনাথের অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে থমকে গেল সে। গোল চোখ দুটো ভূতনাথের উপর স্থির রেখে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল সে। এটা কি তার পরীক্ষা? কি বলবে সে? পাশ থেকে ওমনি শান্ত স্বরে বলে উঠলেন বাড়ুজ্জে মশায়,—সাধু সন্তের সঙ্গে এমন তর্ক-বিতর্ক করতে নেই বাবা। তারা যা বলেন তা শুনতে হয়।

—তুমি চুপ কর বাবা। ধমকে উঠল ভূতনাথ,—চিরকাল মায়ের পোঁ-ধরা থেকে তুমি তোমার জ্ঞান আক্কেল বাস্তববুদ্ধি সব গুলিয়ে ফেলেছ। আমাকে না জানিয়ে যখন উনাকে আমার ভূত ছাড়াতে এনেছ তুমি, তখন বোঝা তো দরকার উনিও একটা ভূত বটেন কি না? তা না হলে তোমার সমস্ত কিছুই তো পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে বাবা।

—সাধু-সন্ন্যাসীকে এমন আজে-বাজে কথা বলতে নেই বাবা। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে উঠলেন মা, —উনি যা বলছেন শোন। বোস উনার সামনে।

—বসবার জন্যই তো যাচাই করে নিচ্ছি মা তাকে। বলে উঠল ভূতনাথ, —কি সাধুবাবা মানুষে ভূতে তফাৎ কি? জগতের প্রেম-প্রীতি স্নেহ-ভালবাসাগুলো কি এতই ঠুনকো যে মরার পর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে? মা মরে ভূত হয়ে গেলেই কি আমার গলা মটকাবে? বাবা মৃত্যুর পর কি রক্ত শুষে খেয়ে আমাকে তার সঙ্গী করবে? ভূত ছাড়ানো সাধু আপনি মরে গেলেই কি আবার ভূত হয়ে সকলের ঘাড়ে চেপে ঘুরে বেড়াবেন?

সাধুবাবার মুখে আর কথা সরল না। ভূত ছাড়াতে এসে যে তিনি এমন ভূতের পাল্লায় পড়বেন স্বপ্নেও তা ভাবতে পারেন নি। ভূতনাথের প্রশ্নবানে ভীষ্মের শরশয্যায় মত অবস্থা হল তার। বলে যেতে লাগল ভূতনাথ, —শুনুন বাবা, পৃথিবীর প্রেম-প্রীতি স্নেহ ভালবাসাগুলো স্বর্গীয় জিনিস। এগুলোর যেমন রূপান্তর নেই, বিনাশও নেই তেমনি। নিষ্কাম ভালবাসা যারা দিতে পারে তারা আপনাদের মত সাধুসন্তের চেয়েও অনেক মহান। আর তা যারা পায় এ জগতে আসলে তারাই ভাগ্যবান। সতী ছিল আমাকে তেমনি এক নিষ্কাম ভালবাসা দেবার পাত্রী। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার যে সে ভালবাসা দিতে চাইলেও আমি তা নিতে পারলাম না। জীবনে তাকে পাইনি বলে মৃত্যুর পর আমি তাকে পেতে চাই সাধুবাবা। তাই আমি ঘুরে বেড়াই শ্মশানে-মশানে। সে ভূত হয়ে আমাকে পাক সাধুবাবা। আমি পেতে চাই তাকে।

—বালাই ষাট, ও কথা বলিস না বাবা। ভয় জড়িত কণ্ঠে জড়িয়ে তাকে বলে উঠলেন মা, —সে মাগী মরে, ভূতনি পেত্নি পিশাচিনী যা ইচ্ছে হয়ে ঘুরে বেড়াক। তোকে যেন না পায় সে। তোর উপর নজর যেন না পড়ে তার। পথে তার কাঁটা দিই আমি। নজরে তার লঙ্কার ধুয়ো লাগাই। হে বাবা সন্ন্যাসী, ওই দুষ্ট আত্মাটার হাত থেকে রক্ষে কর বাবা আমার ছেলেকে। উদ্ধার কর বাবা ওই শাক-চুন্নিটার কবল থেকে।

—খবরদার মা। ধমকে উঠল ভূতনাথ, —সতীর সম্বন্ধে আর একটাও খারাপ কথা উচ্চারণ কর না তুমি। জান না তুমি সে কত মহান। তাকে খারাপ কথা বলা মহাপাপ মা।

—খারাপ কথা মানে? মাও ওমনি সঙ্গে তার সমানে গলা চড়িয়ে উঠল বলে, —অপঘাত, আত্মহত্যা, অপমৃত্যুতে মরলে কারো আত্মার কখনও মুক্তি হয় ভেবেছিস? ওটা ভূতনি হয়ে তোকে ভর করতে চাইছে। তাই তোর ওমনি মতি-গতিটা দিচ্ছে গুলিয়ে। হেই বাবা—জড়িয়ে ধরলেন মা সাধুবাবার পা দুটো,—তুমি ছেলের কথায় কান দিও না প্রভু। ওই একমাত্র সন্তান আমাদের। ওর ভূতুড়ে বাইটা নষ্ট করে দাও দয়াময়।

মায়ের সে কি ব্যাকুলতা। সে কি উদ্বিগ্ন আকুল কাতর মিনতি তার! দেখে শুনে সাধুবাবা মাথায় হাত দিয়ে শান্ত করলেন তাকে, —সেই জন্যই তো এসেছি মা। কোন ভয় নেই তোর। পারলৌকিক কর্ম, ঘাট-শ্রাদ্ধ এখনও চুকেনি যখন তখন তাকে তো আর একেবারে বনেদ তাড়া করতে পারব না। তবে তোর ঘর-বাড়ী সমেত ছেলের গা এমনভাবে বেঁধে দিয়ে যাব যে তাকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা এ চৌহদ্দিতে সে হাওয়া বা ছাওয়া ফেলতে পারবে না কোনদিন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। মরনের কিন্তু পঁয়তাল্লিশ দিন গত হলেই শ্রাদ্ধ-শান্তি আদি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকর্মগুলো অবশ্যই সমাধা করতে হবে তার।

—কেন? গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ, —কেও যদি তা না করে?

—ওসব ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন না করলে আত্মার উচ্চগতি লাভ হয় না বাবা। বলে উঠলেন বলরাম বাবু, —শ্রাদ্ধের পিণ্ড গ্রহণ করলেই আত্মা অতিবাহিক দেহ ত্যাগ করে প্রাপ্ত হয় এক অতিসূক্ষ্ম হাল্কা দেহ। সে সত্তায় সে তখন যেতে সমর্থ হয় ভূস্তরের সীমানা ছাড়িয়ে উর্দ্ধলোকে। পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে এ পৃথিবীর আর কারোর সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। জড় বন্ধন, মায়ার আকর্ষণ ত্যাগ করে সে তখন চলে যায় তার স্বলোকে। অবস্থান করে কর্মফল অনুযায়ী আপন স্তরে।

—আর ফিরে আসে না?

—না। ভূতনাথের প্রশ্নের উত্তরে তেমনি স্বরেই বলে উঠলেন বাবা—উচ্চ স্তরের আত্মা যারা তারা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হতে আর আসে না এ ধরণীতে। কিন্তু যারা নীচু স্তরের আত্মা। যাদের সত্তায় থাকে কামনা বাসনার সংস্কার। তারা জাগতিক মোহের আকর্ষণে পড়ে নেমে আসে সেই পরলোক থেকে। জন্ম নেয় আবার এই ভোগক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পৃথিবীর বুকে।

কথাগুলো শুনে কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল ভূতনাথ। ভাবতে লাগল সে সতী তো তার উচ্চস্তরের আত্মা। উর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াকর্মের ফলে সে যদি চলেই যায় এই মায়ার পৃথিবী ছেড়ে উর্দ্ধলোকে। তাহলে তো সে আর আসবে না তার কাছে। দেখা হবে না তার সঙ্গে। না, এ কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না। ভাবতে ভাবতে তাই হঠাৎ বলে উঠল ভূতনাথ,—শোন বাবা। সতীর কিন্তু শ্রাদ্ধ-শান্তি করা হবে না। শুধু তাই নয়, আর কোন প্রকার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াও করা চলবে না তার। নিজে তো এসব করবই না উপরন্তু করতে আমি দেব না কাকেও।

—সোঁক কথা বাবা। অবাক হয়ে বলে উঠলেন বলরাম বাডুজ্জে। ওসব না করলে যে আত্মা শান্তি পাবে না তার। মুক্তি পাবে না সে।

—তার শান্তির ব্যবস্থা তোমাদের করতে হবে না বাবা। মুক্তি তার নিজের হাতে। মোট কথা কোন প্রকারের যে পারলোকিক ক্রিয়াকর্ম আর করতে পারবে না সতীর এটাই তোমাকে বলে রাখলুম।

—এটা তোর ঠিক কথা নয় বাবা।

—ও কথা কি ও নিজে বলছে ভাবছো? বলে উঠল সারদা,—ওই সতী মুখপুড়ির প্রেতাত্মাটাই তাকে দিয়ে বলাচ্ছে এসব। সর্ব্বনাশী ছেলেকে আবার ভর করে ঘোরে রেখেছে সর্বক্ষণ। করাচ্ছে সব কাণ্ড। হতচ্ছাড়ি ভূতুর আমার আর ঘাড় থেকে নামবে না বলেই করছে এসব কারসাজি। কি হবে বাবা?

অভয় দিয়ে বলে উঠলেন সাধুবাবা—কোন ভয় নেই তোর। যে যেমন ভূত তার তেমন সরষে-পোড়া জানা আছে আমার। উতলা হবার কোন কারণ নেই তোদের। ওর ভূত আমি নামাবই।

—সত্যি করে বলুন তো, আপনি ভূত দেখেছেন? হঠাৎ সাধুবাবাকে প্রশ্ন করে উঠল ভূতনাথ।

সাধুবাবা তার মুখের দিকে একবার কটমটিয়ে তাকালেন। তারপর বলে উঠলেন দাঁতে দাঁত চেপে,—দেখা শুধু নয়, আমি তাদের ধরে বেঁধে রাখি, বুঝলে?

—তাই নাকি? ভ্রূকুটি কুটিল ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ,—ভূত আমাকে দেখাতে পারবেন?

—নিশ্চয়ই পারব। বসো তুমি আমার সামনের এই আসনটাতে।

কি বুঝল ভূতনাথ কে জানে বসলো সে তাঁর নির্দ্দেশিত আসনটাতে। সাধুবাবা তাকে উদ্দেশ্য করে বেশ কতকগুলো মন্ত্র ইড়িং বিড়িং স্বরে যেন ছুঁড়ে মারলেন তাকে। তারপর বেশ ভাব ভারিক্কি চেহারায় গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। কিছুক্ষণ পর আদেশ হল তার—তাকা আমার দিকে।

তাকাল ভূতনাথ।

—মুখের দিকে নয়, তাকা আমার কপালের দিকে।

সাধুবাবার কপালের দিকেই তাকাল সে। বাবা শুধু সম্বোধনে তুমি থেকে তুইএ নেমে এলেন না। মেজাজটাকেও করলেন তেমনি খরা। কড়া সুরে জিজ্ঞেস করে উঠলেন তিনি ভূতনাথকে, — কি দেখছিস আমার কপালে?

সহজ সরলভাবে বলে উঠল ভূতনাথ,—শ্বেত ও রক্তচন্দনের কতকগুলো বলিরেখা আর মাঝে তার ডগডগে সিন্দুরের তিলক।

—ঠিক করে দেখ। ধমকে উঠলেন সাধুবাবা,—ওটা আমার কপাল নয় তোদের গ্রামের শালী-নদীর শ্মশান-ঘাট।

—বেশ, তাই হল।

—তাই হল কি! আবার তাকে ধমকে উঠলেন বাবা,—দেখ ভাল করে ওই শ্মশান ঘাটের একটা চিতা থেকে উঠে আসছে একটা পেত্নী। কালো ঘোমটায় ঢাকা তার মুখ। ওই হল তোর সতীর প্রেতাত্মা। ভূতনী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

একে কারো কখনও ধমক সহ্য করতে পারে না ভূতনাথ তার উপর এই বুজরুকি। চাপা আগুনে যেন বারুদ পড়ল ভূতনাথের। গর্জে উঠল সে, আমাকে কি ছোটজাতের অশিক্ষিত অজ্ঞান বেকুব মেয়েছেলে পেয়েছেন যে যা বলবেন তাই বিশ্বাস করে নিতে হবে আমাকে?

—বিশ্বাস করতে বাধ্য তুই। ধমকে তাকে বলে উঠলেন বাবা, —আত্মহত্যা করে মরে যারা, তারা ভূত-পেত্নী শ্মশানের শাকচুন্নী ছাড়া আর কিচ্ছু হয় না। ওই পেত্নীটাকে টেনে আনছে আমার মন্ত্রশক্তি। বেঁধে আনছে তাকে আমার কাছে। লঙ্কাবানে তাকে জব্দ করব আমি। ধূনোবানে দেব তাকে উড়িয়ে। কিচ্ছু চিন্তা করিস না তুই।

—দেখুন বাবা, ওসব ভণ্ডামি, ধাপ্পাবাজি আমার কাছে চলবে না। আর সতীর সম্বন্ধে একটাও খারাপ কথা উচ্চারন করলে জিবটা আমি আপনার ছিঁড়ে নেব। এসব ধোঁকা বাজি ছেড়ে দিয়ে ভাল চানতো এখনও মানে মানে কেটে পড়ুন আপনি আমাদের বাড়ি থেকে।

ধমকে উঠলেন বাবা,—তোর কি সত্যি সত্যি মাথা খারাপ হল ভূতনাথ। কাকে কি বলছিস তুই?

—মাথা খারাপ হয়নি বাবা আমার। আমি ঠিকই বলছি। আত্মহত্যা করেনি সতী। ভূত-পেত্নী হতে পারে না সে। মিথ্যা বলছে এই ভণ্ড ধড়িবাজ সাধুটা। সরল পেয়ে এ তোমাদের ঠকাতে এসেছে বাবা। ভেল্কি দেখিয়ে ভুলাতে এসেছে আমাদের।

—ভেল্কি দেখাতে এসেছি আমি? রেগে উঠলেন সাধুবাবা,—আমার এই কৌশিক বস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা, কপালের রক্তচন্দন তিলক সব মিথ্যা?

—ওরকম চন্দন লেপে, তিলক কেটে সাজ পোশাকের ভড়ং দেখিয়ে যাত্রাদলে অনেকেই সাধু সাজে। অভিনয় করে। ঝোলা-মালা, তিলক ফোঁটায় সকলে ভুলতে পারে, আমাকে ভুলাতে পারবেন না আপনি।

—কি সব অবান্তর কথা বলছিস? ধমকের সুরে বলে উঠলেন বাবা, যতই হোক উনি আমাদের অতিথি। এ অঞ্চলের ছোট বড় সমস্ত লোক মানে তাঁকে। অতিথির অসম্মান করা, মানীকে অমান্য করা উচিত নয় তোর।

—অতিথি অতিথির মত থাকুন। এসব তুকতাক ভেল্কিবাজি, ছল চাতুরী ছেড়ে দিয়ে তিনি সাধুর মত থাকুন। কেউ তার সম্মান হানি করতে যাবে না। একটা সুস্থ-সবল মানুষকে ভূতে পাওয়া ঠাওরে ওমনি অত্যাচার করতে আসা উচিত কি উনার? লজ্জা করা উচিত তো তার এসব করার।

ভূতনাথের কথায় গুঞ্জন উঠল সব দেখতে আসা লোক-জনদের মধ্যে। একদল তার কথায় স্তম্ভিত হয়ে রইলেও অপরদল বোধ হয় ক্ষুন্ন হল তার উপর। চণ্ডী তলার শ্মশান সাধুকে অপমান করা একি কম অন্যায়ের কথা। পায়ের তলায় মাটি থাকবে না কারো।। এসব মুখ বুজে সহ্য করে গেলেও তিনি ছাড়বেন না কাকেও। শ্মশানের সব ভূতপ্রেত দৈত্য দানোদের লাগিয়ে নাস্তানাবুঁদ করাবেন তিনি সকলের সংসারকে। সকলের গুঞ্জন কানে যেতেই সাধুবাবার মনে সাহস এল না কি কে জানে। ধমকে বলে উঠলেন তিনি,—ভেল্কিবাজি দেখাতে আমি এখানে আসিনি। সত্যি ভূতগ্রস্থ তুমি। তুমি বুঝতে পারছো না সে ভূত কিভাবে তোমার ঘাড়ে চেপে কোন কৌশলে নিয়ে যাচ্ছে তোমাকে মৃত্যুর দিকে।

—হেই বাবা, পা দুটো সাধুর জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন ভূতনাথের মা, এ ভূত যেমন করেই হোক আপনি ছাড়িয়ে দেন বাবা। ছেলের অপরাধ ধরবেন না প্রভু। তার হয়ে ক্ষমা চাইছি আমি। উদ্ধার করুন বাবা ছেলেকে আমার ওই ঘাড়ে চাপা পেত্নীটার কবল থেকে। বাঁচান তাকে।

—তা এখন সম্ভব হবে না। গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন বাবা,—ওই দুষ্টু আত্মাকে গয়ায় না দিয়ে এলে সে নামবে না তোর ছেলের ঘাড় থেকে। স্বামীর অধিকারে সে এখন পেয়ে বসেছে তোর ছেলেকে। সুতরাং আগে প্রেতমুক্তি ঘটাতে হবে তার। দিয়ে আসতে হবে তার নামে প্রেত গয়ায় গিয়ে পিণ্ড। নইলে মুক্ত হবে না সে, মুক্তি দেবেও না তোর ছেলেকে।

সর্বনাশ! কথাটা শুনে ঘাবড়ে গেলেন মা। জড়িয়ে ধরলেন তিনি সাধুবাবার পা-দুটো আরো দৃঢ়ভাবে। বলে উঠলেন কাকুতি-মিনতি করে। —হেই বাবা, তাই গয়ায় দেবারই ব্যবস্থা করুন আপনি। যা লাগে দেব আমি।

—না। গর্জে উঠলে ভূতনাথ—ওসব অন্ধবিশ্বাসের বশে চলতে আমি দেব না কাকেও। শ্রাদ্ধ শান্তি যেমন আমি সমর্থন করি না তেমনি ও সব গয়া পিণ্ডি গঙ্গায় দেওয়া ইত্যাদিকেও আমি বিশ্বাস করি না। গয়ায় দেওয়া হবে না সতীকে।

—একি বলছিস তুই? বলে উঠলেন বাবা—গয়ায় দিলে মুক্তি হবে আত্মার। যে যার লোকে চলে যেতে বাধ্য হবে। বাধ্য হবে সেখানে অবস্থান করতে। এ মাটির পৃথিবীতে নেমে আসার সমস্ত পথ বন্ধ হবে তার।

—সেই জন্যই তো বিশেষভাবে গয়ায় দিতে দেব না আমি সতীকে।

—কি বলতে চাস তুই? গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

—আমি বলতে চাই এক্ষুনি এই মুহূর্তে তুমি বের করে দাও এ সাধুকে আমাদের ঘর থেকে।

—যদি না দিই? বলে উঠলেন তিনি তাঁর পিতৃ-পৌরুষের গাম্ভীর্য্যে।

—বেশ, ভারিক্কিভাবে বলে উঠল ভূতনাথ,—তবে থাক তুমি তোমার ওই সাধুকে নিয়ে। আমি চললাম ঘর থেকে।

—তাই বেরিয়েই যা তুই। বনেদী দাপটে ওমনি মুখ থেকে বেরিয়ে গেল বলরাম বাড়ুজ্জের, —তা বলে যা বলবি তুই তাই আমাকে মেনে নিতে হবে নাকি? যাকে আমি সম্মান করে ডেকে এনেছি ঘরে তোর গোঁয়ার্তুমির জন্য তাকে আমাকে বের করে দিতে হবে?

ভূতনাথ আর কোন কথা না বলে পা বাড়াল বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য। মা ওমনি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাকে,—বাপের কথায় রাগ করিস নে বাবা। মাথা ঠান্ডা করে একটু বুঝে দেখ আমরা যা করছি তোর ভালর জন্যই করছি। তুই ছাড়া আমাদের আর আছে কে বল। তুইচলে গেলে আমরা বাঁচব আর কাকে নিয়ে, থাকবই আর কি জন্য?

—তোমাদের প্রতি ওই দুর্ব্বলতাই আমাকে বেশী জব্দ করে দিয়েছে মা। নইলে সতী আমাকে এ ভাবে ফাঁকি দিয়ে যাবার পর আর আমি আসতাম না এখানে। কিন্তু এসেছি বলে তোমারা যা ইচ্ছে তাই করে যাবে আমার উপর আর আমি তাই মুখ বুজে সহ্য করে যাব তা কখনও হবে না। তুমি তো জান আমি যা বলি তাই করি। তোমাদের সাধু যতক্ষণ এ ঘরে থাকবে ততক্ষণ আমি আসব না এ বাড়ীতে। চললাম আমি।

চলে যেতেই ভূতনাথ, ওমনি ঘরে এসে ব্যাকুলভাবে সাধুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল সারদা,—কি হবে বাবা আমার। ওই পেত্নিটা কি এমনিভাবে ছেলের আমার মাথা খারাপ করে দেবে। হে প্রভু এর কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবেই আপনাকে।

—"ওইং হ্রীং ক্রীং কালিকায়" বলে বিকট স্বরে একটা চিৎকার করে উঠলেন সাধুবাবা। তারপর অভয় দিয়ে বলে উঠলেন তাকে—কোনো চিন্তা নেই তোর। জ্বালা প্রদীপ, দে ধূপধূনা আমি বগলামুখীর সাধনায় বসছি। মন্ত্রের জোরে কোন ভূত পেত্নি স্পর্শ করতে পারবে না ছেলেকে তোর। আমার তন্ত্রের শক্তিতে টেনে আনবে তাকে ঘরে। বিনা উপস্থিতিতেই তার ভূত ছাড়ানো ক্রিয়াকর্ম সমাধা করব আমি। পুনরায় ব্যবস্থা কর তুই।

নিশ্চিন্ত হল সারদা। বাড়ুজ্জে মশায়ও বোধ হয় মনে পেলেন বল।

(নয়)

অনুতপ্ত মায়া। অনুতাপের আগুন দিনরাত দগ্ধ করতে লাগল তাকে। তুষের আগুনের মত থিকি থিকি ধিকি ধিকি। বিবেকের খোঁচায় রাতদিন অস্থির হতে লাগল তাব অন্তরটা। না জানি সেদিন কি ভর করেছিল মায়াকে। জানে না সে কোন পোকা তার মাথায় ঢুকে গুলিয়ে দিয়েছিল তার জ্ঞান-বিবেক আর বোধ-বুদ্ধিটাকে। হঠাৎ সে এমন উত্তেজিত হল কেন ভূতুদার উপর? কোন আক্কেলে? কিসের ঘোরে? যে ভূতুদাকে ভালবাসত মায়া প্রাণ দিয়ে। শ্রদ্ধা করত জীবন দিয়ে। সে ভূতুদাকে অপমান করল সে। যে ভূতুদার মনে অন্য কেও তিলমাত্র আঘাত করলে সহ্য করতে পারত না মায়া। সে ভূতুদাকে নিজে আঘাত করল সে। পারল সে ভূতুদার মনে কষ্ট দিতে? পারল সে তার প্রতি রুষ্ট হতে? এ অসম্ভব সম্ভব হল তার পক্ষে।

দিদির সঙ্গে ভূতুদার বিয়ে হওয়ায় তার চেয়ে বেশী আনন্দিত বোধ হয় আর কেও হয়নি। যে ভাবেই বিয়ে হোক তাদের তাকে একজন নিকট আত্মীয় হিসেবে পেয়ে মায়ার চেয়ে বেশী খুশী মনে হয় আর কেও হতে পারে না। সব ছেলেদের মুকুটমনি ভূতুদা, সব মেয়েদের নয়নমনি ভূতুদা —তাকে ঘরের আপনজন হিসেবে পাওয়া একি কম সৌভাগ্যের কথা। এযে সেই ছোটবেলায় ছুটে গিয়ে পড়া-তালটা কুড়িয়ে নেওয়ার মত। সকলকে টেক্কা দেওয়ার মত বাহাদুরী। গ্রাম সয়লা সখী-বান্ধবীদের নজর লাগা ভূতুদাকে সকলকে কলা দেখিয়ে ঘরে তোলা কম বাহাদুরী নয় মায়ার? নয় তার এটা কম গর্বের কথা। সেই অহঙ্কারেই ডগমগ ছিল সে। কিন্তু একি করল সে আজ সেই ভূতুদা'কে কুকুরের মত দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে, তাদের ঘর থেকে। ছি ছি—ছিঃ।

অন্তরে অনুক্ষণ অনুশোচনার খোঁচা, বাইরে পাড়া-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথীদের খোঁটা, পাগল করে তুলল মায়াকে। ভূতুদার প্রতি তার ওই অন্যায় আচরণটার জিগির তুলে ঘাটে বাটে নানাস্থানে নানাজনে করতে লাগল নানা মন্তব্য। নানান ধরনের চিম্‌টিকাটা কথা, বিদ্রূপের গুঁতো, টীকা টিপ্পনী, আওলি বাউলি বাতাসের মত ঘুরতে লাগল তাকে কেন্দ্র করে। নানান জায়গায়, ঘরে বাইরে সর্বত্র। সাতে-পাঁচে দিনের বেলায় কোটরে থাকা পেঁচার মত অবস্থাটা হয়ে গেল মায়ার। গুপটি মেরে ঘরের কোণায় বসে কাটতে লাগল তার দিন। এর-ওর সঙ্গে মেলা-মেশা তো দূরের কথা ঘরে কেও সঙ্গী-সাথী এলে বড় একটা কথা বলত না পর্যন্ত সে তাদের সঙ্গে।

বাইরে মায়া না বেরুলেও ভূতুদার কথা কিন্তু দিব্যি আসত তার কানে। মাথাটা নাকি খারাপ হয়ে গেছে ভূতুদার। পাগলের মত ঘুরে বেড়ায় শ্মশানে-মশানে। রাত দিন ঠিক নেই তার। নেই ঠিক তার নাওয়া খাওয়ার। সতী হারা পতি ভোলানাথ। দিদির শোকেই নাকি পাগল সে। জানে না মায়া উমার মত কোন সাধনায় পেয়েছিল দিদি তার শিবের মত এ স্বামী-দেবতাটিকে। সত্যি, শুনে অবাক হয় মায়া। এত প্রেম ভূতুদার। এত ভালবাসত সে দিদিকে। এ স্বামীর উপর রাগ কখনও করতে পারে কি দিদি তার? পারে কি কখনও আত্মহত্যা করে তাকে চিরকালের মত ছেড়ে যেতে? ভুল, ভুল তার। ধারনা তার সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ ভূতুদা কখনও দিদির উপর রাগ করে চলে যেতে পারে না। পারে না সে কখনও তার উপর অভিমান করে বোকারোতে গিয়ে পড়ে থাকতে। না বুঝে, না জেনে ভূতুদার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে মস্ত বড় অন্যায় করেছে মায়া। মস্ত বড় অপরাধ হয়েছে তার বিনা দোষে দোষী ভেবে ভূতুদার প্রতি রুষ্ট হওয়ায়। নিজের প্রতি ঘৃণায় ধিৎকারে ভরে গেল মায়ার মনটা।

হঠাৎ সেদিন স্বপ্নে দেখল মায়া তার দিদিকে। মৃত্যুর পর এই হল তার প্রথম দেখা। সেদিনের সেই গাঁজলা ওঠা মুখ, ঘোলাটে চোখ না থাকলেও পরনের তার ডুরে শাড়িটা তেমনিই আছে। তেমনিই আছে তাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় পায়ে পরিয়ে দেওয়া আলতা ও মাথায় পরিয়ে দেওয়া সিন্দুরটা। ঘর থেকে বের করে নদীর ঘাটে নিয়ে যাবার আগে তুলসী থানে যে খাটটার উপর তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল সেখানেই সেই খাটটার উপরই বসে আছে সে। বসে আছে বিষাদ মাখা এক করুণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে সে।

—এ দিদি তুই কাঁদছিস কেন? জিজ্ঞেস করে উঠল মায়া।

দিদির ফেঁস-ফেঁসানি আরও গেল বেড়ে। হাতদুটো মায়ার জড়িয়ে ধরে কান্নাভরা গলায় বলে উঠল সে, —কি দোষ করেছি আমি তোদের উপর? কি অপরাধ করেছি আমি তোর?

—কি মুস্কিল! অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মায়া, —একি বলছিস তুই? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

মুখে দিদির অভিযোগের সুর। গলায় তার অভিমানের কান্না, —মানুষটাকে তুই দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিলি। কেন? কি অন্যায় করেছিল তোর জামাইদা? কি অপরাধ হয়েছিল তার?

মায়া হতভম্ব। কথা সরল না তার মুখে। দিদি তার বলেই চলল, — এই তুই তোর জামাইদাকে ভালবাসিস? এই হল তোর ভূতুদার উপর প্রেম? তার মনের দুঃখটা তুই বুঝলি না? বুঝলি না তার প্রাণের কষ্টটা। সে যে বড় ব্যথা নিয়ে এসেছিল তার অন্তরে। এসেছিল তোর কাছে একটু শান্তির আশায়। একটু সান্ত্বনার লোভে। তুই তার মনের আগুন ঠান্ডা করবি কি—দিলি তা দ্বিগুণ বাড়িয়ে। জ্বলে-পুড়ে চলে গেল সে অথচ একটু সহানুভূতির ভাষা পর্যন্ত বেরুল না তোর মুখ থেকে। এই তোর ভূতুদা'র উপর টান মায়া।

দিদিগো আমি বুঝতে পারিনি। দিদিগো আমি জানতে পারিনি। বলেই ছোটছেলের মত হাউমাউ করে কেঁদে ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়া সতীর বুকটার উপর। সেই ছোটবেলাকার মতই দুহাতে গলাটা জড়িয়ে তার বলতে লাগল কাঁদতে কাঁদতে—কেন আমি ভূতুদার উপর রাগ করলাম দিদি? কেন তার উপর করলাম এমন নিষ্ঠুর আচরণ? কেন তাকে আমি তাড়িয়ে দিলাম ঘর থেকে? বল দিদি তুই, কেন আমি করলাম এমন কাজ। কেন, কেন, কেন?

বুকের উপর মুখটা ঘসে মায়ার সেকি কান্না। পরম সোহাগে দিদি তার জড়িয়ে ধরলেন মাথাটা। পরম আদরে সে মায়ার মুছাতে লাগল চোখের জল। হাত বুলোতে বুলোতে মাথাতে তার বলতে লাগল পরম স্নেহে,

—জানি বোনটি আমার, ভূতুদার উপর রাগ করতে পারিস না তুই। পারিস না কখনও জামাইদার উপর রুষ্ট হতে। তোর ভূতুদাকে যে আমি তোর কাছেই রেখে এসেছি বোন। দিয়ে এসেছি তাকে তোর হাতেই। তুই না দেখলে তাকে কে দেখবে আর বল ? তুই না বুঝলে তাকে কে বুঝবে আর বল ? তুই না নিলে তাকে জীবনটা যে তার বয়ে যাবে মায়া। আমি যে তার কষ্টটা আর সহ্য করতে পারছি না বোন। দেখতে পাচ্ছি না আর তার মনের দুঃখটা। সে যে বড় আঘাত পেয়ে তোর কাছ থেকে চলে গেছে মায়া।

সত্যি বলছি দিদি, বিশ্বাস কর তুই, বলে উঠল মায়া,—আমি তাকে আঘাত দিতে চাই নি। চাইনি তাকে ঘর থেকে আমি বের করে দিতে।

জানি আমি। শান্তস্বরে বলে উঠল দিদি, —ওটা তোর অভিমান। ওসব তোর প্রাণের কথা নয়। নয় ওসব তোর মনের ব্যবহার। কিন্তু অভিমানটা যে তোর উত্তেজনার বশে আঘাত করেছে তার অন্তরে। হৃদয়টা যে তার আচরণে তোর বড় পেয়েছে ব্যথা।

আমায় তুই ক্ষমা কর দিদি। পা-দুটো ধরে দিদির বলে উঠল মায়া— , সত্যি আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে। মহা অপরাধ করেছি আমি ভূতুদা'র উপর। মাফ কর তুই আমাকে। হাতদুটো মায়ার পা থেকে ছাড়িয়ে সতী বুকে তুলল তাকে। বলতে লাগল আদর করে,—মাফ করবার আমি কে বোন। যার কাছে অপরাধ করেছিস ক্ষমা চা' গিয়ে তার কাছে। বাবার মন্দিরে যা তুই। সব ঠিক হয়ে যাবে। যা বাবার মন্দিরে।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল মায়ার। কোথায় বা দিদি তার, কোথায় বা তার সঙ্গে বসা তুলসী থানের মড়া-খাটটা। নিজের ঘরে তক্তাপোষটার উপর শুয়ে আছে সে। চারধার অন্ধকার। রাত তখন কতটা হবে কে জানে। নির্জন, নিস্তব্ধ চতুর্দিক। কিন্তু কানের কাছে তখনও যেন বাজতে লাগল তার দিদির গলা,— বাবার মন্দিরে যা তুই। যা বাবার মন্দিরে।

চোখে মুখে জল নিয়ে প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা করল মায়া। সত্যি, স্বপ্নটা কিন্তু অদ্ভুত। বহুদিন পর দিদিকে দেখে মনটা বড় তোলপাড় করতে লাগল মায়ার। মনে পড়তে লাগল তার নানা স্মৃতি, নানা কথা। বাবার মন্দিরে যাবার কথা তাকে প্রায়ই বলত দিদি। বলত তাকে বাবা ভূতনাথের নানা মাহাত্ম্য-কথা। খুব জাগ্রত নাকি তাদের এই গ্রাম্য দেবতা। ভক্তিভরে ডাকলে তাকে সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তিনি। বাবা ভূতনাথ কল্পতরু। যার যা ইচ্ছা কামনা নিয়ে উপোস দিয়ে পূজো করলে তাঁর মনের বাসনা পূরণ করেন তিনি। বাবার মাথায় জল না ঢেলে যে কোন দিন জলগ্রহণ করে না—জীবনে তার অভাব থাকে না কোনদিন। তাই দিদি তাকে ঢালতে বলত শিবের মাথায় জল। করতে বলত চতুর্দ্দশীর উপোস। কিন্তু ওসব উপোস কাপাস ধাতে সইত না মায়ার। ধারত না ধার সে বার-ব্রতের। পীড়াপীড়ি করে দিদি বলতে এলে তাকে স্পষ্ট জবাব দিত সে, —ওসব জ্ঞান দিতে আর আসিস না বাপু। ধম্মকম্ম আবার দ্বারা হবে না। যত পারিস তুই উপোস দিয়ে শিবের মাথায় জল ঢাল যে শিবের মত বর পাবি তুই।

সত্যিই শিবের মত বর পেয়েছিল তার দিদি। ভূতুদার মত স্বামীকে পাওয়া বাবা ভূতনাথের কৃপা ছাড়া আর কি ? কিন্তু যাক গে ওসব কথা। স্বপ্নটা কিন্তু মায়াকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলল। ভাবতে ভাবতে কাটল তার রাত। ভাবতে ভাবতেই কাটতে লাগল তার দিন। ওধারে যে বাড়ুজ্জে পাড়ায় চণ্ডীতলার শ্মশান-বাবা আসায় তুলকালাম কাণ্ড, গ্রামশুদ্ধো মাতোয়ারা। সে সব কোন কিছুই কানে গেল না তার। আপন মনে বসে বসে ভাবতে লাগল সে — বেঁচে থাকতে দিদির একটা উপদেশও পালন করেনি সে। শুনেনি তার কোন কথা। বরং বলতে এলে অপমান করেছে তাকে। করেছে তাকে নানা বিদ্রূপ, টিট্‌কারী, অবহেলা, অবজ্ঞা। আজ সেসব স্মৃতি উদয় হয়ে মায়ার বড় বেশী মোচড় দিতে লাগল মনটা। তাকে তাচ্ছিল্য করার ব্যথা, অপমান করার বেদনা ব্যুমেরাং হয়ে আজ বড় বেশী আঘাত করতে লাগল তার প্রাণটাকে। তার অন্যায়, অনাদর, মুখ বুজে সহ্য করার মূর্ত্তি মানস পটে ভেসে উঠে বড় বেশী উতলা করতে লাগল তার অন্তরটাকে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাকে। কিন্তু কি ভাবে তা করবে মায়া ? চিন্তা করতে লাগল সে।

হঠাৎ উদয় হল তার মনে—এপাপের প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র উপায় হল তার দিদি যেভাবে তাকে দেখতে চেয়েছিল সেইভাবে তাকে হয়ে উঠা। দিদি মারা গেলেও তার উপদেশগুলোকে সে মরে যেতে দেবে না।

প্রত্যেকটা কথাকে তার বাঁচিয়ে রাখবে সে জীবনে। পালন করবে তার আদর্শ। টিকিয়ে রাখবে তার আশা। অনুসরণ করে চলবে তার প্রত্যেকটা আচরণ জীবনে তার চলার পথে। করবে সোমবার, করবে শিবচতুর্দ্দশী, করবে পুণ্যিপুকুর। দিদির রেখে যাওয়া প্রত্যেকটা বার-ব্রত উপোস-কাপাশ এবার থেকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলবে সে। যাবে বাবা ভূতনাথের মন্দিরে। উপোস দিয়ে করবে সে বাবার পূজো। স্নান করে ঢালবে সে শিবের মাথায় জল। ঠিক দিদির মতই ভক্তিভরে নিষ্ঠার সঙ্গে এবার চড়ক সংক্রান্তি থেকেই ধরবে সে শিব-ব্রত।

হঠাৎ ভাবনায় ছেদ পড়ল মায়ার। এসে হাজির হল কাকলি। এসেই সে বলতে আরম্ভ করল তাকে ভূতুদার বাড়ীতে আসা চণ্ডীতলার শ্মশান-বাবার সমস্ত ঘটনা। তার সঙ্গে ভূতুদার তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি, বাগ-বিতণ্ডা ইত্যাদি সব কিছু। তবে এসব মায়াকে পরিচয় দিতে আসা আসল উদ্দেশ্য নয় কাকলির। আসল উদ্দেশ্য তার তাকে শোনাতে আসা সতীদি'র প্রতি ভূতুদার গভীর প্রেমের কথা। দিদিকে যে তার কত ভালবাসত ভূতুদা' সেটা সেখানের ভূত-ছাড়ার আসরে গিয়ে নিজের চোখে না দেখলে নিজের কানে না শুনলে প্রমাণ পাবে না মায়া। যে কথা আজ শুনেছে কাকলি ভূতুদা'র মুখে তাতে তাকে ভূতগ্রস্থ বলা চলে না। পাগল নয় সে। কোন পেত্নি-পিশাচও ভর করেনি তাকে। আসলে সে তার দিদির শোকেই পাগল। সতী হারা শিবের মত শ্মশানে-মশানে যে ঘুরে বেড়ায় ভূতুদা তার একমাত্র কারণ তার দিদিকে হারিয়ে সে অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছে বলেই। এ ভূতুদ'াকে তার দিদির মৃত্যুর জন্য দায়ী করা ভুল, মস্ত অন্যায় তার।

কথাগুলো যে সত্য কাকলির এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কি করবে সে এখন? ভাবতে লাগল মায়া। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল বেলা ও কেয়া। এ পাড়ারই বান্ধবী তারা। গেছল তারা নাকি বাবা ভূতনাথের মন্দিরে। আজ সোমবার কিনা—তাই শিবের মাথায় জল দিতে। সেখানে নাকি দীপালীর মুখে ভূতছাড়াতে আসা সাধুবাবার সঙ্গে ভূতুদা'র গণ্ডগোলের কথা শোনে তারা। জল ঢেলে তাই ওই পথেই যায় তারা ভূতুদা'দের বাড়ী। যেয়ে দেখে ভূতুদা নেই। তর্কাতর্কিতে সে শ্মশান বাবাকে অপমান করায় বলরাম কাকু রেগে নাকি তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন।

—তাই নাকি? শুনে হঠাৎ চমকে উঠল কাকলি!

বলে উঠল কেয়া,—ভূতুদা নাকি বলে গেছে যতদিন না তার মা-বাবার মন থেকে এসব অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার দূর হবে ততদিন সে নাকি আর পা দেবে না এ বাড়ীতে।

সর্ব্বনাশ। কথাটা শুনে প্রমাদ গুণল কাকলি। সত্যি, ভূতুদা'র যা রাগ- না ফিরতেও পারে সে বাড়ী। তাহলে কি হবে?

বলে উঠল বেলা, — শ্মশান-বাবা তার মাকে নাকি অভয় দিয়ে বলেছেন কোন চিন্তা নেই তার। ছেলে তার যেখানেই যাক, যতদূরেই থাক মন্ত্রের শক্তি তাকে নাকি টেনে আনবেই। উতলা হবার কোন কারণ নেই তার। কারণ দেহবন্ধন মন্ত্রে নাকি সে বেঁধে দিয়েছে ভূতুদার গাটা। সুতরাং ভূত-পিশাচ অপদেবতা উপদেবতা কোন ক্ষতি করতে পারবে না তার। শ্মশান বাবা এখন নাকি ভূতুদা'র ঘরে তাঁর সাধনা করা সঙ্গের চণ্ডটাকে নামাতে বসেছেন। সেই চণ্ডটাই জেগে নাকি ধরে আনবে ভূতুদাকে।

—আচ্ছা মানুষ যা হোক কাকা-কাকীমা। বলে উঠল কাকলি, —অবার সেই তুক তাক! যেগুলো ভূতুদা' দুচোখে দেখতে পারেনি আবার সেগুলো করতে যাওয়া। ভূতে পাওয়ার মিথ্যে ধারনা নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তারা কি ভূতুদা'কে সত্যি পাগল করে ছাড়বে?

—ব্যাপারটা কদ্দূরে দাঁড়ায় চল না একবার সবাই গিয়ে দেখে আসি সেখানে। বলে উঠল কেয়া—দেখি না সাধুবাবার কেমন চণ্ড বা তার মন্ত্রশক্তির জোর। কেমন ভাবে ফিরিয়ে আনে ভূতুদা'কে দেখি গিয়ে চল না।

কথাটা অবশ্য মন্দ নয়। দেখাই যাক না মজাটা। কৌতূহলে সবাই পা বাড়াতে উদ্যত হল ভূতুদা'দের ঘরের দিকে। মায়া কিন্তু নড়ল না। এমনকি এতবড় একটা সংবাদের পরও তার একটু বিচলিত হবারও কোন লক্ষণ দেখা গেল না। দেখা গেল না মুখে তার ভূতুদা'র জন্য দুঃখিত হওয়ার এতটুকু কোন ছাপ বা কপালে একটু চিন্তার রেখা। দিব্যি নির্বিকার হয়ে বসে রইল সে। থাকুক মুখপুড়ি। এত বলা সত্ত্বেও ভূতুদাকে যদি সে

না বুঝে থাকে তবে থাকুক সে তার আপনার রাগটা নিয়ে ঘরের কোণে বসে। অভিমানটা নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে খাক সে। যতই হোক ভূতুদার এ বিপদের দিনে যেয়ে অন্ততঃ একবার খবরটা নেওয়া দরকার। কিন্তু কে পারবে বাপু জেদি ওই গোমড়া মুখো মেয়েটার সঙ্গে। তাই বেলা, কাকলি, কেয়া, মায়াকে রেখেই সবাই চলে গেল ভূতুদাদের বাড়ী।

ঘরের কোণে আপন মনে গম্ভীর হয়ে বসে রইল মায়া। রইল বসে কোণে রাখা হাঁড়ির মত নীরব-ভাবে নিঝুম হয়ে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল তার কেয়া বেলাদের সদ্যবলা কথাটা। আজ সোমবার। শিবের মাথায় জল ঢালার দিন। গেছল তারা বাবা ভূতনাথের মন্দিরে। তবে মায়াও কেন বাকী থাকবে বাবার মাথায় জল দিতে। উপোস দিয়ে তো আছেই সে। বেলা হল তো কি হবে? ঠাকুর পুকুরে ডুবটা দিয়ে মন্দিরে গিয়ে শিবের মাথায় জল দিয়ে আসতে কি দোষ। দিদির কথা যখন রাখব বলে সঙ্কল্পই করেছে মায়া তখন সেটা হোক না শুরু আজ থেকেই। স্বর্গ থেকে দেখে দিদি নিশ্চয়ই তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং উঠল মায়া। রান্নাঘর থেকে ঘটিটা নিয়ে চলল সে বাবার মন্দিরের দিকে।

ওধারে ভূতনাথ বেশ খরা মেজাজেই বেরিয়েছিল ঘর থেকে। বেরিয়েছিল বাপের উপর রাগ করে, মায়ের উপর অভিমান করে। এত বড় স্পর্ধা তাদের তাকে ছাপিয়ে চণ্ডীতলার সাধুবাবাকে আনা! ভূত নেই, প্রেত নেই খামকা তাকে ভূতগ্রস্থ ভেবে ওই উচ্চিংড়েসাধুটার তুকতাকের খোঁটায় পুরা! নিকুচি করেছে তাদের ভূতছাড়ার। তাকে গোপন করে এতদূর উঠেছে যখন তখন থাক তারা তাদের ওই অন্ধ কুসংস্কার আর যতসব বাজে আজগুবি ধারনা নিয়ে। ও ঘরে থাকা তো দূরের কথা, তাদের মুখ পর্য্যন্ত আর দেখবে না সে। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা তার। যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাবে সে।

চলেই যাচ্ছিল ভূতনাথ। গন-গনে রোদে হন-হন করে পাগুলো ফেলে যাচ্ছিল চলে সে বিদ্যুৎ গতিতে। পিছন ফিরে তাকাবার পর্য্যন্ত অবসর ছিল না তার। দৃষ্টি ছিল সামনের দিকে—ক্রোধোদীপ্ত উন্মত্ত। হঠাৎ গ্রামের শেষে বাবা ভূতনাথের মন্দিরের কাছে আসতেই যেন আটকে গেল তার পা দুটো। থমকে গেল দৃষ্টিটা তার দাওয়ার নীচে কুলির পাশে সেই সাদা পাথরটা দেখে। এটাই তো সেই পাথর যেটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার সতীর স্মৃতি। দেখতেই সেটাকে মনটা যেন কেমন হয়ে গেল ভূতনাথের। অতীতের সেই ঘটনা যেন ছবির মত ভাসতে লাগল সেই পাথরটার বুকে। মন্দিরটার দাওয়ার উপর সতীকে হঠাৎ মারধর করতে করতে ধাকলে তাকে ফেলে দিল তার সৎমা। নৈবিদ্যের থালাশুদ্ধো সতী আছড়ে পড়ল এই পাথরটার উপর দাঁড়িয়ে থাকা তার গায়ে। তারপর সে কি কেলেঙ্কারি। তার সৎমার সঙ্গে কথাকাটাকাটি বাগ-বিতণ্ডা ভূতনাথের। উত্তেজনার বশে সতীকে তার বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি। শুধু তাই নয় ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ তাঁর সিঁথিতে সিন্দুর ঘষে দেওয়া ইত্যাদি নানা কাণ্ড কারখানা ভাসতে লাগল সিনেমার পর্দ্দার মত তার চোখের সামনে।

চলার গতি বন্ধ হয়ে গেল ভূতনাথের। মনে এল বিচার। সতীর সঙ্গে স্বভাবের তার পার্থক্যের বিচার। আজ সামান্য একটা কারণে রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে ভূতনাথ। আর সতী। দিনরাত ঘরে আটকে থেকে সইতকত সৎমায়ের তার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। গাধার খাটুনি খেটে পেত শুধু তার কাছে লাথি-ঝাঁটা আর গালাগালি। মুখ বুজে সব সহ্য করত সতী। ভুলেও কারো কাছে কোনদিন অভিযোগ করত না সে। রাগকে কোনদিন দিত না প্রশ্রয়। কিন্তু সে তার স্বামী হয়ে চলছে আজ ক্রোধের বশে। রাগ করতে তাকে যে নিষেধ করত সতী।

মন্দিরটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল ভূতনাথ। তারপর কি হল যে তার মনে কে জানে—উঠল সে মন্দিরের দাওয়াটার উপর। নির্জন মন্দির। নিস্তব্ধ পরিবেশ। দীপ্ততেজে সূর্য্যিমামা যেন অগ্নিবৃষ্টি করে চলেছেন মুষলধারে। পূজো সেরে পুরোহিত মশায় চলে গেছেন বাড়ী। মনে হয় বেলা বাড়ার অনেক আগেই। দুপুর বেলায় ধূপসি রোদে পা পোড়াতে আর কেও আসবে না এধারে। এধার ওধার তাকিয়ে ভূতনাথ গেল মন্দিরটার পিছন দিকে। সেখানের দাওয়াটায় ভৈরবথানের জটলাকরা বেল-পাকুড় আর নিম আঁকড়ের গাছগুলো বেশ ছায়া ফেলে রেখেছিল ঘন করে। ঠাণ্ডাও ছিল জায়গাটা। সেই শীতল ছায়ায় দাওয়ার কোলে মন্দিরটার গায়ে হেলান দিয়ে বসল ভূতনাথ। ওমনি সুদূরের শালীনদীর বুক থেকে ফুরফুরে ঠান্ডা এক দমকা বাতাস পাশের চড়কতলার ডাঙ্গাটা পেরিয়ে যেন হাত বুলিয়ে দিতে এল তার গায়ে পিঠে। তার সঙ্গে ভেসে এল সেই

গাছ গাছালিগুলোর নীচে গাদা করা পোড়ামাটির হাতি ঘোড়াগুলোর উপর ভৈরববাবার পূজো করা বেল-টগর আর আকন্দ ফুলে সুঘ্রান। আঃ কি আরাম! শ্রান্ত-ক্লান্ত শরীরটা তার আপনা থেকে এলিয়ে পড়ল সেই মন্দির-দাওয়ায়। শুতেই নজরটা তার ভৈরবথানের গাছগুলোর গোড়ার ফাঁক দিয়ে চলে গেল চড়ক ডাঙ্গা পেরিয়ে সুদূরের সেই শালী নদীটার দিকে। বুকে তার শ্মশান। তারই চিক চিকে বালির উপর দেখা যাচ্ছে এধার ওধার দু চারটে চিতা। ওই চিতারই কোন একটা হয়ত পোড়া কাঠ-কয়লা আর ছাই নিয়ে ধরে আছে সতীর শেষ অস্তিত্ব। দেখতে দেখতে আবার ভাবনা জাগল ভূতনাথের মনে। সতী হঠাৎ আত্মহত্যা করল কেন? কি তার মৃত্যুর কারণ? কি করে মৃত্যু হল তার?

ধন্য যা হোক মানুষ ভূতনাথ। এত কাণ্ডের পরও তার সেই জেদ আর গেল না। সতীর মৃত্যুর কারণ তাকে জানতেই হবে। সৃষ্টিছাড়া গোঁ তার। কিন্তু জানবে কি করে? কে করে দেবে তার এই রহস্যের সন্ধান। পোড়া মাটির হাতীঘোড়াগুলির দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বলে উঠল ভূতনাথ,

—তোমরা তো দেবতা। সবজান্তা ভগবান। পার না কি তোমরা জানাতে আমায় কি করে মৃত্যু হল সতীর? ভক্তিভরে ডাকলে নাকি মনের আশা পূর্ণ কর সবার। কিন্তু হে অন্তর্যামী ভক্তি টক্তি নেই আমার। মানিও না আমি ঠাকুর দেবতা। ভগবান টগবানের কোন ধার ধারি না আমি। তবু না জানি কেন আজ সতীর মত মানতে তোমাদের ইচ্ছা জাগছে আমার। তার মতই তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী ও ভক্তিমান হতে চাইছে আমার মন। কি পারবে আমাকে সতীর মত বিশ্বাসী করতে? পারবে আমার মনে তার মত ভক্তি এনে দিতে? তাহলে আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমাকে। হে বাবা ভৈরব, তুমি যদি সত্য হও তবে জানাতে হবে তোমায়—সতী মরল কেন।

বোকা ভূতনাথ। জড় দেবতা কখনও কোন উত্তর দিতে পারে নাকি? পারে নাকি ওই মাটির হাতী-ঘোড়াগুলো তার কথা শুনতে? যতসব বাজে চিন্তা তার। আজগুবি ধারনা। সাধারণ মানুষ এসব নিয়ে মেতে থাকতে পারে। কিন্তু তার আবার এসব বাতিক উঠা কেন? সুতরাং আপন মনেই নদীটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল ভূতনাথ। করতে লাগল সে নানা স্মৃতির রোমন্থন। মাঝে-মধ্যে আসতে লাগল দু-এক ঝাঁক বাতাস। নদীর বাতাস। আওলি বাউলি গতিতে তার নড়ে উঠতে লাগল ভৈরবথানের গাছ-গাছালির ঝাঁকড়া মাথাগুলো। শন্‌শন্-ঝন-ঝন। যতদূর দেখা যায় ধূ-ধূ প্রান্তর, জনশূন্য মাঠ। তারই উপর দিয়ে পথ কেটে চলা শালী নদী। যাচ্ছে চলে সে কত মানুষের অস্তিত্ব তার চিতার বুকে মুছে দিয়ে।

নির্জনতার একটা আলাদা ধরনের স্বাদ আছে। আছে একটা আলাদা ধরনের আমেজ। ছায়া ছায়া কত ব্যথা কত স্মৃতি এনে দেয় সে মনে। আধো নিদ্রা, আধো জাগরণ অবস্থাতে সেগুলোরই অনুধ্যান করতে লাগল ভূতনাথ। কেমন যেন একটা ঘোর আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন করতে লাগল তাকে। আশপাশের সমস্ত পরিবেশটাই যেন যেতে লাগল পাল্টে। সামনের ভৈরব তলার হাতী-ঘোড়া, গাছ-গাছালি গুলো অদৃশ্য হতে লাগল আস্তে আস্তে। পরিবর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল তার সতীদের বাড়ীর উঠোন ও বেড়-বারান্দা। ঠিক টি.ভি পর্দ্দায় দেখা ছবির মত। হঠাৎ নজরে পড়ল তার একটা ঘরে ঘাটের উপর শুয়ে আছে সতী। একলা অসুস্থ সে। বিষাদ-ভরা চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে সে। যেন অপেক্ষা করে আছে কারো জন্য।

কেমন যেন এক আবেশ-ভরা ভাবে ভূতনাথ অবলোকন করতে লাগল সতীকে। এ তার স্বপ্ন না সত্যি বুঝতে পারল না সে। বুঝতে পারল না সে ঘুমন্ত না জাগ্রত; সে এক অদ্ভুত অবস্থা তার। অবশ্য এরূপ অবস্থা ক্বচিৎ কেমনও হয় কারো কারো। আসল কথা হল মানুষের জড় দেহটাই তো নয় তার সবকিছু। ভিতরে থাকে তার আসল সত্তা। যেটাকে অনেকেই আত্মিক দেহ, সূক্ষ্মসত্তা বা মনোশরীর বলে। প্রাতিভাসিক দেহের মধ্যে মানুষের এই দ্বিতীয় সত্তা থাকে সুপ্ত অবস্থায়। থাকে দেহ ও মনের আধারে গুপ্তভাবে। মাঝে-মধ্যে জৈব দেহাভ্যন্তরস্থিত এই স্বতন্ত্র সত্তা জাগরিত হয়। প্রকাশিত হয় বস্তু গ্রাহ্য নিয়মের বাইরে এক অদ্ভুত রহস্যময় অবস্থায়। বিশেষ কোন এক সমস্যার মুহূর্তে, কৌতূহলা বিষ্ট অবস্থায় বা বিশেষ কোন জিজ্ঞাসার উত্তর চিন্তায় মন যখন থাকে গভীর ভাবে মগ্ন। ডুব দেয় যখন মানুষ তার বিশেষ কোন জটিলতার নিরসন করতে আপন মনের গভীরে তখন কারো কখনও এই আত্মিক শক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। চিন্তার গভীরতায় মনের একনিষ্ঠতায়,

ভাবনার একাগ্রতায় আন্তরসত্তা তার জাগরিত হয়। জাগ্রতহয়ে উঠে তার প্রশ্নের উত্তর, সমস্যার সমাধান, ও কৌতূহলের নিরসন করতে। অদ্ভুতভাবে।

কখনও কেও পায় তার সমস্যার সমাধান স্বপ্নের মাধ্যমে। কখনও দেখে কেও তার জড়দেহ থেকে আর একটা দেহ নির্গত হয়ে করে দিল তার জটিলতার নিরসন। কারো কারো ক্ষেত্রে বিশেষ এক অবস্থায় চোখের সামনে ভেসে উঠে তার জিজ্ঞাসার উত্তর। জড় দেহটা শুধু উদাসীনভাবে লক্ষ্য করে তা তাকিয়ে থাকে অভিভূতের মত। বাস্তব-জ্ঞান বোধশক্তি নিয়েও থাকে সে জড়বৎ নিষ্ক্রিয় এক অদ্ভুত রকমের তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়। আসলে মানুষের এই বস্তুগ্রাহ্য দুনিয়ার বাইরে আলাদা এক রহস্যময় জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। এ সম্বন্ধ তার স্থান-কাল-মরণশীলতার অনেক উর্দ্ধে। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান তার সে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার এই আত্মিক শক্তির দ্বারা সে অপরের মনের গোপন রহস্য সব উদ্‌ঘাটন করতে পারে। জানতে পারে সে সকলের মনের গোপন খবর।

আসলে কিন্তু সবাই আমরা এক অখণ্ড সত্তায় যুক্ত। যুক্ত আমাদের ব্যক্তিমন সমষ্টি মনের সঙ্গে। বাইরে আমরা ভিন্ন হলেও বিশেষ এক অবস্থায় আমরা কিন্তু এক। জগৎ জীবনের কারো কোন ঘটনা, চিত্ত কর্ম বা ভাবনা নিঃশেষে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। বিশ্বমনের স্মৃতিকোটায় তা কিন্তু থাকে সংরক্ষিত হয়ে। চিন্তার গভীরে ব্যক্তি-মন কখনও কখনও সমষ্টি মনের সঙ্গে যুক্ত হয়। তখন যে যার অগোচরে যাই করে থাকুকনা কেন। করে থাকুক না কেন যে যার অলক্ষে যে কোন কাজ। তা কিন্তু তখন আর অজানা থাকে না তার। এমন কি তখন সে যে কোন ব্যক্তির অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানের মতই স্পষ্ট দেখতে পায় তার চোখের সামনে।

সেই অবস্থাই বোধ হয় তখন হল ভূতনাথের। সতীর মৃত্যুর কারণ-ভাবনায় এমনভাবে মগ্ন ছিল সে যে তার চিন্তার একাগ্রতা ও মনের একনিষ্ঠতা তাকে যুক্ত করে দিল বিশ্বমনের সঙ্গে। সেই মুহূর্তে তাই চোখের সামনে ভেসে উঠল তার আকাঙ্খিত সতীর মৃত্যুর দৃশ্য। দেখতে পেল সে খোলা দরজায় হঠাৎ সতীর ঘরে ঢুকল মায়া। হাতে তার বাবা ভূতনাথের পূজো করা নৈবিদ্য-মনুই। এত ব্যস্ত সে যে বাবার প্রসাদটা দিদিকে তার আর খাওইয়ে দেওয়ার অবসর হল না। পিছনে আসা মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সেটা দিদিকে খেতে দিতে বলে চলে গেল সে চট্‌জলদি স্কুলে। সতীর সংমা হাতে নিয়ে সেটা কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ।

তারপর চলে গেল অন্যঘরে। সে ঘরে গিয়ে সে সেই মনুই প্রসাদটার সঙ্গে মেশাল বিষ। হায় ভগবান! সেই বিষ মেশান মনুই প্রসাদ সে খেতে দিল সতীকে। নিষেধ করার জন্য ছটফট করতে লাগল ভূতনাথ। কিন্তু কোথায় সে? সব কিছুই দেখছে, শুনছে, বুঝছে—কিন্তু অদৃশ্যনিরাকার সে। সত্তা তার ছড়িয়ে আছে যেন সর্বত্র কিন্তু সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন সে। আশ্চর্য্য!

ভক্তিমতী সতী। এ-যে তার ভূতুদার মঙ্গল কামনায় পূজো করা নৈবদ্য। তাই পরম আগ্রহে, নিষ্ঠাভরে, ভক্তি-নম্রভাবে বাবা ভূতনাথকে স্মরণ করে খেতে আরম্ভ করল সেটা। খাসনে সতী। বিষ-বিষ ওটা। ফেলে দে, ছুঁড়ে দে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ভূতনাথের চিৎকার চেঁচামেচি, ডাকা-হাঁকা, নিষেধ-মানা কোন কিছুই গেল না তার কানে। বাবার প্রসাদ—তাই বিশ্রী বদ-ঘ্রাণ, তিঁতা—কষা কোন কিছুকে তোয়াক্কা না করে সতী খেতে লাগল সেটা নিষ্ঠাভরে। শেষ দানা টুকু পর্য্যন্ত নষ্ট করল না সে। চেটে-পুটে পরিষ্কার করে দিল সে পাত্রটা। ভূতনাথের শুধু ছটফটানিই সার হল। করতে পারল না কিছু।

কিন্তু তারপর? বিষ শুরু করল তার বিষক্রিয়া। কাতরাতে লাগল সতী। ছটফট করতে লাগল বিছানার উপর। অস্থির হয়ে ডাকতে লাগল সে মা, বাবা, মায়াকে। কিন্তু কোথায় তার সংমা? সে গেছে পুকুরঘাট। বাবা কোথায় তার? তিনি দিব্যি মাঝ-পাড়ার মেলায় অন্যান্য মাতব্বরদের সঙ্গে আড্ডা জমাচ্ছেন। আর মায়া? ইস্কুলে তার জোরদার চলেছে ফাংশন। কবিতা আবৃত্তি করছে সে। হায় ভগবান। কারো পৌষমাস কারো সব্বনাশ!

অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙ্গাতে শুরু করল সতী। মুখ দিয়ে তার উঠতে লাগল গাঞ্জলা। নাকদিয়ে তার গড়াতে লাগল ফেনা। চোখ দুটো ক্রমশঃ ঘোলাটে হয়ে আসতে লাগল সতীর। কণ্ঠটাও হয়ে আসতে লাগল ক্ষীণ।

জীবনের পাট তার হয়ে আসতে লাগল শেষ। মৃত্যু এসে টানতে লাগল তাকে। বোধহয় সেটা বুঝতে পারল সতী। তাই অস্ফুট স্বরে মুখ দিয়ে তার বেরুতে লাগল কাতর প্রার্থনা, —হে বাবা মহেশ্বর, ভূতুদা'কে আমার রক্ষা কর বাবা। কল্যাণ কর আমার স্বামীর। আমি আর কিচ্ছু চাই না বাবা তোমার কাছে। তুমি আমার স্বামীর সমস্ত অকল্যাণ, অমঙ্গল দূর কর কৃপাময়। হে পরমেশ্বর, ভূতুদা'র ইহজীবনের পাপ, পরজীবনের পাপ, জ্ঞানের পাপ, অজ্ঞানের পাপ সব আমি গ্রহণ করলাম প্রভু। নিলাম আমি তার জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত অন্যায় অপরাধ। এসবের তার সমস্ত সাজা-শাস্তি-দণ্ড-জ্বালা আমাকে দাও প্রভু। দাও আমাকে তার সমস্ত দুষ্কর্ম কুকর্মের ফল। তবু তার জীবনকে রক্ষা কর তুমি। রক্ষা কর তাকে সমস্ত বিপদ-আপদের হাত থেকে। হে বাবা ভূতনাথ, স্বামীকে আমার, তোমার চরণে রেখে গেলাম প্রভু। তুমি তাকে সুখে রাখ দয়াময়, শান্তিতে রাখ কৃপাময়। হে বাবা মহে-শ্ব-র ম-হা-দে-ব—

কণ্ঠটা সতীর আস্তে আস্তে হয়ে আসতে লাগল রুদ্ধ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো হয়ে আসতে লাগল নিশ্চল নিথর। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগল সে ক্রমশঃ। আর থাকতে পারল না ভূতনাথ। সমস্ত সত্ত্বাকে যেন এক করে সে চিৎকার করে উঠল—না-না-না। আমি সুখ চাই না সতী। চাই না আনন্দ। চাই না জীবনে শান্তি। আমি তোকে চাই সতী। সমস্ত কিছুর বিনিময়ে একমাত্র চাই তোকে। শুধু তোকে। তুই আমাকে একলা ফেলে যাসনে সতী। যাসনে তুই এভাবে আমাকে একলা রেখে জীবনে। সতী-কথা শোন আমার। সতী, সতী-সতী—

মন্দিরের ভিতরে শিবের মাথায় জল ঢালছিল মায়া। হঠাৎ সতী-সতী ডাকটা শুনতেই চমকে উঠল সে। এসেছিল সে একা। চুপিসাড়ে। দেখেছিল মন্দির নির্জন। ভর্তি দুপুর বেলায় এধারে যে কেও আসতে পারে বা থাকতে পারে এখানে কল্পনাও করে নি সে। কিন্তু একি ! এ যে মানুষের গলা! ভূতদা'র কণ্ঠস্বর। আসছে মন্দিরটার পিছন দিক থেকে। জল ঢালতে ঢালতে হঠাৎ থমকে গেল মায়া। তাহলে কি ভূতুদা ঘরের উপর রাগ করে এসে মন্দিরের পিছনটায় আছে লুকিয়ে!

ওমনি জল ঢালা বন্ধ করে মন্দির থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল মায়া। স্বরটাকে অনুসরণ করে মন্দিরের পিছনে যেতেই দেখল সে-যা অনুমান করেছিল সত্যি। দাওয়ায় পড়ে যেন কাতড়াচ্ছে ভূতুদা। ঘুমন্ত অবস্থায় যেন হাতড়াচ্ছে কাকে। আর মুখ থেকে তার একটানা বেরিয়ে চলেছে —তুই যাসনে সতী, আমাকে ছেড়ে যাসনে তুই। সতী—সতী—

অবস্থা দেখে মনটা মায়ার হো হো করে উঠল। সমস্ত অন্তরটা তার উঠল যেন মোচড় দিয়ে। একি দশা হয়েছে তার ভূতুদা'র! খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ময়লা পেন্ট। অপরিষ্কার জামা। রুক্ষ শুষ্ক চেহারা! ক্ষীণকণ্ঠে চিৎকার করে চলেছে সে 'সতী-সতী' বলে। চোখের জলকে আর বাধা দিতে পারল না মায়া। পারল না সে আর নিজেকে কোনমতেই সংযত করে রাখতে। কাটা গাছটার মত আছড়ে পড়ল সে ভূতুদা'র পা-দুটোর উপর। মাথাটা ঘসড়াতে ঘসড়াতে বলতে লাগল সে কান্না ভরা গলায়, —এভাবে তুমি কেঁদো না ভূতুদা। দিদির জন্য এভাবে আর নষ্ট কোরো না নিজেকে। উঠ তুমি, বলতে লাগল সে পা-দুটোতে তার নাড়া দিতে দিতে,—উঠ তুমি ভূতুদা' ভূতুদা, —ভূতুদা'গো—

ঘোরের মধ্যেই বোধহয় উঠল ভূতু। চোখ জড়ানো অবস্থায় হাতের মধ্যে পেয়েই মায়াকে জাপটে ধরল সে। বলতে লাগল উদ্বেগ-আকুল কণ্ঠে—তোকে আমি মরতে দেব না সতী। মরিস না তুই। বেঁচে থাক তুই আমার কাছে। আমি তোকে বাঁচিয়ে রাখব। যাসনে তুই আমাকে ফেলে। বল না সতী, বল না তুই—কিছুতেই ছেড়ে যাবি না আমাকে। বল, বল সতী—, সতী—

বেশ মুস্কিলে পড়ল মায়া। একদিকে লজ্জা অপর দিকে অন্য কেও দেখা ফেলার ভয় চঞ্চল করে তুলল তাকে। নিজেকে তার বাহুপাশ থেকে ছাড়াতে ছাড়াতে ও ঘোরটা তার কাটাবার জন্য ঝাঁকরানি দিতে দিতে বলতে লাগল তাকে,—স্বপ্ন দেখছো না কি ভূতুদা? ভাঙ্গাও ঘুমটা। ঘুমটা ভাঙ্গাও তুমি। চেয়ে দেখ। আমি সতী নই। মায়া। আমি মায়া ভূতুদা। ভূতুদা, আমি মায়া।

ঝটকানিতে তার ঘোর কাটতেই চমকে উঠল ভূতনাথ। 'মায়া' শব্দটা কানে আসতেই ওমনি ঝট করে দিল সে তাকে ছেড়ে। তাকাতে লাগল তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে। চোখে-মুখে তার সে এক দারুণ বিস্ময়ের ছাপ। বলে উঠল মায়া, —মা-বাবার উপর রাগ করে এখানে এসেছো বুঝি? লুকিয়ে আছো মন্দিরের আড়ালে?

নির্বাক ভূতনাথ। চোখে তার সেই অবাক হওয়া দৃষ্টি।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলে? স্বপ্ন দেখছিলে দিদিকে?

বোবা চোখের চাওনি ছাড়া কোন উত্তর নেই ভূতনাথের মুখে। কান্নাচাপা গলায় বলে উঠল মায়া,—এত ভালবাসতে তুমি দিদিকে? দিদির প্রতি ছিল তোমার এত গভীর প্রেম? আমি বুঝতে পারিনি ভূতুদা। জানতে পারিনি তোমার এই প্রেমিক-হৃদয়টাকে। আমাকে ক্ষমা কর ভূতুদা। মার্জনা কর আমাকে।

ভূতুদা'র মুখে কথা ফুটল। অবাক চোখেই বিস্ময়ের স্বরে বলে উঠল সে.---সত্যি বলছিস তুহ—সতী নস? মায়া, মায়া তুই?

—হ্যাঁ ভূতুদা। আবেগ-জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল মায়া,—আমি তোমার সতী নই। মায়া আমি। কৃতাপরাধা মায়া, না বুঝে মহাঅন্যায় করেছি তোমার উপর। কষ্ট দিয়েছি তোমার মনে। রাগ করে তাড়িয়ে দিয়েছি তোমাকে ঘর থেকে। আমার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই ভূতুদা। দয়া করে এবারের মত মাফ করে দাও তুমি। আর কখ্খনও আমার এ ভুল হবে না।

কি যে এক ভাবমগ্নতায় ভূতনাথ তাকিয়ে রইল তার দিকে কে জানে। এধারে তার উত্তর না পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল মায়া,

—তোমার দয়া না পেলে কিন্তু আত্মহত্যা করব আমি। তুমি বিশ্বাস কর ভূতুদা' বিনা দোষে তোমার প্রাণে আঘাত দেবার পর থেকে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছি আমি। জ্বলে পুড়ে মরছি দিনরাত অনুতাপের আগুনে। কতবার ছটফট করেছে আমার অন্তর তোমার কাছে ছুটে যাবার জন্য। কিন্তু এ পোড়া মুখটা তোমাদের বাড়ীতে যেয়ে দেখাবার সাহস পাই নি। ভরসা পাই নি আমি ছুটে গিয়ে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বার। বাবা ভূতনাথের কৃপায় আজ আমি পেয়েছি তোমাকে একান্তে, নির্জনে। সুতরাং তোমার এ পা-জোড়া কিছুতেই আমি আর ছাড়ব না। বল তুমি, তোমার এ অপরাধিনী মায়াকে ক্ষমা তুমি করবে কি না?

এত কথা, এত কাকুতি-মিনতি, উপরোধ-অনুরোধ কিছুই বোধ হয় গেল না ভূতনাথের কানে। ভ্যাবা—গঙ্গারামের মত তাকিয়ে রইল সে মায়ার দিকে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বলে উঠল সে ভাবাবিষ্টের মত,—তুই যদি সতী নস তবে এখানে কেন? তাহলে আমি এতক্ষণ দেখলাম কাকে? কি দেখলাম? কেন দেখলাম?

—কি দেখলে তুমি? জিজ্ঞেস করে উঠল মায়া।

—দেখলাম, বলে উঠল ভূতনাথ, ---বাবা ভূতনাথের পূজো করা মনুই প্রসাদ তুই তোর মায়ের হাতে দিয়ে চলে গেলি স্কুলে। আর মা তোর সেই মনুই প্রসাদের সঙ্গে গোপনে বিষ মিশিয়ে খেতে দিল তোর দিদিকে। সেই বিষ খেয়ে দিদি তোর—

—একি বলছো তুমি ভূতুদা? অবাক-বিস্ময়ে বলে উঠল মায়া।

—আমি ঠিকই বলছি। গর্জে উঠল ভূতনাথ।—সেই বিষ মেশান মনুই প্রসাদ খেয়ে দিদি তোর ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মারা গেল। মুখে তার জল দেবার পর্য্যন্ত ঘরে তোদের কেও ছিল না। তুই চলে গেছলি ইস্কুলের ফাংশনে কবিতা আবৃত্তি করতে। বাবা তোর আড্ডা জমাচ্ছিল মাঝপাড়ার মেলায়। আর মা তোর---বিষ দিয়ে সতীকে দিব্যি পুকুরঘাটে গিয়ে স্নান করার অছিলায় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল তার।

একি বলছে তার ভূতুদা! মাথাটা হঠাৎ যেন ঘুরে গেল মায়ার। কিন্তু ভূতুদা তার তো মিথ্যা বলেনি। স্মরণ করতেই মায়া সেদিনের ঘটনাটা স্পষ্টভাবে মনে উদয় হল তার। সেদিনটাও ছিল আজকের মতই সোমবার। তবে সংক্রান্তি পড়ায় সেদিন বাবার বিশেষ পূজো নৈবেদ্য ছিল মনুইভোগ। অসুস্থ ছিল দিদি। তাই তার ভূতুদার মঙ্গলের জন্য কৌলিক করা শিব পূজাটা তার বদলে তাকে করাতে পাঠিয়েছিল এই মন্দিরে। কিন্তু মনুই প্রসাদের জন্য একটু দেরী হয়ে গেছল তার। তাই বাড়ীতে এসে মনুই-প্রসাদ দিদিকে খাওইয়ে দেবার অবসর হয়নি মায়ার। তাড়াতাড়ি মায়ের হাতে দিয়ে সেটা চলে গেছল সে স্কুলে। কারণ সেদিন স্কুলে ছিল তার সত্যিই একটা ফাংশন। সে ফাংশনে রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি আবৃত্তি করার জন্য ভালভাবে রপ্ত করেছিল সে। কিন্তু যাক গে সেসব কথা। মা দিদিকে মনুই-এর সঙ্গে বিষ দিয়ে......

হঠাৎ হাতদুটো মায়ার জড়িয়ে ধরলো ভূতনাথ। বলে উঠল সে অনুযোগের স্বরে—কিন্তু সতী তোদের কি

দোষ করেছিল বলতে পারিস? সে তো তার মায়ের গহনা, জমি-জমা কিচ্ছু তোর মায়ের কাছে চায় নি। সে-সম্বন্ধে চাওয়ার যদি কিছু অপরাধ হয়েছিল তবে সে দোষ ছিল আমার। সতীর নয়। তোর মায়ের সঙ্গে ঝগড়ার মুখে আমিই সেদিন চেয়ে বসেছিলাম তার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত কিছু। সে দোষে তো তোর মা বিষ খাওইয়ে আমকে মারতে পারতো। নিরপরাধিনী সতীকে কেন বিষ খাইয়ে মারতে গেল সে?

কানদুটোতে ওমনি হাত চাপা দিয়ে মাথা ঝাঁকরে বলে উঠল মায়া,—না না ও কথা তুমি বলো না ভূতুদা। বলে উঠল সে কান্না-জড়ানো গলায়—মৃত্যুর কথা বলো না তুমি, দোহাই তোমার! তোমার কোন অমঙ্গলের কথা জীবন থাকতে যেন আমাকে শুনতে না হয়। তার আগে মৃত্যু হয় যেন আমার।

—শোন মায়া!, গম্ভীর ভাবে বলে উঠল ভূতনাথ—সতীর মৃত্যুর জন্য তোর মা দায়ী। আত্মহত্যা করেনি সতী, বিষ খাওইয়ে তোর মা-ই তাকে মেরে তার নামে আত্মহত্যার অপবাদ রটিয়েছে।

—জানি না ভূতুদা এসব কথা সত্য কিনা। বলে উঠল মায়া,—তবে আমার সম্বন্ধে সেদিনের ঘটনা যা বললে তুমি তা কিন্তু সত্য। সত্যি আমি সেদিন শিবপূজা করাতে গেছলাম মন্দিরে। বাবার মনুই প্রসাদ মায়ের হাতে দিয়ে দিদিকে খেতে দিতে বলে তাড়াতাড়ি চলে গেছলাম স্কুলের ফাংশনে। কিন্তু মা দিদিকে মারতে গেল মনুই-এর সঙ্গে বিষ মিশিয়ে।

গর্জে উঠল ভূতনাথ—আমার দেখা স্বপ্ন কখনো মিথ্যা হয় না' মায়া। কিন্তু জানিস তো তুই ভূতনাথ কোনদিন কারো অন্যায় সহ্য করেনা আর করবেও না। এ ভূতনাথ পাগল নয়, নয় কোন ভূত-প্রেতনীর ভর করা ব্যক্তি। আমি যে ভূতনাথ সেই ভূতনাথই আছি। আছি আমার সেই দুর্মুখো স্বভাব নিয়ে। সুতরাং তোর মা-ই হোক আর বাবাই হোক আমার হাত থেকে রেহাই প্যাবে না কেও-ই। মিথ্যাকে আমি কোন দিন সত্যের মুখোশ পরে থাকতে দেব না। এর প্রতিশোধ আমি নেবই নেব।

—দোহাই ভূতুদা, উত্তেজিত হয়ো না তুমি। ভূতুদা'র পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বলে উঠল মায়া,—বাবা ভূতনাথের থানে তোমার পায়ে হাত দিয়ে এই আমি শপথ করছি একথা যদি তোমার সত্য হয় তবে এর প্রতিশোধ নেব আমিই। তোমার মায়াকে একবার তুমি বিশ্বাস করে দেখ ভূতুদা। দাও তোমার এ কাজের ভার আমাকে। দেখ তোমার মায়া তোমার হয়ে প্রতিশোধ নিতে পারে কি না।

কি ভাবল ভূতনাথ কে জানে। তাকিয়ে মায়ার মুখটার দিকে রইল সে গম্ভীরভাবে। হাতদুটো ভূতুদার জড়িয়ে ধরে মায়া বলতে লাগল তাকে অনুরোধ করে—শুধু একটা কথা আমার রাখতে হবে ভূতুদা। কিছুদিন আমাকে সময় দিতে হবে তোমায়। দেখতে হবে যাচাই করে স্বপ্নটা তোমার সত্য কিনা। তা বলে যে আমি তোমায় অবিশ্বাস করছি একথাটা কিন্তু ভেবোনা ভূতুদা। মায়ের মুখ দিয়েই তোমার এই বলা কথাটার সত্যতা প্রমাণ করতে চাই অমি। তুমি শুধু দিনকতক ধৈর্য্য ধরে থাক ভূতুদা। শান্ত থাক কিছুদিন। কি? রাখবে তো আমার কথা?

নির্বাক ভূতনাথ। অপলক তার দৃষ্টি। তাকিয়ে আছে সে সুদূরের সেই শালী নদীর শ্মশান ঘাটটার দিকে। স্থির-নিশ্চল, যেন সে একটা পাষাণ-মূর্ত্তি। কি যে দেখছে সেখানে কে জানে। নাড়া দিয়ে তাকে বলে উঠল মায়া, —শোন ভূতুদা, উত্তেজনার মুখে তোমাকে প্রতিশোধ নিতে দিয়ে জীবনটাকে আমি তোমার কলঙ্কিত হতে আর দেব না। কথা দিচ্ছি তোমাকে—তোমার এ রহস্যের উদ্‌ঘাটন আমি করবই। করবই আমি দিদির মৃত্যুর আসল সত্যের সন্ধান। নিশ্চিন্ত থাক তুমি। যেদিন প্রমাণ পাব সেদিনেই এসে সব কথা আমি জানিয়ে যাব তোমাকে। তারপর দেখবে তুমি কি ভীষণ, কি চরম প্রতিশোধ নিতে পারে মায়া তোমার বদলে। ততদিন পর্য্যন্ত তোমাকে আমার দিব্য রইল ভূতুদা কোন হটকারিতা করবে না তুমি। করবে না তুমি এমন কোন কাজ যাতে কোন আঁচড় লাগে তোমার চরিত্রে। কি? কথা আমার রাখবে তো ভূতুদা? থাকবে তো কিছুদিন শান্ত হয়ে?

কি উত্তর দিত ভূতনাথ কে জানে। হঠাৎ মন্টু-নেপাল হাবলু-গোপাল মন্দিরের দুপাশ দিয়ে দুটো দল নিয়ে হাজির হল তাদের সামনে। যাচ্ছিল তারা ভূতনাথের খোঁজেই সামনের শালীনদীর ওই শ্মশান-ঘাটে। কারণ, জানত নেপাল নদীর ওই বটতলার শ্মশান-ঘাটে নিরিবিলি বসে থাকা ভূতনাথের একটা বাতিকে পরিণত

হয়েছিল। গাঁয়ের মেলা-মণ্ডপ, ক্লাব লাইব্রেরীতে থাকুক বা না থাকুক সে নদীর ঘাটের সতীর চিতাটার কাছে থাকবেই থাকবে। সেই অনুমানেই দলবল নিয়ে যাচ্ছিল তারা। হঠাৎ মন্দিরের গোড়ায় আসতেই ভূতনাথের কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিয়েছিল তাদের গতি। পাছে দেখে তাদের ছুটে পালায় ভূতনাথ তাই কৌশল করে সাঁড়াশী আক্রমণের মত তারা দু-দলে বিভক্ত হয়ে দুপাশ দিয়ে ঘিরে হাজির হল তার কাছে।

কিন্তু একি! ভূতনাথের পাশে মায়া। মায়ার পাশে ভূতনাথ। দেখে দস্তুর মত তাজ্জব বনে গেল তারা। যে মায়া তাকে দুদিন আগে ঘর থেকে কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। যে মায়া তাকে নিন্দা, অপমান, ঘৃণা ছাড়া আর কিছু করে নি— সে মায়াকে নিয়ে গোপনে বসে আছে সে এখানে! রাগ দেখিয়ে ঘরে, ভর্ত্তি দুপুরবেলায় নির্জন মন্দিরে করতে এসেছে প্রেমালাপ! সত্য সেলুকাশ, কি বিচিত্র এই দেশ!

বিচিত্র এই দেশ নয়, বিচিত্র মানুষের মন। এ মন যখন প্রেমে মজে তখন রাগ-অপমান নিন্দা ঘৃণা সব গলার মালায় পরিণত হয়। কিন্তু বাবা এত ঢঙ কেন? ভূতে পাওয়া, ধাষ্টামু করে শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ানো, বিবাগী হয়ে থাকা। বেচারী বুড়ো মা-বাবা কি মুস্কিলেই না পড়েছে দেখে শুনে। ওঝা ডাকা, গুণিন আনা, কোথায় চণ্ডীতলার শ্মশান বাবাকে হাজির করা—একি কম হয়রানি তাদের। কেন রে বাবা সরাসরি তো বলে দিলেই হল। রাখহরি চাটুজ্জের কোম্পানী তো হাতেই। বিয়ে করে বুক করলেই হল। এত ভড়ং কেন?

ভূতনাথ ভ্যাবলাকান্তের মত তাকিয়ে থাকলে কি হবে হঠাৎ এ অবস্থায় দেখে তাদের মায়া বোধহয় প্রথমটার হকচকিয়ে গেছল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসেছিল সে নীচু দিকে মাথাটা করে। মনে হয় লজ্জায়। হঠাৎ তাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল মন্টু—মায়া, তুই এখানে?

—শিবের মাথায় জল দিতে এসেছিলাম?

—এই ভর্ত্তি দুপুরবেলায় একলা? হঠাৎ মন্টুর কথার সঙ্গে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল হাবলুর—বাবা তো মন্দিরের ভিতরে, গম্ভীরে। এখান থেকে জল ঢাললে শিবের মাথায় ঠিক পড়বে তো?

—কি বলতে চাও তোমরা? গর্জে উঠল মায়া। বাবা! খরিশ সাপের ডেকা। এ মালটিকে চেনে সবাই। জলে আগুন জ্বালা মেয়ে।। কি করতে কি করবে সে কে জানে। তাই প্রসঙ্গটা পাল্টিয়ে বলে উঠল নেপাল— তুই কেমন মানুষ বলতো ভূতনাথ। আমরা তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলাম। মা-বাবা তোর এ-ওর বাড়ী সন্ধান নিতে নিতে হদ্দ হয়ে গেল আর তুই এখানে দিব্যি বসে আছিস? চল বাড়ী চল। মা-বাবা তোর কাঁদছেন, খায় নি কিছু।

—মরুক ওরা, গম্ভীর হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ, —ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া। আমাকে না জানিয়ে কোথাকার এক উচ্চিংড়ে, উদ্ভট, ধড়িবাজ-ধাপ্পাবাজ চণ্ডীতলার শ্মশান-বাবাকে ঘরে আনা। ভেবেছে কি ওরা? আমি পাগল? ভূতে পেয়েছে আমাকে?

যেন ফুঁসতে লাগল ভূতনাথ। চোখ দিয়ে তার বেরুতে লাগল আগুন। এ আগুন নেভাবার তাদের বন্ধুবান্ধবদের কোন সাধ্য ছিল না। সাধ্য ছিল না কারো তার এ মেজাজ ঠান্ডা করবার। কিন্তু কি মোহিনী জানত যে মায়া কে জানে। সবার সমক্ষে হাত ধরে তার বলে উঠল সে শান্ত স্বরে,—ছিঃ ভূতুদা। মা-বাবার উপর রাগ করতে নেই। ছেলে মানুষী কোরো না আর উঠ। কে বলে তুমি ভূতগ্রস্থ? কে বলে তুমি পাগল? চল, আমি যাব তোমার মা-বাবার কাছে। তোমার হয়ে যা বলার আমি বলব তাঁদের। সমস্ত দিন কিছু পেটে পড়েনি তোমার। মা বাবাও আছেন উপোস দিয়ে। এভাবে আর কষ্ট দিওনা ভূতুদা চল আমার সঙ্গে।

কথাগুলো যে কি কাজ করল ভূতনাথের মনে কে জানে। মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠল সে। মায়ার ধরা হাতটার বশে চলতেও লাগল সে তার পিছু পিছু। বাঁধা কাঁকড়ি ছেলের বশে যায় যেমন গুটুগুটু, ভূতনাথও তেমনি লাগল যেতে সুটুসুটু। কোথায় গেল তার গোঁয়ার্তুমি আর কোথায় গেল তার মা-বাবার মুখ না দেখার ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা। মন্টু-নেপাল হাবলু-গোপাল গরুর পালের মত চলতে লাগল তাদের অনুসরণ করে। সত্যি তারা হতভম্ব। সত্যি তার বিস্মিত! ভূতনাথের মত একজেদী ছেলের জেদটা যে হঠাৎ এমন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি তারা। মায়ার মায়া সত্যিই আশ্চর্য্যের। সত্যিই অদ্ভুত এই লীলাময়ীর লীলা।

ছিছিঃ—কি কেচ্ছা!

বন্ধুমহল পর্য্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেল ভূতনাথের কাণ্ড দেখে। তাহলে আসল পাগল নয় ভূতনাথ—প্রেমপাগল। ওসব ভূত-পেত্নী কিচ্ছু ভর করেনি তাকে। পেয়ে বসেছে তাকে মায়ার ভালবাসা। এতদিনে সতীর মৃত্যুর আসল রহস্যের সন্ধান পেল তারা। ইতিপূর্বে ঠারে-ঠোরে মায়ার সঙ্গে ভূতনাথের ভাব-ভালবাসার ইঙ্গিত পেয়েছিল তারা। পেয়েছিল ক্লাবে, অনুষ্ঠানে, ময়দানে। সে ভাবটাকে লোক চক্ষুর ভয়ে জমাতে পারেনি বলেই মনে হয় হঠ্ করে ভূতনাথের তার দিদিকে বিয়ে করা। আসলে, সতীর জন্য সতীকে বিয়ে করা নয় ভূতনাথের। বিয়ে করা তাকে মায়ার জন্যই। সতীর সার্টিফিকেটে মায়াকে ভোগ করার ওটা একটা অপূর্ব কৌশল ছিল তার।

কিন্তু যতই হোক মেয়ে মানুষের মন। সেই কথায় বলে না—যমকে দিতে পারি তবু পরকে দিতে নারি। মায়ার সঙ্গে ভূতনাথের এই পিরীতটা বোধ হয় সহ্য করতে পারেনি সতী। সতী সৎ মেয়ে। চুপিসাড়ে তাই সব সহ্য করে স্বামীকে যমের হাতে না দিয়ে নিজেই চলে গেল যমের ঘরে। আত্মহত্যা করে। বানচাল হয়ে গেল ভূতনাথের মায়াকে ভোগ করার ফন্দি-ফিকির। কিন্তু পিরীতি কাঁঠালের আঁঠা লাগলে পরে ছাড়ে না। এখন উপায়। সেই উপায় ঠাওরাতেই সতীর শোক জানানোর অছিলায় ভূতনাথ গেছল সেদিন শ্বশুর বাড়ী, মায়ার কাছে। কিন্তু প্রেম জমাতে গিয়ে দেখাদেখি হওয়ায় বোধ হয় মস্ত ফাঁপরে পড়েছিল তারা। মায়া বুদ্ধিমতী। তাই লোকচক্ষে ভূতনাথের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল ঘর থেকে। আসলে ওটা মায়ার অভিনয়। সত্যি নয় যে ওটা ভূতনাথও বুঝেছিল ভালভাবে।

বুঝেছিল বলেই আজ কৌশল অবলম্বন করেছিল অন্যভাবে। ভূতছাড়ানোর মাতনে গ্রামের লোককে সব মাতিয়ে রেখে রাগ দেখিয়ে চলে এসেছিল সে মন্দিরে। প্রেমিক-প্রেমিকার ইসারা, বুঝতে নারে চাষারা। কিন্তু সাধারণ লোক না বুঝলেও মায়া ঠিক বুঝেছিল। তা না হলে যে কোন দিন ঠাকুর দেবতার পাশ ঠেসে না, ধম্ম-কম্মের ধার ধারে না সে নাকি ভর্ত্তি দুপুর বেলায় মাথায় জল ঢালতে আসে গ্রাম ছেড়ে এই মন্দিরে। নির্জনে, একলা। ফন্দি বটে যা হোক। কথায় বসে—এঁড়ে বকনার ভাব থাকলে বনে গিয়ে গা চাটায়। কিন্তু গাঁয়ের ভৈরবতলাটা তো বৃন্দাবন নয় আর শিব মন্দিরের আড়ালটাও লুকিয়ে ওমনি রাসলীলা করবার জায়গা নয়। ফষ্টি-নষ্টি করে ধর্ম্মস্থান অপবিত্র করলে সহ্য করবে না তারা। ক্ষেপে উঠল মন্টু-হাবলু, গোপ্‌লা-নেপলার দল। মায়ার কথার দাপট আর ক্যাটমেটে ওই দেমাক ভরা চাওনি মন্দিরে তাদের হঠাৎ ওমনি থমকিয়ে দিলেও কিন্তু লেজ গুটিয়ে বসে থাকল না তারা। যতই ভূতনাথ হোক না ধূরন্ধর আর মায়াও হোক না যত বড় কাল-কেওটে। ফের যদি তাদের এমনি কোথাও গুজুর-ফুসুর বা অপকম্ম করতে দেখে তারা তবে সেদিন কিন্তু আর ছেড়ে দেবে না। মন্দিরে কুকীর্ত্তির ঝালটা ঝাড়বে তারা। বেঁধে এনে তাদের সকলের সামনে দেবে ছুঁচো মুখ বুচো করে। দেবে এমন শিক্ষা যেন কোনদিন আর এমন লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম করতে সাহস না পায়।

যার নামে এত কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি, যাকে উদ্দেশ্য করে আড়ালে আবডালে, গাঁয়ের কুলিতে-গলিতে এত রটনা-ঘটনা, ঢাক-ঢাক, গুড়-গুড় সেই ভূতনাথ কিন্তু নির্বিকার। চোখ-কান-মন-মুখ যেন সব বন্ধ তার। মশগুল সে সেই ভৈরব তলায় দেখা অদ্ভুত ঘটনাটার চিন্তায়। কি দেখল সে? ঠাকুরথানে তো কোনো ভূতুড়ে দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় তো তার মত বাস্তববাদী লোকের পক্ষে ভাবের ঘোরে কোন অবাস্তব অলৌকিক কিছু দেখা। তবে কি এটা তার? টেলিপ্যাথি? অসম্ভব। হ্যালুসিনেশন? তাও নয়। হিপ্‌নোটিজম? সেই বা কি করে হয়? কে তাকে সম্মোহন করতে আসবে ওই ভর্ত্তি দুপুর বেলায়, দেব মন্দিরে? তবে?

স্বপ্ন? স্বপ্ন হলেও কিন্তু সত্যি। সত্যি না হলে বলবে কেন মায়া—আমার সম্বন্ধে তুমি যে কথাগুলো বললে তা কিন্তু সত্যি ভূতুদা। তাই যদি সত্যি হয় তবেতো সতীকে মায়ার মায়ের বিষ খাওইয়ে মারাটাও সত্যি। উঃ! কি সাংঘাতিক মেয়ে সতীর ওই দস্যি সৎমাটা। নিজে মেরে আবার মরা মেয়েটার নামে অপবাদ রটাল সে যে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে সতী। এ হত্যার প্রতিশোধ নেবেই ভূতনাথ। স্বামী হয়ে এটুকু যদি করতে না পারল সে তবে কিসের সে পুরুষ? সতীর আত্মার কাছে চিরকার যে অপরাধি থেকে যাবে সে। যতই বলুক মায়া,

করুক সে যতই শপথ বাবা ভূতনাথের মন্দিরে হাত দিয়ে— মা তো সে তার। মেয়ে হয়ে কি প্রতিশোধ নেবে সে তার মায়ের উপর? সুতরাং ভূতনাথকেই নিতে হবে তার চরম প্রতিশোধ। উত্তেজনার মুখে ভিতরের পশুটা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ভূতনাথের। টগবগ করে ফুটতে লাগল তার গায়ের রক্তটা। শিরা-উপশিরাগুলোর মধ্যে যেন ছুটতে লাগল প্রতিহিংসার আগুন। প্রতিশোধ চাই-ই তার। কিন্তু কি ভাবে নেবে সে তার প্রতিশোধ?

ভাবতে লাগল ভূতনাথ। ভাবতে ভাবতে দিন গেল। এল রাত। সে রাত যেতে লাগল ক্রমশঃ গভীরতার দিকে। ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল সবাই। নির্জনতা নিয়ে রাত্রির অন্ধকার রাজত্ব করতে লাগল চারদিকে। চিন্তার ঘোরে হঠাৎ ভূতনাথের মনে হল যেন তার মধ্যে সে নেই। তার শায়িত দেহটা থেকে খোলস ছাড়ার মত যেন ছেড়ে যাচ্ছে আর একটা দেহ। ধোঁয়াটে ধূসর রূপ তার। শয্যায় পড়ে থাকা জড় দেহটার সঙ্গে তার এই বায়বীয় দেহটার যেন নেই কোন সম্বন্ধ। সম্পূর্ণ ভিন্ন সেটা। ভিন্ন সত্তায় ভূতনাথ অভিভূতের মত এধার ওধারে তাকাতেই অদূরে দেখল সতী। দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে। ডাকছে তাকে হাত নেড়ে ইসারা করে।

ওমনি ভূতনাথ স্থান কাল পাত্র ভুলে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। ধরল জড়িয়ে দুপুর বেলায় বাবা ভূতনাথের মন্দিরে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় যেমন মায়াকে জড়িয়ে ধরেছিল ঠিক তেমনিভাবে। ধরবে না? আজ কত দিন পর দেখা দিয়েছে সতী তাকে। কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা আছে তার। সবগুলোর আজ উত্তর চাই তার। ধরে না রাখলে সে যদি পালিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ ধরতেই তাকে মনে হল ভূতনাথের—এ তো ঘর নয়! এ তো সেই দাওয়া। বাবা ভূতনাথের মন্দিরের পিছন পাশ! ডান পাশে দেখল সে অদূরে তার ঘরের ভিতর শয্যার উপর পড়ে আছে তার জড়দেহটা। মড়ার মত। কিন্তু তার সঙ্গে একটা সরু সূতোর মত আলোকোজ্জ্বল রেখার দ্বারা যুক্ত আছে সে। ঠিক লাটাই-এর সূতোর সঙ্গে আকাশে উড়ন্ত ঘুড়ি যেমন বাঁধা থাকে তেমনি। আর বাম পাশে? সেই কুচিলা-আঁকড়-বেল-নিম আর পাকুড় গাছের তলায় গাদা করা পোড়ামাটির হাতী-ঘোড়ার ভৈরব থান।

হঠাৎ চমকে উঠল ভূতনাথ। সেই ভৈরবথান, সেই মন্দিরের পিছন পাশ, সেই ভর্তি দুপুরবেলা। তাহলে তো জড়িয়ে ধরেছে যাকে সে সতী নয়! নিশ্চয়ই মায়া। মনে পড়তেই ওমনি ঝট করে সে ছেড়ে দিল তাকে। হেসে উঠল সতী,—কি হল?

বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে তার দিকে বলে উঠল ভূতনাথ—তুই সতী নস, মায়া, মায়া তুই।

মিষ্টি মধুর হাসি মুখে বলে উঠল সতী—মায়া কি সতী হতে পারে না? না-সতী মায়া হয়ে থাকতে পারে না?

কেমন যেন এক উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বলে উঠল ভূতনাথ,—না, তা কি করে সম্ভব। সতী তো মারা গেছে! তুই তো মৃত!

আবার হাসল সতী। হাসির সঙ্গে ঝরে এল মুখে তার মিষ্টি-মধুর কথা—কে বললে আমি মারা গেছি? এই তো আমি দিব্যি রয়েছি। তোমার সামনে। ধরলে আমাকে, কথা বলছো আমার সঙ্গে। আমিও তো বলছি কথা তোমার সঙ্গে। তবু বলবে আমি মৃত?

বিস্ময়াভিভূতভাবে ভূতনাথ তাকাতে লাগল সতীর দিকে। তারপর বলে উঠল সে উৎকণ্ঠিত চিত্তে, যা দেখছি আমি, ঠিক দেখছি তো? এ তো আমার স্বপ্ন নয়? নয় তো আমার এ বুদ্ধি-ভ্রান্তি বা দৃষ্টিবিভ্রম? নস তো তুই আমার সামনে আলেয়ার আলো বা মরুভূমির মরীচিকার মত অবাস্তব, অলৌকিক কিছু?

হাসিমুখে ধরল সতী ভূতনাথের হাতটা। বসাল তাকে তার পাশে। তারপর কোলে নিলে মাথাটা তার। সোহাগভরে চুলগুলোতে তার হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগল সে, —তুমি যা দেখছো সত্যি দেখছো। এসব তোমার অবাস্তব অলৌকিক দৃষ্টিবিভ্রম বুদ্ধিভ্রান্তি কিচ্ছু নয় ভূতুদা। নয় এটা তোমার স্বপ্নও।

ব্যাকুল স্বরে মিনতি করে বলে উঠল ভূতনাথ,—আর আমাকে রহস্যে ফেলে রাখিস না সতী। সত্যি করে বল তুই এ আমি ঠিক দেখছি কি না? আর এ দেখা আমার সম্ভব হচ্ছেই বা কি করে?

তেমনি পরম যত্নে সতী বলতে লাগল তাকে, —শোন ভূতুদা, উচ্চ আত্মিক যারা তারা স্থূল- দেহ থেকে সূক্ষ্মদেহ বের করে তার সঙ্গে কথাবার্তা, ভাবের আদান-প্রদান ইত্যাদি সমস্ত কিছুই জড় জগতের মত করতে পারে। ওই যে দেখছো তোমার ঘরের ভিতর শয্যার উপর শায়িত অবস্থায় মৃতবৎ পড়ে আছে যে আধারটা ওটা তোমার জৈবদেহ। আর এই যে তুমি আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছ—এটা তোমার দ্বিতীয় সত্ত্বা অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ। সূক্ষ্মদেহে আমিও আছি তোমার কাছে। তবে তোমার আমার পার্থক্য হল—তোমার এই সূক্ষ্মসত্ত্বা এখনও জড়দেহকে ত্যাগ করে আসেনি। সূক্ষ্মসূত্র ওই যে তোমার আলোরেখা—তাই বেঁধে রেখেছে তোমাকে জাগতিক দেহের সঙ্গে। কিন্তু যেহেতু আমি মৃত সেহেতু এই যোগসূত্র আমার ছিন্ন হয়ে গেছে ভূতুদা। জড় দেহ হয়ে গেছে লীন।

—মৃত্যু তাহলে কি সতী? সতীর কোলে মাথা রেখেই তার মুখটার দিকে ছোটছেলের মত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

মায়ের মত পরম স্নেহে বলতে লাগল সতী,—মৃত্যু হল এই সূক্ষ্মসত্ত্বার জড়দেহ ত্যাগ করা। কিন্তু পার্থিব এই জড়দেহটাই তো আমাদের সব কিছু নয় ভূতুদা। কারণ শরীর, সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলশরীর এই ত্রিবিধ দেহ নিয়ে জীবাত্মা আমাদের প্রকৃতির বুকে বিম্বিত। অখণ্ড চৈতন্য সমুদ্রে জীবভাব রূপ বুদবুদেই আমাদের কারণ শরীরের উদ্ভব। সেই কারণ শরীরের অহংভাবের ফলেই সৃষ্ট আমাদের সূক্ষ্ম- শরীর। সূক্ষ্ম শরীরের ভোগের ইচ্ছাতেই জন্ম আমাদের স্থূলদেহের। স্থূলদেহ হল আমাদের জীবাত্মার কর্মোপযোগী যন্ত্রবিশেষ ভূতুদা। নির্দিষ্ট জন্মে, নির্দিষ্ট ভোগ শেষ হলেই সেই বিশেষ যন্ত্র ত্যাগ করে আসে জীবাত্মা। একেই বলে মৃত্যু। মৃত্যু আমাদের আত্মার বহিরাবরণ রূপ জড়দেহ পরিত্যাগ করা ভূতুদা। কোন নাশ বা ধ্বংশ বুঝায় না এর দ্বারা। আর শুধু তো আমাদের এই বহিরাবরণ ত্যাগ করলেই হবে না ভূতুদা, আমাদের অন্তর আবরণ এই সূক্ষ্মদেহকেও ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ করতে হবে আমাদের অহংভাবের মূল উৎস কারণ-শরীরকেও। তবে তো হবে আমাদের আত্মার মুক্তি। আত্মার মুক্তি অর্থাৎ সেই পরম সত্ত্বার সঙ্গে পুনর্মিলনই আমাদের কাম্য ভূতুদা। জীবনে যেমন আমাদের কাম্য পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠা। তাই বাল্য কৈশোর যৌবন আমাদের পরিত্যাগ করে আসতে হয়। তেমনি আত্মার আমাদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য জন্মজন্মান্তর আমাদের মৃত্যুর মাধ্যমেই ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে হয়। মৃত্যু হল আত্মার এক ধাপ ছেড়ে আর এক ধাপে এগিয়ে যাওয়া।

কে জানে এত বড় বড় কথা ভূতনাথের কানে যাচ্ছিল কিনা। গেলেও সে কি বুঝতে কি বুঝছিল কে জানে। কথার মাঝেই সে সেই তার গোঁ-এর বশেই জিজ্ঞাসা করে উঠল, —কিন্তু তোর মৃত্যু হল কি করে? আমি তোর মৃত্যুর কারণ কি জানতে চাই।

গম্ভীর হল সতী। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ তার ভূতুদার মুখটার দিকে। তারপর মুখে হাসি টেনে বলে উঠল সে,—আমার মৃত্যু তো বাবা ভৈরবের থানে তুমি নিজের চোখেই দেখলে ভূতুদা। এর পর আর বলার কিছু তো নেই আমার।

যেন চমকে উঠল ভূতনাথ! ঝট্ করে উঠল সে সতীর কোল ছেড়ে। বসল তার মুখোমুখি। জিজ্ঞেস করল তাকে,—আজ দুপুরে আলসে-ঘুমের ঘোরে যা দেখেছিলাম এই ভৈরবতলায় তা সত্যি? ঠিক বলছিস তুই?

—বাবা ভূতনাথের দাওয়ার বসে দেখা দৃশ্য কি কখনও মিথ্যা হতে পারে ভূতুদা? তোমার প্রার্থনায় বাবা ভৈরব আমার অতীতটাকে টেনে এনে যে তার বুকের উপর তুলে ধরলেন তা কি কখনও মিথ্যা হয়? হয় কি কখনও তা আলেয়া বা মরীচিকা? যা দেখেছো ঠিক দেখেছো তুমি। তোমার স্মৃতিবিভ্রম বা বুদ্ধি-ভ্রংশ কিচ্ছু হয়নি ভূতুদা।

একি শুনছে সে! অবাক বিস্ময়ে ভূতনাথ তাকিয়ে রইল সতীর মুখটার দিকে।

মুখে হাসি ঝরাল সতী। বলে উঠল সে তার মধু-মাখা স্বরে। অদ্ভুত তোমার মানস-শক্তি ভূতুদা। মনটাকে তুমি আমার টেনে আনলে তোমার সামনে। যে কথা জানাতে তোমার ইচ্ছা ছিল না আমার, মনে তুমি কষ্ট পাবে বলে—অতীত সেই জঘন্য, কষ্টদায়ক, দুঃখভরা ঘটনাটাকে আবার দেখাতে তুমি বাধ্য করালে আমার মনটাকে। ধন্য তোমার মানসিক ক্ষমতা ভূতুদা। ধন্য তোমার চিন্তার নিবিষ্টতা ও একাগ্রতার শক্তি।

ভূতুনাথের মন তখন সতীর কথার উপর ছিল না। রি-রি করছিল তার সমস্ত অন্তর। ঘৃণায় ধিৎকারে বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে —ছিঃ ছিঃ! এত নিষ্ঠুর মেয়ে, তোর সৎমা। শেষ পর্য্যন্ত বিষ খাওইয়ে তোকে মারতে গেল?

সতীর কিন্তু তেমনি শান্ত মধুর সুর,—কে কাকে মারতে পারে ভূতুদা? হিরণ্যকশিপুও তো প্রহ্লাদকে বিষ খেতে দিয়েছিল—পেরেছিল কি সে তাকে মারতে। জন্ম-মৃত্যু সব সেই বিধাতার হাত ভূতুদা। ভগবান আমার প্রতি কৃপা করেছিলেন। তাই তো মহাকাল দয়া করে আমাকে তার কোলে টেনে নিলেন।

—ওটাকে কৃপা বলে? বিদ্রপাত্মক ভঙ্গীতে বলে উঠল ভূতনাথ—অকালে সরিয়ে নেওয়াটা তোকে হল ভগবানের দয়া? নিকুচি করছে তোর ওই ভগবানের-টুগবানের আর কৃপা-করুণার।

—উত্তেজিত হয়ো না ভূতুদা, বলে উঠল সতী,—তিনি মঙ্গলময় তিনি কখনও কারো অকল্যাণ করতে পারেন না। যার যাতে মঙ্গল হয় তিনি তাই করেন। আমরা জাগতিক মন নিয়ে তার দয়া মায়া বুঝতে পারি না বলেই তার উপর রাগ করি, অভিমান করি। আর আমাদের কালাকাল বিচার? সে-ও তো আমাদের পৃথিবীর চোখেই। অনন্ত কাল-সমুদ্রে আমরা ভেসে চলেছি ভূতুদা। নিজের নিজের ক্ষুদ্র চিন্তার সার্কেল বা গণ্ডীতেই আমরা নিজের কালা-কাল বিচার করি। কিন্তু তিনি—তাঁর কালের কাঁটা জাগতিক নিয়মে ঘুরে না ভূতুদা। তার কাছে কোন কালাকাল নেই। যাকে যখন জীবন থেকে সরিয়ে নিলে তার সর্বাধিক উন্নতি হবে, হবে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল তখনই তিনি তাঁকে জগৎ থেকে সরিয়ে নেন ভূতুদা।

—মঙ্গল! ঘৃণায় মুখটা বিকৃত করে বলে উঠল ভূতনাথ, —এই তাঁর মঙ্গলের নমুনা? কি শাস্তিটাই না দিল তোকে বলতো মৃত্যুর সময়? কত কষ্ট পাচ্ছিলি তুই। যন্ত্রণায় করিছিলি কত ছট্‌ফট। তোর কাতরানি দেখে বুক ফেটে যাচ্ছিল আমার। এটা তোর প্রতি ভগবানের মঙ্গল হল?

—তা নয়তো কি ভূতুদা। বলে উঠল সতী,—মৃত্যুকালে ভগবান যদি দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্টভোগ না দেন তবে জগৎ জীবনের প্রতি আসক্তি নিয়েই তো মরবে মানুষ। আসক্তিই তো মানুষকে বার বার জন্মচক্রে, জীবাবর্তে আবর্তন করায় ভূতুদা। যন্ত্রণা নিয়ে মরলে সেই স্মৃতি জীবাত্মাকে আর জীবনের মোহে, জগতের মায়ায় পড়তে দেয় না। তাছাড়া মৃত্যুকালে যে যেমন চিন্তা করে গতায়ু হয় মৃত্যুর পরে তার তেমনি গতি প্রাপ্ত হয় ভূতুদা। মৃত্যুকালীন কষ্ট-যন্ত্রণা তাকে ভগবানকে স্মরণ করায়। যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সে ঈশ্বরকে ডাকে, মুক্তি পাবার জন্য করে কাতর প্রার্থনা। এই অন্তিম প্রার্থনাই তাকে পরা-মুক্তির দিকে নিয়ে যায় ভূতুদা, উর্দ্ধলোকে গতিবান করে।

—এই কি তোর পরামুক্তি? এই কি তোর উর্দ্ধলোকে গতিবান হওয়া? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

মুখে হাসির ঝিলিক মেরে বলে উঠল সতী, —আমার পরামুক্তি যে তোমার সাথেই জড়িত ভূতুদা। উর্দ্ধলোকে গতি যে আমার বাঁধা তোমারই সাথে। একলা আমি মুক্ত হতে তো চাই না ভূতুদা। চাই না তোমায় ফেলে এখানে সেখানে গিয়ে শিবলোকের সালোক্য মুক্তিলাভ করতে। তোমার হৃদয় যে আমার ভূতুদা, আমার হৃদয় তোমার। মন যে আমাদের উভয়ের একই মঙ্গল সূত্রে বাঁধা। সেই অধিকারেই তো তুমি আজ টানতে পারলে আমার মনকে। আমিও সেই অধিকারের বলেই টানতে পারলাম তোমার এই মনো-শরীরকে। এ মনকে তোমার আমি ক্লেদাক্ত হতে দেব না। দেব না কখনও ঈর্ষা-হিংসার কবলে পড়ে আত্মাকে তোমার অশুদ্ধ করতে। মৃত্যুকালে আমার কোন পার্থিব কামনা-বাসনা ছিল না ভূতুদা। ছিল না কোন তোমাকে নিয়ে জাগতিক মায়া-মোহে আটকে থাকার ইচ্ছা। তাই জগৎ-জীবনের কোন আকর্ষণেই আর জন্ম নেওয়াতে আমায় পারবে না ভূতুদা। তোমাকেও আর জন্ম-জীবন-মৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খেতে দিতে চাই না আমি। তোমার মধ্যেই আমি আমার ইষ্টদেবকে পাবার ইচ্ছাতেই জীবকলেবর ত্যাগ করেছি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছি তোমার সাথেই আমার ইষ্টমুক্তির আসক্তি নিয়ে। পেয়েছি তাই মৃত্যুর পর তোমাকে সে পথে চালিত করার ভগবানের কাছে আদেশ। এসেছি তোমার আত্মার আকর্ষণে এখানে। এই জন্যেই তোমাকে বাবা বিশ্বনাথের মঙ্গল-আশীর্বাদ পেতে হবে ভূতুদা।

—তোর জন্যে তুই পেয়েছিলি বাবা বিশ্বনাথের আশীর্বাদ? কথার মাঝে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ।

বলে উঠল সতী, — তা পাই নি কি বলছো ভূতুদা? আমার প্রতি তার অশেষ করুণা, অহেতুক কৃপা।

—হুঁ, গম্ভীরভাবে বলে উঠল ভূতনাথ—তাই তো অকালে তুই তোর মাকে হারিয়েছিলি। পড়েছিলি সৎমার খপ্পরে। বাপের পর্য্যন্ত স্নেহ, দয়া, মায়া, পাসনি তুই। পাসনি একটু ভালবাসা।

—পাই নি বলেই তো কারো স্নেহ-দয়া-মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়িনি আমি। আমারও পড়েনি কারো উপর কোন অকর্ষণ। জগৎ-জীবনের এসব বন্ধন থেকে আমাকে মুক্ত করে রাখা এটা কি কম আশীর্বাদ তাঁর?

—বেশ, আর সৎ-মায়ের তোর লাথি ঝাঁটা? জীবনভর তার থেত্‌লানি গাধার খাটুনি খেটেও তার গাল-মন্দ আর মুখ ঝাঁম্‌টানি এগুলো কি রকম ভগবানের আশীর্বাদ শুনি? এত বার-ব্রত উপোস-কাপাসের কি ফল দিয়েছিল তোকে বিশ্বনাথ? জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট?

— দুঃখই তো জীবনের স্পর্শমনি ভূতুদা। শান্ত স্বরে বলে উঠল সতী—আমার ভাগ্য ভাল যে ভগবান কোনদিন সুখের মোহে ফেলেন নি। দুঃখের আগুনে পুড়েই তো সোনা খাঁটি হয় ভূতুদা। চিত্ত হয় শুদ্ধ, নির্মল-জগতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শুধু ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এনে দেয়। এনে দেয় অহঙ্কার। ভোগের মোহ বড় বিপজ্জনক ভূতুদা'। চরিত্রকে বিপথে নিয়ে যায়। সুখের লোভে মানুষ পশু হয়, স্বার্থপরতা তার সত্তাকে করে কলঙ্কিত।

বলতে বলতে সতীর চেহারাটা কেমন যেন এক দিব্যমূর্ত্তির মত মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল ভূতনাথের যেন দেহাবয়বে তার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলো খেলছে। অমৃত ক্ষরিত হতে লাগল যেন তার মুখ থেকে—ভোগ কোনদিন জীবনে তৃপ্তি এনে দিতে পারে না ভূতুদা। সে শুধু বাসনার পর বাসনা বাড়িয়েই যায়। এসব কামনা-বাসনার সংস্কার চিদাকাশে সঞ্চিত হয়ে আত্মাকে শুধু জন্ম -মৃত্যুর পাকচক্রে আবর্ত্তিত করতে থাকে। মুক্তি করে তার সুদূর পরাহত। দুঃখই ভগবানের আশীর্বাদ। জীবনে দুঃখ-কষ্ট জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়েই তো ভগবান কোলে টেনে নেন। ভগবানকে তুমি কোনদিন অবিশ্বাস করো না ভূতুদা। পোড়ো না কোনদিন জাগতিক মায়ার ফাঁদে, ভোগের লোভে।

—আমি না পড়লেও অপরকে কিন্তু অন্যায়ভাবে কিছু আমি ভোগ করতে দেব না সতী। বলে উঠল ভূতনাথ,—আত্মসুখের মোহে পৃথিবী থেকে তোকে যে সরিয়ে দিল সেই সৎমায়ের তোর আমি প্রতিশোধ নেবই।

—ওটা আমার ভবিতব্য বলে ধরে নাও ভূতুদা। শান্তস্বরে বলে উঠল সতী—জানোই তো তুমি নিয়তিকে কেও বাধা দিতে পারে না।

—তা বলে এত বড় একটা অন্যায় করে সে জগতের বুকে সাধু হয়ে বেঁচে থাকবে? গর্জে উঠল ভূতনাথ—তোর নামে আত্মহত্যার মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে সত্যটাকে সে গোপন করে চলবে? তার মুখোশটা আমাকে খুলে দিতেই হবে সতী। শাস্তি তাকে পেতেই হবে তার।

আত্মিক-রূপী সতীমূর্ত্তি বলে উঠল তার মধু-ঝরা স্বরে, —যার যা কর্মফল তাকে তা তো ভোগ করতে হবেই ভূতুদা। অযথা তুমি কেন হেতু হয়ে তার নিজের জীবনটাকে কলঙ্কিত করতে যাবে? সবার অলক্ষ্যে যিনি লক্ষ্য করছেন সব কিছু বিচারের ভার ছেড়ে দাও তার হাতে। বিশ্বের প্রত্যেকটি অনু-পরমাণু নিয়মবদ্ধ ভূতুদা। নিশ্চিন্ত থাক তুমি। তার উপর চলতে তুমি যেয়োনা।

—কিন্তু স্বামী হিসেবে আমারও তো একটা করণীয় আছে? বলে উঠল ভূতনাথ, —দুঃখ-কষ্ট শুধু তোকে ভোগ করিয়েই তো ক্ষান্ত হল না সে। তোকে হত্যা করে জীবনটাকে যে আমার দুঃখ কষ্টে ভরিয়ে দিল তার কি হবে?

শান্তস্বরে বলে উঠল সতী, —সবই আপেক্ষিক ভূতুদা। সবাই আমরা অজ্ঞান, অচৈতন্য। চৈতন্যময় সেই পরমসত্তা। তার বুকেই চলেছে সব কান্না-হাসি, সুখ-দুঃখের খেলা। আসলে এসব সকল-ই আমাদের স্বপ্ন। স্বপ্ন ভাঙ্গলে অর্থাৎ সেই স্বরূপ-চৈতন্যে আসীন হলেই দেখতে পাবে সেখানে সুখও নেই, দুঃখও নেই। জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। হত্যাও নেই, হত্যারিনও নেই।

—কিন্তু তোর মৃত্যুটা যে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না সতী। পারছি না তোর সৎমায়ের অন্যায়টাকে কোনরকমেই বরদাস্ত করতে।

—জানি আমি। বলে উঠল সতী,—বোধটাকে তুমি শাশ্বত সত্যে আসীন করতে পারনি বলেই আপেক্ষিক সত্যটাই তোমার কাছে বড় বলে মনে হচ্ছে। উত্তেজনা তোমাকে তোমার অন্তরের অবিনশ্বর সত্যবস্তুর কাছে যেতে দিচ্ছে না। প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠবে বলেই আমি তোমাকে আমার মৃত্যুর কারণ জানাই নি। কিন্তু ভিন্ন দেহী হলেও সত্তা তো আমাদের এক। সেই অধিকারেই তোমার মনের কম্পন আমার মনে তরঙ্গ তুলে জেনে নিল আমার অতীত জীবনের ঘটনা। কিন্তু তোমার মনের উপরও আমার সমান অধিকার আছে ভূতুদা। সেই অধিকারেই মনটাকে তোমার আমি প্রতিহিংসা পরায়ণ হতে দেব না। আমি তোমার হিংসামূর্ত্তি দেখতে চাই না ভূতুদা। শিব অংশে জন্ম তোমার। তুমি শিব হও, শান্ত হও। হও আশুতোষ ভোলানাথ। ক্ষমার চেয়ে বড় গুণ জগতে তো আর কিছু নেই ভূতুদা।

-তুই যে কি বলছিস আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না সতী।

—বুঝতে তুমি পারবেই। কিন্তু মানুষ নিজেকে নিজে না বুঝলে বাইরে থেকে কারো বোঝানোতে তো তার প্রকৃত জ্ঞান হয় না ভূতুদা। তবে একটা কথা জেনে রাখ তুমি এই জন্মেই শুধু আমরা স্বামী-স্ত্রী নই। সম্পর্ক আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের। কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছায় পরমসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রী রূপে লীলায়িত হয়েছি এই জগতের বুকে। প্রকৃতি আমাদের অভিন্ন-সত্তাকে ভিন্ন চিজ্জড় গ্রন্থিতে বেঁধে পৃথক করে খেলায় মেতেছে। এ খেলা আমাদের শেষ করতেই হবে ভূতুদা। ঘটাকাশকে আমাদের মিশিয়ে দিতে হবে মহাকাশে। আমি মুক্তি চাই ভূতুদা। সে মুক্তি নির্ভর করছে তোমার উপর।

—আমার উপর? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেই ভূতনাথ বলে উঠল সতী ব্যাকুল হয়ে,—হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার উপর। অংশ ছাড়া কেও কখনও একক পূর্ণ হতে পারে না ভূতুদা। সত্তা আমাদের তোমার আমার দুপাখার উপরই ভর করে উড়ে যাবে সেই পরমসত্তার সঙ্গে মিলিত হতে। এ জন্মেই তোমাকে তার উপযুক্ত হতে হবে ভূতুদা।

কি করতে হবে আমাকে? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

বলে উঠল সতী,—যেতে হবে ভোগ-সুখের উর্দ্ধে। থাকতে হবে জীবনে যথাকর্তব্য সম্পাদন করে নির্লিপ্ত নিস্পৃহ হয়ে কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে। পরিহার করতে হবে ঈর্ষা-হিংসা ঘৃণা-বিদ্বেষ। কাম-ক্রোধ ইত্যাদি ষড়-রিপু একটার পর একটা বাঁধন দিয়ে আমাদের মূল সত্তাকে বেঁধে রেখেছে ভূতুদা। এ বাঁধন খুলে আত্মাকে আমাদের মুক্ত করতে হবে। উপরের বাঁধন ঈর্ষা-হিংসা থেকেই তো করতে হবে বাঁধন খোলা শুরু। তবেই তো ক্রমশঃ খুলতে খুলতে আসতে পারা যাবে নীচের বাঁধন খোলার দিকে। উপরের বাঁধন খুলে এলেই মূল রিপু-কাম-ক্রোধের বাঁধন খুলা যাবে ভূতুদা। বিবেকান্ধ না হয়ে জীবনের এই মূল কাজে ব্রতী হও তুমি। আত্মশক্তি অর্জন কর তুমি জগতের কাজে-কর্মে।

—কিন্তু তুই কাছে না থাকলে এসব আমার দ্বারা হবে না সতী।

—আমি তো তোমার কাছেই আছি ভূতুদা। থাকবও চিরকাল। বলে উঠল সতী,—কিন্তু মুখে বলা ছাড়া আমার তো আর অন্য কোন ক্ষমতা নেই ভূতুদা। কাজ করতে হবে এই স্থূলদেহ নিয়ে তোমাকেই। মনে রাখতে হবে, এই জীবনেই যেন শেষ জীবন হয় তোমার। কোন পার্থিব কামনা-বাসনা আর যেন তোমাকে জগতের বুকে জন্মগ্রহণ করাতে না পারে।

—কিন্তু আর কিছুদিন পর তোর শ্রাদ্ধ-শান্তি হলে আমাকে ছেড়ে তো তুই চলে যাবি। আচ্ছা, শ্রাদ্ধ-শান্তি যদি তোর না করা হয় সতী?

—শ্রাদ্ধ শান্তির আমার কোন প্রয়োজন নেই ভূতুদা। উত্তরে ভূতনাথের বলে উঠল সতী,—শ্রাদ্ধ, ইত্যাদি ঔর্ধ্বদেহিক কর্মের বিশেষ করে প্রয়োজন হয় তাদের যারা মৃত্যুর পূর্বের মূর্চ্ছা মৃত্যুর পরও কাটাতে পারে না ভূতুদা। শ্রাদ্ধের মন্ত্রধ্বনিই, সে মূর্চ্ছা কাটিয়ে দেয় তাদের, নইলে দীর্ঘকাল তারা পড়ে থাকে অচৈতন্য অবস্থায়। অনেক জীবাত্মা আবার মৃত্যুর ঘোরে ঘুরে বেড়ায় বেহুঁশ হয়ে। ঘোর কাটাতে তাদের প্রয়োজন হয় শ্রাদ্ধের মন্ত্রবাণী। নইলে তাদের আত্মোন্নতি ধীরগতি প্রাপ্ত হয় ভূতুদা। অনেক জীবাত্মা আবার মৃত্যুর পরও কিছুতেই কাটাতে পারে না তাদের জাগতিক মায়া। মায়ার টানে আত্মার তাদের উর্ধ্বগতি লাভ হয় না। এ মায়ার বাঁধন

কাটাতে দরকার হয় তাদের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের। আবার ভোগে মত্ত এমন সব জীবাত্মা থাকে যারা মৃত্যুর পরও পার্থিব ভোগের নেশায়, পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পাঞ্চভৌতিক উপাদানের অন্নময় কোষে গঠিত দেহ তাদের চলে গেলেও তারা অবশিষ্ট প্রাণ-মন-জ্ঞান-আনন্দ-ময় কোষে গড়া আতিবাহিক দেহ নিয়ে ভোগ করতে চায় জগতের ভোগ্য বস্তু সমূহ। কিন্তু এ দেহ নিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনা পূর্ণ করা সম্ভব হয় না তাদের। ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুঃখ জ্বালায় তখন ছটফট্ করতে থাকে তার জীবাত্মা। উত্যক্ত করে তাদের মনের সংস্কারাবদ্ধ ভোগ লালসা। স্থূল দেহের থেকে দশগুণ বেশী মাত্রায়। সে বড় যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা ভূতুদা। এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করে ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াকর্ম। শ্রাদ্ধের পিণ্ড, তর্পনের জলগ্রহণ করলে আতিবাহিক দেহ তাদের সূক্ষ্ম হয়। বাসনা-কামনার ভারগ্রস্থ সত্তা তাদের হাল্কা হয়ে পৃথিবীর স্তর থেকেউর্দ্ধে উঠতে সমর্থ হয়। এমন কি বায়ুভূত নিরালম্ব পিশাচ-প্রেতিনী যারা তারাও শ্রাদ্ধের পিণ্ড গ্রহণ করে ভৌতিক দেহ, প্রেতশরীর ত্যাগ করে উর্ধ্বস্তরে উঠতে সমর্থ হয়। এবং নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী স্ব স্ব লোকে গতিবান হয়। শ্রাদ্ধ-শান্তি মৃতাত্মাদের জানিয়ে দেয় তাদের জগৎ-জীবনের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই। তাদের অন্য পথ। ইহলোক তাদের ত্যাগ করিয়ে পরলোকের দিকে যেতে তাদের সাহায্য করে পরলৌকিক ক্রিয়াকর্ম।

—কিন্তু তোর তো মৃত্যু— কি যেন জিজ্ঞেস করতে যেতেই ভূতনাথ বলে উঠল সতী,—আমার মৃত্যু অজ্ঞানে হয়নি ভূতুদা। সজ্ঞানে বাবা ভূতনাথের নাম স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেছি আমি। তাঁর কৃপাতেই আমি কোন তন্দ্রাঘোরে বা অচৈতন্য অবস্থায় পড়িনি। জগৎ জীবনের কোন মোহও আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি। তোমার উপর আমার যা টান তা জাগতিক জীবনের মত রূপজ, গুণজ বা কোন স্বার্থজ কিছু নয় ভূতুদা। আমাদের পারস্পরিক আকর্ষণ জগৎ-জীবনের কামনা বাসনার উর্ধ্বে শাশ্বত সত্তার আকর্ষণ। সুতরাং আতিবাহিক দেহের ফেরে পড়িনি আমি।

না জানি সতীর কথাগুলোর মধ্যে কি যাদুশক্তি ছিল। সব কিছু ভুলে ভূতনাথ মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল তার মুখটার দিকে। সতী যেন সাক্ষাৎ কোন দেবী প্রতিমা। কিন্তু সে দেবীর তো দেবতা ভূতনাথ। কেমন যেন এক অজানা পুলকে ভরে যেতে লাগল ভূতনাথের মনটা। ঝিরি ঝিরি ঝরনার মুখটা বন্ধ করে সতী বলে উঠল তাকে, —এবার তুমি তোমার জড়দেহে ফিরে যাও ভূতুদা। পাখ্-পাখালির কাকলি শেষ প্রহরের ঘোষনা করছে। ভোরের বাতাস আনছে জগতে নূতন দিনের বার্তা। থাক গিয়ে তুমি তোমার পার্থিব আধারকে অবলম্বন করে। কিন্তু একটা কথা তুমি স্মরণে রাখবে ভূতুদা, তোমার মনোশরীরে আমার অবস্থান। জড়শরীরে এমন কোন কাজ করো না তুমি যার আঁচ লেগে আমাকে কষ্ট দেয়। কোরো না অন্যায় যাতে ব্যথা লাগে আমার প্রাণে।

—তাই হবে সতী। বলেই ভূতনাথ হঠাৎ আবার জিজ্ঞেস করল তাকে,—কিন্তু আর একটা কথা জানিয়ে আমায় বিদেয় কর সতী।

—কি কথা বল?

—চণ্ডীতলার শ্মশান-বাবা এসে তোকে গয়ায় দেওয়ার কথা বলেছিল। গয়ায় পিণ্ড দিলে তুই নাকি চিরকালের মত আমাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাবি। আর কখনও আসবি না। মুক্তি হয়ে যাবে তোর। এ কথাটা সত্যি?

শুনে একটু গম্ভীর হল সতী। তারপর তার ভূতুদা'র দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে বলে উঠল সে,—গয়ায় পিণ্ড দিলেই কি মুক্তি আত্মার হয় ভূতুদা? মুক্তি জীবাত্মার নিজের হাতে। যতক্ষণ না মন তার কামনা-বাসনা মুক্ত হচ্ছে, হচ্ছে সর্ব্ব-সংস্কার মুক্ত ততক্ষণ তার মুক্তি নেই। ভগবান কাকেও মুক্তি দিতে পারেন না যতক্ষণ না সে নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা করছে। এর জন্য সাধনা চাই ভূতুদা। সে সাধনা নিজের অন্তঃকরণকে পবিত্র করার সাধনা। চিত্তকে নির্মল, স্বভাবকে সুন্দর ও শুদ্ধকরার সাধনা।

—তবে বলে কেন গয়ায় পিণ্ড দিলে প্রেতযোনি মুক্ত হয় তার?

জিজ্ঞেস করতেই ভূতনাথ বলে উঠল সতী তেমনি শান্তস্বরে,

—ব্যাপারটা কি জান ভূতুদা। মৃত্যুর প্রাক্কালে মানুষকে এক গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে। সে মরণ-ঘুম মৃত্যুর পরও অনেকের থেকে যায়। জীব কলেবর ত্যাগ করে অনেক আত্মা নিশি পাওয়ার মত একরকম ঘোরে

ঘুরে বেড়ায়। বুঝতে পারে না সে জীবন্ত না মৃত। অনেকেই মৃত্যুর পর তার প্রেতশরীর নিয়ে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে যায়, কথা বলতে যায়, ছুঁতে যায়, ধরতে যায়, কিছু বুঝতে যায়। কিন্তু তাদের কথা শোনা তো দূরের কথা আত্মীয়েরা দেখতেও পায় না তাকে। তখন ব্যর্থ হলে সেই প্রেতাত্মাটা হয় রাগান্বিত। কখনও কখনও রেগে সে জড়কণা আহরণ করে ভৌতিক দেহতে অবতীর্ণ হয় তাঁর উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সামনে। ঠিকমত অবয়ব ধরতে পারে না বলে তার কদাকার চেহারা দেখে ভয় পেয়ে অনেকেই পালায় তার কাছ থেকে। ভৌতিক সত্তাটা তখন তার নানাভাবে চেষ্টা করে বুঝাতে তাদের যে সে জীবন্ত তাদেরই একজন। এই বুঝবার চেষ্টাগুলোই তার ক্রমশঃ ভৌতিক কাণ্ড, প্রেত-উপদ্রবে পরিণত হয়। এদের ঘোর কাটাতে, হুঁশে আনতে প্রয়োজন হয় তখন তাদের গয়ায় পিণ্ড দেওয়ায়। গয়ায় না দিলেও অবশ্য তাদের আপনি একদিন ঘোর কাটে তবে গয়া- পিণ্ড সদ্য তাদের হুঁসে এনে দেয়। মৃত্যু সচেতন আত্মা তখন স্বগতি প্রাপ্ত হয়। চলে যায় সে স্ব-কর্মফল অনুযায়ী নিজ নিজ লোকে। মুক্তি পায় তার আত্মীয়-স্বজন তার ভৌতিক উপদ্রবের হাত থেকে। এই হল গয়া-মুক্তি।

—আর সে ফিরে আসে না? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

—ফিরে আসে তবে সেই পূর্ব্ব সম্পর্কিত জাগতিক সত্তায় নয়। বলে উঠল সতী, —কর্মফল অনুযায়ী সে নিজ-নিজ লোকে অবস্থান করে পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করতে থাকে। নির্দ্দিষ্টকাল ভোগান্তে স্ব স্ব স্বভাব ও সংস্কার অনুযায়ী আবার সে মাতৃগর্ভে আশ্রয় নেয়। চলতে থাকে জীবন তার আবার সেই সঞ্চিত প্রারব্ধ ক্রিয়ামান কর্মের ফল অনুযায়ী। জন্ম জীবন কর্মের এই ধারা ভূতুদা।

—তাহলে তোকে কি গয়ায় দিলে আমার সতী হিসাবে আর কখনও পাব না শাশ্বতী? হারাব তোকে আমি চিরকালের মত?

হাসল সতী। বলল তেমনি সেই সোহাগ ভরা স্বরে—শাশ্বতী তোমার শাশ্বত ভূতুদা। তুমি আমাকে হারালেও আমি তোমাকে হারাব কেন? তবে পৃথিবীর জন্ম-জীবন মৃত্যুচক্রে আমি আর পড়ব না। গয়ায় দিলে থাকতে হবে আমাকে সেই নিজলোকে—তপলোকে। এভাবে এই ধরণীর বুকে নেমে এসে আর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না। না পারলেও সেখান থেকে দৃষ্টি আমার অনুক্ষণ থাকবে তোমার উপর। তোমার আত্মিক উন্নতির জন্য সেখানে বসে আমি তপস্যা করব ভূতুদা।

—কিন্তু তোকে কি গয়ায় দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

বলে উঠল সতী—প্রয়োজনের কথা যদি বল তবে শোন ভূতুদা। শ্রাদ্ধ শান্তি গয়া-পিণ্ডি ফল পেয়ে গেছি আমি মৃত্যুর পরক্ষণেই। অন্তিম সময়ে স্বামী-চিন্তায় প্রাণত্যাগ করলে স্ত্রীর পরমাগতি লাভ হয়। তাছাড়া প্রাণবায়ু আমার শিবস্মরণে নির্গত হওয়ায় অর্চিঅভিমানী দেবতাদের মাধ্যমে আত্মসচেতন অবস্থাতেই শিবলোকে গতি হয়েছিল আমার। কিন্তু তুমি ছাড়া আমি সদ্যমুক্তি চাইনি ভূতুদা। কিন্তু তোমার তো শুধু জাগতিক কালের জন্য অপেক্ষা করা নয় এ মুক্তির জন্য তোমারও কিছু তপস্যার প্রয়োজন। তোমার হয়ে সেই তপস্যা করার জন্য আমি তপলোকেই বেছে নিয়েছি ভূতুদা। সপ্তম স্তর স্বর্গলোকে আমি যাই নি। কারণ স্বর্গ তো শুধু পুণ্যকর্মের ভোগ ক্ষেত্র ভূতুদা। পুণ্যফল শেষ হলেই ভোগান্তে আবার নেমে আসতে হবে পৃথিবীর বুকে। আমি জন্ম-মৃত্যুর এ খেলা আর খেলতে চাই না ভূতুদা। তোমাকেও আর মেতে থাকতে দিতে চাইনা এ খেলায়। চাই না তোমাকে আর জন্মচক্রে জীবাবর্তে আবর্ত্তন করাতে। গয়ায় দিলে অপরে যদি তৃপ্তি পায়, স্বস্তি পায় মনে তবে দিক না আমাকে গয়ায়। না এলেও আমি তোমার কাছে সেই ষষ্ঠ স্তরে থেকেই তোমার জন্য তপস্যা করে যাব।

—না সতী না, হঠাৎ জড়িয়ে সতীর হাতদুটো বলে উঠল ভূতনাথ, —আমি তোকে সর্ব্বক্ষণ পেতে চাই আমার কাছে। আমি তোকে কিছুতেই গয়ায় দিতে দেব না। দেব না কাকেও তোর শ্রাদ্ধ- শান্তি করে আমার কাছ থেকে তোকে দূরে সরিয়ে দিতে। বল তুই, এভাবে থাকবি তো তুই চিরকাল আমার পাশে, আমার কাছে?

মুচকি হেসে বলল সতী সোহাগভরে—তাই হবে ভূতুদা। শিব ছাড়া যখন সতী থাকতে পারে না তখন সতীও থাকতে পারবে কি করে শিব ছাড়া। কিন্তু ওখানে সতী শিবের জন্য তপস্যা করলেও এখানে কিন্তু সতীর কথা চিন্তা করে চলতে হবে জীবনে ভূতনাথকে।

—বল তুই আমায় কি ভাবে চলতে হবে? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ। বলে উঠল সতী—সে তোমার বিবেকরূপী ভগবানই তোমাকে অন্তর থেকে নির্দ্দেশ দিবেন। চলবে তুমি তার কথায়। তবে বললে যখন তখন আপাততঃ শোন আমার কথা। কখনও মা বাবার তোমার অবাধ্য হয়োনা তুমি। শুনবে তাদের কথা। করবে তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা। জগতে মা-বাবাই সাক্ষাৎ ভগবান ভূতুদা। জাগ্রত তারা দেব-দেবী। ক্ষমা যেমন মানুষের মহৎ গুণ, সহনশীলতা মানুষের তেমনি মহান শক্তি। তোমাকে এই গুণ-শক্তি সম্পন্ন হতে হবে ভূতুদা। সামান্য একটু নিজে সহ্য করলে যদি অপরের মনে কষ্ট দেওয়া না হয় তবে একটু সয়ে-রয়ে চললেই বা ভূতুদা। এতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। মন হয় তাপ মুক্ত নির্মল। ক্ষমা সহনশীলতায়, অপরে তোমাকে দুর্ব্বল মনে করলেও আত্মিক বলে বলীয়ান হবে তুমি। কি ভূতুদা? শুনবে তো আমার কথা?

আবেগ-ভরা কণ্ঠে বলে উঠল ভূতনাথ—আর অবাধ্য হব না তোর। তোর কথা না শুনে, রাগ দেখিয়ে চলে গিয়ে হারিয়েছিলাম তোকে। ফেলে গেছলাম তোকে আমি বাঘের মুখে। কিন্তু বিশ্বাস কর তুই, সৎমা যে তোকে এভাবে মেরে ফেলবে কল্পনাও করতে পারিনি। তোর দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন অত্যাচার সব কিছুর জন্য আমিই দায়ী।

—আবার সেই অতীতকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলে ভূতুদা? গম্ভীর হয়ে বলে উঠল সতী—ছেড়ে দাও ওসব। মন থেকে ওসব ঘটনার স্মৃতি মুছে দাও একেবারে চিরকালের মত। অতীতকে নিয়ে আঁকড়ে পড়ে থাকা জীবন নয় ভূতুদা। মূল মন্ত্র জীবনের চরৈবেতি। এগিয়ে যেতে হবে তোমাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, অসৎ-এর থেকে সৎ-এর দিকে। ভবিষ্যতের পরামুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমানটা তোমাকে কাজে লাগাতে হবে। ঈর্ষা-হিংসার দাস করে চিত্তটাকে তোমার ভারাক্রান্ত করা চলবে না। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের প্রভুত্ব করতে হবে তোমাকে। চিজ্জড় গ্রন্থি ভেদ করে সত্তাকে তোমার শিবত্বে আসীন করতে হবে। তবেই তো তোমার জীবনের সার্থকতা।

সতীর মুখটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল ভূতনাথ। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়ে সতী এতসব বড় বড় কথা জানল কি করে। বোধ হয় তার মনের কথা বুঝতে পারল সতী। তাই একটু হেসে উঠল সে। বলতে লাগল হাসিভরা মুখেই—এসব আমার কথা নয়, ভূতুদা। তোমার অন্তর সত্তার কথা। তোমার হৃদয়ের আকুতি। বেরুচ্ছে শুধু আমার মুখ দিয়ে। পতি সতীর পরমগুরু। তাকে গুরুত্বে আসীন করাই তো সতীর ধর্ম্ম ভূতুদা। এসব কোন পার্থিব জগতের বইপড়া, শুনে জানা জ্ঞান নয়। জন্ম-জন্মের অভিজ্ঞতা। আশীলক্ষ যোনি ঘুরে এসে সত্তা তোমার এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। সমস্ত জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ছাপ আছে তোমার অন্তরে। আমার মত জড়দেহ মুক্ত হয়ে সূক্ষ্মসত্তা আসীন হলেই জানতে পারবে তুমি তোমার হৃদয়ের আকৃতি। মনকে স্থির করে অন্তরমুখী করলেই খুলে যাবে তোমার কাছে সব রহস্যের জাল। এখন যাও তুমি ভূতুদা, ফিরে যাও তোমার জড়দেহে। সৎসত্তায় আসীন হয়ে শুদ্ধ পবিত্রভাবে পরিচালিত করার চেষ্টা কর তোমার জীবনটাকে। সৎ চেষ্টাই ভগবানের পূজা ভূতুদা।

—কিন্তু আমি যদি তা না পারি? ছোট ছেলের মত প্রশ্ন ভূতনাথের।

হাসি মুখে তাই বলে উঠল সতী, —পারবে বলেই মনটা তোমার নিবিষ্ট হয়ে শুনছে এসব কথা। না পারলে জানবে তুমি ভোগ বাড়বে আমার। সব নদীই একদিন না একদিন মহাসাগরে মিলিত হবেই। সেই ততদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে আমাকে তপলোকে। কিন্তু আমি চাই এই জন্মেই তুমি আমি জয়পণ্ডা-শীলাবতী নদীর মত মহাসত্তায় লীন হতে। তুমি পারবে ভূতুদা। সাধু-সন্ন্যাসীরা যোগধ্যান করে যা সহজে আয়ত্ব করতে পারে না তুমি তা সহজেই করায়ত্ব করে বসে আছ স্বভাবের বশে। কোন পার্থিব ভোগ-বাসনায় লোভ নেই তোমার। আসক্তি নেই তোমার জাগতিক কোন ধন-সম্পদে। একনিষ্ঠ মন তোমার। আছে তোমার চিন্তার একাগ্রতার শক্তি। কেন পারবে না তুমি?

—পারতেই যদি হয় আমাকে তবে বল তুই, এমনিভাবে থাকবি আমার কাছে। আমার বল-ভরসা, বোধ-বুদ্ধি, শক্তি-সাহস সব হয়ে তুই পরিচালিত করবি আমাকে। কথা দে আমায়।

শুনেই যেন কেমন একটু স্তম্ভিত হয়ে গেল সতী। ভাবল কিছুক্ষণ। মুখে চোখে তার দেখা গেল যেন

চিন্তার ছাপ। তারপর চাপা একটা শ্বাস ফেলে মুচকি হেসে বলে উঠল সে,—বেশ, তোমার যদি এই ইচ্ছা, তবে তাই হবে।

সতীর প্রতিশ্রুতি পেতেই কেমন যেন একটা পুলকের ঝিলিক খেলে গেল ভূতনাথের সর্বাঙ্গে। আনন্দ-ভরে বলে উঠল সে তাই, —ডাকলেই কিন্তু আসতে হবে আমার কাছে। চাইলেই কিন্তু দেখা দিতে হবে তোকে। বললেই কিন্তু শুনতেহবে আমার কথা।

—এত অধীর হবার কি আছে ভূতুদা? বলে উঠল সতী,—স্ত্রীর একক চিন্তায় স্বামীর অন্তর যখন সূক্ষানুভূতির স্পন্দন গ্রহণে সমর্থ হয়েছে তখন দেখতে তুমি আমাকে পাবেই। তবে তোমার চোখ, কান, নাক যে এখনও সূক্ষ্ম-দর্শন, শ্রবন ও ঘ্রানের উপযুক্ত হয়ে উঠেনি ভূতুদা। তাই স্থূল ইন্দ্রিয়ে তোমার বলা মাত্রই দৃষ্টিগ্রাহ্য নাও হতে পারি আমি। তবে দুঃখ কোরো না ভূতুদা। প্রয়োজন হলে আমিই দেব তোমায় দেখা। এবার যাও তুমি প্রবেশ কর গিয়ে তোমার ওই পড়ে থাকা স্থূল শরীরে। মা উঠেছেন তোমার। দেখতে আসছেন তোমাকে। মৃতবৎ পড়ে থাকতে দেখলে তোমাকে এক্ষুনি হুলস্থূল কাণ্ড করে বসবেন উনি। যাও ফিরে ভূতুদা।

কি আশ্চর্য্য! সতী বলার সঙ্গে সঙ্গে দেহটা তার হাল্কা তুলোর মত ফুস করে ভেসে উঠল উপরে। সতীকে ছেড়ে। তারপর জড়দেহের সঙ্গে যুক্ত তার সেই সূক্ষ্ম আলোর পথটা ধরে ভেসে যেতে লাগল সে। ভেসে যেতে লাগল সেই ঘরে তার শয্যার উপর পড়ে থাকা পার্থিব দেহটার দিকে। আসমানে, নিরালম্বভাবে। যেন সে শূন্যে ভেসে যাওয়া একখণ্ড মেঘ। ধোঁয়াটে ধূসর তার মূর্ত্তি। তাকিয়ে রইল সতী তার দিকে। স্নেহভরা দৃষ্টি তার, করুণা-মাখা মুখ। সে মুখে ঝরছে তার অদ্ভুত এক মিষ্টি হাসি। সে হাসিতে কি মায়া ছড়ানো! ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না ভূতনাথের সে দেবী-প্রতিমাকে। কিন্তু কি করবে সে। জড়দেহটা তার চুম্বকের মত আকর্ষণ করতে লাগল তাকে। যেন স্রোতের টানে পাল-ছেঁড়া নৌকা সে। কিছুতেই ভূতনাথ এড়াতে পারছিল না সেই অমোঘ আকর্ষণটাকে। সতীকে ছেড়ে ভাসতে ভাসতে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে লাগল সে। জ্যোতির্ময়ী সত্তটা সতীর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল আস্তে আস্তে। তারপর শেষে এক আলোর বিন্দুতে পরিণত হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। ভূতনাথও খাপে ঢোকো তলোয়ারের মত ঢুকে গেল তার সেই জড় দেহটাতে।

সতীর কথাই ঠিক। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন তার মা। এসেই পাগলের মত ভূতনাথকে নাড়া দিতে দিতে বলতে লাগলেন ব্যাকুলভাবে— একি বাবা ? কি হয়েছে তোর? ঘুমের ঘোরে এমন বিড় বিড় করে কার সঙ্গে কথা বলছিলি? কি হয়েছে তোর? ও বাবা ভূতনাথ স্বপ্ন দেখছিলি না কি রে? উঠ। উঠে বোস বাবা।

উঠল ভূতনাথ। বসল তার বিছানার উপর। কিন্তু কি বলবে সে! অভিভূতের মত তাকাতে লাগল সে তার মায়ের মুখটার দিকে। ভীতি-বিহ্বল স্বরে তার মা বলতে লাগল তাকে,— বুঝেছি, সেই সতী মুখপুড়ি বৌ-টাই তোকে বোধ হয় দেখাচ্ছিল স্বপ্ন। জানি আমি, শ্মশান বাবা ঠিকই বলেছিলেন। মন্ত্রের শক্তিতে তোকে জাগ্রত অবস্থায় না পেলেও ঘুমন্ত অবস্থায় তোকে পেয়ে বসবে। অন্ততঃ শেষবারের মত একবার তোকে দেখা দিতে আসবেই। দেখ্ সাধুবাবার কথা ঠিক কিনা?

ভূতনাথ ভ্যাবলাকান্তের মত তার মায়ের দিকে তাকাতেই বলে উঠলেন তিনি, —কোন ভয় নেই বাবা তোর। শ্মশান বাবার নির্দ্দেশ মত আমি তোর বিছানার তলায় গোটা পান, সুপারি, ঘিঁচি কড়ি, লৌহার পেরেক বাবা যা-যা বলেছিলেন সে সমস্ত গুঁজে রেখেছি। ও সর্ব্বনাশী কোন ক্ষতি করতে পারবে না তোর। কিন্তু বাবা, এবার যে একটা কথা আমার রাখতে হবে। শুনতেই হবে কথাটা আমার।

বলতেই মা, ভূতনাথের মনে পড়ে গেল সতীর সেই কথাগুলো— 'কখনও মা-বাবার তোমার অবাধ্য হয়োনা তুমি। শুনবে তাদের কথা। করবে তাদের শ্রদ্ধা ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্মরণ হতেই মনটা কেমন উতলা হয়ে উঠল ভূতনাথের। না আর সতীর কথা কোন মতেই অমান্য করবে না সে। যত কষ্টই হোক তার। হোক না কেন তার যতই অসুবিধা —অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে সে শাশ্বতীর নির্দ্দেশ। তাই বলে উঠল সে তার মাকে,—

—কি কথা বল? শুনবো।

—এটা শুধু আমার কথাই নয় বাবা। শ্মশান বাবার নির্দেশ। মাথায় ভূতনাথের হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন তার মা বেশ মিনতি করে. —সাধু সন্তের আদেশ মানতে হয় বাবা। পালন করতে হয় তাদের উপদেশ। ওঁরা যা বলেন ভালর জন্যই বলেন। ওঁরা যা করেন তোর আমার মঙ্গলের জন্যই করেন।

—ভণিতা রাখ দেখি মা। চাপা ধমকে বলে উঠল ভূতনাথ, —আগে কথাটাই কি বল না?

—বলছি বাবা বলছি। বলেই ইতস্তত করে বলতে লাগলেন তার মা—বললেই কিন্তু এ কথা রাখতেই হবে তোকে। নইলে সাধু-সন্ন্যাসীর অসম্মান করা হবে।

—বলছি তো রাখবো। বেশ জোরের সঙ্গেই বলে উঠল ভূতনাথ। মা-সারদা আশ্বস্ত হলেও জানেন তো তিনি ছেলের ধাত। তাই ইনিয়ে বিনিয়ে বেশ একটু আড়ষ্টভাবে অনুরোধের স্বরে বলতে লাগলেন তিনি, —শ্মশান বাবার কাছে বড় আশা করে নিয়েছি বাবা তোর জন্য একটা তাবিজ আর এক মাদুলি। বড় আগ্রহ নিয়ে আছি বাবা তোকে এ দুটো পরাবার জন্যে। সাধুবাবার মন্ত্রপূতঃ এই তাবিজ-মাদুলি তোকে কিন্তু ধারণ করতে হবেই বাবা।

শুনেই ভূতনাথের পা থেকে মাথা পর্যন্ত গেল জ্বলে। অন্য সময় হলে সে কি করত কে জানে। কিন্তু সদ্য সতীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিটা তার মনে পড়তেই রাগ-তেজ ঘৃণা তাচ্ছিল্য তার সব গেল বানচাল হয়ে। যত্তসব! বলে একটা ন্যাক্কারজনক কথা তার মুখ থেকে বেরিয়ে ছিল বটে। কিন্তু পরক্ষণেই সে সেটাকে সংযত করে বলে উঠল মাকে তার বিরক্তি ভরা কণ্ঠে,—এটা পরালেই আমাকে সাধ মিটবে তো তোমার? সন্তুষ্ট হবে তো তুমি? পরে আবার একটা অন্যকিছু করতে বলবে-না-তো আমায়?

—না বাবা, আর কখখনও কোন কথা বলতে যাব না তুমি। করতে যাব না আর তোকে কখনও বিরক্ত। অনুরোধ করে হাত দুটো ধরে ভূতনাথকে বলে উঠলেন মা, —শুধু এবারের মত কথাটা আমার রাখ বাবা তুই। কোন অন্যথা করিস না।

গোমড়া মুখে গম্ভীরভাবে বলে উঠল ভূতনাথ—বেশ, এতেই যদি মনে শান্তি হয় তোমার তবে দাও পরিয়ে।

আর যায় কোথা! ছেলের কথায় মা যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন। বলতেই ভূতনাথ বিদ্যুৎগতিতে তিনি বেরিয়ে গেলেন বাইরে অর্থাৎ উঠোনে। সেখানে তুলসী থানে রাখা ছিল তাবিজ মাদুলি। ভক্তিভরে প্রণাম করে সে দুটো নিয়ে সেখান থেকে ত্বরিত গতিতে আবার এসে হাজির হলেন ভূতনাথের কাছে। যত্ন করে পরিয়ে দিলেন সেটা ছেলের দু-বাহু[illegible]।

এগুলো অত্যাচার নয়তো কি? রাগে কিশ্-কিশ্ করতে লাগল ভূতনাথের সর্বাঙ্গ। দাঁতে দাঁত চেপে সে বহু কষ্টে সহ্য করতে লাগল মায়ের দৌরাত্মি। যেগু[illegible]লাকে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা এসব তুক-তাক আজে-বাজে জড়ি-বুটি বুজরুকি দেখলে যার পিত্তি শুদ্ধো জ্বলে যেত তাকেও এসব পরতে হল ঠেকায় পড়ে। মনে হচ্ছিল তার—দিই এগুলো ছিঁড়ে ফেলে গুঁড়ো করে জানালার নীচে ওই খানা-ডোবাটার দিকে ছুঁড়ে। কিন্তু কি করবে সে—সতীর আদেশ। মনে তার আঁচ লাগবে। কষ্ট পাবে সে। তাই মনের রাগটা মনেই চেপে ড্যাব ড্যাব করে মায়ের দিকে তাকিয়ে সইতে হল তাকে তার মায়ের উপদ্রব।

মা ভাবলেন—এসব সেই চণ্ডীতলার শ্মশান-বাবার কৃপা। মন্ত্রের শক্তিতে তিনি তার অবাধ্য ছেলেকে সুবাধ্য করেছেন। নইলে হরিণ শিং এ তার এসব [illegible] কে?

ছেলেকে তাবিজ-মাদুলি পরিয়ে উপর দিকে মুখ করে শ্মশান বাবাকে স্মরণ করে বেশ একটা হাতজোড় করে প্রণাম ঠুকলেন মা। তোমার অপার মহিমা প্রভু, অপার তোমার করুণা। জয় হোক বাবা তোমার। জয় বাবা ভূতনাথ। জয় বাবা মহেশ্বর।

তারপর পরম নিশ্চিন্তে নির্ভয় করবার জন্য ভূতনাথকে বলে উঠলেন তিনি,—আর কোন ভয় নাই বাবা তোর। ও সর্ব্বনাশী আর ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না। মুখপুড়ি আর তোর কেশাগ্র স্পর্শ করতে সাহস করবে না কখনও। এবার তুই একটু শান্ত হয়ে ঘুমো বাবা। রাত আছে এখনও।

কপাট বন্ধ করে চলে গেলেন মা। ভূতনাথ তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। ঘুম তার এলে তো আর।

(এগার)

একি দেখল ভূতনাথ। কি দেখল সে!

নিজের দেহ থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে দেখল সে আবার পৃথক ভাবে। ভিন্ন একটা ব্যক্তির মত সম্পূর্ণ আলাদা রূপে। আশ্চর্য্য! মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বা ও তার জড় দেহ তাহলে কি আলাদা? স্থূল-শরীর পরিত্যাগ করে তাহলে কি সত্যি আসতে পারে সে একটা পৃথক অস্তিত্বে। এসে আবার ফিরে যেতে পারে সে তার জৈবিক দেহটাতে। স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে সত্যিই সে কি আসা-যাওয়া করতে পারে ঘড়ির দোলকের মত। অসম্ভব। এ কখনও হতে পারে না। হতে যদি না পারে তাহলে দেখল সে কি?

স্বপ্ন। স্বপ্নে অবশ্য মানুষের অবচেতন মনে জমে থাকা নানা চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা চেতন স্তরে ভেসে উঠে মাঝে-মধ্যে। ভেসে উঠে সচেতন মনটা যখন থাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়। তন্দ্রাঘোরে মানব মনের অতল তলে তলিয়ে থাকা নানা অবাস্তব কামনা, অলীক বাসনা, গোপন ইচ্ছা, অসামাজিক ভোগ লালসা, যেগুলো পূরণ হওয়া সম্ভব নয় কখনও সেগুলো আবির্ভূত হয় ক্বচিত কেমনও। ঘুমন্ত চেতন মনটার উপর স্তরে ভেসে উঠে তারা বাস্তব রূপ ধরে। রূপটা তেমন ধরতে না পারলেও সাধটা তাদের পূরণ করবার জন্য নানাভাবে করে খেলা। বাস্তবে তার সতীকে পাওয়ার অলীক কল্পনা ঘুমঘোরে তাই এসেছিল তার চিত্ররূপ ধরে। মৃত্যুর কারণ চিন্তাটা তার বহিরিন্দ্রিয়গুলোর তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার সুযোগ নিয়ে করে গেল অভিনয়। মনটা রইল তার নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে।

আবার ভাবতে লাগল ভূতনাথ। অনেকে বলে ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের সূক্ষ্মসত্ত্বা নাকি খেলায় মাতে। কিন্তু খেলতে তো একজন সঙ্গী চাই। সে তখন কল্পনা দিয়েই তৈরী করে নেয় একটা সঙ্গী। কিন্তু সঙ্গী পেলেও তো শুধু হয় না। খেলার একটা বিষয় চাই। বিষয়টা নাকি যে চিন্তা করতে করতে ঘুমোয় মানুষ সেই চিন্তাটাই গ্রহণ করে নেয় তার সূক্ষ্ম সত্ত্বা। বাবার মন্দির দাওয়ায় সতীর মৃত্যু চিন্তায় তন্দ্রাজড়ানো অবস্থায় তাহলে সে দেখেছিল যা তা ছিল তার সূক্ষ্ম সত্ত্বার নিছক একটা খেলা মাত্র। অভিনয়। অভিনয় কখনও সত্য নয়। সত্য নয় কখনও স্বপ্নের দৃশ্য বা ঘটনা। অলীক সব। অবাস্তব।

কিন্তু তাই বা বলবে কি করে ভূতনাথ। শুনল যা সে সতীর কথা, তার মুখ থেকে নিঃসৃত হল যে সমস্ত বানী তা তো কখনও মিথ্যা হতে পারে না। মিথ্যা হতে পারে না এ সব যুগ-যুগান্ত থেকে চলে আসা মুনি-ঋষিদের উপদেশ। এসব উপদেশ সুধা মুষলধারে বর্ষণ করে সতী যে তার ধুয়ে মুছে দিতে চাইল মনের কালিমা, অন্তরের মালিন্য তা তো মিথ্যা হতে পারে না। মিথ্যা হতে পারে না তার কথার মাধ্যমে তাকে একজন চরিত্রবান, শুদ্ধহৃদয় সম্পন্ন পবিত্রমনা মানবে পরিণত করার চেষ্টা। এসব সনাতন, শাশ্বত চিরসত্য জীবন গঠনের বানী যে শোনাতে পারে সে সতী কখনও মিথ্যা হতে পারে না। পারে না সে অলীক আলেয়া অবাস্তব কল্পনা হতে।

ভূতনাথ পড়ল মহামুস্কিলে। সত্য মিথ্যার দোলায় পড়ে মনটা তার করতে লাগল ছটফট্। অন্তর হল চিন্তান্বিত। চিরচঞ্চল অস্থির প্রকৃতিটা কেমন যেন এক ভাবমগ্নতায় হয়ে রইল বিভোর। ছেলের ধীর শান্ত সুশীল স্বভাব দেখে মা ভাবলেন এ নিশ্চয়ই সেই শ্মশান বাবার তাবিজ-মাদুলীর গুণ। শ্মশান বাবাই কৃপা করে তাড়িয়েছেন ভূতনাথের ঘাড়ে চেপে থাকা ভূত। সে ভূতটাই বোধহয় লেগেছে গিয়ে এবার রাখহরি চাটুজ্জের ঘরে। পেয়ে বসেছে মায়াকে। ভর করে তার মাথায়, বলাচ্ছে তাকে এমন সব কথা যাতে তার মা গেছে থমকে, বাপ গেছে চমকে। বলে কি না দিদিকে তার মা-ই মেরেছে নিজের হাতে। আত্মহত্যা করেনি সে। মা-ই তাকে মনুই-এর সঙ্গে বিষ মিশিয়ে সরিয়ে দিয়েছে তাকে জীবন থেকে। আত্মহত্যা তার দিদির নামে রটান মিথ্যা অপবাদ। বাবাঃ! কি সাংঘাতিক কথা!

ভূতে ভর করলে এমন আবলি বলায়। আত্মপর, গুরুজন, ভালমন্দ, লোক-নিন্দা, বিচার-ভাবনা না করিয়ে এমন অবিশ্বাস্য অসম্ভব অকথা-কুকথা বলিয়ে বেড়ায়। যে যেমন ভূত তার তেমন মনোভাব বা স্বভাব-প্রকৃতিই তো ব্যক্ত হয় ভরগ্রস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে। মরুক গে যাক। আত্মহত্যাই করুক সে, বিষ খাইয়েই মারুক তাতে বয়ে গেছে মা সারদার। কে কার ছাগল মাথার দিকে কাটবে না পিছন দিকে কাটবে তা নিয়ে মাথা

ঘামাবার কি দরকার তার? ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেছে। বৌ মরেছে চুকে গেছে তার সে বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ। ফিরে আর জোড়া লাগান তো দুরের কথা চাটুজ্জে পাড়ার বাতাস বাডুজ্জে পাড়ার দিকে আসতে পর্য্যন্ত দিবে না সারদা। ধনুকভাঙ্গা পন তার।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন মায়া এসে হাজির হল তার ঘরে। ভূত পাওয়া বা তেমন পাগলামি বলে মনে হল না তাকে সারদার। সেই আগের মতই বড় মা বলে ছোট মেয়েটির মত কাছে এসে দাঁড়াল তার। বসল তার সামনে। অনেক দিনের অনেক কিছু মায়ার সম্বন্ধে বলার জমা ছিল সারদার মনে। বিশেষ করে তাদের ঘরে পেয়ে ভূতনাথকে তার অপমান করা, কুকুর তাড়া করে ঘর থেকে তাকে বের করে দেওয়া। সব ঝালগুলো এক সঙ্গে ঝাড়বার জন্য রি-রি করে উঠল সারদার মনটা। কিন্তু পারল না। কোন কিছু বলার আগেই মেয়েটা এমনভাবে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল যে আপনা থেকেই মুখটা বন্ধ হয়ে গেল তার। বলবার আর দরকারও হল না সারদার। কারণ যে কথাগুলো রেগে শোনাবার ইচ্ছে ছিল তাকে সেই কথাগুলোই মায়া বলতে আরম্ভ করল কাঁদতে কাঁদতে। —ভূতুদাকে আমি ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলাম বড় মা, অন্যায় ভাবে মনে আঘাত দিয়েছিলাম তাকে, বিনাদোষে অপরাধি করে ভূতুদাকে প্রাণে দিয়েছিলাম কষ্ট। অপরাধের আমার সীমা নেই বড় মা, দোষের নাই শেষ। কিন্তু তুমি তো মা, তুমি আমায় ক্ষমা কর বড় মা। একবার অন্তত বল মুখে তুমি আমায় মাফ করলে।

মায়ার কাণ্ড দেখে বড় মা তো অবাক! সত্যি মায়ার মাথা-টাথা খারাপ হল নাকি। পায়ের সামনে মাথা ঠুকে তার এমন হা-হুতাস করতে লাগল সে যে কোথায় গেল সারদার তাকে রাগ দেখানো আর কোথায় গেল তার ঝাল-ঝাড়া। দূব দূর কবে তাড়িয়ে দেবে কি মাথাটা ধরে বুকের কাছে নিলেন টেনে। বলতে লাগলেন তাকে স্নেহের ধমকে, —কি ছেলেমানুষী করছিস তুই? আমি কি তোকে কিছু বলেছি না ভূতনাথ তোকে কিছু বলেছে?

—তোমাদের কিছু না বলার আঘাতটাই যে আমাকে বড় বেশী লেগেছে বড়-মা। ধমক দিলে গাল-মন্দ করলে যে আমি ধন্য হতাম বড় মা। তোমার শাসন পেলে মার-ধর খেলেও যে সার্থক হত আমার জীবন। দুর্ভাগ্য আমার যে সে সব কপালে আমার জুটল না। কিন্তু এ জীবনে শুধু তোমার ক্ষমাটুকু নিয়ে যেতে দাও। নইলে মরেও যে আমি শান্তি পাব না বড় মা।

—কি সব অবান্তর, কথা বলছিস? ধমকে উঠলেন বড় মা, কি হয়েছে তোর? মা বাবার সঙ্গে কি গণ্ডগোল করে এসেছিস? আমার বাড়িতে বাপু ঝামেলা করতে আসিস না তুই, বাড়ী যা।

—আর কোনদিন আমি ঝামেলা করতে আসব না বড়মা? বলে উঠল মায়া,—এই শেষবার। মা-বাবার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই আমার। মুখ নেই আমার ভূতুদা'র কাছে শেষবারের মতও ক্ষমা চাইবার। তুমি আমার মা-বাবার বহু উর্ধ্বে বড়-মা। তোমার স্নেহ ভালবাসা, আশীর্বাদ জীবনে আমি বহুবার পেয়েছি। এবার শুধু প্রয়োজন আমার ক্ষমার। আমার সব অপরাধ মাফ করে দাও তুমি।

—বেশ, তাই না হয় হল। বলে উঠলেন বড় মা, —তোর কোন কিছুতেই আর কিছু মনে করব না আমি। এবার মাথা ঠাণ্ডা করে বাড়ী যা। ভূতু আবার এসে পড়লে তোকে এ অবস্থায় দেখে নানা প্রশ্ন করবে আমাকে। কৈফিয়ৎ দিতে দিতে দম বেরিয়ে যাবে আমার। যা এবার তুই।

কিন্তু ও বাবাঃ। যাবে কি মেয়ে, ভূতনাথ নেই শুনেও ভূতনাথের ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল সে। অবিশ্বাস তাকে? মিথ্যাবাদী সে? মুহূর্তে মেজাজটা ঘরে উঠল সারদার। এমনিতে সে শান্ত হলেও তার স্বভাবটাই এই। কেউ তাকে সন্দেহ অবিশ্বাস করলে মাথায় আগুন জ্বলে তার। সে আগুনে ঘি ঢেলে দিল মায়া। ভূতনাথের ঘরের দরজায় গিয়ে করল সে আবার একটা প্রণাম। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সারদা। ধমকে উঠল তাকে,—দেখ মায়া ঢেমনামি করিস না। ভেবেছিলি আমি মিথ্যা কথা বলছি। এখন সত্যি ভূতু ঘরে নেই দেখে গরু মেরে জুতো দান। প্রণাম করার ছল কবে বোকা বানাচ্ছিস আমাকে? দূর হ' বলছি। বেরিয়ে যা আমার ঘর থেকে।

মায়া তো অবাক! —আমি তোমায় অবিশ্বাস করিনি বড় মা।

—আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকাতে হবে না। খবরদার! আর আমার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবি না তুই। এই মুহূর্ত্তে তুই দূর হয়ে যা আমাদের ত্রিসীমানা থেকে। কোনদিন যদি এ বাড়ীতে মুখ দেখি তোর—

—এ কি বলছো বড়-মা তুমি? বলে উঠল মায়া, —আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

—তা বুঝবি কেন! রেগে বলে উঠলেন বড়-মা,—বোঝাতে আর কি বাকী রেখেছিস তুই গায়ের লোককে? সেদিনে দুপুরে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে ভূতনাথের সঙ্গে শলা-পরামর্শ, আজ আবার এখানে ঘরে তার সঙ্গে গুজুর-ফুসুর করতে আসা। বুড়ো-ধাঙড়ি মেয়ে হয়ে লজ্জা করে না তোর? মায়া-কান্নার ঢঙ্ দেখিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখে ভূতনাথের মাথা খাবার মতলব করেছিস তুই? ভেবেছিস, ভূতনাথের নামে কলঙ্ক রটিয়ে তাকে কব্জা করে করবি বিয়ে? ধাষ্টামু করার আর জায়গা পাসনি?

—বড় মা, দোহাই তোমার, ব্যাকুলভাবে নিবেদন করে উঠল মায়া, —এমন কথা বলো না তুমি। বলো না তুমি ওভাবে আমাকে।

—বলবো না মানে? গর্জে উঠলেন বড় মা, —তোদের বাসুকি চাল আমি ধরতে পারি না মনে করেছিস? এসব কুমতলব তোদের ডেকে-হেঁকে সকলকে বলে বেড়াবি। এক বিটিকে বাপ তোর ষোল আনা ডেকে কায়দা করে বিয়ে করতে বাধ্য করেছিল। এখন তোকে আবার অন্য চালে ভূতনাথের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার ধরেছে ফন্দি। এতদিনে তাই সুর পাল্টিয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার ফিকিরে পাঠিয়েছে তোকে। ভেবেছিস কি তোরা? আমার ভূতনাথ কি এতই ফেলনা! তোকে লেলিয়ে দিলেই ভূতনাথকে ওমনি ফকটে আবার জামাই করে নেবে তোর বাপ-মা। সে গুড়ে বালি। যে থুতু ফেলে এসেছে ভূতনাথ তোদের ঘরে সে থুতু আর ঘুরে চাটতে যাবে না সে।

সে কি তেজ বড়মার! মুহূর্তে চেহারাটাই যেন পাল্টে গেল তার। চোখ দিয়ে বেরুতে লাগল যেন আগুন। মুখ দিয়ে ছুটতে লাগল যেন গোলা। হায় ভগবান! কি বুঝতে তাকে কি বুঝল বড়-মা। সে যে অবিশ্বাস করেনি বড়মাকে। মিথ্যাবাদী ঠাওরে তাকে দেখতে আসেনি সে ভূতুদাকে তার ঘরে। কোনো চাল-চরিত্রি, ফন্দি-ফিকির, কুমতলব নেই তার অন্তরে। কোনদিন সে কুমন নিয়ে আসেনি এ বাড়ীতে। আজ জীবনের শেষ দিন তার। সঙ্কল্প করেছে যখন তখন রাত্রে আজ সে ঘুমের বড়ি খেয়ে করবেই আত্মহত্যা। দিদি-হত্যার প্রতিশোধ নেবে সে এভাবে তার মায়ের উপর। তাই শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে সে এ বাড়ীটাকে। নিবেদন করতে এসেছে সে ভূতুদা'কে জীবনেব তার শেষ প্রণাম। কিন্তু উল্টা বুঝলি রাম! এ অন্তিম ইচ্ছাটা তার বলবে সে কি করে বড়মাকে? এসব কথা বলা যায় না, জানানো যায় না কাকেও। তাই এক মুহূর্তও আর অনল-বর্ষি মায়ের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না মায়া। কান্না চেপে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

মেয়ে মানুষের পেটে কথা থাকে না। তাই ব্যাপারটা সারদা জানাল ভূতনাথকে রাত্রে বেলায়। খাবার পর। জানাল অন্য রকমভাবে। মায়ার স্বভাব-চরিত্র খারাপ। তার গতিবিধি কুমতলবে ভরা। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে তার সঙ্গে। সুতরাং ভূতনাথের একটু সাবধানে থাকা উচিত। তার সঙ্গে মেলা-মেশা কথাবার্তা তো দূরের কথা তার কোন ব্যাপারেই যেন নাক না গলায় সে। চাটুজ্জে পাড়ায় মায়ার সঙ্গে তাকে নিয়ে রটেছে নানা কুৎসা-কেলেঙ্কারি। বাড়ুজ্জে পাড়ায় সেই নিয়ে তার সম্বন্ধে চলছে নানা কানা-ঘুষা। ওই নষ্টা মেয়েটা গাঁয়ের ছোকরাদের সঙ্গে মিশে বেড়ায়। তাদের নাকে দড়ি বেঁধে উঠায়-বসায়। এধার-উধার ঘুরায়। তার সঙ্গে মায়ার ভৈরবতলার ঘটনা নিয়ে একটা চাপা আক্রোশ সৃষ্টি হয়েছে ওই সব ছেলে-ছোকরাদের মনে। ধূমায়িত হতে চলেছে প্রতিহিংসার আগুন। কল-কাঠি নেড়ে মায়া কাকে যে কখন তার উপর লেলিয়ে দেবে ঠিক নেই। সুতরাং মায়ার সম্বন্ধে সচেতন থাকাই শুধু নয় ওই চাটুজ্জে পাড়ার কোন বাতাস যেন সে না লাগায় গায়ে।

ব্যোম ভোলানাথ ভূতনাথ। সে মায়ের কথা আদৌ শুনল কিনা কে জানে। শুনলেও সে এক কানে নিয়ে আর এক কানে বের করে দিল কিনা তারই বা ঠিক কি। আর তা না বের করলেও কি বুঝতে সে কি বুঝল তাই বা কে বলতে পারে। তবে মায়ার কথা কানে ঢুকল যখন তখন মায়ের সম্বন্ধে চিন্তা করতে আরম্ভ করল সে। চিন্তা করতে করতে শুয়ে পড়ল সে বিছানায়। শুতে শুতে এল তার চোখ জড়িয়ে ঘুম। ঘুমের মধ্যে মায়া এল স্বপ্নে তার! সে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন!

কোথায়, কোনখানে কোন দিকে যে ছুটে চলেছে মায়া কে জানে। আলুথালু বেশে, এলোমেলো চুলে ছুটে

চলেছে সে উর্দ্ধশ্বাসে। প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছে সে চিৎকার করতে করতে,—ভূতুদা, বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে, আমাকে বাঁচাও ভূতুদা। পিছনে তার অদ্ভুত দর্শন কিম্ভুতকিমাকার কুৎসিত কদর্য্য চেহারার কতকগুলো মানুষ। কেউ শেয়াল মুখো, কেও কুকুর মুখো। কারো মুখটা বা বানরের মত। মানুষ নয় ওগুলো। ওগুলো ভূত-প্রেত, পিশাচ-পিশাচিনী। নইলে ওমনি দাঁত বের করা, হাড় হাত ওয়ালা, চোখ ঠিক্‌রে বেরুনো বিশ্রী-কদাকার চেহারা হয় তাদের। তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা মায়াকে কেও ব্যাঙের মত লাফিয়ে, কেও বানরের মত ঝাঁপিয়ে, কেও শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে। প্রাণপণে ছুটছে মায়া। ছুটছে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। মুখে তার আর্ত্তচিৎকার,—বাঁচাও ভূতুদা, বাঁচাও আমাকে, সে চিৎকার ঢেকে যাচ্ছে প্রেতগুলোর হুহু হা হা ও পেত্নীগুলোর হিল-হিল খিল-খিল' বিকট কর্কশ হাসিতে। হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটছে মায়া। তেড়ে যাচ্ছে ভূতগুলো তাকে হাত বাড়িয়ে ধরার জন্য।

ধরতে পেলে কিন্তু নিস্তার নেই মায়ার। ছিঁড়ে খুঁড়ে, খাবলে খাবলে খেয়ে মনে হয় শেষ করে দেবে তাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে। আর স্থির থাকতে পারল না ভূতনাথ। জীবন-মরণ পণ করে সে ছুটলো সেই প্রেতগুলোর পিছু পিছু। যেমন করেও হোক মায়াকে রক্ষা করতেই হবে তাকে। ছুটতে ছুটতে মনে হল তার সামনে তাদের শালী নদীর শ্মশান। সেই শ্মশান-ঘাটের বটগাছের তলায় মস্ত একটা কুঁয়ো। মায়া ছুটে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গেল সেই কুয়োটাতে। ওমনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলো তাকে তেড়ে আসা ভূত প্রেতগুলো। কুয়োটাকে ঘিরে তারা শুরু করল নাচতে। সে এক উদ্ভট নাচ তাদের। যেমনি উৎকট চিৎকার তেমনি তাদের দুষ্ট ঘোড়ার মত উদ্দাম নাচের ভঙ্গী। ভিতর থেকে আসতে লাগল মায়ার কাতর কণ্ঠস্বর—বাঁচাও ভূতুদা, বাঁচাও আমাকে। মারা যাচ্ছি আমি। উদ্ধার কর আমাকে।

মায়ার মরণ চিৎকার শুনে প্রেতগুলোর সে কি আনন্দোচ্ছাস! কুঁয়োটার কাছে এসে উঁকি মারতেই দেখল ভূতনাথ মায়া তখনও যায়নি সম্পূর্ণ পড়ে। সরু একটা বটের ঝুরি ধরে ঝুলছে সে আসমানে। আর করুণ ভাবে তাকিয়ে তার মুখটার দিকে ব্যাকুল স্বরে প্রার্থনা করে চলেছে সে তাকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু কুঁয়োটার আরো ভিতরকার দৃশ্য দেখে চক্ষু স্থির হয়ে গেল ভূতনাথের। ঘুরে গেল মাথাটা। দেখল মস্ত বড় বড় কুমীর তাকে খাবার জন্য হাঁ করে আছে। যেন হাঁ করারই প্রতিযোগিতা চলেছে তাদের পরস্পরের মধ্যে। দাঁত বের করে ওৎ পেতে আছে তারা মায়ার পড়ার অপেক্ষায়। ঝুলন্ত খাবারটা একবার তাদের মুখে পড়লে হয়। ছিঁড়ে কামড়ে সঙ্গে সঙ্গে গলাধঃকরণ করবে তারা। মাঝে মাঝে আনন্দে কুঁয়োর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে তারা। আবার ঝুলন্ত মায়ার আশায় লালা-ঝরা মুখে ঢেঁকির মত দাঁত বের করে হা করছে তারা উপরের দিকে। কি সাংঘাতিক! কি ভয়ানক! দেখে গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল ভূতনাথের।

কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে গেলে তো চলবে না। যেমন করেও হোক উদ্ধার করতে হবেই মায়াকে। তাই নিজের সম্বন্ধে আগু-পিছু চিন্তা না করে ভূতনাথ কুঁয়োর ভিতর বাড়িয়ে দিল হাতটা মায়াকে ধরবার জন্য। ওমনি চারপাশ থেকে সেই ভূত-প্রেতগুলো থমকে দাঁড়িয়ে ধমকে উঠল তাকে, —খবরদার!

যেন বজ্রাঘাত হল হঠাৎ। বজ্রকণ্ঠে বলে উঠল তারা, খবরদার বলছি। মরতে যাচ্ছে যে তাকে মরতে দে। আমরা ওকে সঙ্গী করে মৌজ উড়াব। মজা লুট্‌বো। পালিয়ে যা তুই।

ভূতনাথ শুনলো না তাদের কথা। তোয়াক্কাই করল না তাদের। বাড়িয়ে দিয়ে হাতটা বলে উঠল সে মায়াকে—ধর তুই শক্ত করে আমার হাতটা। তুলছি আমি টেনে।

"—সাবধান!" গুরু গম্ভীর মানুষের গলায় বলে উঠল সেই নীচের কুমীরগুলো, —সাবধান বলছি! নিস না আমাদের মুখের আহার কেড়ে। সব্বনাশ হবে তোর। মরতে হবে তোকে।

—হোক। কোত্থেকে একটা সাহস এসে ধমকের আকারে হঠাৎ বেরিয়ে গেল ভূতনাথের মুখ থেকে। কুঁয়োর ভিতর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল তার কণ্ঠস্বর—সাবধান হ তোরা। আমি বেঁচে থাকতে মায়াকে নিবি এত বড় হিম্মত তোদের। শক্ত করে ধরতো তুই মায়া আমার হাত। ওরা যেমন ভূত আমিও তেমনি ভূতনাথ। দেখি কার কত ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় তোকে আমার হাত থেকে।

ভূতনাথের জেদ সৃষ্টিছাড়া। ঝোঁক চাপলে মাথায় একবার কার বাপের সাধ্যি প্রতিরোধ করে তাকে? হাত

বাড়ালে কোন কাজে সে হাত কখনও গুটোয় সে? মায়া ধরতে না পারলেও সে ধরল হাতটা তার। টানতে লাগল তাকে কুয়োর মধ্য থেকে হিড় হিড় করে।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল ভূতনাথের। কোথায় মায়া আর মাথায় সেই ভূত-প্রেত ঘেরা নীচে কুমীর ভর্ত্তি কুঁয়োটা। একলা ঘরে বিছানার উপর শুয়ে আছে সে। চারধারে তখন মধ্যরাত্রির ষোল-আনা রাজত্ব। গভীর ঘুমে অচেতন সবাই। নিস্তব্ধ নিঝুম প্রকৃতি।

অবাক কিন্তু স্বপ্নটা তার। স্বপ্ন হলেও দেহের মধ্যে স্বপ্নের প্রতিক্রিয়াটা ভূতনাথের তখনও কিন্তু পুরোমাত্রায় রইল বর্তমান। গা-টা তার ঘামে জপ-থপে। শিরায় শিরায় রক্ত তখন ছুটছে বিদ্যুৎগতিতে। শরীরে কম্পন, বুকে ধড়-ফড়ানি, চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ। আর সেই মায়ার চিৎকার—ভূতুদা, বাঁচাও, বাঁচাও ভূতুদা, ভূতুদা বাঁচাও আমাকে। কানের কাছে এখনও যেন বাজতে লাগল তার। আশ্চর্য্য!

উঠল ভূতনাথ। উঠে গেল টেবিলের পাশে। সেখানে ঢাকা দেওয়া গ্লাসের জলটা ঢক ঢক করে পান করল সে সবটাই। পায়চারি করতে লাগল মেঝের উপর। চেষ্টা করল একটু প্রকৃতিস্থ হবার। তারপর আবার বসলো সে বিছানায়। ভাবতে লাগল স্বপ্নের কথাটাই। হঠাৎ কানে এল সেই স্বপ্নের চিৎকারটাই, বাঁচাও ভূতুদা, ভূতুদা বাঁচাও...। মায়ার সেই আর্ত্ত কণ্ঠস্বর।

চমকে উঠল ভূতনাথ! খাড়া করল তার কান দুটোকে। শুনতে লাগল বেশ অভিনিবেশ সহকারে। একবার নয়—বার বার। একভাবে নয় বিভিন্নভাবে। একি! এতো তার শ্রুতি-বিভ্রম নয়। নয় এ তার কোন বুদ্ধি-ভ্রান্তি বা স্মৃতি-ভ্রংশ। নেই সে ঘুমের ঘোরে বা স্বপ্নের আমেজ। সম্পূর্ণ সচেতন সে। হুবহু, অবিকল সেই মায়ার চিৎকার, ভূতুদা বাঁচাও, বাঁচাও ভূতুদা।

হঠাৎ মনে হল তার—একথা মায়ার হ েও স্বরটা কিন্তু সতীর। এ গলা সতীর গলা। সতীই ডাকছে তাকে, —বাঁচাও ভূতুদা, ভূতুদা বাঁচাও।

অস্থির হয়ে উঠল ভূতনাথ। স্বরটাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেল সে বাইরে। কিন্তু না। বাইরেও তো কেও নেই। দেখতে কাকেও না পেলেও স্বরটা কিন্তু তেমনি আসতে লাগল তার কানে। কান পাততেই মনে হল তার বাইরে কোথাও নয়। আসছে ডাকটা গ্রামের মাথা থেকে। যেখান থেকেই আসুক, এ ডাক তার সতীর ডাক। নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে সে। নইলে অযথা এমন অসময়ে এতটা রাতে ডাকতো না সে। সুতরাং যেতে তাকে হবেই।

ছুটল ভূতনাথ। রইল পড়ে খোলা ঘরের সদর দরজা। ভাবল না সে নিজের কথা। চিন্তা করল না অগ্র-পশ্চাৎ। দেখল না সে রাত কতটা। অন্ধকারের বুকে সেই স্বরটাকে মাত্র অনুসরণ করে চলতে লাগল সে বিদ্যুৎগতিতে। যাবে না, সতী-ভূতনাথ কি আলাদা। এ স্বর যে তার সতীর স্বর। এযে তার আকুল স্বরে ব্যাকুল করা আহ্বান। এ ডাককে কখনও কি অবহেলা করতে পারে ভূতনাথ। সুতরাং কাক জ্যোৎস্নার অন্ধকারে নির্জন পল্লীর কুলি- গলির পথ ধরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্রুত পদক্ষেপে এসে হাজির হল সে গ্রামের মাথায় মন্দির প্রাঙ্গনে।

এসে দেখল, যা ভেবেছিল তাই। বাবা ভূতনাথের মন্দির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ব্যাকুল ভাবে ডাকছে সতী তাকে, —বাঁচাও ভূতুদা, বাঁচাও তুমি।

হন্তদন্ত হয়ে কাছে ছুটে এল ভূতনাথ। দেখল সতীর নেই সেই সৌম্য-শান্ত চেহারা, মুখে মিষ্টি হাসি নেই তার। অস্থির চঞ্চল সে। চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ। উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ, —কি হয়েছে সতী? এমনভাবে ডাকছিস কেন তুই!

ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল সতী,- -তুমি যা দেখলে তা মিথ্যা নয় ভূতুদা। নয় তোমার ওটা অলীক অবাস্তব স্বপ্ন। সত্যি মায়ার আজ মস্ত বড় বিপদ। সাংঘাতিক একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে তার জীবনে। তুমি তাকে উদ্ধার কর গিয়ে ভূতুদা। বাঁচাও গিয়ে তাকে।

যা বাবা! যার পর নাই বিস্মিত হল ভূতনাথ! সে যে স্বপ্ন দেখছিল সতী জানল কি করে! আর ওই অদ্ভুত অসম্ভব স্বপ্নটা তার সত্যিই বা হতে যাবে কেন! সন্দেহ অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান হতে লাগল তার চিত্তটা।

বোধহয় ভাবটা মনের তার জানতে পারল সতী। তাই বলে উঠল সে,—সংযম ও পবিত্রতায় উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে তোমার মনটা। তাই মায়ার চিন্তায় তোমার সেই মানসিক শক্তির ফলে তার সম্ভাবনাময় নিকট ভবিষ্যৎটা প্রত্যক্ষ হয়েছে তোমার সামনে। বিশেষ এক অনুভূতির স্তরে তোমার ভেসে উঠেছে তার ভাবী ছবি। এ দেখা তোমার মিথ্যা নয় ভূতুদা। তুমি তোমার সূক্ষ্ম সত্তায় যা দেখলে যা শুনলে তা সত্যি। স্বপ্ন নয়—মিথ্যা নয় এতটুকু।

তবু ভূতনাথের সন্দেহ গেল না। বলে উঠল সে, —বেশ যা দেখলাম, যা শুনলাম ওটা না হয় সত্যি হল। কিন্তু যা এখন দেখছি, যা শুনছি? এই যে আমার ছুটে আসা, তোর কথা শোনা, তোকে দেখা এটা মিথ্যা নয়তো? নয়তো এটা আমার স্বপ্ন?

বলার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা আশ্চর্য্য রকমের কাণ্ড করে বসল সতী। সিঁড়ি বেয়ে নেমেই ধরল ভূতনাথের হাতটা। টেনে তাকে তুলল এনে মন্দিরের দাওয়ায়। বলল তাকে ব্যাকুলভাবে—এতেও অবিশ্বাস করবে তুমি? তবু তোমার সন্দেহ না যায় যদি বেশ তো, তুমিই না হয় ধর আমাকে। ছুঁয়ে দেখ আমার মুখ, টেনে দেখ আমার চুল। জানি আমি সন্দেহ তোমার হবে আমাকে। তাই তো সূক্ষ্ম জড়কণাগুলোকে আহরণ করে সত্তাটাকে আমার তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করেছি। তুমি তোমার ওই পার্থিব ইন্দ্রিয় দিয়ে পরখ করে দেখতে পার ভূতুদা আমার এই জড়ীকরণ রূপটাকে।

সত্যিই ভূতনাথ ছুঁয়ে নেড়ে দেখতে লাগল সতীর অবয়াটাকে' এমন কি এই মুহূর্ত্তে সে নিজেও সত্য কিনা, স্বপ্ন কিনা নিজের দেহেই এধার ওধার চিমটি কেটে দেখতে লাগল সে নিজেকে। ভূতনাথকে দুহাতে ধরে ঝাঁকরা দিয়ে বলে উঠল সতী,—আমি তোমার স্বপ্ন কোন-দিন হতে পারি না ভূতুদা। তুমিও হতে পার না কোন দিন আমার কাছে মিথ্যা বা মায়া। শাশ্বত সতী তোমার ধাপ্পা দিতে পারে না কোন-দিন তোমাকে। তুমি বিশ্বাস কর ভূতুদা। শোন আমার কথা।

—কি কথা বল।

—এক্ষুনি ছুটে যাও তুমি মায়ার কাছে। ঘরে অর্গল বন্ধ করে বসে আছে সে। যেমন করেই হোক অর্গল ভেঙ্গে, জোর করে ঢুকবে গিয়ে তুমি তার ঘরে।

—কিন্তু কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ,—কি হয়েছে তার? ব্যাপার কি?

—সে তোমাকে তার মন্দিরে দেওয়া প্রতিশ্রুতি, তোমার বদলে তার মায়ের উপর প্রতিশোধ নেওয়া, পালন করতে যাচ্ছে আজ।

—তাই নাকি? অবাক হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ—কিন্তু এমন তো কথা ছিল না তার। সত্যিই তার মা দোষী কি না, সত্যিই তোকে বিষ খাওইয়ে মেরেছে কি না —এসব কথা তো যাচাই করে আগে আমাকে জানানোর কথা ছিল তার। তারপর প্রতিশোধের ব্যাপার।

গম্ভীর হয়ে বলে উঠল সতী,—জানি আমি, এসব নানা ঘটনা ঘটবে ভূতুদা। তাই মৃত্যুর কারণটা আমার কিছুতেই আমি বলতে চাইনি তোমাকে। কিন্তু এমন তোমার মানসিক শক্তি যে মনটাকে টেনে আমার জেনে নিলে সব। কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকবে কি—সেটা আবার বলতে গেলে মায়াকে। মায়াও সেই তোমার মত জেদী মেয়ে। তোমার কাছ থেকে শোনার পর মা-বাবার সঙ্গে দিনের পর দিন গণ্ডগোল ঝগড়া করে গেছে সে। আসল সত্য জেনেছে সে গতকাল। জেনেছে নানা কাণ্ড করে। মাকে তার বাপের দিব্যি, নিজের দিব্যি, চৌদ্দপুরুষের দিব্যি দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বাবা ভূতনাথের মন্দিরে টেনে এনে তাকে বাধ্য করিয়েছে বলাতে তার মুখ দিয়েই আমার মৃত্যুর আসল ঘটনাটা।

—কিন্তু—

জানাতে তোমাকে পারে নি ভূতুদা তোমার কথাই চিন্তা করে। বলে উঠল সতী—যা কুৎসা রটেছে ভূতুদা তোমার-মায়ার নামে, ছড়িয়েছে যা মন্দিরে সেদিন তোমার-মায়ার দেখা-সাক্ষাৎ নিয়ে সমস্ত গ্রামে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি—দেখা করলে তোমার সঙ্গে পাছে আরো মিথ্যা কলঙ্কের আঘাত সইতে হয় তোমাকে তাই মায়া আসতে পারেনি তোমার কাছে। জানাতে পারেনি কোন কথা।

—কিন্তু আমি ওসব কেচ্ছা—কেলেঙ্কারি পরোয়া করি না তা তো তুই জানিস। বলে উঠল ভূতনাথ।

—তুমি না করলে কি হবে ভূতুদা। এ নিয়ে ঠারে ঠোরে নানা জনে নানা কথা বলবে তোমাকে। রটাবে নানা মিথ্যা অপবাদ, কুৎসা-কেলেঙ্কারি তা মায়া সইতে পারবে কেন? তবু সে এসেছিল আজ তোমাদের বাড়ী। শেষ দেখা করতে, তোমাদের সঙ্গে। শেষ প্রণাম জানাতে তোমাদের। কিন্তু থাকগে ওসব কথা। সময় নেই এখন। যাও তাড়াতাড়ি তুমি মায়ার কাছে।

—কিন্তু ব্যাপারটা কি, তুই তো এখনো বললি না? জিজ্ঞেস করতেই ভূতনাথ, বলে উঠল সতী,—আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে মায়া।

আত্মহত্যা! চমকে উঠল ভূতনাথ! বলে উঠল সতী,—হ্যাঁ ভূতুদা। মনে করেছে সে এই হবে তার মায়ের উপর নেওয়া উপযুক্ত প্রতিশোধ। কিন্তু জানে না সে কেও কারো কর্ম্মফলের জন্য দায়ী নয়। কেও কারো অপকর্ম্মের শাস্তি, দুষ্কর্মের সাজা গ্রহণও করতে পারে না কখনও। আত্মহত্যা মহাপাপ ভূতুদা। আত্মহত্যা করে ফাঁকি দিয়ে জীবনে কিচ্ছু পাওয়া যায় না। ভোগ থাকতে জীবনকে শেষ করা পরজন্মে শুধু দুঃখ বাড়ানো। অবশিষ্ট দুর্ভোগ তার দশগুণ হয়ে আসে ভূতুদা। আত্মহত্যার সূক্ষ্মসত্তার ব্যভিচারী গতি প্রাপ্ত হয়। আত্মা দীর্ঘকাল মূর্চ্ছিতঅবস্থায় পড়ে থাকে। নিম্নশ্রেণীর প্রেত হয়ে সে কুৎসিত কদর্য্যভাবে কাল কাটায়। তুমি যে আজ কুম্ভী-পাক নরকের দৃশ্য দেখলে ভূতুদা আত্মহত্যায় মায়া ওই নরকে গিয়ে পড়বে। অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তাকে। তুমি মায়াকে এ দুর্ভোগের হাত থেকে বাঁচাও ভূতুদা। এখনও ওই বটগাছটার ঝুরি ধরা ক্ষীণ আশা আছে তার। তুমি তাকে উদ্ধার কর ভূতুদা।

—কিন্তু এ ভাবে সে প্রতিশোধ নিতে যাবে কেন? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ,—যাবে কেন সে এর জন্য আত্মহত্যা করতে?

—এটা ওর মায়ের পাপের ফল ভূতুদা। তার মায়ের পাপই টানছে আজ মেয়েকে তার মহাপাপের দিকে। আমাকে হত্যা করে মা যে তার আমার নামে আত্মহত্যার মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে ছিল সেই মিথ্যা অপবাদই আজ মেয়েকে তার আকর্ষণ করছে সত্য আত্মহত্যার পথে।

—এর থেকে কি উদ্ধার পাবার মায়ার আর কোন উপায় নেই?

—কিছুটা হয়তো ছিল যদি তার গোত্রান্তর হত। বিয়ে রূপ নবজন্মে সে পা বাড়ালে হয়তো তার মায়ের দুষ্কর্ম এতটা প্রবলভাবে তাকে আকর্ষণ করতে পারতো না।

—কিন্তু তুই তো রয়েছিস সতী। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ —তুই কি পারিস না, মায়াকে এই দুষ্কর্মের হাত থেকে রক্ষা করতে?

—না ভূতুদা না। বলে উঠল সতী,—আমি পারছি না, পারছি না কিছুতেই। মাযার স্থূল, বাস্তবঘেষা মনের কাছে আমার সূক্ষ্মশক্তির সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তোমার মত উচ্চমনের সামান্যও যদি অধিকারী হত সে। থাকত যদি তোমার মত সহজ উদার সরল অন্তঃকরণ তাহলে হয়তো আমার সদিচ্ছা স্পর্শ করতে পারত তার অন্তর। মনটাকে যদি সৎ চিন্তায়, সৎ কর্মে, আসীন করার চেষ্টাও করত সে তবুও সত্ত্বা আমার তার লুপ্ত জ্ঞান, সুপ্ত বোধকে সমর্থ হত জাগাতে। তার বিবেককে দিতে পারত নাড়া। কিন্তু হৃদয়টা তার পার্থিব ভোগ-লালসায় মোড়া। বাস্তব কামনা-বাসনা ভরা তার মনটা। স্বভাবটা তার এমন বস্তু-নির্ভর যে আমার ইচ্ছা-তরঙ্গ কোনভাবেই কম্পন সৃষ্টি করতে পারছে না তার হৃদয়ে। আত্মনাশ চিন্তায় সে এমন মগ্ন যে মুহূর্ত্তের জন্যও করছে না সে আমার চিন্তা। তাই কোনভাবেই কোন প্রভাব ফেলতে পারছি না আমি তার উপর। তবে তোমার চিন্তা করছে সে। সেই চিন্তার সূত্র ধরেই শেষ চেষ্টা করেছিলাম আমি। মনে একটু নাড়া দিতে পেরে তার নিয়ে গেছলাম তাকে তোমাদের বাড়ী। ভেবেছিলাম, মায়া যখন স্নেহ-কাঙ্গালী তখন তোমার মায়ের মনে তার উপর স্নেহ সঞ্চয় করলে হয়তো এ পথ থেকে সরে আসতে পারেও সে। সমর্থ হয়েছিলাম প্রথমটায়। কিন্তু মায়ার আত্মহননের সূত্র ধরে কতকগুলো দুষ্ট-প্রেতাত্মা সেখানে হাজির হয়ে, দিল সব বানচাল করে। মায়াব চরিত্রের প্রতি তোমার মায়ের মনের সন্দেহের সুযোগ নিয়ে প্রভাব ফেলল তারা। এই দুর্বলতার পথ ধরেই তারা ঢুকিয়ে দিল তোমার মায়ের মনে মায়ার প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ। বিরূপ হল তোমার মা। মায়া তাই তোমার

ঘরের দরজায় তোমাকে উদ্দেশ্য করে শেষ প্রণাম জানাতে যেতেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তোমার মা। স্নেহের পরিবর্তে আঘাত দিলেন তাকে। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন মায়াকে ঘর থেকে।

—তাই নাকি? বিস্মিতভাবে হঠাৎ বলে উঠল ভূতনাথ।

—এতে তোমার মায়ের কোন দোষ নেই ভূতুদা। বলে উঠল সতী,—অনেক সময় অদৃশ্য আত্মার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে চলে আমাদের মন। পবিত্র মনে, পবিত্র আধারে শুদ্ধ আত্মা যেমন প্রভাবে ফেলতে পারে। অশুদ্ধআধারে অপবিত্র মনে থাকলে তেমনি দুষ্ট-নষ্ট প্রেতাত্মারাও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মায়ার মনে আত্মহননের চিন্তায় আত্মনাশী আত্মহত্যাকারী প্রেতাত্মারা তাকে পেয়ে বসেছে ভূতুদা। কুম্ভীপাক নরকের দিকে ওই যে মায়াকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখলে যাদের তারা হচ্ছে অপমৃত্যু, আত্মহত্যায় মরা প্রেত। নীচুস্তরের অপবিত্র আত্মা। আত্মহত্যা রূপ মহাপাপে ভারাক্রান্ত তাদের সত্তা। ভূস্তর ছাড়িয়ে উপরে উঠার তাদের শক্তিও নেই এবং উর্দ্ধলোকে যাবার তাদের চিন্তাও নেই। মড়াফেলা, ভাগাড়, ছেলে পুঁতো ইত্যাদি কদর্য, অপবিত্র, কুৎসিত জায়গায় কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায় ওরা। মানুষের মনে নীচ-চিন্তা, কদর্য্য কামনার গন্ধ পেলেই ছুটে আসে। তাদের মনে ঢুকে প্রভাব বিস্তার করে। বায়বীয় শরীরে পার্থিব ভোগ লালসা পূরণ করতে পারে না বলে যে অসহ্য মনঃকষ্টের মধ্যে থাকে তারা অনেক সময় তা পূরণ করার জন্য সমমনোভাবাপন্ন মানুষকে মাধ্যম করে। মানুষকে তাই সৎ মনে, পবিত্র হৃদয়ে ভগবদ্‌চিন্তায় থাকতে হয় ভূতুদা। কিন্তু থাকগে ওসব কথা। ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল সতী,—এখন উদ্ধার করতে হবে মায়াকে। আত্মহত্যাকারী ওই ভূত-পেতনীগুলো অনুক্ষণ তাকে আত্মহত্যার প্রেরণা দিয়ে চলেছে। আর কোন চিন্তাই তার আসতে দিচ্ছে না মনে। মায়াকে সঙ্গী করতে তারা বদ্ধপরিকর। দলপুরু করে নরক গুলজার করতেই তাদের আনন্দ। তোমার স্থূলদেহ ছাড়া মায়ার ওই স্থূলমনটার মোড় ফেরাতে আর কেও সমর্থ হবে না ভূতুদা। তুমি বাঁচাও মায়াকে।

—কি করে তা সম্ভব হবে বল? জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ।

—তোমার ভালবাসার ছোঁওয়া পেলে জীবনের প্রতি হতাশাটা ওর কেটে যাবে। পেলে তোমার প্রেমের স্পর্শ তার বড়-মাব অপমানটা সে ভুলে যাবে। জীবনের প্রতি আসক্তি আসবে তার। প্রাণের প্রতি জন্মিবে তার মায়া। আত্মসচেতন হলে সে কোন ভূত-প্রেত তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। মানুষ নিজেকে নিজে উদ্ধার করবার মনস্থ করলে কোন অসৎ প্রভাব, অশুভ শক্তি বাধা দিতে পারে না ভূতুদা। আমি জানি, মায়ার মনে তুমি এ প্রেরণা জাগাতে পারবে ভূতুদা। তাই তোমাকে আমার এখানে ডেকে আনা। যাও তুমি ভূতুদা, দয়া কর মায়াকে। কৃপা পাক তোমার আমার এই অজ্ঞান ছোট বোনটা। তোমার করুণায় এই মহাপাপ থেকে মুক্ত হোক তোমার মায়া। এ উপকারটুকু করে তুমি সতীকে তোমার শান্তিতে থাকতে দাও পরলোকে।

—বেশ। যেন ঝুঁকে উঠল ভূতনাথ,— আমায় কি করতে হবে বল। বল কি ভাবে মায়াকে আমি উদ্ধার করতে সমর্থ হব তার এই বিপদ থেকে।

বলে উঠল সতী—যেমন করেই হোক ঘরে গিয়ে তার খুলবে দরজার কপাট। বালিশের নীচে তার লুকানো আছে বারটা ঘুমের বড়ি। তোমার উপর মায়ার-আমার উভয়ের আমাদের একই আকর্ষণ। সেই আকর্ষণের সূত্র ধরে আমি এখনও ধরে রেখেছি মায়ার মনটাকে। আমার প্রেমের দোলা লেগে এখনও দুলছে তার অন্তর। কিন্তু বেশীক্ষণ আর তাকে এ অবস্থায় রাখতে আমি সমর্থ হব না। ওই দুষ্ট প্রেতাত্মাগুলো বড় বেশী প্রভাব ফেলছে তার মনের উপর। তুমি যাও ভূতুদা। বাবা ভূতনাথ তোমার সহায় হোন।

চলল ভূতনাথ। সতীর মন্ত্র কানে নিয়ে চলল সে বিদ্যুৎ গতিতে। আবছা চাঁদের আলো ভেদ করে বাড়ুজ্জে পাড়ার কুলি ছেড়ে পা বাড়াল সে চাটুজ্জে পাড়ার কুলির দিকে। নিস্তব্ধ পল্লী, নিঝুম প্রকৃতি। ঘুমঘোরে বোধহয় অচেতন সবাই। সচেতন ভূতনাথ এগিয়ে চলল সতীর তাগিদে। লক্ষ্য তার সতীর মনের শান্তি, তার আত্মার স্বস্তি।

গ্রামের ছেলে শুধু নয় ভূতনাথ। গ্রামের জামাই সে। সুতরাং শ্বশুর বাড়ীর গলি-গুঁজি সব নখ— দর্পনে তার। পরিচিত সে এ গাঁয়ের গাছপালা পশুপক্ষী সকলের কাছে। জানে তাকে সব পাড়ারই নেড়ি কুত্তা থেকে আরম্ভ করে ভুলি, ভোলা, খেঁকি, লেজ বেঁড়ে ইত্যাদি সমস্ত কুকুর-কুলই। তাই তাকে দেখে কেও টুঁ-শব্দটি

পর্য্যন্ত করল না। বরং উল্টো পায়ে এসে লুটিয়ে তার চুপিসাড়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে লেজ গুটিয়ে চলে যেতে লাগল সব যে যার কাজে। নির্বিবাদে চাটুজ্জে পাড়ার গলি ধরে ভূতনাথ প্রাচীর টপকিয়ে প্রবেশ করল শ্বশুরালয়ে।

শ্বশুরবাড়ী তখন ঘুমের পুরী। ঘুম ছিল না শুধু মায়ার চোখে। আত্মহত্যার আগে সে একটা চিঠি লিখেছিল তার ভূতুদার উদ্দেশ্যে। এ ছাড়া তো মনের কথা জানাবার আর কোন উপায় ছিল না তার। তাই গভীরভাবে মনোনিবেশ করে লিখেছিল সে,—তুমি শুধু সতীর পতিই ছিলে না ভূতুদা, আমারও দেবতা ছিলে তুমি। কিন্তু জীবনে তোমাকে পাবার আর কোন আশা নেই বলেই এ দেহ ত্যাগ করে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে। স্বপ্ন তোমার সত্য ভূতুদা। সত্যই মা মনুই—এর সঙ্গে বিষ মিশিয়ে মেরে ছিল দিদিকে। দিদির মৃত্যুর জন্য মা-ই প্রকৃত দোষী ভূতুদা। কিন্তু মিথ্যা তোমার উপর দোষারোপ করে মনে তোমার কষ্ট দিয়েছি আমি। দিয়েছি প্রাণে তোমার ব্যথা। আমার এ অপরাধের ক্ষমা নেই ভূতুদা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার যে ব্যাপারটা জানা সত্ত্বেও পূর্বকথামত তোমাকে বলে যেতে পারলাম না। এ ক্রটিটাও আমার রয়ে গেল ভূতুদা। দিদির কাছে চললাম আমি। এ ছাড়া মায়ের উপর চরম প্রতিশোধ নেওয়ার আর অন্য কোন উপায় নেই আমার। তোমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলাম বলে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে আশীর্বাদ করবে ভূতুদা। খুশি হবে তুমি।

ভাবছিল আর লিখছিল মায়া। লিখছিল আর ভাবছিল সে। ভাবছিল তার মৃত্যুর পরের দৃশ্যটা। ঘুমের বড়ি খেয়ে যখন চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে থাকবে তার দেহটা তখন কি হবে? খবর শুনে আসবে ছুটে হয়ত তার ভূতুদা। দেখবে তার চিঠি। পড়বে সেটা। তারপর?

হঠাৎ দরজায় তার কড়া নাড়ার শব্দ শুনতেই চমকে উঠল মায়া। ভূতনাথ জানত মায়ার শোবার ঘরটা। তাই তার দরজাতেই সোজা এসে খটখট আওয়াজ করতে লাগল সে।

—কে ?

—বলছি কে আমি। আর জানাচ্ছিও তোকে কি জন্য এসেছি। গম্ভীরস্বরে বলে উঠল ভূতনাথ, —কপাট খুল। খুল কপাট আগে।

ভূতুদার স্বর। যার পর নাই বিস্মিত হয়ে উঠল মায়া। এধারে রাখহরি চাটুজ্জেরও তখন তেমন চোখ লাগেনি। জমেনি তখনও জ্ঞানদার ঘুমটা। তাই দরজায় খট খট আওয়াজ আর ভূতনাথের চড়া কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল স্বামী-স্ত্রী। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল তারা, —কি হয়েছে বাবা? ব্যাপার কি?

—ব্যাপারটা কি মেয়েকেই আপনার বলব। মায়া,— ধমকে উঠল ভূতনাথ, —কপাট খুল বলছি। খুল বলছি দরজা।

হঠাৎ মেঘ না চাইতেই জলকে আসা দেখে হতচকিত হয়ে গেল মায়া। বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে পারল না সে—কোথায় রাখবে চিঠি, কোথায় রাখবে আলো। ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল সে। দরজা খুলতে দেরী হতেই ভূতুদার আবার এল সেই কড়া নির্দ্দেশ—খুল বলছি কপাট, নইলে দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকবো আমি। তখন কিন্তু ভাল হবে না মায়া।

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন চাটুজ্জে মশায়! ভূতগ্রামের ভূত ভূতনাথ। হয়েছিল বটে দিনকতকের জন্য জামাই তার। কিন্তু এখন তো সে পাট চুকে গেছে। ছড়ানো হয়েছে তার নামে অনেক নিন্দাবান্দা। রটানো হয়েছে মায়াকে নিয়ে তার নামে অনেক কুৎসা, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী। সে সবের প্রতিশোধ নিতে ধূমকেতুর মত আসেনি তো ভূতনাথ! যে রকম দুর্মুখো ছেলে সে, স্বভাব চরিত্র যা তাতে তো বিশ্বাস করা যায় না তাকে। ভয় হল চাটুজ্জে মশায়ের। দিন ছেড়ে এমন মাঝরাতে—হঠাৎ যুবতী মেয়ের ঘরে একলা— !! না না সতর্ক হতে হবে তাকে। মায়ার উপর চড়াও হয়ে হঠাৎ যদি বলাৎকার করে সে। এ কলঙ্কে মেয়েটার যে তা হলে আর বিয়েই হবে না। চিরকালটা গলায় গেঁথে মরতে হবে তাকে। বিয়ে না করে ভূতনাথ মনে হয় এভাবেই সর্ব্বনাশ করতে এসেছে তার। এভাবেই নিতে এসেছে সে তাদের উপর চরম প্রতিশোধ। তাই নিষেধ করে উঠলেন তিনি মায়াকে। দরজার বাইরে থেকেই—না-না কিছুতেই কপাট খুলিস না তুই। খুলতে হলে ডেকে আনি আমি পাড়ার পাঁচ-জনকে। উঠিয়ে আনি ছেলে-ছোকরাদের—তাদের সামনে খুলবি কপাট তুই।

বলেই চাটুজ্জে মশায় ডেকে-হেকে পাড়া গোল করতে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। এধারে মায়া ইতস্তত

করতেই রোক চাপল ভূতনাথের। দুম-দাম আঘাত করতে লাগল সে দরজায়। কপাট খুলল মায়া। খুলতেই কপাট, ঝড়ের বেগে ঢুকল ভূতনাথ মায়ার ঘরে। বিছানার উপর ঝুঁকে পড়ে তার বালিশের তলা থেকে বের করতে গেল সে ঘুমের ট্যাবলেটগুলো। ওমনি মায়া ঝাঁপিয়ে পড়ল ভূতনাথের উপর। তারপর সে কি ধস্তাধস্তি। মায়া কিছুতেই নিতে দেবে না মৃত্যু-বিষ আর ভূতনাথ যেমন করেই হোক হস্তগত করবেই তা। শেষে হাত উঠলো ভূতনাথের। ঠাই-ঠাই। এগালে ওগালে দুগালে মায়ার বসিয়ে দিল দু'থাপ্পড়। চড়ের চোটে ছিট্‌কে পড়ল মায়া মেঝের উপর। দেখেই মা তার উঠোনে দাঁড়িয়ে গলা ফেড়ে করতে লাগল চিৎকার, —ওগো, কে কোথায় আছো ছুটে এসো গো। দেখে যাও গো— ভূতু—ভূতুটা কেমন মেয়েকে আমার মেরে শেষ করে দিল গো—

ওমনি মেঝে থেকে উঠেই ছুটে মায়া বেরিয়ে এল বাইরে। ঝাপটে ধরল মায়ের মুখটা,—খবরদার বলছি চিৎকার করবি না তুই। ভূতুদার নামে আর একটাও খারাপ কথা বলিস তো আমি মাথা ঠুকে মরব তোর পায়ে।

থমকে গিয়ে মা অবাক হয়ে বলে উঠল তাকে,—একি বলছিস তুই?

ধমকে উঠল মায়া,—চুপ কর তুই। ভূতুদা মারেনি আমাকে। বলেই মায়া ডুকরে কেঁদে উঠল মায়ের বুকে মুখটা দিয়ে—তুই ভুল দেখেছিস মা। আমাকে মারেনি ভূতুদা। ভুল দেখেছিস তুই। আমাকে মারতে পারে না কখনও ভূতুদা। ভূতুদা আমাকে মারেনি, মারেনি, মারেনি—

মেয়ের কাণ্ড দেখে মা তো হতভম্ব। হতভম্ব মনে হয় ভূতনাথও! ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভূতনাথ দাঁড়াল এসে মা-মেয়ের কাছে মস্ত অপরাধির মত। কান্না-চাপা গলায় বলে উঠল সে, —কেন তুই আমাকে তোর গায়ে হাত তুলতে বাধ্য করালি মায়া? কেন আমাকে মারা করালি তুই? কি দোষ করেছিলাম আমি তোর? কেন তুই আমাকে এ অন্যায় কাজটা করালি মায়া বল? আমি যা কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি সে কাজটা আমি কেন করতে গেলাম?

—ওভাবে তুমি কথা বোলে না ভূতুদা। মুখ ঘুরিয়ে বলে উঠল মায়া, —কোনো অন্যায় করোনি তুমি। করোনি কোন অপরাধ। কেন তুমি মিছে মিছি এভাবে নিজেকে দোষী মনে করে কষ্ট পাচ্ছো ভূতুদা?

—বেশ, আমি অন্যায় করিনি যদি তবে তুই কেন এতবড় একটা অন্যায় করতে যাচ্ছিলি বল? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

—কি অন্যায় করতে যাচ্ছিলাম আমি?

বলতেই মায়া তাদের সামনে হাতের মুঠিটা খুলল ভূতনাথ। তালুর উপর ঘুমের বড়িগুলো দেখিয়ে বলল তাকে—এগুলো কি বল? আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলি তুই? ভেবিছিলি কি তুই? তোর মনের খবর আমি জানি না? কিন্তু আত্মহত্যা করলে কি অবস্থা হবে তোর জানিস? কুম্ভী পাক নরকে পড়ে কুমীর-কামড়ের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে দীর্ঘকাল। প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়াবি তুই।

ভূতনাথের কথাগুলো শুনে ও হাতে মৃত্যুর বড়িগুলো দেখে যারপর নাই বিস্মিত হয়ে গেল জ্ঞানদা। চোখ স্থির করে দাঁড়িয়ে রইল সে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে। কিন্তু মেয়ে তার মাথা ঝামটে বলে উঠল, —তা হোক ভূতুদা। তবু খুনারু মায়ের মেয়ে হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। এ জ্বালা আমার কুমীর-কামড়ের যন্ত্রণার চেয়েও কত যে ভীষণ, কত যে ভয়ঙ্কর জান না তুমি। বাধা দিও না তুমি ভূতুদা। মরতে দাও আমাকে। মরতে চাই আমি।

—আর আমি। গম্ভীর হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ, —তোর দিদি চলে গেল, তুই চলে যাবি। জীবনে আমি শ্মশানটার বুকে একা বেঁচে থেকে খুব শান্তিতে থাকবো ভেবেছিস? একান্তই যদি মরতে চাস তবে মরবি তুই। কিন্তু আমার পরে। তোর দেওয়া এই বিষগুলো খেয়ে আগে আমি তোকে মারার প্রায়শ্চিত করি তারপর মরবি তুই।

ওমনি মায়া কাটা গাছটার মত লুটিয়ে পড়ল ভূতনাথের পায়ে। জড়িয়ে ধরে পা-দুটো তার বলে উঠল কাকুতি-মিনতি করে,—না ভূতুদা, না। এ মহাপাপ কোরো না তুমি। এ সব্বনাশ করলে যে আমি দিদির কাছে গিয়ে মুখ দেখাতে পারেবো না। দোহাই তোমার, আমার দিব্যি ভূতুদা। ওগুলো তুমি ফেরৎ দাও আমাকে।

হঠাৎ কানে এল তাদের —মার শালাকে, ধর শালাকে,

বুঝতে আর বাকী রইল না কারো —এ হল রাখহরি চাটুজ্জের পাড়ার লোককে খবর দিতে যাওয়ার ফল। সে এক মহা হট্টগোল। যেন লাঠি-লন্ঠন নিয়ে ভেঙ্গে আসছে সমস্ত গ্রাম। মুখে তাদের ভূতুদার উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালি, —শালা লম্পট। একলা ঘরে যুবতী মেয়ে পেয়ে ডুবে ডুবে জল খেতে এসেছে। মেরে গুঁড়িয়ে দে শালাকে। থেত্‌লে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দে শালার লাশটা।

সর্ব্বনাশ। এ যে রুখে আসছে জনতা। উত্তেজনার মুখে এখন উন্মত্ত পশু সব। চঞ্চল হয়ে উঠল মায়া। কি করে রক্ষা করবে সে ভূতুদাকে, —তুমি চলে যাও ভূতুদা। তাড়াতাড়ি চলে যাও তুমি এখান থেকে।

—না, গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল ভূতনাথ,—তোকে মারার এই হবে আমার উপযুক্ত শাস্তি। সকলের লাঠির ঘায়ে মরব আমি তোর সামনেই।

—অবুঝ হয়ো না ভূতুদা। ব্যাকুল ভাবে বলে উঠল মায়া, —কথা শোন আমার। পালাও তুমি এখান থেকে।

ভূতনাথের মুখে সেই একই কণ্ঠস্বর, —পালাবো কেন আমি? মরার ভয়ে? মৃত্যুই তো আমি চাই মায়া। এতো ভালই হবে আমার। বিষ খেয়ে মরতে হবে না। তোর মরার আগে এমন মৃত্যুর উপযুক্ত সুযোগ আমি কি কখনও হারাতে পারি মায়া?

পা দুটো ভূতনাথের জড়িয়ে ধরে মায়া বলতে লাগল তাকে কাঁদতে কাঁদতে,—এভাবে আমাকে আর শাস্তি দিও না ভূতুদা। পালাও তুমি। আমার দিব্যি না মান, দিদির দিব্যি রইল তোমায়—পালাও তুমি এখান থেকে।

—পালাতে পারি, বলে উঠল ভূতনাথ—তবে একটা কথা আমার রাখতে হবে তোকে।

ওধারে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগল হৈ-হল্লা। এধারে তেমনি ব্যস্ত হতে লাগল মায়া,—বল তুমি, একটা কথা কেন হাজারটা কথা শুনবো আমি তবু তোমাকে চলে যেতেই হবে এখান থেকে।

গম্ভীর হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ—কথা দে আমাকে, আর কখনও আত্মহত্যা করতে যাবি না তুই। মনে কখনও স্থান দিবি না এসব পাপচিন্তা।

বলার সঙ্গে সঙ্গে মায়া ভূতনাথের পা দুটো ধরে বলে উঠল ব্যগ্রভাবে—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে শপথ করছি ভূতুদা আত্মহত্যা করব না আমি। প্রতিজ্ঞা করে বলছি আমি তোমার নামে দিব্যি নিয়ে আর কখনও মনে এসব পাপচিন্তা আনবো না আমি। এবার দয়া কর আমাকে, চলে যাও এখান থেকে।

—কি করে যাব বল? বলে উঠল ভূতনাথ।

এও তো এক মহা মুস্কিল! ওধারে ছুটে আসছে জনতা। সত্যিই তো কিভাবে যাবে ভূতুদা? এধারে আর চিন্তা করারও সময় নেই মায়ার। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সে দড়াম করে লাগিয়ে দিল সদর দরজার কপাটটা। শক্ত করে অর্গলটা দিল বন্ধ করে। তারপর এসে ধরল তার ভূতুদার হাতটা। কড়াস্বরে সাবধান করে দিল সে তার মাকে— ভূতুদা'র এধারে যাওয়ার কথা যেন ঘুণাক্ষরেও সে না জানায় কাকেও। মেয়ের কাণ্ড-কারবার দেখে মায়ের তো চক্ষু চড়কগাছ! সুতরাং কাকেও কিছু বলার তার মুখ থাকলে তো বলবে। দাঁড়িয়ে রইল সে জরদ্‌গবের মত। ঠিক যেন সে মাঝপুকুরে গাদা ইঁটকাঠ। নড়ন চড়নের বালাই নেই তার। বোবা চোখে মিটি-মিটি তাকিয়ে সে শুধু দেখতে লাগল মেয়ের কীর্ত্তিকলাপ। মায়া ভূতনাথকে বলতে গেলে প্রায় হিড়-হিড়করে টেনে নিয়ে গেল খিড়কি দরজার দিকে। খিড়কি দরজা খুলে তাকে ঠেলে বের করে দিয়ে আবার তেমনি বন্ধ করে দিল কপাটটা। বিপরীত পাশে ওধারে তখন সদর দরজায় ভিড় করে এসেছে জনতা। চিৎকারে তাদের কাক-পক্ষীও আর জাগতে বাকী নেই। দুম্‌-দাম্ কপাটে ধাক্কা দিচ্ছে তারা। খুলতে বলছে কপাট তারস্বরে। জ্ঞানদা কি করবে না করবে ভেবে পাচ্ছে না। তাকিয়ে আছে মেয়ের দিকে আদেশের অপেক্ষায়। মায়ার তখন অন্য চিন্তা। ভূতুদা তার চলে যাক দূরে, আরো দূরে, বহুদূরে। সকলের ধরা-ছোঁয়ার নাগালের বাইরে। তারপর খুলবে সে কপাট।

(বার)

ভবিষ্যৎ অন্ধমূঢ় মানব সকল। সত্যিই তাই। কোন ঘটনা মানুষের জীবনকে নিয়ে গিয়ে যে কোথায় ফেলে কেও তা বলতে পারে না। পরিস্থিতির পাল্লায় পড়ে সিংহ শশকও হয় আবার মুষিকও কখনও কখনও হাতী হয়ে উঠে। ঘর থেকে মায়া খিড়কি দরজা দিয়ে ভূতনাথকে ঠেলে বাইরে বের করে দিতেই সে পড়ল মস্ত ফাঁপরে। কোথায় যাবে সে? কোনদিকে যাবে সে, নামপাড়া দিক থেকে তেড়ে আসছে ছেলে-ছোকরার মস্ত একটা দল। উপর পাড়ার দিক থেকে উপচে আসছে উন্মত্ত জনতা, মাঝ কুলির দিক থেকে রোকে আসছে এক দুর্মদ-দুর্মুখ পার্টি। লাঠি, লন্ঠন হৈ হাল্লা, সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। মাঝে ভূতনাথ। লক্ষ্যতো তার উপরই। ডাইনে গেলেও বিপদ। বাঁকে গেলেও মুস্কিল। দাঁড়িয়ে থাকলে তো কথাই নেই। মৃত্যুকে সদ্য আলিঙ্গন করা। এসব ঝোঁকের মাথায়, হৈ হট্টগোলে কেও শুনবে না তার কথা, কেও বুঝবে না তাকে। উত্তেজনার মুখে তাল-জ্ঞান শূন্য হয়ে যাবে সবাই। দুম্‌দাম্‌ ধুপ্‌-ধাপ্‌, একেবারে শুয়োর মারা করে ছাড়বে তাকে। ভাবতেই ভূতনাথের ভয়হীন হিয়া উঠল সভয় হয়ে। কিন্তু এখন উপায় কি?

য পলায়তিস জীবতি। ছুটল ভূতনাথ। খিড়কি পাশের ডোবাটার বাঁশ-পলাসের ঝাড়-ঝোপে ভরা পাড়টা দিয়ে দৌড়তে লাগল সে। লাগল ছুটতে চুপিসাড়ে চোরের মতন। ঝোপ আগাছা ডিঙ্গে পিছনের মাঠে নেমে হাঁফাতে লাগল সে। ভাবতে লাগল এবার কি করা যায়! হঠাৎ মাথায় এল তার এ সমস্যার জন্য দায়ী তো সতীই। সেই করবে তার সমাধান। সুতরাং চল মন সতীর কাছে। কোথায় সতী? মন্দিরে। অতএব মন্দিরের দিকেই ছুটে চলল ভূতনাথ গ্রামের পিছন দিয়ে বাঁকা পথে।

কিন্তু কোথায় সতী। মন্দির চত্বর ফাঁকা! দাওয়া শূন্য! বাবা ভূতনাথের মন্দিরটা কাক-জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মত। যেন শাসাচ্ছে তাকে,—বুদ্ধু কোথাকার! বুড়ো কাড়ার মত এখন ভিড়কে ছুটে বেড়ালে কি হবে? তখন ভাবা উচিত ছিল যে নিছক একটা স্বপ্নের বশে এমন অকাণ্ড, কুকাণ্ড করা ঠিক নয়। নাও বোঝ এবার। ভোগ কর। ঠেলাটা সামলাও।

সত্যিই তখন ঠেলাটা না সামলালে একটা যা'চ্ছে তাই অবস্থা হয়ে যাবে ভূতনাথের। ওধারে তখন তেড়ে আসছে গাঁয়ের লোক। বোধ হয় ঘরে-বাইরে কোথাও তাকে পায় নি তারা তাই খুঁজতে আসছে মন্দিরে। মন্দিরেই সেদিন দুপুর বেলায় শ্মশান বাবা আসার দিন লুকিয়ে ছিল কি-না—সেই ধারনাতেই মনে হয়, সন্ধানে আসছে এদিকে। কি মুখের খিস্তি তাদের। কথার কি চোট! যে যার খুশি সুযোগ পেয়ে ঝেড়ে নিচ্ছে তার উপর ঝালটা। এগিয়ে আসছে মন্দিরটার দিকে তাকে অশ্রাব্য গালি-গালাজ করতে করতে। শালা লম্পট, শালা কামুক। আইবুড়ো মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করতেই মিশতো হারামজাদা তাদের সঙ্গে। কেও বলছে—ওর স্বভাবটার দোষেই তো মরল সতী। শালীর সঙ্গে লটপটানি সহ্য করতে না পেরেই তো আত্মহত্যা করল মেয়েটা।

বলছে কেও, আবার—এতদিন শালা, ভূতগ্রস্থ হবার ভান করে পাগল সেজে ডুবে ডুবে জল খাবার ফন্দি করেছিল। ধরা পড়তেই ধরেছে আবার নূতন কৌশল। ঘুমোলে সবাই রাত্রে বেলায় লুকিয়ে আসবে প্রেম করতে।

—লুকিয়ে কেন শালা, দরজা তো খোলা। বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যা। কে একজন বলে উঠতেই ওমনি বোধ হয় আপত্তি করে উঠল টিলা খচ্চর মদনাটা, —হুঁ—হুঁ হুঁ, বিয়ে করা বৌ-এর চেয়ে বিয়ে না করা বৌ-এ মধু বেশী।

শুনে গায়ের রক্তটা টগবগ করে ফুটতে লাগল ভূতনাথের। মনে হতে লাগল তার হঠাৎ হনুমানের মত লাফিয়ে পড়ে তাদের মাঝে গোটা কতককে আচ্ছা করে দিতে উত্তম মধ্যম। কিন্তু কাজটা মোটেই যে সে ভাল করে নি মনে পড়তেই সংযত হয়ে গেল সে। অন্যায় তারই। ওভাবে হটকারিতা করা উচিত হয়নি তার। হোক না মায়া তার নিজের শালী। হোক না তাদের ঘরটা তার যতই আপন। রাত্রে বেলায়, একলা, ওই রকম একটা যুবতী মেয়ের কক্ষে ঢুকা আদৌ ঠিক হয় নি তার। যতই জানুক সে আত্মহত্যা করছে মায়া। তবুও ঘরে গিয়ে তাদের প্রথমে তাকে উঠাতে হত তার মা-বাবাকে। তারপর তাদের সাহায্যেই উচিত ছিল তার মায়াকে এ পথ থেকে উদ্ধার করা।

কিন্তু এখানে অযথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ভাবলে তো এখন চলবে না। রুখে আসছে তারা। দেখলে তাকে শুধু গালি-গালাজই করা নয় উত্তেজনার মুখে হয়তো লাঠির আঘাতে মাথাটাই গুঁড়িয়ে দেবে তার। এসব নির্বোধ ঘাস-কাটাদের হাতে মরার চেয়ে পালিয়ে যাওয়াই তার বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং চাচা-আগে আপন-প্রাণ বাঁচা।

ভৈরব তলার গাছ-গাছালিগুলোর আড়ালে হয়ে ভূতনাথ ছুটল সোজা শালী নদীর দিকে। হাঁফাতে হাঁফাতে সে হাজির হল শ্মশান ঘাটে। ঘাটে গিয়ে নদীর মাঝে দাঁড়াল সে সতীর সেই চিতাটার কাছে। হাতে আনা তার মায়ার মৃত্যু-বড়িগুলো ফেলে দিল তার উ[illegible]। বলে উঠল সে,—তোর কথা শুনতে গিয়েই তো এ দশা আমার হল সতী। এবার কি করব বল তুই-ই।

কিন্তু কে বলবে তাকে তখন কি কথা? [illegible]র কি করেই বা শুনবে তখন সে? ওধারে তখন তেড়ে আসছে তাকে খেদানোর দলটা। এবড়ো খেবড়ো ক্ষেত, উঁচু-নীচু আল, খাল-খন্দর ভরা পাথুরে ডাঙ্গা কিচ্ছু মানামানি নেই। হৈ-হল্লা করে মাটিতে লাঠি ঠুকে তারা ছুটে আসছে নদীটার দিকে ঠিক শিকার তাড়ানোর দলটার মত। মনে হয় ভৈরব তলাটা ছেড়ে নদীর দিকে ছুটে আসার সময় কেও তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করেছিল। তাই তাদের তাকে ধরতে এধারে উদ্দামভাবে ছুটে আসা। মুখে তাদের গাল-মন্দের মুষল ধারা। তাকে উদ্দেশ্য করে বর্ষন করতে করতে আসছে তারা বেপরোয়াভাবে। ভূতনাথের মত লোকের পক্ষে সত্যিই এসব হজম করা দায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ভাবতে লাগল ভূতনাথ।

ওধারে তখন দলটা এসে পৌঁছল নদীর পাড়ে। প্রথমে এসেই ঘেরাও করল তারা পাড়ের বটগাছটা। কারণ জানে তারা নদী পাড়ের এই বটতলাটা প্রধান ডেরা তার। প্রায় সময়েই গ্রাম ছেড়ে সে এখানে এসে বসে থাকে নিঝুম ভাবে। সুতরাং আতিপাতি করে তারা এসে খুঁজতে লাগল বুড়ো গাছটার শিকড়, ঝুরি, আশ-পাশের ঝোপ ঝাড় সমস্ত কিছু। তাদের প্রত্যেকটা কথা মাঝনদীতে এসে তীরের মত বিঁধতে লাগল তার কানে, —পালিয়ে কোথায় থাকবি শালা। জলে-পাতালে ঠাঁই নেই তোর। গাঁয়ের মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করাটা আজ তোকে মেরে ছাড়াবই।

কেও বলতে লাগল,—মেরে শুধু নয়, হাড়গুলো ভেঙ্গে এমন ফেলে রাখতে হবে তাকে যেন লম্পট গিরির শখটা ওর চিরজীবনের মত শেষ হয়ে যায়।

—কিন্তু এসব তো হল পরের কথা। বলে উঠল আর এক মাতব্বর —খুঁজে না পেলে তাকে সবার মুখের কথা যে দুঃখেই রয়ে যাবে। শালা গাঁয়ের লোকের চোখে ধূলো দিয়ে পালালো কোথায়?

কার হঠাৎ সন্দেহ হল—বেটা যা ধুরন্ধর, বটগাছটার উপরে উঠে ডালে কোথাও লুকিয়ে বসে থাকা তার পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়। সুতরাং শুধু গাছের নীচে নয়, খোঁজ উপর।

ওমনি বাঁনরের মত জনকতক লোক উঠল গাছে। সবার হাতের টর্চগুলো সব আলো ফেলতে শুরু করল গাছটার প্রতি ডালে। পাতায় পাতায়। সকলের চোখ, কান, মন সব দৃঢ়-নিবদ্ধ হল বটগাছটার উপরেই। ভূতনাথ দেখল এই সুযোগ। বাহাদুরী দেখানোর আর দরকার নেই। এই মুহূর্তে মানে মানে কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নইলে বটগাছে না পেয়ে তাকে খুঁজবে হয়তো নদীর মাঝে। তার আগেই চলে যেতে হবে তাকে নদী ছেড়ে। সুতরাং সতীর চিতা ছেড়ে ভূতনাথ গুঁড়িশুঁড়ি মেরে পালাতে শুরু করল নদীটার অপর পাড়ের দিকে। বিপরীত পাশের জল-জমা বাঁকটার কাছে হেলেপড়া জাম, অর্জুন গাছের আঁধার করা ধারটাতে পৌঁছল সে। কোনরকমে লতা-পলাস ও কাল-কুচিলার ডাল ধরে উঠল সে উপরে।

তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল অপর পাড়ে তাকে খেদানো লোকগুলোর কাণ্ড কারবার। তখনও বটগাছটার উপর ধূরমার চলেছে তাদের খানা-তল্লাসী। দু-একজন সন্দেহভাজন লোক তখন সবেমাত্র লাইট ফেলতে শুরু করেছে নদীটার উপর। যে যা করার করুক। ভূতনাথের মোটকথা আর এখানে থাকা উচিত নয়। তাই পাড় থেকে নেমে সে নীচের একটা গাড়ীর ডহর ধরে চলতে লাগল সোজা পশ্চিম দিকে। যে দিক থেকে নেমে এসেছে শালী নদীটা সেই দিকে মুখ করে।

চলতে লাগল ভূতনাথ উদ্দেশ্যহীনভাবে। কোথায় যাবে সে জানে না। কি করবে সে বুঝে না। চলাই এখন

কাজ তার। পথই এখন সাথী। সমব্যথী তার চলার পথের গাছপালাগুলো। দূর আকাশে বাঁকা চাঁদটাকে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুশুনিয়া পাহাড়। আলো-আঁধারি রূপটা যেন তার নানা রহস্যে-ভরা। সেটার দিকেই লক্ষ্য রেখে চলতে লাগল ভূতনাথ একটানা, বরাবর। চলতে চলতে গাড়ীর আটটা হতে লাগল বড়। মনে হল তার ট্রাক যেয়ে যেয়েই দিয়েছে ডহরটাকে চওড়া করে।

কতকক্ষণ চলল সে কে জানে। রাত যে এখন কতটা তারও কোন হিসেব নেই তার। হাঁটল সে কত মাইল, এল সে কতদূর সে-সব দিকেও খেয়াল নেই তার। হঠাৎ দূর থেকে চোখে একটা আলো পড়তেই হুঁস হল তার। যা ভেবেছিল সত্যি। ট্রাকেরই একটা কাঁচা রাস্তা এটা। আলোটা ট্রাকেরই। দাঁড়াল সে একপাশে সরে। উঁচু-নীচু রাস্তায় আলোটা উপর-নীচ করে ট্রাকটা এল বটে তার সামনে কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলে গেল না তাকে। দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। হঠাৎই ট্রাকটার উপর থেকে ঝাঁপিয়ে নামল সামনে তার ড্রাইভার সাহেব। নামা শুধু নয় কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বলে উঠল তাকে, আপন করা একেবারে অতি পরিচিত গলায়,—কি রে ভূতনাথ, তুই এখানে!

ভূতনাথ তো হতভম্ব। স্বরটা ধরে তার নিজের স্মৃতিশক্তি টেনে দেখতে লাগল তাকে আপাদ-মস্তক। রাত তখন বিদেয় হওয়ার মুখে। ভোরের আলোয় ফর্সা হয়ে আসছে সব দিক। সেই আলোতেই দেখল ভূতনাথ ড্রাইভার সাহেব আর অন্য কেও নয় তারই বাল্যবন্ধু ভজনলাল। ভজনলাল দস্তিদার। তবে দস্তিতাই শুধু একমাত্র পরিচয় নয় তার। সে তার ভিক্ষাভাই। বাবার নাম তার বিমলাকান্ত দস্তিদার। বিমলবাবু নিজে তাকে ভিক্ষে ছেলে বের করেছিলেন। সে কত আড়ম্বর! কত জাঁকজমক! শালী নদীর তীরে বাঁকাদহ গ্রামে বাড়ী তাদের। কতবার এসেছে সে তাদের বাড়ী। প্রতিবারে একটানা কতদিন ধরে থেকে গেছে সে তাদের বাড়ীতে। ভিক্ষা বাবা যেমন ছেলের মত ভালবাসতো তাকে, ভিক্ষাভাই এই ভজনলালও তেমনি আপন করে রাখত তাকে চব্বিশ ঘণ্টা। খাওয়া, থাকা, শোয়া, ঘুমানো সব একসঙ্গে। কিন্তু যাগ গে সে সব কথা। সে তাহলে কি এসে গেছে বাঁকাদহ গ্রামে! সাত আট মাইল এতটা পথ সে এল কি করে! তাছাড়া এখানে এসময়ে ট্রাক নিয়ে—! ভজনাকে—! দেখছে সে তো সব ঠিকঠাক!

ভ্যাবলাকান্তের মত তাকাতেই ভূতনাথ ভজনই উল্টো জিজ্ঞেস করে উঠল তাকে তার প্রশ্নগুলোই—এখানে, এসময়ে ব্যাপার কি রে? পথ ভুল করে না কি? যাচ্ছিলি কোথায়?

উত্তর না পেতেই ভজন মারল তার পিঠে একটা হাল্কা চাপড়। মৃদু ধমকের ঝট্‌কানিতে বলে উঠল তাকে—দেখছিস কি এমন করে? চিনতে পারছিস না? কিরে?

প্রকৃতিস্থ হয়ে ভূতনাথ বলে উঠল তাকে,—ভজনলালকে ভূতনাথ চিনবে না এও কখনও হতে পারে? কথা বলার আগেই তোর ঝাঁপিয়ে নামার ধরন দেখেই বুঝে গেছি আমি এ আমার সেই ভজুবীর পাণ্ডা ছাড়া আর অন্য কেও নয়। কিন্তু যা প্রশ্ন করছিস তুই সেসবের উত্তর দেওয়ার মত ক্ষেত্রও এটা নয় এবং সেরকম অবস্থাও এখন নয় আমার।

—বেশ তো, কে বলছে এখানে তোকে উত্তর দিতে। সামনেই আমার ইটভাঁটা। চল সেখানে আমার ডেরায়। ঝুপড়িতে বসেই শোনা যাবে সব। বলেই ভজনলাল ট্রাকটা তার পাশে বসে থাকা লোকটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে বলে নিজে ভূতনাথের কাঁধ ধরে ফিরে এল তার আস্তানায়।

আস্তানায় মানে তার ইটভাঁটার থাকা ঝুপড়িটাতে। বেশি দূরে ছিল না সেটা। পৌঁছতেই ভোরের আলো স্পষ্ট করে দিল সব কিছু। শালী নদীর পাড়ে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে করেছে ভজনলাল এই ভাঁটাটা। করেছে নাকি নিজের চেষ্টায়, নিজের হিম্মতে। পরিচয় নিতে নিতে জানল ভূতনাথ শুধু ভাঁটাটাই নয় ট্রাকটাও তার নিজের কেনা। ড্রাইভার রাখলেও অধিকাংশ সময় সে নিজেই চালায় ট্রাকটা। গত সন্ধ্যায় লোড করা ইটগুলো ভাঁটায় কুলি-কামিন আসার আগেই সে আনলোড করতে যাচ্ছিল বাবলা-ডাঙ্গার ঘাট। সেখানে রোলিং মেশিনের কারখানা হচ্ছে একটা। সেই কারখানাতেই ইট সাপ্লায়ার সে। কাজের চাপে এখানেই পড়ে থাকতে হয় তাকে। নাওয়া-খাওয়া সব এখানেই। এমন ব্যস্ত সে যে বিয়ে করার পর্যন্ত নাকি সময় নেই তার। তবে বিয়ে না করলেও নিঃসন্তান নয় সে। সামনের ওই চিমনি দুটোই হচ্ছে তার বেটা-বেটি।

শুনে হাসবে কি ভূতনাথ অবাক হল দস্তুর মত! এতক্ষণ ভাবছিল সে বাকা দেহের কাছে এই সাত-আট মাইল নদীর পাড়ে পাড়ে একলা হেঁটে সে এল কি করে। এখন ভাবতে লাগল সে বাঁকাদহ গ্রামের বোকা-পাঁঠা ছেলের এমন আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হল কি করে। যে ভজনলাল ছিল কুঁড়ের বাদশা, মা-বাবার টাকা পয়সা চুরি করার যম। সিনেমা থিয়েটার দেখার জন্য যে ঘরের চাল-ডাল পর্যন্ত দিত লুকিয়ে বিক্রি করে সেই লক্ষ্মী ছাড়া হতচ্ছাড়া বিমলাকান্তের বাউণ্ডুলে ছেলেটা এমন লক্ষ্মীবন্ত-পয়মন্ত হল কোন যাদুমন্ত্র বলে। একেই বলে "পুরুষের দশ দশা কখনও হাতী কখনও মশা।" হাতী এখন ভজনলাল, মশা এখন সে।

কিন্তু হাতী শুনল যখন মশার কাণ্ড তখন যার পর নাই বিস্মিত হয়ে গেল সে! অবাক হবারই কথা ভজনলালের। কারণ ভূতনাথকে সে তো হাড়েহাড়েই চেনে। তারমত এমন ধূরন্ধর, বেপরোয়া উদ্ভট, সৃষ্টিছাড়া ছেলে তো শালীনদীর উভয় পারে কোথাও ছিল না। ভূতপ্রেত সে কোনদিনও বিশ্বাস করত না। তুকতাক, অলৌকিকের সে কখনও ধার ধারত না। সাধুসন্ত অগড়ম বগড়ম ছিল তার দুচোখের বালি। সে ভূতনাথ সামান্য একটা স্বপ্নের ঘোরে বাবা ভূতনাথের মন্দিরে এসে কি দেখতে কি দেখে, কি শুনতেকি শুনে হঠাৎ একটা এমন কাণ্ড করে বসল! মায়ার বালিশের তলা থেকে ঘুমের বড়িগুলো বের করা একটা কাক-তালীয় ব্যাপার। সেটাকে নিয়ে ওই সামান্য কাণ্ডটাকে চিরদিন গলায় গেঁথে জীবনটাকে তার নষ্ট করতে হবে নাকি? ক্‌ভভি নেহি। অন্তত ভজু থাকতে কোনদিন তা হতে দেবে না।

সুতরাং ডোন্ট কেয়ার। এমন কত ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে, কত কাণ্ড এমন ফুলে ফেঁপে উঠে তারপর আপনা থেকেই হঠাৎ একদিন ফট্ করে ফেটে আকাশের সঙ্গে মিশে যায়। এটা নিয়ে এত চিন্তা করার বা বিমর্ষ হয়ে থাকার কি আছে? ভজুবীর পাণ্ডার কাছে যখন এসে পড়েছে সে তখন সব ঠাণ্ডা করার দায়িত্ব তার। তবে দিনকতক এখন বাড়ী-যাওয়া চলবে না ভূতনাথের। থাকতে হবে এখানেই, তার কাছে। যেতে হলে এই ভজনলালই আগে যাবে তাদের বাড়ী। ভূতগ্রামের ভূতগুলোকে সব সরষে পড়া দিয়ে ঠাণ্ডা করবে সে। তারপর সসম্মানে পৌঁছে দিয়ে আসবে তাকে তাদের বাড়ীতে।

বড়ের চাল তার। এমনভাবে কিস্তিমাৎ করবে সে যে শিবেরও আঘাত লাগবে না, সাপও মরবে অথচ লাঠিও ভাঙবে না।

কি আর করবে ভূতনাথ। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় সে। এখন যে অবস্থায় পড়েছে সে তাতে সত্যিকারের তার একজন গাইড দরকার। দরকার ভজনলালের মতই তার একজন সহৃদয়, সমব্যথীও দরদী বন্ধু। তার জীবনের স্টেয়ারিং ধরে যদি এই ট্রাক-ড্রাইভার ঠিক মত নিয়ে যেতে পারে তাকে তবেই মঙ্গল। নইলে ধাক্কা খেয়ে, খাল-খন্দরে পড়ে জীবনটাই তার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। তাই ভূতনাথ ভজনলালের ইট-খোলাতে নিজেকে সম্পূর্ণ তার হাতে সমর্পণ করে লাগল থাকতে।

এধারে ভূতগ্রামের যে যেমন ভূত সে তেমন মায়ার কথা শুনে, মায়ার মায়ের কথা শুনে ধারণা করতে লাগল। একদল ভূতনাথের অলৌকিক কাণ্ড শুনে দস্তুরমত তাজ্জব বনে গেল! আশ্চর্য হবারই কথা! ভূতনাথ জানল কি করে মায়া আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে! বুঝল কি করে সে যে মায়ার বালিশের তলায় ঘুমের বড়ি লুকানো আছে। সত্যিই কি কোন মানসিক শক্তির অধিকারী হয়েছে ভূতনাথ? না এসব কোন ভৌতিক ব্যাপার?

অপরদল ভাবল ওসব হল মস্ত একটা চাল-চরিত্রের ব্যাপার। বিনাপণে জামাই ধরার একটা কৌশল। বলরাম বাড়ুজ্জেকে কলা দেখিয়ে ঘরের জামাই ঘরে বেঁধে রাখার একটা ফন্দি। তবে ব্যাপারটা মা-বিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বুড়ো নাংলা রাখহরি চাটুজ্জে এসব রহস্যের কিচ্ছু জানে না। না জানলেও সব দিক তার ভেবে চিন্তে চলা উচিত। ঘরের মালিক সে, মাথার সব চুলগুলোই প্রায় পেকে গেছে তার। কচি খোকাটি হয়ে থাকলে আর চলে? ঘরে বুড়ো ধাঙ্ড়ি মেয়ে, বাইরে লকলকে থুবড়ো জামাই। একে অপরকে পাবার জন্য সব সময় ওঁৎপেতে আছে। জিবে লালা সরছে যখন ভূতনাথের তখন বাপকে বলে তার সুযোগটা কাজে লাগা। তা না দরজা গোড়ায় খট্-খট্ করতেই জামাই বুড়ো কাকের মত রাত্রেবেলায় কা-কা করে দিল সব পাড়া মাত করে। ঘটে একটু বুদ্ধি থাকলে ওই রাতেই মায়ার মাথায় সিন্দুর দিয়ে ঘরে ঢুকাতে তাকে বাধ্য হতভূতনাথ।

আর একদল দিতে লাগল চাটুজ্জে মশায়ের গিন্নির দোষ। মেয়েকেগছাবার এতই যদি মতলব ছিল তার

তবে আগে থেকে ফন্দিটা তার বুঁড়োকে তা জানিয়ে রাখলে পারতো। মেয়ের আত্মহত্যার দুরভিসন্ধিটা কৌশলে করে ভূতনাথের কানে পৌঁছাতে পেরেছিল কিন্তু বুড়োর কানে ঢুকাতে পারে নি কেন? তাহলে তো আর জাল কেটে শিকার পালাতে পারতো না। এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে গেলে কি হবে? মা-মেয়েতে এসবের প্রতিবাদ করতে যেতেই বলে উঠল আর এক দল,—মরুক গে সব। কেও যদি তার নিজের ছাগল ল্যেজ দিয়ে কাটে তবে তাদের বলার কি আছে।

শুধু মা-মেয়েরই নয়, নানাভাবের লোকের নানা বাদ-প্রতিবাদের ঝড়-ঝাপটায় তালগোল পাকিয়ে গেল ভূতনাথের ব্যাপারটা। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার তেমন আর প্রয়োজন মনে করল না কেও। কাজে কাজেই আপনা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে গেল গ্রামটা।

গ্রাম ঠাণ্ডা হলেও মায়ার মন কিন্তু ঠাণ্ডা হল না। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল সেটা তার মা-বাবার উপর।। তারাই তো যত নষ্টের গোড়া। ওমনিভাবে তারা যদি চিৎকার করে না উঠত তাহলে তার ভূতুদাকে এমন বিপদে পড়তে হত না। ভূতুদা মিথ্যা বলেনি। সত্যি সে জানতো তার মনের খবর। নইলে বুঝলো কি করে সে তার আত্মহত্যার ইচ্ছা? জানলই বা কি করে তার বালিশের তলায় বিষ রাখা। ভূতুদা সত্যিই তাকে ভালবাসতো। নইলে ঠিক তার মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে ওভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে বাঁচাতে সে তাকে ছুটে আসতো না। তোলপাড় করতে লাগল মায়ার অন্তরটা। হায় ভগবান! ভূতুদা একদিনের জন্যও বলেনি কেন যে সে তাকে ভালবাসে। মায়া তো তাহলে এসব পাপ চিন্তা মনেও স্থান দিত না। পরক্ষণে আবার নিজের মনে নিজেই চিন্তা করতে লাগল মায়া—না না ভূতুদার কোন দোষ নেই। ভালবাসার কথা—অন্তরের কথা। এসব কথা মুখে বলার নয়, হৃদয়ে জানার। প্রাণের কথা প্রাণই জানে। কিন্তু যে প্রাণের টানে ভূতুদা এসেছিল তার কাছে মায়া তাকে দিল কি? রাত্রেবেলায় খিড়কি দরজা দিয়ে বার করে দিল তাকে! ঠেলে দিল বিপদের মুখে! কেন তার সঙ্গে সেও বেরিয়ে যেতে পারল না? কেন সে সকলের মাঝে ভূতুদাকে আগলে ধরে বলতে পারল না—ভূতুদা আমার, ভূতুদার কলঙ্ক আমার; ভূতুদার সব কিছুর জন্য দায়ী আমি। ভূতুদাকে আমি ভালবাসি। ভূতুদাকে এনেছি আমি ভালবাসার টানে। তাহলে তো ভূতুদাকে এমন সূচীভেদ্য অন্ধকারে ওমনি চোরের মত বেরিয়ে যেতে হত না। তার জন্যে যে কলঙ্কের হার জীবনে পরাও মহা সুখের। এ সুখ থেকে বঞ্চিত হল কেন মায়া? হায় ভূতুদা কোথায় তুমি? কোথায় তুমি ভূতুদা?

ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ঘরের কোণে বসে রাত দিন কাঁদতে লাগল মায়া। মা তার চোখের বালি, বাবা তার বিষ। ভূতুদার শত অনর্থের মূল তো তারাই। মনের কথা বলবে সে কাকে? কে বুঝবে তার অন্তরের ব্যথা। পাড়ায় বেড়ান, সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মেলা-মেশা সব বন্ধ হয়ে গেল মায়ার। গেল ঠিক মত তার নাওয়া-খাওয়াও। সব সময় হো হো করতে লাগল মনটা তার। অন্তরটা মোচড়াতে লাগল তার ভূতুদার সেই শেষ কথাটা স্মরণ করে—এ বড়িগুলো খেয়ে তোকে মারার আমি প্রায়শ্চিত্ত করব মায়া। ভূতুদা'র যে কথা, সেই কাজ। যদি কেলেঙ্কারির মাথায় অপমানের মুখে হঠাৎ ওই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে সে। তবে যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে মায়ার। না, ভূতুদা না, এ কাজ করো না তুমি। এভাবে নষ্ট করো না নিজেকে। জানবে তাহলে মায়াও আর এ জগতে নেই।

দিনের পর দিন নানা দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা উথাল-পাতাল করতে লাগল মায়ার অন্তরটাকে। হঠাৎ একদিন পাগলিনীর মত ছুটে কাছে তার এসে হাজির হল বড় মা। বড়-মা মানে ভূতুদ'র মা। বাড়ুজ্জে পাড়ার বনেদী বংশের বৌ বড়-মা। চাটুজ্জে পাড়া আসা তো দূরের কথা ঘরের বাইরে কোন দিন পা দেয় নি সে। আজ কি না সে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে গ্রামের কুলি কুলি সকলের মাঝে ছুটে এল তাদের বাড়ীতে। কখনো যে কারো কাছে মাথ-নত করেনি সে কিনা আজ মান-সম্ভ্রম সব খুইয়ে ধরতে এল তার হাত। বলতে এল তাকে মিনতি করে— সেদিন আমি তোকে ঘর থেকে চলে যেতে বলে মহা অন্যায় করেছিলাম মা। এ দোষ আমার ক্ষমা করে দে-মা। বল আমার ভূতনাথ কোথায় আছে?

পা দুটো তার জড়িয়ে ধরে বলে উঠল মায়া,—এভাবে আমাকে অপরাধি করো না বড়-মা। মহাপাপ হবে আমার। ছোট মেয়ে আমি তোমার। আমাকে আবার হাত ধরে, অনুরোধ করে কি বলবে তুমি?

কিন্তু বড় মা তখন আছে নিজের ঝোঁকে। মায়ার কথা শোনার মত মন থাকলে তো তার। বলতে লাগল সে তেমনি ভাবেই,—মন্দির, ভৈরব-তলা, শ্মশান ঘাটের বটতলা, পাড়ের বাগান, পোড়ো বাড়ী, গায়ের মেলা-মণ্ডপ কোন স্থান খুঁজতে বাকী রাখিনি আমি। আত্মীয়-স্বজন, কুটুম-বন্ধুর বাড়ী সব জায়গাতেই লোক পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। কেও কোন হদিশ পায়নি তার। বল মা, বল, কোথায় আছে আমার ভূতনাথ।

—আমি জানি-নি বড়-মা। বিনীতভাবে বলে উঠল মায়া,—জানলে তো আমি নিজেই যেতাম তাকে খুঁজতে। সত্যি বলছি, জানি না আমি।

—জানিস না মানে? ধমকে উঠল বড়-মা,—নিশ্চয়ই জানিস। বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল সে, —তুই না জানলে জানবে আর কে? সেবার শ্মশান বাবা আসার দিন তুই তাকে লুকিয়ে রেখেছিলি মন্দিরের পিছন দাওয়ায় ভৈরবতলার আড়ালে। আর আজ বলছিস জানি না আমি। না মায়া মা, এভাবে শাস্তি দিস না তুই আমাকে। আমি মনের ভুলে সেদিনে তোর উপর খারাপ আচরণের জন্য তো ক্ষমা চাইছি। বলিস তো তোর মা-বাবার পায়ে ধরে মাফ চাইবো আমি। বলে দে আমার ভূতনাথ কোথায়।

—এভাবে আমাকে আর আঘাত দিও না বড়-মা। কান্নাচাপা গলায় বলতে লাগল মায়া, —আমার মা-বাবা কেন, জগতে কারো কাছে তোমাকে কোনদিন ছোট হতে দেব না আমি। মা-বাবার চেয়ে তুমি আমার অনেক, অনেক বড় বড়-মা। এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, ভূতুদা কোথায় আমি সত্যি জানি না। বিশ্বাস কর তুমি, মিথ্যা বলিনি আমি।

কিন্তু বড়-মার তখন উগ্রমূর্তি। মুখ ঝামটে বলে উঠল সে, —সব জেনেশুনেও তোর মিথ্যা কথাটাকে বিশ্বাস করতে বলছিস? ভেবেছিস কি, সত্যিই আমি কিছু জানি না? শুনিনি কিছু? সেদিন রাত্রে-বেলায় ভূতনাথকে তুই খিড়কি দরজা দিয়ে বের করে দিস নি? নিশ্চয়ই তুই বলে দিয়েছিস তাকে লুকিয়ে কোথায় থাকতে হবে। বল মা, বল, আর দুশ্চিন্তায় ফেলে রাখিস না আমাকে। গাঁয়ের লোক আর কেও কিছু বলবে না তোকে। আমি সকলের হাতে পায়ে ধরে ভূতনাথের হয়ে মাফ চেয়ে নিয়েছি! বলিস তো সেদিন রাত্রের ঘটনার জন্য তোর মা-বাবারও পায়ে ধরে তার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি। আর কোনদিন এমন অন্যায় কাজ করবে না ভূতু। তুই ভূতুকে আমার ফিরেয়ে এনে দে-মা।

চাপা কান্নায় বড় মার পা দুটো ধরে বলে উঠল মায়া, —তুমি বিশ্বাস কর বড় মা, ভূতুদা কোন অন্যায় করেনি। করতে পারে না কোনদিন। সে নির্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। তার হয়ে কারো কাছে তোমাকে ক্ষমা চেয়ে ছোট হতে হবে না বড়-মা।

দোষ-গুণ বিচার করার আমার আর কোন মুখ নেই মা। গম্ভীর হয়ে বলে উঠল বড়-মা,—সেদিনের ওর কেলেঙ্কারিতে মেরুদণ্ড আমার ভেঙ্গে গেছে। বাবাও ওর কারো কাছে মুখ দেখাতে পারছে না। কিন্তু সবে ধন ওই একমাত্র সন্তান তো আমার। মা হলে তুই বুঝবি এই হৃদয়ের কত জ্বালা। আজ তিন দিন হল ভূতনাথ আমার উপোস দিয়ে আছে। কোনদিন যে কারো কাছে সে চেয়ে খেতে জানে না। কোথায় আছে, কি ভাবে আছে বলে দে-মা আমার। আমি চিরকাল তোর কেনা বান্দী হয়ে থাকব। ভূতনাথকে একবার এনে দে-মা তুই।

কি মুস্কিল! কি ভাবে যে বুঝাবে মায়া বড়-মাকে কিচ্ছু ভেবে পেল না। শুধু পায়ে তার মাথাটা রেখে ডুকরে কাঁদতে লাগল বসে,—তুমি বিশ্বাস কর বড়-মা, সত্যি বলছি আমি জানি না ভূতুদা কোথায় আছে। দিনরাত শুধু আমি প্রার্থনা করছি বাবা ভূতনাথের কাছে ভূতুদা আমার ফিরে আসুক। ফিরে আসুক আমার ভূতুদা।

বড়-মার মনে হয় সে-সব কথা কানে গেল না। না সে কানে নিল না কে জানে। রেগে উঠল সে মায়ার প্রতি। বলে উঠল বেশ চড়া গলায়, —তোর কথায় আমি আর ভুলবো না মায়া। আমার মন বলছে তুই ছাড়া আর কেও জানে না আমার ভূতু কোথায়। তুই বল আর না বল তোর কাছে আমি ধন্না দিয়ে পড়ে রইলাম যতক্ষণ না ভূতনাথ আমার ফিরে আসে। ভূতু আমার অনাহারে আছে, আমিও আর জলস্পর্শ করব না। ভূতুকে তুই আমার ফিরিয়ে এনে না দিলে তোদের দরজায় হত্যা দিয়ে মরব আমি। তবু বাড়ী ফিরে গিয়ে আর তার বাবার আমি শুকনা মুখটা দেখতে পারব না। এই আমার শেষ কথা।

সত্যি, বড়-মা তার শুয়ে পড়ল তাদের মেঝের উপর। মা এলেন বাবা এলেন। বললেন কত, বুঝালেন কত। কিন্তু সংকল্প থেকে কেও তাকে আর সরাতে পারল না। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা তার। হয় ভূতুকে এনে দিতে হবে মায়াকে কিংবা দেখতে হবে তার মরা মুখ।

বড়-মার কথায় মায়ার মুখে আর ভাষা সরল না। কিন্তু তার ওই ধন্না- দেওয়া, হত্যা-দেওয়া কথাগুলো শুনে দিদির কথাগুলো হঠাৎ স্মরণে এসে গেল তার। দিদি তাকে প্রায়ই বলতো বাবা ভূতনাথের থানে ধন্না দিলে নাকি অসাধ্য সাধন করতে পারা যায়। হত্যা দিলে অসম্ভব সম্ভব হয়। মন্দিরে বাবার হত্যা দিয়ে শূলের ব্যামো সারিয়েছিল হেরম্ব ভট্চার্য। নটবরব্বাবু শিবের থানে ধন্না দিয়ে সারিয়ে ছিল তার দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যানসার। ঘোষ পাড়ার সুলোচনা দি তার হারানো ছেলে ফিরে পেয়েছিল বাবা ভূতনাথের চরণে হত্যা দিয়ে পড়ে থেকেই। বেশী -দিনের কথা নয়, দিদির সয়লা রাণুদি তার নাকি নিরুদ্দেশ স্বামীকে লাভ করেছিল একমাত্র বাবার থানে ধন্না দেওয়ার ফলেই। বার বার বলতো তাকে দিদি—বাবা আমাদের খুব জাগ্রত দেবতা-রে। যদি কোনদিন বিপদে পড়িস তুই, বাবা ভূতনাথের মন্দিরে গিয়ে ধন্না দিবি। দেখবি, তিনি তোর সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

সত্যি মায়ার তো আজ মস্ত বিপদ। এত বড় সমস্যায় সে পড়েনি কোনদিন। তবে কি দিদিই তাকে বড়-মার মুখ দিয়ে নির্দেশ পাঠাচ্ছে। দিচ্ছে তাকে ধন্না দেওয়ার ইঙ্গিত। আশার যেন আলো দেখতে পেল মায়া। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা তার। আবেগে হঠাৎ বড়-মার পায়ে মাথা রেখে বলে উঠল মায়া, —তুমি আমাকে ওই আশীর্বাদই কর বড় মা যেন ভূতুদাকে, আমি তোমার কাছে ফিরিয়ে এনে দিতে পারি। বলেই চলল সে ঘর ছেড়ে।

প্রতিজ্ঞা-দৃঢ় সে এক অদ্ভুত মূর্তি মায়ার। চৌকাট ডিঙ্গতেই বলে উঠল মা- -, এ অসময়ে কোথায় যাবি তুই। কোন উত্তর করল না মায়া। কুলিতে নামতেই পিছু পিছু এসে জিজ্ঞেস করে উঠলেন তাকে তার বাবা—হঠাৎ এসময় এক কাপড়ে চললি কোথায় মা? উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা ফিরেও তাকাল না সে। গটগটিয়ে চলে গেল সে সোজা কুলির পথটা ধরে। বোবা চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার বড় মা সমেত মা-বাবা সবাই তার চলে যাওয়া পথটার দিকে।

যতই হোক, রাখহরি চাটুজ্জে বাবা তার। ভর দুপুরে যুবতী মেয়ে ওই রকম যদি কাকেও কিছু না বলে ঘর ছেড়ে চলে যায়, তবে কি কখনও স্থির থাকতে পারেন তিনি? কাজেই দু-চার জনকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলেন তিনি মায়ার পিছু পিছু। অনুসরণ করে মন্দিরে এসে পৌঁছুলেন যখন তখন মায়া পাশের ঠাকুর পুকুরে স্নান করে মন্দিরে ঢুকে গেছে। ধন্না দিয়েছে সে বাবা-ভূতনাথের থানে। সুতরাং আর কোন কথা নয়। ধন্না দিলে আপত্তি করা চলে না। মায়া এখন বাবার মেয়ে। তাই বাবার জিম্মায় রেখে তাকে মাথা হেঁট করে ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হতে হল রাখহরি চাটুজ্জেকে।

দুদিন দুরাত কাটল মায়ার মন্দিরে। যে কোনদিন ঠাকুর দেবতার ধারে-পাশে যেত না। ধার ধারতো না কোন বার-ব্রতের। সহ্য করতে পারতো না যে একটুও ক্ষুধা। সে মায়া নিরম্বু উপোস করে পড়ে রইল বাবার থানে ধন্না দিয়ে। মরণ পণ তার, ভূতুদা না এলে উঠবে না সে মন্দির ছেড়ে। কুৎসা, কলঙ্ক, মিথ্যা অপবাদের মেঘ যা জমায়েত হয়ে আছে তার জীবনে সে না এলে যে দূরে সরবে না এসব। ভূতুদাকে নির্দোষ, নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করে সে সরে যাবে তার জীবন থেকে চিরকালের মত। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা তার।

কারো সম্বন্ধে একনিষ্ঠ চিন্তা মনে তার কম্পন সৃষ্ট করতে পারে কি না কে জানে। কে জানে একাগ্রতার ঢেও অপরের অন্তরে পাবে কি না আছড়ে পড়তে। ভজনলালের ইটভাঁটায় রাজার হালে থাকলেও কিন্তু ভূতনাথের মনে স্বস্তি আসছিল না। সোনার খাঁচায় থাকলেও পাখি ছটফট করতে লাগল কেমন যেন এক অসোয়াস্তিতে। তার গম্ভীর চিন্তাভারগ্রস্থ ভাবটা কাটাবার জন্য ভজনলাল নানা চেষ্টা করত। বলত তাকে তার মন থেকে ওসব অবাস্তব আজগুবি ধ্যান ধারনাগুলো একেবারে মুছে ফেলতে। তার মত জীবনে এমন কত লোকের কত সতী মারা যায়। আবার তারা অন্য সতী এনে সেটা পুষিয়ে নেয়। তার নিজের কাকার জীবনেই নাকি চারবার বিয়ে। আর মায়াতো তার শালী। শালীর সঙ্গে এমন রঙ্গরস কত জামাইদাই তো করে থাকে।

তার জন্য এমন বিমর্ষ হয়ে থাকতে হবে কেন তাকে? রূপ-যৌবন মনে লাগলে তার জীবনে তো তাকে লাগিয়ে নিতে পারে। এতে দোষ কি? আর না মনে ধরলে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে ওসব চিন্তা অন্তর থেকে। ভজনলাল প্রায়ই তাকে কাজের কথা বলে। অবশ্য একথাটা সত্যি, কাজে থাকলে মনটা তার ওসব আজে-বাজে চিন্তা করবার আর ফুরসুত পাবে না। আর কাজ তো তার হাতেই। ইটভাঁটার এই ম্যানেজারিটা করে যদি সে তবে ভজনলাল বাইরের কাজগুলো নিশ্চিন্ত হয়ে দেখা শোনা করতে পারে। আর এ কাজ করতে মন যদি না চায় তার তবে শালীনদীর অপর পারে বাবলাডাঙ্গায় যে রোলিং মেশিনটা বসছে সেখানেও ইচ্ছে করলে কাজ করতে পারে সে। ও কারখানার মালিক অবিনাশবাবু তার হাতের লোক। একবার তার বলার অপেক্ষা। ইচ্ছেমত যেকোন কাজে সেখানে জয়েন করতে পারে সে।

ধাপ্পা যে ভজন তাকে দেয়নি সেই কথাটাই প্রমাণ করার জন্য একদিন সে ভূতনাথকে জোর করে নিয়ে গেল ইটের ট্রাকে চাপিয়ে। অবিনাশবাবু দস্তুর মত খাতির করল তাকে। বোকারো থার্মল পাওয়ারে তার কাজের অভিজ্ঞতা আছে জেনে এবং গুরমিথ এন্টার প্রাইজে সে দীর্ঘদিন কাজ করেছিল শুনে অবিনাশবাবু তো মহা খুশি সেই দিনেই তিনি তাকে নিতে চাইলেন কাজে। কিন্তু ভীমরতি ভূতনাথের। পরে দেখব, ভেবে বলব বলে সে এড়িয়ে গেল তার কথা। ভাঁটায় এসে আবার সেই গুম গম্ভীর ভাব।

ভাবনা তো ভূতনাথের কিছু আর কাঁচকলা। সেই সতী আর স্বপ্ন, স্বপ্ন আর সতী। মাঝে মধ্যে রেগে যায়, ভজনলাল। বিরক্তহয়ে বলে উঠে, এভাবে মুষড়ে পড়ে থাকলে শরীরটা তোর থাকবে? আচ্ছা, এসব চিন্তা করে কোন লাভ হবে তোর? মানুষ মরে গেলে সে কি আর থাকে? চিতার ধূয়ো উড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু তার শেষ হয়ে যায়। ও সব ভূত-প্রেত সব বাজে কল্পনা, ফালতু বাত। ফক্কা বাজি। তা নয় তো কি?

বুঝিয়ে তাকে বলতে লাগল ভজনলাল এই যে তার ইটভাঁটাটা দিব্যি তো এখন রাতে দিনে কাজ হচ্ছে। কুলি-কামিনরা মেয়ে-ছেলে নিয়ে ঝুপড়ি বেঁধে নিশ্চিন্তে বাস করছে। কিন্তু এককালে? এককালে নাকি ছিল এটা একটা মস্ত বড় ভুতুড়ে জায়গা। মড়া ফেলা হত এখানে। হাসপাতালের যত সমস্ত বেওয়ারিশ লাশ পোঁতা হত এই জায়গায় এনে। পাশেই তো তাদের বাঁকাদহ গ্রাম। রাতে তো দূরের কথা দিন-দুপুরেও ভয়ে কেও ভুলেও পা মাড়াত না এদিকে। কিন্তু সে, অর্থাৎ তার এই ভজহরি পাণ্ডা, দিব্যি তো টিকে আছে সেই গোড়া থেকে বহাল তবিয়তে। তোর যদি ওই ভূত-প্রেত দত্যি-দানোগুলো সত্যি হত তবে কি টিকে থাকতে পারতো সে? আর সে এই যে আজ চার-পাঁচ দিন পড়ে আছে এখানটায় দেখেছে কি কিছু? শুনেছে কি কোন ভুতুড়ে কথা বা ভূতের হাসি, প্রেতের কান্না, হিঁ-হিঁ খিঁ-খিঁ বা কোন ফুড়ুক্-ফুড়ুক শব্দ? সুতরাং ওসব গাঁজাখুরি কথা, অবাস্তব ধারনা। মাথায় ওসব গিজগিজ না করিয়ে উচিত তার মগজটা পরিষ্কার করা। নিজের ধান্দা দেখে চলা। জীবনটা এখনও অনেক বাকী তার।

কিন্তু ভজনলাল যতই বোঝাক না কেন ভূতনাথের মন ময়নাবুলি তার ধরলে তো। সেই কথায় বলে না—আর লোকের আর চিন্তা, ছুতোর মাগীর ধানের চিন্তা। ঢেঁকিকে যতই বোঝানো হোক না কেন ধানভানা সে কখনও ছাড়ে না। সুতরাং যে ভূতনাথ সেই ভূতনাথই রয়ে গেল। সেই সতী, সেই মায়া, সেই স্বপ্ন, সেই ঘটনা মনের কাছে বার বার আসতে লাগল তার ভেসে। অবশ্য এগুলো যে সে ভুলবার একেবারেই চেষ্টা করত না—তা নয়। ভজু না থাকলে ইটভাঁটার পাশে নদীর পাড়টাতে বসে থাকত সে—একলা। আরাম চেয়ারটায় হেলান দিয়ে দেখতো সে পড়ন্ত বেলায় রঙিন সূর্য্যের খেলা। মনটা রাখতো দূর গগনে শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে। সেখানে হাসিমুখে সূর্যিমামার মুখ লুকানোর কেরামতিটা। বড্ড ভাল লাগতো তাকে। ডুবন্ত সূর্য্যের সেই রঙিন আভাগুলোকে নিয়ে মেঘেদের ছুড়োছুড়ি খেলা বসে বসে দেখতো সে। মনে হত ভূতনাথের ঝরে পড়া সেই রঙিন আভার গুঁড়োগুলো নিয়ে যেন শুশুনিয়ার কোল থেকে বয়ে আসছে শালী-নদীটা। বালির উপর তার ছিলছিলে স্রোতটা মনে হত যেন রঙের খেলার আবিরগুলা জল। সেই জলের উপর পা দিয়ে দিয়ে ওপাড় থেকে এপাড়ে ফিরে আসতো মোষের পাল। বাঁকাদহ গোয়ালা-প্রধান গ্রাম। তাই সকাল হলেই এপার থেকে ওপারে মোষ চরাতে যায় রাখাল ছেলেরা। ফিরে এই প্রাক-সন্ধ্যায় অস্তনিত সূর্য্যের রঙিন আভাকে মাথায় করেই। নদীর বুকে মোষের পিঠে বসে রাখাল ছেলেদের বাঁশী বাজাতে বাজাতে সুন্দর এই

বাড়ী ফেরার দৃশ্যটা বড্ড ভাল লাগতো ভূতনাথের। ভাল লাগতো তাদের ওই সহজ সরল জীবনের ছবি। ভাল লাগত বাঁশীতে তাদের ভেসে আসা মেঠো সুর—ভার করে মুখ রইল রাধা, মান করে মানিনী গো, কি করে মান ভাঙ্গর রাধার বল ত্বরা সেই উপায় গো.... কৃষ্ণযাত্রার গান। বড় পরিচিত কলি এখানের কুলি-কামিনদের। কাজের ফাঁকে, বিশ্রাম বেলায় গুণগুনিয়ে প্রায় সকলকেই এই গানটা গাইতে শুনেছে ভূতনাথ। কিন্তু আজ হঠাৎ বাঁশীর সুরে না জানি কেন মায়ার কথা বড় বেশী স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল এই গানটা।

স্মৃতিই বন্ধন, বিস্মৃতিই মুক্তি। কিন্তু মুক্তি কি করে পাবে ভূতনাথ? যা কাণ্ড করে এসেছে সে মায়ার উপর পারবে তাকে বিস্মৃতির কোটায় ফেলে দিতে? সেই রাতের দৃশ্যটা মনে পড়লে এখনও কেমন একদিকে ঘৃণায় লজ্জায় মাথাটা হেট হয়ে যায় তার অপর দিকেও তেমনি ক্ষোভে দুঃখে অপমানে রি রি করে উঠে তার সমস্ত শরীরটা। গ্রামের ওই অপগণ্ড লোকগুলোর প্রতি ফুঁসে উঠে তার অন্তর। কি কেলেঙ্কারীর মধ্যেই না ফেলেছিল তারা! ছিঃ—।

কিন্তু তার কথা থাক। তার হটকারিতার বলি হয়ে মায়া এখন কি দুর্ভোগ ভোগ করছে কে জানে। কে জানে তার নির্বুদ্ধিতার ফলে কিরূপ কলঙ্ক লেপন করেছে তার উপর গাঁয়ের লোক। উচিত হয়নি তার এভাবে তাকে সকলের সন্দেহ, অবিশ্বাসের মধ্যে ফেলে চলে আসা। কদিন আত্মগোপন করে থাকবে সে? আর থাকবেই বা কেন সে এভাবে লুকিয়ে? কি অন্যায় করেছে সে? কি তার অপরাধ? আসলে মনে হয় সে একটি ভীতু। কাপুরুষ।

কাপুরুষ নয়তো কি? সত্যকথা যে স্পষ্টভাবে বলতে পারে না, শত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও যে বুক ফুলিয়ে আসল ঘটনা প্রকাশ করতে সাহস পায় না, প্রানের ভয়ে যে লুকিয়ে বেড়ায় তাকে ভীতু-কাপুরুষ ছাড়া আর কি বলা যায়? আসলে সে একটা স্বার্থপর পশু।

পশু? হ্যাঁ, পশুরাই তো স্বার্থপর হয়। কোন্ লজ্জায় সে মায়ার কথাটা চিন্তা না করে লেজগুটিয়ে নিজে চলে এল রাতের অন্ধকারে? কোন্ লজ্জায় সে একটা নিষ্পাপ, নির্দোষী, অবলা সরলা মেয়েকে মিথ্যা একটা কুৎসা কেলেঙ্কারির মধ্যে ফেলে দিয়ে এসে এখানে বন্ধুর কাছে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে কাল কাটাতে লাগল? জানে না সে, সত্যই হোক মিথ্যাই হোক মেয়ে মানুষের চরিত্রে একবার কালি ছিটালে সে দাগ আর জীবনেও মুছা যায় না? তার বুদ্ধিহীনতার ফলেই হয়তো মায়া সেখানে চরিত্রহীনা, কলঙ্কিনী, কুলটা, নষ্টা মেয়ে ইত্যাদি মিথ্যা অপবাদের বোঝা নিয়ে দিন কাটাচ্চে। এর প্রতিকার করতেই হবে তাকে। কারণ ভূতনাথই তো তার এই অবস্থার জন্য দায়ী। এমনিভাবে এখানে লুকিয়ে থেকে দিনগত পাপক্ষয় করা তার মানুষের কাজ নয়। যেতে হবে তাকে গাঁয়ে। সম্মুখীন হতে হবে সকলের। বুঝিয়ে বলতে হবে সকলকে তার আসল কথা। বিশ্বাস করা বা না করা তাদের ব্যাপার। কিন্তু প্রাণের চেয়ে মান বড়। আর একজন পুরুষের কাছে সবার চেয়ে বড় কাজ হল মেয়েমানুষের সম্মান রক্ষা করা। তাদের কলঙ্কমুক্ত রাখা।

হঠাৎ ভাবনায় ছেদ পড়ল ভূতনাথের। কোত্থেকে হন্তদন্ত হয়ে সাইকেলে চড়ে ছুটে এল ভজনলাল। এসেই বলে উঠল ভূতনাথকে, —আমার আজ আর ভাঁটায় থাকা হবে না ভূতু। অবশ্য এখানে একলা থাকতে হবে না তোকে। সঙ্গে থাকবে তোর বন্ সিং, বিহারী লাল, খাদুরায়।

অবাক হয়ে ভজনলালের দিকে তাকিয়ে দেখল ভূতনাথ চোখে মুখে তার উদ্বেগের রেখা, উৎকন্ঠার ছাপ। ব্যাপার কি? জিজ্ঞেস করার আগেই বলে উঠল ভজনলাল, —আচ্ছা, তুই-ই বল, পুরুষ হোক নারী হোক অসময়ে বিপদের মুখে কেও যদি এসে আশ্রয় চায় তাকে আশ্রয় না দেওয়াটা কি ঠিক?

— ব্যাপারটা কি আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

—আমি বুঝতে পারছি উত্তেজনার মুখে বলে উঠল ভজহরি পাণ্ডা—আসলে এই যে আমি এখানে ইট ভাঁটাটা করেছি, দুপয়সা কামাচ্ছি, একটু মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছি—তাই তাদের এসব হল আমাকে মুড়িয়ে দেবার চাল। এ্যাদ্দিন তো নানা কাণ্ড করে অন্য কোন উপায়েই আমাকে টিট্ করতে পারে নি। তাই এখন মেয়েছেলে নিয়ে মিথ্যা একটা কুৎসা কেলেঙ্কারি রটিয়ে দিতে চাইছে আমার উন্নতির পথে বাধা। জানিস, গ্রামের লোকের আমাদের স্বভাবটাই এমনি। কেও কারো ভাল দেখতে চায় না। একজন কুষ্ঠ যেমন আরো সুস্থ

পাঁচ-জনকে কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত করতে চায় তেমনি আমাদের পাড়া-গাঁয়ের লোক। চায় তারা তাদের সবাই হাতে ডালা, কাঁধে ঝুলি নিয়ে ভিখারী হয়ে ঘুরে বেড়াক।

ভূতনাথ তো ভ্যাবা গঙ্গারাম। ঝড়ের মত বলে গেল ভজু কি হবে? আসলে ভূতু কিছু বুঝলে তো। তাই হাবা রামকান্তের মত মুখটার দিকে তার তাকিয়ে রইল সে। বুক চাপড়িয়ে ভজহরি পাণ্ডা বলে যেতে লাগল তেমনি রাগতস্বরে, বীরদর্পে—বুঝলি ভূতু, সকলের মাঝে স্পষ্ট বলে দিয়ে এসেছি আমি—ভজনলাল কাপুরুষ নয়, ভীতু নয়। তার ইটভাঁটায় ঘন্টাকয়েক থাকার জন্য মীনার নামে যদি সত্যিই কোন কলঙ্ক রটে এবং এর জন্য সত্যিই যদি তার বিয়ে আটকে যায় তবে মীনার বা তার মা-বাবার ইচ্ছে থাকলে করবে সে তাকে বিয়ে। কিন্তু একটা কথা, তার আগে তাকে প্রমাণ করবার সুযোগ দিতে হবে যে মীনার উপর সে কোন অসৎ আচরণ করে নি।

যা বাবাঃ! মীনা, অসদাচরণ—এসব বলছে কি ভজন! ভজন ভূতনাথের পিঠটায় আলতোভাবে চাপড় মারতে মারতে বলে উঠল তাকে থতমত স্বরে, ব্যস্ত-সমস্তভাবে,—তুই কষ্ট করে আজকের রাতটা ভাটায় একটু একলা থাক ভূতো। লোক এসেছে। মীনার বিয়ের কথাবার্তা আজকে রাতেই হবে ফাইন্যাল। সে সময় আমি নিজে যদি উপস্থিত না থাকি তবে এক ফোঁটা গো-মূত্রের মত সেদিনরাত্রে আমার ভাঁটায় মীনার থাকার কথাটা তুলে দিবে সব ছিটিয়ে—নষ্ট করে।

—সে না হয় হোল, কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বলতো? তোকে তো এমন উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি আমি কোনদিন! কে মীনা? তোর সঙ্গে তাকে জড়িয়ে লোকে সন্দেহই বা করছে কেন?

আসল ব্যাপার যা বলল ভজন তা মায়াকে নিয়ে তারই মত হল এক কাক তালীয় ঘটনা। মীনাকে নিয়ে অঘটনে পড়ার সে তার এক অদ্ভুত জীবনেতিহাস। নদীর ওপারে তিলাবেদ্যা গ্রামে ছিল সেদিন চৈতগাজনের মেলা। শুধু বাঁকাদহ কেন আশপাশ গ্রামের মেয়েছেলে আদি করে প্রায় সকলেই যায় তিলাবেদ্যার এই চৈত্-সংক্রান্তির মেলা দেখতে। এক বিকালের গাজন হলে কি হবে এ মেলা জমেও যেমনি, বেচা-কেনাও হয় তেমনি। বাঁকাদহের আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে নাম-পাড়ার গোপাল ঘোষের মেয়ে মীনাক্ষীও গেছল গাজন দেখতে। অঘটনটা ঘটেছিল ফেরার সময়। মাঠের মাঝে হঠাৎ তাদের আক্রমণ করল কালবৈশাখী। সে এক দূরন্ত ঝড়। ধুলো-বালি নিয়ে মস্ত একটা দৈত্যের মত সেটা হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল হঠাৎ তাদের উপর। সোঁ সোঁ গোঁ গোঁ -সে এক প্রচণ্ড বেগ তার। দুর্দান্ত গতি। সূচের মত বিঁধতে লাগল গায়ে উড়ন্ত ধুলো-বালিগুলো। দু-হাতে চোখ-কান-মুখ ঢেকে সবাই আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে লাগল এধার ওধার। কে কাকে দেখে। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। ঝড়ের তোড়ে কে যে কোনদিকে গেল কারো কোন খেয়াল রইল না। মীনা এসে নাকি আশ্রয় নিয়েছিল নদী- ওপারের পাকুড় গাছটার তলায়। আসতেই সেখানে সন্ধ্যা। ঝড় ছাড়তেই রাত। তার উপর মেঘের ঘনঘটা বাড়াতে লাগল ক্রমশঃ অন্ধকারটাকে। পাকুড় গাছ ছেড়ে মীনা নদী পেরিয়ে এল তার ইট ভাঁটার কাছে। আর ওমনি শুরু হল বৃষ্টি। তার সঙ্গে ঝড়টাও আবার ঘুরে এসে যোগ দিয়ে আরম্ভ করল সে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড! প্রকৃতির সে কি উগ্রচণ্ডামূর্তি। কোনরকমে ছুটে এসে ঢুকল মীনা তার ইট-খোলার ঘরটাতে। বাইরে চলতে লাগল ঝড়-বৃষ্টির নাচন-কোঁদন পুরোদমে। প্রলয় নাচনে যেন মেতে উঠলেন মহাকাল, কাল-ভৈরব। যেমনি ঝড়ের ঝাপট, তেমনি বৃষ্টির দাপট। ওই তাণ্ডবের মুখে বাইরে বেরোয় কার বাপের সাধ্যি! বাধ্য হয়ে মীনাকে থাকতে হল তার ইট ভাঁটাতে। বলতে বলতে ভজনলাল হঠাৎ হাত নেড়ে উগ্রমূর্ত্তিতে বলে উঠল তাকে —সেই মীনার থাকা নিয়ে গ্রামের শালারা বদনাম রটায় আমার নামে। মেয়েটার নামে রটায় কুৎসা-কেলেঙ্কারী। বলে কিনা আর পাঁচটা মেয়েকে ছেড়ে মীনা বেছে ঠিক তোর ভাঁটাতেই একলা আশ্রয় নিতে এল কেন? আচ্ছা তুইই বলতো ভূতু, সে সময় কারো কোনো ঠিক থাকে? তাছাড়া মেয়ে হোক পুরুষ হোক মানুস তো আমরা। বিপদের সময় আমাদের করণীয় কর্তব্যটা কি?

ভূতনাথ কি আর বলবে তাকে। ভজনার উত্তেজিত মুখটার দিকে শুধু তাকিয়ে রইল সে। তেমনিভাবে গর্জাতে লাগল ভজনলাল, আমি অমানুষ নই। একটা মেয়েকে সন্দেহ কেলেঙ্কারীর মুখে ফেলে দিয়ে আমি গা-

ঢাকা দিয়ে থাকবো ভাবছিস? সত্য যা তা সকলের মাঝে সাহস করে বুক ফুলিয়ে বলবো। বিশ্বাস করা না করা তাদের ব্যাপার। তবে কোন মেয়ের আমি সর্ব্বনাশ করবো না। আবার ওই করণীয় কর্ত্তব্যটুকুর ফলে একটা মেয়েকে যদি চিরকাল অবিবাহিত থেকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে চোখের জল ফেলতে হয় তাহলে ধর্ম্মে আমার সইবে না। আজই এর হেস্তনেস্ত করতেই হবে আমাকে। হয় বিয়ে দেব তার নইলে বিয়ে করব আমি নিজেই। থাক তুই আজকের রাতটা একটু একলা কাল সকালেই ফিরে এসে আমি বলব তোকে সমস্ত কথা। চললাম আমি।

কথাগুলো বলে দিয়েই সাইকেলে চড়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল ভোজু নিজের গ্রামের দিকে। ভূতনাথ তেমনি ভাবে নদীর কিনারে বসে ভাবতে লাগল নিঝুম হয়ে। মনে হল-তার এগুলো যেন নিছক ভোজুর কথা নয়। তার অন্তরাত্মারই নির্দ্দেশ। বিবেক যেন ভোজুর মুখ দিয়ে দিচ্ছে তাকে তার করণীয় কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত। মায়াকে সে মীনার মতই ফেলে এসেছে অসহায় অবস্থায়। এখানে আত্মগোপন করে দিনের পর দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে সে তার প্রতি গাঁয়ের লোকের সন্দেহ, অবিশ্বাস। সত্যি, তার সেদিনের হটকারিতায় মায়া যদি চিরকাল কুলটার কলঙ্ক নিয়ে জীবন কাটায় তবে কিসের সে পুরুষমানুষ। ভজনলাল আদর্শ তার। কাপুরুষের মত এখানে বসে থেকে একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করা উচিত নয় তার। আজই যাবে সে বাড়ী। সকলের সামনে সাহস করে বলবে সে তার আসল ঘটনা। বিশ্বাস-অবিশ্বাস তাদের ব্যাপার। মোটকথা সব কিছু বলে তাকে পরিষ্কার হতে হবে আগে। তারপর যা করণীয় করবে সে। করবে সে সকলের মাঝে সাহস করেই। ভীতু, কাপুরুষ হয়ে নয়। উঠল বাই তো বিলাত যাই চিরকালের স্বভাব ভূতনাথের—সুতরাং সে বৈশিষ্ট্যের সে ব্যত্যয় ঘটাবে কেন। চণ্ চাপতেই উঠল সে। ধরল বাড়ী ফেরার পথ। সেই মুহূর্তেই সেই কিনাব থেকে নেমেই নদীর বুকে বুকেই চলতে লাগল সে। চলতে লাগল বালির উপর দিয়ে। রইল পড়ে কিনারে তার বসে থাকার চেয়ারটা। রইল পড়ে ভাঁটার ঘরে নিজস্ব তার দু-একটা টুকি-টাকি। সেদিকে একবার ফিরেও তাকাল না সে। পাছে পাড়ের পথটা ধরে গেলে খাঁদু রায়ের সঙ্গে দেখা হয়। জিজ্ঞেস করে আটকে দেয় তাকে। বনু সিং, বিহারীলাল অপেক্ষা করতে বলে তাকে, বাবু না আসা পর্য্যন্ত। তাই ও পথ দিয়ে গেল না সে। চলতে লাগল সে মাঝ নদীর ক্ষীণ জলধারাটাকে অনুসরণ করে। এই স্রোতই আসল সঙ্গী তার। এই নদীই তো চলে গেছে তাদের গ্রামের শেষের বটতলার শ্মশানটার উপর দিয়েই। এরই বুকেই আছে পড়ে তো তার সতীর শেষ চিহ্ন, চিতাটা। সুতরাং চলো মুসাফির।

(তের)

চলেছে ভূতনাথ। শালীনদীর বুকে, বালি-উপত্যকার মাঝ দিয়ে ক্ষীণ জলধারাটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে সে। ওধারে বিদায় নিয়েছে সন্ধ্যা বহুক্ষণ আগে। এধারে দুপাশ জুড়ে নেমে আসছে অন্ধকার সব-চৌহদ্দি গ্রাস করে। দু-পাড়ের গাছ-গাছালিগুলো ঠেলে রেখে অন্ধকারটাকে দেখছে যেন ভূতনাথের কাণ্ড-কারবার। এই নদীরই ও পাশ দিয়ে এসেছিল ভূতনাথ একদিন মাঠের উপর মানুষ-চলা ডহর-পথটা ধরে। আর আজ, ফিরে যাচ্ছে সে সেই পাড়েরই নীচটা দিয়ে নদীর বুকে বালি-উপর স্রোতের চলা পথটা ধরে। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি তার। যেন সে ভূতনাথ নয়। এই নদীরই জলধারা। যাচ্ছে বয়ে সে দু-পাড়ের গাছ-গাছালি, মাঠ শ্মশান, বাগান-বাগিচা, নগর-জনপদকে পিছনে রেখে। কুলু-কুলু, কল কল, ছল ছল গতিতে। কিন্তু সব নদীই তো যায় সমুদ্রের বুকে পড়তে, সে যাচ্ছে আজ কোন সাগরের সঙ্গে মিশতে?

মাথা-মুণ্ডু কি যে ভেবে ভেবে যাচ্ছিল ভূতনাথ কে জানে। হঠাৎ আকাশে কৃষ্ণ-সপ্তমীর চাঁদটা নজরে পড়তেই চিন্তার ধারাটা পাল্টে গেল তার। মনে হল চাঁদটা যেন দেখে তাকে হঠাৎ গেল চমকে, থমকে গিয়ে সে যেন কেমন এক ভাবে দেখতে লাগল ভূতনাথকে। সে এক বিষাদ-করুণ চেহারা তার। এমনি ভাবেই মায়া একদিন হঠাৎ চমকে উঠে তাকিয়ে ছিল তার মুখটার দিকে। অবাক-বিস্ময়ে! অপ্রত্যাশিত ভাবে তার হাতের চাপড়টা সেদিন আচমকা পড়েছিল তার গালে। এই সেই ভূতনাথ! এই তার ব্যবহার! এই ভদ্র সে! ছি-ছি-ছি-ছি!

মনে পড়তেই হৃদয়টা ভূতনাথের হয়ে উঠল বেদনা ভারাক্রান্ত। সেদিনের ঘটনা ভিড় করে এল তার স্মৃতি পটে। অনুতাপ, অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগল তার অন্তর। সেই সমস্ত স্মৃতির রোমন্থন করতে করতে কখন, কিভাবে, কতক্ষণ পরে যে সে হাজির হয়ে গেল তাদের গ্রামের শেষে মাঠের পরে সেই বটতলার শ্মশান ঘাটটাতে কে জানে। হুঁস হল তার দমকা হাওয়ায় গাছটা যখন নেড়ে দিল তার শাখাপ্রশাখা গুলোকে, উড়িয়ে এনে দিল ফেলে তার সামনে দুচারটে পাতা। হুঁস হতেই দেখল ভূতনাথ নিস্তব্ধ নিঝুম চারদিক! নিরিবিলি, জনশূন্য সে এক শান্ত-সৌম্য অদ্ভুত পরিবেশ। সে পরিবেশে চোখ ঘুরতেই নজরে পড়ল তার সতীর চিতাটা। এ চিতাই তো সতীর অস্তিত্ব বিলোপের শেষ চিহ্ন নয়। এটা হল তার পঞ্চভৌতিক দেহটার পঞ্চভূতের ঋণশোধ করার ক্ষেত্র মাত্র। সত্তাটা তার জড়দেহটাকে ত্যাগ করলেও তাকে ত্যাগ করতে পারে না কখনও। ফেলে যেতে পারে না তাকে কোনদিন। এ পৃথিবীতে তাকে একলা রেখে পারে না সে চলে যেতে চিরকালের মত। ভজনলাল তাকে ভুল বুঝিয়ে ছিল। মিথ্যা তার কথা। কে বলে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় মানুষের সমস্ত অস্তিত্ব? কে বলে চিতার ধূঁয়ো ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় তার জীবনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক? উড়ে যায় প্রেম-প্রীতি-স্নেহ ভালবাসা? অসম্ভব। আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের দেওয়া দান এসব নষ্ট হতে পারে না কোনদিন। তার মতোই এসব চিরন্তন, শাশ্বত, অবিনশ্বর। সতীর সঙ্গে সত্তা যে তার এ-সম্বন্ধেই যুক্ত। এ সম্বন্ধ ছাড়া যে সতীর অসম্ভব।

তাই যদি সত্য হয় তবে দেখতে পাচ্ছে না কেন সে তাকে? কেন সে পাচ্ছে না শুনতে তার কোন কথা? তবে কি তাকে ভুলে গেছে সতী? না-না, তাতো হতে পারে না। তবে সে কি রাগ করে আছে তার উপর? হতে পারে। মায়াকে যে বড় ভালবাসতো সতী। সে-ছোট বোনটার উপর ছিল তার গভীর স্নেহ। তাকে আঘাত করেছে সে। মেরেছে চাপড়। তাই সতীর রাগ হয়েছে মনে। অভিমান করে আছে তার উপর। কিন্তু—ভাবতে লাগল ভূতনাথ। সতী যে বলেছিল ডাকলেই তাকে দেবে দেখা। স্মরণ করলেই আসবে সে। এতো তার নিজের মুখে দেওয়া তাকে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। এ প্রতিশ্রুতি তো লঙঘন করতে পারে না সে। কেমন যেন একটা বিশ্বাসে চাঙ্গা হয়ে উঠল তার মনটা। সেই শক্তিতেই মন-প্রাণ এক করে ডাকতে লাগল সে,—সতী তুই দেখা দে। কথা রাখ তোর। আয় আমার কাছে। সতী-সতী—

রাত্রের নির্জনতায় ভূতনাথের ডাকটা নদীর গাছপালাগুলোকে যেন ঝঙ্কৃত করে তুলতে লাগল। প্রতিধ্বনিত হয়ে তার স্বরটা ঠক্কর খেতে লাগল নদীর এপাড়ে-ওপাড়ে। কেমন যেন এক ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সতীর চিতাটার দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগল ভূতনাথ। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল তার স্বরটা। দেখল সে সতীর চিতাটার উপর একটা ধূঁয়োর কুণ্ডলী। কুণ্ডলীটা পাক খেতে খেতে বড় হতে হতে ধরল একটা অবয়ব। অবয়বটা জমাট বাঁধতে বাঁধতে আকার নিল একটা মানুষের মূর্ত্তিতে। মনে হল ভূতনাথের সামনে যেন দাঁড়িয়ে আছে তার ঘন-কুয়াশার একটা মানুষ। মূর্ত্তিটা বলে উঠল সতীর গলায়,—কি ভূতুদা? চিনতে পারছো আমাকে?

গলাটা শুনে ভীতি-বিহ্বল অবস্থাটা যেন কেটে গেল ভূতনাথের। মনে-প্রানে এনে দিল তার কেমন একটা সাহস। সেই সাহসের উপর ভর করে সে বলে উঠল তাকে,—সতী, একি মুর্ত্তি তোর। এ চেহারায় তো আমি দেখিনি তোকে কোনদিন।

ভেসে এল মূর্ত্তিটার কাছ থেকে একটা হাসির শব্দ। সতীর মতই মিষ্টি-মুধর স্বরটা সে হাসির। হাসি থামিয়ে বলে উঠল মূর্ত্তিটা,—কি করব বল? তোমার অবিশ্বাসের ঘোরটাই আমাকে আজ হাজির করল এরূপে তোমার কাছে। সব সৃষ্টিরই আদিরূপ তো এই গ্যাসীয় অবস্থা ভূতুদা। সব বস্তুই বায়বীয় তরল অবস্থা থেকে পরিণত হয় ক্রমশঃ কঠিন আকারে। অদৃশ্য অবস্থা থেকেই সুদূরের ওই নীহারিকা পুঞ্জ প্রতিভাত হয়েছে প্রথম এই গ্যাসীয় রূপেই। আকাশের সূর্য্য-আদি তারা-জ্যোতিষ্কের আদিরূপ এই গ্যাসীয় অবস্থাই। এই অবস্থা থেকেই জমাট বেঁধে রূপ নিয়েছে সব গ্রহ-উপগ্রহ জড়-প্রাণী।

হতভম্ব ভূতনাথ অবাক-বিস্ময়ে শুনতে লাগল সেই ধোঁয়াটে ধূসর সতী-মূর্ত্তির কথাগুলো,—জান ভূতুদা, জন্ম-মৃত্যুর পর্য্যায়ে সত্তা আমাদের দৃশ্য-অদৃশ্য উভয় অবস্থাতেই থাকে। জীবাত্মা ঠিক জলকণার মত। জলবিন্দু যেমন প্রথমে অদৃশ্য, তারপর বাষ্পীয় ঘনীভূত মেঘপুঞ্জ থেকে ক্রমশ পরিণত হয় বৃষ্টি ও জমাট বেঁধে তুষার

বা বরফে। প্রাণ বিন্দুও তেমনি। জন্মের পর দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তব রূপে থাকলেও মৃত্যুর পর সে থাকে অদৃশ্য, সূক্ষ্মরূপে। দেহত্যাগের পর এই সূক্ষ্মসত্তা ধোঁয়াটে বায়বীয় অবস্থা থেকে যেমন অদৃশ্য হয়ে যায় তেমনি অদৃশ্য অবস্থা থেকে তাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে হলে এমনি বায়বীয়, গ্যাসীয় অবস্থা থেকেই আসতে হয়। এতে কোন ভয়ের ব্যাপার নেই ভূতুদা।

বলে উঠল ভূতনাথ,—তোর আভাসে, কথার স্বরে কোন ভয় মনে আমার স্থান পায়নি সতী। তবে এ-রূপে আমি দেখতে চাইনি তোকে। দেখা দে আমাকে সেই চেহারায়। যে চেহারায় বাস্তব জীবনে সদা-হাস্যময়ীরূপে তুই থাকতিস আমার কাছে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই কুয়াশার শরীরটা সতীর পরিণত হল মানবীরূপে। সেই মুখ, সেই চোখ, অধরে তার তেমনি স্নিগ্ধ হাসি। হাসতে হাসতে বলে উঠল সতী,—আমি যা, তাই কিন্তু আছি ভূতুদা। ভজনদার কাছে তোমার সন্দেহ অবিশ্বাসই হাজির করেছে আমাকে এভাবে তোমার কাছে—ভৌতিক এই বায়বীয় আকারে।

—ভজনার কথা আর আমি বিশ্বাস করব না সতী। তুই যে রূপে যে আকারেই থাকনা কেন-- আমার তুই সতী হয়ে থাক। থাক তুই আমার অন্তরের জ্যোতি বিন্দু হয়ে। সেই আলোতে যেন আমার অন্ধ ধারণা, ভুল বিশ্বাস সব দূর হয়ে যায়। তোকে যেন কোনদিন কখনও আমাকে সন্দেহ করতে না হয়।

—আজ তোমাকে বড় বেশী উতলা কেন দেখাচ্ছে ভূতুদা? হাসি মুখে কেমন যেন এক বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে বলে উঠল সতী,—ও, বুঝেছি। মায়ার জন্য মনটা বোধ হয় খারাপ করছে তোমার?

—সত্যি সতী। ব্যগ্রভাবে বলে উঠল ভূতনাথ,—মায়ার জন্য প্রাণটা আমার বড় বেশী উতলা হয়ে আছে রে। বড় অন্যায় করে এসেছি আমি তার উপর। এত বড় মেয়েব গায়ে হাত তুলেছি আমি। মেরেছি তাকে থাপ্পড়। এ গালে ও গালে থাপ্পড়ের পর থাপ্পড়। মার খাওয়া তার সেই করুণ মুখ, অসহায় চোখের চাওনি—বড় বেশী কষ্ট দিচ্ছে আমার মনটাতে। অনুতাপের ব্যথা বড় বেশী মোচড় দিচ্ছে আমার অন্তরটাকে। কি করব আমি বল?

—কি আর করবে? সহজ ভাবে, সরল সুরে বলে উঠল সতী,—যা করেছ—ঠিক করেছ। তোমার ওই মারটাই ওর প্রয়োজন ছিল জীবনে। দুঃখ করার কিছু নেই ভূতুদা। তুমি কোন অন্যায করনি। শাসন করা তারই সাজে যে করে সোহাগ। তার প্রতি তোমার গভীর স্নেহ, অন্তরের ভালবাসাই দিয়েছে তোমাকে এই অধিকার। মায়া খুব ভাগ্যবান ভূতুদা তাই খেয়েছে তোমার মার।

—কিন্তু আমি? বলে উঠল ভূতনাথ—আমি যে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না মনে। তার কুৎসা, কলঙ্ক সবের জন্য দায়ী তো আমিই। জীবনটা তো তার নিন্দায় ঘৃণায় ভরিয়ে দিয়েছি আমিই। সেই রাত্রে বেলায়, একলা ঘরে যদি আমি........না না আমি কেন যদি তুই না পাঠাতিস আমাকে ....না সতী, এর জন্য তুই-ই দায়ী। এ সমস্যায় তুই-ই ফেলেছিস তাকে এবং আমাকে। তোকেই করতে হবে এর সমাধান। বল মায়ার কুৎসা, কলঙ্ক দূর হবে কি করে?

—তা আমি কি করে বলব। বলে উঠল সতী,—শ্রীরাধার কলঙ্ক তো শ্রীহরিই ভঞ্জন করেছিলেন। তাহলে মায়ার কুৎসা তার ভূতুদা দূর করবে না তো আর কে করবে বল?

কথায় কথায় ভূতনাথ কেমন যেন স্বাভাবিক হয়ে গেল। সতী যে মৃত এবং সে যে জীবন্ত এ পার্থক্যটা একেবারে দূর হয়ে গেল তার মন থেকে। শুধু তাই নয় সে যে শ্মশানে, নির্জন নদীর বুকে কথা কইছে চিতার উপর ভেসে উঠা একটা বিদেহী সত্তার সঙ্গে এ বোধও লোপ হয়ে গেল তার। মৃদু স্বরের একটা চাপা ধমকে বলে উঠল সে সতীকে,—হেঁয়ালী রাখ সতী। কথার প্যাঁচে আর রহস্যে ফেলে রাখিস না আমাকে। চিন্তা কর মায়ার কথা। মেয়ে মানুষের চরিত্রে এক ফোঁটা কলঙ্ক রটলে ছিটে যায় তার জীবনটা। যে যা বলার বলুক তুই তো জানিস, আমাকে নিয়ে তার উপর আরোপ করা কুৎসা ভুল, সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ কুৎসা দূর না হলে যে বিয়ে হবে না তার।

—তুমি তাকে বিয়ে না করলে যে এ কুৎসা তার আর দূর হবে না ভূতুদা। বলে উঠল সতী,—আর তুমি ছাড়া জীবনে সে অন্য কাকেও বিয়েই করবে না। তুমি তাকে এই অবিবাহিত থাকার বিষময় জীবন থেকে উদ্ধার কর ভূতুদা।

—একি বলছিস তুই? বিস্মিতভাবে বলে উঠল ভূতনাথ, এতে লোকে কি ভাববে! তাছাড়া মায়ার মনেই বা কি ধারণার সৃষ্টি হবে আমার সম্বন্ধে! তারও তো একটা ইচ্ছা বলে কথা আছে। এভাবে তুই ভূত-ভবিষ্যৎ না ভেবে সকলের কাছে আমাকে লম্পট সাজিয়ে রাখিস না জীবনে। মায়ার সম্বন্ধে তুই অন্য চিন্তা কর সতী। কথা দিচ্ছি আমি তোকে, জীবনে আমি আর বিয়ে করব না। আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি তোর সব গহনা মায়াকে দিয়ে—আমি তাকে এমন ভাবে, এমন ঘরে, এমন বরে বিয়ে দিতে চাই যাতে সে বা গ্রাম-ঘরের সকলে তার উপর আমার সেদিন রাত্রেবেলার ভুল-ত্রুটি সব চিরকালের মত ভুলে যেতে পারে।

ভূতনাথের দিকে তাকিয়ে তেমনি স্বাভাবিক মুখে হাসল সতী। সে-হাসিতে আর বুঝতে বাকী রইল না ভূতনাথের যে তার এত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা মোটেই আমল দিল না সে। হাত ধরে তাকে টেনে আনল সতী পাশের একটা উঁচু বালির চড়ার উপর। বসাল তাকে। বসল সে তার মুখোমুখি। আলো ঝরা জ্যোৎস্নায় নিস্তব্ধ নদীর বুকে কেমন যেন ঘরোয়া পরিবেশের সৃষ্টি করে দিল সে। তারপর হাসি মুখে দরদী গলায় বলতে লাগল সে,—আমি এখন মনোলোকের বাসিন্দা ভূতুদা। সকলের তাই মনের কথা জানতে পারি আমি। দেহধারী মানুষের চিন্তা-ভাবনা বর্তমানের চেয়ে সামান্য দুপা এগিয়ে বড় জোর নিকট ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত যেতে পারে। সুদূর ভবিষ্যৎ চিন্তা করার ক্ষমতা তাদের নেই ভূতুদা। অতীত সংস্কারের বশে তারা শুধু ভবিষ্যৎকে ধারণা করে নেয়। পরের তো দূরের কথা নিজেদেরই তারা ভাবী রূপ দেখতে সমর্থ হয় না। কিন্তু উচ্চ-আত্মিক যারা তারা ভূত-ভবিষ্যৎকেও বর্তমানের মত সুস্পষ্ট দেখতে পায়। আমি আমার দেখা তোমার সুন্দর ভবিষ্যৎটাকে একটু গড়ে দিতে চাই ভূতুদা। তুমি আমাকে সাহায্য কর।

—কি করতে হবে আমায় বল? জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ।

—মায়াকে তোমায় বিয়ে করতেই হবে ভূতুদা।

গম্ভীর হল ভূতনাথ। সতী মাথাটাকে তার কোলে টেনে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলতে লাগল তাকে,—মানুষের মনে বীজাকারে যা চিন্তা লুকিয়ে থাকে উন্নত মানসিক শক্তি সম্পন্ন জীবাত্মারা তা জানতে পারে ভূতুদা। তোমরা যেমন জানতে পার ক্ষুদ্র বট-বীজটির মধ্যে মহা মহীরুহ লুকিয়ে আছে। আমরাও তেমনি জানিতে পারি তোমাদের মনের ক্ষুদ্র ইচ্ছা বীজটির মধ্যে কি ভাবে তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন বৃক্ষের ফুল-ফল ইত্যাদি অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে লুকিয়ে আছে। মায়া তোমাকে শুধু এই জন্মেই স্বামী রূপে পেতে চাইছে না ভূতুদা। এ তার অতীত জীবনের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছার সংস্কার নিয়েই জন্মেছে সে আমার পরে বিগত জন্মেরই ছোট বোনটি হয়ে। এর জন্য মূলতঃ আমিই দায়ী ভূতুদা।

—কি যে বলছিস তুই মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে তুমি পারতে ভূতুদা যদি আধ্যাত্মজ্ঞানে একটু উন্নত হতে তুমি। জানতে তুমি পারতে আমার সব কথা যদি মনটা তোমার সে সব জানবার জন্য একটু উপযুক্ত হত। কারণ আমার যা বলার যা জানাবার তোমাকে, সব কিন্তু সঞ্চিত হয়ে আছে তোমার মনের অবচেতন স্তরে। মনটাকে একটু শুদ্ধ পবিত্র করে সে স্তরে সংযুক্ত করলেই সব জানতে পারবে তুমি। যাকগে ওসব কথা। আচ্ছা ভূতুদা, তোমার গতজন্মের কথা মনে পড়ে?

—গত জন্মের কথা! হাসালি তুই। বলে উঠল ভূতনাথ,—গতজন্মের কথা কারো মনে পড়ে নাকি? তাহলে তো আমি জাতিস্মর হয়ে যেতাম।

—জাতিস্মর না হলেও অনেকেরই গত জন্মের কথা মনে পড়ে ভূতুদা। বলে উঠল সতী,—উন্নত বিকশিত মন যাদের তাদেরই স্মৃতিপটে ভেসে উঠে পূর্ব্বাপর জীবনের ছবি। মন তো আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সমূহ ঘটনা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ভাণ্ডার ভূতুদা। সে সব থাকে আমাদের মনের অবচেতন স্তরে সংস্কার রূপে সঞ্চিত হয়ে। সুপ্ত, গুপ্ত, অব্যক্ত অবস্থায়। অনুকূল পরিবেশে কখনও-সখনও সেগুলো আপনা থেকে চেতন মনের স্তরে ভেসে উঠে। সাধক যোগী যারা, যারা তপস্বী, ইচ্ছা করলেই অবচেতন স্তরে তারা মনঃসংযোগ করলে অতীত জীবনের কথা জানতে পারেন। আবার ব্যক্তি মনতো সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত। তাই অধিক মানসিক শক্তি সম্পন্ন মানুষ যাঁরা, যাঁরা উচ্চ আত্মিক, তারা মন নিবিষ্ট করলে নিজের কেন অপরেরও বিগত জীবনের

সমস্ত কিছু জানতে পারেন। তাই তো তোমায় জিজ্ঞেস করছি ভূতুদা অতীত জীবনের ছবি তুমি দেখতে পেয়েছো কি না?

—পাব কি করে বল? আমি তো উচ্চ-আত্মিকও নই বা উচ্চ মানসিক শক্তি সম্পন্ন কোন সাধক যোগীও নই। আর ওসব সাধনা-ফাধনা যোগতপস্যা? হাত নেড়ে বলে উঠল ভূতনাথ,—জীবনে কখখনও হবে না আমার দ্বারা।

—তোমাকে ওসব করার দরকার নেই ভূতুদা। সে সব কাজ তোমার করবার জন্য আমি তো আছি। কিন্তু একটা কথা ভূতুদা, বলে উঠল সতী,—নিজেকে কোন দিন হীন মনে কোরো না তুমি। তোমার মানসিক শক্তি সম্বন্ধে তুমি কিছু জান না বলেই আজ তাই বলছো এমন কথা। দীর্ঘদিন সাধন -ভজন যোগ-তপস্যা করে যে স্তরে উঠা যায় তোমার মন সেই স্তরে উন্নীত ভূতুদা।

—তাই নাকি? বেশ একটু মজার সুরে বলে উঠল ভূতনাথ।

—তা নয়তো কি। বলে উঠল সতী,—এই যে পরের বিপদ দেখলে স্বাভাবিকভাবেই তুমি তা দূর করতে ছুটে যাও, কোন মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখলে স্বতস্ফূর্ত ভাবেই তার অবসান করতে অগ্রহী হও, তোমার এই পরোপকার প্রবৃত্তি, অপরের জন্য নিজেকে এমনভাবে বিলিয়ে দেবার মনোভাব এসব কি তোমার উন্নত মনের পরিচয় নয় ভূতুদা? সূক্ষ্ম অবস্থায় এসেই যে আমি মনকে তোমার পরিষ্কার ভাবে দেখছি তা নয় ভূতুদা। জীবিত অবস্থাতেও পরিচয় পেয়েছি আমি তোমার সহজ সরল উচ্চমনের। আমার মত একটা অতি সাধারণ, তুচ্ছ নগণ্যা মেয়ের বিপদ দেখে যে ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে তুমি তা দূর করতে; নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ, ভাল-মন্দের কথা চিন্তা না করে দিয়ে ছিলে যেভাবে আমাকে জীবনে স্থান, লোভ-লালসা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে, মা-বাবার পরিবার পরিজনের অনিচ্ছা সত্বেও নিজের বিবেককে জয়ী করবার জন্য আমার মত একটা কুৎসিত, কুরূপা মেয়েকে যে করেছিলে বিয়ে—এটা কি তোমার কম মানসিক শক্তির পরিচয় ভূতুদা? সাধক যোগীরা সাধন ভজন করেও অনেকে মন ,ক এমন উন্নত স্তরে আনতে সমর্থ হয় না। উচ্চ মন, পবিত্র হৃদয়, শুদ্ধ অন্তর না হলে এভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে কেও পারে না। তুমি দেবতা ভূতদা।

—তা হব বৈকি। বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে বলে উঠল ভূতনাথ,—তা না হলে কি গ্রাম, সমাজ, আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমি আজ এমন অবজ্ঞার পাত্র হই। লোকের ঘৃণা নিয়ে, লাম্পট্যের বদনাম নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় আমাকে ঘর দোর ছেড়ে। প্রাণের ভয়ে আমাকে লুকিয়ে পালাতে হয়। লোক নিন্দার ভয়ে আমাকে পড়ে থাকতে হয় ইট-খোলাতে। নদী-নালায়, অপথে বিপথে, অন্ধকারে নদীর মাঝে এই বালুর চড়ায় আসতে হয় আমাকে আত্মগোপন করে।

—তোমার খুব কষ্ট হয়েছে ভূতুদা? বলতেই সতী, ভূতনাথ উঠল ওমনি ফোঁস করে,—হবে না কষ্ট? কিন্তু এমন দশায় তুই আমাকে ফেললি কেন জা‌ ‌ ‌ত পারি কি? জানতে পারি দোষ কি আমার? যার জন্যে মহা অপরাধির মত এমন দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে আমাকে।

—তোমার কোন দোষ নেই ভূতুদা। সোজা সরল কথায় বলে উঠল সতী,—আর আমি থাকতে কোন দোষে বা বিপদে পড়তে দেবও না তোমাকে। তবে সুখের চেয়ে জীবনে এসে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করাটা খুব ভাল ভূতুতা। এতে প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হয়। তোমাকে যেমন আগে বলেছিলাম দুঃখই জীবনের স্পর্শমণি এখন তেমনি বলছি কষ্টই জীবনের ইষ্ট লাভের উপায়। তোমার ইষ্টলাভ তো আমার একমাত্র আশা ভূতুদা। সে ইষ্ট সেই পরম সত্তায় লীন হওয়া। তোমাকে যে দেবতার ে ‌ ‌মারও বড় হতে হবে ভূতুদা। তাতে এই জীবনেই প্রাক্তন কর্মফলের অবসান করতে হবে তোমাকে। দুঃখ-কষ্ট সবই তো আপেক্ষিক ভূতুদা। আর মানুষের নিন্দা-বান্দা সবই তো তাদের চঞ্চল-স্বার্থপর মনের ধারণা প্রসূত। ক্ষণিক উত্তেজনাপুষ্ট। জগতের ওসমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা, নিন্দা-প্রশংসাকে গ্রাহ্য করে, মুষড়ে পড়ে নিজের সত্তাকে পঙ্গু করে রাখলে চলবে না ভূতুদা। এগিয়ে যেতে হবে তোমাকে। ও সমস্ত মাড়িয়ে চলে মনকে যারা শুদ্ধ মুক্ত, নিত্য পবিত্র রাখতে পারে তারাই তো পরম সত্তার অধিকারী হয় ভূতুদা। আমার এ আশা যে তোমাকে পূর্ণ করতে হবেই ভূতুদা।

মুখে বিরক্তির ভাব এনে বলে উঠল ভূতনাথ,—তোর এসব বড় বড় কথা আমার ভাল লাগে না সতী। ভাল লাগে না এমন জীবন আমার।

—কেমন জীবন তোমার ভাল লাগে ভূতুদা? মুখের উপর তার মুখটা ঝুঁকিয়ে হাসি মুখে তাকে জিজ্ঞেস করল সতী।

চট করে এক কথায় এ সব প্রশ্নের তো উত্তর দেওয়া মুস্কিল। তাই ভাবতে লাগল ভূতনাথ। ভাবনার সূত্র ধরে চোখের সামনে তার সদ্য দেখা আজ বিকেলের শালী নদীর রোদ ঝিল মিল বুকে মোষ বা রাখালদের বাড়ী ফেরার দৃশ্যটা উঠল হঠাৎ ভেসে। বলে উঠল তাই ভূতনাথ,—জানিস সতী, সত্যি বলতে কি—বর্তমানের এ জীবন, অবস্থাপন্ন মা-বাবার এ জীবনের স্নেহ সম্পদ কিচ্ছু ভাল লাগে না আমার। ভাল লাগে কি জানিস? দূর গগনের পাহাড় কোলে থাকত আমার ছোট্ট একটা ঘর। সে ঘরে থাকত আমার দীন-দুঃখী মা-বাবা। সকাল হলেই তাদের হাতের খাবার নিয়ে গামছায় বেঁধে মোষ চরাতে যেতাম আমি। সমস্ত দিন পাহাড় কোলের সবুজ মাঠে চরিয়ে বেড়াতাম মোষ। তারপর বিকেল হলেই শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে—

—যুঁ-হুঁ, হাসি মুখে ঘাড় নেড়ে বলে উঠল সতী,—সব কিছু ঠিক বলা হচ্ছে না তোমার ভূতুদা। শুধু মোষ চরিয়ে বেড়ানো নয়। বল টিলার উপর বা গাছে চড়ে বসে বাঁশী বাজিয়ে মোষ চরাতে ভাল লাগে, লাগে ভালো কোন মেয়েকে পাশে বসে তোমার শ্রোতা-রূপে দেখতে। সে তোমাকে খাওয়াবে জল, খাওয়াবে ঠেকোয়া, মিঠিপুরি, হালুয়া। তারপর দিন কাটবে যখন, ফিরবে তুমি শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে মোষের পিঠে চড়ে বাঁশী বাজাতে বাজাতে বাড়ী। লাগবে ভালো তোমার ভজাদার ইট খোলায় দেখা ডুবন্ত সূর্য্যের আভা লাগিয়ে মোষের পিঠে বসা রাখাল ছেলেদের মত নদীটা পেরুতে। কি ভাল লাগে না তোমার এসব?

—তুই কি করে বুঝলি? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

—বারে! ওমনি বলে উঠল সতী,—বলিনি তোমায় যে সত্ত্বা আমাদের উভয়ের এক এবং অভিন্ন? সুতরাং তোমার মনের কোন চিন্তার তরঙ্গ বা ভাবনার কম্পন অগোচরে থাকবে কেন আমার? তাই তো তোমায় জিজ্ঞেস করছিলাম আমি যে গত জন্মের ছবি তুমি দেখতে পেয়েছো কি না? ওই তো তোমার গত জীবনের ছবি।

—আমার গত জন্মের ছবি! অবাক হল ভূতনাথ।

—হ্যাঁ, ভূতুদা। ওই পাহাড়ের কোল, ওই নদীর ছবি, ওই মোষ-রাখালদের সহজ সরল জীবন ভাল কেন লাগে তোমার জান ভূতুদা?

—কেন?

—কারণ আগের জন্মে তুমি ওই মোষ রাখালই ছিলে। ছিল তোমার ওই পাহাড়-কোলেই বাড়ী।

—তাই নাকি! যেন চমকে উঠল ভূতনাথ। তড়াক করে উঠে বসল সে সতীর মুখোমুখি। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞেস করে উঠল সে তাকে,—সত্যি?

হাসি মুখে বলে উঠল সতী,—ব্যাপার কি জান ভূতুদা। পূর্বাপর কোন জীবনের কোন স্মৃতিই মন থেকে একেবারে মুছে যায় না। অতীত জীবনের কোন ঘটনাই যায় না কখনও নাশ হয়ে। ছাপ তার একটা থেকেই যায় মনের গভীর গহন গোপন স্তরে। অনুকূল পরিবেশ পেলে বা মনের এক বিশেষ অবস্থায় মাঝে-মধ্যে ভেসে উঠে সেগুলো চেতন স্তরে। এই যে আমাদের হঠাৎ কিছু ভাললাগা বা মন্দলাগা এ হল আমাদের সেই অতীত জীবনেরই আভাস। হঠাৎ হঠাৎ মানুষের মন যে কখনও কখনও আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠে বা হয়ে উঠে কখনও কখনও বিষাদগ্রস্ত, দুঃখ-গ্রস্ত, বেদনা-ভারাক্রান্ত; যার কোন হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। জানতে পারা যায় না তার কোন কারন। এর আসল রহস্য জান কি ভূতুদা; সেই বিগত জীবনের নানা ঘটনার স্মৃতি। যা মনের অবচেতন স্তরে হয়ে আছে সঞ্চিত। সেগুলোরই চেতন স্তরে ভেসে উঠার প্রয়াস। প্রতি মানুষেরই যেমন বাল্যকালের স্মৃতি রোমন্থন করতে ভাল লাগে। মানুষের মনও তেমনি অতীত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে ভালবাসে। বাস্তব ঘেষা মন যাদের তারা শুধু এ সব স্মৃতির আভাস পায়। পায় কখনও স্বপ্নের মাঝে কখনও জাগ্রত অবস্থায় তোমার মত ওমনি তন্ময়তার ঘোরে। ইঙ্গিত পেলেও ধরতে পারে না তারা স্মৃতির সম্পূর্ণ রূপ। কারণ বর্হিজগতের ইন্দ্রিয়জ্ঞানে মনটা তাদের থাকে আবদ্ধ, আচ্ছন্ন। বাস্তববাদী মন তাদের স্বার্থ চিন্তায় থাকে এমন মশগুল যে অতীতের জীবন-ছবি অস্পষ্ট, আবছা, অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাদের মাঝে প্রকাশ পায়।

আমি আমার সূক্ষ্মসত্তায় চৈতন্যের আলোকে তোমার আমার অতীত জীবন স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাই ভূতুদা। অবশ্য আমার মত তুমিও দেখতে পাবে। দেখতে পাবে আমার মত বিদেহী অবস্থায় নয়। এই জীবনেই, এই দেহেরই চক্ষু-কর্ণ নিয়ে অবলোকন করতে সমর্থ হবে তুমি তোমার অতীত জীবনের সমস্ত কিছু। যদি মনটাকে তোমার বর্হিজগতের বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পার। পার যদি মনটাকে তোমার একাগ্র করে অন্তর্জগতে সন্নিবিষ্ট করতে। কি ভূতুদা, পারবে না তা?

ভূতনাথ এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনছিল সতীর কথাগুলো। সতীর জিজ্ঞাসায় সচেতন হতেই হাতদুটো তার জড়িয়ে ধরে মিনতি করে বলে উঠল তাকে,—তুই-ই তো আমার মন, তুই-ই তো আমার অন্তর্জগৎ জুড়ে অবস্থান করছিস সতী। তবে বল না আমার অতীত জীবনের কথা। জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

সতী ভূতনাথের কৌতূহলী মুখটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে উঠল তাকে,—অতীত জীবনের কথা শোনালে কিন্তু আমার অতীত জীবনের কথা তোমায় রাখতে হবে ভূতুদা।

—নিশ্চয়ই রাখব। পরম আগ্রহ ভরে বলে উঠল ভূতনাথ,—শুধু অতীত জীবনের কেন সব জীবনেরই আমি কথা রাখব তোর।

শুরু করল সতী ভূতনাথের অতীত জীবনের ইতিহাস। যে ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সতীরও অতীত জীবন। বিগত জনমে বিহারের বৌলিয়া জেলার পাহাড়ী ছেলে ছিল ভূতনাথ। বাড়ী ছিল তার রোটাক্স পর্বতের উপর আহীর-টোলা গ্রামে। সে জন্মে নাম ছিল তার শঙ্কর। বাবার নাম ছিল তার জ্বালা প্রসাদ। আহীর-টোলার পাশের গ্রামছিল কুসুম-টিক্‌রী। কুসুম-টিক্‌রীর গঙ্গারামের মেয়ে ছিল সতী। নাম ছিল তখন তার উমা। উমার ছিল ছোট একটা বোন। ছিল সে উমার চেয়ে দু-বছরের ছোট। নাম ছিল তার পার্ব্বতী। তবে পার্ব্বতী দেখতে তেমন উমার মত সুন্দর ছিল না। কিন্তু যাকগে সেসব কথা। উমাদের গ্রাম থেকে শঙ্করদের গ্রাম তেমন দূরে ছিল না। মাঝে ছিল ছোট্ট একটা নদী। নাম ছিল কুস্‌মী। কুসমী-নদীটাকে নদী না বলে পাহাড়ী ঝর্ণা বলাই মনে হয় ঠিক। সকাল হলেই সেই পাহাড়ী ঝর্ণা পেরিয়ে শঙ্কর তার মোষ-পালটা নিয়ে চরাতে যেত অপর-পারে। মোষ চরত আপন মনে টিলা-ডুংরি-ডহরে। আর শঙ্কর, নদীর পাড়ে কখনও জাম গাছের উপর, কখনও পাহাড়ের ঢালে বসে বাজাতো বাঁশী। বাঁশের বাঁশী। তুচ্ছ হলেও সে বাঁশীতে উঠতএমন সুর যে জল নিতে এসে উমা যেত তন্ময় হয়ে। সুর তুলে, বাঁশী ঝঙ্কারে তার, পাড়ের গাছপালাগুলো অনুরনিত করে কি মায়া ছড়াত যে উমার মনে কে জানে। সঙ্গী সহেলী পুষ্পা, রীতা, চম্পা জল নিয়ে চলে গেলেও খেয়াল থাকত না তার। কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ কবে সে বাঁশী আকুল করে তুলতো উমার প্রাণটাকে। সব যুগেই, সব দেশেই কৃষ্ণরা বোধ হয় এমনি করে রাধাদের মনগুলোকে টানে। টেনেছিল শঙ্কর তাই রাখালিয়া বাঁশীর সুরে উমার প্রাণটাকে। পড়েছিল উমা তার বাঁশীর সুরে বাঁধা।

মাঝে মধ্যে নানা অছিলায় দলছুট হয়ে উমা হাজির হত বাঁশরিয়ার কাছে। খাওয়াতো তাকে জল। কৃষ্ণও বোধ হয় পিপাসা নিয়ে অপেক্ষা করত তার জন্য। দিনের পর যতই যেতে লাগল দিন শঙ্করের পিপাসা আর উমার তাকে জল খাওয়ানোটা ততই যেতে লাগল বেড়ে। শুধু জল খাওয়াতো না উমা। কোনদিন ঘাঘরার নীচে লুকিয়ে আনতো সে ঠেকোয়া, কোনদিন গাগরীর ভিতর মিঠিপুরী কোন দিন বা লোটায় করে গোপনে আনতো খিলৌনা, উড়নায় বেঁধে আনতো কোনদিন চবেনী বা আখরোট কা প্রসাদ। শঙ্করও অকৃতজ্ঞ ছিল না। গামছায় বাঁধা তার মায়ের দেওয়া লিট্টি, পাঁরোটা বা হালুয়া ভাগ দিত তাকে। এমনি করে বাড়তে লাগল ভালবাসা। জমতে লাগল প্রেম। শঙ্কর হতে লাগল উমার। উমা হতে লাগল শঙ্করের।

সে প্রেমকে মিলনে, বিরহে, মান-অভিমানে আরো মধুর করার জন্য মাঝে মধ্যে খেলতো তারা লুকোচুরি খেলা। এগাছের আগডালে, ও গাছের মগডালে কখনও কখনও লুকিয়ে বসে থাকত শঙ্কর। ডাকলেই তাকে বাঁশীর সুরে দিত কুক। কিন্তু দেখা দিত না সহজে। খুঁজে যখন হয়রান হয়ে রেগে উঠত উমা তখন পিছন থেকে লুকিয়ে এসে হঠাৎ চোখ দেবে তার চমকে দিত তাকে। মান ভাঙ্গাতো তার গাছের থেকে জাম, কুল, খেজুর আঁচল ভর্ত্তি তাকে পেড়ে দিয়ে। মজা করতে উমাও কখনও পিছিয়ে থাকতো না। কুসমী নদীর পাড়ের মাটি দিয়ে করত সে এমন ঠেকোয়া হালুয়া, লিট্টি যে দেখলে সে সব মিথ্যে বলে মনে হোত না। বোকা শঙ্কর সরল

মনে সে সকল খেতে যেয়ে যখন থু-থা করে ফেলতে আরম্ভ করত তখন হাত চাপড়ে সে কি হাসি উমার! সে কি মজা! হেসে লুটোপুটি খেত সে। যমুনার মত সাক্ষী হয়ে দেখতো কুসমী নদীটা রাধা-কৃষ্ণরূপ উমা-শঙ্করের প্রেম-লীলা।

এ খেলাটা কানাকানি হতেই জানাজানি হয়ে গেল চারদিকে। এখন উপায়? উপায় ঠিক করতে গঙ্গারাম গেল জ্বালাপ্রসাদের বাড়ী। কিন্তু রিস্তা মঞ্জুর হয় কি সহজে। জ্বালাপ্রসাদের দশটা ভৈষ আর গঙ্গারামের মাত্র তিনটে। জ্বালাপ্রসাদের ক্ষেতিকা কাম, তড়ি-বাড়ী আছে কিন্তু গঙ্গারামের মাত্র দুটো গেঁহুকা ক্ষেত। সুতরাং বড় ঘর কা লেড়কার সঙ্গে ছোটা ঘরকা লেড়কীর শাদী হবে কি করে। দিতে পারবে কেন গঙ্গারাম চাহিদা মত জ্বালাপ্রসাদকে পণ। শেষ পর্য্যন্ত মঞ্জুর হল শঙ্কর লালেরই জেদে। বর-বরচ্চা অর্থাৎ কথা বার্তার সময় ঠিক হল দুটো ভৈষ আর পাঁচশ-এক টাকা দিলে তবে শঙ্করের দুলহন হয়ে আসতে পারবে উমা। দুটো ভৈষ দিয়ে তিলকদান হল বটে শঙ্করের কিন্তু বিয়ের টাকা যোগাড় করতে হিমসিম খেতে হল গঙ্গারামকে। তার সঙ্গে মেয়ে উমাকেও কম কষ্ট পেতে হল না। বাপ-বেটিতে মিলে কখনও পাহাড় থেকে কাঠ কেটে বৌলিয়া বাজারে বিক্রি করে, কখনও আহীর-টোলা কুসুম-টিকরীর ঘর-ঘর দুধ সওদা করে দোকানে বিক্রি করে করতে লাগল তারা বিয়ের টাকার যোগাড়।

এধারে তিলকদানের পর শঙ্কর বাঁধা কনের বাঁধা বর হয়ে যাওয়ার আর উমার সঙ্গে মিলতে-ঝুলতে পারল না। উমাও তাকে আর পানি পিলাতে, ঠেকোয়া খিলাতে যেতে পারল না লজ্জায়। ছোট বোন পার্ব্বতীকে দিয়ে সে বাঁশরিয়ার সেবা-পূজোটা যেতে লাগল চালিয়ে। কোথায় শঙ্করের আস্থানা, চরায় কোথায় মোষ, বাজায় কোথায় বাঁশী মায় শঙ্করের মতি-গতি স্বভাব-প্রকৃতি সব জানিয়ে দিয়ে ছিল উমা পার্ব্বতীকে। সে জানা লাইন ধরে চলতে গিয়ে পারু আসক্ত হল বটে শঙ্করের প্রতি। কিন্তু এতে শঙ্করের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। না পাওয়া গেলেও মনের আশা মনেই চেপে পারু দিদির কথামত করতে লাগল শঙ্করের সেবা।

এধারে বাপ-বেটির কঠোর পরিশ্রমে বিয়ের টাকা যোগাড় হল।

গঙ্গারাম গেঁহুকা-ক্ষেত বিক্রি করে জ্বালা প্রসাদ কে দিয়ে এল পণের পাঁচশো একটাকা। কিন্তু এমনিই দুর্ভাগ্য—হল না তাদের বিয়ে।

—সেকি! অবাক হয়ে কথার মাঝে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ, —বিয়ে তাদের হোলো না কেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সতী। তাকাল ভূতনাথের দিকে বিষাদ ভরা করুণ চোখে। তারপর হতাশা-ভরা স্বরে বলে উঠল সে,—সে কেনর আসল উত্তর সে-জীবনে ছিল না ভূতুদা। ছিল উমার আগের জন্মের ইতিহাসে।

কৌতূহলী হতেই ভূতনাথকে সংক্ষেপে বলতে বাধ্য হল সতী যে সে—জন্মে নিয়ে এসেছিল সে তার আগের জন্মের অভিশাপ। সেই বিগত জন্মের অধ্যায়ে সে এক কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে জন্মেছিল চণ্ডীপুর গ্রামে। নাম ছিল তার গৌরি। বাবার নাম ছিল তার বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ভূতনাথ তখন জন্ম নিয়েছিল শিবপ্রসাদ মন্ডল নামে বারুইপুর গ্রামে। নীচু জাতির ছেলে হলে কি হবে শিবু, সে ছিল বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, হৃষ্টপুষ্ট সুপুরুষ। সে পুরুষটির সঙ্গে ভাব হয়েছিল গৌরীর পড়াশোনার কালে। সে ভাবটিকে জীবনে চিরন্তন করার জন্য গৌরি বিয়ে করতে চেয়েছিল শিবুকে। শিবুও মন-প্রাণ দিয়ে পেতে চেয়েছিল গৌরিকে জীবনে। কিন্তু পেতে চাইলে কি হবে সবার আশা তো পূর্ণ হয় না জীবনে। বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মাঝে এই জাত-বেজাতের প্রাচীর। বিক্রম বাড়ুজ্জে ছিলেন মস্ত গোঁড়া। তাছাড়া বনেদী ব্রাহ্মণ বংশটার মুখে তিনি চুন-কালি দিতে দেবেন কেন মেয়েকে? চলতে লাগল অশান্তি। শুকিয়ে মরতে লাগল গৌরি। মা মেয়ের পক্ষ নিতেই শুরু হল সংসারটাতে ত্রিশক্তির এক চাপা লড়াই এই লড়াইটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য বিক্রমবাবু ধরলেন অন্যপথ। যেমন একধারে জোর করে দিতে চাইলেন তিনি মেয়ের বিয়ে তেমনি অন্যধারে গুণ্ডা লাগিয়ে সরিয়ে দিতে চাইলেন তিনি শিবপ্রসাদকে। জেদী বাপের জেদী বেটি। সকলের সামনে গৌরি শিবুকে বিয়ে করার কথাটা জোর গলায় ঘোষণা করে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। বাবাও তাকে দিলেন অভিশাপ,—জীবনে কখনও তোদের মিলন হবে না আর।

হয়নি মিলন। শিব প্রসাদের লাশটা ভেসে গিয়েছিল গঙ্গায়। গৌরিও ভেসে গিয়েছিল জীবনে। সেই জীবনেরই অভিশাপটা উমার জীবনেও ছাড়েনি তাকে। মিলিত হতে দেয়নি সেটা শঙ্করের সঙ্গে।

সেদিন বাবার সঙ্গে উমা বৌলিয়া বাজারে গেছল বিয়ের সব জিনিসপত্র কেনা-কাটা করতে। হঠাৎ তার গা বমি বমি। ঘুরে গেল তার মাথাটা। অবশ্য এমন গা বমি-বমি, মাথা ঘোরা হোত তার মাঝে মধ্যে। অম্বল, সর্দ্দি-গর্মি ভেবে গ্রাহ্য করত না সে। সামলেও নিত কিছুক্ষণ পরে। কিন্তু এবার সে আর সামলাতে পরল না। পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

জ্ঞান ফিরল যখন তখন সে বৌলিয়া হাসপাতালে। জানল সে এটা তার মাথা-ঘোরা বা অম্বল-টম্বলের মত সামান্য রোগ নয়। ব্রেন-টিউমার। সুতরাং মৃত্যু উমার সুনিশ্চিত। হায় ভগবান! কোথায় গেল বিয়ে আর কোথায় গেল উমার ঘর বাঁধার স্বপ্ন। বানচাল হয়ে গেল সব কিছু। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন গঙ্গারাম। শুধু উমার মৃত্যু-চিন্তায় নয়, ভেঙ্গে পড়েলেন তিনি তার সংসারটার ভাবী চিন্তা নিয়ে। এরপর কি করবেন তিনি। ভৈষ গেল, গেল গেঁহুকা ক্ষেত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা বাপ-বেটির রোজগারের কড়ি তাও গুঁজে দিয়ে এল জ্বালা প্রসাদের হাতে। তিলকের টাকা, বিয়ের কড়ি উচিত নয় ফেরৎ চাইতে যাওয়া। তবু গেল গঙ্গ ারাম জ্বালা প্রসদের কাছে। ভৈষ, টাকা ফেরৎ চাইতে নয়, অনুরোধ করতে যাতে উমার বদলে তার ছোট মেয়ে পার্ব্বতীর সঙ্গে শঙ্করের বিয়ে দিয়ে তার তিলকদানটা বজায় রাখে।

কিন্তু ও বাবাঃ! জ্বালা-প্রসাদ উঠল তেলে বেগুনে জ্বলে। বাপের মুখের উপর স্পষ্ট বলে দিল সে যে শঙ্কর নাকি তার পাঁচটা ম'ষ ও দু-হাজার টাকার পাত্র। তবু যে তার বড় মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হয়েছিল সে, তার কারণ ছিল উমা খুবসুরত ছিল বলে। তার বদসুরত ছোট লেড়কীর সঙ্গে কখখনও শাদী সম্ভব নয় তার লেড়কার।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এল গঙ্গারাম। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সে। তার জোত গেল, জমি গেল, গেল হাতের-পাতেব সমস্ত টাকা। করবে সে এখন কি? পেটটাকে কোন রকমে গম-মাইলো, ভূট্টা বাজরার ছাতু দিয়ে ঠাণ্ডা রাখা যাবে কিন্তু পার্ব্বতীকে? উদ্ধার করবে সে এখন কি ভাবে? একেবারে ভেঙ্গে পড়ল গঙ্গ রাম। হতাশায় রাতদিন কপাল চাপড়াতে লাগল সে মুমূর্ষ উমার কাছে। কারণ সামনের অন্ধকারটার জন্য দায়ী তো উমাই। বাবার হতাশা পারুর বিষাদ ভরা মুখ মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে লাগল উমাকে। কথা দিল সে যেমন করেই হোক শঙ্করের সঙ্গে পারুর বিয়ে দেবেই সে।

একদিন তাই তাকে দেখতে আসা শঙ্করের হাতটা ধরল সে সোহাগ ভরে। বলে উঠল সে তাকে অনুরোধ করে ছোট বোন পার্ব্বতীকে তার বিয়ে করার জন্য। কি যে বলবে শঙ্কর খুঁজে পেল না। আর এধারে তার পানি পিলানোর হাত, ঠেকোয়া-মিঠিপুরী খিলানোর হাতটাও ছাড়িয়ে নিতে পারল না। চোখে জল এল শঙ্করের। সে কি অবস্থা তখন উমার। এধারে পারু কাদছে, ওধারে শঙ্কর। —বাবার তিলকদানটা তুমি সার্থক কর শঙ্করদা। আমি কথা দিয়েছি তাদের। এ কথা রাখ তুমি আমার। মিনতি করে বলে উঠল উমা। ধীর গম্ভীরভাবে হাতটা শঙ্কর ছাড়িয়ে নিল আস্তে আস্তে। তারপর কোন কথা না বলে সে চলে গেল বাড়ী থেকে।

যত রাগ পড়ল গঙ্গারামের তার মেয়ে উমার উপর। মুমূর্ষ, মৃত্যু পথযাত্রী সেই মেয়েটাকে ধমকে বলে উঠল তার বাবা,—তোর রূপটাই তো যত নষ্টের গোড়া। অকালে মরবি যদি তবে কেন ওই সুন্দর চেহারা নিয়ে জন্মেছিলি। পারু তোর ওই রূপটা নিয়ে জন্মালে যে শঙ্কর আজ তাকে বিয়ে করত। তুই কুরূপা হলি না কেন। তুই কুৎসিত হলি না কেন?

বলতে বলতে থামল সতী। মনে হল থামল যেন তার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি। হতাশা-ক্লিষ্ট, বিষাদ-ভরা মুখ সতীর। গত জীবনেরই ছাপ মনে হয়। মনে হয় তার বিগত জীবনের স্মৃতি বেদনা-ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল তার অন্তরটাকে। তন্ময় ভূতনাথ। নিথর নিঝুম নদী উপত্যকা, পাড়ের গাছপালা। কিছুক্ষণ থেমেই টানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সতী। অবস্থাটাকে একটু হাল্কা করার জন্য শুকনো মুখটায় তার ফুটাল একটু হাসির রেখা। তারপর বলে উঠল সে,—সেই উমাই জন্ম নিয়েছিল এই জীবনে সতী রূপে। মৃত্যুকালে যে যেমন ভাবনা নিয়ে দেহত্যাগ করে, যার মনে যেমন পড়ে ছাপ, সত্তায় তার আরোপিত হয় যে রূপ প্রভাব, পরবর্তী জীবনে সে তেমনি ভাবেই আসে ভূতুদা। আমিও তাই এসেছিলাম এ জন্মে কুরূপা হয়ে। রূপটা আমার দিয়ে এসেছিলাম পার্ব্বতীকে। সেই পারুই এ জন্মে তাই আমার রূপ নিয়ে মায়া হয়ে জন্মেছে ভূতুদা। রূপতো আত্মার বহিরাবরণ।

জগতে পোষাক পরিচ্ছদের মত ইচ্ছা করলে জীবাত্মা যে কোন রূপ পরিগ্রহ করে আসতে পারে। মৃত্যু হয় এই বহিরাবরণটারই অর্থাৎ পরিবর্তন হয় এই পোষাক-পরিচ্ছদেরই। আত্মা অবিনশ্বর ভূতুদা। বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বৃদ্ধ ইত্যাদি জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ে আমাদের সত্তার যেমন কোন বিচ্ছেদ ঘটে না। তেমনি আত্মার জন্ম-জন্মান্তর রূপ-দেহ পরিবর্তন করলেও মূলে সে থাকে অবিচ্ছিন্ন, অপরিবর্ত্তিত। মনের কামনা-বাসনাই আমাদের রূপ-পরিগ্রহ করায় ভূতুদা। ঘুরায় জন্ম-কর্ম জীবনচক্রের আবর্তনে। মনকে আসক্তিশূন্য করে আত্মাকে আমাদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হবে ভূতুদা। তোমাকে এ জন্মে স্বামীরূপে পেয়ে গত জন্মের কামনা আমার পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু পার্ব্বতী যে আমার সঙ্গে মায়া হয়ে এসেছে ভূতুদা, তার কামনা যে অপূর্ণ, আশা তার যে পূর্ণ করতে হবে তোমাকেই।

---কি করতে হবে বল আমাকে? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

—মায়াকে তোমায় বিয়ে করতে হবে ভূতুদা।

---বিয়ে! যেন চমকে উঠল ভূতনাথ,—এ কি কথা বলছিস তুই?

মিনতি করে বলে উঠল সতী,—গত জন্মে পারুকে দেওয়া কথা যে আমার এ জন্মে মায়াকে তোমার গ্রহণ করে রক্ষা করতে হবে ভূতুদা। আমি যে ঋণী হয়ে আছি মায়ার কাছে। স্বামী ছাড়া স্ত্রী-এর এ ঋণ তুমি ছাড়া কে আর শোধ করবে বল?

—কিন্তু বিয়ে—কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল ভূতনাথ। সতীর কথায় বাধা পড়ে গেল সেটা,—শুধু মায়ার কাছে নয় ভূতুদা; ঋণী হয়ে আছি আমি তোমার মা-বাবা এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ও সমাজ সংসারের কাছে। জন্মগ্রহণ যখন আমি আর করছি না ভূতুদা তখন এ সমস্ত ঋণ আমার শোধ করে আসতে হবে তোমাকেই। এই জীবনেই। নইলে যে সত্তা আমাদের পার্থিব-বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে না ভূতুদা।

—ঋণ, পার্থিব-বন্ধন! এসব কথা তোর আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না সতী।

বলে উঠল সতী,—মা হওয়াই তো নারী জীবনের পূর্ণতা ভূতুদা। জগতের সব মায়ের কাছেই সমাজ, সংসার আশা করে জনকল্যাণকামী জগন্মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুসন্তান, সুমানব। স্ত্রী হয়েও তোমার সে সন্তান তো আমি তুলে দিয়ে আসতে পারিনি তোমার মা-বাবার কোলে। বংশে তোমাদের দিয়ে আসতে পারিনি কোন প্রদীপ। যার আলোকে আলোকিত হয়ে উঠবে তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের পরলোকের পথ। এসব ইচ্ছা আমার মায়ার মাধ্যমেই তোমাকে পূরণ করতে হবে ভূতুদা।

কি যে বলবে ভূতনাথ খুঁজে পেল না। ভাবতে লাগল সে নিশ্চুপ হয়ে। বলে উঠল সতী,—সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা যেমন ছায়াকে তার স্বামীকে দিয়ে সরে গেছল আমিও তেমনি মায়াকে তোমার জীবনে দিয়ে সরে এসেছি ভূতুদা। জানবে মায়ার মধ্যেই আমি আছি। আছে আমার কামনা-বাসনা আশা-আকাঙ্ক্ষা। মায়ার মাধ্যমেই আমাকে তোমার সেবা করার অধিকার দাও ভূতুদা। মায়াই আমার ছায়া। মায়াই আমার কায়া, মায়াকেই আমার অংশ মনে কর ভূতুদা।

---কিন্তু যে আসনে বসিয়েছি তোকে সে আসনে যে আমি অন্য কাকেও আর বসতে দিতে চাই না সতী। বলে উঠল ভূতনাথ।

---কায়াকে বসতে দিলে সে আসনে যে তার ছায়াকেও বসতে দিতে হয় ভূতুদা। মুখে স্নিগ্ধ হাসি টেনে বলতে লাগল সতী,—তোমার অপেক্ষায় ধন্না দিয়ে আছে মায়া বাবা ভূতনাথের মন্দিরে। অনাহারে, অনিদ্রায়। পার্ব্বতী করছে শিবকে পাবার জন্য তপস্যা। লোক-নিন্দা, ঘৃণা-বিদ্রূপ, কুৎসা-কলঙ্ক রূপ পঞ্চাগ্নির সাধনা তার হয়ে গেছে ভূতুদা। প্রেমের ঠাকুর বাবা ভূতনাথের থানে হত্যা দিয়ে পড়ে আছে সে তোমার আশায়। প্রারব্ধ, সঞ্চিত ক্রিয়মান সর্ব্ব কর্ম্মফল ক্ষয় করছে সে আত্মনিগ্রহ করে। প্রেমের সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা। এ সাধনায় নারী পুরুষের মধ্য দিয়ে, পুরুষ নারীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর লাভ করতে সমর্থ হয় ভূতুদা। তার এই আত্মার আকর্ষণকে কিছুতেই তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পার না ভূতুদা। তার এই অব্যভিচারী প্রেমকে গ্রহণ করে নাও তুমি তোমার জীবনে। পত্নীত্বে বরণ করে নাও মায়াকে।

—কিন্তু তুই? বলে উঠল ভূতনাথ। —তোর প্রেমকে তো আমি কোনদিন অপমান করতে পারব না সতী।

—প্রেম কখনও স্বার্থপর হয় না ভূতুদা। সে অপরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই পূর্ণ হয়। পূর্ণ হয় সে প্রেমাস্পদের সুখের জন্য তার সব কিছু ত্যাগ করে। আমার পৃথিবীর চোখ চলে গেছে ভূতুদা। তাই কার মনের মুকুরে কি ছবি পড়ে আমি আমার সূক্ষ্ম-দৃষ্টি দিয়ে তা দেখতে পাই। তৃষ্ণাই বন্ধন ভূতুদা। সে তৃষ্ণা সংভাবে পূরণ করলে ভোগের মধ্যে ত্যাগ এসে আত্মাকে মুক্তির পথে নিয়ে যায়।

—তোর ও সব বড় বড় কথা আমি বুঝিনি সতী। বলে উঠল ভূতনাথ,—'তোকে ছাড়া আমি কাকেও আর জীবনে স্ত্রী বলে স্বীকার করতে পারব না।

হাসল সতী। বলল স্নিগ্ধ হাসির ছটায়,—কে কার স্বামী, আর কে কার স্ত্রী। আত্মায় কোন স্বামী-স্ত্রী ভেদ নেই ভূতুদা। কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছায় একই সত্তা আমাদের স্বামী-স্ত্রী হিসাবে এই জগতের বুকে বিকশিত হয়েছে। মনের ইচ্ছা বা সংস্কারই রূপ নেওয়া করিয়েছে আমাদের স্বামী-স্ত্রী রূপে।

—তাহলে কোন জন্মে তুই স্বামী আমি স্ত্রী হয়েও তো জন্মাতে পারতাম। পরজন্মে পুরুষ হয়ে তুইও তো পূরণ করতে পারতিস মায়ার মনের আশা।

—হয়তো পারতাম। জন্ম-জীবনের খেলায় স্ত্রী-সত্তা পুরুষ ও পুরুষ-সত্তা স্ত্রী হয়ে জন্মাতে পারে ভূতুদা। সবই তো মনের ব্যাপার। জন্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে সত্তা আমাদের ইচ্ছামত যে কোন রূপ দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হতে পারে এই পৃথিবীতে। কিন্তু তাতে আত্মার মুক্তি লাভ হয় সুদূর পরাহত। স্ত্রীর পথ ভক্তির পথ। শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেম-ভালবাসার পথ। জন্ম-জন্মান্তর যদি সে একই আধারে এই পথে এগিয়ে যায় তবে পরামুক্তি হয় তার সহজলভ্য। তেমনি পুরুষের পথ জ্ঞানের পথ, বিচারের পথ। জন্ম-জন্মান্তর যদি সে এই জ্ঞান-বিবেক ও বুদ্ধি বিচারের পথ ধরে এগিয়ে চলতে পারে তবে ওই আধারেই মুক্তি হয় তার সহজে। জন্ম-জন্মান্তর আধার পরিবর্তন করে এপথ ওপথ ধরে চললে, সেই পরমসত্তার মিলিত হতে জীবাত্মার বহুজন্ম কেটে যায় ভূতুদা।

—কিন্তু মায়াকে বিয়ে করলে আমাদের উভয়-সত্তার মাঝে আর এক সত্তার আগমন বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো আমাদের মিলনে? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ,—স্ত্রী হিসাবে মায়া জীবনটার আমার অধিকার পেয়ে বহাবে না তো ধারাটা আমার অন্যখাতে? আমাকে নিয়ে তোর সেই পরমপ্রাপ্তির ইচ্ছার বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো মায়া?

সতী ক্ষণিক থেমে বলে উঠল তেমনি শান্ত স্বরেই,—মনই তো মানুষের প্রধান বাধা ভূতুদা। নশ্বর জীবনের পার্থিব ভোগ লালসায় মনকে যদি মশগুল রাখ তুমি তবেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে তোমার আমার আত্মিক মিলন। মনে শুদ্ধ বিচারবোধ এনে দেখবে তুমি—তুমি ও তোমার দেহ আলাদা। দেহটা তোমার ইন্দ্রিয় নিয়ে সমূহ জড়জগতের কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে থাকতে চাইলেও দেবে কেন তুমি মনটাকে তোমার ওসব ক্ষণিক সুখের মদ-মত্ততার ঘোরে থাকতে? জ্ঞানের চোখে বুঝতে তুমি চেষ্টা করবে নিজেকে তুমি কি? তোমার কি, আর কে তোমার? পরলোকে সূক্ষ্মদেহে এসে উচ্চ আত্মিকদের কৃপায় যে চোখ আমার খুলে গেছে ভূতুদা তোমার সে চোখ যাবে খুলে ইহলোকে তোমার ওই জড় দেহেতেই। দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাবে তুমি—তোমার মধ্যে আমি আছি আমার মধ্যে মায়া আছে, সবাই আমরা একাকার হয়ে আছি সেই পরমপুরুষের মধ্যে, অনন্ত সত্তায়।

—তবে কেন মায়াকে আবার জীবনে নেওয়ার কথা বলছিস তুই? কথার মাঝে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

—বলছি সেই পরম সত্তার মিলন আমাদের ত্বরান্বিত করার জন্য। জগতে প্রেমের আকর্ষণ ভগবান পর্য্যন্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারে না ভূতুদা। মানুষের একনিষ্ঠ ভালবাসার টান বড় কঠিন। চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে সে যে কোন সত্তাকে নামাতে পারে পৃথিবীতে। মায়ার বাঁধনে বেঁধে তাকে রাখতে পারে এই ধূলার ধরনীতে। স্বয়ং মা-লক্ষ্মীকেও তাই আসতে হয়েছিল আয়ানের টানে বৈকুণ্ঠধাম থেকে নারায়ণকে ছেড়ে। একনিষ্ঠ কামনায় তাঁকে জন্ম নিতেহয়েছিল আয়ানের স্ত্রী শ্রীরাধা রূপে। আমি চাই না ভূতুদা মায়ার আকর্ষণে স্বামী রূপে এসে তোমার আর একটা জীবন নষ্ট হোক। এই জন্মেই তোমার সব জনমের কাজ শেষ হয়ে যাক ভূতুদা। সত্তা তোমার সর্ব্ব কামনা-মুক্ত হয়ে সকলের সমস্ত আকর্ষণ ছাড়া হয়ে চলে আসুক আমার কাছে।

কি যেন ভাবতে লাগল ভূতনাথ। বোধ হয় বুঝতে পেরে তার মনের কথা বলে উঠল সতী,—শোন ভূতুদা, বিয়ে করলেই কেও কারও স্ত্রী হয়ে যায় না। এর জন্য জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা চাই। সম্পর্কও এদের জন্ম-জন্মান্তরেব। ভগবান কারো কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন না বলেই এক জন্মের জন্য হলেও একে অপরের স্বামী-স্ত্রী হয় ভূতুদা। কিন্তু জাগতিক কামনা-বাসনার টানে স্বামী-স্ত্রী রূপ ধরে থাকলেও সত্তা তার চিরন্তন হয় না ভূতুদা। আয়ান তাই পায় নি রাধাকে প্রকৃত তার স্ত্রীর অধিকারে। মানুষও এমন অনেক স্ত্রীকে হারায় অকালে। শিব ছাড়া সতী কখনও কি থাকতে পারে ভূতুদা? তুমি আমি জন্ম-জন্মান্তর একই সূতায় বাঁধা ভূতুদা। বিচ্ছিন্ন করতে কেও কখনও পারে কি আমাদের? তুমি বাড়ী ফিরে যাও ভূতুদা। বিয়ে কর মায়াকে। এতে তোমার যেমন মঙ্গল হবে, মায়ার জীবনেও তেমনি কল্যাণ নেমে আসবে। উভয় নদী মিলিত হয়ে যখন মহা-সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাবে তখন তার বুকে পড়া ছোট্ট নদী জোড়-কান্দর বাকী থাকবে না ভূতুদা।

ভূতনাথের ভাবনার তবু অবসান হল না। তবে সতীর কথায় মায়ার প্রতি কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল সে অন্তরে। তার সেই মুখ, তার সেই চোখ, ভূতুদা-অন্ত প্রাণ, সব কথায় ঝাঁপিয়ে পড়া তার সেই চেহারা ভাসতে লাগল তার স্মৃতিপটে। উদয় হতে লাগল তার নানা ঘটনার ছবি। তাকে কেন্দ্র করেই মায়ার তাদের ঘরে আসা, বড়-মার সেবা করা, অসুস্থ অবস্থায় তার রাত-দিন ব্যাকুল হয়ে থাকা, এক কথায় ভূতুদার জন্য নিজেকে তার সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করার নানা স্মৃতি ভিড় করে আসতে লাগল ভূতনাথের মনে। সত্যিই, কি রহস্যে ভরা মানুষের এই জগৎ-জীবন। মানুষের এই দৃশ্য জীবনের অন্তরালে রয়েছে যে একটা অন্তর্জগৎ এতদিন তেমন জানত না ভূতনাথ। জানত না সে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি জীবন-চর্য্যা চলছে তার অতীত জীবনের কলকাঠিতে।

হঠাৎ বলে উঠল সতী,—এ মায়া আর সে মায়া নেই ভূতুদা। তোমার প্রতি রূপজ মোহ পরিণত হয়েছে তার অপার্থিব নৈসর্গিক প্রেমে। আর তোমার প্রতি তার গুণজ আকর্ষণ রূপ নিয়েছে কামনা-মুক্ত শুদ্ধ পবিত্র প্রেমে। মায়া এখন যোগিনী ভূতুদা। ধ্যান করছে তোমাকে সে বাবার মন্দিরে। এ সাধনার সিদ্ধি তোমাকে তো দিতেই হবে ভূতুদা। হবেই দিতে বিয়ে করে তাকে এ তপস্যার ফল। সংসার ধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম ভূতুদা। যাও তুমি, জনক রাজার মত খাঁটি থেকে পালন কর গিয়ে এ ধর্ম্ম।

—বেশ, গম্ভীর স্বরে বলে উঠল ভূতনাথ,—তোর যদি সেই হচ্ছে তবে তাই হোক সতী। কিন্তু একটা কথা আমার রাখতে হবে তোকে।

—কি কথা?

—এমনি ভাবে জীবনের প্রতিপদে থাকবি তুই আমার পাশে। দিবি যুক্তি পরামর্শ। জ্ঞান, বুদ্ধি, বোধ দিয়ে পরিচালিত করবি জীবন আমার।

—ছিঃ ভূতুদা। চাপা একটা ধমক দিয়ে উঠল সতী,—এমনিভাবে নিজের পৌরুষত্বটাকে কোনদিন ছোট কোরো না তুমি। সবাকার অন্তরেই দিয়েছেন ভগবান জ্ঞান, বোধ-বুদ্ধি, বিবেক। আর তার সঙ্গে দিয়েছেন প্রতিমানুষকে স্বাধীনতা। ভগবানের দেওয়া ওই সমস্ত মূলধনের সদ্ব্যবহার করতে হবে তোমাকে স্বাধীন ইচ্ছায়। পার্থিব কামনা বাসনার মোহে পড়ে বিধাতার ওই সমস্ত গচ্ছিত ধনের অপব্যবহার করবে না তুমি। চলতে হবে তোমাকে নিজের বলে।

-কিন্তু বিপদে পড়ি যদি আমি? শোক দুঃখ নিরাশ-প্রণয় আসে যদি আমার জীবনে? তখন?

-আলো-আঁধার নিয়ে যেমন দিন, তেমনি সুখ-দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন ভূতুদা। একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ। একটাকে ছেড়ে অপরটা থাকতে পারে না কোন দিন। এদের কোনটাতেই বিহ্বল হওয়া উচিত নয় ভূতুদা। এসবের ঊর্দ্ধে উঠতে হবে তোমাকে। এমন কি শোক-দুঃখ বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রার্থনাও করা চলবে না তোমাকে ভগবানের কাছে। এতে সত্তার তোমার অবমাননা হবে। জানবে এসব ঈশ্বরের পরীক্ষা। এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে হবে তোমাকে নিজের চেষ্টায়। জাগতিক চোখে তুমি তোমার সে শক্তির পরিচয় না পেলেও জানি আমি—সে শক্তি আছে তোমার। যাও তুমি তোমার শুদ্ধ অন্তঃকরণ ও পবিত্র মন নিয়ে মায়ার কাছে। তাকে রাধার সঙ্গে অভিন্ন হওয়ার, রাণী-রজকিনীর সঙ্গে অনন্যা হওয়ার সুযোগ দাও ভূতুদা।

কথাগুলো বলেই উঠল সতী। দাঁড়াল সামনে তার প্রসন্নময়ী দেবী মূর্ত্তিতে। এলো চুল তার দুপাশের ঘাড় দিয়ে নেমে গেছে কোমর পর্য্যন্ত। চোখে তার স্নিগ্ধ-কোমল দৃষ্টি। মুখে তার পরিতৃপ্তির হাসি। সমগ্র চেহারায়, তার অদ্ভুত এক বিভা। তার সেই বিভাময়ী রূপটার দিকে তাকাতেই বলে উঠল সে,—এবার আমায় বিদায় দাও ভূতুদা। চলি আমি।

—সেকি! বলে উঠল ভূতনাথ, —যাবি না তুই আমার সঙ্গে ঘরে আমার?

হাসি ঝরা মুখে বলে উঠল সতী,—দিরাগমনে আমার যাওয়া হল না তো তোমার ঘরে, তবে বিয়ের পর তোমাদের মায়ার দিরাগমনে যাব তার আঁচল ধরে তোমাদের বাড়ী। এখন আমি চলি ভূতুদা।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে গিয়ে সতী মূর্ত্তিটা আসমানে দাঁড়াল যেন তার চিতাটার উপর। তারপর সতীর সেই হাসি-মাখা মুখ, স্নেহ-মাখা চোখ, জ্যোতি-মাখা চেহারা ঝাপ্সা হয়ে আসতে লাগল ক্রমশঃ। আস্তে আস্তে ধরল সেটা তার সেই দৃশ্য হবার আগের অবয়ব। ঘন-কুয়াসার জমাট-বাঁধা মূর্ত্তি। তারপর মূর্ত্তিটা ক্রমশঃ ধোঁয়াটে-ধূসর আকার নিয়ে চিতার ধোঁয়ার মতই আকাশে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল আস্তে আস্তে।

জ্যোৎস্নালোকিত নদীর বুকে পড়ে রইল ভূতনাথ একা। এপাশ-ও পাশ দুপাশের বালুচরটা খাঁ-খাঁ করতে লাগল তাকে মাঝে নিয়ে। দু-পাড়ের গাছপালাগুলো নিস্তব্ধ-নিঝুম হয়ে যেন অবলোকন করতে লাগল তার নিঃসহায় অবস্থাটা। স্বপ্ন যেন ভেঙ্গে গেল তার। মনটা বড় বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে গেল ভূতনাথের। মরুভূমির বুকে নিঃস্ব-রিক্ত পথিকের মত অসহায়ভাবে সে তাকাতে লাগল এধার-ওধার। কি করবে এখন সে? যাবে সে কোথায়?

ভাবতেই হঠাৎ পূর্ব-পাশটার নদীর পাড়ে চোখে পড়ল তার সেই বটগাছটা। তারই অদূরে চড়কতলার ডাঙ্গার পারে নজরে এল তাদের বাবা ভূতনাথের মন্দিরটা। চাঁদটাকে যেন মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ইঙ্গিতে যেন ডাকছে তাকে তার কাছে আসার জন্য।

উঠল ভূতনাথ নদী ছেড়ে। বটতলার শ্মশান-ঘাট ছেড়ে এগিয়ে যেতে লাগল সে মন্দিরটার দিকে লক্ষ্য রেখে। চড়কতলার ডাঙ্গা পেরিয়ে হাজির হল সে মন্দির চত্বরে। শূন্য প্রাঙ্গণ। নির্জন মন্দির। চারধার যেন থমথম করছে। দাওয়ার পাশে সেই গাদাপাথরটার গোড়ায় গিয়ে থমকে দাঁড়াল ভূতনাথ। দেখতে লাগল মহাশূন্যের নিঝুম বুকে জ্যোৎস্না-মাখা মন্দিরটাকে। এই মন্দিরেরই ভিতরে আছে নাকি মায়া। ধন্না দিয়ে পড়ে আছে তার জন্য।

মন্দিরে কেও ধন্না দিয়ে থাকলে তাকে নাকি ডাকতে নেই। সাহস দিতে তাকে বড়জোর হাত-চাপড়ে শিব-নাম করতে করতে ঘুরতে পারে মন্দির দাওয়াটা। এর বেশী কিছু করা নিষেধ। একাজ সমাধা করে কিছুক্ষণ আগেই বোধ হয় চলে গেছে কেও। কারণ জ্বলছে তখনও ধূপের কাঠি, দরজা গোড়ায় মিট্‌-মিট্‌ করছে তখনও প্রদীপের আলো।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কেমন যেন সন্দেহ হল ভূতনাথের। গম্ভীরের ভিতর সত্যিই আছে কি মায়া? জানতে সেটা ডাকলে তাকে দোষ কি? তাই হাল্কা গলায় চাপা স্বরে ডেকে উঠল ভূতনাথ, —মায়া, সত্যিই কি তুই মন্দিরে আছিস? আমি ভূতনাথ মায়া। তোর ভূতুদা। দাঁড়িয়ে আছি বাইরে। ডাকছি আমি তোকে। তোর কোন ভয় নেই মায়া। ভিতরে আছিস তো বেরিয়ে আয়।

অদ্ভুত! আশ্চর্য্য!! তার ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দির দরজাটায় ভেসে উঠল মায়ার মূর্ত্তি। আলুথালু বেশ, এলোমেলো চুল, সেএক জীর্ন-শীর্ণ কঙ্কাল সার চেহারা! সে চেহারাটার মুখে ফুটে উঠল ভাষা,—ভূতুদা! সতিই তুমি এসেছো ভূতুদা! সত্যিই বাবা মহাদেব কৃপা করেছেন আমাকে! সত্যিই তিনি রেখেছেন আমার মান। কাছে এনে দিয়ে তোমাকে! বল না ভূতুদা। বল না তুমি।

মায়ার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর যেন মোচড় দিয়ে উঠল ভূতনাথের অন্তরটাকে। আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল সে,—সত্যিই আমি তোর ভূতুদা মায়া। এতটুকুও মিথ্যা দেখছিস না তুই আমাকে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে মায়ার সে কি আবেগ! আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দরজা ছেড়ে সে মন্দির দাওয়ার উপর ছুটে আসতে লাগল তার ভূতুদার দিকে, ভূতুদা ভূতুদা,—

অনাহার-ক্লিষ্ট দুর্বল শরীর মায়ার। পারবে কেন হঠাৎ উঠে ছুটে আসার ধকলটা সহ্য করতে। কাজেই মাথাটা ঘুরে গেল তার। চোখদুটো সরষে ফুল দেখতে দেখতে দেহটাকে তার কোনদিকে নিয়ে যেতে যে কোনদিকে নিয়ে গেল কে জানে। দাওয়ার উপর থেকে হঠাৎ আছড়ে পড়ল মায়া নীচে। পড়বি পড়-একেবারে পাশের সেই গাদা পাথরটার উপর। যেটার উপর একদিন তার দিদি, সতী পড়ে ফাটিয়ে ছিল মাথাটা; মায়াও সেটার উপর পড়ে তেমনি লাগাল একটা মারাত্মক চোট। ক্ষীণকণ্ঠে—ভূতুদা তুমি কোথায়, কোথায় তুমি ভূতুদা? কথা দুটো বেরিয়ে এসেই চুপ হয়ে গেল মায়ার কণ্ঠস্বর।

—মায়া, মায়া,—বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে ভূতনাথ বসল তার পাশে। নাড়া দিতে লাগল তাকে বারবার,—মায়া-মায়া, চেয়ে দেখ, সত্যিই আমি এসেছি। কেবল মাত্র তোর জন্যেই আমি ফিরে এসেছি মায়া।

কিন্তু জ্ঞান থাকলে তো মায়ার শুনবে তার কথা। অচেতন মুখটা সোজা করতেই ভূতনাথ উঠল চমকে! কি সর্ব্বনাশ! কেটে গেছে যে মায়ার কপালটা! ঝর ঝর করে পড়ছে রক্ত। কি করা যায় এখন? কাল বিলম্ব না করে ভূতনাথ সেই আলুথালু বেশ-শুদ্ধো অজ্ঞান মায়াকে তুলল তার বুকে। ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে চ্যাং দোল্লা করে মায়াকে নিয়ে ছুটতে লাগল গ্রামের কুলি কুলি। তাদের ঘরের দিকে। চিৎকার করতে করতে,—'মায়ার বিপদ। অজ্ঞান হয়ে গেছে মায়া। পড়ে গেছে মায়া মন্দির-দাওয়া থেকে। ছুটে এস সবাই। কেটে গেছে মায়ার মাথাটা।

একে নিঝুম নিঃসাড় রাত। তার উপর ভূতনাথের মত লোকের ডাক-সাইটে গলা। সুতরাং কানে আর ঢুকতে কারো বাকী রইল না তার কণ্ঠস্বর। ঘর বাইরের কুলি-বারান্দায়, উঁচু দাওয়ায় যে যেখানে মরদ-বেটাছেলে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল ধড়ফড়িয়ে উঠল সবাই। এমন কি বাড়ীর বেড়-উঠোনে মেঝের পীড়েয়, ঘরের ভিতর ঘুমিয়ে ছিল যারা তারাও বাকী রইল না জাগতে। কারণ এডাক, ভূতনাথের ডাক। বলরাম বাড়ুজ্জের এতদিন নিরুদ্দেশ থাকা ছেলের ডাক। গ্রাম-শুদ্ধো ছেলে-ছোকরারা যাকে এদ্দিন হন্যে হয়ে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছিল তার ডাক। এ ডাকে কেও কৌতূহল নিয়ে স্থির থাকতে পারে কখনও। সুতরাং উঠেই তারা যে যার লাঠি-লণ্ঠন নিয়ে ছুটল সেই ডাকটা অনুসরণ করে। মাঝ-পাড়া, উপর-পাড়া, নাম-পাড়া তিন-পাড়া থেকে তিনটে জনস্রোত ভূতুদেব বাড়ীতে পৌঁছলো যখন তখন ভূতনাথ মায়াকে নিয়ে গিয়ে তাদের বাড়ীর উঠোনে শুইয়েছে। পাশে তার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে চাপা ধমকে বলছে সে তার মাকে, —আমার কথা হবে পরে আগে মায়াকে বাঁচাও। অজ্ঞান হয়ে আছে সে। তাড়াতাড়ি জল, পাখা নিয়ে এস।

ভূতনাথের সে কি উদ্বেগ-আকুল, ব্যস্ত-ব্যাকুল চেহারা! জমা হয়ে গ্রামের লোক তাকে কিছু বলবে কি, জিজ্ঞেস করবে কি কোন কিছু, ভাব-ভারিক্কি অবস্থা দেখেই তাদের চক্ষু চড়ক গাছ। ইতিমধ্যে তখন উঠোন ভর্ত্তিহয়ে গেছে তাদের। শুধু পাড়া-প্রতিবেশীরাই নয় এসে জুটেছে মেয়ে-ছেলে সবাই। তাদেব মধ্যে দীপালীকে দেখে হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ,—হ্যাঁ, করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? তাড়াতাড়ি ঘরে যা আমার। টেবিলের উপর ফাস্ট-এড বাক্সটা আছে। নিয়ে আয় জলদি করে।

এ সেই সুর, সেই আদেশ। এমনি একদিন ব্যস্ত গলায় আদেশ করেছিল ভূতুদা তাকে তার ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর থেকে ফাস্ট-এডের বাক্সটা আনতে। সতীদি যেদিন মন্দির দাওয়া থেকে নীচে পড়ে পাশের গাদা-পাথরটায় ফাটিয়ে ছিল মাথাটা। সেই অতীত আবার ফিরে এল নাকি মায়ার মাথায় চোটটা নিয়ে? তাড়াতাড়ি যাবে কি দীপালী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে অবাক-বিস্ময়ে। আদেশটা পালন করল তার বাবা বলরাম বাড়ুজ্জে। তাড়াতাড়ি সে ঘরের ভিতর থেকে এনে দিল তার ফাস্ট এড বাক্সটা। ওমনি ভূতনাথ হাতে নিয়ে সেটা চট্-জলদি বসে গেল মায়ার মাথায় ব্যাণ্ডেজ করতে। এধারে পুরোদমে চলতে লাগল জল-বাতাস।

কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল মায়ার। টানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ খুলল সে। বিষাদ-মাখা করুণ-দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল সে এধার-ওধার মিটি-মিটি। বড়-মাকে তার দেখতে পেয়েই হঠাৎ ক্ষীণ-কণ্ঠে বলে উঠল সে,—ভগবান ভূতুদাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন বড়-মা। এবার সব অপরাধ ক্ষমা করে আমার বিদেয় দাও আমাকে।

কিন্তু মায়াকে বিদেয় দিতে আর পারে কি বড় মা? চোখ খুলেছে তার। ভেঙ্গে গেছে ভুল। চিনেছে মায়াকে।

পরিচয় পেয়েছে তার অন্তরের। যে প্রেমকে বাবা ভূতনাথ নিজে-স্বীকার করেছেন সে প্রেমকে কি মায়ার অস্বীকার করতে পারে কখনও সারদা? জড়িয়ে ধরলেন তিনি মায়াকে। বলে উঠলেন আবেগ-আকুল স্বরে,—তোকে আমি আর বিদেয় দিতে পারব না মা। তুই আমার হারানিধিকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছিস। রেখেছিস আমাদের মান-প্রাণ। তোর চেয়ে যে কেও আমাদের আর আপন নেই মা। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ছুটে গেছিস তুই মন্দিরে। যুবতী মেয়ে হয়ে একলা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত পড়ে থেকেছিস সেখানে আমার ভূতনাথের জন্য। তিলে তিলে ক্ষয় করেছিস নিজেকে অনাহারে অনিদ্রায় একমাত্র তারই জন্য। ঘরের লক্ষ্মী তুই আমার। ভূতনাথকে তুই নে মা। দে মা তার হৃদয়ের তোর দিদির শূন্য স্থানটা তুই পূরণ করে।

সুতরাং বাজল আবার বলরাম বাড়ুজ্জের ঘরে বিয়ের সানাই। ঘর সংসার কাঁপিয়ে সারদার উঠল আবার শঙ্খ-ধ্বনি, উলু-ধ্বনি, সেই উলুরই মাঝে ভূতনাথ টোপর মাথায় দিয়ে ঘরে নিয়ে এল মায়াকে বংশের তাদের কুলবধূ করে। যে মায়াকে বড়-মা একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ঘর থেকে। নিষেধ করেছিলেন বাড়ীতে আসতে। সেই মায়াকে বরণ করে ঘরে তুলে নিলেন তিনি ঘরনী করে।

সত্যি, মানুষের জীবন কেমন বিচিত্র! বিচিত্র কেমন তার গতি! এই কথাটাই ঘুরিয়ে সেদিন ফুলশয্যার রাতে ভূতুদার পাশে বসিয়ে মায়াকে বলে উঠল দীপালী,—কি-লো মায়া-বৌদি, পারবি আর কোন দিন দাদাকে আমার ঘর থেকে তোর দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে?

লজ্জায় মুখটা লাল হয়ে গেল মায়ায়। অবস্থাটা তার কাটিয়ে দেবার জন্য ধমকে দীপালীকে বলে উঠল কাকলি,—মনের কথা— তুই কি করে বুঝবি? ওটা তাড়িয়ে দেওয়া না বেড়িয়ে ধরা যাকে বলেছে সে জানে, আর যে বলেছে সে বুঝে। তোর ওসব বোঝবার সাধ্যি থাকলে এদ্দিন আইবুড়ো থাকতিস না, কোনদিন একটাকে ধরে নিয়ে এমনি পাশে বসাতিস।

—পাশে বসাতে শুধু শিবের মাথায় জল ঢালতে গেলেই চলবে না লো। বলে উঠল কেয়া,—বলেছিলাম না সেবার সতীদির বাসর-রাতে শুধু শিব পূজা করলেই হবে না মন্দির দাওয়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গাদা-পাথরে মাথা ফাটাতে হবে। তবেই ভূতনাথ আসবে এমন সিন্দুর লেপতে। কথাটা ঠিক কিনা মিলিয়ে নে এবার।

হো হো করে হেসে উঠে সবাই সমর্থন করল কেয়ার কথাটাকে। সে-রাতের কথাটা মনে পড়তেই ওমনি মায়ার ঠোঁটটা নেড়ে বলে উঠল সবিতা,—কি লো ছুঁড়ি, বড্ড তখন বলেছিলি—দিদি হল গুরুজন, ভূতুদাকে এঁঠো করে দেব না আমি তাকে। পাপ হবে। এবার? কে কার এঁঠো খাবে শুনি? তোর জিনিস তুই-ই এবার এঁঠো করে যত পারিস খা। চললাম ৺ মরা।

বলেই মায়াকে ভূতনাথের দিকে ঠেলে দিয়ে চলে গেল সবাই?

(চোদ্দ)

বৎসরের বর্ষা বসন্ত-শরৎ হেমন্ত যতই ভাগ থাকুক না কেন আসল বিভাগ হল যেমন দুটি—গ্রীষ্ম এবং শীত। মানুষের ও তেমনি। তার জীবন বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বৃদ্ধে, যতই বিভক্ত হোক না কেন আসল বিভাগ কিন্তু দুটি—বিবাহ পূর্ব জীবন ও বিবাহ পরবর্তী জীবন। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে একমাত্র বিবাহ-ই এসে মানুষকে কানে ধরে শিখিয়ে দেয়—ওহে, তুমি আর ছোটটি নও, এবার বড় হয়েছো। বাধা-বাঁধনহারা ছন্নছাড়া, বেপরোয়া হয়ে আর ঘুরে বেড়ালে চলবে না। দায়িত্ব নিতে হবে জীবনের। দুপা ছিলে চার পা হলে। তোমার জীবন লেজ-ওয়ালা চারপেয়ে জীবের মত তিড়িং-বিড়িং করে নেচে বেড়ানোর নয়। সঙ্গে যখন আর একটা মাথা পেয়েছো, পেয়েছো যখন তার সঙ্গে ডবল ডবল চোখ-কান-নাক তখন সবদিকে দেখে শুনে ভেবে চিন্তে চারদিক বজায় রেখে চার হাতে কাজ করে চলতে হবে তোমাকে। মিলে-মিশে দুজনের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে এবার থেকে বিবেচনা করে চলতে হবে তোমাকে। বুঝলে?

কিন্তু বুঝবে কে? ভূতনাথ? তার তো কাকস্য পরিবেদনা। সেই কথায় বলে না—'স্বভাব যায় না মলে আর অভ্যাস যায় না ধুলে' সেই হল এই ভূতগ্রামের ভূতটার। একবার নয় দু-দুবার বিয়ে হল তার। জীবনে দু-দুটো বৌ-এর হল সে স্বামী দেবতা, পতি-পরম গুরু। কিন্তু গুরুত্ব-বোধ থাকলে তো তার যে জীবনে সে নেবে

দায়িত্ব। তেমনি ভাবে আগের মত সে ঘুরে বেড়াতে লাগল শ্মশানে-মশানে। লাগল ঘুরতে বাউণ্ডুলে, বেপরোয়া ভাবে। বলরাম বাড়ুজ্জে ভাবলেন বেটাকে বাগে আনা আর তাদের মা-বাপের কম্ম নয়। বৌকে রাখতে হবে ঘরে। তবেই যদি যে শক্ত হাতে লাগাম ধরে বাগ মানাতে পারে তাকে। মায়া বড় মেয়ে। সুতরাং বছর ঘুরাতে তাকে আর বাপের বাড়ীতে রাখার দরকার নেই। দরকার নেই তার আর সেরকম অনুষ্ঠান করে দিরাগমন করার। সারদার সঙ্গে যুক্তি করে তাই শুভ একটা দিন দেখে পাঠালেন তিনি ভূতনাথকে শ্বশুর-বাড়ী। বৌ-মাকে চট-জলদি আনতে।

আনতে ভূতনাথ গেল বটে কিন্তু স্থান মাহাত্ম্য না চরিত্র মাহাত্ম্য কে জানে শ্বশুরবাড়ীর চৌকাঠ ডিঙ্গতে না ডিঙ্গতেই তার মনটা গেল কেমন গোলমাল হয়ে। সতীর স্মৃতি উদয় হল মনেনা কি, কে জানে। মেজাজটা গেল তার খিঁচড়ে। মনে হল তার শ্বশুর যেন তুবড়ি ফুঁকে এবং শাশুড়ী যেন ডুগডুগি বাজিয়ে হুড়পিতে পুরতে আসছে তাকে। ভূতনাথ-ফনী কি হুড়পিতে পুরা থাকতে পারে কখনও। তার মত জাত-সাপকে নিয়ে খেলাবে জ্ঞানদা-রাখহরি চাটুজ্জে! সুতরাং চণ্ড চাপল তার। আদেশ হল তক্ষুনিই যে এখনই সে নিয়ে যাবে মায়াকে। যখনই ঘোড়া তখনই চাবুক—স্বভাবটা ভূতনাথের জানে তারা। তাছাড়া বলরাম বাড়ুজ্জেও ইতিপূর্বেই চিঠি দিয়ে জানিয়ে ছিলেন চাটুজ্জে মশায়কে। তাই বাধ্য হয়েই চট্ জলদি-ই ব্যবস্থা করে দিল তারা মায়ার বিদেয়ের। সব কিছুই প্রায় ঠিক হয়ে এসেছিল কিন্তু যাবার আগে মায়ার গায়ে সতীর সেই গহনা-শাড়ী দেখে ভূতনাথের মেজাজ গেল খচে। এই হল সেই গহনা যার জন্য অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল সতীকে। এর জন্যই সৎমা সতীর করেছিল তার সঙ্গে তুলকালাম-কাণ্ড। জুমড়ো কাঠ নিয়ে ধেঁসে দিয়েছিল সতীর পিঠটা। বলতে গেলে ছিনিয়ে নিয়েছিল সে তার অলঙ্কারগুলো। নিজের মায়ের গহনা পরতে পায়নি সতী আর সেই অলঙ্কার তার স্ত্রী হয়ে আজ পরবে মায়া! কখনও না। সঙ্গে সঙ্গে চণ্ড্ চাপলো ভূতনাথের। বলে উঠল সে মায়াকে,—খুল, খুল বলছি এসব গহনা-গাঠি।

কেন? তাজ্জব বনে গেল সবাই ভূতুর কথা শুনে! মায়াতো যার পর নাই হল বিস্মিত! অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে ভূতুদার মুখটার দিকে!—দেখছিস কি? ধমকে উঠল ভূতনাথ,— যে গহনা তোর দিদি পরতে পায়নি সে গহনা পরবি তুই! লজ্জা করে না তোর?

যেমন টেপা তার তেমনি টেপী। বলার সঙ্গে সঙ্গে মায়া খুলে ফেলল তার গা থেকে সমস্ত গহনা। কিন্তু তবু শান্ত হল না ভূতনাথ। বলে উঠল সে,—শুধু গহনা খুললেই চলবে না ওই শাড়ীও খুলে ফেলতে হবে তোকে।

—একি কথা! চাপা একটু ধমকের সুরে বলে উঠল মায়ার মা,—খুলতে কেন যাবে সে এসব? ব্যাপার কি?

—মনে নেই? মেজাজ-গম্ভীর স্বরে বলে উঠল ভূতনাথ,—একদিন সতীকে তুমি ছেঁড়া-ময়লা একটা শাড়ী পরিয়ে বিদেয় করতে চেয়েছিলে আমার সঙ্গে। তার ব্যবহার্য্য সামান্য দু-একটা সায়া-শাড়ী ছাড়া কিচ্ছু নিতে দাওনি তাকে। বেচারা সেগুলোই ময়লা গামছায় পুঁটলি করে বেঁধে বেরুতে উদ্যত হয়েছিল আমার সঙ্গে। আব আজ তুমি তোমার মেয়েকে রাজরাণীর সাজে সাজিয়ে পাঠাবে আমার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী? কখ্খনও না। মায়া! ধমকে উঠল ভূতনাথ,—আমার সঙ্গে যাবি তো এই শাড়ীও খুলে আয় তুই। পরে আয় তোর দিদির মত ওমনি একটা ছেঁড়া-ময়লা আটপৌরে কাপড়। নাইলে আমি নিয়ে যাবো না তোকে।

সে কি! একে যাচ্ছে তাই কাণ্ড! জ্ঞানদা কত অনুরোধ করল তাকে। করল কত কাকুতি-মিনতি। কিন্তু না, ভূতনাথ যথা পূর্বং তথা পরং। একে-একে দিয়ে কত বোঝানোর চেষ্টা করা হল তাকে। কিন্তু ভূতনাথ অটল অনড়। বলেছে যখন কথা তখন মানতেই হবে মায়াকে। ছুটে এলেন রাখহরি বাবু। সকলের কাছে দোষ স্বীকার করলেন তিনি। কিন্তু ভূতনাথের মাথার পোকা একবার নড়লে তাকে থামায় কে। শেষে বুড়ো হাতটা ধরল জামাই-বাবাজীবনের। কাতরভাবে অনুরোধ করে বলতে লাগল তাকে,—এভাবে অপমান কোরো না বাবা আমাকে। এ অবস্থায় মায়াকে যেতে দেখলে ছি ছি করবে লোকে। বলবে যা-তা কথা। মাথাটা কাটা যাবে আমার।

কিন্তু ভূতনাথের ঝোঁক সৃষ্টি ছাড়া। রোক চাপলে তার, থামায় কার বাপের সাধ্য। বলে উঠল সে রাখহরি চাটুজ্জেকে,—সেদিন আপনার মাথাটা কাটা যাওয়ার কথা চিন্তা করেননি? ভাবেননি সেদিন বড় মেয়ে আপনার ওমনি বেশে শ্বশুরবাড়ি গেলে ছি ছি করবে লোকে? অপমান হবে আপনাদের? সতীর মা ছিল না, তাই বুঝি বাপের তার মান-সম্মান রক্ষার জন্য এত মাথা ব্যথা হয়নি? তাই নয় কি?

কিযে বলবেন চাটুজ্জে মশায় খুঁজে পেলেন না। ভূতনাথের কথাগুলো একলব্যের সেই কুকুরকে মারা বানের মত মুখটা দিল তার বন্ধ করে। মায়াও তেমনি। বলার সঙ্গে সঙ্গে ওমনি ধরল সে অনাথিনীর বেশ। মুহূর্ত্ত মধ্যে দামী শাড়ীটা ছেড়ে কোত্থেকে সে একটা আধ-ময়লা কাপড় পরে এসে দাঁড়াল সকলের সামনে। হাতে তার গামছায় বাঁধা ছোট্ট একটা পুঁটুলি। দু-একটা সায়া-শাড়ী বাঁধা আছে-তাতে। তৈরী সে ভূতনাথের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্য। ছি ছি, কি লজ্জা! এই বেশে কেও কি কখনও প্রথম শ্বশুরবাড়ী যায়? বিশেষ করে রাখহরি চাটুজ্জের মেয়ে হয়ে। লোকে বলবে কি?

মায়ার হাতটা ধরলেন চাটুজ্জে মশায়,—তুই একটু বুঝিয়ে বল মা জামাইকে। এ বেশে বিদেয় করলে তোকে, শত্রুরা সব হাসবে, টিট্‌কেরী করবে। পাড়া-প্রতিবেশীরা সব যা-তা কথা বলবে আমাকে।

—বুঝিয়ে আমি কি বলব বাবা। বলে উঠল মায়া,—জামাই তো তোমার কোন অন্যায় করেনি। যে আচরণ দেখিয়ে ছিলেন মা সেই আচরণ ধরেই চলছে তো সে।

—তাহলে কি বলতে চাস, ও আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই তোকে বিয়ে করেছিল? ফোঁস করে উঠল জ্ঞানদা।

জ্ঞানদার মুখ খুললে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায় তার। স্থান-কাল-পাত্র কোন বোধ থাকে না। তাই তাড়াতাড়ি থামিয়ে স্ত্রীকে বলে উঠলেন রাখহরি চাটুজ্জে,—তুমি থামো তো। কথা বলতে জানো না যখন কথা বলতে এসো না তুমি।

— তা বলে জামাই যা বলবে তাই আমাদের মেনে নিতে হবে নাকি? বলে উঠল জ্ঞানদা,—বিয়ে দিয়েছি বলে কি আমাদের কোন মানসম্মান নেই? সন্তান বলতে তো ওই একটা মাত্র মেয়ে আমাদের। তাকে ধরে সাধ-আহ্লাদ মেটাবো নাতো আমরা আর কাকে নিয়ে মেটাবো শুনতো?

—বিয়ে দিয়েছেন যখন তখন তো আর আপনাদের খেয়াল-খুশি মত চলতে দেব না আমি মায়াকে। গম্ভীর ভাবে বলে উঠল ভূতনাথ—সে এখন আমার স্ত্রী। স্বামীর কথা মতই চলতে হবে তাকে। চলে আয় মায়া। দেরী করিস নে আর।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ওমনি মায়া পা বাড়াল। চাটুজ্জে মশায় এগিয়ে গিয়ে ধরলেন ভূতনাথের হাতটা,—ওর মায়ের কথা ধোরো না বাবা। আর ওসব অতীত ব্যাপাব নিয়ে মাথা গরমও কোরোনা তুমি। গতস্য শোচনা নাস্তি। যা হবার হয়ে গেছে। ছেড়ে দাও বাবা ওসব। মানুষ মাত্রই ভুল করে, সে ভুলটা তো আবার মানুষেই শোধরে দেয়। ছেলে হয়ে মায়ের ত্রুটিটা তো মার্জ্জনা করতে হবেই তোমাকে। মায়াকে তুমি এভাবে নিয়ে যেয়ো না বাবা। অনুরোধটা রাখো আমার।

—কিন্তু জানেন তো বাবা, বলে উঠল ভূতনাথ,— আমি মুখে যা বলি কাজেও তাই করি। বলেছি যখন একবার তখন আমার সঙ্গে আসতে হলে মায়াকে ওই বেশেই, ওই ভাবেই আসতে হবে।

—আর এই বাক্স-পেট্‌রাগুলো? জিজ্ঞেস করে উঠলেন চাটুজ্জে মশায়।

—ওগুলো মেয়ে যদি আপনার মাথায় করে হেঁটে হেঁটে নিয়ে আসতে পারে তো আনবে। বলেই ভূতনাথ জিজ্ঞেস করে উঠল মায়াকে,—কিরে মায়া, পারবি?

—কেন পারবো না? ওমনি মায়া বলে উঠল তাকে,—তুমি যদি মাথায় তুলে দিতে পার আমার তবে একবার কেন একশো বার পারবো আমি।

—বেশ, তবে আয়। দেখি তোর কেমন ক্ষমতা।

ওমা! সত্যি ভূতনাথ মায়ার মাথায় তুলে দিতে এল ওই মস্ত বড় ট্রাঙ্কটা। থাকতে পারল না আর জ্ঞানদা। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সে, তুলতে না দিয়ে ট্রাঙ্কটা রুদ্রানী মূর্ত্তিতে সে এসে দাঁড়াল তাদের মাঝে। গর্জে

উঠল সে ভূতনাথকে,—বাঁদরামির একটা সীমা আছে। এত ছোটলোকের ঘরের মেয়ে নয় মায়া যে কামিন-গিরি করবে তোমার। আমরা কি এতই নীচ, এতই ইতর যে মেয়েকে আমাদের তোমার পিছু পিছু বাক্স মাথায় করে শ্বাশুরবাড়ী যেতে হবে? ভেবেছো কি তুমি? মেয়েকে আমাদের বসে খাওয়াতে পারবো না? একটা মাত্র মেয়ে আমাদের তাকে নিয়ে তুমি যা-ইচ্ছে তাই করবে? চলে যাও তুমি। বিদেয় করবো না আমি মায়াকে, মেয়েকে পাঠাবো না আমার।

দিব্যি গটগটিয়ে চলে গেল ভূতনাথ। ভারী ভারী পা ফেলে সে ডিঙ্গল বাড়ীর চৌকাঠটা। এধারে ছট্‌ফট্‌ করে উঠল মায়া,—আমিও যাই মা।

ধমকে উঠল জ্ঞানদা,—তুই আবার কোথায় যাবি? ওই পাগলাটার কোন কি ঠিক-ঠোর আছে? কোন দিক নিয়ে গিয়ে কোথায় উঠবে তোকে তাই বা কে জানে। রাগের মাথায় কি করতে কি করে বোসবে তোকে তারই বা ঠিক কি? এ অবস্থায় যেতে আমি দেব না তোকে।

—তুমি জান না মা, চঞ্চল হয়ে বলে উঠল মায়া,—মস্ত জেদী মানুষ। ওর সঙ্গে না গেলে রাগ করবে আমার উপর।

—করুক রাগ। বলে উঠল জ্ঞানদা,— ওর মা-বাবাকে জানাই আগে ওদের ছেলের কাণ্ডটা। তারাই ব্যবস্থা করুক এর। বিহিতকরুক একটা। তারপর যাবি তুই।

—না মা, না। যেতে আমায় হবেই। বলেই মায়া যাবার জন্য পা বাড়াতেই ওমনি বাবা তার ধরল হাতটা,— এ অবস্থায় যাওয়া তোর উচিত নয় মা। তুই শুধু চাটুজ্জে বংশেরই মেয়ে ন'স, বাঁড়ুজ্জে বংশের কুলবধূ। উভয় পরিবারের মান-সম্মান তোর এ সমস্ত করণ-কারণ, যাওয়া আসার সঙ্গে জড়িত। একটু বুঝবার চেষ্টা কর মা।

কিন্তু কি বুঝতে কি বুঝলে যে মায়া কে জানে। এই অবস্থাতেই কারো কথা না শুনে সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে,—দাঁড়াও ভূতুদা দাঁড়াও, নিয়ে যাও আমাকে, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

দৌড়তে দৌড়তে চিৎকার করতে করতে চলতে লাগল মায়া গাঁয়ের কুলি কুলি। ভূতনাথের পিছনে পিছনে। লজ্জায় যেন মাথাটা কাটা গেল চাটুজ্জে মশায়ের। ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখটা তার। কিন্তু কি করবেন তিনি? যেমনি হয়েছে উদ্ভট জামাই তেমনি হয়েছে তার ডাকাবুকো মেয়ে। একজনকার উঁকো-গতি, আর একজন কার রুখো—মতি, কে কার কথা শোনে। জ্ঞান-আক্কেল, লজ্জা-সরমের বালাই থাকলে তো তাদের?

গ্রামশুদ্ধো সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মায়া-ভূতনাথের চলে যাওয়া সেই দৃশ্যটার দিকে। ভূতনাথটা না হয় চিরকালের ভূত। আক্কেল-বুদ্ধি কোন কালেই নেই তার। কিন্তু বেটাছেলে সে। বাঁদরামিটা তার বরদাস্ত করা যায়। কিন্তু মায়া? বৌ মানুষ সে। কোন লজ্জায় সে এমন ধাংড়ি মেয়ের মত ধেই-ধেই করে নাচতে নাচতে ছুটল ভূতনাথের পিছু পিছু। যতই স্বামী হোক তার। এভাবে যাওয়াটা তার মোটেই উচিত নয়। ছি-ছি-ছি-ছি!

এই হল মেয়ে মানুষের জাত। পাল, পোষ, বড় কর, বিয়ে দিলেই পর। ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে সে এমনি করে মা-বাবাকে ফেলে। মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চাটুজ্জে মশায়। আর জ্ঞানদা?

সেই একটা গান আছে না—

> হায় মেনকা রাজরাণীর তুই রাখলি কেথায় ঠাট্-টা?
> করলি জামাই জাত ভিখারী, চিরদিনের নেংটা—
> নেংটা লো নেংটা, কি জামাই এর ঢঙটা
> ছি-ছি-ছি! হায়-মেনকা, মাথায় দে-লো ঘোমটা।।

হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল জ্ঞানদা,—আমার কি সব্বনাশ হোলো গো। ভূত জামাই এর গলায় গেঁথে দিয়ে মেয়েকে যে আমার জলে ভাসিয়ে দিলাম গো।

পাড়া-প্রতিবেশী বৌ-ঝিরাও এতক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সত্যই, বাপের জন্মে মেয়ের পতি-গৃহে যাত্রার এমন উদ্ভটকিভূতকিমাকার দৃশ্য দেখেনি তারা কখনও। দেখেনি এমন বিদেয় বেলার কেলেঙ্কারি কাণ্ড। জামাই বলল আয় আর মেয়ে ওমনি লাজ-সরমের মাথা খেয়ে গাঁঠরি বগলদাবা করে ছুটল তার পিছু পিছু। ধন্যি মেয়ে যা হোক।

কিন্তু হা-হুতাস আর মনস্তাপ করলে কি হবে? পিসি-মাসি কাকী-শাশুড়ীর দল এগিয়ে এসে জ্ঞানদাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল,—ওরা ছেলে মানুষী করলেও তাদের ঘরে বসে তো কাঁদলে চলবে না এখন। মাথার উপর মায়ার শ্বশুর শাশুড়ী আছে। বাবা যেয়ে ওর বলরাম বাড়ুজ্জেকে বলুক সব কথা। মেয়ে তো তোদের ফেলনা নয়। বড় ঘরে বনেদী বংশে বিয়ে দিয়েছিস তার। হচ্ছে কি এসব? মায়া এখন আর নিছক গাঁয়ের আইবুড়ো মেয়ে নয়। কুলবধূ তাদের। তারাই এর ব্যবস্থা করুক।

কথাগুলো যুক্তিগ্রাহ্য। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি? তাই শান্ত হল জ্ঞানদা। চাটুজ্জে মশায় চললেন বলরাম বাড়ুজ্জের বাড়ী। বেয়াই-বেয়ানকে তাদের ছেলের কাণ্ডটা বেশ ভালভাবে একটু বুঝিয়ে দিয়ে আশা দরকার। এসব কি পাগলামি! লেগ-নিয়ম তো মানামানি নেই-ই, উপরন্তু তাদের লোক-জনের মাঝে এভাবে অপমান করা! না না কোন মতেই উচিত নয় এসব বরদাস্ত করা। বেশ রাগতঃ ভাবেই বেরিয়ে গেলেন রাখহরি বাবু।

এধারে মায়া লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে সঙ্গ ধরল ভূতনাথের বাবা-ভূতনাথের মন্দিরে। সামনে এসে তার কোমরে হাত দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল মায়া,—ভেবেছিলে কি, পাল্লা দিয়ে আমাকে হারিয়ে দেবে? কখ্খনও না। স্কুলে রাণ-কম্পিডিশনে বরাবর আমি ফাষ্ট হতাম। নেহাৎ স্বামী বলে তাই। নইলে গাঁয়ের মাঝেই তোমাকে অভার-টেক করে আসতাম। কিন্তু বৌ করেছো যখন তখন লোকজনের কাছে আর তোমাকে টপকে এলাম না। নিজেই একটু স্লো হয়ে সম্মানটা রাখলাম তোমার। এখন বল-কেন আমাকে নিয়ে এলে না সঙ্গে করে? আমি কি আসবো না বলেছিলাম?

অবাক ভূতনাথ! মায়ার মুখে এতটুকু রাগের ছাপ নেই। একেবারে সহজ সরল সাধা-সিধে মায়া। এতকাণ্ডের পরও তার উপর কোন ক্ষোভ-দুঃখ বা মান-অভিমানের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই তার। নেই কোন অপমান বোধের লক্ষণ। বলে উঠল ভূতনাথ।

—সত্যিই, তুই তাহলে আসতে পারলি আমার সঙ্গে?

—কেন পারবো না? বলে উঠল মায়া,—আমি কি দিদির মত বোকা যে বাবা মানা করলেই থেকে যাব আমি। আর তুমি রাগ করে চলে যাবে আসানসোল। তারপর আমি তার মত বাড়ীতে বসে মরি আর কি।

—না-না, আমি সে কথা বলছি না। বলে উঠল ভূতনাথ,—আমি ভাবছি ওই অবস্থায় তুই এভাবে, এরূপ শাড়ী পরে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলি কি করে?

—শোন কথা। অবাক হয়ে বলে উঠল মায়া,—শাড়ী পরে আসবো না তো কি সেই ছোটবেলাকার মত ফ্রক-পেন্ট পরে বেরিয়ে আসবো? বড় হয়েছি না? তার উপর তুমি আবার বৌ করেছো আমাকে। কি করে ওসব পরি বলো? তবে পরলে তোমার আজ রক্ষে থাকতো না। আজকের এই দৌড়-প্রতিযোগিতায় তোমাকে হারিয়ে একেবারে গো-হারা করে দিতাম। এত ক্ষণ মন্দির আর ঘর, ঘর আর মন্দির বার-চারেক আসা-যাওয়া হত আমার।

ভূতনাথ অবাক হয়ে তাকাতে লাগল মায়ার দিকে। মায়া মুচ্‌কি হেসে বলে উঠল,—অবশ্য মন করলে শাড়ী পরেও পারতাম তোমাকে হারাতে। তবে স্বামী যখন আমার তুমি, গুরুজন, তখন হারিয়ে তোমাকে আর লজ্জিত করলাম না। নিজেই একটু স্লো হয়ে এগিয়ে দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম অপমানের হাত থেকে।

—সত্যিই তুই অদ্ভুত মায়া। বলে উঠল ভূতনাথ,—এতকাণ্ডের পরও আমার উপর তোর একটু রাগ হল না পর্য্যন্ত।

—সে কি কথা। মায়া যার পর নাই বিস্মিত হয়ে বলল,—তোমার উপর আবার আমার রাগ হবে কি? আমার উপর তোমার রাগ সামলাবার জন্যই তো এদ্দূর আমার ছুটোছুটি।

—তোর উপর আমার রাগ হবে কেন? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

—কাজ করে কাজের কারণ জানতে চাও? ন্যাকা কোথাকার। এস তবে মন্দির দাওয়ায়। ভৈরব তলার ওই ছাওয়ার দিকটায় গিয়ে বসি একটু। বলেই ভূতনাথকে হাতে ধরে টেনে আনল মায়া মন্দিরটার পিছনের দিকে। বসিয়ে তাকে আঁচলায় করে মায়া তার মুখের-গায়ের ঘামগুলো মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, —সব

কাণ্ডের কাণ্ডারী হয়ে কারণটা যদি আমার মুখ দিয়েই শুনতে চাও তাহলে বাবার থানে হাত দিয়ে শপথ কর আগে যে সব দোষ আমার ক্ষমা করবে তুমি।

—কি মুস্কিল! বলে উঠল ভূতনাথ,—দোষটা কি তোর আগে বলবি তো। তারপর তো ক্ষমার কথা।

—সত্যি বলছি ভূতুদা, মস্ত অন্যায় হয়ে গেছে আমার। বলে উঠল মায়া,—কিন্তু বিশ্বাস করো তুমি, দিদির ওই সমস্ত গহনা গাঠি পরার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। জানি আমি, ওই গহনার জন্য দিদিকে আমার কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল। এই গহনার জন্যই জ্বলন্ত জুমড়ো কাঠ নিয়ে মা একদিন ধেঁসে দিয়েছিল দিদির পিঠের উপর। ঠিকই বলেছিলে তুমি—লজ্জা ছিল না আমার তাই যে [illegible] দিদি পরতে পায়নি জীবনে সে গহনা পরতে গিয়েছিলাম আমি।

বলতে বলতে হঠাৎ ভূতনাথের ঝুলন্ত পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বলে উঠল মায়া,—কিন্তু তোমার এই পায়ে হাত দিয়ে বলছি ভূতুদা, বিশ্বাস করো তুমি,—বাধ্য হয়েছিলাম আমি দিদির ওই গহনাগুলো পরতে। মায়ের পীড়াপীড়ি, বাবার অনুরোধ কাটতে পারিনি কিছুতেই। ভাবলাম, মা-বাবাকে ছেড়ে যাচ্ছি যখন শ্বশুরবাড়ী তখন যাবার সময় আর তাদের মনে দুঃখ দিয়ে যাব না। তোমাদের বাড়ী যেয়ে খুলে দেব এসব। কিন্তু এর জন্য তুমি যে মনে এত কষ্ট পাবে মোটেই ভাবতে পারিনি আমি। তাহলে কিছুতেই আমি ওসব জিনিস ঠেকাতাম না গায়ে। আমার এ দোষ ক্ষমা করে দাও ভূতুদা। আর কখ্খনও এ ভুল হবে না আমার। এ-বারের মত এ-অপরাধ মাফ করে দাও তুমি।

কান্না-চাপা গলায় মায়ার জড়িয়ে এল শেষের কথাগুলো। চেয়ে দেখল ভূতনাথ সত্যি মায়ার চোখদুটো ভর্ত্তি হয়ে গেছে জলে। হাত ধরে তার টেনে তুলল ভূতনাথ। বসাল তাকে দাওয়ার উপর নিজের পাশে। তারপর চাপা একটা ধমকে বলে উঠল তাকে—দূর বোকা। কাঁদবি আবার কি? কৈ, তোর তো কোন দোষ দেখতে পাইনি আমি। বলার সঙ্গে সঙ্গেই তো গহনা-শাড়ী সব খুলে দিলি তুই। অপরাধ কোথায় তোর যে মাফ চাইতে হবে তোকে। বরং অন্যায় হয়ে গেছে আমারই। ওই সময়ে, এত লোকের মাঝে, ওভাবে তোকে আমার অপমান করাটা মোটেই ঠিক হয়নি। আগেই তোকে আমার নিষেধ করে রাখা উচিত ছিল। এ ত্রুটি আমার মায়া। দোষটা আমারই।

—না ভূতুদা, কোন দোষ হয়নি তোমার। বলে উঠল মায়া,—এসব কথা আবার আগে থেকে তোমাকে বলতে হবে কি? আমারই তো নিজে থেকে বুঝা উচিত ছিল। ওই গহনা খুলা করিয়ে তুমি যে আমাকে কত বড় অসোয়াস্তি থেকে উদ্ধার করেছো তা কি বলে আর বুঝবো! সত্যি তুমি মনে আমার শান্তি দিয়েছো ভূতুদা।

—আচ্ছা মায়া, হঠাৎ বলে উঠল ভূতনাথ,—তুই তোর দিদিকে খুব ভালবাসতিস—না রে?

—যুঁ-হুঁ, ঘাড় নেড়ে বলে উঠল মায়া,—তোমার মত ভালবাসতে বোধ হয় আমি তাকে পারিনি ভূতুদা। নইলে সে তো তোমার মত আমাকেও দেখা দিতে পারতো। স্বপ্নেও আসতো আমার কাছে। বলতো কথা তোমার মত আমার সঙ্গেও। আচ্ছা ভূতুদা, বলতে বলতে হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করে উঠল মায়া,—ঘুম থেকে উঠিয়ে তোমাকে পাঠিয়েছিল দিদি আমাকে আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করতে? নদীর মাঝে দেখা দিয়ে তোমায় বলেছিল আমার বাবার মন্দিরে ধন্না দেওয়ার কথা? বলেছিল তোমাকে আমায় বিয়ে করার জন্য? তেমনি কি আজও দিদি দেখা দিয়ে তোমায় বলেছিল গহনাগুলো তার খুলে দিতে?

চমকে উঠল ভূতনাথ। থমকে গেল সে মায়ার কথাটা শুনে। সত্যি তো একথাটা ভাবা উচিত ছিল তার। থতমত খেয়ে হঠাৎ বলে উঠল সে,—দূর বোকা, সতী কি-তা বলতে পারে কখনও। আমিও তোকে পরীক্ষা করছিলাম। দেখছিলাম, সাধারণ মেয়ের মত তোর গহনা-গাটি, ভাল-শাড়ীতে লোভ আছে কি না। কিন্তু দেখলাম না, এ পরীক্ষাতে পাশ করে গেলি তুই। এবার আমাকেই চাকরী-বাকরী একটা যোগাড় করে তোর গায়ের ওমনি গহনা-শাড়ীর ব্যবস্থা করতে হবে আর কি।

—তাই যেন হয় ভূতুদা, বলে উঠল মায়া,—তোমার রোজগারের ধূলো মুঠি, আমার গায়ের যেন সোনার-কাঠি হয়ে উঠে। কিন্তু আর একটা কথা বোধ হয় তুমি জান না ভূতুদা। এতক্ষণ নিজেই আমি নিজেকে পরীক্ষা করছিলাম। দেখছিলাম, ভূতগ্রামের ভূতের ভূতনী আমি ঠিক হতে পারি কি না। বলতো, এ পরীক্ষায় আমি পাশ করেছি কি না।

—ফার্স্ট ডিভিশনে। বলে উঠল ভূতনাথ,—একেবারে ফুল-মার্ক নিয়ে।

—তবে এখানে কেন আর। চলো যাই শ্মশানে।

—সে কিরে? অবাক হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ,—শ্মশানে যাবি কি?

—তাছাড়া ভূত-ভূতনীরা যাবে কোথায় বল? ওখানেই তো আস্থানা আমাদের।

—তোর মতলবটা কি বলতো? হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ,—ফাজলামি করে তুই কি আমাকে হারাতে চাস?

জিব-কাড়া দিয়ে কানে হাতে রেখে বলে উঠল মায়া,—ছি ছি। ওসব কথা বোলো না ভূতুদা। স্ত্রী হয়ে স্বামীকে হারাবার মতলব করা কি? পাপ হবে। ওরকম দুর্বুদ্ধি যেন আমার না হয়।

—তবে শ্মশানে যাবার ফন্দি আঁটলি কেন?

—সত্যি বলছি ভূতুদা, বলে উঠল মায়া,—তোমার মুখে সেদিনের, মানে সেই ভজুদার ভাটা থেকে ফেরার পথে রাত্রেবেলায় শ্মশানের কথা শুনে বড় ইচ্ছে হয় আমার দিদির চিতাটা দেখে আসতে। যে দিদি তার চিতায় বসে তোমার-আমার বিয়ের করেছিল ঘটকালী আজ বিয়ের পর প্রথম শ্বশুর-ঘর যাবার সময় তাকে সেখানে একটা প্রণাম করে আসবো না?

যেমন পাগলী তার তেমনি পাগলা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভূতনাথের সতীর সেই কথাটা,—মায়ার আঁচল ধরেই তোমাদের বাড়ী যাব ভূতুদা।' তাহলে তো এই সুযোগ, সুতরাং চল ক্ষেপা তুই ক্ষেপীকে নিয়ে। উঠল ভূতনাথ। চড়কতলার ডাঙ্গা পেরিয়ে মাঠ টপকে, আল ডিঙ্গিয়ে চলল সে মায়াকে নিয়ে শালীনদীর শ্মশান। মায়াও তেমনি। সে যে আর ফ্রক-পরা আইবুড়ো মেয়ে নয়। ধেই-ধেই করে সেই কচি-খুঁকীর মত মাঠে-ঘাটে নেচে বেড়ালে আর চলবে না। বৌ হয়েছে সে। হয়েছে ভূতগ্রামের নামজাদা কুলীন বংশের কুলবধূ। আচরণে তার নির্ভর করছে বাড়ুজ্জে পরিবারের মান-ইজ্জৎ। সে সব দিকে যদি এত্তটুকু খেয়াল আছে তার। কত্তা-গিন্নি জুটেছে ভাল। দুই-ই বাউণ্ডুলের শিরোমনি।

বটতলার ঘাটে নেমে মায়া সোজা হাজির হল মাঝনদীতে, শ্মশানের বুকে। সতীর চিতাটা দেখিয়ে দিতেই ভূতনাথ সেই পোড়াবালি ও কাঠ-কয়লার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মায়া। কি যেন ভাবল সে কিছুক্ষণ। তারপর সে সেই চিতাটাকে ডুপ করে করল একটা প্রণাম।

—কি আশীর্বাদ চাইলি? মজা করে ভূতনাথ জিজ্ঞেস করে উঠল মায়াকে,—কি বর প্রার্থনা করলি বল না একটু।

—আশীর্বাদ চাইলাম, বলে উঠল মায়া,—যেন দিদির মত আমি তোমাকে ভালবাসতে পারি।

—তুই ভালবাসলে কি হবে, বলে উঠল ভূতনাথ, —আমি যদি তোকে ভাল না বাসি?

—তার জন্যেই তো প্রার্থনা করলাম বর, বলে উঠল মায়া, —যেন তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে পারি।

—কিন্তু মরতে যদি তোকে আমি না দিই। একবার ভুল করে তোর দিদিকে হারিয়েছি আর ভুল করে তোকে হারাতে পারবো না আমি হ্যাঁ।

—কিন্তু দিদি মরে বেঁচে আছে তোমার কাছে আর আমি কি তোমার কাছে বেঁচে মরে থাকবো ভেবেছো? কখনও না।

—মানে?

—মানে, তুমি যদি আমায় ভাল না বাস তবে শুধু শুধু এই ধড়টা রেখে আমার কি লাভ বলতে পার?

—ওহ্—এই কথা। হেসে উঠল ভূতনাথ—এবার কিন্তু হেরে গেলি তুই মায়া। ধরতে পারলি না আমার কথার মানে। মুখে ভাল না বাসি বললেও সতী কিন্তু ঠিক বুঝে নিত আমার মনের কথা। বলত হেসে সে—

হঠাৎ বলে উঠল মায়া,—দাও না ভূতুদা দিদির সঙ্গে আমাকে দেখা করিয়ে। সত্যি বলছি, তোমার কথা শোনার পর থেকে মনটা আমার ভীষণ উতলা হয়ে আছে দিদিকে দেখবার জন্য। আজ কতদিন দেখিনি তাকে। বড় ইচ্ছে হচ্ছে আমার—দাও না একবার দেখা করিয়ে দিদির সঙ্গে।

সে কি পীড়েপীড়ি মায়ার। জড়িয়ে ধরে গলাটা তার বার বার করতে লাগল তাকে অনুরোধ। ভূতনাথ পড়ল মহা মুস্কিলে। বলে উঠল সে, —এখন আমি এখানে কোথায় পাব তোর দিদিকে যে দেখিয়ে দেব তোকে?

—বা-রে! সেদিন তো এখানেই পেয়েছিলে তার দেখা। ডাকতেই তাকে এসে হাজির হয়েছিল সে তোমার কাছে। এই নদীরই চড়ায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার সঙ্গে বলেছিল কত কথা। তাহলে সে আজ এখানে দেখা দেবে না কেন? আমি আছি বলে? আমি কি তার পর? না আমার প্রতি স্নেহ মায়া মমতা নেই তার একেবারে? সে কি ভালবাসে না আমাকে?

—ছিঃ! ওকথা বলিস না মায়া। তাহলে আত্মা তার কষ্ট পাবে। বলে উঠল ভূতনাথ,—জানিস না তুই, সতী তোকে কত গভীর ভাবে ভালবাসে। তাছাড়া, তুই শুধু এই জন্মেরই ছোট বোন নস তার। জন্ম-জন্মান্তরের সে তোর দিদি। তাই মায়ের মতই বরাবর দেখে সে তোকে পরম স্নেহে, পরম আদরে।

—ওসব কথায় আমি ভুলবো না ভূতুদা। বেশ ঝোঁকের মাথায় বলে উঠল মায়া,—ডাক তুমি সেদিনের মত দিদিকে। বলেছে যখন সে তখন নিশ্চয়ই আসবে দিদি তোমার ডাকে। কাটতে পারবে না তোমার কথা। এসেছি যখন এখানে তখন আজ না দেখে তাকে উঠবো না এই শ্মশান থেকে। ডাকো না, ডাকো না ভূতুদা দিদিকে।

বার বার তাকে নাড়া দিতে দিতে আবদেরে সুরে বলতে লাগল মায়া। কি ফ্যাসাদেই না পড়ল ভূতনাথ! বাপরে বাপ্—নাছোড়বান্দা মায়া। বাধ্য হয়ে শেষে ডাকতে আরম্ভ করল সে,—সতী, কোথায় তুই? আয় এখানে, দেখা দে সতী। বলেছিলি যে তুই মায়ার আঁচল ধরে যাবি আমাদের ঘরে। নিতে এসেছে মায়া। আয় আমাদের কাছে। চল আমাদের সঙ্গে বাড়ী। সতী-ই-ই, সতী-ই-ই—

ডাকতে লাগল ভূতনাথ সতীকে তার আকুল স্বরে। এধারে ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মায়া তার দিদিকে দেখবার জন্য। স্থির-নিবদ্ধ চোখে সেই চিতাটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে আকুল আগ্রহে। ভূতুদার কাছে শুনেছিল সে সতীর সেই আবির্ভাব দৃশ্য। প্রথমে ধোঁয়ার আকারে আসবে তার দিদি। তারপর স্পষ্ট হবে সে। বলবে কথা। ধরবে তার হাত। বসবে তাদের কাছে। সহজ সরল স্বাভাবিক মানুষের মতই প্রতিভাত হবে তার সব কিছু। কৌতূহলটাকে নিয়ে মায়া ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল তার দিদির জন্য।

কিন্তু কোথায় সতী? ভূতুদার ডাকটা শুধু মাঝ নদী ছেড়ে পাড়ের গাছপালাগুলোকেই ঠোক্কর দিতে লাগল। কানে তার প্রতিধ্বনি ছাড়া শোনাল না কিছু। দেখা তো দূরের কথা। তবে কি ভূতুদা মিথ্যা বলেছিল তাকে। ভাওতা দিয়ে সে তার ভুলিয়ে ছিল মন। কেমন যেন সন্দেহ জাগতে লাগল মায়ার প্রাণে।

এধারে ডাকতে ডাকতে ভূতুদা ক্রমশঃ অস্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল। চড়ে ল তার গলা। জ্বলতে লাগল তার চোখ। ফুঁসতে লাগল তার নাক। উত্তেজনার আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগল তার মুখে—এখনো বলছি দেখা দে সতী। আয় সেদিনের মত আমার কাছে তুই। নইলে কিন্তু আস্ত রাখব না তোর। চিতার ওই ছাই-ভস্ম, পোড়া কাঠ-কয়লা হাড়-গোড় সব আমি তোর নিয়ে গিয়ে ফেলে দেব ওই নদীটার জলে। ভাল চাস-তো এখনো তুই দাঁড়া একবার এসে আমার সামনে।

কিন্তু কে শুনবে কথা তার? শূন্য চিতা, শূন্য তো সব দিক। কিন্তু ভূতুদা কেমন যেন হয়ে উঠল পাগল-পারা, আত্মহারা। সেই ফাঁকা চিতাটার দিকে তাকিয়েই রাগে ফুঁসতে লাগল সে। মাঝে-মধ্যে মাতলা ম'ষকে যেমন ভাগাড় শুঁকে উত্তেজিত হতে দেখা যায়। দেখা যায় যেমন ভিড়কে তাকে ভাগাড়ের চারধার ছুটোছুটি করতে, তেমনি অবস্থা হল ভূতুদার। সতীর চিতাটার চারদিকে পাগলের মত ঘোরাঘুরি করতে করতে ঠিক ওই ভিড়কা মাতলা ম'ষটার মতই ফোঁপাতে ফোঁপাতে চিৎকার করে বলতে লাগল সে,—আমায় ক্ষেপিয়ে তুলিস না সতী। দেখা দিয়ে এখন আর অদৃশ্য হয়ে থাকিস না আমার কাছে। মায়ার কাছে মিথ্যাবাদী সাজাস নে আমাকে। দেখা দে। রক্ষা কর আমাকে ধাপ্পাবাজির অপবাদ থেকে। দে দেখা সতী। সতী-ই-ই সতী-ই-ই---

সে কি আকুল ডাক ভূতুদার। স্বরটা তার মাঝ-নদী, বালুচর ছাপিয়ে উপচে উঠতে লাগল আকাশে বাতাসে। কাঁপিয়ে দিতে লাগল সমস্ত পাড়-চৌহদ্দির নদীর গাছ-গাছালি ও লতা-পাতাগুলোকে। স্বরটা কেঁপে কেঁপে

কান্নার মত শোনাতে লাগল মায়ার। মনে বড় কষ্ট হতে লাগল তার। তাই আকুল হয়ে হাতটা ধরে ভূতুদার মিনতি করে বলতে গেল তাকে,—এভাবে তুমি আর দিদিকে ডেকো না ভূতুদা। চাই না আমি তাকে দেখতে। আসবে না যখন সে ছেড়ে দাও তাকে। দেখা দিতে হবে না তাকে।

—থাম তুই। এক ঝট্‌কায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার গর্জে উঠল সে,—দেখা দেবে না কি পড়ে আছে। আমার সঙ্গে চালাকি। বলেছিল কেন সে সেদিন ডাকলেই দেবে দেখা? দিয়েছিল কেন কথা তখন যে স্মরণ করলেই আসবে সে? জানে না সে তার ভূতুদাকে যে কারো কথা-খেলাপি সহ্য করতে পারি না? আসতেই হবে তাকে। দিতেই হবে দেখা।

সে কি চেহারা ভূতুদার। কথার কি তেজ। ভর্তি-দুপুরের সূর্য্যের মত চোখে-মুখে যেন সে ছড়াতে লাগল জ্বলন্ত কিরণ। দেখে শুনে ভয় হতে লাগল মায়ার। সিটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে একধারে। ভূতুদা তার ক্রুধোন্মত্ত স্বরে সতীদির সেই চিতাটার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বলতে লাগল শাসিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে,—আর আমাকে ক্ষেপাস নে সতী। দিস না আমার মাথাটা গরম করে। ডাকছি যখন এতবার তখন অন্ততঃ একবার এসে দাঁড়া আমার সামনে। দেখা দিয়ে আমাকে বজায় রাখ তোর কথাটা। সম্মান রাখ আমার। মিথ্যেবাদী সাজিয়ে দিস না তুই আমাকে মায়ার কাছে।

—আমার কাছে মিথ্যেবাদী সাজতে হবে না তোমায় ভূতুদা। ব্যাকুল হয়ে আবার হাতটা ধরে ভূতুদাকে অনুরোধ করতে গেল মায়া,—নিষেধ করছি আমি তোমাকে দিদিকে ডাকতে। চাইনা দেখা আমি তার। এটা শ্মশান। এখানে এমন ভাবে চিৎকার করলে লোকে কি বলবে তোমায়?

—নিকুচি করেছে তোর শ্মশানের। ধমকে তাকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠল ভূতনাথ,—লোকের সঙ্গে আমার সঙ্গ কি? সঙ্গ আমার এখন সতীর সঙ্গে। হয় তাকে আমার রাখতে হবে কথা নয় তাকে আমার ছাড়তে হবে সঙ্গ। তার সঙ্গে হবে আমার আজ শেষ বোঝা-পড়া। তুই দেখতে না চাইলে কি হবে আমি তাকে দেখতে চাই। না দিলে দেখা তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে যেতে চাই আমি আজ তার সঙ্গে। আঙ্গুল বাড়িয়ে বলতে লাগল ভূতুদা চিতাটাকে,—এখনোও বলছি সতী, ভাল চাসতো দেখা দে তুই। নইলে সব কিছু তোর ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেব তোকে পৃথিবীর বুক থেকে।

হে ঈশ্বর ভূতুদা কি তার পাগল হয়ে গেল! আতঙ্কে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল মায়া। এখন একমাত্র উপায় তার যেমন করেই হোক ভূতুদাকে ঘরে নিয়ে যাওয়া। তার পক্ষে এখানে এ অবস্থায় তাকে শান্ত করা সম্ভব নয়। তাই মায়া জাপটে ধরল ভূতনাথের হাত-দুটো। বলে উঠল তাকে অনুনয় করে,—হেই ভূতুদা, রক্ষে কর আমাকে। বাড়ী-চল তুমি। এখানে আর একদণ্ড থাকতে মন যাচ্ছে না আমার, দয়া করে চল বাড়ী।

—বাড়ী যাবি তো এখানে এলি কেন? নিয়ে এলি কেন এখানে আমাকে? ধমকে উঠল ভূতনাথ।

—ভুল হয়ে গেছে আমায়। ক্ষমা কর আমাকে। বলেই মায়া জড়িয়ে ধরল ভূতনাথের পা-দুটো,—আমার দিব্যি ভূতুদা, বাড়ী ফিরে চল তুমি। ঘুরছে আমার মাথাটা। আর থাকতে পারছি না আমি এখানে।

কিন্তু ভূতনাথ তখন ক্রুধোন্মত্ত। সতী আসেনি তার ডাকে। তাই মাথায় আগুন জ্বলছে তার। গর্জে উঠল সে মায়াকে,—খবরদার বলছি, আর একটা কথাও তুই বলিসনে আমাকে। জানিসনে তুই তোর ভূতুদা মুখে যা বলে কাজেও করে তা। সতী না এলে আজ তার একটা হেস্তনেস্ত করব আমি। তারপর যাব বাড়ী। মাথা ঘুরছে তো দাঁড়িয়ে থাক ওই চিতাটার পাশে চুপ করে। কাজে আমার বাধা দিতে এলে কিন্তু মুস্কিল হবে তোর।

ভয়ে সিঁটিয়ে গেল মায়া ভূতনাথের সে চেহারা দেখে। কাঁপতে লাগল সে একদিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে। ওধারে মাত্রা ছাড়া হয়ে উঠল ভূতুদার উত্তেজনা। হায় ভগবান, সত্যিই কি পাগল হয়ে গেল তার ভূতুদা। এধার-ওধার চিতা থেকে কুড়িয়ে আনতে লাগল সে যত সমস্ত আধপোড়া মড়া-কাঠ, মুড়ো। একটার পর একটা ছুঁড়ে মারতে লাগল সে সতীর চিতাটার উপর,—দিবি না দেখা তো দেখ মজা। আসবি না ডাকে তো ভোগ কর শাস্তি। মিথ্যেবাদী। ধোঁকাবাজ—

কি করবে এখন মায়া! নির্জন নদীর মাঝ। ডাকবে যে কাকেও তারও উপায় নেই। চিৎকার করলে হয়তো রেগে যাবে তার উপর ভূতুদা। তাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে ছুটে যে পালাবে তাও মনে সায় দিচ্ছে না তার।

হে বাবা ভূতনাথ। এ কি অবস্থায় ফেললে তুমি মায়াকে। নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছে মায়া। অসম্ভব যা তাই সম্ভব করতে ঝোঁক ধরিয়েছে সে তার ভূতুদাকে। খাল কেটে সে ডেকে এনেছে কুমীর, দিদিকে তার দেখাতে বলে। মায়ার এ দোষ ক্ষমা করে দাও প্রভু। রক্ষা কর তাকে। উদ্ধার কর ভূতুদাকে তার এ অবস্থা থেকে।

—এখনো শিক্ষা হোলো না তোর ? হঠাৎ গর্জে উঠল ভূতনাথ,—এখনো তুই দেখাচ্ছিস আমাকে তোর শূন্য চিতাটা। দেখা তাহলে সত্যি দিবি না আমাকে ? দাঁড়া, দেখাচ্ছি তবে তোকে আসল মজাটা। আনছি ওই খেঁচন-দাঁড়িটা।

বলেই ভূতনাথ রেগে ছুটল অদূরের একটা চিতার দিকে। পড়েছিল সেখানে একটা মড়া-পোড়ানো লম্বা এক-টুকরো বাঁশ। তুলেই সেটাকে উঁচিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল ভূতুদা মূর্ত্তিমান একটা ক্রোধের মত। কি ভয়ঙ্কর চেহারা তার। যেন যমদূত। চোখ থেকে তার ঠিকরে বেরুতে লাগল আগুন। মুখ থেকে যেন ছিট্‌কে বেরুতে লাগল গোলা,—তোর সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নেই আমার। তোর ওই জন্ম-জন্মান্তরের কথা, স্বামী-স্ত্রীর বুলি সব মিথ্যা। সব ভাঁওতা। ধাপ্পা দিয়ে তুই আমাকে ভুলিয়ে ছিলি তখন। তোকে বিশ্বাস করার এই আমার ফল হল ? মরেই যখন গেছিস তুই তখন ভাল করেই যা তুই আমার কাছে মরে।

দুহাত দিয়ে উপরে তুলে খেঁচন-দাঁড়িটা কাল-বৈশাখীর মত তেড়ে আসতে লাগল ভূতনাথ। তেড়ে আসতে লাগল নানা অবান্তর কথা বলতে বলতে, আবোল-তাবোল বোকতে বোকতে। এতো বদ্ধ উন্মাদেরই লক্ষণ। কি করবে এখন মায়া ? রেগে ভূতুদার সতীদির চিতাটার দিকে ভারী ভারী পা ফেলে আসার ধরণ দেখে বুঝতেআর বাকী রইল না মায়ার এরপর তার কাণ্ডটা হবে কি। হয়তো দমাদম মারবে ওই চিতাটার বুকে তার খেঁচন-দাঁড়ির বাড়ি নয়তো ওটার পোড়া কাঠ-কয়লা, হাড়-গোড়, ছাই বালিগুলো ওই লাঠিটাতে করে এধার-ওধার ছুড়ে করবে দাপাদাপি। এ পাগলামিটা ভূতুদার চোখে দেখা যাবে না মায়ার। সহ্য করতে পারবে না সে। কান্নাটা চেপে তাই চোখদুটো তার নিজের হাতে দেবে ভয়ে একদিকে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মায়া। ডাকতে লাগল ভগবানকে—হে বাবা ভূতনাথ রক্ষে কর। বাঁচাও তাকে এ অবস্থা থেকে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! হঠাৎ ভূতুদার পাল্টে গেল ক্রোধোদীপ্ত কণ্ঠস্বরটা। হাতের লাঠিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল সে,—এসেছিস সতী। এসেছিস তুই। জানি আমি আসবি। কথা আমার কিছুতেই কাটতে পারবি না তুই। ডাক শুনে আমার স্থির থাকতে পারবি না কখনও। কিন্তু সতী এত কষ্ট দিলি কেন আমাকে ? করালি কেন এত সমস্ত কাণ্ড ? না দেখা দিলে ওই খেঁচন-দাঁড়িটা নিয়ে এক্ষুনি কি সর্ব্বনাশ করতাম বল দেখি আমি। ছিদ্-ছাতুর করে দিতাম তোর ওই চিতাটাকে। ছিঃ ছিঃ।

কথাগুলো শুনে ভূতুদার আস্তে আস্তে চোখের থেকে হাতদুটো সরাতে লাগল মায়া। কিন্তু কোথায় বা কি ? কেও তো কোথাও নেই। আশ্চর্য্য! শূন্য তো দিদির চিতাটা। ফাঁকা তো এধার-ওধার। কাকে দেখে এসব কথা বলছে ভূতুদা। এ আবার তার কি ধরনের পাগলামি।

ভূতুদা এক্কবারেই কিন্তু সেই আগের মানুষ। পাগলামির কোন লক্ষণই নেই তার চোখে-মুখে। এতটুকু নেই তার মুহূর্ত্তের আগের অস্বাভাবিকতার কোন ছাপ। এ যেন সেই কাল-বৈশাখীর দাপটের পর-উঠা মিষ্টি সূর্য্য। রঙিন আভার মধু ঝরিয়ে হাসছে সে। হাসি-ভরা মুখে মায়ার দিকে তাকিয়ে আবেগ-অধীর কণ্ঠে বলে উঠল তার মায়াকে—দেখ্-দেখ, তোর দিদি-এসেছে। বলেছিলাম না আমার ডাকে সতী নিশ্চয়ই আসবে। বড্ড ঝোঁক ধরে ছিলি তুই দিদিকে দেখবার। দেখ এবার, যত খুশি দেখ। দেখ খেদ ভরে।

কিন্তু কি দেখবে মায়া। দিদি তার কোথায়। অবাক হয়ে ভূতুদার দিকে তাকাতেই ওমনি একমুখ হাসি ছুঁড়ে বলে উঠল সে,—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দেখছিস তুই কি ? তোর দিদিকে দেখ। পিছনে তোর আঁচলটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সতী।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন ফিরল মায়া। কিন্তু কোথায় সতী।

—কি বোকা মেয়েরে তুই। বলে উঠল ভূতনাথ মায়াকে,—পিছন ছেড়ে সতী যে তোর ডাইনে এস দাঁড়াল, তাও দেখতে পেলি না ?

কিন্তু ডাইনে কোথায়। ডাইনে, বাঁয়ে, পিছনে সামনে বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে লাগল মায়া। কিন্তু কোথায় দিদি তার? সতী তো দূরের কথা কোন আভাষ, লক্ষণ বা চিহ্ন বিন্দুমাত্র পড়ল না তার নজরে। আশ্চর্য্য। ভূতুদা কিন্তু দিব্যি স্বাভাবিকভাবে বলতে লাগল সেই শূন্যতাকে উদ্দেশ্য করে—তোর মুখটা কেন এমন গম্ভীর সতী? রাগে? তোরও তাহলে রাগ আছে বল? কিন্তু জানিস তো তুই আমার স্বভাব। একটুকুতেও আমার মেজাজটা যায় বিগড়ে।

কিছুক্ষণ থেমে আবার বলে উঠল সে,—বুঝলাম-বুঝলাম, এটা উচিত নয় আমার। কিন্তু এতে কার রাগ না হয় বল? এই ধুপ্সি-রোদে নদীর মাঝে মায়াকে নিয়ে আমাকে এত হয়রানিতে ফেলতে গেলি কেন তুই? সেই-তো এলি। ডাকা মাত্র এলে তো আর এমন রাগা-রাগিটা করতে হোত না আমাকে।

যা বাবাঃ। এ আবার কেমন ধরনের উদ্ভট কাণ্ড। জন মনুষ্য নেই কোথাও অথচ শূন্যে কার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে কথা বলছে তার ভূতুদা। দাঁড়িয়ে আছে সে পাশেই, দেখতে পাচ্ছে না সে কিছুই। কিন্তু দিব্যি বোকে চলেছে ভূতুদা। যার পর নাই বিস্মিত হয়ে মায়া দাঁড়িয়ে রইল কাঠের পুতুলটার মত। হঠাৎ হেসে উঠল ভূতনাথ হো-হো করে,—তাই বল। মায়াকে গহনাগুলো খুলতে বলায় রাগ করেছিস তুই আমার উপর। বেশ বাবা, ঘাট মানছি আমি। দোষ হয়ে গেছে আমার। তোর সব জিনিসেই যদি মায়ার অধিকারে তবে আজ থেকে আর তোর কোন জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করব না তাকে। কি রে মায়া শুনছিস তো তোর দিদির কথা?

ভূতুদার হঠাৎ সাড়া পেয়ে চমকে উঠল মায়া। স্বপ্নাবিষ্টের মত বলে উঠল সে,—কি কথা?

মুচকি হেসে তেমনি আবার পাশের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল ভূতনাথ,—দেখছিস তো সতী, তোর বোনের কেমন কাণ্ড? এমন অন্যমনস্ক মেয়েকে নিয়ে ঘর করা আমার পক্ষে দায় হবে দেখছি। ওরে পাগলী—বলেই ভূতনাথ সোহাগ ভরে ধরল মায়ার ঘাড়টা। মাথাটা তার আনল নিজের মুখের সামনে। তারপর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বলতে লাগল মায়াকে সে ঠিক কালা-লোককে কথা বলার মত জোরে জোরে,—তোর দিদি বলছে, যে গহনা-গুলো আমি তোকে খুলা করিয়েছি সেগুলো তোরই। তোর বিয়েতে দেওয়া ওগুলো তোর দিদির আশীর্বাদ। সুতরাং ওগুলো পরবি তুই। তোকে ওগুলো গিয়ে না পরা করালে তোর দিদি-নাকি চিরকাল আমার উপর রাগ করে থাকবে। আজ থেকে সতীর সব জিনিষই তোর। বুঝলি তো বোকা মেয়ে?

তবু কিন্তু বোকা মেয়ে হাঁ করে তাকাতে লাগল ভূতুদার মুখটার দিকে। বুঝল বটে সে তার কথা। কিন্তু কে যে এত সহজে এমন গোঁয়ার গোবিন্দ লোকটাকে বুঝিয়ে দিল একথাটা, তাকে দেখতে পেল না সে। ভূতনাথ মায়ার বিস্ময় বিহ্বল মুখটা দেখে আবার তার পাশের শূন্যতাটাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল,—দেখছিস সতী তোর বোনটা কেমন হাঁদা-গঙ্গারাম। ক্যাবলাকান্তের মত এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন কালা। সব ন্যাকামি বুঝলি? এসব হল তার অভিমান। কাজ বাড়ল আমার। এবার মান ভাঙ্গাতে হবে তার।

বলতে বলতে একটু থেমেই আবার অবাক হয়ে শুরু করল ভূতু,—নাও ঠেলা। আবার মায়ার সঙ্গে তুইও মুখটা ভার করে রইলি কেন। আরে বলছি তো বাবা, মায়ার গহনাগুলো খুলা করিয়ে আমার অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু এতে দুঃখের এত কি আছে? বলছি তো আমি গিয়েই মায়া পরবে তোর সব গহনাগুলো। এ মায়া, দিসনে তোর দিদির মনটা খারাপ করে। দে না বলে পরবি গিয়ে তার সমস্ত কিছু।

কিন্তু কি আর বলবে মায়া। ভূতুদার কাণ্ড দেখেই তো তার চক্ষু চড়কগাছ! কোথায় বা তার দিদি আর কোথায় বা কে। কাছে পিঠে তো দূরের কথা দূর-দূরান্তও তার শূন্য। অথচ এমন ভাবে বলছে ভূতুদা কথাগুলো যেন সামনেই, তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দিদি। মায়ার বিস্ময় ভরা চাওনিটা দেখেই মৃদু একটা ধমক দিয়ে বলে উঠল ভূতনাথ—ফাজলামিটা এখন রাখ দেখি। বলে দেনা তোর দিদিকে যে গহনাগুলো যেয়েই আবার পরবি তুই। এতদিন পরে তোর দিদির সঙ্গে দেখা, দুটো কথা বল, হাসাহাসি কর তোরা। দেখে আমার প্রাণটা জুড়োক। তা না দু-বোনেই রইলি তোরা আমার উপর অভিমান করে দাঁড়িয়ে। তোদের ওই গম্ভীর ভাবটা বাবু মোটেই ভাল লাগছে না আমার। চল-চল, ঘাটের ওই বটতলাটায় গিয়ে সবাই মিলে বসি। তিন জনে একটু খোশ মেজাজে গল্প করিগে ওখানে।

কিন্তু যাবে কি মায়া! চলবে কি তার পা। ভয়ে তার তো আত্মারাম খাঁচা। হতভম্ব সে। ভীতি বিহ্বল দৃষ্টি তার। ভয়ার্ত চোখের তারা-গুলো মায়ার স্থির-নিবদ্ধ হয়ে রইল ভূতুদার প্রতি। হঠাৎ কানে এল তার কতকগুলো লোকের কণ্ঠস্বর। এল নদীপাড়ের বট গাছটার দিক থেকে। তাকিয়ে দেখল মায়া সেখানে তার বাবা ও ভূতুদার বাবাকে। খুঁজতে এসেছেন তারা তাদের লোকজন ও পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে। সঙ্গে তাদের হাবলু-মন্টু-নেপালদা সহ গাঁয়ের ছেলে-ছোকরারা সবাই। দেখে তাদের ধড়ে প্রাণটা এল মায়ার। কিন্তু ভূতুদার ভয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে নিশ্চুপ হয়ে। ওধারে দেখে তাদের চিৎকার করে উঠল ছেলে-ছোকরার দল,—ওই যে, মাঝ নদীতে দাঁড়িয়ে আছে শ্মশানের বুকে।

নেপালদা আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে তাদের বলতে লাগল দু-বুড়োকে বেশ ভারিক্কি গলায়,—কি বলেছিলাম না, এধার-ওধার খুঁজে হয়রাণ হবেন না। ভূতনাথ যখন আছে তখন শ্মশান ছাড়া তারা কোথাও থাকবে না। অথচ বিশ্বাস না করে গ্রাম-চৌহদ্দি, চণ্ডীতলা, মেলা-মণ্ডপ; এর-ওর বাড়ী খুঁজে আপনারা নিজেও হয়রাণ হলেন আমাদেরও অযথা হয়রাণ করালেন।

সত্যি, কথাটা তখন বিশ্বাস করতে পারেন নি চাটুজ্জে মশায়। বাড়ুজ্জে মশায়েরও ধারণা ছিল না যে ভূতনাথ নূতন-বৌকে নিয়ে শ্মশানে আসবে। তাই নব-দম্পতিকে নদীর বুকে শ্মশানের মাঝে দেখে তারা যারপরনাই বিস্মিত হয়ে গেল। বাহাদুরীটা নেবার জন্য নেপাল বলতে লাগল তাদের ঘাড় নেড়ে,—তখন তো ধমকে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন কথাটা, এখন বিশ্বাস হলো তো? দেখছেন তো আমার কথাটা ঠিক কি না?

কিন্তু তখন ঠিক-বেঠিক বিচার করার মানসিকতা ছিল দু'বুড়ো বাপ-শ্বশুরের। তাঁরা তখন বাছুর হারানো গাই। গাই যেমন তার হারানো বাচ্চাটাকে দেখলেই দিক্‌বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে হাম্বালে ছুটে যায় তার কচি বাছুরটার দিকে। চাটুজ্জে-বাড়ুজ্জে মশায়ও তেমনি মায়া-ভূতনাথকে দেখেই পাড় থেকে নদীতে নামলেন। নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তাদের ছুটে যেতে লাগলেন শ্মশানের দিকে। পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল তাদের সঙ্গে আসা লোকজন সবাই। কাছাকাছি হতেই মায়া চট্-জলদি এগিয়ে গিয়ে জাপটে ধরল তার বাবাকে। ধরেই সে কেঁদে উঠল হাউ-মাউ করে। রাখহরি চাটুজ্জে তো অবাক! মায়া কঠিন ধাতের মেয়ে। কাঁদে না সহজে। ব্যাপার কি?

ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতেই মায়া কাঁদতে কাঁদতে বলল যে কথা তাতে গ্রামশুদ্ধো সকলেরই চক্ষু চড়ক গাছ! ভূতনাথের নাকি মাথা খারাপ! পাগল হয়ে গেছে সে! কি করবে এখন মায়া। কি হবে তার জীবনে? ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল মায়া।

—কি বললি তুই? ধমকে উঠল ভূতনাথ মায়াকে,—আমার মাথা খারাপ? আমি পাগল?

—পাগল ন'স তো কি? পাল্টা ধমক দিয়ে বলে উঠলেন ভূতনাথকে তার বাবা, বলরাম বাড়ুজ্জে,—নূতন বৌটাকে এভাবে শ্মশানে আনতে লজ্জা করল না তোর হতভাগা? তোর মত এমন কাণ্ড করতে কেও কখনও দেখেছে কোথাও? শুনেছে কোনদিন? কোন গাধা বৌকে তার আনতে গিয়ে মাঝ-নদীতে এমনি শ্মশানের বুকে হাজির করে শুনি? তোকে মাথা খারাপ বলবে না তো কি ভাল-মানুষ বলবে? শুয়ার।

—অযথা তুমি আমাকে বোকছো বাবা, বলে উঠল ভূতনাথ, —মায়াকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না, সে আমাকে শ্মশানে আনল না আমি তাকে শ্মশানে আনলাম।

—আর ওকে জিজ্ঞেস করে তোকে আমাকে যাচাই করতে হবে না হতছাড়া। ধমকের সুরে বলে উঠলেন বাড়ুজ্জে মশায়,—তোর মতি-গতি জানতে দেশ-দুনিয়ায় আর কেও বাকি নেই। বৌমার তো তোর মত মতিচ্ছন্ন হয়নি যে গহনা-শাড়ী খুলে ওমনি একটা কামিনের পোষাক পরে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সে তোর পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে আসবে এই শ্মশান-ঘাটে। গ্রামের কুলি ডাঙ্গা ডহর পেরিয়ে। ছি-ছি!

কি যে বলবে ভূতনাথ খুঁজে পেল না। মাথাটা নীচু দিকে করে দাঁড়িয়ে রইল সে পাথরটার মত। বাড়ুজ্জে মশায় মুষল ধারায় বর্ষণ করতে লাগলেন তার বকুনি আর ধমকানি। সারদা নেই যে থামাবে তাকে। বন্ধু-বান্ধবদেরও তেমন কোন সাহস নেই যে বাপ-বেটার ঝড়-ঝাপটার মাঝে নাক গলাবে তারা।

ওধারে মায়ার বাবা মায়ার মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে লাগলেন, তাকে,—কাঁদিস নে মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কথাটা কানে যেতেই ওমনি বাড়ুজ্জে মশায়ের মোড়টা গেল তার দিকে ফিরে। বলে উঠলেন তিনি,—ঠিক হয়ে যাবে না, ঠিক করে নিতে হবে। এক চোট নিলেন তিনি এই সঙ্গে মায়াকেও, তুই কোন লজ্জার ওই বানরটার কথায় ছুটতে গেলি তার পিছনে পিছনে বলতো? তোরও তো একটু আক্কেল করা উচিত ছিল। আর তুই সেই আগেকার মত গায়ের ছোট বিটি ছেলেটি ন'স যে এধার ওধার ডাঙ্গা ডহরে ছুটো-ছুটি করে ঘুরে বেড়াবি। বংশের আমাদের কুলবধূ হয়েছিস তুই। পরিবারটার মান-ইজ্জত এখন নির্ভর করছে তোর উপর। তুই যদি না বুঝে-সুজে ওই বেয়াক্কেলে ভূতটার সঙ্গে নেচে বেড়াস তাহলে কি আমাদের মান-মুরোদ আর থাকবে ভেবেছিস?

কি আর বলবে মান্না। যেমন পতি তার তেমনি জায়া। ভূতনাথ রইল মুখ গোমড়া করে গাদা খুঁটিটার মত দাঁড়িয়ে আর মায়া রইল বুড়ো বাপটার বুকের উপর দেওয়াল-আঁটা ছবির মত নির্বাক হয়ে। পাড়া প্রতিবেশী, ছেলে-ছোকরাদেরই বা বলার কি আছে? করবেই বা কি তারা এসব ব্যাপারে। তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল প্রায় সবাই। এগিয়ে এলেন শেষে তাদের মধ্যেই দু-একজন, পাকামাথা বয়স্ক ব্যক্তি। বুঝিয়ে বলতে লাগলেন তারা,—যা হবার তা তো হয়েই গেছে। খুঁজে যখন পাওয়া গেছে তাদের তখন তো এখন দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি আর ভাল নয়। আর মাঝ-নদীতে শ্মশানের বুকে দাঁড়িয়ে বকাবকি করাটাও উচিত নয়। বাড়ী ফিরে চলা যাক এবার। নইলে ওদের মা-বুড়ী দুটোর মনের যা অবস্থা তাতে এখনও পর্য্যন্ত এদের কোন খোঁজ-খবর না পেলে হয়তো তারা আবার একটা কিছু অঘটন ঘটিয়ে বসে থাকবে।

কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। যেমনি সারদা তেমনি জ্ঞানদা। উভয়েই সন্তান-স্নেহে অন্ধ। আর হবে নাই বা কেন? সবে ধন নীলমনি বলতে তো জ্ঞানদার ওই মায়া আর সারদার ওই ভূতনাথ। ছেলে-খোঁজা দলটার সঙ্গে তারাও বেরিয়েছিল কাঁদতে কাঁদতে। বহুকষ্টে তাদের সবাই মিলে বলে-কয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে দলছাড়া করে এসেছে ভূতনাথের মন্দিরে। দু'বেয়ানে বোধ হয় এতক্ষণ আড়াআড়ি করে শুরু করে দিয়েছে বাবার থানে মাথা ঠুকোঠুকি। সুতরাং তাড়াতাড়ি মায়া-ভূতনাথকে নিয়ে এখন তাদের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত সকলের।

তাইচাটুজ্জেমশায় মায়াকে নিয়ে চললেন নদীর পাড়ের দিকে। এধারে ভূতনাথের বন্ধু-বান্ধবরাও ভূতনাথকে ধরে নিয়ে যেতে লাগল তাদের সঙ্গে সঙ্গে। পিছনে আসতে লাগলেন বাড়ুজ্জেমশায়। উল্লুক-ভল্লুক, গাধা-শুয়োর ইত্যাদি কাণ্ডজ্ঞানহীন নানা পশুর ভূতনাথের উপর গুনারোপ করতে করতে। মোটকথা বাপ হয়ে বলরাম বাড়ুজ্জেকে অদ্যাবধি এমন অধিকার প্রয়োগ করতে দেখা যায়নি কোনদিন ছেলের উপর। আর ছেলে হয়ে ভূতনাথও বোধ হয় এমন হজম করেনি কখনও বাপের কথা। কথায় বলে—বাঁধা কাঁকড়ি ছেলের বশ। দিব্যি ভূতনাথ সবকিছু সহ্য করে গুটুগুটু চলতে লাগল তাদের পিছনে পিছনে। রইল পড়ে তার সতীর চিন্তা। রইল পড়ে তার সতীকে দেখিয়ে মায়াকে প্রমান দেবার ইচ্ছা যে দিদি তার মরেনি। বেঁচে আছে সে তার কাছে। উবে গেল মন থেকে তার বটতলায় গিয়ে মায়ার পাশে সতীকে বসিয়ে জমিয়ে গল্প করার আশা। হারিয়ে গেল ভূতনাথের মায়াকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া বাসনা যে তার মতই সতী জীবন্ত তার কাছে। সতী মৃত নয়।

সব কিছুই গোলমাল করে দিল মায়া। দেখেও সতীকে তার না দেখার ভানটা নষ্ট করে দিল তার সবকিছু। ভণ্ডুল করে দিল সে তার সতীকে তাদের সঙ্গে নিয়ে জীবনে চলার সমস্ত কামনা। সকলের সামনে তাকে মায়ার পাগল বলা, মাথা খারাপ বলা ইত্যাদি উক্তিগুলো খুঁচিয়ে দিল তার ভিতরের পশুটাকে। ক্ষোভে দুঃখে অপমানে গর-গর করতে লাগল সে। কষ-কষ করতে লাগল তার মনটা মায়ার প্রতি রাগে। কিন্তু কি করবে সে? সিংহ এখন মুষিক। পিঞ্জরে বদ্ধ এখন কেশরী। তাই হঠাৎ এখন ফেটে পড়া উচিত হবে না তার। সব দিক চিন্তা করে তাই ভূতনাথ চলতে লাগল সকলের হাতের খেলার পুতুলের মত বাধ্য হয়ে।

হাজির হল সকলে বাবা ভূতনাথের মন্দিরে। সারদা জ্ঞানদা হারানিধিদের ফিরে পেয়ে তো জাপটে ধরলেন। আবেগ-আকুল স্বরে তাদের আদরের সোনামানিকদের বললেন কত কথা। স্নেহভরে বোঝালেন কত তাদের। মায়া চাপা কান্নায় তাদের আদরের প্রত্যুত্তর দিলেও ভূতনাথ কিন্তু চুপ। ধীর-গম্ভীর নিরুত্তর সে। চাপা আগ্নেয়গিরি।

যাই হোক শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হল যাত্রা ধরেই যখন স্বামী-স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়েছে তখন বাড়ী ফিরে গিয়ে পুনরায় আর মায়ার পতি-গৃহে যাত্রার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই। বাবা ভূতনাথ যখন সকলেরই বাবা তখন তাঁর মন্দির হল সকলেরই বাপের বাড়ী। সুতরাং এখান থেকেই মায়ার পতিগৃহে যাবার উদ্যোগ করা হোক।

তাই করলেন চাটুজ্জে মশায়। ঘর থেকে গাড়ী-গরু, মায়ার সঙ্গে দেবার জিনিস-পত্র সব আনা করালেন তিনি মন্দির চত্বরে। তোষক, পালঙ্ক, বালিশ-বিছানাও বাদ গেল না। এধারে সারদা জ্ঞানদা দুই বেয়ানই বাতিকগ্রস্থ। তাই শ্মশান গেছল যখন ভূতনাথ-মায়া তখন স্নান করালেন তাদের তাঁরা ঠাকুর-পুকুরে। পুকুর হল ভূতগ্রামের শিব-গঙ্গা। কিন্তু শুধু গঙ্গায় ডুবালেই তাদের সর্ব্ব শুদ্ধ হবে না ভেবে সারদা-জ্ঞানদা বাবা মহাদেবের স্নান-জল, ফুল-বেলপাতা খাওয়ালেন তাদের ভক্তিভরে। পরানো হল আবার ভূতনাথকে পাটের জোড়। মায়াকেও সাজানো হল আগের মত সেই গহনা-শাড়ী, আলতা সিন্দুর পরিয়ে। সতীর অলঙ্কার মায়ার গায়ে দেখেও ভূতনাথ কিন্তু আর বলল না কিছু। করল না কোন প্রতিবাদ। আশ্চর্য্য!

গো-যান হল ভগবানের রথ। গরু হল দেবতা। সুতরাং গো-দেবতার রথে চড়ে গেলে নাকি সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়। অকল্যাণ পাশ ঠেসতে পারে না। অসোয়াস্তি, অশান্তি গাড়ীর চাকায়, গরুর পায়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই মায়া-কন্যার পাশে মায়ের কথায় ভূতনাথকে বসতে হল গাড়ীতে উঠে। ইচ্ছা না থাকলেও কোন উপায় নেই তার। কারণ সে এখন কয়েদী।

যাত্রা হল শুরু। বাবার মন্দির থেকে চলল নব-দম্পতি সংসারের পথে। জীবনে ঘর বাঁধার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে। পিছনে পিছনে চলল তাদের শ্বশুর-শাশুড়ী, জিনিস-পত্র, লোকজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সই-সয়েলীর দল। সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। রৈ-রৈ কাণ্ড। দস্তুর মত এক শোভাযাত্রা আর কি। এ কোলাহলের সঙ্গে, যদি বাজি-বাজনা যুক্ত হত তাহলে আর রক্ষে থাকতো না। তুলকম্প ধরাতো চারদিকে। ভূতগ্রামের ভূতগুলো বোধহয় গ্রামচৌহদ্দি শ্মশান-মশান ছেড়ে পালাতে পথ পেত না।

সে যাই হোক—এমন সৃষ্টিছাড়া দিরাগমন অনুষ্ঠান মনে হয় বাপের জন্মে কেও কখনও দেখেনি। কি সাংঘাতিক জামাই-রে বাবা! বৌকে বাপের ঘর থেকে বের করে নদীর-ঘাট, ঠাকুর-পুকুরের ঘাট—মানে লেজে বেঁধে সাতঘাটের জল খাইয়ে ছাড়ল। না বাপু! কীর্ত্তি রাখল বটে ভূতনাথ একটা।

(পনের)

ভূতনাথকে পাগল বলে যারা, তার মাথা খারাপ—ভূতনাথের শত্রু তারা। তারা এ পরিবারের দুশমন। বাড়ুজ্জে বংশের ভাল তারা দেখতে পারে না। পারে না সহ্য করতে তারা এ বাড়ীটার উন্নতি। ধ্বংস হোক তারা। লাগুক তাদের মুখে আগুন। পুড়ুক তাদের কপাল। খাট বেয়ে সব যাক না তারা শালী-নদীর শ্মশান ঘাটে। চাপুক তাদের বুকের উপর আমের কুন্দো, মড়ার মুড়ো। দাউ দাউ করে জ্বলুক তাদের চিতা।

কিন্তু যাক গে তাদের কথা। পরশত্রু ভায়াদ-দুশমনরা না হয় ওসব বলেই থাক। কিন্তু মায়া? বিয়ের গন্ধ এখনও যায় নি যার গা থেকে। এ বংশের কুলবধূ সে। যার উপর নির্ভর করছে বংশটার সম্মান, পরিবারটার মান-মর্যাদা। সে কেন স্বামীকে তার বলতে গেল পাগল? ভূতনাথ মাথা খারাপ ক্ষেপে গেছে সে

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়ল সারদা। বধূ-মায়া মহা অপরাধীর মত বড়-মার পায়ের তলায় রইল মাথাটা নীচু দিকে করে বসে। শাশুড়ী তাকে ধমকের সুরে একের পর এক বলে যেতে লাগলেন নানা কথা। সত্যিই তো বড় হয়েছে সে। চাটুজ্জে পাড়ার আর সে সেই হরবলা, নেচে-বেড়ানো মেয়েটি নেই। বাড়ুজ্জে পাড়ার বৌ হয়ে এসেছে সে। এসেছে সে এ ঘরে ভূতনাথের ধর্মপত্নী হয়ে। একটু আক্কেল করে চলবে না সে? চলবে না সে মুখটাকে তার বোধ-বুদ্ধির লাগাম দিয়ে একটু সংযত করে? পরের মুখে ঝাল খাবে কেন সে? কেন সে কাকে কান নিয়েছে শুনলে ছুটে যাবে কাকের পিছনে পিছনে? হাতটা দিয়ে একবার নিজের কানটা নেড়ে দেখবে না সে? কি এমন দেখেছে সে ভূতনাথের মধ্যে যাতে সে বলেছে তাকে পাগল, মাথা খারাপ?

বড়-মা শাশুড়ীর দেমাকে পৈ-পৈ করে বুঝাতে লাগলেন তাকে ভূতনাথ ক্ষেপাও নয় আর তার মাথা খারাপও নয়। যা দেখেছে শ্মশানে সে—সেটা তার পাগলামির কোন লক্ষণই নয়। নয় সেটা তার বিকৃত মস্তিষ্কের কোন পরিচয়। আসলে সতীর প্রেতাত্মাটাই নিয়ে গিয়ে তাকে শ্মশানে করিয়েছে ওসব কাণ্ড। নইলে সুস্থ সবল ভূতনাথ। ভালমনেই সে আনতে গেছে মায়াকে। হঠাৎ ওমনি অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারবার সে কখনও করতে পারে? সতীর অর্থাৎ মায়ার দিদির ওই ভূতটাই ঘাড়ে চেপে ঘুরাচ্ছে তাকে। স্বামীর হাতের আগুন

পায়নি সে। পায়নি সে তার হাতের এখনও পর্য্যন্ত কোন শ্রাদ্ধ-পিণ্ড। শ্বশুরের হাতে ভূতনাথকে লুকিয়ে ছাপিয়ে দিদির তার যে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মটুকু করা হয়েছে তাতে তো আর তার আত্মার উদ্ধার হয়নি। হয় কি কখনও কারোর স্বামী থাকতে শ্বশুরের হাতেঘাট-পিণ্ডি নিয়ে কোন স্ত্রীর আত্মার প্রেতমুক্তি? তাই ওটা মাঝে মধ্যে পেয়ে বসছে ভূতনাথকে। করাচ্ছে তাকে এসব বদ্-বিটকেলে ভূতুড়ে সব পাগল-পারা কাণ্ড। দেখতে গেলে এসব কাণ্ডের জন্যে দায়ী মায়াই। কারণ উচিত হয়নি তার ভূতনাথকে সতীর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। ঠিক হয়নি তার তাকে ওভাবে শ্মশানঘাটে যেতে দেওয়া। স্ত্রী যখন সে তার তখন ধরবে না কেন সে শক্ত হাতে তার লাগামটা। ওরকম বাতিকে-স্বভাবে চলতে দেবে কেন তাকে? যেমন করেই হোক ওসব বাঈ ভূতনাথের ছাড়াতে হবেই তাকে।

বড়-মা'র কথাগুলো বেশ গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনে বসে বসে ভাবতে লাগল মায়া। শাশুড়ী তার কর্ত্তব্য-চেতনার টনক নড়িয়ে দিলেও কেমন যেন এক ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে সে তাকাতে লাগল তাঁর মুখের দিকে। সাহস দিয়ে বড়-মা বলে উঠলেন তাকে,—ভয় নেই তোর। আমি আছি, তোর শ্বশুর আছে। আছেন আমাদের সবার উপর চণ্ডীতলার শ্মশান বাবা। সতীর ভূতটা পেয়ে বসলেও ভূতনাথকে, কোন ক্ষতি করতে পারবে না তার। কারণ শ্মশান-বাবা মন্ত্রে তার বেঁধে দিয়ে গেছেন গা-টা।

বুঝিয়ে মায়াকে বলতে লাগলেন শাশুড়ী যে বাইরে ভূতুকে সুযোগ পেলে হয়তো ভর করে থাকে তার দিদির প্রেতাত্মা। কিন্তু বেড়-বন্দী ঘরের ভিতর কোনমতেই পেতে পারবে না সে তাকে। কারণ দেওয়াশী-বাবা নাকি মন্ত্রপড়া সরষে-পড়া দিয়ে বেঁধে গেছেন তাদের ঘর-বাড়ী। অমাবস্যায় জাগানো লৌহার পেরেক, ঘোড়ার নাল পুঁতে বেঁধে দিয়ে গেছেন প্রাচীরেব চার-কোণা। মহা-যজ্ঞের হোম-ভস্ম ছিটিয়ে করে দিয়ে গেছেন বেড়-বন্দি, আটকে দিয়ে গেছেন প্রাঙ্গণ চৌহদ্দি। এ সীমানার ভিতর তার দিদির প্রেতাত্মা কোনমতেই আর ফেলতে পারবে না তার ছায়া। পারবে না সে তার ভূতুড়ে বাতাস বহাতে এ বড়ীর ভিতর। কিন্তু বাড়ীর ভিতর না পাক তাকে তার দিদি, বাড়ীর বাইরেই বা ভূতনাথকে পাবে কেন? বেটা ছেলে সে ঘরের ভিতর বসে থাকা তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং একটা কাজ করতে হবে মায়াকে। এ কাজ করলে তার দিদির প্রেতাত্মা ভূতনাথকে পাওয়া তো দূরের কথা চিরকালের মত এ চৌহদ্দি ছেড়ে চলে যাবে সে। মুক্তি হবে তার।

—কি কাজ? জিজ্ঞেস করতেই মায়া বলে উঠল তার শাশুড়ী,—তোর বাবাকে দিয়ে গয়ায় পিণ্ড দেওয়াতে হবে তোর দিদির।

কারণ, শ্মশান বাবা বলে গেছেন প্রেত-গযায় দিলেই নাকি মুক্তি পেয়ে যাবে সতীর প্রেতাত্মা। আর দৌরাত্ম করতে আসবে না সে কোনদিন। তবে এ কাজ নাকি করাতে হবে তাকে গোপনে। কারণ ভূতনাথ কণামাত্র টের পেয়ে গেলে গয়াতেকিছুতেই তাকে দিতে তো দেবেইনা উপরন্তু কেলেঙ্কারী কাণ্ড শুরু করবে ঘরে। অন্যলোককে পাঠালে জানলে তাকে হয়তো জ্যান্ত কবর দেবে। আর তার বাবাকে পাঠালে তো কথাই নেই। সুতরাং বুড়ো মুখুজ্জেমশায়কে অন্য কোথাও যাবার অছিলায় গোপনে তাকে দিয়ে গয়ায় পাঠিয়ে সতীর পিণ্ড-দানটা করিয়ে আসানো সবচেয়ে ভাল। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙ্গবেনা। বুঝতেও পারবে না ভূতনাথ। বাঈটা যাবে তার। যাবে তার পাগলামি। মাথা খারাপ আর বলবে না তাকে লোকে। সুখে ঘর-কন্না করতে পারবে তারা। কিন্তু একটা কথা—ততদিন পর্য্যন্ত শান্ত থাকতে হবে মায়াকে। রাগ-অভিমান তো করা চলবেইনা এমন কি ভুলেও কোনদিন চলবে না বলা এমন কথা বা করবে না চলা এমন কাজ যাতে সতীর কথা মনে পড়ে যায় ভূতনাথের। সতীর স্মৃতি জাগলেই মনে তার সব কিছু লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যেতে পারে। ওই স্মৃতিধরে এসে হয় তো প্রেতাত্মাটা তার সবকিছু জানিয়ে দিয়ে ভূতনাথকে ভণ্ডুল করে দিতে পারে সব। বানচাল করে দিতে পারে গয়ায় যাওয়া। সুতরাং খুব সাবধান। সেদিন শ্মশানে সতীর কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভূতনাথকে যে ভুল করেছিল মায়া তার পুনরাবৃত্তি যেন না করে সে।

বুঝল মায়া সব কিছু। কিন্তু রাগিয়ে ভূতুদার মনটা সে বাপের বাড়ী যাবেই বা কোন ছলে আব বাবাকে তার বলবেই বা কি করে দিদিকে তার গয়ায় দেওয়ার কথাটা। সেদিন রাত্রেবেলায় শোবার ঘরে গিয়ে দেখল মায়া ভূতুদার তেমনিই গোমড়া মুখ। পাগল বলার রাগটা এখনও যায়নি তার মন থেকে। আলাদা বিছানা, কথা

না বলে শোওয়া, চুপচাপ থাকা রাগের সব লক্ষণগুলো বজায় রেখে চলেছে সে পুরো মাত্রায়। কিন্তু স্ত্রী হয়ে মায়ার কি এসব সহ্য করা যায়? সদ্য বিবাহিতা পত্নী কখনও পারে কি স'য়ে থাকতে স্বামীর ওই গোমড়া-বদন? বিশেষ করে ভূতুদার মত পতির। তাই সাহস করে মায়া গেল সেদিন সুপ্ত আগ্নেয়গিরিটার পাশে। বিছানায় বসে তার শুরু করল চাপা কান্না—ফ্যাঁসেক ফ্যাঁসেক।

মেয়ে মানুষের এ হল বড় অস্ত্র। পুরুষদের উপর এ হল তাদের মোক্ষম দাওয়াই। ফল ফললো। কথা সরল ভূতনাথের মুখে। গোমড়া-বদনে অগ্ন্যুৎপাত হল তার,—ঘুমুতে দিবি না—না কি?

বলে উঠল মায়া, --প্রতিদিন আলাদা বিছানায় শুয়ে তোমার সঙ্গে তো ঘুমের প্রতিযোগিতায় নামতে এ মাঠে আমি আসিনি। বাপের ঘর থেকে শ্বশুর-ঘরে নিয়ে এলে কি আমাকে তোমার রাগ দেখাতে?

ধমকে উঠল ভূতনাথ—কানের গোড়ায় মেলায় ফ্যাচ-ফ্যাচ করিস না বলে দিচ্ছি। জানিস তো আমি পাগল। দেবো এক্ষুনি কামড়া-কামড়ি খামচা-খামছি শুরু করে।

—বলেছি তো আমার ভুল হয়ে গেছে। মুখ ফসকে ও খারাপ কথাটা বেরিয়ে গেছে হঠাৎ। ঘাট মাগছি আমি। লক্ষ্মীটি আমার। দিনের পর দিন আর রাগ করে থেকো না আমার সঙ্গে। এভাবে থাকলে—

—আঃ। শুরু হল আবার সেই ঘ্যানর-ঘ্যানর! বিরক্ত হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ,—মাথা খারাপদের ঘুমোতে দেওয়া হল আসল চিকিৎসা। বুঝলি? ঘুমোতে দিলে তাদের ক্ষেপামি সারে। সুতরাং—

—আচ্ছা, গম্ভীর হয়ে মায়া বলে উঠল তাকে,—সত্যি কি আমাকে তুমি ক্ষমা করবে না কোনদিন?

—করতে পারি এক শর্তে। বলে উঠল ভূতনাথ,—বলতে হবে তোকে সেদিন শ্মশানে আমার মধ্যে কি এমন দেখলি তুই যে ভূত দেখার মত আমাকে দেখে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে গেলি তোর বাবাকে? আমার যে মাথা খারাপ কি করে বুঝলি তুই? কি পাগলামির কাজ করেছিলাম আমি; বলতেই হবে তোকে।

মায়া চুপ। কারণ বললেই উঠবে সতীদির কথা। সতীদির কথা ভূতুদার কাছে বলতে বার বার নিষেধ করে দিয়েছেন বড়-মা। শুধু তার কথা বলাই নয় পাছে গহনা-গাঠি পরে থাকলে মনে পড়ে যায় ভূতুদার তার স্মৃতি তাই সে সব অলঙ্কার খুলা করিয়ে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু আজ ভূতুদা নাছোড়বান্দা। বলতেই হবে তাকে মাথা খারাপের কি দেখেছিল সেদিন সেই শ্মশান ঘাটে তার আচরণের মধ্যে। বেশ মুস্কিলে পড়ল মায়া। সে-সব কথা এড়িয়ে যাবার-এমনকি তার কাছ থেকে উঠে যাবার নানা ফন্দি-ফিকির করল সে। কিন্তু ভূতুদার গোঁ-এর কাছে কোন ছল-চাতুরিই টিকল না তার। পারল না তার শক্ত হাতের ধরনটা নানা অছিলায় ছাড়িয়ে আসতে। শেষে দুম্ করে ভূতুদা তার দিব্য দিয়ে বসতেই বলতে বাধ্য হল মায়া। সেদিন শ্মশানে ওই শূন্য চিতাটার দিকে তাকিয়ে তার নানা কাণ্ড করাই মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছিল তার মাথা খারাপের। বিশেষ করে তার পাশে তার দিদির থাকায় কথা বলায় এবং ফাঁকা পাশটাকে তার লক্ষ্য করে ঠিক দিদির সঙ্গে কথা কইবার মত অঙ্গভঙ্গী আচরণ ও হাসাহাসি করায় মনে হয়েছিল তাকে পাগলের মত। বলতে বলতে হঠাৎ পা দুটো তার জড়িয়ে ধরে বলে উঠল মায়া,—কিন্তু বিশ্বাস কর ভূতুদা, মনটা আমার এক মুহূর্তের জন্যও পাগল তোমাকে বলেনি। মুখটাই শুধু বলেছিল তোমার সেদিনের আচরণটাকে। চোখদুটো আমার ওই সমস্ত কাণ্ড দেখে তোমার ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল মনে। তাই মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে গেছল আমার ওই কথাটা। ক্ষেপা, পাগল, মাথা খারাপ কিচ্ছু তুমি নও ভূতুদা। ওসব আমার বলার ভুল। এ ভুল আমার ক্ষমা করে দাও তুমি।

শুনেই কথাগুলো হাতদুটো কেমন আলগা হয়ে গেল ভূতনাথের। ছেড়ে তাকে গম্ভীর হয়ে বসে রইল সে। সব সহ্য হয় মায়ার কিন্তু তার কাছে ভূতুদার ওই চুপচাপ গম্ভীর হয়ে থাকাটা মোটেই সহ্য হয় না। তাই বার বার তাকে ঝাঁকরানি দিতে দিতে বলতে লাগল মায়া,—বেশ, ক্ষমা যদি না করতে পার তুমি তবে শাস্তি দাও। দোষ যখন করেই ফেলেছি তখন যা শাস্তি দেবে তুমি মাথা পেতে নেব। তবু তুমি ওই মুখ গোমড়া করে থেকো না আমার কাছে। আমার দিব্যি রইল ভূতুদা—কথা বল তুমি। বল আমাকে কি করতে হবে।

বলার পরিবর্তে ভূতনাথ- ফেলল একটা টানা দীর্ঘশ্বাস। সেটাই জানিয়ে দিল মায়াকে কি ধরনের চিন্তা ভূতুদা জড়িয়ে রেখেছে মনটাতে।

ভ্রূ-দুটো কুঁচকে উঠল ভূতনাথের। তাকাতে লাগল সে মায়ার দিকে অবাক চোখে। বলে উঠল তাকে

বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে,—দিদির থাকার মত। ফাঁকা পাশটা লক্ষ্য করে দিদির সঙ্গে কথা বলার মত। কি বলছিস তুই? সতীকে তুই দেখিস নি? একটু চোখে পড়ে নি তোর দিদিকে?

—না ভূতুদা। বলে উঠল মায়া,—তাই তো তোমার ওরকম—

কিন্তু তখন কে শুনে কার কথা। চোখ তখন তার ছেড়ে গেছে মায়াকে। শূন্যে উঠেছে দৃষ্টি। কপালে জমে গেছে তার চিন্তা-ভারাক্রান্তের ছাপ। বিড় বিড় করে বলতে লাগল সে,—তাহলে আমি কি দেখলাম? কাকে দেখলাম? সত্যি বলছিস মায়া—দিদিকে তোর একদম দেখিসনি? একটুও দেখতে পাসনি তাকে?

একেই বলে,—ছুতোর মাগীর ধানের চিন্তা আর পুয়োতী মাগীর বাসি-পান্তা। যার যাকে চিন্তা সে কি তাকে না ভেবে থাকতে পারে কখনও? বিরক্ত হল মায়া। কোথায় তাকে ক্ষমা করবে কি, বলবে কি তাকে শাস্তি দেওয়ার কথা—তা না। সতী আর সতী! ধমকে উঠল সে,—ছাড়াতো ওসব দিদির ভাবনা। যা বলছি শোন এখন।

কিন্তু ওসব শোনবার মত কান, বুঝবার মত মন ভূতনাথের তখন থাকলে তো। চণ্ড্ চাপছে তার। বাইটা বইতে আরম্ভ করেছে তখন তার অন্যখাতে। তাই ধমকের সুরেই বলে উঠল ভূতনাথ,—ওসব ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপার নয় মায়া। বেশ, সতী যখন তোর আঁচলটা ধরে পিছনটায় দাঁড়িয়েছিল তখন না হয় না দেখতে পারিস তুই। কিন্তু যখন সে তোর আঁচল ছেড়ে ডান-পাশটায় এসে দাঁড়াল তখনও দেখতে পেলি না তুই? দেখলি সব ফাঁকা? শূন্যতাটাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছি আমি? হাসাহাসি, অঙ্গভঙ্গী, আচরণ সব করছি আমি ফাঁকা, শূন্যতাকেই উদ্দেশ্য করে?

—বিশ্বাস কর ভূতুদা, অনুনয়ের সুরে বলে উঠল মায়া,—কিছু দেখতে পাইনি আমি। সেই জন্যই তো তোমার ওই আচরণগুলো কেমন গোলমেলে ঠেকল আমার। মনটা কেমন ভয়-ভয় করে উঠল। তাই তো মুখ ফসকে ওই পাগল কথাটা বেরিয়ে গেল আমার। তুমি কিছু মনে কর না ভূতুদা। এবারের মত ক্ষমা করে দাও আমাকে।

কিন্তু ভূতনাথের মন তখন ওসব ক্ষমা-টমার বাইরে। দস্তুরমত বিস্মিত সে। সত্যিই তার অবাক হওয়ার কথা। সে দেখতে পেল সতীকে অথচ মায়া দেখতে পেল না তাকে। এ কেমন করে হয়! চোখের সামনে থেকে সতী অদৃশ্য হয়ে থাকবে মায়ার কাছে একথা যে বিশ্বাস করা অসম্ভব ভূতনাথের পক্ষে। তাই ভূতনাথ একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্নভাবে জিজ্ঞেস করতে লাগল মায়াকে যে কথা তার সত্যি কি না, মিথ্যা সে বলছে কি না, মজা সে করছে কি না—ইত্যাদি।

বার বার একই প্রশ্নের কি যে উত্তর দেবে মায়া খুঁজে পেল না। ভেবে পেল না সে সতী প্রসঙ্গটা কি ভাবে দূর করবে সে ভূতুদার মন থেকে। একটু ভেবে পাকামাথা মুরুব্বির মত হঠাৎ বলে উঠল মায়া,—সব জিনিস তো সবার চোখে পড়ে না ভূতুদা তাই হয়তো দেখতে আমি পাইনি দিদিকে। কিন্তু তা হলে কি হবে। তোমার দেখাই তো আমার দেখা। ছেড়ে দাও ওসব।

—ছেড়ে দেব মানে! গর্জে উঠল ভূতনাথ,—এ কেমন কথা! আমাকে দেখা দেবে সতী অথচ তোকে দেখা দেবে না। তার কথায় আমি বিয়ে করলাম তোকে। যে চিতায় দেখা দিয়ে সে বলেছিল একথা, সে-কথা রেখে আমি তার দেখাতে গেলাম তোকে বৌ করে তার সেই চিতায়। অথচ দেখা দিল না সে তোকে! না, এ হতে পারে না। দেখা তাকে দিতেই হতে তোকে। কিন্তু একথা তুই আগে বলিস নি কেন? কেন বলিস নি তুই আগে যে দিদিকে তোর আমি দেখাতে পারিনি বলেই তুই আমাকে পাগল বলেছিস, মাথা খারাপ বলেছিস। তাহলে তো আমি কোন দোষ দিতাম না তোকে। রাগ করতাম না তোর কথায়। ছি ছি! কি অন্যায় বলতো?

—যা হবার তা হয়ে গেছে ভূতুদা। বলে উঠল মায়া,—ঝেড়ে ফেলে দাও মন থেকে ও সব। ভুলে যাও সে সব কথা।

—ভুলে যাব কি? বেশ ভারিক্কি গলায় বলে উঠল ভূতনাথ,—জানিস তো তুই, কেও আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি, চালাকি করলে আমি কখনও তা ভুলি না। ভেবেছে কি তোর দিদি? আমার সঙ্গে ধোঁকাবাজি! মরেছে বলে ছেড়ে দেব আমি তাকে? কখ্খনও না। নিয়ে আয় তুই তোর দিদির সেই গহনাগুলো।

গহনা। এত রাতে। শুনেই তো মায়া ভ্যাবাচেকা। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল সে ভূতনাথকে,—এসময়ে আবার গহনা নিয়ে কি হবে তোমার? মাঝ-রাতে-এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে—

—ফেলে দিয়ে আসব আমি ওসব তার চিতায়। রেগে বলে উঠল ভূতনাথ,—যে আমাকে ধাপ্পা দেয়, মিথ্যেবাদী সাজায়, তার জিনিস পরতে আমি দেব না তোকে। পরা শুধু-নয় ওসব চাল-বাজ মেয়ের কোন জিনিস রাখতেও দেব না আমি তোকে। যা, নিয়ে আর সতীর সব অলঙ্কার। এক্ষুনি শ্মশানে গিয়ে তার দিয়ে আসি ফেরৎ সমস্ত কিছু।

যা বাবাঃ। এ আবার কেমন ধরনের মাথা খারাপ হল ভূতুদার। এত রাতে গহনাগাঠি নিয়ে আবার শ্মশানে ফেলে দিয়ে আসবে কি! দেখে শুনে তো মায়ার চক্ষু চড়ক গাছ। ড্যাব-ড্যাব করে সে তাকাতে লাগল ভূতনাথের দিকে। ভূতনাথ হাত নেড়ে তাকে আরম্ভ করল বুঝাতে,—তুই-ই বল; যে দিদি তোর কাছে আমাকে পাগল সাজায়, লোকের মাঝে মুখ দিয়ে তোর বলা করায় আমার মাথা খারাপ তার জিনিস নেওয়া কি উচিত তোর? উচিত কি তোর যে স্বামীকে তোর অপমান করায় তার কোন- কিছু গ্রহণ করা? কোন্ লজ্জায় রাখবি তুই ওসব? পরবি ওসব তুই আমার সামনে। দে-ফেলে ওসব তুই। দূর করে দিয়ে আসি বাড়ী থেকে।

ভ্যাবা গঙ্গারাম মায়া। ভয়ার্ত চোখে তাকাতে লাগল সে ভূতুদার দিকে।

বলতে বলতে চোখে-মুখে ভূতুদার ভেসে উঠতে লাগল সেদিনের সেই শ্মশান-ঘাটের চেহারা। ফুঁসে উঠতে লাগল সে রাগে, দিদির উপর। ক্রুধোদীপ্ত কণ্ঠটা তার উদ্গিরণ করতে লাগল আগুন। ভয় হল মায়ার। স্মৃতিপটে উদয় হয়ে সেদিন শ্মশানের ছবি উতলা করে তুলল তাকে। সতীদির চিতার পাশে সেদিন ভূতুদার পাগলামি ভাবতে গেলে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে আসে তার অন্তরটা। সেদিনের মতই যদি আবার কাণ্ড বাঁধায় ভূতুদা। তা-হলে কি হবে! কেলেঙ্কারির যে বান ডেকে যাবে এই রাত্রে বেলায়। সতীদির কথা মনে করিয়ে দেওয়ায় শাশুড়ী তাহলে তাকে করবে যৎপরোনাস্তি অপমান। আতঙ্কে, উদ্বেগে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল মায়ায়। করুণ চোখে তাকাতে লাগল সে তার ভূতুদার দিকে।

ধমকে উঠল ভূতনাথ,—দেখছিস কি? দে বের করে সতীর গহনাগুলো।

কি করবে মায়া? কি বলবে সে এখন! ক্ষেপ উঠেছে ভূতুদা। এ নিশ্চয়ই তার সেদিনের মত পাগলামি। এ অবস্থায় তার সঙ্গে সঙ্গ দেওয়া মোটেই উচিত হবে না তার। তাই উপস্থিত বুদ্ধিমত বলে উঠল সে, যে এ গহনা তার দিদির আশীর্বাদ। চিতায় তাকে প্রণাম করতেই এক ঝলকায় দেখা দিয়ে সে বলেছিল তাকে এ গহনাগুলো নিতে। এ আশীর্বাদ তার ফিরিয়ে দিতে পারবে না সে কিছুতেই।

—তাই নাকি? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ,—কৈ, এতক্ষণ তো একথা তুই বলিস-নি আমাকে।

—জিজ্ঞেস করেছিলে তুমি? বলে উঠল মায়া, —তুমি শুধু তো বার বার জানতে চাইছিলে যে দিদি আমার আঁচলা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল কিনা। পিছনে থাকলে কি কেও কখনও দেখতে পায়?

—কিন্তু ডাইনে, বলে উঠল ভূতনাথ,—ডান পাশে যখন এসে দাঁড়ালো তোর দিদি তখন তো তাকে দেখা উচিত ছিল তোর।

—ডান পাশে আসতেই তাকে দেখতে পেলাম বৈ-কি।

—মিথ্যে বলছিস?

—কি মুস্কিল! মিথ্যে তোমাকে আবার বলতে পারি কখনও?

—বল দেখি, কি শাড়ী পরেছিল তোর দিদি? গায়ে ছিল তার আর কি কি? চুলগুলো তার খোলা ছিল না বাঁধা ছিল? ইত্যাদি নানা জেরায় জেরবার করতে লাগল ভূতনাথ মায়ার।

মায়াও বুদ্ধিমতী। জানে সে ভূতনাথের ধাত। মিথ্যাবাদী ঠাওরালে তাকে আর রক্ষে নেই। তার তলার মাটি উপরে করে ছাড়বে সে। সুতরাং একবার যখন মিথ্যাটাকে সত্য বলতে আরম্ভ করেছে সে তখন যেমন করেই হোক সেই মিথ্যেটাকেই তার খাঁটি সত্য বলে খাঁড়া করতে হবে। তাই বলে উঠল সে,—দিদির দিকে তাকাতেই হঠাৎ সূর্য্যটা পড়ে গেছল চোখে। তাই ঝলসে গেছল চোখদুটো। ও নজরে এতশত কি চট্ করে

দেখা যায়। তাছাড়া কনে দেখার মতো তোমার ন্যায় এতসব খুঁটি নাটি দেখবার মতন তখন মন ছিল না আমার। এতদিন পরে দিদিকে দেখা। আনন্দে তখন আত্মহারা আমি। কোথায় দেখব তার সাজ-পোশাক?

'—কৈ, গায়ে হাত দিয়ে বল দেখি আমার যে সতীকে তুই দেখেছিলি। হঠ্ করে ওমনি বলে উঠল ভূতনাথ।

জব্দ হল মায়া। বড় ফ্যাসাদে পড়ল সে। যতই বলুক মুখে সে কিন্তু স্ত্রী হয়ে স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে তো আর মিথ্যে বলা যায় না। চালাকি ধরা পড়ে গেল তার। গর্জে উঠল ভূতনাথ,—আমার সামনে মিথ্যে কথা বলতে তোর লজ্জা করে না? দে বলছি সতীর গহনাগুলো।

কিন্তু যতই ধমক দিক ভূতনাথ ক্ষেপামি করতে তো আর তার দামী-দামী এতসমস্ত সোনার গহনা তুলে দেওয়া যায় না। তাই বলে উঠল সে,—গহনাগুলো নেই আমার কাছে।

—কোথায়?

—বাবার কাছে।

—কেন?

—ড্যাপ-ড্যাপে ওল্ড মডেলের বলে বাবা সেগুলো পোদ্দারদের দোকান দিয়েছেন। ভাঙ্গিয়ে সেগুলো নূতন ডিজাইনে গড়ানো হবে।

—ফের মিথ্যেকথা?

—মিথ্যে না সত্যি মা-বাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও না।

গর্জে উঠল ভূতনাথ,—আমাকে না জানিয়ে তোকে ওসব ডিজাইন পাল্টাতে কে বলল? আমি কি ঘরের এমনি অপদার্থ যে একটা মতের পর্য্যন্ত প্রয়োজন নেই আমার।

—দোষ হয়ে গেছে আমার। এবারের মত ক্ষমা করে দাও তুমি।

রেগে উঠল ভূতনাথ,—সব কথাতেই—দোষ হয়ে গেছে আমার, ক্ষমা করে দাও তুমি—এ ছাড়া আর কি জানা আছে তোর? চলে যা বলছি আমার কাছ থেকে। চুপ দিয়ে রইলাম আজ। কাল যদি মা-বাবাকে যাচাই করে জানি যে মিথ্যে বলছিস তুই তবে ঘাড় ধরে তোকে রেখে দিয়ে আসবো তোর বাপের বাড়ীতে। যা বলছি, চলে যা নিজের বিছানায়। ঘুমোতে দে আমাকে।

আর ঘাটাঘাটি করল না মায়া। ঘুমোনই বোধ হয় ভাল ভূতুদার এখন। কালকের কথা কাল হবে। মা-বাবাকে বলে বাগিয়ে নেওয়া যাবে সব কিছু। তাই ফেঁস-ফেঁসানি কান্না দেখিয়ে মায়া শু'ল গিয়ে নিজের বিছানায়। ভাবতে ভাবতে কখন যে তার চোখ-দুটো জড়িয়ে এল কে জানে।

ভূতনাথও বোধ হয় পড়েছিল ঘুমিয়ে। কিন্তু হঠাৎ একটা ফেঁস-ফেঁসানি কান্নার শব্দ কানে আসতেই ভেঙ্গে গেল তার ঘুমটা। যা বাবাঃ। রাত তখন কতটা হবে কে জানে। কিন্তু সে যাই হোক। এখনও কাঁদছে মায়া। আচ্ছা মেয়েতো। কি এমন বলেছে সে যে তাকে রাতভোর পড়ে পড়ে কাঁদতে হবে? উঠল ভূতনাথ। কারণ একজন সারারাত ফেঁস-ফেঁস করবে আর সে দিব্যি ঘুমোবে তা তো হয় না। গেল ভূতনাথ মায়ার কাছে।

কিন্তু কৈ। কাঁদেনি তো মায়া। দিব্যি তো সে ঘুমোচ্ছে। ঘুমে একেবারে কাদা সে। আশ্চর্য। তবে শব্দটা আসছে কোত্থেকে? কানে লাগা পরিচিত স্বর তার। বন্ধ-হয়নি এখনও। মায়া ছাড়া আর তো কোন জনপ্রাণী নেই এখানে। তবে?

খুলল কপাট। বেরুল সে বারান্দায়। কিন্তু না। বারান্দাতে তো নেই কেও। মা-বাবা দিব্যি ঘুমোচ্ছেন তাদের ঘরে। তবে কি বাইরে থেকে আসছে শব্দটা? খুলল গিয়ে সে সদর দরজাটা। না সেখানেও কেও নেই। কিন্তু চাপা কান্নার স্বরটা দিব্যি তার আসতেলাগল কানে। অদ্ভুত তো। মেয়েলী কান্না, চেনা-চেনা গলা, যেন কত তার আপন জনের স্বর। যতই শুনছে ভূতনাথ ততই তার উদ্বেল হয়ে উঠছে মনটা, প্রাণটা হয়ে উঠছে উতলা। না, ছেড়ে দিলে চলবে না। দেখতেই হবে তাকে কার এ কান্না। কে, কোথায়, কেন, রাত্রে বেলায় কাঁদছে এমন চাপা স্বরে—জানতেই হবে তাকে। ঝোঁক চাপলে ভূতনাথের রোক চেপে যায় তার। মানে না সে রাত-বেরাতের কোন বাধা। ভাবে না সঙ্গী-সাথী নেওয়ার কথা। তাই একাই চলল ভূতনাথ। চলল ঘুমন্ত গ্রামটার বুকে পা ফেলে মাঝ-কুলি বরাবর স্বরটাকে অনুসরণ করে।

হাজির হল গ্রামের মাথায়। বাবা ভূতনাথের মন্দিরে। দেখল দাওয়ার নীচে সেই গাদা পাথরটার পাশে উবুড় হয়ে শুয়ে আছে একটা মেয়ে। কাঁদছে সে-ই। ডুকরে ডুকরে কাঁদার ফলে দুলেদুলে উঠছে তার শরীরটা। আশ্চর্য্য! এই রাত্রে বেলায়, নির্জনে, গ্রামছাড়া এই মন্দিরটার বুকে কে কাঁদতে এল এমন ভাবে? কি হয়েছে তার? কে আছে এমন নিষ্ঠুর যে এই ভর-রাতে মেরে-ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটাকে তার ঘর থেকে? সঙ্গে সঙ্গে সেই অনির্দ্দিষ্ট লোকটার প্রতি রাগে ফুঁসে উঠল সে। রোষে পায়ের রক্ত মাথায় উঠল তার মুহূর্ত্ত মধ্যে। কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে এখানে অযথা উত্তেজিত হলে তো চলবে না। আগে জানতে হবে তাকে-কে মেয়েটা? বুঝতে হবে তাকে—কাঁদছে কেন সে? দেখতে হবে ব্যাপারটা কি তার? তারপর কোন কুকুরকে কেমন মুগুর দিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয় তা আর বলে দিতে হবে না তাকে।

মেয়েটার কাছে গেল ভূতনাথ। কিন্তু শাড়ীটা দেখেই তার চমকে উঠল সে! কারণ এই রকমই একটা আকাশে রঙের শাড়ী পরে সেদিন উদয় হয়েছিল সতী শ্মশানে। দাঁড়িয়েছিল তার চিতার পাশে মায়ার পিছনে তার শাড়ীর আঁচলটা ধরে। পরক্ষণেই আবার ভাবতে ভাবতে মনে হল তার, এমন শাড়ীতো অনেক মেয়ের থাকতে পারে। তাই মেয়েটার একেবারে নিকটে গেল ভূতনাথ। কিন্তু দেখবে কি তাকে, দুহাতের উপর মাথাটা রেখে এমনভাবে সে উবুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে যে দেখাই গেল না তার মুখটা। ভূতনাথ একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল তাকে,—কে তুমি? এত রাতে এখানে এমনভাবে পড়ে পড়ে কাঁদছো কেন? কি হয়েছে তোমার?

কিন্তু কান্না বন্ধ হলে পর তো উত্তর দেবে সে। ডুকরে ডুকরে একনাগাড়ে কেঁদেই চলল মেয়েটা। আচ্ছা মুস্কিল তো! বলে উঠল ভূতনাথ,—কোন ভয় নেই তোমার। আমি ভূতনাথ। বল তোমার কি হয়েছে? তারপর যা করার করবো আমি।

তবু কান্না। বিরক্ত হল একটু ভূতনাথ। তাই স্বরটা একটু গম্ভীর করে বলে উঠল সে,—দেখ বাপু, কারো কান্না আমার সহ্য হয় না। ওসব শুনলে মেজাজটা আমার ঠিক থাকে না। দয়া করে বল তুমি কে? ব্যাপার কি তোমার? এই বাবা ভূতনাথের থানে কথা দিচ্ছি তোমাকে সাহস করে বল তুমি তোমার কথা। প্রাণ দিয়েও আমি সাহায্য করব তোমাকে। কাকেও তোমার আর কোন ক্ষতি করতে দেব না আমার জীবন থাকতে।

তবু সেই ফ্যাঁস-ফ্যাসানি। ডুকরে ডুকরে কান্না। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো!

— কাঁদলেই কি কারো কোন সমস্যার সমাধান হয়, না হয়েছে কোথাও? যা বলছি শোন। কেঁদো-না আর। উঠে বসে পরিষ্কার করে বল আমাকে কে তোমার প্রতি কি দুর্ব্যবহার করেছে? কেন করেছে?

শুনল ভূতনাথের কথা মেয়েটা। কান্না থামিয়ে তাই উঠল সে আস্তে আস্তে। শাড়ীটা বাগিয়ে গায়ের উপর জড়িয়ে সে বসল ভূতনাথের মুখোমুখি। দেখেই তাকে চমকে উঠল ভূতনাথ! প্রথমে সে যা ভেবেছিল তাই। এ মেয়ে অন্য কোন মেয়ে নয়! তার সতী! তার সেদিনের সেই শ্মশানঘাটে দেখা সতী! চিতার পাশে তার মায়ার ডানপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সতী! কিন্তু একি! সতী তার কাঁদছে কেন? যার পর নাই বিস্মিত হয়ে ভূতনাথ জিজ্ঞেস করে উঠল তাকে,—তুই এখানে এমন ভাবে পড়ে পড়ে কেন কাঁদছিস সতী? কি হয়েছে তোর?

অভিমান ভরা মুখটাতে বলে উঠল সতী,—সব কাণ্ডের কাণ্ডারী হয়ে আবার জিজ্ঞেস করছো আমাকে কি হয়েছে তোর? কাঁদছিস কেন এমনভাবে? দেখো দেখি পিঠটা আমার কি করেছো তুমি?

কি সর্ব্বনাশ! পিঠের শাড়ীটা সরতেই সতীর চোখে পড়ল ভূতনাথের গোটা পিঠটাতে তার কাল-শিটে দাগ। ঘাড় থেকে শুধু কোমর পর্য্যন্তই নয় আশে-পাশে হাতে পায়ে তাকে ঠুকে মারার কালো কালো দাগগুলো যে অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বুঝতে আর বাকী রইল না ভূতনাথের এসব তারই কাণ্ড। এসব সেই শ্মশানে তাকে মারার চিহ্ন।

চোখ-দুটো আঁচলায় মুছে শুক্‌নো মুখটায় হাসি টেনে আনল সতী। বলে উঠল একটু টিপ্পনীর সুরে,—কি ভূতুদা এরই মধ্যে ভুলে গেলে? বৌকে মেরে সব স্বামীই অবশ্য ভুলে যায় এমনি চট্ করে। বাপ্‌রে বাপ্ কি তোমার রাগ! যেন আগুন। ওমনি করে মড়া-কাঠ, মুড়োকাঠ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে হয় আমাকে? ভেবেছিলে বোধ হয়—মরা মানুষকে মারলে বুঝি আর লাগে না। দেখ, তোমার সেদিনের আঘাতের চিহ্নগুলো কেমনভাবে লেগেছে আমার। আমাকে উদ্দেশ্য করে যখন যা-ই করনা তুমি তখনই তার ফল ভোগ করতে হয় আমাকে।

মন-প্রাণ, সমস্ত অন্তঃকরণটা মুচড়ে উঠল ভূতনাথের। ভুলে গেল সতী মৃত, ভুলে গেল যে এটা রাত। বিস্মরণ হল তার যে ঘর ছেড়ে ছুটে এসেছে এখানে-অলৌকিক এক কান্নার স্বরকে অনুসরণ করে। এখন সবই বাস্তব তার চোখে। বাস্তব সতী। বাস্তবেই সে স্বামী হয়ে কাছে আছে তার স্ত্রীর। যে স্ত্রীকে মারের মুখ থেকে রক্ষা করবার জন্য ছিনিয়ে এনেছিল সে তার সৎমায়ের হাত থেকে সেই স্ত্রীর গায়ে আজ নিজে হাত তুলল সে। ছি-ছি। একি করেছে সে।

বসল ভূতনাথ সতীর পাশটাতে। পিঠটাতে তার হাত দিতে দিতে বলে উঠল সে,—সত্যি বলছি সতী, এভাবে তোকে মারব বলে আমি ছুঁড়িনি ওসব। তাছাড়া এসব লাগবে বলে তোর গায় আমি কল্পনাও করিনি তখন। ডাকতে ডাকতে কেমন রাগ ধরে গেল আমার। তোকে দেখতে না পেয়ে হঠাৎ মেজাজটা গেল খচে। কিন্তু শূন্যে ছুঁড়া ও মুড়ো-কাঠগুলো তোর গায়ে লাগল কি করে?

-বাঃ ভূতুদা বাঃ। অদ্ভুত কথা তো তোমার! বলে উঠল সতী,—শূন্যে ডাকলে অদৃশ্য সত্তাটাকে আমার বাস্তবের মত ডাক্ শুনতে হবে তোমার অথচ সেই সত্তাটাকেউদ্দেশ্য করে তুমি যখন মারবে লাঠির বাড়ি তখন সেটা আমার বাস্তবের মত গায়ে লাগবে না? তাই কখনও হয়?

চোখ দিয়ে জল এল ভূতনাথের। কান্না-চাপা গলায় বলে উঠল সে,—আমি অন্যায় করেছি সতী। সত্যি মহাপাপ করেছি আমি তোকে মেরে।

হাসল সতী। বলল সে,—বৌকে মারলে যে পাপ হয় বুঝেছো তাহলে। এবার থেকে তবে জেনে রাখো ভূতুদা, মৃত হলেও আমার উদ্দেশ্যে যা করবে তুমি তাই এসে লাগবে আমাকে জীবন্ত মানুষের মত।

কিন্তু ভূতুদা শুনবে কি-হঠাৎ যে কি রকম উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। উন্মত্তের মত গর্জে উঠে ঠুকতে লাগল সে তার হাতদুটো পাশের সেই গাদা পাথরটার উপর,—যে-হাত তোকে মারতে উদ্যত হয় সে-হাত আমি রাখবো না, রাখবো না, রাখবো না।

চট্ করে হাত-দুটো তার ঝপটে না ধরলে সতী বোধ হয় মুহূর্ত্ত মধ্যে রক্তারক্তি করে ফেলতো ভূতুদা। ধমকে উঠল সতী তাকে,—একি ভূতুদা? পাগল হলে না কি; হাত-দুটোর কি দোষ?

ক্রোধোন্মত্ত তখন ভূতনাথ,—না সতী, বাধা দিস না তুই আমাকে। এই হাতেই উঠিয়েছি আমি মড়াকাঠ, তুলেছি খেঁচন-দাড়ি, মেরেছি আমি তোকে। চাই-না আমি আমার এ হাত।

—এ হাত তোমার নয় ভূতুদা। বুকে জড়িয়ে হাত দুটো ভূতুদার বলে উঠল সতী,—এ হাত আমার। বিয়ের সময় পূতঃ পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে এ হাত বেঁধে দেওয়া হয়েছিল আমার সাথে। এ হাতের আমি অধিকারী। তুমি নও। আমার এ হাতকে আমি কিছুতেই আঘাত করতে দেব না তোমাকে।

ভূতনাথ এবার কেঁদে উঠল। জ্ঞান অবধি এই শক্ত মানুষটা এই প্রথম বুঝি ফেলল তার চোখের জল। সতী টেনে নিল ভূতুদার মাথাটা নিজের কোলে। তার সেই আকাশে রঙের শাড়ীর আঁচলে মুছোতে মুছোতে চোখ-দুটো তার বলতে লাগল সতী,—ছিঃ ভূতুদা, অবোধ হয়ো না তুমি। অঙ্গ- প্রত্যঙ্গগুলোর কি দোষ? সেগুলোর তো মানুষের কাজ করবার যন্ত্রমাত্র। যন্ত্রী সেগুলোকে ব্যবহার করবে যেভাবে সেগুলো তো ব্যবহৃত হবে তেমনি ভাবেই। যন্ত্রী হোলো তো মানুষের মন ভূতুদা। আসলে মনটাকে ঠিক রাখলেই—

—নিকুচি করেছে আমার মনের। তেমনি রাগতঃ স্বরেই বলে উঠল ভূতনাথ,—যে মন এত নীচ, হীন, জঘন্য হয় সে মন চাই না আমি। হব না আমি এই মনের অধিকারী। মনকে আমার—

—এতে তোমার কোন দোষ নেই ভূতুদা, শান্ত স্বরে বলে উঠল সতী,—এ দোষ আমার। এ তোমার হাতে পাওয়া আমার অন্যায়ের শাস্তি।

যেন চমকে উঠল ভূতনাথ।—সে কি কথা। এতে আবার তোর দোষটা কোথায়? তোর আবার অন্যায় কিসের?

—মনে পড়ে ভূতুদা সেদিনের কথা? গম্ভীরস্বরে বলে উঠল সতী,—যেদিন মায়ার গালে চড় মেরে আমাকে এসে বলেছিলে তুমি সেদিন কি বলেছিলাম আমি? বলেছিলাম না—ঠিক করেছো তুমি। ওই মারটাই ওর প্রয়োজন ছিল জীবনে। সেদিন ঠিক বলিনি আমি। কোন অবস্থাতেই হঠ্ করে কারো গায়ে হাত উঠানো

উচিত নয় ভূতুদা। বিশেষ করে পুরুষ মানুষ হয়ে মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেওয়া মস্ত বড় অন্যায়। সেই অপরাধটাকে তো তোমার সমর্থন করেছিলাম আমি। সেটারই শাস্তি সেদিন শ্মশানে আমি পেয়েছিলাম তোমার হাতে। এতে আমার মঙ্গলই হয়েছে ভূতুদা। কেটে গেছে পাপ। ভগবান আমাকে তোমার হাতে অন্যায় সমর্থন করার দণ্ড দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন ভোগটা। এ শাস্তি আমার পাওনা ছিল ভূতুদা। এতে তোমার দোষ হয়নি কোনো।

—কিন্তু আমি, আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল ভূতনাথ,—আমি যে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না সতী। পারছি না আমার এই অন্যায়টাকে কোন মতেই সহ্য করতে। অনুশোচনায় পুড়ে মরছি আমি। অনুতাপের আগুন যে দগ্ধ করছে আমার মনটাকে অহরহ।

—ঠিক আছে ভূতুদা, হাসিমুখে বলে উঠল সতী,—আমাকে মারার জন্য এতই যদি মনে কষ্ট পাচ্ছো তুমি তবে যে হাতে মেরেছিলে সে হাত দিয়ে দাও না আমার পিঠটাতে হাত বুলিয়ে। সব অপরাধ খণ্ডন হয়ে যাবে তোমার। শান্তি পাবে মনে।

বসল ভূতনাথ উঠে। সত্যিই সে হাত বুলোতে অরম্ভ করল সতীর পিঠটাতে। কে বলে সতী মৃত? কে বলে সে চিরকালের মত চলে গেছে এই পৃথিবী ছেড়ে। বলে যারা তারা মিথ্যাবাদী। ভুল তাদের কথা। আর পাঁচটা মানুষের মতই জীবন্ত সতী। জীবন্ত সে রক্ত-মাংসের দেহটা নিয়ে এ ধরার বুকে। সবার সঙ্গে সব সম্পর্ক নিয়েই প্রাণ-চঞ্চল বাস্তব সত্য সে প্রকৃতির কোলে। সতী যেমন ছিল তার তেমনিই আছে। আছে সে তার তেমনিই মন-প্রাণ-দেহ নিয়ে তার স্ত্রী হয়ে। পাশে বাবা ভূতনাথের মন্দির, আকাশে সপ্তমীর চাঁদ, সামনের সেই গাদা পাথর, নীচে ধরিত্রী মার কোল বলছে যেন তাকে, সতী তার—সে সতীর। সতী তার—সে সতীর—

সত্যিই, কি যাদু আছে যে সতীর মধ্যে—দেখলেই তাকে মন থেকে ভূতনাথের সমস্ত সন্দেহ অবিশ্বাস, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মুহূর্তে যেন কোথায় মিলিয়ে যায়। উঠে যায় তার মন থেকে মৃত্যু সম্বন্ধে তার নানাজনের মুখ থকে শোনা নানা কথা। ঘাড় ঘুরিয়ে হাসিমুখে বলে উঠল সতী,—কি ভূতুদা, এখনও শান্ত হল না তোমার মনটা? এভাবে বৌ-এর সেবা করলে লোকে বলবে কি? হাসবে যে তোমাকে? মুছে গেছে তো দাগগুলো, আর কেন?

আশ্চর্য্য! সতীর কথাই ঠিক! অবাক হয়ে দেখল ভূতনাথ সেই রক্তজমা কাল-শিটে পড়া দাগগুলো একটাও আর নেই সতীর গায়ে পিঠে কোথাও। স্নিগ্ধ হাসির কিরণ মাখিয়ে বলে উঠল সতী ভূতনাথকে,—তুমি যা ভাবছো তা কিন্তু নয় ভূতুদা। এর জন্য কাঁদছিলাম না আমি। আর এ কান্নাটাও নয় আমার নিজের। এটা তোমার দ্বিতীয় পক্ষের অর্থাৎ আমার সতীনের—মানে তোমার মায়ার কান্না গো।

ভূতনাথ অবাক! সে আবার কি! তার বিস্ময়ভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল সতী,—এর মধ্যেই ভুলে গেলে? একটু আগেই ধমকে মায়াকে দূর করে দিলে তোমার কাছ থেকে। বিছানায় গিয়ে সে উবুড় হয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল ফ্যাঁসেক ফ্যাঁসেক করে মনে নেই তোমার?

—তুই কি করে জানলি?

—জানলাম বলেই তো কান্নাটাকে তার টেনে নিতে হল আমাকে। উত্তরে ভূতনাথের বলে উঠল সতী,—না টেনে নিলে কান্নাটা তার ঘুমোতে দিত না তোমাকে। ঘুমোত না সেও। মায়া তাহলে রাগটাকে তোমার খুঁচিয়ে দিত আরো বাড়িয়ে। শ্মশানে গিয়ে আবার তাহলে তুমি শুরু করে দিতে তাণ্ডব নৃত্য। সেদিনের মত ওমনি আবার রাত্রেবেলায় বইতো কেলেঙ্কারীর ঝড়। সেই ভেবেই তো তরঙ্গে আমার মনটাকে তার শান্ত করে পাড়াতে হল তাকে ঘুম। ঘুমোবে এখন মায়া।

কি রহস্যে যে ভরা সতী খুঁজে পেল না ভূতনাথ। চোখ-দুটো তাই বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে স্থির-নিবদ্ধ হয়ে রইল তার মুখটার উপর। সোহাগে গলায় বলে উঠল সতী,—শোন ভূতুদা, ছোট-বোনটাকে আমার মনে কিন্তু আর কষ্ট দিতে পাবে না তুমি, পাগল বলাটা ওর মনের কথা নয়। মাথা খারাপ হলে তোমার, দাঁড়াবে সে কোথায়? একটু শান্ত থাকার চেষ্টা কর তুমি। লোকে তোমায় পাগল বললে ব্যথা পায় মায়া, কষ্ট হয় আমার মনে, দুঃখ পান অন্তরে তোমার মা-বাবা-এটা একটু বুঝবার চেষ্টা কর ভূতুদা। ভেবে চিন্তে একটু শান্ত হয়ে চল তুমি জীবনে।

ভূতনাথ ধীর-স্থির নীরব নির্বাক। বলে চলল সতী,—আর একটা কথা ভূতুদা—মায়ার গহনাগুলো কিন্তু তোমার নয়—আমার। আমিই দিয়েছি ওগুলো আমার ছোট বোনটাকে পরতে। মিথ্যে বলে ও গহনাগুলো সে বাঁচিয়েছে তোমার নষ্টামীর হাত থেকে। নইলে কি কষ্ট যে পেতাম আমি আজ মনে-তা আর বলবার নয়। এ নিয়ে কিন্তু আর একটা কথাও তুমি বলতে যেও না মায়াকে। ওতে তোমার কোন অধিকার নেই। মায়ের আমার গহনাগুলো পরে ছোট-বোনটা যখন ঘুরে বেড়ায় তখন উপর থেকে তাকে দেখে আমার কি যে আনন্দ হয় ভূতুদা, বলবো কি তোমাকে। আমার এ আনন্দ তুমি নষ্ট করে দিও না ভূতুদা। সতী-সাবিত্রী হয়ে আমার ওই গহনাগুলো আজীবন সে পরুক।

কথাটাতে কেমন যেন কেঁপে উঠল ভূতনাথের অন্তরটা। সত্যি তো একথাটা বুঝা উচিত ছিল তার। যে কাজ সে করতে যাচ্ছিল আজ তা-তো সতীর মনে দুঃখ দেওয়া ছাড়া আর কিছু ছিল না। ভুলটা বুঝে ভূতনাথ বলে উঠল তাকে—সত্যি সতী, বাঁচিয়েছে মায়া আজ আমাকে। কথা দিচ্ছি আমি তোকে, এ ভুল আমার আর হবে না কখনও। এ নিয়ে মায়াকে আমি বলব না আর কোনদিন কোন কথা। নিশ্চিন্ত থাক তুই।

শুনে, ভূতুদার দিকে তাকিয়ে, মুচকি হেসে বলে উঠল সতী,—সত্যি তুমি আমকে নিশ্চিন্ত করতে চাও ভূতুদা।

—সত্যিই তোকে আমি নিশ্চিন্ত করতে চাই সতী। ব্যগ্রভাবে বলে উঠল ভূতনাথ,—শান্তিতে থাক তুই, আনন্দে থাক তুই, এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় তৃপ্তি।

—তাহলে তো ভূতুদা এবার থেকে তোমার ছেলেমানুষীটা একদম বন্ধ করে দিতে হবে।

—ছেলে-মানুষী মানে? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

—হঠ্‌হাঠ্‌ রেগে যাওয়া একটুতেই উত্তেজিত হওয়া, হঠাৎ কোন কিছুর জন্যে ঝোঁকধরা—এগুলো তোমার ছেলেমানুষী নয়?

চুপ দিল ভূতনাথ। একটু থেমে আবার বলে উঠল সতী,—তুমি বুঝতে পারছো না ভূতুদা এতে তোমার আত্মার কি ক্ষতি হচ্ছে। কাম-ক্রোধ-লোভের বশে মনটাকে চলতে দেওয়া তো মানুষের কাজ নয়। নয় ঈর্ষা-হিংসা দ্বেষ আদি-ষড়রিপুর অধীন রাখা নিজের সত্তাটাকে। এদের দাস হয়ে থাকা মনুষ্য জীবনের সার্থকতা নয় ভূতুদা। এদের অধীন রেখে পুরুষত্ব বলে এদের প্রভু হয়েই চলতে হবে জীবনে তোমাকে। পারবে না ভূতুদা, মনটাকে তোমার আত্মবশে রেখে পরিচালিত করতে?

গম্ভীরভাবে বলে উঠল ভূতনাথ,—সত্যি সতী, ওটাই আমার সবচেয়ে বড় দোষ। কেন যে হট করে এমন রেগে যাই আমি, চট্‌ করে কেন যাই চটে বুঝতে পারি না নিজে। সেদিন দেখলি না, মায়াকে নিয়ে গেলাম শ্মশান, তোর চিতার পাশে। ডাকা মাত্র এলি না বলে মেজাজটা কেমন গেল আমার চড়ে। খচে উঠলাম আমি তোর উপর।

হেসে উঠল সতী,—বাপরে বাপ্‌। সেদিন এমনভাবে আহ্বান করছিলে না তুমি আমাকে যেন আমি তোমার কত শ্মশান জাগানো ভূত বা চিতা চিঁয়ানো পিশাচ। শব-সাধনায় পাওয়া আমি কি তোমার কোন তাল বেতাল না প্রেতাত্মা যে মন্ত্রশক্তিতে বেঁধে রেখেছো তুমি আমাকে? ডাকামাত্রই শরীর ধারণ করে আসতে হবে তোমার সামনে?

কি বুঝতে যে কি বুঝল ভূতনাথ কে জানে। বলে উঠল সে গম্ভীরভাবেই,—এতক্ষণে বুঝলাম, কেন তুই সেদিন ডাকামাত্র এলি না আমার কাছে। তোকে পেতে হলে তাহলে আমাকে সাধনা করতে হবে বল? ঠিক আছে, করব আমি সাধনা। অমাবস্যার রাতে গিয়ে জাগাবো আমি শ্মশান, চিঁয়াবো আমি চিতা। কিংবা কোন মড়া জোগাড় করে বোসবো আমি তার বুকে—করব শব-সাধনা।

—ছিঃ ভূতুদা, সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে তাকে বলে উঠল সতী,—ও সব কাজ আবার তুমি করবে কি? ওসব হল নীচুস্তরের সাধনা। যারা হট্‌-বিভূতি বা যোগ-সিদ্ধাই লাভ করে জগতের বুকে বাহাদুরী দেখাতে চায়। চায় যারা পার্থিব ভোগ-লালসায় মত্ত হয়ে জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে, তুচ্ছ মান-যশ ও প্রতিষ্ঠার প্রঙ্কিলে হাবু-ডুবু খেতে তারা করে এসব সাধনা। এসব সাধনায় সামান্য অলৌকিক শক্তি লাভ করে মানুষের

শুধু চোঁখ ধাঁধানো যায়। আত্মার কোন উন্নতি লাভ হয় না ভূতুদা। উল্টো বরং ক্ষতি হয় শুদ্ধ-সত্ত্বার। ভগবানের দেওয়া সাধন-শক্তিকে এভাবে নষ্ট করা উচিত নয় মানুষের।

—ওসব উচিত-অনুচিত আমি কিছু বুঝি না সতী। বলে উঠল ভূতনাথ,—ডাকলেই তোকে যাতে পাই তার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত আমি।

—আমি কি কোন নীচুস্তরের আত্মা ভূতুদা। না সত্তা আমার পার্থিব কোন ভোগ-কামনায়, লালসায় বা মায়া-মোহে আকৃষ্ট যে ভারী হয়ে সত্তা আমার ভেসে বেড়াচ্ছে নীচুস্তরে-ভুবলোকে? তুমি আমাকে ওসব তুচ্ছ সাধনায় বশ করে প্রেত-পিশাচের মত কখনও বেঁধে রাখতে পারবে না ভূতুদা। তাছাড়া ওসব হীন-তপস্যা, জঘন্য সাধনা করতেই আমি দেব না তোমাকে। দেবই না আমি তোমাকে ওসব নিম্নস্তরে নেমে আত্মার তোমার উর্ধ্বগতি রোধ করতে দিতে।

—ওসব শ্মশান সাধক, ভূত-প্রেত সাধক, কাপালিকদের তুই নীচুস্তরের সাধক বলিস সতী? জানিস চণ্ডীতলার শ্মশান-বাবা কত বড় সাধু? দো-মোহানীর ঘাটের ভোলানাথ দেওয়াশী কত বড় সাধক জানিস তুই? চণ্ড নামাতে পারে তারা। দনা-মনা নামে তার সাধন-করা ভূতদুটোকে নিয়ে অসম্ভব সম্ভব করতে পারে। কত মানে তাকে লোকে, সম্মান পায় কত। কতদিকে কত তার নাম-যশ, ডাক-হাঁক।

গম্ভীরভাবে বলে উঠল সতী, ভুলেও ওসব তুক-তাক শক্তির দিকে আকৃষ্ট হয়োনা তুমি। দিও না কভু মনটাকে তোমার ওসব হীন-সাধনার মোহের ফাঁদে পড়তে দিতে। আসলে কি জানো ভূতুদা—'

বলেই সতী শুরু করল ভূতনাথকে বুঝাতে—ওসব সাধন করা ভূত-প্রেত, শ্মশান-জাগানো প্রেতাত্মা বা চিতা-চিঁয়ানো পেত্নী-পিশাচ হল নীচুস্তরের আত্মা। পৃথিবীতে যারা অসৎ প্রবৃত্তি নিয়ে থাকে, থাকে যারা হীন-কর্ম, নীচ মনোভাব নিয়ে, মৃত্যুর পর আত্মার তাদের উর্ধ্বগতি হয় না। নব। হয় না সেই সব আত্মারও উর্ধ্বগতি যারা পার্থিব কামনা-বাসনায় থাকে মত্ত হয়ে। স্বার্থপরতা, ভোগলালসার ভারে ভারী হয়ে তাদের আত্মা অতিবাহিক দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীর বুকে। ভূস্তর ছেড়ে উপরে তারা উঠতে পারে না কখনও। পরে না কারো কাম-পঙ্কিল, লোভলিপ্ত অন্যায় অধর্মচারীর অপবিত্র আত্মা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে উর্ধ্বস্তরে যেতে। এই সব নিম্নস্তরের আত্মারাই নাকি ভূত্নী পেত্নী পিশাচ, দত্যি-দানো হয়ে বেড়ায় ঘুরে। ঘুরে বেড়ায় তারা জীবিত-কালীন ভোগাকাঙ্ক্ষা পুরণ করার জন্য। সূক্ষ্মদেহে এসব কামনা-বাসনাগুলো অত্যন্ত-তীব্র হয়ে উঠে। দেহের বাধা থাকে না বলে মনটাকে এসব লালসা সাংঘাতিকভাবে উত্যক্ত করে। বলে উঠল সতী,—দেহ নেই অথচ দেহের কামনা-বাসনা প্রবল। এর যে কি মারাত্মক জ্বালা তা কি করে তুমি বুঝবে ভূতুদা। তুমি তো আর দেহহীন নও। কামনার উন্মত্ততায় কখনও কখনও বেগে এরা পৃথিবীর বস্তুকণা, জড়-অনু আহরণ করে পার্থিব দেহ ধারণ করার চেষ্টা করে। কখনও বা তাদের আত্যন্তিক পার্থিব চেতনা অতিবাহিক দেহটাকে ক্রমশঃ ভারীকরে পঞ্চ-ভৌতিক রূপ নেওয়ায়। এ চেহারা তাদের সব সময় ঠিক মানুষের মত হয় না। কখনও চিন্তার প্রাবল্যে ফুটে উঠে তার মধ্যে ঈর্ষা-হিংসা, কখনও ঘৃণা-বিদ্বেষ কখনও বা কামনার করাল মূর্ত্তি। কুৎসিৎ, কদাকার বীভৎস রূপ নিয়ে ভেসে উঠে তারা। এটাই তাদের ভৌতিক দেহ। এদেহ এলোমেলো বস্তুকণার ঘণীভূত রূপ বলে এলোমেলো বাতাসে তা মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলিয়ে যায়। বেশীক্ষণ এ বায়বীয় দেহটাকে ধরে রাখার শক্তি তাদের থাকে না। থাকে না বলেই দেহের ক্ষুধা, ভোগপিপাসা পূর্ণ হয় না তাদের। তাই অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা। আর ঘুরে বেড়ায় সেই সমস্ত জায়গায় যেখানে তাদের পার্থিব দেহটা লীন হয়েছিল। অর্থাৎ শ্মশান, চিতা, মড়া-ফেলা, মড়া-পুঁতা ইত্যাদি স্থানে। ভাবে তারা এসব জায়গায় আবার হয়তো তারা তাদের সেই পার্থির্ব-ভোগযন্ত্র কামনার দেহটাকে ফিরে পাবে। ফিরে পেলে আবার এই ভোগ দেহটাকে নিয়ে তারা তাদের অতৃপ্ত পার্থিব ভোগ-তৃষ্ণা ও দেহের ক্ষুধা মেটাতে সমর্থ হবে। সেই মোহে তারা এসব মায়ার স্থানগুলো ছাড়তে পারে না। তাদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নেয় ওই সমস্ত শ্মশান সাধক, তুক-তাক মন্ত্র-তন্ত্রের তপস্বীরা। শব-সাধনা, চিতা-চিঁয়ানো ইত্যাদি বিদ্যায় বশ করে তাদের। ইচ্ছা মত এসব আত্মাকে তারা ব্যবহার করে, ঘুরায়, কষ্ট দেয়।

ভূতনাথ তন্ময় হয়ে শুনছিল সতীর কথাগুলো। বলতে বলতে হঠাৎ সতী হাতটা ধরে তার বলে উঠল

অনুরোধের স্বরে,—তোমার জন্য এসব সাধনা নয় ভূতুদা। এ সাধনায় সাধকের যেমন মুক্তি হয় না তেমনি যে সব নীচুস্তরের আত্মাকে নিয়ে সাধনা করে তারা তাদেরও সদ্‌গতি হয় না। কারণ উভয়ের মধ্যে থাকে না কোন মুক্তির চিন্তা বা উর্ধ্বলোকে যাবার আকাঙ্ক্ষা। থাকলেও পরস্পর পরস্পরকে টেনে নামায় এই ভূস্তরে। দেহহীন সত্তাগুলো সব জড়-ক্ষুধায় অস্থির হয়ে মাধ্যম একটা খুঁজে বটে, থাকে বটে অবশ্য তারা পার্থিব ভোগকাঙ্ক্ষা পুরণের আশায় একটা পার্থিব দেহকে আশ্রয় করে। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা অপূরণের জ্বালায় যখনই অস্থির হয়ে উঠে তারা, নতুবা যখনই পায় সেই সাধকের কোন দুর্বলতা তখনই হয় শেষ করে তাকে সঙ্গী করে তাদের, কিংবা উল্টো তাকে বশ করে ইচ্ছামত ঘোরায় তারা নিজেদের খেয়াল খুশির বাহন করে।

ভূতুদার কৌতূহলী দৃষ্টিটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল সতী,—

—সাধক যদি হতে চাও ভূতুদা—তবে প্রকৃত সাধনায় ব্রতী হও। ষড়রিপুর হাত থেকে মুক্ত কর নিজের সত্তাকে। আশপাশের বন্ধন থেকে উদ্ধার কর নিজের আত্মাকে। তুমি এই জগতের সামান্য একটা রক্ত-মাংসের পিণ্ড নও ভূতুদা। নও তুমি কামনা-বাসনার হাতের তুচ্ছ একটা দেহ-পুত্তলি। তুমি হলে জন্মমৃত্যুহীন, অবিকৃত, সর্বব্যাপক, সর্বানুস্যুত পরমসত্তা। পরম চৈতন্য সেই জ্যোতিষ্মান স্বরূপ তোমার। তুমি সেই আত্মাস্বরূপের সাধনা কর। প্রকৃত সাধক নিজেকে যেমন জাগতিক কোন মোহে বদ্ধ রাখে না; অপরকেও তেমনি জগতের এই মায়া প্রপঞ্চে আবদ্ধ থাকতে দেয় না। ভূত-প্রেত, দত্যি-দানো শুধু নয়, দেহ-ধারী কোন আত্মাকেই সে বশীভূত করে রাখে না, রাখে না সে কাকেও কোনদিন তার আত্মস্বার্থ পূরণের যন্ত্র করে। সকলকে সে তার আত্মোপলব্ধি সাধনায় নিয়ে যায় মৃত্যুর থেকে অমৃতের পথে, তমসার থেকে জ্যোর্তির পথে, অজ্ঞানতার থেকে জ্ঞানের পথে। নিজে সর্ব-বন্ধন মুক্ত হয়ে অপরকে বন্ধনমুক্ত করাই হল প্রকৃত সাধকের প্রকৃতি, আসল সাধনার কাজ। জগতে জন্ম গ্রহণ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সার্থকতা।

—ওসব সাধনা-ফাধনা আমার দ্বারা হবে না সতী। হাত নেড়ে হঠাৎ বলে উঠল ভূতনাথ,—আর ওসব ভজনা-তপস্যার কথাও আমার ঢুকবে না মাথায় কোনদিন। এখন কোন্ বিদ্যায় ডাকলেই তোকে পাব আমি সেই সাধনার কথা বল। এর জন্য যদি কোন চিতা-গুরু বা শ্মশান-সাধকের চেলা হতে হয় তাও কিন্তু হব আমি।

—আমার জন্য ওসব চেলা-চামুণ্ডা হওয়ার বা সাধন-ভজন করার তোমার কোন দরকার নেই ভূতুদা। ভালবাসার সাধনায় বাঁধা তো আছিই আমরা জন্ম-জন্মান্তর। আদিতে কোন এক অদৃশ্য-শক্তির ইচ্ছায় একই সত্তা আমাদের ভিন্ন চিজ্জড়-গ্রন্থীতে আবদ্ধ হয়ে নেমেছি স্বামী-স্ত্রী রূপে পৃথিবীর বুকে লীলা বিলাসে। এ লীলা-খেলা এবার আমাদের সাঙ্গ করতে হবে ভূতুদা। চিজ্জড়-গ্রন্থী ভেদ করে এবার আমাদের যেতে হবে শাশ্বত-সত্তায়। তার জন্য শাশ্বতী তোমার সাধনা করবে তার তপলোকে। আর ভূতনাথ তার নিষ্কাম-কর্মে ব্রতী-হয়ে কাটাবে তার পার্থিব জীবনটুকু-সংযমে, পবিত্র হৃদয়ে, শুদ্ধ অন্তঃকরণে।

—তার মানে ডাকলে তুই আর আসবি না আমার কাছে-এই তো? ভূতনাথের মুখে অভিমানের সুর।

—আবার সেই অভিমান। বলে উঠল সতী,—রাগটা দেখছি আমার উপর তোমার এখনও কমেনি ভূতুদা। চলো যাই বাবা ভূতনাথের মন্দিরে। উঠে গিয়ে বসি দাওয়ার উপর, বাবার কাছে।

বলা শুধু নয়, হাতটা ধরে ভূতনাথের টেনে তুলল সতী। টেনেই তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে উঠল মন্দিরে। বসল দুজনে দাওয়ার উপর পা ঝুলিয়ে। কাছাকাছি, পাশাপাশি, ঘেষাঘেষি। কে বলবে সতী অশরীরী-বিদেহী? রক্তমাংসের দেহধারী সে জীবন্ত মানবী হাস্যময়ী প্রাণ-চঞ্চলা স্ত্রী তার। বসে আছে স্বামীর পাশে সে ধর্ম্মপত্নীর অধিকার নিয়ে। আকাশের চাঁদটা অষ্টকলা পূর্ণ করে আলো ফেলছে তাদের উভয়ের মুখের উপর। জ্যোৎস্নায় তার সৃষ্টি করেছে প্রকৃতির বুকে যেন এক নন্দন কানন। সুন্দর পরিবেশ। মধুময় এ যেন কোন এক স্বপ্ন-রাজ্য। এ রাজ্যের রাজা ভূতনাথ, রানী সতী। মন্দির দাওয়ায় নয়, নিভৃত নিরালায় সিংহাসনে বসে আছে শ্যামরাজা রাধারানী। হাসি মুখে রানী বলে উঠল রাজাকে,—চমৎকার এই পৃথিবী, নয় ভূতুদা? কি সুন্দর এই ধরিত্রী মাতার স্নেহ-ভরা কোল, কি মায়াই না ছড়ানো আছে এই মর-জগতের বুকে, আকাশে-বাতাসে মা ধরনী কত মোহেরই না জাল বিস্তার করে ধরে রেখেছেন তার এই সৃষ্টিকুলকে। সুদূরের ওই জ্যোতিষ্কপুঞ্জ ও নীহারিকা থেকে প্রাণকনা আহরণ করে কোলে তাদের কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষী, মানব-মানবী ইত্যাদি নানা আকারে রূপ

দিয়ে, ভূষিত করে বেঁধে রেখেছেন তাদের পরম স্নেহে। ভুলিয়ে রেখেছেন তাদের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ ইত্যাদি নানা খেলনা দিয়ে। কামনার লোভে, বাসনার ফাঁদে ফেলে দূরে সরিয়ে রেখেছেন তাদের স্বরূপ-চিন্তন থেকে। কাকেও কোনদিন কোলছাড়া করতে চান নি বসুধা। মায়ের মধুর স্নেহের আঁচল ছেড়ে থাকতে মন চায় না সন্তানেরও।

—তুই কিন্তু আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছিস সতী। গম্ভীর মুখে বলে উঠল ভূতনাথ,—ডাকলেই তুই কাছে আমার আসবি কি না বল?

—আসবো কি ভূতুদা, বলে উঠল সতী,—এই পৃথিবীর বড় মায়া। দেখছো না ওই চাঁদ, এই আকাশ, বাতাস কেমনভাবে আকৃষ্ট করতে চাইছে আমাকে। এই মায়ার আকর্ষণে পড়লে আর রক্ষে নেই ভূতুদা। জগতের এই জন্মচক্রের আবর্তনে ঘুরতে ঘুরতে যে কোথায় গিয়ে কোন মায়ের গর্ভে সন্তানরূপে পড়তে হবে তার কি কোন ঠিক আছে? শুরু হবে সত্তার আবার কর্ম-জীবন, জন্মমৃত্যুর খেলা। ভুলে যাবে তুমি হয়তো আমাকে। ভুলে যাব তোমায় হয়তো আমি। উভয় সত্তায় মিলিত হতে তখন হয়তো কেটে যাবে আমাদের বহু জনম। আত্মার পূর্ণ মুক্তিলাভ হবে আমাদের সুদূর পরাহত। তাই বাবার কৃপায় যে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি আমি সে বন্ধনে আর ফিরে পড়তে আমি চাইনে ভূতুদা। চাই না আমি তোমাকেও আর জীবনের ঘূর্ণিপাকে পড়ে ঘুরপাক খেতে দিতে। এই জীবনই শেষ জীবন হোক তোমার।

অবাক হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ,—মায়ার আকর্ষণ জন্ম-জীবন কর্ম্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তন—তোর তো এসব কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝতে পারছি না সতী। হেয়ালী রেখে স্পষ্ট করেই বল না তুই, কি বলতে চাস আমাকে?

—শোন ভূতুদা, বলেই বেশ ভারিক্কিসুরে বলতে আরম্ভ করল সতী,—সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার মত এই পৃথিবীর-বক্ষেও মাঝে-মধ্যে জীবনাবর্তের ঢেও উঠে। সে ঢেও-এর চুম্বকের মত আকর্ষণ-ভূতুদা। সমুদ্র যেমন জোয়ার দ্বারা যে কোন জিনিসকে স্পর্শ করে ভাটার টানে তা নিজের বুকে টেনে নিতে পারে। মা ধরিত্রীও তেমনি—জীবার্তের তরঙ্গ উঠিয়ে ভূর্ভূব-স্ব আদি উর্ধ্বলোকর তৃতীয় চতুর্থ স্তর পর্য্যন্ত যে কোন আত্মিককে আকর্ষণ করে নিজের বুকে টেনে নামাতে পারে। পারে তাদের তার কোলে জন্ম নেওয়াতে। এ আবর্তনের আওতায় পড়লে পুণ্যাত্ম-উচ্চাত্মারও কোন রক্ষে নেই ভূতুদা; নেই তাদের অনিচ্ছায়ও কোন শক্তি। বাধ্য হয় তারা জগতের বুকে জন্মগ্রহণ করতে। আর দেহ ধারণ করলেই হয় সত্তার বিস্মৃতি। বিস্মৃতির জালে জড়িয়ে পড়ে কর্ম্ম-জীবনের পাকে ঘুরপাক খেতে শুরু করে তারা জন্ম-জন্মান্তর। এ বৈষ্ণবী মায়ার চক্রে পড়তে উচ্চাত্মারা সহজে চান না ভূতুদা। চান না পিতাপুত্র, মাতা ভগিনী, স্ত্রী কন্যা হয়ে মায়া মোহে পড়ে কর্মচক্র ও জন্মচক্রের আবর্তনে আবর্তিত হতে। সেদিন মায়ার সঙ্গে শ্মশানে যখন ডাকছিলে তুমি আমাকে তখন পৃথিবীর উপরে উঠেছিল জীবাবর্তের ঝড়। ডাকামাত্র সে সময় যদি নামতাম আমি ধরার বুকে তাহলে পড়তাম আমি ওই ঝড়ের মধ্যে। জীবাবর্তের আকর্ষণ স্থূল স্তরে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় যে কার কোলে স্থূল দেহ ধারণ করাত কে জানে।

—কিন্তু তুই তো সেদিন এসেছিলি?

—এসেছিলাম। পরে। পূণর্জন্মের ঢেওটা যখন ঠাণ্ডা হল তখন। কিন্তু এসে দেখলাম ক্রোধে তখন তোমাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে নিয়েছে। নিয়েছে তোমার চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে গ্রাস করে। এমন আবরণে ঢেকেছে তোমার সত্ত্রা যে না দিচ্ছে তোমায় আমাকে দেখতে, না দিচ্ছে তোমাকে আমার কথা শুনতে। ক্রুধোন্মত্ত তুমি। তাই অস্থির মতি, চঞ্চল। সূক্ষ্ম চিন্তার এতটুকুও তখন শক্তি নেই তোমার। তাই সূক্ষ্মদেহী আমাকে তখন দেখতে পাওনি তুমি। স্থূল মনটার বশে চলে অন্ধের মত তখন তুমি মেরে চলেছ আমাকে চিতা-কাঠ, শ্মশান-মুড়ো, ছাই, অঙ্গার, পোড়া-হাড়, বালি ইত্যাদি।

—ওসব কথা আর তুলিস না সতী। মনে পড়লে মনটা আমার বড় হু-হু করে উঠে রে। এ অজ্ঞানতার ক্ষমা নেই আমার। এ দুঃখ আমার রয়ে গেল চিরকাল। কিন্তু সত্যি আমি বলছি তোকে, ডাকলে যদি না পাই তোর দেখা তাহলে কিন্তু মারা যাব আমি।

—ছিঃ ভূতুদা। এসব কথা তোমার মুখে শোভা পায় না।' বলে উঠল সতী,—কাপুরুষ নও তুমি। বীরের মত জীবনের কাজ শেষ করে মরার মত মরবে তুমি। তুচ্ছ এ কারণটার জন্য মরতে কেন হবে তোমায়? আমি তো তোমার হাতের বাঁধা ঘুড়ি। যত উপরেই উঠি না কেন লাটাই তো আছে তোমার হাতে। তাই বলি যখন তখন টেনো না ভূতুদা আমায়। ছিঁড়ে যাব আমি। উড়ে পড়ব কোথায় গিয়ে তখন খুঁজে পাবে না তুমি আমাকে।

—বুঝছি সতী সবই। কিন্তু—

কেড়ে নিয়ে ভূতনাথের কথাটা বলে উঠল সতী,—নাইবা তুমি দেখলে ভূতুদা আমাকে এ স্থূল দেহে। চিন্তার মধ্যেই রয়েছি তো আমি তোমার। রয়েছি তো আমি তোমার সূক্ষ্মসত্তায় একাত্মা হয়ে। কাজ কি তোমার মন থেকে আমাকে বের করে এনে বাইরের এই স্থূল রূপে দেখার।

—আমার প্রয়োজন না থাকলেও মায়ার চোখে তোকে দেখবার একবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। সেদিনে আমি পেলাম তোর দেখা অথচ মায়া পেল না কেন?

হাসল সতী। বলে উঠল বিদ্রূপাত্মকভঙ্গীতে,—ভূত দেখা কি এত সহজ ভূতুদা? তাদের দেখতে হলে তোমার মত সহজ মন চাই, সরল হৃদয় চাই। চাই স্বচ্ছ, নির্মল, পবিত্র দৃষ্টি। তোমার সঙ্গে আমার আত্মার সম্বন্ধ ভূতুদা। হৃদয়ের যোগ। তাই আমার সঙ্গে যুক্ত করলে মনটাকে তোমার—দেখতে পাও তুমি। কিন্তু মায়া! মায়ার যে এখন সেরকম মানসিক শক্তি হয় নি ভূতুদা। সূক্ষ্ম-শক্তি-বিহীন ভোগ- ঘোলাটে চোখে দেখলে আমাকে ভূত মনে হবে তার। পেত্নী পিশাচিনী ভেবে আমাকে ভয়ার্ত হবে সে। তার দুর্ব্বল মনটা হঠাৎ এভাবে আতঙ্কগ্রস্থ হলে ক্ষতি হতে পারে তার। বিপদ ঘটাতে পারে সে।

—তাহলে কি মায়া কোনদিন দেখতে পাবে না তোকে?

—নিশ্চয়ই পাবে। বেশ একটু ভ্রূকুটি কুটিল ভঙ্গীতে বলে উঠল সতী,—ভূতনাথের স্ত্রী হয়ে ভূত দেখবে না মায়া তাই কি কখনও হয়? তবে এ ব্যাপারে তোমাকে একটু ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে ভূতুদা। উতলা না হয়ে অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে তার সে শক্তির স্ফূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত।

—সে শক্তি কি তার হবে সতী।

—হবে তোমার সাহচর্য্যে। তোমার মত স্বামী পেয়েছে যখন সে তখন তোমার সংস্পর্শে সেও হবে পবিত্র-মনা, শুদ্ধ-হৃদয়। তুমি শুধু তোমার আধারটাকে সত্য-সুন্দর নির্মল রাখার চেষ্টা কর ভূতুদা। ক্রোধের কালিমা যেন না লাগে তোমার অন্তরে। ঈর্ষা-হিংসা যেন না পারে লাগাতে তোমার মনে কাদা। জানই তো তুমি, পতির পুন্যে সতীর পুণ্য।

—না সতী, বলে উঠল ভূতনাথ,—আমি জানি সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। সেই পুণ্যের একটুও যদি দান করি আমি মায়কে তবুও কি সে এখন পাবে না তোর দেখা?

মুচকি হেসে বলে উঠল সতী,—দেখছি আমার ছোট বোনটার প্রতি তোমার বড় মায়া পড়ে গেছে ভূতুদা। হয়েছে বড় দরদ। নূতন বৌ বলে না কি?

— সে জন্য নয় সতী। মায়াকে তোকে আমি দেখাতে না পারলে তার কাছে বড় খেলো হয়ে যাব আমি। হেরে যাব আমি তার কাছে।

—কোনো দিন তুমি তার কাছে খেলো হবে না ভূতুদা। হারাবেও না কোনদিন। সে আমার বোন। সে কখনও কি ছোট করে ভাবতে পারে তোমাকে। তোমার প্রতি তার ঐকান্তিক কামনাই স্ত্রীরূপে তাকে তোমার সঙ্গে যুক্ত করেছে। তোমার প্রতি তার ঐকান্তিক প্রেমেই স্বার্থত্যাগ, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, সহনশীলতা ইত্যাদি উচ্চভাবের মাধ্যমে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে তাকে। আমি পেয়েছিলাম ভগবৎ-সাধনার মাধ্যমে তোমাকে। সে পাবে তোমার সাধনার মাধ্যমে ভগবানকে। প্রিয়জনের জন্য আত্মত্যাগ, আত্মবিলোপ নারীকে মহাশক্তির আশ্রয়ে নিয়ে যায় ভূতুদা। তোমার জন্য তার ত্যাগ সংযম তিতিক্ষায় খুলে যাবে তার অনুভূতির দ্বার। আস্তে আস্তে হবে তার মানসিক ও আত্মিক শক্তির বিকাশ। মন বিকারহীন, অন্তর শুদ্ধ, চিত্ত নির্মল হলেই উচ্চ আত্মিকদের দেখার মত উপযোগী হবে সে। তোমাকে তখন আর দেখাতে হবে না তাকে সেই তখন দেখতে পাবে আমাকে তার মুকুলিত চেতনে।

উদাসীনতায় ভরা ভাসা ভাসা চোখে জিজ্ঞেস করে উঠল, ভূতনাথ,—কত দিনে তা হবে সতী।

—যত দিনে সে তার ইন্দ্রিয় বশ চঞ্চল মনটাকে তোমার প্রতি শান্ত নিষ্কলুষ প্রেমে আনতে সমর্থ হবে। স্বামীকে ভগবান ভেবে তার পায়ে নিজেকে সম্যকভাবে সমর্পণ করাই নারীর উৎকৃষ্ট সাধনা ভূতুদা। এ সাধনায় যে যেমন স্তরে উঠতে পারে ইচ্ছা করলে সে সেই স্তরের আত্মিকদের দর্শন লাভ করতে পারে। পারে সে সর্ব্বোচ্চ আত্মিক সীতা-সাবিত্রীদেরও সাক্ষাৎ লাভ করতে। নারীর দেবীত্ব বিকাশ করা পুরুষেরও ধর্ম ভূতুদা। নারীর দেবীত্বে বিশ্বাস করা তাদেরও বিকশিত হওয়ার মূলমন্ত্র। পুরুষ তার জ্ঞান-যুক্তি-বিচারের পথে চললেও নারী প্রেম-ভক্তি ভালবাসার পথে মিশে সে পূর্ণ হয়। পূর্ণ হয় নারী পুরুষের প্রেমশুদ্ধ আধারে পড়ে। মায়াকে যেমন প্রেমের সাধনায় নামতে হবে ভূতুদা তোমাকেও তেমনি আর রুদ্রদেবের বাম মুখ হয়ে থাকলে চলবে না। ভৈরব-মূর্ত্তি ত্যাগ করে এবার শিবমূর্ত্তি ধারণ করতে হবে তোমাকে। তোদের উভয়ের প্রেম সুন্দর মঙ্গলময় মূর্ত্তির মাঝে অবস্থান করব আমি দেহহীন নির্মল সত্তায়।

স্থির নিশ্চল নির্বাক হয়ে বসে রইল ভূতনাথ। ভাবতে লাগল যেন সে কি। বলে উঠল সতী,—তোমার সংসত্তার আকর্ষণই বলাল আমাকে এসব কথা। সত্তা আমার তোমার সঙ্গেই শ্রোতা হয়ে শুনল এসব। কিন্তু সে যাই হোক ভূতুদা বিদেহী আমি, বলা ছাড়া তো আর সূক্ষ্মাধারে স্থূল জগতের কোনকিছু কর্ম করার সাধ্য নেই আমার। দেহধারী তোমরা। কাজ করতে হবে তোমাদের। যাও এবার ঘরে তুমি ভূতুদা। স্ত্রীর গুরু স্বামী হলে আত্মিক উন্নতি ত্বরান্বিত হবে মায়ার। সব কিছু মেনে মানিয়ে নিয়ে শিষ্যাটিকে তুমি চালাও তোমার জীবন সাধনার পথে। আর দেরী কোরো না। জেগে যাবে মায়া। বিছানায় তোমায় না দেখলে মণিহারা ফণী হয়ে উঠবে সে। ডেকে-হেকে অস্থির করে তুলবে সকলকে। মাতিয়ে তুলবে পাড়া। জানই তো ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। মায়ার অবস্থা তোমাকে না দেখে হবে তা-ই। যাও তুমি ঘরে।

দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল ভূতনাথ। হতাশ চোখে তাকিয়ে সতীর দিকে বলে উঠল সে বিষাদমাখা স্বরে,—বাড়ী-ফিরে না হয় আমায় যেতেই হবে সতী। কিন্তু তুই? বলেছিলি তো তুই একদিন আমাকে মায়ার আঁচলা র যাবি তুই আ[illegible] বাড়ী। ধরেছিলি তো তার আঁচলা। তাহলে চল না আমার সঙ্গে আমাদেরে বাড়ী।

-স্মৃতি বড় বেদনার ভূতুদা। কেমন যেন এক করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভূতনাথের দিকে বলে উঠল সতী,—স্মৃতির আকর্ষণ বড় কঠিন ভূতুদা। সূক্ষ্মসত্তার প্রতি এর টান বড় প্রবল হয়। উর্ধ্বস্তরের সপ্তলোকের আত্মারা পর্য্যন্ত ঘুরে ফিরে আসে এই পৃথিবীর বুকে, তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে। অনেক সময় পড়ে যান তারা মায়ার টানে। মা ধরিত্রী তখন জীবনাবর্তের জাল ফেলে তাদের টেনে নেন কোলে। জন্ম নিতে বাধ্য হন তারা। জীবাবর্তে পড়ে তাদের শুরু হয়ে যায় জন্ম-মৃত্যুর খেলা। আমিও যদি তোমাদের বাড়ী গিয়ে পড়ে যাই সেইরূপ মায়ার আকর্ষণে। তোমাদের বাড়ীতে বিয়ের পর কুলবধূ হয়ে যাওয়ার সেই স্মৃতিগুলো যদি আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলে আমাকে। মায়ার টানে যদি রূপ ধরায় আমাকে। তাহলে তো সবাই ভূত দেখবে আমাকে। বিপদে পড়ব আমি আর সে এক বিষদৃশ অবস্থা হবে তোমাদের।

—সে সামলাব আমি। তবু চল না তুই আমার সঙ্গে বাড়ী।

—না ভূতুদা, কামনার বীজ এখনও যায় নি সম্পূর্ণ আমার মন থেকে। তোমাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে আমার জাগতিক আসক্তি। বাবা ভূতনাথকে স্মরণ করে, তোমার মধ্যে তাঁকে দেখে বহুকষ্টে কাটিয়ে থাকি আমি সে আসক্তি। তোমাদের বাড়ী গিয়ে মুহূর্ত্তের দুর্বলতায় কামনাচক্র যদি পেয়ে বসে আমাকে তবে তো পড়ব গিয়ে জীবনাবর্তের টানে। ধরণীর ধূলায় তাহলে তো আবার লটপট খেতে হবে জন্ম-জন্মান্তর। তোমাকে নিয়ে পরামুক্তির উদ্দেশ্য তাহলে আমার সিদ্ধ হবে না ভূতুদা। দেরী হয়ে যাবে।

—কিন্তু এখানেও তো জীবাবর্ত্তের আবর্ত্তে পড়তে পারিস তুই? এতক্ষণ তো আছিস, কই পড়িস নি তো? তাহলে সেখানেও কেন ওসব আবর্ত্তে পড়তে যাবি তুই?

—বাবা ভূতনাথের থানে ওসব আবর্ত প্রভাব ফেলতে পারে না ভূতুদা। ধরে থাকলে বাবার খুঁটি জীবনাবর্তের ঢেউ কোনক্রমেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না কোন আত্মাকে। এখানে মুক্তির হাওয়া, নিবৃত্তির পরিবেশ। কিন্তু সংসারে আসক্তির হাওয়া, প্রবৃত্তির পরিবেশ। তাই সংসার কামনার, বাসনার ঘুরপাকে যে কোন মুহূর্ত্তে ফেলে দিতে পারে আত্মিকদের। বাবার কোল তাই এখানে নিরাপদ ভূতুদা।

—বেশ, যদি এখানটাই নিরাপদ তোর তাহলে এখানে এসে ডাকলে তো দেখা পাব তোর?

স্মিতহাস্যে বলে উঠল সতী,—আবার সেই দেখার কথা ভূতুদা। জান না বোধ হয় তুমি, সেই উর্ধ্বলোক থেকে নেমে আসতে আত্মাদের কষ্ট হয়। কষ্ট হয় পৃথিবীর উপরকার বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসতে এ ধরার বুকে। জগৎ-জীবনের কোন কিছুই কোনদিন ফেলা যায় না ভূতুদা, নষ্ট হয় না মানুষের চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারনা কোনকিছুই। উপরকার স্তরে গিয়ে মেঘ হয়ে তা জমে থাকে থরে থরে। পৃথিবীর উপরকার বায়ুমণ্ডলে তাই জমে আছে মানুষের অর্থাসক্তি, কুচিন্তা, স্বার্থপরতা, দুর্নিবার লোভ, ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা-বিদ্বেষ, নানা বদ্-ভাবনা, কু-মতলব ইত্যাদি। সে আস্তরণ ভেদ করে আসতে উচ্চ আত্মিকদের কষ্ট হয় ভূতুদা।

—তোরও কষ্ট হয়? হঠাৎ বোকার মত জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ। বলে উঠল সতী,—শুধু উপরকার বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসতেই কষ্ট হয় না ভূতুদা নীচেরকার বায়ুমণ্ডলে থাকতেও তাদের কষ্ট হয়। মানুষের অন্যায় ভোগাকাঙ্ক্ষা, পাপাসক্তি, নারী-সুরা-বিলাসে লোভভারী করে রাখে এখানের বাতাসকে। এ বাতাসে দম নিতে তাদের কষ্ট হয়। পৃথিবীর নীচেকার স্তরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় স্বার্থপর মানুষের হত্যা-লুণ্ঠন প্রতারনার ইচ্ছা। মিশে থাকে এখানের বাতাসে চোর-জোচ্চোর দাগাবাজ-ধড়িবাজদের ধাপ্পাবাজি ছল-চাতুরি ও নানা ফন্দি-ফিকির। উচ্চস্তরের দেব-পিণ্ডধারী আত্মারা এ বাতাস সহ্য করতে পারেন না। পারেন না তারা এখানে কাম-প্রবৃত্তি অসৎ চিন্তা-ভাবনার ধোঁয়ায় বেশীক্ষণ অবস্থান করতে। আমারও তাই কষ্ট হয় ভূতুদা।

—কই, একথা তো তুই আগে বলিস নি সতী? জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছিস তুই। ডেকে তোকে তাহলে আর কষ্ট দেব না আমি। শান্তিতে থাক তুই।

বলে উঠল সতী,—সত্যি যদি শান্তিতে তুমি আমাকে রাখতে চাও ভূতুদা তাহলে তো এবার থেকে শান্ত হয়ে থাকতে হবে তোমাকে। তোমার আমার সত্তা যখন এক তখন আমার এ সত্তার শান্তি তো নির্ভর করছে তোমার উপর। রাগ করে, কারো' মনে অযথা কষ্ট দিয়ে সত্তাকে তোমার অস্থির চঞ্চল করো না। তাহলেই শান্তিতে থাকবো আমি।

—আমার যা কিছু রাগ-অভিমান তুই নে সতী। নিয়ে চালা আমার জীবনটাকে তুই তোর ইচ্ছামত। শুধু একটা কথা দিয়ে যা আমাকে যে ডাকলেই তুই আমাকে দেখা দিবি। বললেই এভাবে তুই সাড়া দিবি আমার কথায়। তুই ছাড়া কিছুতেই আমি শান্তিতে থাকতে পারব না সতী।

হাসিতে আবার মুক্তা ঝরাল সতী। বলে উঠল সোহাগভরা স্বরে,—সতী কখনও ভূতনাথ ছাড়া থাকতে পারে ভূতুদা। জানবে সব সময় আমি তোমার সাথে সাথেই আছি। তোমার ভাল, তোমার মন্দ তোমার চেয়ে আমি ভাল বুঝি ভূতুদা। সুতরাং চিন্তা নেই তোমার। ডাকতে হবে না তোমায় আমাকে। দেখা দেবার যখন প্রয়োজন বুঝবো আমি তখন আপনা থেকেই ঠিক সময় বুঝে দেখা দেব আমি তোমায়। বাহাদুরী দেখাতে বা অন্য কারো কৌতূহল নিবৃত্ত করতে দেখা দিতে কাকেও বল না আমায়। এমন কি মায়ার কাছেও না। সকলের তো আর তোমার মত আমাকে দেখার শক্তি নেই ভূতুদা। তাই সূক্ষ্ম-দেহ না দেখতে পেয়ে আবার তোমাকে ক্ষেপা বলতে পারে, পাগলা বলতে পারে। করতে পারে টিট্‌কারী বিদ্রূপ। তাদের ও সব কটূক্তি, বক্রোক্তি তোমার মত আমারও মনে কষ্ট দেবে ভূতুদা। এতে শুধু আমার সূক্ষ্ম মনটার যে কষ্ট হবে তা নয়—আত্মিক ক্ষতি হবে আমার। তোমার কথা রাখতে বার বার স্থূল দেহ ধারণ করি যদি তাহলে আমার সত্তার যে শুধু শক্তিক্ষয় হবে তা নয়,—পাঞ্চভৌতিক উপাদান কণা আহরণ করতে করতে পঞ্চভৌতিক টানে পড়ে যাব আমি। জাগতিক দেহ ধারনের বস্তুকণাগুলোর মধ্যে জাগতিক কামনা-বাসনার বীজ মোহে ফেলবে আমাকে। সত্তাকে আমার ক্রমশঃ আচ্ছাদন করে ফেলবে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোন মাতৃ জঠরে। জন্ম-জীবন কর্মচক্রের আবার আবর্তনের মধ্যে ফেলে আমাকে বিস্মরণ ঘটাবে সত্তার। তোমার আমার পরা-মুক্তির পথে ঘটাবে বাধা। তাই, বলি দেখার ঝোঁক বা আমাকে অপরকে দেখানোর লোভ তুমি ত্যাগ কর ভূতুদা।

ভূতনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সতীর মুখটার দিকে। ওধারে ভৈরব-থানের গাছে-পালায় পাখ-পাখালিগুলো উঠল ঝাপটা দিয়ে। বোধ হয় গায়ে তাদের রাতের শেষ প্রহরের বাতাস লাগায় গা ঝাড়া দিয়ে উঠল তারা। ধরতে হবে প্রভাতী। আসছে দিনের ভোরকে তাদের বন্দনা গেয়ে জানাতে হবে অভিনন্দন। তারই প্রস্তুতি যেন নিতে লাগল তারা। বলে উঠল শাশ্বতী, তেমনি হাসিভরা শান্ত মুখে,—যাও ফিরে এবার

তুমি, তোমার সংসারে, মায়ার কাছে। বাবাকে প্রণাম করে বাড়ী ফিরে যাও তুমি। আমাকেও এবার যেতে হবে। পূত-পবিত্র আত্মারা সব তাদের ধরিত্রী মায়ের কোলে বিচরণ ত্যাগ করে উঠছে সবাই উর্দ্ধলোকে। তাদের সঙ্গে যেতে হবে আমাকেও ভূতুদা। গেলেও কিন্তু জানবে তুমি সত্তা আমার বাঁধা তোমার কাছে। যেখানে যেমন অবস্থাতেই পড় না তুমি, করনা তুমি যাই কিছু, সত্তাতে আমার পড়বেই তার টান। সে-টান ধরে আসব আমি তোমার কাছে। বাবার মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে আর তুমি পিছন ফিরে তাকিয়ো না আমার দিকে। তাতে তোমার-আমার উভয়ের ক্ষতি হতে পারে ভূতুদা। নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরে যাও তুমি।

সতীর আদেশ আর অমান্য করার শক্তি যেন রইল না ভূতনাথের। তাই লক্ষ্মীছেলের মত বাবার মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে ধরল সে বাড়ীর পথ। সতীর নিষেধ যখন, তখন কৌতূহলটাকে দমন করল সে। ফিরে তাকাল না সে আর পিছন দিকে।

(ষোল)

নারী নাকি বিধাতার এক অদ্ভুত সৃষ্টি। এ অপূর্ব জীবটিকে সৃষ্টি করবার সময় তিনি নাকি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোনো উপাদানই বাকী রাখেন নি। জগতে পাহাড়ের বুকে ঝরণার খেলা থেকে আরম্ভ করে আকাশে মেঘের বুকে রঙের মেলা পর্য্যন্ত সব কিছু লাগিয়ে ছিলেন তিনি তাঁর এ নারী সৃষ্টিতে। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীর স্বভাব-গতি, নর-বানর আর সাগর-নদীর মতি-প্রকৃতি, কুয়াশার কুহেলিকা, মরীচিকার ভ্রম, আলেয়ার আলো, বাজের চম্‌কানি, বিদ্যুতের ঝল্‌কানি, বাদলার খামখেয়ালি, ঝড়ের ঝাপট কোন কিছুই বাদ দেননি তিনি। বাদ দেন নি বলেই মনে হয় নানা উপাদানের জটলায় জটিল হয়েছে নারীর মন। সে মনের জট খুলতে "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"। মায়ার মনের খেই তাই খুঁজে পাবে কেন ভূতনাথ? তার ধারনায়—-মায়া কন্যাটিকে সৃষ্টি করার সময় সৃষ্টি-কর্ত্তার মনে হয় একটু ঝিমুনি এসে গেছল। ঢুলতে ঢুলতে তাই বোধ হয় মায়া মেয়েটির মধ্যে গোঁ-এর ডোজটা একটু বেশী করে ফেলেছিলেন তিনি। তা যদি না হয় তবে নিশ্চয়ই তিনি ভুলক্রমে মায়ার মধ্যে দিয়ে ফেলেছিলেন হয় গোরুর গোয়ার্তুমি কিম্বা ম'ষের একগুঁয়েমি।

বাপরে বাপ্—কি সাংঘাতিক জেদ মায়ার! ভূতনাথ কত করে বুঝাল তাকে, বলল তাকে কত রকম ভাবে,—তোর দিদিও যা-তুইও তা। সতীর গহনা-শাড়ীতে অধিকার আছে তোর। নিশ্চয়ই তুই পরবি সতীর সব কিছু। এ নিয়ে কোনদিন তোকে ভুলক্রমেও কোন কিছু বলব না আমি আর। দিব্যি করে তোর বলছি।

কিন্তু শুনলে তো মায়া তার কথা—বুঝলে তো সে। উত্তরে তার বলে উঠল তাকে,—ভূতনাথের স্ত্রী যখন সে তখন পেত্নী হয়ে থাকাটাই উচিত তার। এবং সেভাবেই থাকবে সে চিরকাল।

কি মুস্কিল! সাজ-গোজ-তো নারীর ধর্ম। এই যে জগতে এত শাড়ী গহনার প্রচলন, ফ্যাসন-প্রসাধনের উদ্ভাবন, রঙ্-ডিজাইনের প্রবর্ত্তন, দিনের দিন বসন-ভূষনের রকমফের সব তো শুধু নারীর জন্যই। এসব পরে সেজে-গুজে নারীরা সব <u>পরী হয়ে ফরী খেলে</u> বেড়াবে নর-পুরুষদের চারপাশে। প্রজাপতির মত নানা রঙের পাখনা মেলে পত্-পতিয়ে উড়ে বেড়াবে তারা পুরুষগুলোর চারদিকে। টানবে তাদের প্রাণ, মজাবে তাদের মন, নাচাবে তাদের হৃদয়, শিরায়-শিরায় জাগাবে তাদের শিহরণ, লাগাবে তাদের পুলক—এই তো নারীর কাজ। কিন্তু কি ধাতে যে গড়া মায়া কে জানে। থাকতে কেন পরবে না সে শাড়ী গহনা? চাইতে কেন দাঁড়াবে না সে স্বামীর সামনে সেজে-গুজে?

'—না।' মায়ার স্পষ্ট জবাব। খোলস পবে জৌলুষ বাড়াতে চায় না সে। তার মতে স্বামীই নারীর আসল অলংকার। নকল ভূষণ পরে সঙ্ সেজে স্বামীর রঙ্ ধরাতে চোখে পারবে না সে। জীবনের ভূতুদার মত আসল রত্নটি পেয়ে ওসব পরে ঢঙ্ দেখানোর কি প্রয়োজন তার। থাকবে সে চিরকাল ভূতুদার বুকে নিরাভরণ রূপে সোহাগ ভরে। কৃষ্ণের পাশে রাধার মত।

কথার চোটপাটে মায়ার ভূত বনে গেলেন ভূতনাথ বাবু। ভ্যাবলাকান্তের মত দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি নির্বাক হয়ে। আসল কথা কিন্তু—ভয় জেগেছিল মায়ার মনে। জেগেছিল মনে তার সন্দেহ। সন্দেহ হল পাছে তার দিদির শাড়ী-গহনাগুলো পরলে সতীদিকে ভূতুদার যায় পড়ে মনে। পড়লে মনে নাকি প্রেতাত্মাটা তার ভর করবে তাকে। ঘুরাবে ওমনি শ্মশানে-মশানে। বিগড়ে দেবে মাথাটা তার। এ অভিজ্ঞতা আছে মায়ার। এখনও জ্বল জ্বল করছে মনে তার সেদিনের শ্মশানঘাটে ভূতুদার কাণ্ডটা। কি কেলেঙ্কারিই না বাঁধিয়েছিল সেবার ভূতুদা। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি কিছুতেই যেন আর না হয় তার জীবনে।

নারীর মন—গভীর গহন বন। এ মন-বনে একবার সন্দেহপশু প্রবেশ করলে তাকে তাড়ায় কার বাবার সাধ্যি। বিশেষ করে আবার নারী-ই ঢুকায় যদি নারীর মনে সন্দেহ তাহলে তো আর কথাই নেই। ভূতনাথের চরিত্রের ওই ধরনের সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছিল মায়ার মনে তারই শাশুড়ী-মাতা অর্থাৎ ভূতুদার মা,—খুব সাবধান। ঝাঁড়-ফুক করে গা বেঁধে দিয়ে গেছেন ভূতনাথের শ্মশান-বাবা, বার বার করে নিষেধ করে দিয়ে গেছেন তিনি—কাজে কর্মে, আচরণে—ব্যবহারে, কথায়-বার্তায় এমন কিছু যেন না করে কেও যাতে মৃতা-স্ত্রীকে ভূতনাথের মনে পড়ে যায়। তাহলে হয়তো আবার অঘটন ঘটাতে পারে ওই প্রেতাত্মাটা। আবির্ভূত হয়ে অলক্ষ্যে আবার পেয়ে বসতে পারে ভূতনাথকে।

সুতরাং হুঁশিয়ার থাকতে হবে মায়াকে। স্ত্রী হয়ে তাকে সদা সচেতন থাকতে হবে এ ব্যাপারে। অতএব ভূতুদা যতই বলুক তাকে, করুক যতই ধানাই-ফানাই, বুঝাক যতই সোহাগ ভরে—কিচ্ছুতেই শুনবে না সে তার কথা। কারণ দিদির গহনা-শাড়ী তার তো স্মৃতি-উদ্রেকী বস্তু। পরলে ওসব তার স্মারক হয়ে নাচায় যদি ভূতুদা'কে।

কিন্তু যেমন টেঁপী তেমনি টেপা। জেদে ভূতনাথও কম নয়। নাছোড়বান্দা। কোন বিষয়ে একবার তার চণ্ চাপলে মাথায় চাপা দেয় তাকে কোন বাপের বেটি। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীতে চলল কথা কাটা-কাটি। চড়তে লাগল উত্তরোত্তর উতর-চাপানের খেলা। কিন্তু বুদ্ধিমতী মায়া। ভূতুদার জেদটা তেড়ে-ফুঁড়ে তুঙ্গে উঠতে লাগল যখন তখন হট্ করে বলে ফেলল মায়া,"—আমাকে গহনা-শাড়ী পরাবার মুরোদ আছে তোমার? তাহলে এদ্দিন একটা কাজ-কর্ম্ম যোগাড় করে সেই টাকায় শাড়ী-গহনা কিনে পরাতে পারতে আমাকে। বেকার স্বামীর স্ত্রী হয়ে বসন-ভূষনের বাহার দেখালে লোকে হাসবে না আমাকে? ছিঃ ছিঃ করবে না পাড়ার প্রতিবেশিনীরা।" অর্থাৎ সাফ কথা হল মায়ার, তার দিদিরই হোক বা তার মাঁ-বাপের দেওয়াই হোক ওসব গহনা পরের। পরের নিয়ে পোদ্দারী করতে পারবে না সে। থাকে হিম্মত স্বামীর তার নিজে রোজগার করে তার টাকায় পরাক সে তার স্ত্রীকে গহনা-শাড়ী। যে মরদের নিজের ট্যাঁকের কড়ি নেই সে ভাতারের নিজের মাগকে পাটরাণী সাজিয়ে দেখার এত সখ কেন? চাঁছা-ছুলা কথা।

কথাটা বড় প্রাণে লাগল ভূতনাথের। তার পৌরুষত্বে দিল বড় চোট। কি, মুরোদ নেই তার? নেই তার কোন হিম্মত? বেকার বলে মায়া তাকে দিবে এত বড় খোঁটা! স্ত্রী হয়ে করবে তাকে এত বড় অপমান! না-এ অপমান কিছুতেই সহ্য করবে না সে। রগ চটকাল ভূতনাথের। রোক চাপল মাথায়। জেদ-চাপল তার—যেমন করেই হোক দেখিয়ে দিতে হবেই মায়াকে। যে সে তার বেমুরোদে মরদ নয়। নয় সে পাড়ার পঁচা-তাঁতী, পলু-বৈষ্টম, খাঁদা কুলুর মত মাগদের মুখ-ঝামটানি সহ্য করার মত মরদ বা বৌদের চোখ-টাটানো, মুখ-বাঁকানো হজম করে যাওয়ার মত স্বামী। কালু কাকুর মত কর্ম কুঁড়ে নয় সে, নয় সে ঘনুপিশের মত ঘর কুন্দুড়ে ঘর-জামাই। ভোলুদাদুর মত ভোঁদড়-মার্কা ভাতারও নয় সে যে দিনরাত রান্না ঘরের চুলো-শালে বসে স্ত্রীর বাপান্ত শাপান্ত, গাল-মন্দ বেমালুম গিলে গিলে যাবে।

সুতরাং মায়ার খোঁচায় লেজ নেড়ে উঠল ভূতনাথের ভিতরের সেই একরোখা স্বভাবটা। কাজ চাই তার—চাই কাজ। উঠল বাই তো কটক যাই। চড়ল ভূতনাথের বাতিক। সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াল সে বাড়ীর বাইরের দিকে। আসলে মায়া এতটা বুঝতে পারে নি। এরকমটা বলা উদ্দেশ্য নয় তার। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছেল। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে করে ফেলেছে সে। স্বামীকে তার বেকারত্বের খোঁচা দেওয়া মোটেই মতলব নয় তার। নয় তার ইচ্ছা ভূতুদা'কে তার রোজগারের ধান্দায় ঠেলে ঘর থেকে বের করে দেওয়া। তাহলে যে ঘরটা শূন্য লাগবে তার। পারবে না যে সে তখন একদণ্ড কোথাও তিষ্ঠিতে। অন্ধকার লাগবে যে তার চোখে সব কিছু। কায়দা করে ভুলাবার জন্য দিদির স্মৃতিটা একি বেফাঁস কথাটা বলে ফেলল সে। এযে নিজের মাথায় নিজের মুগুর মারা হল তার। গোছাতে গিয়ে সব কিছু অগোছালো হয়ে গেল যে তার। হায় ভগবান—একি করল সে।।

ছুটল মায়া প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ভূতুদা'র পিছু পিছু। ঝট্ করে পাশ কেটে সামনে গিয়ে তার ল্যট্ করে পড়ল গিয়ে তার পায়ে, —তোমার পায়ে পড়ি ভূতুদা, এভাবে ছেড়ে যেওনা তুমি আমাকে। তুমি রাগ করে চলে গেলে থাকবো আমি কি ভাবে।

—রাগ করে আমি তো যাইনি কোথাও। চাকরী করতে যাচ্ছি।

—চাই না আমি চাকরী। ঘরে আমাদের যা জুটবে তাই নিয়ে দুজনে কাল কাটাবো ভূতুদা; তুমি পাশে থাকলে ক্ষুদ-কুঁড়াই আমার কাছে পরমান্ন ভূতুদা, ছেঁড়া-শাড়ীই আমার কাছে মখমল। আমার ভুল হয়ে গেছে ভূতুদা। না বুঝে তোমায় যা-তা বলা মস্ত বড় অন্যায় হয়ে গেছে আমার। এ অপরাধ আমার ক্ষমা কর তুমি। যেও না ফেলে এভাবে আমাকে।

কিন্তু বললে তখন কি আর শুনে ভূতনাথ। ভূত চেপেছে তার মাথায়। জেদের ঝড়ে যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল তাকে। অনন্যোপায় হয়ে ডাকল মায়া তখন চিৎকার করে তার শাশুড়ীকে। মা তার পিছন ডেকে, ছুটে যেয়েও নিবৃত্ত করতে পারল না তাকে। হাত নেড়ে শুধু জানিয়ে গেল ভূতনাথ তার মাকে যে সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে একেবারে চলে যাচ্ছে না সে। যাচ্ছে কাজের সন্ধানে। সুতরাং কোন চিন্তা নেই তাদের। রোজগারের একটা কিছু ধান্দা করে ফিরে আসবে সে বাড়ী।

কিন্তু যাবে সে কোথায়! কাজটা তো গাছের ফল নয় যে নাড়া দিলেই পড়বে দুপ্-দাপ আর কুড়িয়ে সে নেবে লুপ্-লাপ। নয় চাকরী তার মায়ের হাতের মোওয়া যে ঝোঁক ধরলেই পাবে সে। নয় এ তার বাপের ঝোলার নাড়ু যে কাঁদলেই বাবা তাকে ভুলিয়ে দেবে তার হাতে দিয়ে। কিন্তু মায়াকে যে সে টেঁক দেখিয়ে এসেছে। এসেছে যে সে কাজ করবে বলে দাপট দেখিয়ে মায়ার কাছে। দেমাক-ভরা চালে বেরিয়ে সে যদি আবার ছুঁচো মুখটা বুচো করে ফিরে আসে বাড়ী তবে স্ত্রীর কাছে আর কোন সম্মান থাকবে তার? মুরোদহীন তার মরদটার দিকে তাকিয়ে ফিক্-ফিক্ করে হাসবে না মায়া? কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত লাগবে না তার সে হাসি? এ যে অসহ্য তার পক্ষে। সুতরাং চালাও চরণ যেদিকে খুশি, ঘর-মুখো আর হয়োনা রে—।

যেতে যেতে পড়ল মনে তার সেই বন্ধু-প্রবর ভজনলালের কথা। স্মৃতিপটে উঠল ভেসে তার সেই বাঁকাদহে শালী-নদীর তীরের ইট-ভাটাটা। সে ইট-ভাটায় থাকার সময় ভোজু-দস্তিদার বন্ধু তার বলেই ছিল তাকে যে সেখানে তার একজন পার্টনার হয়ে কাজ করতে। না করলে সে তো বলেই ছিল তার বাবলা-ডাঙ্গার মোটা খদ্দের অবিনাশ বাবুর রোলিং মেশিনে চাকরী নিতে। বলা শুধু নয় সঙ্গে করে সে নিয়ে গেছল তাকে সেখানে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সে অবিনাশ বাবুর সঙ্গে। পরিচয় শুধু নয় সরাসরি সে বলেও ছিল তাকে তার কাজের কথা। বলার সঙ্গে সঙ্গে কাজে তাকে যোগও করতে বলেছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু ভূতনাথই তখন নিজের পায়ে নিজের কুড়ুল মেরেছিল। "ভেবে দেখব," "চিন্তা করে পরে বলব"—ইত্যাদি বলে এড়িয়ে তার কথা চলে এসেছিল সে। তা হোক—এখনও গেলে সে সব কথা নিশ্চয়ই তার বানচাল হয়ে যাবে না। মোটকথা ভিক্ষে-ভাই ভোজুর কাছে গেলে তার চাকরির একটা সুরাহা হবেই হবে।

সেই আশাতেই চলল ভূতনাথ ভজনলালের ইট-ভাটায়। পৌঁছল যখন সন্ধ্যা তখন ছুঁই ছুঁই। শালী নদীর দূর-দিগন্তে আকাশের বুকে রঙের খেলা শেষ করে সূর্য্যি মামা বেশ কিছুক্ষণ আগে অস্তমিত হয়েছেন। মাঠের চাষী, গোঠের রাখাল ফিরে গেছে নিজ নিজ বাড়ী। ইট-ভাটারও কুলিকামিনরা বোধ হয় চলে গেছে যে যার কাজ সেরে। জনহীন শালীনদীর পাড়, নির্জন ইট-ভাটাটা করছে খাঁ-খাঁ।

কিন্তু ভাটাটার কাছে এসেই কেমন যেন চমকে উঠল ভূতনাথ। নির্জন শুধু নয় ভাটাটা মনে হল তার যেন বহুদিন ধরে এধারে পা পড়েনি মানুষের। বেহাল হয়ে পড়ে আছে তার কর্মক্ষেত্রটা। চারধার ছিদ্-ছাতুর, ভাঙ্গা ইটের পাহাড়। বট-গাছটার কাছে আসতেই দেখল নদীর পাড় ঘেসে যে ছালট-ইটের থাকগুলো লাইন ধরে দাঁড়িয়েছিল সেগুলো সব হড়কে গেছে। পড়েছে গিয়ে নদীর বুকে। তার পাশের দু-নাম্বার ইটের থাকগুলো কারা যেন ভেঙ্গে, ফেলে, মাড়িয়ে, গুঁড়িয়ে গেছে চলে। কাছে যেতেই চৌহদ্দি সমেত ইট-ভাটাটা কেমন যেন অসহায়ভাবে তাকাতে লাগল ভূতনাথের মুখের দিকে। ব্যাপার কি? এ দশা হল কেন ভাটাটার? ভাবতে ভাবতে পায়চারি করতে করতে এসে দাঁড়াল সে নদীর পাড়ে। এ পাড়টাতেই তখন প্রতিদিন পড়ন্তবেলায় চেয়ার নিয়ে বসে থাকত সে। দেখত তাকিয়ে নদীর বুকে ম'ষের পিঠে চড়ে পড়ন্ত বেলায় ম'ষ রাখালদের সব বাড়ী ফেরার ছবি। করত নিরীক্ষণ পশ্চিম-দিগন্তে পাটে বসা সূর্য্যমামার নানা রঙের আবির-ছড়ানো রঙের খেলা। এ খেলা দেখতে দেখতে আসত সন্ধ্যা দূর-দূরান্তের গাঁগুলোকে ছাপিয়ে। ঘরে-ঘরে সে-গ্রামের তুলসী-

থানগুলোতে জ্বলে উঠত প্রদীপ, বেজে উঠত শাঁখ। গ্রাম-দেবালয়ে, মন্দির-মণ্ডপগুলো থেকে সন্ধ্যারাতির কাসর-ঘণ্টার ধ্বনি আসত ভেসে বড় মধুরভাবে তার কানে। বড় ভাল লাগত তার। ভাবতে ভাবতে এসব কথা স্মৃতির চোখে এধার-ওধার দেখতে লাগল ভূতনাথ। হঠাৎ চোখ পড়ল তার শালীনদীর অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই একুড়ে শিমূল গাছটার উপর। ওমনি ঝড়-ঝড়িয়ে কানে এসে বাজতে লাগল তার ভজনলালের কথাগুলো। তিলাবেদ্যায় চৈত-গাজনের মেলা দেখতে গেছল তার গ্রাম-প্রণয়িনী-মীনাক্ষী। মেলা দেখে গ্রাম ফেরার পথে পড়েছিল সে ঝড়ের মুখে। ছুটে এসে আশ্রয় নিয়েছিল মীনা ওই শিমূল গাছটার তলায়। সেখান থেকে নদী পেরিয়ে এসেছিল সে ভজনলালের এই ইট-ভাটাটায়। তারপর—

হঠাৎ চমকে উঠল ভূতনাথ। কানে এল তার মেয়েমানুষের কণ্ঠস্বর,—গাজন ছেড়ে সঙ্গী-সাথীদের ফেলে একমাত্র তোমার জন্যই এখানে এলাম ভজুদা। এলাম ঝড়ের মুখে স্রেফ তোমার জন্য। মেলা থেকে কিনে আনা তোমার জন্য পাপড়-ভাজাগুলো ঝড়ের চোটে ভেঙ্গে কোথায় উড়ে গেছে ভোজুদা'। কিন্তু কলাই-ভাজা, টানার নাড়ুগুলো খুঁটে আমার আছে বাঁধা। দেখনা খেয়ে কত মিষ্টি।

"—আমার সব চেয়ে মিষ্টি তুই মীনা। আয় আমার বুকে জড়িয়ে ধর আমাকে।" ভজনলালের গলা।

চম্‌কে দিল স্বরটা। যেন বিদ্যুতের একটা ঝিলিক এসে নাড়া দিয়ে উঠল ভূতনাথের মন-প্রাণটাতে। আওয়াজটা আসছে মনে হল তার ভাটার যে-ঘরটাতে থাকত ভ্জন—সেই ঘরটার দিক থেকে। ছিঃ ছিঃ ভোজুর পেটে এতগুণ। তাহলে ডুবে ডুবে জল খায় সে। দেখতেই হবে মজাটা। ভাবতেই আবার সেই মেয়ে মানুষের গলা,—না ভোজুদা, বিয়ের আগে এসব করা উচিত নয় তোমার।

—কিন্তু তুই বাইরের ঝড়টা সামলাতে এলি যে ছুটে আমার কাছে আমি এখন ভিতরের ঝড়টাকে সামলাই কি করে বলতো? এ ঝড় আমার তোর বুকে সামলাতে দে-মীনা! বলছি তো লক্ষ্মীটি, তোকে ছাড়া কাকেও বিয়ে করব না আমি। আর করব বিয়ে বলেই তো ভগবান ঝড় উঠিয়ে আমার কাছে তোকেউড়িয়ে এনেছেন। তোকে আমায় এই নিভৃত নির্জনে এক করে দিয়েছেন। এ সুযোগ আমি আজ হেলায় হারাব না মীনা। আয়, বুকে আয় আমার।

"—কিন্তু একটা কিছু যদি হয়ে যায় তখন ফ্যাসাদে পড়ব যে আমি। বলে উঠল মীনা,"—তখন লাজ রাখবার আমার যে জায়গা থাকবে না ভজুদা। কেলেঙ্কারিতে পড়ব তখন আমি। কলঙ্ক রটবে তখন তোমারও।

"—সে সব আমি বুঝব।" বলে উঠল ভজনলাল,—আজ এ মুহূর্ত্তে আমি কিন্তু কোন কথাই শুনবো না তোর। মানব না তোর কোন বাধা।

"—না, ভজুদা না। এমন বিপদে ফেলো না তুমি আমাকে।"

কি আকুলি-বিকুলি মেয়েটার। ভূতনাথের অতীত-বর্তমান কোথায় যেন গুলিয়ে গেল। স্থান-কাল-পাত্র বোধটাও বোধ হয় লোপ পেয়ে গেল তার। না—এ-অন্যায় হতে ভূতনাথ দেবে না কিছুতেই। বন্ধুকে তার এ পাপ পথ থেকে, এ অধর্ম্ম-আচরণ থেকে করতেই হবে রক্ষা। নদীর পাড়টা থেকে বিদ্যুৎ বেগে ভূতনাথ ছুটে গেল ইট-ভাটার সেই ঘরটার দিকে, —ভজনা, ভজনা, কি করছিস তুই? হচ্ছে কি তোর এখানটাতে?

কিন্তু একি! ঘরটা যে ফাঁকা! ভজনা বা মীনা কারো কোন চিহ্ন তো নেই কোথাও। ভেঙ্গে গেছে ঘরটার ইটের হোড় (বেড়া) দেওয়া চারপাশের দেওয়ালগুলো। উপরের ঘড়ের চালটার কোন অস্তিত্বই নেই। কারা যেন ভেঙ্গে তেড়ে-ফুঁড়ে পুড়িয়ে দিয়েছে সবকিছু। পোড়ার কালি, খড়ের ছাই, কাঠের আঙ্গরা সবকিছু মিলে একাকার করে রেখেছে ঘরটাকে। তিথিটা কি ছিল কে জানে। তবে আকাশের চাঁদটা দিব্যি ফুটফুটে আলোয় তার দেখিয়ে দিচ্ছিল যেন তাকে—সব ফাঁকা! আনাচে-কানাচে রশ্মি ফেলে বুঝাবার যেন চেষ্টা করছিল ভূতনাথকে—শুনল এতক্ষণ যে-সব কিছু সে সব মিথ্যা।

মিথ্যা! অসম্ভব। নিজের কানটাকে অবিশ্বাস করবে সে? বয়স্ক মানুষ নয় সে যে এক শুনতে আর এক শুনবে। ভীমরতি ধরে নি তার যে ভ্রম হবে। যা শুনল সে—সত্যি। এ পোড়ো ঘরটায় না হোক, ঘরটার আশে-পাশে গাদা-ইটের ফাঁকে কোথাও, ভাঙ্গা ইটের স্তূপের আড়ালে কোনখানে নিশ্চয়ই মীনাকে নিয়ে আছে ভোজু। নির্জন এই ভাটায় এনে মেয়েটাকে গুপ্তভাবে লিপ্ত হবার চেষ্টা করছে সে এই জঘন্য কাজে। এটা অন্যায়,

অধর্ম, অনাচার। বন্ধুকে তার এ অপকর্মে লিপ্ত হতে দিয়ে চরিত্রটাকে তার কলঙ্ক-কালিকা যুক্ত হতে কিছুতেই দেবে না সে।

খুঁজতে আরম্ভ করল ভূতনাথ ইটভাটার চৌহদ্দি। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করতে লাগল সে দূর-নিকটের আশে-পাশের সমস্ত ইটের থাক, ছালটের হোড়, আধলা-ইটের গাদা। কিন্তু কোথায় বা কি। সব শূন্য—ফাঁকা—নির্জন। আশ্চর্য্য তো।

বিস্মিতভাবে এধার-ওধার তাকাতেই আবার কানে এল সেই গলা। সেই মেয়েমানুষের কণ্ঠস্বর। তবে স্বরটা মনে হল তার যেন বেশ একটু রাগত-ভাবে—মনে করেছো কি তুমি আমাকে? আমি বেশ্যা? আমি একটা নষ্টা মেয়ে—দুশ্চরিত্রা—বারবনিতা?

'—আঃ মীনা।' বলে উঠল যেন ভজনলাল,—হুট করে তুই এমন রেগে যাস কেন বলতো?. আমি কি তাই তোকে বলছি? একটু বুঝে দেখ। বিয়ের ছোপটা তোর জীবনে পড়া দরকার। এতে তোর-আমার উভয়েরই পথ পরিষ্কার হবে। যে পুরুষটার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে সেটা একটা বোকা পাঁঠা—ভ্যাবলাকান্ত। তাকে ভেঁড়া করে রেখে তুই দিব্যি আমার সঙ্গে মিলতে পারবি। আমিও ইচ্ছামত তোর সঙ্গে যখন তখন মিলতে পারব। কোন বাধাই আর থাকবে না আমাদের।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ-ছিঃ। শুনে ভূতনাথের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো ঘৃণায়, ক্ষোভে, দুঃখে রি-রি করে উঠল। বলে উঠল মেয়েটা,—তাহলে বিয়ে তুমি করবে না আমাকে?

"—অবোধ হস না মীনা।" বলে উঠল ভজন,—বিয়েটা তুই হতে দে। টাকা যা দেবার আমি তা দেব বলেছি তোর বাবাকে। আমি বিয়ে না করলেও বৌ হবি তুই তো আমারই। থাকবি তো তুই আমার হয়েই। তোর দায়-দায়িত্ব সব বহন করব আমিই।

"—লম্পট, লোফার।" গর্জে উঠল মেয়েটা,—বিয়ের লোভ দেখিয়ে এদ্দিন আমার ইজ্জত নিয়ে তাহলে তুমি ছিনিমিনি খেলে এসেছো। ছোবড়া করে আজ আমাকে ফেলে দিতে চাইছো শেয়াল কুকুরের মুখে? ভেবেছো কি তুমি—তোমাকে আমি এমনিই ছেড়ে দেব? বিয়ে তোমায় করতেই হবে আমাকে।

—কখ্খনও না। মুখে বলেছিলাম বলে তোকে যে আমায় সতি সত্যি বিয়ে করতে হবে তার কোন মানে নেই। আমার কাছে আসতিস, থাকতিস—তার জন্য আমি তোকে টাকা দিতাম, শাড়ী দিতাম। বিয়ের পরেও এমনি তুই আমার কাছে আসবি, থাকবি-গহনা শাড়ী পরাব তোকে। টাকা-পয়সা যা চাইবি দেবো।

—আমি তোমার কেনা বান্দি নই ভজুদা যে টাকা-পয়সা দিয়ে বাখবে তুমি আমাকে। নই আমি কোন বাজারের নচ্ছার মেয়ে যে টাকায় তুমি আমাকে গুঁজে রাখবে তোমার ট্যাঁকে। আমি রাখনী হয়ে থাকতে চাই না ভোজুদা তোমার জীবনে। স্ত্রী হয়ে থাকতে চাই সতী-সাধ্বী সীতা সাবিত্রীর মত। আমায় তুমি দয়া কর ভোজুদা। বিয়ে করে আমাকে তুমি সেভাবে থাকার সুযোগ দাও। বড় আশা নিয়ে আজ পর্য্যন্ত আছি আমি তোমার আশায়। তোমাকে ছাড়া জীবনে আর অন্য কাকেও চাই না ভোজুদা। তুমি বিয়ে না করলে এ জীবন আর রাখব না আমি।

কথাগুলো শুনে তোলপাড় করে উঠল মনটা ভূতনাথের। পরদুঃখ কাতর অন্তরটা তার উঠল ওমনি মোচড় দিয়ে। ভুলে গেল সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে—কি জন্য দাঁড়িয়ে আছে—কেন দাঁড়িয়ে আছে। স্থান-কাল বোধ লোপ হয়ে গেল তার মুহূর্ত্তমধ্যে। গুলিয়ে গেল তার যে মেয়ে-পুরুষের এতটা অলৌকিক কথাবার্তাকে অনুসরণ করে ঘুরছে সে এই ইট-ভাটাটাতে। ছিঃ। ভোজু এতটা নীচ। একটা লম্পট, লুচ্ছার চরিত্রহীন ব্যক্তি সে। এতদিন সে তাকে শুধু ভুলিয়ে এসেছিল! তিলাবেদ্যার চৈত-গাজনের মেলা থেকে ঝড়ের মুখে মীনার তার ইট-ভাটায় চলে আসার যে কথাটা বলেছিল তাকে—সব মিথ্যা। বিপদের মুখে ওই নিরাশ্রয় মেয়েটাকে সাহায্য করার কথা তার ধাপ্পা। ভাওতা দিয়ে তাকে গেছল যে সেদিন ইট-ভাটায় রেখে, ঘরে-গ্রামে তাদের মীনার সম্বন্ধের ব্যাপারে আসা লোক-জনদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলতে—সব অছিলা, বুজরুকি, চালবাজি।

কিন্তু আর নয়। কানে ঢুকছে যখন ভূতনাথের এসব কথা। বুঝতে যখন পারছে সে ভজনলালের কীর্ত্তি-কলাপ তখন আর ডুবে ডুবে জল খেতে দেবে না তাকে। বিয়ের কথায় ভুলিয়ে একটা গেঁয়ো, সাধা-সিধা সরলা

বালিকার সর্বনাশ করেছে যখন সে তখন ভূতনাথ তাকে কিছুতেই আর ছাড়বে না—কোনমতেই না। নারীত্ব যখন লুণ্ঠন করেছে সে তার তখন মীনাকে বিয়ে তাকে করতেই হবে। আজ হাতে নাতে ধরবে সে পাজিটাকে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য—স্বরটাকে অনুসরণ করে সে-জায়গাটাতে যেতেই দেখল ভূতনাথ—সব ফাঁকা। আকাশ থেকে আলো ফেলে চাঁদা-মামা বলছে যেন তাকে—সব ঝুটা হ্যায়। ভাগ যাও।

এধার-ওধার তাকাতেই ওমনি হঠাৎ পিছন থেকে এল আবার তেমনি সেই সব কথাবার্তা। বলছে ভোজু যেন মীনাকে, —বিয়ে বিয়ে করে মেলা এখানে চেঁচাসনি তো। চলে যা এখান থেকে। জানাজানি হয়ে গেলে লজ্জা রাখতে জায়গা থাকবে না।

"—লজ্জা তাহলে আছে তোমার?" বলে উঠল যেন মীনা, —ভেবেছ কি তোমাকে আমি এমনি ছেড়ে দেব? নষ্ট করেছো তুমি আমাকে বিয়ে তোমাকে আমার করতেই হবে।

—ভাল কথায় তাহলে তুই যাবি না এখান থেকে?

—কি করবে তুমি? মারবে আমাকে? মার। একেবারে শেষ করে দাও।

"—মরতেই তোকে হবে দেখছি।" দাঁতে দাত চেপে যেন বলে উঠল ভোজু।

কি সর্ব্বনাশ। সত্যি ভজনলাল মারবে নাকি মেয়েটাকে। চিৎকার করে ভূতনাথ ছুটল সেদিকে, —খবরদার ভজনা হাত তুলবি তুই মেয়েমানুষের গায়ে। সাবধান—

কিন্তু একি? শূন্য যে ভাঙ্গা-ইট গাদার আড়ালটা। তাজ্জব ব্যাপার।

কিন্তু না, তাজ্জব ব্যাপার নয়। ওই তো পিছনের ইট-গাদাটা থেকে আসছে মেয়েটার গলা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর,—চিৎকার করব আমি। এক্ষুনি গাঁয়ে যেয়ে ডেকে-হেঁকে বলব আমি সকলকে তোমার কীর্ত্তি-কলাপ। ঘর-ঘর গিয়ে জানাব আমি সকলকে যে আমার সর্বনাশ করেছো তুমি।

—তাহলে তার আগে আমাকেই গাঁয়ে যেয়ে বলতে হয় তোর এখানে আসবার কথাটা। জানাতে হয় তোর মা-বাবাকে যে সন্ধ্যারাতে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে একলা এসেছিস তুই আমার কাছে মিথ্যা আমার নামে বদনাম রটাতে।

"—না ভজুদা, না।" ব্যাকুলিত প্রাণে আকুল হয়ে বলে উঠল সে, এত বড় সর্ব্বনাশ করো না তুমি। চুন-কালি পড়বে বাবার মুখে—কলঙ্ক রটবে বংশটার। আমার অবস্থা বিবেচনা করে একটু করুণা কর আমাকে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ছুটল বোধ হয় ভজনলাল গ্রামের দিকে। কারণ উঠল একটা মোটর সাইকেলের শব্দ। তারপর হঠাৎ সেটা মিলিয়ে গেল অদূরে গ্রামের পথে। ভূতনাথ দেখতে পেল না কিছু। তবে মনে হল তার মীনা যেন পিছনে পিছনে ছুটল কিছুটা তাকে অনুরোধ করে, —তোমার পায়ে পড়ি ভজুদা, এসব কথা জানিও না গিয়ে ঘরে আমাদের। কাকা, দাদা তাহলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে আমাকে।

তারপর হঠাৎ সব চুপচাপ। আশ-পাশ সব চৌহদ্দি যেন নিথর নির্জন নিঃসাড় হয়ে গেল মুহূর্ত্ত মধ্যে। ভ্যাবলাকান্তের মত দাঁড়িয়ে রইল ভূতনাথ। শুনল সে এত কথা—এত কাছ থেকে, তবু সে দেখতে পেলনা কিছু। অদ্ভুত তো। কোন্‌টা সত্য? দেখছে যে শূন্যতা সেইটা—না শুনল যে এতক্ষণ সেইসব। মিথ্যা তাহলে কোন্‌টা। হতভম্ব ভূতনাথ। ভেবে পেল না কিছুই। হঠাৎ ইট-ভাটার সেই ঘরটার দিক থেকে ভেসে এল চাপা একটা কান্নার শব্দ। মনে হয় মীনারই কান্না। একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই আহাম্মকটার। জনহীন এই ইট-ভাটায় বেমালুম একটা মেয়েকে একলা ফেলে দিয়ে চলে গেল সে। তাই বোধ হয় ভয়ে পড়ে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে মেয়েটা। এ অবস্থায় সান্ত্বনা দেওয়া উচিত তার। বলা তাকে—কোনো ভয় নেই তার। যাক সে আগে তার গাঁয়ে, যাকে যত খুশি মিথ্যা তার সম্বন্ধে বলে বেড়াক ভজনলাল। ভূতনাথ যখন সাক্ষী তার, সে সবের পাল্টা জবাব দেবে সে গ্রামের সকলকে। খুলে দেবে সে ভজনলালের মুখোশটা। যতই বন্ধু হোক সে তার—হোক সে তার যতই আপন সুহৃদ। অন্যায় ভূতনাথ করেনি কোনদিন, করতেও দেবে না সে কাকেও। সুতরাং ছাড়বে না সে ভজনলালকে। অলক্ষে তাদের দাঁড়িয়ে আজ সে শুনল পরস্পরের যে-সব কথাবার্ত্তা, বুঝল তাদের যে-সব কাণ্ড-কারবার—তাতে লুকিয়ে ভোজুকে আর ছ্যাবলামি করতে দেবে না সে। তার বন্ধু হয়ে একটা সরলা উদার মেয়ের জীবন নষ্ট করবে—এ কোনো মতেই কিছুতেই বরদাস্ত করবে না ভূতনাথ। বিয়ে

তাকে করতেই হবে মীনাকে। সাধুগিরি ফলাতে একলা ফেলে মেয়েটাকে এখানে গাঁয়ে গেছে বদমাশটা—যাক। লাগাক সে যাকে যত পারে মিথ্যা কথা। কিন্তু সাক্ষী আজ তার স্বয়ং ভূতনাথ। লুকিয়ে মীনার মধু খেয়ে থুতু ফেলে চলে যাবে সে তার মুখে—সেটি হতে দেবে না আর। বাঁদরামিটা তার ঝেড়ে দেবে সে চিরকালের মত। কি করে?

মীনাকে সে এখান থেকে নিয়ে যাবে গ্রামে। আগে গিয়ে ভজু তার সম্বন্ধে যাই বলুক, যাই বুঝাক সকলকে—সকলের সামনে সে বলবে তাদের প্রেম-পীরিতের গোপন-কথা। এবং বাধ্য করবে ভোজুকে মীনাকে তাকে বিয়ে করার জন্য। ডুবে ডুবে জল খাবে-ফাজলামি! ইয়ার্কি মনে করেছে সে?

ভুলাতে মীনার কান্নাটা, অভয় দিতে তাকে ঢুকল ভূতনাথ ইট-ভাটার সেই ঘরটাতে। কিন্তু একি! কোথায় মীনা। ঘরটা যে ফাঁকা। যথা পূর্বং তথা পরং। অর্থাৎ একটু আগে যেমন দেখেছিল তেমনি। ছাদন-শূন্য উপর। নীচে কাঠ-কয়লা, খড়ের ছাই, ভাঙ্গা-আদলা, পোড়া-কালিলাগা ইটগুলোর সব পড়ে আছে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে এধার-ওধার। দেওয়ালের মত থাক করে রাখা ইটের হোড়গুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—পড়ে গেছে, ধ্বসে গেছে, হেলে গেছে কোথাও। মীনা তো দূরের কথা—জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই সে ঘরটাতে। খাঁ-খাঁ করছে সেটা। আকাশের চাঁদটা তার ক্যাট-ম্যাটে আলোর রশ্মি ফেলে বলছে যেন তাকে সেই "ক্ষুধিত পাষাণের" পাগলাটার মত, —তফাৎ যাও। সব ঝুট হ্যায়।

সত্যি কি তাহলে সব ঝুট! ঘরের মধ্যে এইমাত্র শোনা ফোঁসফোঁসানি কান্নাটা—যেটা স্পষ্ট ভাবে এতক্ষণ কানে আসছিল তার—সব মিথ্যা, অবাস্তব, অলৌকিক। যা বাবাঃ। তবে কি শুনতে কি শুনল সে?

ভাবতেই হঠাৎ কানে এল ভূতনাথের পাশের বটগাছটা থেকে একটা ঝপ-ঝপানি শব্দ। ঝড় নেই, বাতাস নেই হঠাৎ গাছটার নড়ে উঠল একটা ডাল। ডালটার দিকে তাকাতেই ওমনি ভূতনাথ উঠল চমকে। একটা মেয়ে-মানুষ—হ্যাঁ হ্যাঁ একটা যুবতী নারী। পরনে তার মাত্র শায়া-ব্লাউজ। আর শাড়ীটা? সেটাই সেই বটগাছটার ডালটাতে বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে সে। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে মেয়েটা। এই মেয়েটাই মীনা নাকি কে জানে। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! মরতে গেল কেন মেয়েটা এমন ভাবে। চিন্তা করতেই ওমনি দুলতে আরম্ভ করল ঝুলন্ত লাশটা। লাগল দুলতে ঠিক ঘড়ির দোলকের মত—এধার ওধার। যতই বাড়তে লাগল ভূতনাথের বিস্ময়ের মাত্রাটা ততই চড়তে লাগল লাশটার দোলনের স্পীড্। বাড়তে বাড়তে রেশটা তার ক্রমশঃ হয়ে উঠল মাত্রা-ছাড়া। একেবারে এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত। এধার-ওধার বোঁ-বোঁ, শোঁ-শোঁ।

সভয় হয়ে উঠল ভূতনাথের ভয়শূন্য হিয়া। কারণ কাণ্ড দেখে ওই ঝুলন্ত নারী দেহটার বুঝতে তার আর বাকী রইল না—যে এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার। পড়েছে সে নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট-প্রেতাত্মার কবলে। সেটাই ভূতনাথকে ভুলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এই ইট-ভাটাটার চারদিকে। ভোজুর গলা, মীনার স্বর, কান্না কথাবার্তা সব অলৌকিক, অবাস্তব, ভৌতিক। ভূতের পাল্লায় পড়েছে সে। তাহলে উপায়?

উপায়—এখানে আর এক মুহূর্ত্ত না থাকা। সামনেই বাঁকদহ গ্রাম। তার ভিক্ষা বাবার ঘর অর্থাৎ ভজনলালদের বাড়ী। সেই বটগাছটার দিকে আর না তাকিয়ে, পিছন ফিরেই চলল ভূতনাথ সেই গ্রামের দিকে। আর কোন শব্দ, খেঁকুরে কাশি, বিদঘুটে হাসি, চিৎকার চেঁচামেচি কিচ্ছু গ্রাহ্য করল না সে। পিছন ফিরে তাকাল না পর্য্যন্ত। নীচু দিকে মাথাটা করে গট গট করে চলতে লাগল সে। লাগল চলতে কোনরকমে দেহটাকে তার বাঁকাদহে ভজনলালদের ঘরে ফেলবার জন্য।

বাড়ীতে যখন এল তাদের রাত তখন কতটা হবে কে জানে। বাবা তার বিমলাকান্তবাবু বসেছিলেন বাড়ী-বারান্দায় বিমর্ষ হয়ে। হঠাৎ রাত্রেবেলায় এমন অসময়ে তার ভিক্ষে ছেলে ভূতনাথকে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলেন তিনি। অবাক হয়ে গেলেন তিনি তার ঘর্মাক্ত কলেবর, ভয়ার্ত চোখ ও ভীতি-বিহ্বল চেহারাটা দেখে। ব্যাপার কি? কোত্থেকে আসছে সে? এমনভাবে হন্তদন্ত হয়ে আসবারই বা কারণ কি তার? ঘটেছে কি কিছু?

সে সব কথার কোন উত্তর দিল না ভূতনাথ। উল্টো বরং জিজ্ঞেস করে উঠল সে তার ভিক্ষা বাবাকে,—ভোজু কোথায়? এইমাত্র মোটর-সাইকেলে ভাটা থেকে এল যে সে বাড়ীতে—গেল সে কোথায়?

বুড়ো অবাক। মুখটার দিকে তাকিয়ে ভূতনাথকে বলে উঠলেন তিনি, —কি বলছো বাবা তুমি। ভোজু আজ প্রায় দু-তিন মাস ঘর ছাড়া। নিরুদ্দেশ সে। কোথায় আছে, কেমন আছে, কি করছে হাজার চেষ্টা করেও আজ পর্য্যন্ত তার কোন হদিশ পাওয়া যায় নি। দু ভাই তার, কাকাও মামারা হন্যে হয়ে চারধার খুঁজছে তাকে। তোমার কাছে যাবার কথাই চিন্তা করছিলাম আমি বসে বসে। ভাবছিলাম কাল বাড়ীতে গিয়ে তোমাদের সন্ধান নিয়ে আসব তার। ভাই-বন্ধু সবই যখন তুমি তখন নিশ্চয়ই জানবে তার সন্ধান। কিন্তু কি বলছো বাবা তুমি? ভোজুকে তুমি আসতে দেখলে ভাটা থেকে মোটর সাইকেলে? গেছলে তুমি ভাটা?

বুড়োর কথায় হতভম্ব হয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগল ভূতনাথ। ভাবল, তার ভাটা যাওয়ার কথা, সেখানে তার ওই সব অলৌকিক—ভৌতিক ব্যাপার অবলোকন করার বিষয় আপাততঃ গোপন থাকাই ভাল। তুইচুপ দিয়ে রইল সে। বলে উঠল বুড়ো,—তুমি বোধ হয় ভুল দেখেছিলে বাবা। ভাটাটা আজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ-হয়ে পড়ে আছে। তচনচ করে দিয়েছে সব পাড়া-পড়শী গাঁয়ের লোকগুলো।

—কেন?

"—কেন আবার, গাঁয়ের লোকের যা স্বভাব।" বেজার মুখে বলে উঠল তার ভিক্ষে বাবা,—কেও যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একটু বড় হয়ে উঠে, করে কম্মে দু-পাঁচ টাকা রোজগার করে খায় ওমনি চোখ টাটিয়ে যায় সকলের। সব ভায়াদি, বুঝলে বাবা—হিংসা, ঈর্ষা, আক্রোশ আর কি। এই জন্যই তো পাড়া-গাঁগুলো সব উচ্ছন্ন যাচ্ছে। অধঃপাতে যাচ্ছে দিনের পর দিন। দেখবে বাবা একদিন এই বাদ-বিষম্বাদেই গ্রামগুলো সব ধ্বংস হয়ে যাবে, লোপাট হয়ে যাবে সব।

—কিন্তু এই বাদ-বিবাদের কারণটা কি? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

'—কারণ ওই একটাই," বলে উঠল বুড়ো,—ভোঁজুর আমার ভাটা করে কাঁচা টাকা রোজগার করা, অবস্থাপন্ন হয়ে উঠা। সহ্য হয় কখনও? তাই লাগল তার পিছনে। কিছুতেই যখন পারল না তাকে দমাতে—কোন দিকেই তখন পিছনে লেলিয়ে দিল তার নামপাড়ার ওই গোপাল ঘোষের মেয়েটাকে। মানে ওই মীনাকে।

—মীনাকে।

বিস্ময় ভরা স্বরটা ভূতনাথের গ্রাহ্য না করে বলেই চলল বুড়ো,—কিন্তু জান তো বাবা তুমি ভোজু আমার কেমন সাচ্চা ছেলে। মিশে আসছো তো তার সঙ্গে ছোট থেকে। খেলেছো-বুলোছো—একসঙ্গে খেয়েছে-শুয়েছো। দেখেছো কি কোনদিন ভোজুকে আমার কারো কখনও কাঁচা আলে পা দিতে? বিশেষ করে মেয়ে-ছেলের উপর ভোজুর আমার কখ্খনও কোন দুর্ব্বলতা ছিল না বাবা।

কথার মাঝে হঠাৎ বলে উঠল ভূতনাথ,—মীনার সঙ্গে ভোজুর কোন ভাব-ভালবাসা ছিল না? ছিল না কোন কথা-বার্তা, যোগাযোগ?

—ওটাই তো গাঁয়ের লোকের চাল বাবা, চক্রান্ত। মিথ্যে-তার সঙ্গে ভোজুর একটা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী রটিয়ে দিয়ে ব্যবসাটাকে তার ডুম করে দেওয়ার মতলব।

বিস্ময়ের মাত্রাটা যেন ক্রমশঃ বাড়তে লাগল ভূতনাথের, —মীনা কখনও যায় নি ভোজুর ভাটায়? মিশেনি তার সঙ্গে? সেবার তিলাবেদ্যার গাজন দেখে ফেরার সময়—

"দশচক্রে ভগবান ভূত হয় আর কোথায় বাবা মানুষ।" থামিয়ে ভূতনাথকে বলে উঠল তার ভিক্ষেবাবা,—ওই সবই তো মিথ্যা তার নামে রটনা, অপবাদ। মাথায় তার ঘোল ঢালার ষড়যন্ত্র।

—কোথায় মীনা? বলে উঠল ভূতনাথ,—আছে তো এই গায়েই? একবার দেখিয়ে দিতে পারেন তাকে? মাত্র দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব তাকে। খুব দরকার।

—সে তো আর বেঁচে নেই বাবা; আজ মাস-তিনেক হল মারা গেছে সে।

মারা গেছে। যেন চমকে উঠল ভূতনাথ। হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুতের ঝট্‌কা লাগল এসে তার মনে। ওমনি চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল তার সদ্য ইট-ভাটায় দেখে আসা সেই সব কথা, দৃশ্য ব্যাপারগুলো। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল সে কৌতূহলী স্বরে,—কোথার মারা গেছে? কেন মারা গেছে? কবে মারা গেছে? কখন মারা গেছে মীনা বলতে পারেন?

ঝড়ের মত তার প্রশ্নগুলো শুনে বিমল বাবু তো অবাক। অবাক্-চোখেই তাকিয়ে তার দিকে বিস্ময়ভরা স্বরে জিজ্ঞেস করে উঠলেন তিনি,—কেন বলতো বাবা?

ভূতনাথের যেন আর ত্বর সয়না,—বলুন তাড়াতাড়ি। এসব জানার বিশেষ দরকার আমার।

বলতে তাই শুরু করল তার ভিক্ষে বাবা। শুনল ভূতনাথ তাঁর যে সব কথা তাতে মিলে গেল তার সদ্য দেখে-আসা ইট-ভাটার সেই ভৌতিক ব্যাপারগুলোর সঙ্গে। মরেছিল মীনা গলায় তার শাড়ীর ফাঁস লাগিয়েই। এবং মরেছিল সে তাদের ওই ইট-ভাটায় থাকা ঘরটার পাশের বট গাছটার একটা ডালে, রাত্রে বেলায়। মরেছিল যেদিন-সেদিন ভোজু ছিল না ইট-ভাটায়। সন্ধ্যা রাতেই সে মোটর সাইকেলে চলে এসেছিল বাড়ী। ঘটনাটা ঘটেছিল মেয়েটার বাইরের একটা সম্বন্ধ পাকা-পাকি হওয়ার পরই। তাতেই নাকি ধারণা করে নেয় লোকে যে মেয়েটার সেখানে বিয়ের মত ছিল না। ইচ্ছে ছিল তার ভোজুকে বিয়ে করার। কারণ তার সঙ্গে তার লটঘট চলছিল অনেক দিন থেকে। কিন্তু ভোজু তাকে করে প্রত্যাখ্যান। তখন মুখর হয়ে উঠে মেয়েটা ভোজুর সঙ্গে তার কেচ্ছা-কাহিনীগুলো প্রচার করতে। অন্য উপায় না দেখে ভোজু তাকে নাকি ভুলিয়ে নিয়ে যায় তার ইট-ভাটায়। এবং মেরে তাকে সেখানে ঝুলিয়ে দেয় ওই বট গাছটার ডালে। যাতে মনে করে সবাই মীনা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

ঝুলন্ত লাশটা দেখে মীনার, ক্ষেপে যায় তার বাপ-কাকা ও দাদারা। উত্তেজিত করে গাঁয়ের লোককে। তেড়ে আসে তার ইট-ভাটায়। সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে সকলে তাণ্ডব-কাণ্ড শুরু করে দেয় ইট-ভাটাটাতে। ভাটার ঘরটা দেয় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে। ইটের হোড় ভাঙ্গে, থাক তছনছ করে। চিমনি দুটো উপড়িয়ে ভেঙ্গে ছিদ্‌ছাতুর করে দয়। মীনার মস্তান-গুণ্ডা কাকা ও মামারা মারতে আসে ভোজুকে ঘরে। ভাগ্যে ভোজু ব্যাপার গোলমাল দেখে কেটে পড়ে তার আগেই। ভগবানের কৃপায় তাই রক্ষে। নইলে ক্ষেপা কুকুরের মত যেভাবে ছোরা-বল্লম উচিয়ে ছুটে এসেছিল তারা তাতে হয়তো মারাত্মক রকমের একটা কিছু খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে যেত। সেই থেকে ভোজু নিরুদ্দেশ। আজ প্রায় তিনমাস হতে চলল সে বেপাত্তা। পোষ্ট-মটামের রিপোর্ট অবশ্য দিয়েছিল ঠিক। মারা হয়নি মীনাকে। মরে ছিল সে গলায় দড়ি দিয়েই। এটা তার আত্মহত্যা। তাতে অবশ্য ঠাণ্ডা হয়ে গেছে গ্রামটা। উত্তেজনারও হয়েছে প্রশমন। কিন্তু ভজু যে কোথায় কে জানে।

শুনল অবশ্য ভূতনাথ সব। কিন্তু সব শুনেও তার মনটা যেন কেমন ঘুরতে লাগল সেই ভাটায় দেখা ভৌতিক কাণ্ডগুলোতে। মরে মীনা ভূত হতে পারে। পারে হয়তো প্রেতাত্মা তার জীবন্ত গলার মত স্বর ফুটিয়ে ওমনিভাবে কথা বলতে। কিন্তু ভোজুর গলা। তার সঙ্গে ভোজুর কথা-বার্তা। এগুলো কি করে সম্ভব। তবে কি ভোজুও নেই এ পৃথিবীতে? সরে গেছে সে জীবন থেকে? গাঁয়ের লোকের ধারনা, তার বাবার মুখের কথা, এমন কি তার নিজের মুখে তাকে ভাটায় বলা মীনার সম্বন্ধে ঘটনাগুলো সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন—বেঁচে থাকা তো দরকার তার। হঠাৎ ভিক্ষেবাবা ভূতনাথের জড়িয়ে ধরল হাত-দুটো। বলে উঠল তাকে আবেগ-ভরা কণ্ঠে,—ভোজুকে আমার দাও না বাবা খুঁজে এনে। মিথ্যে একটা ধারণা নিয়ে চিরকালটা আত্মগোপন করে থাকবে কেন সে। গাঁয়ের লোককে আমি মানিয়ে রেখেছি বাবা। ফিরে এলে সে—কেও কিছু আর বলবে না তাকে। দরকার নেই তার আর ইট-ভাটার। ও গলগ্রহটা গেছে যখন—যাক। চাষ করে সে খাবে ঘরে। আমার মন বলছে বাবা—খুঁজে এনে দিতে পারবে তাকে। নইলে স্মরণ করতেই তোমাকেআসতে না কখনও এসময়। এসব ভবিতব্যের ইঙ্গিত বাবা। যে-যাই বলুক ভোজু আমার মরতে পারে না কখনও—আমার মন বলছে।

বলছে ভূতনাথেরও মন যে ভোজু বেঁচেআছে। কিন্তু আছে সে কোথায়। যেমন করেই হোক খুঁজে বের করতে হবেই তাকে। নইলে জীবনটা তার চিরকাল একটা রহস্যের মধ্যে থেকে যাবে। তার ভাটায় দেখা, অদ্ভুত ভাবে শোনা ওসব ভৌতিক ব্যাপারেরও কোন সমাধান হবে না। আর মীনাকে নিয়ে ভোজুর মুখে, তার বাবার মুখে ও পাড়া-প্রতিবেশী অন্যান্যদের মুখে শোনা কথারও হবে না কখনও সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ।

কথায়-কথায় আলোচনা উঠল বাবলা ডাঙ্গার। সেখানে অবিনাশ বাবুর রোলিং মেশিনের কারখানায় ইট সরবরাহ করত ভোজু। খুব দহরম-মহরমও ছিল তার সঙ্গে। থাকতে পারে ভোজু ওখানে আত্মগোপন করে। একান্ত পরিচিত জন ছাড়া তো অবিনাশ বাবু বলবেন না কাকেও তার কোন কথা। ভূতনাথ সেদিকে পরিচিত তার। সুতরাং সে গেলে হয়তো সেখানে পেতে পারে তার সন্ধান।

তাই ঠিক হল। পরদিনই ভূতনাথ গিয়ে হাজির হল বাবলাডাঙ্গা। অবিনাশবাবুর নির্মীয়মান রোলিং মেশিনের কারখানায়। কিন্তু গিয়ে দেখল যা—তাতে মনে হল তার হতে হতে কারখানাটা কেমন যেন মিয়িয়ে পড়েছে। ঝিমিয়ে পড়েছে আশে-পাশের ঘরদোরগুলো। মেশিনগুলো এধার-ওধার পড়ে আছে মা-বাপ মরা ছেলের মত। অসহায়ভাবে। ফাঁকার মাঝে আলো-বাতাসে পড়ে পড়ে জল খাচ্ছে আর জং ধরছে শুধু। বসানো হয় নি এখনও। যেখানে বিশ-পঁচিশ জন লোক রাতদিন কাজ করত, গম গম করত চৌহদ্দিটা সেখানে মাত্র পাঁচ-ছ'টা লোক। শিবরাত্রির সলতের মত কোন রকমে যেন জাগিয়ে রেখেছে তারা কর্মধারাটাকে। বাকী সব খাঁ-খাঁ। উঠতি মুখে ভোজুর ভাটার মত শ্রীহীন হয়ে পড়ে আছে কারখানাটাও। আগে দেখা এই কর্মক্ষেত্রটার সঙ্গে তার বর্তমান রূপটার কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পেল না ভূতনাথ। ব্যাপার কি?

ব্যাপার জানতে ফটক ঠেলে ভিতরে ঢুকল ভূতনাথ। দেখল ভেতরে চৌহদ্দিটার আরো অসহায় অবস্থা। মাঝে ছিল যে ঝাকড়া মাথাওয়ালা বড় বড় শাখা-প্রশাখা মেলা প্রকাণ্ড বট-গাছটা নেই সেটা। পরিবর্তে সে-জায়গাটাতে তুলা হচ্ছে একটা ঘর। ঘরটার যা আবার অবস্থা—ধ্বংসস্তূপ বললেই হল। নীচ থেকে যেন মস্ত বড় একটা ভূমিকম্প উঠে ছিদ-ছাতুর করে দিয়েছে সব। ভেঙ্গে গেছে দেওয়ালগুলো, ইটগুলো সব এধার-ওধার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে এমনভাবে যেন হঠাৎ রেগে উঠে একটা দৈত্য তচনচ করে দিয়েছে সব। কর্মী একজন নিয়ে গেল ভূতনাথকে বাবুর কাছে। কোণার একটা ঘরে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন অবিনাশবাবু। বিষাদ-বিষন্ন চেহারা তার। চিন্তা-মগ্ন মুখ। ভাবছিলেন তিনি কি—কে জানে। তবে দেখেই ভূতনাথকে যেন আঁৎকে উঠলেন তিনি। আকাশের চাঁদ-পেলেন যেন হাতে,—আরে ভূতনাথবাবু যে। আসুন মশায় আসুন। আজ দিন তিনেক ধরে ভাবছি আমি আপনার কথা। কিন্তু ভজনবাবুও নেই আপনার ঠিকানাও জানি না তাই বসে বসে ভাবা ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পাই নি আমি।

—ভজনবাবু নেই মানে। তাহলে আপনিও জানেন না ভোজু কোথায় আছে। অবাক হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ।

উত্তরে তার বলে উঠলেন অবিনাশ বাবু,—বন্ধুটি যে আপনার এত দুর্ব্বল-চিত্ত, ভীতু আগে তা আমি মোটেই জানতাম না মশায়। কেমন বোকা, আহাম্মক বলুন তো? আমার ভাটায়, পুকুর পাড়ে, বাগানে, মাঠে কোন জায়গায় কোন গাছে যদি কেও গলায় দড়ি দিয়ে মরে—তার দায়ী কি আমি? চলতি ট্রেনে যদি কেও যেচে গিয়ে মাথা দেয়—তাহলে কি ট্রেন কর্তৃপক্ষ দায়ী। থানায় ডাইরি করে একটা কেশ ঠুকে দিলেই হোত। গাঁয়ের লোকের ওসব গুলতানি ঠাণ্ডা হয়ে যেত কবে। তা-না, কাজ কারবার সব ডকে উঠিয়ে মিথ্যে ধারনাটাকে লোকের সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে কোথায় বেকুবের মত। কেমন কাপুরুষ বলুন তো?

"—আপনি তাহলে শুনেছেন সব?" বলে উঠল ভূতনাথ—কিন্তু আপনিও জানেন না, কেও কোন হদিশও পায় না—গেল সে কোথায়।

"—ভীতু যারা, মিথ্যার সামনে সাহস করে সত্যকে নিয়ে দাঁড়াতে পারে না যারা—তাদের এই অবস্থাই হয়।" বলে উঠলেন অবিনাশবাবু, "—ছাড়ুন তো মশায় ওর কথা। এখন আপনাকে যে আমি এখানে কাজ করতে বলেছিলাম সেটা কি করে সম্ভব হবে বলুন।"

কথাটা সেরকম কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে দাঁড়িয়ে রইল ভূতনাথ অবিনাশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে। বলে উঠলেন অবিনাশবাবু,—আসানশোলে আপনি এসব কাজ করতেন জানি আমি। আপনার মত এমনি একজন কাজ জানা লোকের দরকার আমার। তাই সেদিন ভজনবাবুর কথায় আপনাকে এখানে কাজ করতে বলেছিলাম। সেদিন তো পরে ভেবে বলব বলেছিলেন। বলুন এখন কাজ করতে চান কি আপনি আমার এ ফ্যাক্টরীতে?

এযে মেঘ না চাইতেই জল। আশ্চর্য্য। কাজের সন্ধানেই তো ঘর থেকে বেরিয়েছে সে। নির্বাক হয়ে ভাবতেই ভূতনাথ ব্যস্তসমস্ত হয়ে মিনতি করে উঠলেন অবিনাশবাবু,—কাজ শুধু নয় বলেন তো এ কারখানার আমার পার্টনারশীপও দেব আপনাকে। এ কারখানাটাকে আপনি অলৌকিক দুর্বিপাকের হাত থেকে উদ্ধার করুন ভূতনাথবাবু।

অলৌকিক দুর্বিপাক। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ, —ব্যাপার কি?

'—ব্যাপার কি কারখানাটার অবস্থা দেখেও আপনি বুঝতে পারছেন না?" বলে উঠলেন অবিনাশবাবু,— ওখানে একটা বটগাছ ছিল সেটা কেটে মেশিন-ঘরটা করতে যেতেই শুরু হয়েছে যতসব গোলমাল। রাত্রে বেলায় ভূতুড়ে তাণ্ডব, ভূতুড়ে চিংকার চেঁচামেচি, আরম্ভ হয়েছে কারখানাটাতে। রাত্রে দারোয়ান পর্য্যন্ত থাকতে চায় না। সম্প্রতি একজন পশ্চিমা লগদি, বিহারী দারোয়ান ও একটা সেপাইকে রাখা হয়েছে রাত্রে মালগুলো আগলাতে। দিনের বেলাতেও শুরু হয় উপদ্রব। রাজমিস্ত্রীর মাচা ভেঙ্গে দেওয়া, মাল-পত্র উধাও করে দেওয়া, মশলার সঙ্গে মাটি মেশানো, কুলি-কামিনদের ঝুড়ি তাওয়া ইত্যাদি সরঞ্জাম হাওয়া করে দেওয়া— সে একেবারে যাচ্ছে তাই কাণ্ড।

—এর কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন নি? জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ।

—প্রতিকার মানে তো জান-ঘর যাওয়া, ওঝা আনা, গুনিনদের দিয়ে বিচার করানো? সে সবের চূড়ান্ত হয়ে গেছে। বলেছে সবাই এ সবের মূল কারন নাকি বট-গাছটা কেটে দেওয়া। ওই বট-গাছটাতে নাকি কোন প্রেতাত্মার আস্থানা ছিল। কেটে দেওয়ায় গাছটা আশ্রয়হীন হওয়াতেই উৎপাত শুরু করেছে সেটা। যদিও আমি বিশ্বাস করিনি এসব। তবু পাঁচ-জনের কথায় শান্তি-স্বস্ত্যয়ন যাগ-যজ্ঞ, গীতা-পাঠ, চণ্ডী-পাঠ ইত্যাদি সব কিছু করা হয়েছে আমার। কিন্তু দৌরাত্ম্য তাতে বন্ধ হবে কি উৎপাত বেড়েছে অন্য রকমভাবে। মেশিন-ঘরটা কিছুতেই আর সম্পূর্ণ হতে দিচ্ছে না। যত বারই দেওয়াল তুলা হচ্ছে ততবারই আপনা থেকে যাচ্ছে ওটা ফেটে। ভেঙ্গে ছিদ্-ছাতুর হয়ে পড়ে যাচ্ছে এধার ওধার ইটগুলো। অথচ গাঁথনির কোন দোষ নেই, সিমেন্টের কোন গোলমাল নেই, মাল-মসলা সব দেওয়া হচ্ছে যথাযথভাবেই। তাই মনে হয়েছে আমার নিশ্চয়ই এসব কোন কাযাহীনেরই কারসাজি। ভাবতেই এসব আপনার কথা হয়েছে আমার স্মরণ। ভজনলালের মুখে শুনেছি আপনার নাকি মৃতা-স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। আপনার স্ত্রীর আত্মা নাকি পরলোক থেকে নেমে আসেন আপনার কাছে। দেহধারণ করেন, দেখা দেন, কথা বলেন। ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যা কিছু আপনি জিজ্ঞেস করেন সব কিছুর নাকি উত্তর দেন তিনি। বাৎলে দেন আপনাকে নানা সমস্যার সমাধানের পথ। দেন-না ভূতুবাবু এ ব্যাপারে আমার একটু উপকার করে। চিরজীবন ঋণী হয়ে থাকব আপনার।

স্ত্রীর কথা বলতেই ভূতনাথ উঠল যেন চমকে! সত্যিই তো মস্ত ভুল হয়ে গেছে তার। ইট-ভাটায় ওই ভূতুড়ে কাণ্ডটার সময় সে যদি সতীকে করত স্মরণ—তাহলে তো সব কৌতূহলের নিবৃত্তি হত তার। শোনা, দেখা ওইসব অলৌকিকআলেয়াগুলোর তার সত্য হত উদ্ঘাটন। ভূতনাথকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলে উঠলেন অবিনাশবাবু—মেশিন ঘরটাকে হয়তো আমি ঘুরিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু প্ল্যান মোতাবেক হয়ে আসা সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে। এ-স্থান ছেড়ে কারখানাটাকে নিয়ে গিয়ে যে অন্য কোথাও স্থাপন করব তারও আর কোনরূপ সঙ্গতি বা সামর্থ নেই আমার। এটার পিছনে সব খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছি আমি। এতদূর পর্য্যন্ত রূপ দিয়ে কারখানাটাকে যদি আবার ত্যাগ করতে হয়—তাহলে কিন্তু ক্ষতিটা আমার আর সহ্য করতে পারব না আমি ভূতনাথবাবু। মৃত্যু ছাড়া আর আমার গতি, থাকবে না কিছু।

তন্দ্রাবিষ্টের মত দাঁড়িয়ে রইল ভূতনাথ। ভাসা চোখদুটো তার কোন দিকে যে দৃষ্টি ফেলে কি দেখতে লাগল কে জানে। কথাগুলো অবিনাশবাবুর তার কানে যাচ্ছিল কি না-তাও বলা শক্ত। কাকুতি-মিনতি, অনুরোধ-উপরোধের ঝড় বয়িয়ে দিতে লাগলেন অবিনাশবাবু, —আপনি এখানে স্ব-ইচ্ছায় আসেন নি ভূতনাথবাবু। ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন মনে হয় এখানের হোম-যাগ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ফল হিসাবেই। ভগবান তো নিজের হাতে কোন কাজ করেন না। অপরকে হাত দিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ তিনি। আপানার আমার মাধ্যমেই তো তিনি তাঁর কাজ করেন। এখানে তাঁর কাজ করবার জন্যই তিনি আপনাকে এনেছেন। আপনার আসার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি তাঁরই ইঙ্গিত। আমাব বিশ্বাস ভগবান আপনাকে দিয়েই আমার এ সমস্যার সমাধান করবেন। মন বলছে আমার, আপনি ছাড়া এ কাজ আমার কেও সম্পূর্ণ করতে পারবে না।

ভূতনাথ কিন্তু নির্বাক। এত তোবামোদ খোসামোদের মধ্যেও দাঁড়িয়ে রইল সে নিশ্চুপ, নিশ্চল হয়ে। মাটিতে পোঁতা কাঠের একটা পুতুলের মত। ভাবতে লাগল যে কি—কিই বা করতে লাগল সে চিন্তা তা সেই জানে।

(সতের)

"বাবলা ডাঙ্গার রাত

ভূতের বাড়ে বাত—" কথাটা একটা প্রবাদে পরিণত হয়ে গেছল এ অঞ্চলে। হবে নাই বা কেন—এসে থেকে এ জায়গাটা সম্বন্ধে নানা জনের মুখে এমন সব কথা শুনতে লাগল ভূতনাথ যাতে ওই রকম একটা ধারনা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে উক্ত প্রবাদটা যে নিছক একটা এ অঞ্চলের কথার কথাই নয় প্রমাণটা তার অবলোকন করতে লাগল ভূতনাথ ডাঙ্গার শেষে দূর-দিগন্তে সূর্য্যিমামা অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গেই। আশ-পাশ চৌহদ্দিটা পাটে বসতেই সূর্য্যঠাকুর হয়ে আসছিল ক্রমশঃ জন বিরল। ও পাশের হাটা-পথটায় লোক চলাচল হয়ে আসছিল বন্ধ। ডুবতেই সূর্য্য অদূরের গাড়ীর আঁট বা সড়ক রাস্তাটা পর্য্যন্ত হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ ফাঁকা—জনশূন্য। তারপর সন্ধ্যা নামতেই দূর নিকটের পাথরমুড়ি, পলাস ডাঙ্গা, গদার ডিহি, খয়রা শোল, কুমার খুলি ইত্যাদি গ্রামগুলো ডাঙ্গাটাকে করে দিল একা। সেই বিক্ত ডাঙ্গার মাঝে অবিনাশবাবুর কারখানাটাকে দেখাতে লাগল একটা সৃষ্টিছাড়া দ্বীপের মত। সঙ্গ ছাড়া সেই দ্বীপটা রাত নামতেই চার পাশের শূন্যতাটাকে আকঁড়ে ধরে করতে লাগল খাঁ-খাঁ অর্থাৎ নিশীথ-নীরব নির্জনতার ঘর-চৌহদ্দি সমেত কারখানা করতে লাগল ঝম-ঝম, থম-থম।

নিজের ইচ্ছাতে রাত্রে এখানে থাকতে চাইলেও ভূতনাথ, অবিনাশবাবু তাকে একা থাকতে দেননি। ফটকের এপাশের ঘরটায় একা সে থাকলেও ও পাশের ঘরটায় ছিল লাল বাহাদুর, রাম সিং, ভীম চাঁদ অর্থাৎ কারখানার লগ্দী সেপাই দারোয়ানটা। এসেছিল ভূতনাথ এখানে কাজের সন্ধানে। কাজ চাই তার। যেমন করেই হোক, যেভাবেই হোক একটা কাজ তার চাই-ই চাই। নইলে মুখ দেখাবে কি করে সে মায়ার কাছে। রাগ দেখিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফিরে গিয়ে আবার দেখাবে সে মায়াকে তার নিষ্কর্মা মুখটা, কখ্খনও না—কিছুতেই না। ছুঁচো মুখটা বুচো হয়ে যাবে না তার?

কিন্তু কাজ তো এখানে নির্ভর করছে তার কারখানাটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠার উপর। ওই কাটা বটগাছটার গোড়ায় মেশিন ঘরটা তৈরী হয়ে গেলেই বসানো হবে সেখানে মেশিনটা। সে মেশিনে অপারেটারের কাজ করবে ভূতনাথ। পারমানেন্ট সার্ভিস। কিন্তু গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিয়ে বসে থাকলে হবে কি? বসবে মেশিন কোথায়? মেশিন ঘরটাই নাকি উঠতে দিচ্ছে না অদৃশ্য এক অলৌকিকবাধা। উঠতেই দেওয়াল ভেঙ্গে যাচ্ছে ভিত, ফেটে যাচ্ছে গাঁথনি। বলছে সবাই এসব নাকি ভূতুড়ে কাণ্ড। কারণ ভৌতিক নানা শব্দও নাকি শুনতে পাওয়া যায় এ কারখানাটার পূব-পাশে। সত্যিই এসব ভৌতিককাণ্ড কিনা—তার রহস্য নাকি উদঘাটন করতে হবে ভূতনাথকে। কারণ ভূতনাথের সম্বন্ধে তার বন্ধু ভজহরির মুখে শুনেছে যে সমস্ত কথা তাতে দৃঢ় বিশ্বাস অবিনাশবাবুর যে সত্যি যদি ভৌতিক ব্যাপার হয় তবে ভূতনাথবাবু তার মৃতা স্ত্রীর আত্মায় চেষ্টায় পারবে এ সবের সমাধান করতে।

কিন্তু এর পিছনে চোর-ছেঁচড়রের কারচুপি বা দুষ্ট-নষ্ট লোকের দুরভিসন্ধিও তো থাকতে পারে। পারে থাকতে কোন বদমাশ বা বাটপাড় লোকের কুমতলব। ভূত-ভেল্কি দেখিয়ে তারা কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করছে। লুকিয়ে এসব কাণ্ড করে ভূতের নামে তুলছে ধোয়া। অদৃশ্যে থেকে নানা ভৌতিক শব্দ তুলে সেপাই-দারোয়ানদের হটিয়ে গোপনে হাতাবার চেষ্টা করছে নানা মেশিন-পত্রের পার্টস, টুট্কা-টুট্কি জিনিস। মেশিন ঘরটা না উঠতে দেওয়ার পিছনে কোন ধান্দাবাজ লোকের বজ্জাতিও থাকতে পারে। পরোক্ষভাবে এখান থেকে উৎখাত করে অবিনাশবাবুকে, হয়তো কব্জা করার ধান্দা করছে জায়গাটাকে। ভূত-প্রেতের ভয়ে আসবে না কোন ছুতোর মিস্ত্রি, করবে না কুলি-কামিন কাজ, চাইবে না থাকতে সেপাই-দারোয়ানগুলোও এখানে। বে-দখল করবার জায়গাটাকে হতে পারে ফন্দিবাজ লোকের এসব অদ্ভুত প্ল্যান। ভূত-বাস্তব, লৌকিক-অলৌকিক, সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন-দেখতে হবে ব্যাপারগুলো কি, বুঝতে হবে এর পিছনে সত্যিই কোন অদৃশ্য হস্ত বা দৃশ্যের কোন কারচুপি আছে কি না।

কারখানাটার ফটকের ডান পাশে একুড়ে ঘরটাতে একা বসে ভাবছিল ভূতনাথ ওই সমস্ত কথা। ফটকটার বাম পাশের কুটরীটাতে ছিল লাল বাহাদুর ভীম-চাঁদ ও রাম সিং। অবিনাশবাবুর সেপাই, দারোয়ান ও লগ্দী

ইত্যাদি। দম দিচ্ছিল তারা গাঁজায়—না পান করছিল তারা সিদ্ধি—না মোজে ছিল সব ভাঙ্-আফিঙে কে জানে। তবে কণ্ঠ-নিসৃত তাদের তুলসীদাসী রামায়ণের সুর শোনা যাচ্ছিল বেশ চমৎকার ভাবে। হাঁকছিল কেও "সোরঠা" ছন্দে,—

বন্দো পবনকুমার,
জ্ঞান ঘনযাসু হৃদয় আগার
বসহি রামশরচাপ ধর।।

গাইছিল চৌপাই,—"বন্দো রামনাম রঘুবরকে
হেতু কৃষানুভানু হিমকরকে।।"

কেও বা আবার সুর তুলছিল দোঁহায়,—রামানম মনিদীপ.ধর
"রামনাম মনিদীপধর জীহদেহরিদ্বার।
তুলসী ভিতর বাহির হুঁ যো চাহদি উজিয়ার।।

ভয়ে না ভক্তিতে কে জানে প্রতি চৌপাই বা পায়রের শেষছন্দের সঙ্গে মিল রেখে তারা সমস্বরে উঠছিল একবার করে চিৎকার করে "—বোলো সীয়াবর রামচন্দ্র কি জয়।" "বোলো প্রেমসে ভাই—দশরথ নন্দন শ্রীরামচন্দ্র কী-জয়।" বড়ছিল যতই রাত ততই বোধ হয় এ ধূয়ার সুরটা উঠছিল তাদের চড়ে। উদারা থেকে মুদারায়—মুদারা থেকে তারা-পঞ্চমে। শুনতে বেশ লাগছিল ভূতনাথের। তবু কান রেখেছিল সে খাঁড়া, চোখ রেখেছিল সে সচেতন। মনকে রেখেছিল সদা-জাগ্রত, তৈরী অবস্থায়।

অবিনাশবাবুর চলে যাবার পর থেকেই জায়গাটার দিকে বিশেষভাবে নজর রেখে চলছিল ভূতনাথ। সূর্য্যডোবার পর থেকে অন্ধকারের চৌহদ্দিটার কোন্ খানটার কেমন রূপ হয় দেখবার জন্য চোখদুটোতে সে রেখেছিল শ্যেন-দৃষ্টি। অবিনাশবাবুর আদেশ ছিল সেপাই-দারোয়ানগুলোর উপর, যেন বলা মাত্রই ভূতনাথ তার কাছে তারা চট্ জলদি হাজির হয়। আসলে ভূতকে তো মানুষের ভয় নেই, ভয় যত মানুষকেই। চোর-ডাকাতকখন কি রূপ নিয়ে কোন ভাবে যে আসবে বলা শক্ত। ভজনলালের ইট-ভাটার ডাঙ্গার রাতটার চেয়ে এ ডাঙ্গাটার রাতটার প্রকৃতিটা ছিল ভিন্ন রকমের। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিকের গন্ধেশরী নদীর দক্ষিণ পাশের সতীঘাটার শ্মশানটা ধরেছিল ভয়ঙ্কররূপ। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীপাড়ের ঝাপ-ঝোপে গাছপালাগুলো যেন হয়ে উঠেছিল এক একটা দৈত্য, কবন্ধ, পিশাচ। এধার-ওধার ভুঁড় শেয়ালের ডাক, খেঁক-শেয়ালের খেঁকসানি, মড়া-খেকো হায়না-হেঁড়োলের ঘোঁৎ-ঘোঁতানি, হুক-হুকানি আওয়াজ। সবে মিলে পরিবেশটাকে করছিল ক্রমশঃ ভয়াল-ভয়ঙ্কর ভীতি-জনক ও রহস্যময়।

ভাবছিল বসে ভূতনাথ ইট-ভাটার সেই বটগাছটার ডালে দেখা ঝুলন্ত সেই প্রেতাত্মাটার কথা। এখানেও যদি তেমনি একটা কিছু দেখে সে তাহলে কি করবে।? ডাকবে কি সে তার মৃতা স্ত্রী-সতীকে। কিন্তু নিষেধ করে গেছে সে বার বার যখন তখন যেন না স্মরণ করে সে তাকে। দরকারও নেই তাকে তার আবাহন করার। কারণ মনের সঙ্গে তার নাকি সতীর মনের যোগ। এ যোগে তার চেয়েও তার প্রয়োজনের কথা বেশী বুঝে সে। সুতরাং জানছে যখন সে ভূতনাথের কাছে তার হাজির হওয়ার প্রয়োজন তখন না ডাকলেও আপনা থেকে সে হাজির হবে তার কাছে। তাই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে ভাবছিল বসে সতীর কথা।

হঠাৎ ভাবনায় ছেদ পড়ল তার। পূব পাশের কারখানার ছোট-ছোট ঘরগুলো থেকে এল একটা এমন শব্দ মনে হল যেন কে কতকগুলো কাঁসার থালা-ঘটি গ্লাস-বাটি উপর থেকে আচমকা ঝন্-ঝন্ করে দিল ফেলে। তারপরই কিন্তু আবার সব চুপচাপ। পরক্ষণেই আবার মনে হল ভূতনাথের কে যেন কতকগুলো জিনিস "হড়-হড়" করে নিয়ে যাচ্ছে ঝাড়ীর বাইরে আবার "দড়-দড়-" করে টেনে আনছে ঘরের ভিতর। উঠল ভূতনাথ। গেল সেদিকে। কিন্তু কোথায় বা কি। সব সুম-সাম। একি। এটা কি তার শ্রুতি বিভ্রম। না মনের বিকার। হলে-হতেও পারে। পিছন ফিরল ভূতনাথ। ওমনি আচমকা ঝন্-ঝন্-ঝন-ঝন্ ঝনাৎ শব্দ। ত্বরিতে ভূতনাথ গেল সেই শব্দটাকে অনুসরণ করে। কিন্তু কৈ—কোথাও তো কিছু নেই। নিস্তব্ধ নিঝুম সব। ফাঁকা-শূন্য স্থান। তবে?

যাক গে। পিছন ফিরল ভূতনাথ। কিন্তু যেই কয়েক পা এগিয়েছে সে ওমনি আবার কানে এল তার ওপাশের ঘরটা থেকে "সর-র-র ঘড়-র-র-র" শব্দ। কে বা কারা যে কিছু টানাটানি করে সরাচ্ছে। করছে হুট-হাট ঠুং-ঠাং শব্দ। তাহলে কি চোর ঢুকেছে ওঘরে। ডাকবে রাম সিং, ভীম-চাঁদ বা লাল বাহাদুরকে? না, আগে দেখা দরকার। শোনার ভুলে যদি আবার সব ফাঁকা হয়ে যায় তবে তো সে খেলো হয়ে যাবে তাদের কাছে। চুপি সাড়ে গেল ভূতনাথ সে ঘরটাতে। কিন্তু গিয়ে সে ঘরে আশ্চর্য্য হয়ে গেল সে! যেখানের যা জিনিস সেখানেই সব ঠিক ঠাক আছে। সরাসরি টানা-টানি তো দূরের কথা সে সবের কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই কোথাও। আচ্ছা মুস্কিল তো! একি ফ্যাসাদে পড়ল সে! চিন্তা করতে করতে ভূতনাথ ফিরে এল নিজের ঘরটাতে। বিছানার উপর বসে ভাবতে লাগল সে।

হঠাৎ শুরু হল কতকগুলো অদ্ভুত শব্দ—দুপ্-দাপ, দুম্-দাম, হুট-পাট, ঠুং-ঠাং, ঝড়-ঝড়, হড়-হড়, গড়-গড়, টুং-টুং। এবার একজায়গায় নয়-বিভিন্ন জায়গায়। এঘরে-ওঘরে, এপাশে-ওপাশে। কারা যেন বিভিন্ন জিনিস-পত্র এধার-ওধার ছুঁড়াছুঁড়ি করছে—করছে লুফালুফি, ফেলাফেলি। শব্দগুলো মনে হয় ভীম চাঁদ, লাল বাহাদুরদেরও কানে গেছে—নইলে তাদের রামায়ণ পড়া বন্ধ হবে কেন। কেন তারা হঠাৎ চুপ হয়ে গেল এমন করে? প্রথমে ভাবল ভূতনাথ—হচ্ছে যত হোক শব্দ, গ্রাহ্য করবে না সে। কিন্তু শব্দগুলোর তীব্রতা, গতি উত্তরোত্তর এমন উঠেত লাগল বেড়ে যে ঘরে টেকা দায় হল ভূতনাথের। লাল বাহাদুর ভীম চাঁদদের চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে বাইরে বেরিয়ে এল সে। হঠাৎ একটা বিশ্রী, উৎকট, তীব্র ভ্যাপসা দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগল তার ভক্ করে। এগোবে কি সে দুর্গন্ধে টেকাই যেন দায় হল তার। নিশ্চয়ই কোনো মরা গরু-মোষের পঁচা মাথা বা গলা নাড়ী-ভুঁড়ি বা ঠেং শেয়াল-কুকুরে ভাগাড় থেকে টেনে এনে ফেলেছে তার ঘরের কাছে।

ভাবতেই ওমনি তার কানে এল শেয়াল-কুকুরের সমস্বরে চিৎকার হুক্কা হুয়া কাহু কাহু—ঘেও-ঘেও ভ্যাক ভ্যাক, কাঁট কাঁট খেঁক-খেঁক। নিশ্চয়ই এগুলো পাগলা কুকুর কিংবা ক্ষেপা শেয়াল। নইলে ডাকগুলো এমন এদের বিশ্রী খেঁকুরে বা উদ্ভট হবে কেন। মনে একটু ভয় হল ভূতনাথের। ওমনি এক দমকা বাতাস মানুষ পঁচার এমন একটা উৎকট গন্ধ ঠেলে ঢুকিয়ে দিল ভূতনাথের নাকে যে গা-টা উঠল তার বমি বমি করে। আর ওমনি ফটকের পাশের ঘরটা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল লালবাহাদুর ভীম চাঁদের দল। চোখে মুখে আতঙ্ক তাদের! স্বরে ভয়ের ছাপ। কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগল তারা,—তুরন্ত হিঁয়াসে ভাগ যানে হোগা বাবু। জলদি সে জলদি হাম সবকো নিকাল যানে হোগা হিঁয়াসে।

"—কিঁউ?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ,—ভাগ যানে কা কেয়া জরুরৎ হে?

"—শুনতা নাহি জিন কা চিৎকার প্রেতকা আওয়াজ?" ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল ভীম চাঁদ।

"—কিন্তু ওগুলো তো শেয়াল-কুকুরের ডাক।" বলতেই ওমনি বাধা দিয়ে আধাবাংলা আধা-হিন্দী ভাষায় বলে উঠল রামসিং—ওহি সব শেয়াল-কুত্তা ই আছে বাবু। ওহি সব আওয়াজ ভি শেয়াল কুত্তেকো নাহি আছে। ওহি তো জিনকা আওয়াজ আছে বাবু, ভূতকা চিল্লাহট।

"—মানে?" জিজ্ঞেস করতেই ভয়-কাঁপা চাবা গলায় সংক্ষেপে বলতে লাগল লাল বাহাদুর যে ওই সমস্ত শেয়ালগুলো আসলে নাকি শেয়াল নয়, শ্মশানের ভূত। আর ওই কুকুরগুলো হল কবরের প্রেত। দিনের বেলায় থাকে সব ওমনি শেয়াল-কুকুর হয়ে শ্মশানের ঝোপে ঝাড়ে ও কবরের গর্তে! রাত হতেই ওরূপ ত্যাগ করে তারা ধরে যে যার সব প্রেত-পেতনী ভূত-ভূতনীর মূর্ত্তি। ছুটে আসে নদীর শ্মশান ও কবরের গাড়-গর্ত্ত থেকে কারখানার এই জায়গাটাতে। কারণ এটা নাকি ওদের আদি বাসস্থান। অতীতে ওই কারখানাটার অর্দ্ধেকটা ছিল শ্মশান আর অর্দ্ধেকটা ছিল মড়া ফেলা ও কবরখানার জায়গা। তাদের এ স্থানটার উপর কারখানা উঠতেই নাকি ক্ষেপে গেছে তারা। রেগে আছে কারখানার সব লোক জনের উপর। সেই রাগটা দিনের বেলায় ঝাড়তে পারে না বলেই ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ছুটে আসে সব রাত্রে বেলায়। দৌরাত্মি করে সমস্ত রাত ধরে ওই কারখানাটার মাঝে। শ্মশানের হিন্দু ভূতগুলো বাবুর যাগযজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন মেনে কতকটা ঠাণ্ডা হয়ে থাকলেও কবরের মুসলমান ভূতগুলো তা মানবে কেন? তাই নাকি ভাঙছে তারা ওখানের মেশিন ঘরের ভিত, মাল-ঘরের দেওয়াল। তচনচ করছে কল-কারখানার সব লৌহা-লক্কড় মেশিন-পত্র। উপরে ঘর উঠতেই কবরে চাপ

পড়ছে জিন-প্রেতগুলোর। তাই রুখে উঠেছে তারা। তাদের জায়গায় মানুষের কোন দখল-দারী সহ্য করবে না তারা। উঠতে দেবে না কল-কারখানা, থাকতে দেবে না এখানে কোন জীবন্ত মানুষকে। এ জায়গা তাদের সুতরাং তারাই এখানে রাজত্ব করবে চিরকাল।

ব্যাপারটা যে ভৌতিক তা ওই সমস্ত অদ্ভুত অলৌকিক শব্দগুলোর প্রকৃতি দেখেই আঁচ করতে পেরেছিল ভূতনাথ। কিন্তু ভীমচাঁদের ওই সব ধারনার সঙ্গে নিজেকে সামিল করতে পারল না সে। তাদের ওই সমস্ত উদ্ভট চিন্তা ও অদ্ভুত বিশ্বাসকে আমল না দিয়ে বুঝিয়ে বলতে গেল ভূতনাথ,—যাই হোক, ব্যাপারটা যে কি কাছে গিয়ে নিজের চোখে তো একবার দেখাও দরকার। ভূত-জিন না হয়ে ওসব তো চোর-ডাকাতের ফন্দি-ফিকিরও হতে পারে।

"—বিলকুল ঝুট বাবুজী।" ঘোর আপত্তি করে বলে উঠল লাল বাহাদুর,—হাপনার কথা ঠিক নাই আছে। চোর ডাকু কভি শেয়াল কুত্তেকো মাফিক আওয়াজ করিয়ে পহেচোন দিয়ে আসবে না। ইখানে ঘর ভাঙ্গি য়ে উনলোকের কি ফায়দা আছে? লৌহা-লক্কড় তো রূপায়-পৈসা নাই আছে বাবুজী যে লুট করিতে আসিবে। ওহি সব সাচ ভূত-প্রেত আছে।

ভীম চাঁদ তার সঙ্গে যোগ দিল ওই বিশ্রী ভ্যাপসা পঁচা দুর্গন্ধটার কথা তুলে। তার বক্তব্য হল ওই দুর্গন্ধ চোর-ডাকাতের নিশ্চয়ই গায়ের গন্ধ নয়। আর শেয়াল-কুকুর কখনও বেড় চৌহদ্দি-বাড়ীর ভিতর মরা গরু-মোষের পা-মাথা টেনে এনে খায় না। ওটা হল কবরে পঁচা প্রেতাত্মাদের গায়ের গন্ধ, ফেলে দেওয়া বে-ওয়ারিশ মড়াগুলো ভূতপ্রেত হলে ওমনি তাদের পঁচা-গলা দুর্গন্ধ যুক্ত হয়।

জের টেনে তাদের কথায় বলে উঠল রাম সিংও,—আপনা জান খতরামে ডালনেকা কৌশিস মৎ করিয়ে বাবুজী। ইহা, জীন-ভূত কিসীকা দিললাগী কা পাত্র নাই আছে। তুরন্ত হিঁয়াসে ভাগ যানে হোগা। চলিয়ে জলদি হমারা সাথ।

কিন্তু ভেগে যাবে কি সে! তারাই বা এখান ছেড়ে চলে যাবে কেন? রাত্রে এসব কল-কারখানা, মেশিন-পত্র আগলে রাখার জন্যই তো তাদের মোতায়েন করা। ফেলে এসব চলে গেলে অবিনাশবাবুর সঙ্গে বেইমান করা হবে না? এটা অন্যায়। এ নিমকহারামী ভূতনাথ কিছুতেই করতে পারবে না তাদের সঙ্গে।

সেপাই-দারোয়ানরা এক যোগে কত বুঝাতে লাগল ভূতনাথকে যে এটা বেইমানী নয়। ভূত-প্রেতের চক্করে ফেসে গিয়ে তারা একাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া আজ বলে নয়, প্রায় দিনেই তারা রাত্রে বেলায় নাকি কারখানা ছেড়ে পালায়। কারণ যে ভূত তাদের "রাম-নাম" মানে না, যে প্রেত তাদের রামায়ণ পাঠের সময়ও ওমনি দুমদাম শব্দ করে আসে সে সব নাকি সামান্য জল-পড়া বা সরষে পড়ার ভূত নয়। হয় মামদো কিংবা কালজঙঘা বা কবন্ধ তারা। মারাত্মক হিংসুটে, ভয়ানক প্রকৃতির প্রেতাত্মা এরা। পেটের দায়ে কাজ করতে এসেছে তারা, এখানে ভূতের হাতে জান দিতে তো আসেনি। ছা-পোষা মানুষ তারা অর্থাৎ স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করতে হয়। এখানে যদি ভূতের হাতে বেঘোরে প্রাণটা যায় তাদের তবে পথে বসবে তাদের সংসার। ছেলেপিলেগুলোও না খেয়ে যাবে মারা। সুতরাং বাঁচতে যেমন হবেই তাদের তেমনি বজায় রাখতে হবে কাজও। শ্যাম-কুল দুই বজায় রাখার জন্য তারা নাকি প্রতিদিনই কারখানার গেটে তালা লাগিয়ে দিয়ে পালায়। রাত কাটায় অদূর-গ্রামের কোন চণ্ডী-মণ্ডপে বা মনসা মেলায়। সব দিন এক জায়গায় থাকে না তারা। কোন রাতে যায় পাথর মুড়ির শিব-মন্দিরে কোন দিন বা গদার ডিহির দুগ্গার থানে। রাত বাড়লেই যেমন যায় গোপনে, রাত থাকতেই তেমনি কারখানায় ফিরে আসে গোপনে। সকলের চোখের আড়ালেই নিত্য তাদের হয় এমনি যাওয়া আসা। বাবুও বুঝতে পারে না—অন্য লোকেও জানতে পারে না। আসল কথা হল ভূতনাথকেও তাদের সঙ্গী হতে হবে। কাজ করতে হলে এখানে বাবুর চোখে ধূলো দিয়ে এমনিভাবেই থাকতে হবে তাদের সঙ্গে।

অসম্ভব। এভাবে ডিউটিতে অবহেলা করতে পারবে না ভূতনাথ। তাছাড়া সত্যটা যেদিন প্রকাশ হবে সেদিন সে মুখ দেখাবে অবিনাশবাবুর কাছে কি ভাবে? এভাবে জোচ্চুরি দাগাবাজি করে মিথ্যার আশ্রয়ে থাকতে পারবে না সে। দিতে সে পারবে না কিছুতেই অবিনাশবাবুকে ফাঁকি। ঘাবড়ে গেল ভীম-চাঁদ, রাম সিং-

এর দল। লোকটা যে এমন বেয়াড়া হবে ভাবতে পারেনি তারা। তাই একটু চিন্তায় পড়ল তারা। এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল গম্ভীরভাবে। চোখের ইসারায় ইঙ্গিতে তাদের কি যে কথা হল পরস্পর কে জানে। বেয়াড়া বাবুটাকে তাদের দলে ভেড়াবার জন্য ধরল তারা রুদ্রমূর্ত্তি। কারণ কাজে ফাঁকি দেওয়া কথাটা প্রকাশ করে দিয়ে হয়েছে এখন তাদের সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থা। জানিয়ে দিলে এসব মালিকে তাদের দূর করে দেবে কাজ থেকে। ফাঁকি দেওয়ার চরিত্রটা তাদের জানাজানি হয়ে গেলে আর কোথাও জুটবে না চাকরী। এখন একমাত্র উপায় তাদের মত ভূতনাথকেও সাদা আদমী থেকে কালা আদমীতে পরিণত করা। এক বাঁনরের মুখ পুড়লে সব বানরেরই মুখ পুড়িয়ে দিতে হয়। এই নিয়ম। তাই রামসিং ও ভীম চাঁদ তাকে আপনি-আজ্ঞা বুঝা-বুঝি ছেড়ে দিয়ে দু- পাশে দুজন ধরল তার দুটো হাত, শক্ত করে। ধমকে বলে উঠল তাকে, —এ শালা লোক, ওহি সব ফালতু বাত ছাড়িয়ে দে। তোকে আলবৎ যাইতে হোবে হামাদের সাথে।

"—যদি না যাই।" বলতেই ভূতনাথ ধমকে উঠল তাকে রাম সিং—তোর বাপ যাইবে। না যাইলে হামরা তোকে মারিয়ে ফেলিয়ে দিয়ে পালাইয়ে যাবে। সবেরে রটাইয়া দিবে যে রাত মে জিন-ভূত তোকে মারিয়ে দিয়েছে।

আশ্চর্য্য লোকগুলোর ব্যবহার। এইমাত্র দেখল যাদের ভয়-কাতর চেহারা, যাদের অসহায়, করুনার পাত্র বলে মনে হয়েছিল ভূতনাথের তারা এমন বদ-মেজাজী রুক্ষ স্বভাবের রূঢ় আচরণের হল কি করে। ভাবতেই হঠাৎ কারখানাটার পূব পাশ থেকে এল একটা হুড়-মুড় দুদ্দাড় শব্দ। আচমকা যেন ছাদশুদ্ধো মস্ত বড় একটা বাড়ী ভেঙ্গে পড়ল। ব্যাস্-আর যায় কোথায়। ভূতনাথকে আর কোন কিছু ভাবতে দেখতে না দিয়েই তারা হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চলল তাকে ওর এক পলভি হিঁয়া রহনা ঠিক নাহি হে।' শুধু একথা ছাড়া আর কোন কিছু বেরুল না তাদের মুখ থেকে।

বাপরে বাপ্-কি হেঁচকা টান তাদের। স্রোতের মুখে পড়লে কুটো যেমন আপনি ভেসে যায় তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন ধার ধারে না—ভূতনাথের অবস্থা হল তেমনি। তাদের হিড়-হিড়ানি টানের চোটে কোন দিকে যে সে ভেসে চলল কোন কিছু-ঠিক-ঠাহর করতে পারল না সে। বাধা দেওয়া তো দূরের কথা তাদের পালোয়ানি জোরের তোড়ে এধার-ওধার কোনো ধারেই একটু চোখ মেলে দেখতে পেল না সে। পড়ি-মরি করে তাকে নিয়ে এসে তারা হাজির হল ডাঙ্গার মাঝে কতকগুলো বড় গাছের জটলা করা জায়গায়। জোরে জোরে শ্বাস টেনে দম নিতে লাগল তারা ভূতনাথকে ছেড়ে।

হঠাৎ তারা ঝাপ-ঝোপে গাছগুলোর তলায় কি দেখল কে জানে। আচমকা চিৎকার করে উঠেই তারা "রাম-রাম, সীয়া-রাম" বলে মেরে দিল তেফেড়েঙ্গা দৌড়। দৌড় তো দৌড়-"চাচা আপন প্রাণ বাঁচা" গোছের পলায়নটা তাদের। টেনে আনল যাকে সেই ভূতনাথের দিকে একটুকু ভ্রূক্ষেপ করারও সময় পেল না তারা। অন্ধকারের বুক চিরে মুহূর্তে কোথায় যে তারা উধাও হয়ে গেল—কে জানে।

ভূতনাথ তো থ, হতভম্ব। তারা দেখলই বা কি আর এমনভাবে তাকে এখানে একলা ছেড়ে পালিয়েই বা গেল কেন হঠাৎ কিচ্ছু বুঝতে পারল না ভূতনাথ। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঝমঝমে রাতে থমথমে প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়ে রইল সে। অন্ধকারের মাঝে দৃষ্টিটাকে তার তীক্ষ্ণ করে দেখল ভূতনাথ যে যে-জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে সে সেটা হল পাথর মুড়ির ভৈরব-থান। গ্রামের প্রায় শেষ মাথাতেই অবস্থিত এটা। অবিনাশবাবুর কারখানা এ জায়গাটা থেকে কিন্তু বেশী দূরে নয়। থানটার গাছগুলোও তার জানা—নিম, কুচলা আঁকড়, বাবলা। আশ-পাশ ছেড়ে অন্ধকারটা এখানে এসে গাছগুলোর সব ডাল-পালাতে আশ্রয় নিয়েছে বেশ জমাট রূপে। নীচটাকেও তারা করে রেখেছে বেশ ঘোরালো। তেল-সিন্দুর মাখা বাবা ভৈরব রাজের মূর্ত্তি অর্থাৎ পোড়া-মাটির ভাঙ্গা হাতী-ঘোড়াগুলোকে দেখা তো দূরের কথা, স্থানটার উঁচু মাটির বেদীটা পর্য্যন্ত সেরকম পড়ছিল না ভূতনাথের চোখে। সে না পড়ুক কিন্তু লোকগুলো এমন আচমকা হঠাৎ চিৎকার করে পালাল কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল ভূতনাথ। ভাবতে ভাবতে নিজের প্রতি নিজেই বড় আশ্চর্য্য হল ভূতনাথ। ভূত-ভূতুড়ে অদ্ভুতুড়ে এত যে সব কাণ্ড-একলা রাতে ডাঙ্গার মাঝে অন্ধকারের বুকে এই যে ভীতি-জনক স্থানটাতে তার দাঁড়িয়ে থাকা—মনে কিন্তু এতটুকু ভয় জাগছিল না তার। ভুলেও অন্তরে আতঙ্কের এতটুকু দানা পর্য্যন্ত বাঁধছিল না তার।

যাক গে ওসব। অথ কিম। কি করা যায় এখন। ভীম বাহাদুর-রাম সিং-এর মত পালিয়ে যাবে? না। এতবড় অকৃতজ্ঞ হতে পারবে না সে। এভাবে কাপুরুষতার কাজ করে নিজের পুরুষত্বটাকে অবমাননা করতে পারবে না সে কিছুতেই--কোনোমতেই। তাহলে? ফিরে যাবে সে অবিনাশবাবুর কারখানায়। যদি ওই শব্দগুলো কোন দুষ্ট-নষ্ট শয়তানের হয়। হয় যদি তারা চোরগুণ্ডা বদমাশ! লড়বে সে তাদের সঙ্গে। একা? হোক একা। জীবনটাকে সে বেইমানীর কলঙ্কে তবু কলঙ্কিত হতে দেবে না। তাছাড়া ওগুলো কোন অদৃশ্য শক্তির খেলাও তো হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে রাম-বাহাদুররা এখানে পড়ে আছে—তাদের কথা মিথ্যা হয়ত না হতে পারে। পারে হতে ওসব দুম-ধড়ক্কা কাণ্ডগুলো কোন ভূত-প্রেতের। সত্যি হয়তো ওসব কোনো কালজঙঘা-মামদো, কবন্ধ-ভূতের কেরামতি। অত্যন্ত হিংসুটে প্রকৃতির প্রেতাত্মা ওরা। মারাত্মক নিষ্ঠুর! তাদের কীর্ত্তির মাঝে একলা ঢুকে সে জীবনটাকে করতে যাবে বিপন্ন। কিন্তু তবু উপায় নেই ভূতনাথের। বিবেকের যেমন খোঁচা তার অন্তরে, কিছুতেই থাকতে দেবে না বোধ হয় তাকে ভীতু একটা কাপুরুষের মত।

মুখ ফেরাল ভূতনাথ। ভৈরব থানটাকে পিছনে রেখে অবিনাশবাবুর কারখানার দিকে লক্ষ্য করল স্থির। হঠাৎ মনের মাঝে উদয় হল তার সতীর কথা। সত্যি যদি জীবন বিপন্ন হয় তার তবে সতী আছে। আছে তার দেওয়া কথা—ভূতনাথের চেয়েও তার ভূতুদার প্রয়োজন বেশী বুঝে সে।

অতএব চিন্তা কি তার? বিপদ-আপদ তার সে বুঝবে। তার সতীর চেয়ে ভূত-প্রেত দত্যি-দানো বড় নয়। সত্যি যদি হয় প্রয়োজন তার তবে নিশ্চয়ই সতী আসবে তার কাছে। সুতরাং ছেড়ে আসা কারখানার দিকে পা বাড়াতে উদ্যত হল ভূতনাথ। ওমনি একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ এসে লাগল তার নাকে। যুঁই-টগর না বেলা-চাপা, না স্বর্গের পারিজাত ফুলের গন্ধ—কিচ্ছু বুঝতে পারল না ভূতনাথ। তবে সুঘ্রানে তার কারখানার সেই নাকে লেগে থাকা দুর্গন্ধের রেশটা মুহূর্ত্তে গেল মিলিয়ে। আমোদিত হয়ে উঠল মনটা। নিশ্চয়ই কোন ভক্ত-প্রবর সন্ধ্যায় হয়ত বাবার মাথায় ওমনি কোন মিষ্টি-মধুর গন্ধওয়ালা ফুল চড়িয়ে গেছে। এসেছে যখন বাবার থানে, যাচ্ছে যখন ভয়ের মাঝে তখন তারও একটা ভৈরব-বাবাকে প্রণাম করে যাওয়া দরকার।

কিন্তু পিছন ফিরতেই চমকে উঠল ভূতনাথ! দেখল এক অদ্ভুত দৃশ্য! ভৈরব-রাজের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে যেন মানুষের অবয়বে শরতের জমাট বাঁধা সাদা একখণ্ড মেঘ। চাপ-টগরের গন্ধমাখা, পারিজাত ফুলের সুবাসটা আসছে যেন ওই মেঘাবয়ব মূর্ত্তিটা থেকেই। বিস্ময়াভিভূত ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে ভূতনাথ তাকিয়ে রইল সেই দিকে। বাতাস-লাগা কাশফুলের মত মৃদু-মন্দ ভাবে দুলতে দুলতে পরিণত হতে লাগল সেই মেঘবরণ অবয়বটা আবছা অস্পষ্ট একটা নারীর মূর্ত্তিতে। অস্পষ্ট হলেও এর আকার-প্রকার অতি পরিচিত হ ব। দৃশ্য হবার আগে তো সতী এমনি আধার নিয়েই প্রথম প্রথম আবির্ভূত হয়। মনে পড়তেই দেহে-মনে-প্রাণে ভূতনাথের জাগল এক অদ্ভুত শিহরণ। পলকে সর্ব্ব ভয়-শঙ্কা দূরীভূত হয়ে গেল তার অন্তর থেকে। পুলক ভরা আনন্দে হঠাৎ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, —সতী, তুই এসেছিস! এসেছিস তুই সতী!

ভূতনাথের সতী কথাটা যেন মন্ত্রের মত কাজ করল ওই মেঘ-বরণ অবয়বটার বুকে। বলার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল তার উপর সতীর চেহারা। সেই হাসি-মাখা মুখ তার, করুনামাখা চোখ। সেই সল ভাব তার---ভূতুদার প্রতি আনুগত্য ভরা তেমনি তার ভক্তি-নম্র চাওনি। হবে না? এ সতী যে ভূতনাথের সতী --ভূতনাথের সহ-ধর্ম্মিনী সতী। মুহূর্ত্তে ভূতনাথ স্থান-কাল-পাত্র সমস্ত গেল ভুলে। ভুলে গেল সে যে সতী তার মৃত। জীবন্ত সে তারই মত। তারই মত রক্ত মাংসের স্থূল দেহ-ধারী একটা মানুষ। দাঁড়িয়ে আছে সামনে তার বাস্তবের মাটিতে পা দিয়ে স্বামীর কাছে স্ত্রীর মত। আবেগ ভরা কণ্ঠে বলে উঠল ভূতনাথ, —আমি তোর কথাই ভাবছিলাম সতী।

উঠল ফুটে সতীর মুখে চাঁদের হাসি, "—আর আমি?" হাসি-মাখা মুখটি নেড়ে বলে উঠল সে, – ভাবছো বুঝি ভাবিনি আমি তোমার কথা? সেই ভাবনার জোরেই সত্তাটা তো আমার এসে হাজির হল তোমার কাছে। এসে দেখি অদ্ভুত কাণ্ড! ভূতনাথকে ভয় দেখাতে যাচ্ছে কতকগুলো ভীতু কাপরুষ।

কত সহজ সরল স্বাভাবিক সতী। তার কথায় সেই স্বাভাবিক স্বরেই উত্তর দিল ভূতনাথ, --ভূতের ভয় আমি করিনি সতী। তার জন্যই তো আবার ফিরে যাচ্ছিলাম কারখানায়। তোর কথা জাগলে আমার মনে কোন

ভয়-ডর থাকে না সতী। তুই থাকতে ভয় করব আমি কাকে? বিশ্বাস কর তুই, ভয়ে আমি আসিনি এখানে। এসব বেইমানীর কাজে কিছুতেই সায় দেয় নি আমার মন। ওরা ওভাবে হিড় হিড় করে এখানে টেনে না আনলে আমাকে—

"—জানি ভূতুদা।" বলে উঠল সতী,—তোমার উপর জোর-জবরদস্তি করে যে অন্যায় কাজে ওরা হাত বাড়াচ্ছিল তার আগুনে নিজেই পুড়ে মরত ওরা। কিন্তু ধৈর্য্য ধরতে পারলাম না আমি। তোমায় হিড়-হিড় করে অমানুষিকভাবে টানাটানি করতে দেখেই মনে হল আমার ক্রোধের সঞ্চার। সেই ক্রোধোদীপ্ত সত্তাটাই আমার তাদের কাছে প্রতিভাত হল ভয়াল-ভয়ঙ্কর ভৌতিক রূপে। তোমার মনে ভয় ছিল না তাই সে-মূর্তি আমার পড়ল না তোমার চোখে। কিন্তু ভূত-ভয় কাতর প্রাণটা তাদের মনের কল্পনায় আমাকে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মামদো ভূত ধারনা করেই তোমাকে ফেলে মেরে দিল ছুট।

—তাহলে তোকে দেখেই এভাবে হঠাৎ ছুটে পালাল তারা?

"—তা নয়তো কি?" বলে উঠল সতী,—এই ওদের সাহসের বহর ভূতুদা! এই ভরসা নিয়ে ওরা এখানে সেপাইগিরি করতে আসে? করে এখানে পাহারাদারীর কাজ? তোমার উপর করতে যায় জুলুম বাজী!

—ওদের কথা ছাড় সতী।

"—না ভূতুদা।" সতীর গলায় মেজাজী স্বর,—ওরা বদমাশ, বেইমান নিমক হারামই শুধু নয় ভূতুদা-ওরা দুষ্ট কুটিল মতলবাজ ব্যক্তি। ওরা এমন অমানুষ যে তোমার গায়ে হাত উঠাবে বলে আনে এখানে! ওরা এমন পাষণ্ড, নিষ্ঠুর স্বার্থপর যে জোর করে টেনে এনে তোমাকে ঘুটঘুট এ অন্ধকারে বিপদের মুখে অসহায়ভাবে একলা ফেলে পালায় তোমাকে?

"—ভালই তো করেছে ওরা।" বলে উঠল ভূতনাথ,"—ভাগ্যে ওরা আমাকে এখানে এমনিভাবে একলা ফেলে পালাল তাইতো আমি দেশা পেলাম তোর। প্রকৃত বন্ধুর কাজই করেছে ওরা আমার।

"—তুমি ওদের মনের খবর জান না ভূতুদা। তাই এমনি কথা বলছ।" বলে উঠল সতী,—দুরভিসন্ধি ছিল ওদের মনে। বাবুর কাজে ওরা যেমন ফাঁকি দেয় তেমনি তোমাকেও তারা তাদের মত বাবুর কাজে ফাঁকি দেবার জন্য প্রতিশ্রুতি আদায় কবতেই এনেছিল এখানে। কুমতলব ছিল ওদের মনে। এই ভৈরব থানে হাত দেওয়া করিয়ে প্রথমে দিব্যি নেওয়াতো তোমাকে যেন তোমার প্রতি তাদের এসব আচরণ, কথা ও কাজ ভুলেও কখনও কারো কাছে প্রকাশ না কব তুমি। তারপর ভৈরব-বাবার মাথায় হাত দেওয়া করিয়ে প্রতিজ্ঞা কবাতো তোমাকে, নেওয়াতো কঠোর শপথ যে তাদের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে চলতে হবে তোমাকে। তাদের কাজের সামিল হয়ে থাকতে হবে তাদের সঙ্গে এক গোয়ালের গরুর মত। না শুনলে ওদের কথা তোমাকে ওরা এখানে—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে তাকে বলে উঠল ভূতনাথ,"—ওদের কোনো দোষ নেই সতী। যেরকম কারখ্যানার মধ্যে রাত নামতেই দুম-দাম, হুট-হাট, দুদ্দাড়-সব ভূতুড়ে শব্দ আরম্ভ হয়েছিল তাতে আমার মনটাই কেমন ভয়ে ছেঁক-ছাঁক করে উঠছিল। ওরা তো চঞ্চল হবেই। রাত বাড়তেই আবার ওইসব উদ্ভট-ভৌতিক শব্দগুলোর সঙ্গে যুক্ত হল অদ্ভুত ধরনের শেয়াল-কুকুরের ডাক, চিৎকার। তার সঙ্গে তেমনি নাকে এসে ঢুকতে লাগল উৎকট, বিশ্রী গলা-পঁচা মানুষ—পশুর গন্ধ। ভয় লাগাটা স্বাভাবিক। হটকারিতা যা করেছে ওরা ভয়েই করেছে সতী। হয়তো আমাকে ওই ভূতুড়ে কারখানা থেকে উদ্ধার করবার জন্যই ওরা এনেছে জোর করে টেনে আমাকে এখানে। বাধ্য হয়ে। এতে ওদের দোষ ধরিস না সতী।

ভূতুদার মুখের কথায় প্রথমে মিষ্টি চোখের দৃষ্টি নিয়ে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকাল সতী। তারপর কি বুঝল সে কে জানে হেসে উঠল ফিক্ করে। ছেলে মানুষী হাসি। হাসি মুখেই বলে উঠল সে,— তাহলে ভূতনাথেরও ভূতের ভয় হয়? গা ছেঁক-ছেঁক করে?

কি যে বলবে ভূতনাথ খুঁজে পেল না। অপ্রতিভ হল একটু। তারপর থতমত খেয়ে বলে উঠল সে,—না, মানে সেপাই-দারোয়ানগুলোও ভয়ে কারখানার ভিতর টিকতে পারল না কিনা তাই—। আচ্ছা সতী, সেখানে বাঁকাদহের ইটভাটায় দেখে এলাম এক অলৌকিক দৃশ্য এখানে আবার এসে শুনতে হল নানারকম অদৃশ্য ভৌতিক-শব্দ—ব্যাপারগুলো কি? সত্যি কোন অশরীরীদের কাণ্ড?

—হ্যাঁ ভূতুদা। বলে উঠল সতী,—কিন্তু এতে তোমার মত সত্তার তো ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। এখানে তোমার ভয়ের চমক সেখানে গিয়ে কম্পন জাগাল আমার সত্তায়। তাই তো নেমে আসতে হল আমাকে তোমার কাছে। সেখানে দেখে এসেছিলে যা তা নিরালম্ব বায়ুভূত আর এখানে এসে কারখানায় শুনতে পাচ্ছিলে যা তা হল ইতরযোনির প্রেত ও নীচু স্তরের আত্মার কাজ।

—কিন্তু দেখতে কেন পেলাম না তাদের? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

—তোমার কাছে দেহধারনের মত শক্তি তাদের নেই ভূতুদা। ওরা সৎ মানুষের বাতাস সহ্য করতে পারে না তাই তারা তাদের কাছে আসে না। পবিত্র চেতার অঙ্গজ্যোতি অসহ্য লাগে তাদের। তাই তারা উন্নত মনার কাছ থেকে সরে থাকে দূরে। কারণ তাদের গায়ের আঁচ বিষ লাগে তাদের। জীবৎকালে যারা পাপ কর্মে লিপ্ত থাকে, কাটায় জীবন যারা বদভ্যাসে মগ্ন হয়ে, থাকে কুক্রিয়াসক্ত হয়ে—সেইসব স্বার্থপর, নীচ-মনা, হীনচেতা মানুষই মৃত্যুর পর হয় এইসব নিম্নস্তরের ভূত বা নীচু যোনীর প্রেত।

—কিন্তু কারখানার ভেতর ওদের ওই সব উদ্ভট অলৌকিক শব্দ করে কি লাভ?

—লাভ তাদের ওখান থেকে তোমাদের তাড়ান। হটিয়ে দেওয়া।

—কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেই ভূতনাথ শুরু করল বলতে সতী অবিনাশবাবুর ওই কারখানার জায়গাটার অদ্ভুত এক অতীত ইতিহাস। বর্তমান জায়গাটার নাম বাবলা-ডাঙ্গা হলেও এর আগে নাকি নাম ছিল জায়গাটার "সাধুর ডাঙ্গা"। কারখানার মাঝে কেটে দেওয়া বট-গাছটার তলায় নাকি ছিল তার ডেরা। ডেরাটা সাধুর ছোট-খাটো একটা আশ্রমে পরিণত হয়ে যেতেই আপনা থেকে পরিচিত হয়ে গেছল ওই জায়গাটা "সাধুর-ডাঙ্গা" নামে। তারপর হঠাৎ একদিন ভোর রাতে সাধু উধাও। আশ্রম তচনচ। ঘর ভাঙ্গা। আগুন লাগিয়ে ঝুপড়িটা কারা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে। মরল, না কোথায় বেঁচে রইল সাধু কে জানে। মোটকথা ব্যাপারটা একটা মস্ত বড় রহস্য হিসাবে রয়ে গেল সকলের কাছে। কাল সব কিছু হরণ করে। করল হরণ সাধুর-ডাঙ্গার স্মৃতি। সে স্মৃতি বাবলা-গাছে ঢেকে দিয়ে নাম নিল জায়গাটা "বাবলা-ডাঙ্গা" রূপে। কিন্তু এসবের বহু পূর্বে অর্থাৎ সাধুর ডাঙ্গারও আগের অতীতে এ ডাঙ্গার রূপ ছিল আলাদা। ছিল সে ভিন্ন নামে, ভিন্ন প্রকৃতিতে। তখন ওই গন্ধেশ্বরী নদীটা নাকি বয়ে যেত এর পাশ দিয়ে। গাছ-আগাছায় ঝোপে-ঝাড়ে ভর্তি নদীর কোলের এ ডাঙ্গাটার পূর্বপাশে ছিল শ্মশান ও দক্ষিণ-পাশে ছিল কবরখানা। শ্মশান-কবরখানা থেকে আরম্ভ করে কারখানার মাঝের বটগাছটা পর্য্যন্ত ছিল এ জায়গাটার ব্যাপ্তি। নাম তখন ছিল তার "মড়া ফেলার ডাঙ্গা" বা "মানুষ-পুঁতার চর"। গরীব হিন্দু যারা, অর্থাৎ যাদের মড়া পোড়াবার মত কাঠ-কয়লা কেনার সামর্থ থাকত না তারা তাদের মৃতদেহ দাহ না করে ওই মড়া ফেলার ডাঙ্গার ঝোপের মধ্যে দিত ফেলে। কেও বা আবার আধ-পোড়া করে ওই ঝোপের মধ্যেই কোথাও মাটি আঁচড়ে দিত পুঁতে। পাশের দরিদ্র মুসলমানরাও অর্থাৎ যাদের আড়ম্বর করে মৃতদেহ কবর দেবার মত সামর্থ বা ফুরসৎ থাকত না তারাও তাদের মড়া এনে এই নদীর চরের ডাঙ্গার বেলে-মাটি সামান্য একটু খুঁড়ে আধ-পোঁতা করেই সারত তাদের কবর দেওয়ার কাজ। বোকা মানুষগুলোর এসব কাজ-কর্ম্ম গোপনে নিরীক্ষণ করত এ ডাঙ্গার ঝোপে-ঝাড়ে, গাড়ে-গর্ত্তে লুকিয়ে থাকা শেয়াল-হেড়োল-নেকড়ে ও মড়া-খেকো কুকুরের দল। ওৎ পেতে থাকত তারা। যেই জ্যান্ত মানুষগুলো ফেলে-পুঁতে মরাগুলো তাদের কাজকর্ম্ম কাবার (শেষ) করে পগার পার হত। ওমনি তারা যেন উড়ে এসে জাপটে ধরত মরা মানুষগুলোকে। ঝোপের মধ্য থেকে হিঁচড়ে বের করত তাদের। গর্ত্তের উপরের মাটি নখে আঁচড়ে বের করত তাদের টেনে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে মড়াটাকে খেয়ে করত সাবাড় মড়া-খেকো ওই সব পঙ্গপালের দল। সামান্য গোটাকতক হাড় ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্বই রাখত না ওইসব মৃতদেহের। এই সমস্ত ভয়াবহতা নিয়ে বটগাছটার পূর্বদিকের অর্থাৎ কারখানার ভিতর চৌহদ্দির পূর্ব-পাশের জায়গাটা-যেটার নাম ছিল তখন "মড়া ফেলার ডাঙ্গা" বা "মানুষ পোতার চর"—ছিল তখন বেশ ভয়াল ও ভয়ঙ্কর। দল বেঁধে মড়া ফেলা বা পুঁততে আসা ছাড়া রাত্রে বেলায় তো দূরের কথা, দিন-দুপুরেও একা-দু'কা আসত না কেও সাহস করে।

কিন্তু এ ডাঙ্গার দিকে চড়া ফেলে গন্ধেশ্বরী দূরে সরে যেতেই মড়া পোঁতার চর উধাও হয়ে গেছে তার

নাম-বৈশিষ্ট্য নিয়ে। ঝোপ-ঝাড় ভর্ত্তি মড়া ফেলার ডাঙ্গা তার স্বভাব-প্রকৃতি নিয়ে হারিয়ে গেছে বহুকাল পূর্বেই। পরিণত হয়েছে ওটা সৃষ্টিছাড়া ব্রহ্মডাঙ্গা রূপে। নদীর সঙ্গে শ্মশানটাও ও পাশে সরে গিয়ে নাম নিয়েছে, এখন "সতী ঘাটা" বলে। কবরখানাটাও দেখে-শুনে স্থান পরিবর্তন করেছে তার। "সাধুর ডাঙ্গা" এসে দিয়েছে তার উপর প্রলেপ। "বাবলা-ডাঙ্গা" এসে ভুলিয়েছে তার সেই অতীতের নাম-গোত্র স্বভাব-প্রকৃতি। আজ সে-ডাঙ্গার কীর্ত্তি-কলাপের চিহ্ন থাকা তো দূরের কথা তার সামান্যতম স্মৃতি পর্য্যন্ত মনে নেই কারো। এমন কি এ অঞ্চলের বুড়ো-বুড়ীর মন থেকেও চিরকালের মত হারিয়ে গেছে মড়া-ফেলার ডাঙ্গার কথা বা মড়া-পোঁতা চরের ইতিহাস।

কিন্তু জ্যান্ত মানুষের মন থেকে সে-চর তার স্মৃতি নিয়ে উধাও হয়ে গেলেও এ-ডাঙ্গার সেই মরা-মানুষের মন থেকে যায়নি হারিয়ে সে সব স্মৃতি। মরা মানুষ মানে সেই সব মৃতের সত্ত্বা যাদের জড়-দেহ তখন এখানে ঠিক মত অগ্নি-সংস্কার, কবরস্থ বা সৎকার করা হত না। অর্থাৎ গরীব হিন্দু মুসল-মানরা। বিধিমত যাদের শেষকৃত্য সমাধা না করে আধ-পোড়া, আধ-পোঁতা অবস্থায় এখানের চরে, বা মড়া ফেলার ডাঙ্গার ঝোপে ঝাড়ে ফেলে দিয়ে পালাত।

আসল কথা হল—মৃত্যুই তো মানুষের পরিসমাপ্তি নয়। নয় তার জীবনের শেষ কথা। মরার পরও বেঁচে থাকে সে—থাকে বেঁচে সে তার সূক্ষ্ম সত্ত্বায়। দেহ তার পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেও মন তার থাকে সেই জীবন্ত অবস্থার মতই। কথায় বলে "স্বভাব যায় না মলে।" সত্যিই তাই। মরার পর মন তার স্বভাব-প্রকৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে। জীবনের সমস্ত সংস্কার মনকে আশ্রয় করে থাকে টিকে। এমন অজ্ঞান মন—জীবন্তের মোহগ্রস্ত সত্ত্বা। যে দেহটাকে নিয়ে জীবনে সে ভোগে লি.প্ত থাকে সে দেহটার মায়া সে কিছুতেই ছাড়তে পারে না। মরার পর অদৃশ্য সত্ত্বায় সে ভেসে আসে শব-যাত্রীদের সঙ্গে তার মৃত-দেহটার উপরে উপরে। সে দেহটার প্রতি তার এমন টান যে শবযাত্রীরা মড়াটাকে তার শ্মশানে-মশানে কবরখানায় পুড়িয়ে পুঁতে বা ফেলে দিয়ে গেলেও সে কিন্তু সেখানে তার সূক্ষ্মসত্ত্বাটাকে আশ্রয় করে থেকেই যায়। মায়া এমন জিনিস যে মৃতদেহটা তার শেয়ালে কুকুরে শেষ করে দিলেও, গলে-পঁচে-পুঁড়ে ছাই হয়ে গেলেও সে কিন্তু ভাবে-এ দেহ সে আবার ফিরে পাবে। পাবে ফিরে যেখানে তার বাস্তব দেহটা হয়েছে বিলীন, মিশেছে মাটি তে। অর্থাৎ তার শ্মশানে মড়া ফেলা জায়গায় বা কবরখানায়। এমন দৃঢ় বিশ্বাস তার-যে সে দেহ আবার তার উঠবে মাটি ফুঁড়ে পূর্বের মত রূপ ধরে। হারা দেহ ফিরে পেয়ে যাবে সে তখন তার ফেলে আসা জীবনে। স্বস্থানে ফিরে গিয়ে এ দেহযন্ত্রটাকে নিয়ে আবার করবে সে ভোগ জীবনের ছেড়ে-আসা কামনা-বাসনাগুলোকে। পূরণ করবে আশা, চরিতার্থ করবে আকাঙ্খা—ভোগ সুখে মত্ত হবে আবার, কাটাবে সে জীবন সেই আগের মত পুরোদমে—বেপরোয়া ভাবে। তাই তারা সব আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকে সেই জায়গাটাতে যেখানে তাদের বাস্তব দেহ পঞ্চভূতে হয় বিলীন। সাধারণত প্রেত হয়ে এভাবে শ্মশান-চিতায়, কবর-খানায় অবস্থান করে সেই সমস্ত আত্মারাই—জীবৎকালে যারা থাকে কুক্রিয়াসক্ত হয়ে। কদাচার-অনাচারে মত্তহয়ে কুপ্রবৃত্তির দাস হয়ে কাটায় যারা জীবন। এ অজ্ঞানতার ঘোর কাটবার মত সৎ-কর্ম যাদের জীবনে থাকে না। নিকট আত্মীয় আত্মজ-স্বজন এমন কেও থাকে না—যারা শ্রাদ্ধশান্তি বা পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করে উদ্ধার করবে তাদের মুক্ত করবে তাদের আত্মাকে সেই পরম-চৈতন্যের কাছে প্রার্থনা করে বা দোয়া মেগে। সতীর কথায়, তৎকালের সেই হীন-প্রবৃত্তির নীচ মনোবৃত্তির আত্মারাই নাকি অবস্থান করছে এখানে। সেকালের সেই মড়া পোঁতার চর, কবরখানা, মড়া ফেলার ডাঙ্গায়। কালের করালগ্রাসে তার কীর্ত্তিকলাপ ও স্মৃতি চিরতরে উধাও হয়ে গেলেও তারা আছে। এ হল তাদের আস্থানা। এ ডাঙ্গা তাদের জায়গা। এর অধিকার ছাড়বে না তারা কিছুতেই—কোনোমতেই।

"—একথা জানাতে তো পারে তারা।" বলে উঠল ভূতনাথ।

"—ওই তাদের জানাবার ভাষা ভূতুদা।' বলে উঠল সতী,—ওরা এমন নীচু স্তরের আত্মা যে যার-তার কাছে যখন খুশি মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে না। পারলেও-পাঞ্চভৌতিক বস্তুকণা ঠিকমত আকর্ষণ করে যথাযথ অবয়ব গঠন করে নেবার শক্তি এদের নেই ভূতুদা। তাই কখনও চোখ-দুটো হয় বড়, মুখটা হয় সরু, পেটটা হয়

বড় জালার মত, হাত-পাগুলো হয় প্যাকাটি। কারো বা নাকটাই যায় বেড়ে মাথাটা হয় বড় হাঁড়ি। জ্যান্ত মানুষের কাছে রূপ ধরে মনের কথা তারা জানাবে কি তাদের ওই কিম্ভুতকিমাকার চেহারা দেখে ভয়ে মানুষ ছুটে পালায়। কেও বা হয় অজ্ঞান। কেও হয় হাবা-গোবা, দিশাহারা পাগল।

বুঝল ভূতনাথ—এইজন্যই নাকি তারা পঞ্চ তন্মাত্রার শব্দ-গন্ধ ইত্যাদি উপাদান আহরণ করে দুম-দাম, দুদ্দাড়, ঝড়-ঝড়, ঝন্-ঝন্ ইত্যাদি নানারকম অদৃশ্য অলৌকিক ভৌতিক শব্দ করে জানায় তাদের উপস্থিতি। শুধু তাই নয় পুণ্যাত্মা উচ্চাত্মার উপস্থিতি যেমন হঠাৎ নাকে পারিজাত বা অন্য কোন মিষ্টি ফুলের গন্ধ এলে অনুভব করা যায় তেমনি নীচআত্মা বা হীন অদৃশ্য সত্তার উপস্থিতিও ওমনি ভ্যাপসা, বিশ্রী পঁচা-গলা দুর্গন্ধেও উপলব্ধি করা যায়। কারখানার ভিতর যে গা বমি-বমি করা উৎকট গন্ধটা নাকে এসে লেগেছিল ভূতনাথের ওটা নাকি ছিল কোন কবরে পঁচা মড়ার কিংবা ডাঙ্গার ঝোঁপে পঁচা-গলা শব থেকে আকর্ষণ করা আত্মার দুর্গন্ধ। এ গন্ধই নাকি তাদের প্রতিবাদের ভাষা। এর মাধ্যমে যেন জানাতে চায় তারা যে ওঠাও এ কারখানা। হঠাও সব এখান থেকে। ভাগো সব। পালাও। এ জায়গার তারা হকদার। জীবন্ত মানুষের এখানে থাকার কোন অধিকারই নেই। থাকতে দেবে না তারা।

সতীর কথায় আরো জানল ভূতনাথ—আজ বলে নয় প্রায় দিনেই অবিনাশবাবুর কারখানার সেপাই-দারোয়ান ওই ভীম-চাঁদ রাম সিংহের দল রাত নামলেই পালায় সব ওই কারখানা ছেড়ে। পালাতে বাধ্য হয় তারা সেখানের প্রেতাত্মাগুলোর দৌরাত্মিতে। ভীতু প্রকৃতির মানুষদের ওইসব নীচু প্রকৃতির প্রেতাত্মাগুলো ভয় দেখিয়ে মজা পায়। বাস্তবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে এরা কোরো কোন ক্ষতি করতে পারে না। তবে তাদের ওই অদৃশ্য অলৌকিক হুড়ুম-দাড়ুম ভৌতিক শব্দে বা হঠাৎ ধারণ করা তাদের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে কেও যদি ভয় পায় সে কথা আলাদা। কারখানার আগলদার ওই লাল বাহাদুররা সবাই নাকি ভীরু প্রকৃতির। তাই তাদের দুর্ব্বল মনে ভয়ের সঞ্চার করতে পারে তারা সহজে। অত্যন্ত নিম্নস্তরে প্রেতগুলোই ওমনি দুর্গন্ধ যুক্ত হয়। হঠাৎ মানুষ-পশুর পঁচা-গলা গন্ধতেই নাকি বুঝতে পারা যায় তাদের উপস্থিতি। রাত নামলেই পোড়ো ঘরের ছুঁচো-ইন্দুরের মত আবির্ভূত হয় তারা তাদের ওই সমস্ত স্মৃতি বিজড়িত স্থানে। সাধারণত যেখানে তাদের জড়দেহের অস্তিত্ব বিলোপ হয় সেখানে। মানুষ দেখলেই তারা প্রথমে ওই রকম হুড়ুম-দুড়ুম হুট-হাট ঠুং-ঠাং ইত্যাদি নানা প্রকার ভৌতিক শব্দ করে। করে জায়গা থেকে তাদের তাড়াবার জন্য। না পারলে তুলে ওমনি শেয়াল কুকুরের মত অদ্ভুত রোল, মড়া-খেকো শ্মশান-চারী নানা হিংস্র পশুর উৎকট স্বর বা উদ্ভট আওয়াজ। ভীতু প্রকৃতির মানুষ ওই ভীম-পালোয়ান ও বীর বাহাদুরদের মনে এভাবে তারা ভয়ের উদ্রেক করেই ধরে তাদের মনের কল্পনা অনুযায়ী নানা ভয়াল-ভয়ঙ্কর সব ভৌতিক মূর্ত্তি। তখন মুখে "রাম-রাম" মনে ভয় নিয়ে নাকি তারা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। কারখানার মাঠ-চৌহদ্দী ত্রিসীমানা পেরিয়ে। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তাই দিনের পর দিন ভূত-তাড়ানো প্রেত-খেদানো সহ্য করেও টিকে থাকে তারা। সেপাই-দারোয়ানের কাজ করে যায় ভূত-প্রেতের হাতে প্রাণটি রেখে জীবনের দায়ে। চাকরি রাখবার জন্য বাবুর চোখে ধূলো দেয় তারা। রাত নামলেই চলে যায় গোপনে আশ-পাশ গ্রামের মন্দির দেবালয়, পূজা-মণ্ডপ, ঠাকুর মেলা ও দালানে। সকলের অজ্ঞাতে লুকিয়ে তারা রাত কাটায় সেখানে। ভোর না হতে হতেই ফিরে আসে আবার কারখানায়। নানা বাঁধা-বুলি, মিথ্যেকথা বলে ভুলায় অবিনাশবাবুকে। দিনের পর দিন এই ভাবেই চলে তাদের কারখানা বক্ষার কাজ।

শুনে অবাক হল ভূতনাথ। আশ্বস্ত হল সে। এই জেনে যে কারখানার এসব ব্যাপার কোন চোর-চণ্ডাল বা দুষ্টু-নষ্ট লোকের কাণ্ড নয়। তবে কাটা বটগাছটার গোড়ায় মেশিন-ঘর উঠতে না দেওয়া বা সেখানের ভিত তেড়ে ফেলা বা দেওয়াল ভেঙ্গে দেওয়ার পিছনে নাকি অন্য রহস্য আছে লুকিয়ে। এ রহস্যও অবশ্য ভূতুড়ে। তবে ঠুক-ঠাক দুম-দাম ইত্যাদি নানা ভৌতিক আওয়াজ তুলে যে সব ভূত-প্রেতগুলো সেপাই-দারোয়ানদের তাড়াচ্ছে এগুলো তাদের কাজ-কারবার নয়। কারণ এরা হল নাকি অত্যন্ত নীচু স্তরের আত্মা। পঞ্চতন্মাত্রার শব্দ-গন্ধের মাধ্যমেই যা ভীরু দুর্বল শঙ্কিত মনে ভয়ের সঞ্চার করতে পারে এরা। ক্ষণিক মূর্ত্তি ধারণ করা ছাড়া এদের বাস্তবে ওসব করার কোন ক্ষমতা নেই। শুধু তাই নয়, এরা নাকি সৎ-পবিত্র উন্নত আত্মার উপস্থিতিও সহ্য করতে পারে না। পারে না এরা সইতে কোনো গ্রাম-দেবালয় মন্দির মসজিদের পবিত্র বাতাস। এমন কি

মানুষের মুখে ভগবানের নাম ও দেব-দেবীদের গুণকীর্ত্তন পর্য্যন্ত অসহ্য লাগে এদের। তাই তারা লোক-লোকালয়, গ্রাম-সমাজের সংস্পর্শে ছেড়ে থাকে এখানে নিরালায়। তাদের জাগতিক দেহ লীন হয়ে যাওয়ার জায়গায় অর্থাৎ এই শ্মশানে-মশানে কবরখানায়, মড়া ফেলা বা শব পোঁতার স্থানগুলোতে। এসব জায়গায় জীবন্ত অবস্থার স্মৃতি নিয়ে তারা নাচন-কোঁদন করতে নাকি ভালবাসে। বিলীন হওয়া দেহের মাটি বা কবরের উপর এরা কল্পনায় নাট্যমঞ্চ তৈরী করে সে মঞ্চে ফেলে আসা জীবনের কীর্ত্তি-কলাপের এরা করে চলে অভিনয়। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। কি যে সুখ পায় তারা এতে কে জানে। অতীত জীবনের ঘটনাগুলো বারবার কল্পনায় এনে এরূপ একঘেয়েমি কতকাল যে চালিয়ে যাবে তারা কে জানে। বলতে বলতে ভেসে উঠল সতীর মুখে বিষাদের সুর, "—এরা বড় অসহায় ভূতুদা। বড় নির্বোধ-অজ্ঞান এরা। তাদের কল্পনার খাঁচায় আত্মা-পাখী বন্দী হয়ে কত যে ছটফট করছে বুঝছে না এরা। সত্তা যে তাদের মুক্তির জন্য কাঁদছে—সে বোধও নেই এদের। কবে যে এদের কাটবে এ ঘোর ঈশ্বর জানেন।

"—তুই পারিস না এদের ঘোর কাটাতে, এদের উদ্ধার করতে?" আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল ভূতনাথ,—সত্যি বলছি সতী, তোর মুখে ওই প্রেতাত্মাগুলোর কথা শুনে বড় দুঃখ হচ্ছে আমার মনে। পারবি না তুই ওদের এ অবস্থা থেকে মুক্ত করতে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সতী। তারপর বলে উঠল সে বিষন্ন মুখে, বিষাদ-ভরা স্বরে,—মুক্তি সকলের নিজের উপর নির্ভর করে ভূতুদা। মুক্তি কেও না চাইলে অপর কেও তাকে মুক্তি পথের সন্ধান দিতে পারে না। আত্মোদ্ধারের ইচ্ছা নিজের অন্তরে কারো জাগরিত না হলে বাইরে থেকে কেও তাকে সাহয্য করতে পারে না।

লাগল বলতে সতী যে জীবিত মৃত প্রত্যেক সত্তারই নাকি আন্তরিক ইচ্ছার অদ্ভুত এক আকর্ষণী শক্তি আছে। সৎ-চিন্তার আকর্ষণে সদাত্মারা তার কাছে আর্বিভূত হয়। দেখায় তাকে মুক্তির পথ। সাহায্য করে তাকে আত্মোদ্ধারের জন্য। অপরপক্ষে অসৎ চিন্তার চৌম্বকশক্তিতে তেমনি অসদাত্মা, নীচ সত্তাদের হয় আবির্ভাব। তারা তাকে অসৎপথে টানে। পাপ পথে নিয়ে যায়। অধঃপাতে ফেলে তাকে নিম্নস্তরে নিয়ে গিয়ে সকলে মিলে নরক করে গুলজার। কারখানার মাঝে কাটা বটগাছটার সংলগ্ন যে মেশিন ঘরটা উঠেছে সেটার দেওয়াল ভাঙ্গা বা ভিততোলপাড় করা অবশ্য শক্তিশালী এক অন্যমনা উচ্চ-আত্মার কাজ। কিন্তু তার পূর্বপাশের জায়গাটায় রাত নামলেই যে ভৌতিক শব্দ, অলৌকিক আওয়াজ তুলে তা কিন্তু কবরে পোঁতা বা মড়াফেলার ডাঙ্গার ফেলা নীচ-সত্তা বা হীন আত্মাদের কারসাজি। বটগাছটার দিকে তারা পা মড়াতে পারে নি ওই শক্তিশালী সত্তাটার দাপটে। তাই তাদের অতীত জীবনের পার্থিব-দেহ বিলীন হওয়ার স্থানটাতেই জোট বেঁধে সব করে আসছে নানা দৌরাত্মি-আসছে করে এসব অদ্ভুতূড়ে ভূতুড়ে কাণ্ড। এমন নাকি নির্বোধ এরা যে জগৎ-জীবনের পরিবর্তনের স্রোতে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে সবকিছু, পাল্টাচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র সে সব দিকে কোন হুঁস নেই তাদের। আঁকড়ে থাকা স্থানটাকে তারা কল্পনায় নাট্যমঞ্চে পরিণত করে ফেলে আসা জীবনের নানা ঘটনাকে বার বার করে চলেছে অভিনয়। এভাবে এখানে পড়ে থেকে অতীতস্মৃতির একঘেয়ে রোমন্থন করে কি যে সুখ পায় তারা—কে জানে। না আছে মনে তাদের মুক্তির চিন্তা, না আছে এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের ইচ্ছা।

কথার মাঝে হঠাৎ বলে ভূতনাথ, —তুই পারিস না ওদের মনে জানাতে মুক্তির বাসনা? কতকাল তারা থাকবে পড়ে এখানে—এভাবে? পারবি না তাদের বোধে আনতে এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য ইচ্ছা?

"—ইচ্ছা তো হয় ভূতুদা;" বলে উঠল সতী, "—কিন্তু কোন্ চিন্তার সূত্র ধরে বোধে দিব ওদের নাড়া? উচ্চাত্মার দিব্যজ্যোতিতে ওদের চোখ ঝলসে যায়। পুণ্যাত্মার বাতাসে যেন ওদের ফোস্কা পড়ে গায়ে। হাজির হলে সামনে তাদের উবে যায় তারা। শুদ্ধ সত্তাদের সবরকমভাবে এড়িয়ে চলে তারা। শুধু আমার কেন তোমার উপস্থিতিও তো ওবা পারছিল না সহ্য করতে কোন মতে। তাই তো তারা ওমনি ভৌতিক আওয়াজ তুলে, দুর্গন্ধ ছড়িয়ে ওখান থেকে হটাবার চেষ্টা করছিল তোমাকে। না পেরে শেষে ভীমবাহাদুর-রাম সিংদের মনে ভয় ধরিয়ে পরোক্ষভাবে তাদের দিয়ে তাড়াল তারা তোমাকে ওখান থেকে। এই তো ওদের প্রকৃতি ভূতুদা। এই তো ওদের স্বভাব।

—হটাক আমাকে, তাড়াক তারা। তবু যদি আমার দ্বারা ওদের কোন উপকার হয় তবে বল না সতী। করব

তা আমি। এভাবে যুগের পর যুগ পড়ে থেকে এখানে কষ্ট পাবে তারা এতে মনটা যে আমার সায় দিচ্ছে না কিছুতেই।

মিষ্টি হাসির ঝিলিক মেরে বলে উঠল সতী,—বাবা ভূতনাথের অংশ তুমি—ভূতদের জন্য দুঃখ তো তোমার হবেই। বল, কি উপকার করতে চাও তুমি ওদের?

"—তা তো জানি না।" বলে উঠল ভূতনাথ,—তবে যা বলবি তুই যেভাবে যা করতে বলবি আমাকে তাই করব আমি। বল-না কি করতে হবে আমাকে?

ভূতনাথের কথায় কি দোলা যে লাগল সতীর মনে কে জানে। কিছুক্ষণ তার মুখটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি। যেন ভূতনাথের অন্তরটা পর্য্যন্ত নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করল সতী। তারপর বলে উঠল আশাভরা স্বরে,—পারলে একমাত্র তুমিই পারবে ভূতুদা। এব্যাপারে আমার চেয়ে তুমিই তাদের উপকারে লাগবে বেশী। পরোপকারী প্রবৃত্তির শক্তিতে তোমার হয়ত জাগাতে সমর্থ হবে তাদের মনে মুক্তির চিন্তা, উদ্ধারের ইচ্ছা।

কারণ হিসাবে বলল সতী উর্ধ্বলোকের চেয়ে ভূলোকের সত্তার সঙ্গে ভুবর্লোকের সত্তার সম্পর্ক বেশী। ভূলোকের পরই শুধু ভুবর্লোকের অবস্থান নয়। উভয়লোক থাকে পরস্পরের কাছাকাছি, পাশাপাশি। বলতে গেলে একে অপরের এপিঠ-ওপিঠ হিসাবে। ভূলোকের বাসিন্দারা মৃত্যুর পরই যায় প্রথমে ভুবর্লোকে। তারপর কর্মফল অনুযায়ী গতি হয় তাদের স্বঃ-জন-তপ ইত্যাদি উর্দ্ধলোক। তেমনি আবার পৃথিবীতে জন্মাবার আগে আসে তারা ভুবর্লোক থেকেই। সেখানের সূক্ষ্মদেহ ত্যাগ করে এখানে এসে মাতৃগর্ভে ধারণ করে জড়দেহ। তাই উর্দ্ধলোকের আত্মার চেয়ে মরলোকের সত্তার সঙ্গে ভুবর্লোকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এবং সেখানের সূক্ষদেহীরা এখানের স্থূল দেহীদের সাথে বিশেষ যোগাযোগ রক্ষা করতে চায়। সম্পর্ক স্থাপনের জন্য থাকে তারা আগ্রহী, ব্যাকুল। ভূলোকের জীবিত আত্মার চিন্তা-কর্ম-ইচ্ছা ভুবর্লোকের মৃতাত্মাদের প্রভাবিত করতে পারে। ভূলোকের শ্রাদ্ধ-শান্তি-স্বত্যয়ন পিণ্ডদান আদি পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম তাদের শুধু আত্মোদ্ধারের সহায়তাই করে না—মরজীবের তাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর প্রার্থনা, আল্লার দোয়া মাগা, ঈশা-মুশার নিকট মুক্তির কামনা তাদের মোহ-মুক্তি ঘটায়—তাদের আত্মার শান্তি লাভে, সত্তার উর্দ্ধগমনে সাহায্য করে। জগতের মানুষের প্রতি তাদের এই আসক্তির দুর্ব্বলতায় অনেক সত্তা আবার ঘোর-প্যাঁচেও পড়ে। তাদের এই আসক্তির সুযোগ নিয়ে অনেক ধুরন্ধর লোক আত্মাকে তাদের বশ করে রাখে। এই বশ করা সত্তা অর্থাৎ ভূত-প্রেত ও পিশাচদের নিয়ে দেখায় তার নানা তুকতাক, অলৌকিক কাণ্ড। জগতে বাহবা-ও কুড়ায়, টাকাও রোজগার করে। তার সাধনার বলে বশে থাকা ওই সব আত্মারা এসব মানুষের নির্দ্দেশে ওসব কাণ্ড করতে বাধ্য হয় বটে কিন্তু এতে তাদের খুব কষ্ট হয়। বিশেষ করে তাদের আত্মোদ্ধারে ঘটে বিলম্ব, সত্তার মুক্তি-ইচ্ছা হয় সুদূর পরাহত।

বলতে বলতে সতীর মুখটা হঠাৎ যেন দুশ্চিন্তার একটা কালো মেঘে গেল ঢাকা। বিষাদ-গম্ভীর হয়ে গেল তার চেহারাটা। দুঃখ ভরা কণ্ঠে বলে উঠল সে,—এতে শুধু ওইসব সত্তাদেরই ক্ষতি হয় না ভূতুদা, ভূত-সিদ্ধ প্রেত-সাধক হয়ে যারা তাদের ভগবানের দেওয়া সাধন-শক্তির করে অপব্যবহার তাদের আত্মাও হয় নীচগামী। সত্তা তাদের হয় অত্যাচার দোষে দুষ্ট। শুদ্ধ-সত্ত্ব নির্মল-পবিত্র আত্মা তোমার। এসব হীন-কর্ম নীচ-প্রবৃত্তিতে মন তোমার না গেলে, উপকার করতে গেলে তাদের অন্য বাধা হয়ত তোমার আসতে পারে সামনে।

"—কোনো বাধাই আমি মানব না সতী।" বলে উঠল ভূতনাথ তার স্বভাব-সিদ্ধ রোখে,—সত্যি যদি উপকারে কোন লাগতে পারি তাদের তবে নিজেকে ধন্য বলে মনে করব আমি। বল না আমায় কি করতে হবে। দেখি না কোন বাধা এসে রুখে আমার পথ।

—তোমার দিক থেকে কোন বাধার কথা বলছি না আমি ভূতুদা। বলছি ওই প্রেতাত্মাগুলোর দিক থেকে বাধার কথা।

—তার মানে? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ।

বলে উঠল সতী,—উপকার করব বললেই তো আর কারো উপকার করা যায় না ভূতুদা।—উপকার নেওয়ার মত তো আবার আধার হওয়া চাই। উপকার করতে যাবে তুমি যাদের—তাদের তো সে উপকার গ্রহণ করার মত মানসিকতা থাকা চাই। থাকা চাই আগ্রহ, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা।

কথাগুলো শুনে কেমন যেন খটকা লাগতে লাগল ভূতনাথের। চাওনি দেখে তার ধাঁধাটা মনের পরিষ্কার করবার জন্য বলতে লাগল সতী সে এক অদ্ভুত কথা। অবাক হয়ে শুনতে লাগল ভূতনাথ যে মানুষই শুধু ভূতকে ভয় করে না—ভূতেরাও নাকি মানুষকে ভয় করে। দুর্ব্বলমনা মানুষের ভয়ের কল্পনায় তারা যেভাবেই প্রতিভাত হোক না কেন সবল-মনা মানুষের কাছে তারা কিন্তু সহজে ঠেসে না। বিশেষ করে কারখানার ওইসব নীচু স্তরের প্রেতাত্মাগুলোর তো ভূতনাথের মত শুদ্ধচেতা পবিত্র হৃদয় মানুষের কাছে আসারই কথা নয়। সাহসী মানুষকে এরা মারাত্মকভয় করে। যুগ যুগ ধরে যে অভ্যাস নিয়ে তারা পড়ে আছে এখানে সে অভ্যাসকে হয়তো সহজে ছাড়তে পারবে না এরা। তাই হয়তো এড়িয়ে চলবে তারা ভূতনাথকে। কিন্তু এড়িয়ে চললেও তাদের স্থান ছেড়ে যাবে না তারা। ভূতনাথের সামনে কোন মূর্ত্তি ধরতে তারা না পারলেও তন্মাত্রার অতি সহজ উপাদান শব্দ-গন্ধগুলোকে আধার করবে তারা। তারপর পরোক্ষভাবে সেগুলোর সাহায্যে স্থান ছাড়া করবার চেষ্টা করবে ভূতনাথকে। ভূতনাথ যদি ওসব ভৌতিক শব্দ ও দুর্গন্ধের মাঝে গিয়ে তাদের প্রতি গভীর প্রেম ও সহানুভূতি সহকারে নিবেদন করে তার অন্তরের কথা তাহলে হয়তো শুনলেও শুনতে পারে তারা। কিন্তু শুনুক বা না শুনুক ওইসব প্রেত-গন্ধ বা ভৌতিক শব্দের মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি অনুভব করলেই দেখুক বা না দেখুক যেতে হবে ভূতনাথকে অদৃশ্য সেই সত্তাগুলোর মাঝে। হৃদয় ভরা দরদে বার বার বুঝিয়ে বলতে হবে তাদের যে বিগত জীবনেই তাদের একমাত্র জীবন নয় বা ছিল না। সত্তা তাদের জন্মজন্মান্তর নানা জীবনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে এসেছিল অতীত জীবনে। সুতরাং শুধুমাত্র অতীত জীবনেরই স্মৃতি রোমন্থন করে এখানে আটকে পড়ে থাকা উচিত নয়। নয় উচিত একঘেয়েমির মধ্যে ফেলে মনকে অবসাদগ্রস্ত করা ও বিষাদ, বিষন্ন বিষমস্থ করা। খোয়া জীবনের ছিবড়া চর্বিত চর্বন করে কোনো লাভ নেই। এক জায়গায় বদ্ধ জলার মত আটকে থেকে সত্তাটাকে তাদের দূষিত, আবর্জনা-ভরা ও দুর্গন্ধ যুক্ত করা ঠিক নয়। এর জন্যে মৃত্যু তাদের দেয়নি ভগবান। মৃত্যু হল ভাবী জীবনের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের কাল। অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে পরবর্তী জীবনকে আরো সুখী, সুন্দর, সৌন্দর্য্যময় ও মধুময় করার জন্যই মৃত্যু দেন ভগবান। জীবনকে একঘেয়েমীর নিরসতা অসাড় আনন্দহীন ও বিষাদগ্রস্থ অবস্থা থেকে মুক্ত করে আবার তাকে নবরূপে নূতন সৃষ্টির অভিমুখে যাত্রা করার জন্যই মৃত্যু। এর মাধ্যমেই জীবন জন্মান্তরে আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করবার জন্য নবছন্দে যায় এগিয়ে। মৃত্যুর পর বিগত জীবনের স্বভাব-প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি নিয়ে পড়ে থাকা তো জড়-পদার্থেরই নামান্তর। একটা জীবন বা একটা জীবনের সুখ-দুঃখ হাসিকান্না, আনন্দ-নিরানন্দই তো চিরন্তন বা শাশ্বত নয়। জন্ম মৃত্যু, মৃত্যু জন্ম; সৃষ্টি-ধ্বংস, ধ্বংস-সৃষ্টির মাধ্যমেই জীব-সত্তার সম্যক বিকাশের পথে হয় অগ্রগমন। আত্মার কীট থেকে জীব, জীব থেকে মানব, মানব থেকে যে ঈশ্বরত্ব লাভ করে তা তো এই মৃত্যুর মাধ্যমেই আত্মচৈতন্যকে ক্রমোত্তর বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেয়ে।

সতীর বিশ্বাস হল এসব কথা ভূতুদার করুণা-ভরা হৃদয়ে তার আন্তরিক ইচ্ছায় যেভাবে ওই প্রেতাত্মাগুলোর চেতনায় পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে সেভাবে হয়তো অতিলোকের বাসিন্দা হয়ে তার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। আত্মার উর্ধ্বগমনের পথরোধ করে ওই যে প্রেতাত্মাগুলো বিগত জীবনের মোহ অন্ধে ওই জায়গাটাকে আকড়ে ধরে কষ্ট পাচ্ছে—যা হয়তো তারা বুঝেও বুঝতে পারছে না। এর থেকে তাদের উদ্ধার করতে ভূতুদার মত ভূলোকের উচ্চ সত্তারই হবে সহায়ক। কারণ মর্ত্তলোকের অধিবাসীরা যে রূপ মন নিয়ে সূক্ষ্মলোকের অধিবাসীদের দেখে সূক্ষ্মলোকের অধিবাসীরা তাদের কাছে সেইভাবেই প্রতীয়মান হয়। তাদের ভাবেই রূপ ও গুণ নিয়ে প্রতিভাত হয় তারা। হয় তাদের অন্তরের শক্তিতে প্রভাবিত। জীবন্ত সত্তার দরদী-প্রাণ মৃতাত্মার হৃদয়ে ঝঙ্কার তুলতে পারে সহজে। জীবনের পর যেমন মৃত্যু আছে তেমনি মৃত্যুর পর যে আবার জীবন আছে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু; মৃত্যু-জন্ম যে পরস্পর সম্পর্কিত, বাস্তব ও আবশ্যকীয় ঘটনা এ বিশ্বাস জীবন্তরাই প্রত্যক্ষে জানাতে পারে মৃতের মনে। মানুষই জানাতে পারে তাদের যে এ জীবনের সুখ-শান্তি-ভালবাসার চেয়েও অধিকতর সুখকর ও আনন্দদায়ক অনুভূতির স্তর আছে। মৃত্যুর মাধ্যমে ধাপের পর ধাপ সে স্তরের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। এক জীবনের দৈহিক মৃত্যুকে ধরে ক্রমোন্নতির এ ধারা বন্ধ করে থাকতে নেই। দেহের মৃত্যু হলেও সত্তার মৃত্যু নেই-নেই আধ্যাত্মিকতার মৃত্যু। নিম্নের কদর্য কামনা-বাসনায় মনকে তাই পঙ্গু করে একটা স্তরে ফেলে

রাখা উচিত নয়। উন্নত চিন্তাধারার মাধ্যমে, সদাকাঙ্ক্ষায় মনকে শক্তিশালী করে, পার্থিব আসক্তি বন্ধন কেটে আত্মাকে তার দিব্য অমৃতময় স্তরে নিয়ে যেতে হয়। ভূত-প্রেত আদি সমস্ত সত্তাই তো সেই পরম চৈতন্যেরই অংশ। সেই সৎ-চিৎ আনন্দময় সত্তায় লগ্ন হওয়াই মুক্তি। এই পরামুক্তির পথেই বিশ্বের সমস্ত অনু-পরমাণু এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হতে। সুতরাং মহামুক্তির এই যাত্রা পথে যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় তারা থমকে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? আসল কথা হল—মৃত্যুর পর বিগত জীবনের বদ্ধ সংস্কার নিয়ে এখানে আবদ্ধ থাকতে নিষেধ করতে হবে ওই সব প্রেতাত্মাদের। অন্তর দিয়ে বলে-বুঝিয়ে এগিয়ে চলার মন্ত্র তাদের ঢুকাতে হবে কানে এবং তা ভূতনাথকেই।

ভূতনাথ তো অবাক। কারণ সতীর তো এগুলো নিছক কথার কথা নয়, যেন অমৃতময় বাণী। এ বাণী সতীর শেষ হয়ে গেলেও তার অনুরণন যেন বাজতে লাগল ভূতনাথের কানে। তাই ভাব-বিহ্বল তন্ময়তায় সতীর মুখটার দিকে বিস্ময়াভিভূত ভাবে তাকিয়ে রইল সে। মিষ্টি হাসির ঝঙ্কার তুলে বলে উঠল সতী, —কি ভূতুদা, এমনভাবে দেখছো কি আমাকে? বোকে শুধুতো আমিই গেলাম। এবার তোমার পালা। বল তুমি তোমার কথা। কি? পারবে না তোমাদের ওই কারখানার ভূতগুলোকে মনে সাহস, হৃদয়ে বল, অন্তরে সহানুভূতি নিয়ে তাদের তোমার মনের কথা শোনাতে?

ভাবালুতার স্বরে উত্তর দিল ভূতনাথ,—তোর কথায় আমি সব পারি সতী। সত্যি যদি শুনে তারা আমার কথা তবে কেন বলব না এসব।

সতীর মুখে তেমনি আশাদীপ্ত কথা, "—ভূতদের নাথ তুমি—তোমার কথা না শুনে থাকতে তারা পারে কখনও? তুমি শুধু তোমার কাজ করে যাবে। দেখতে তাদের না পেলেও উপস্থিতিটা তাদের শব্দে-গন্ধে অনুভব করে দরদ-ভরা কণ্ঠে শূন্যে তাদের উদ্দেশ্য করে বলে যাবে তোমার কথা। দেখবে, নিশ্চয়ই সে কথা শুনবে তারা তোমার। বন্ধ হয়ে যাবে ভূতুড়ে শব্দ, প্রেতুড়ে দৌরাত্ম্যি। শেয়াল-কুকুরের অলৌকিক চিৎকার, উৎকট গন্ধ কিচ্ছু থাকবে না আর অবিনাশবাবুর কারখানায়। সেপাই-দারোয়ানরা তখন দিব্যি নির্ভয়ে থাকতে পারবে সেখানে।

"—কিন্তু সতী," বলে উঠল ভূতনাথ,—তাদের সঙ্গে কথা বলব, শুনবে তারা আমার কথা কিন্তু দেখতে পাব না তাদের এ কেমন করে হয়? না সতী, দেখতে যেন পাই তাদের। দেখাতে তোকে হবেই তাদের আমাকে।

সতী হল নিশ্চুপ। কেন যে কে জানে। ভূতনাথের স্বভাব—একটা কিছু ঝোঁক চাপলে মাথায় সহজে তা নামে না। তাই বলে উঠল সে,—শুন্ সতী, ভূত দেখাতো আমার এই প্রথম হবে না। এর আগে দেখেছি তো আমি ভূত। বাঁকাদহে, ভজহরির ইটভাটায়। বটগাছের একটা ডালে ঝুলন্ত অবস্থায়। কিন্তু তা ক্ষণিক। আর সত্যি বলতে কি—ওই ক্ষণিক দেখাটাই আগ্রহটা আমার দিয়েছে বাড়িয়ে। ভালভাবে কাছে থেকে দেখব আমি ভূত। বলব আমি তাদের সঙ্গে কথা। বুঝব তাদের স্বভাব, প্রকৃতি, মনোভাব। পারবি না তুই আমার এ আশা পূর্ণ করতে—ভূত-প্রেতদের স্পষ্টভাবে দেখিয়ে আমার মনের ইচ্ছা পূরণ করতে?

তেমনি হাসি-ঝরা মুখে বলে উঠল সতী, —কেন, আমায় দেখেও কি মিটছে না তোমার সে সাধ? আমি কি ভূত নই? মৃত আমি তোমার—

হঠাৎ একটা আবেগ চাপা কণ্ঠে বেরিয়ে এল ভূতনাথের মুখ থেকে ছোট্ট একটা ধমক,—খবরদার সতী, আমার কাছে তুই ওই "মৃত" কথাটা উচ্চারণ করিব? ভুলেও কখনও বলিস না তুই আমাকে যে তুই ভূত। তুই আমার কাছে জীবন্ত সতী।—জীবন্তের চেয়েও জীবন্ত। চির-সত্য। উজ্জ্বল একটা বাস্তব সত্য। মানুষ তুই আমার মতই। আমার মন-প্রাণ-হৃদয়ের তুই। এভাবে নিজেকে মৃত বলে মনটাকে আমার কষ্ট দিস না সতী। দিস না দুঃখ প্রাণটাকে আমার নিজেকে তুই "ভূত" বলে। দোহাই তোর সতী।

ভূতুদার গলায় যেন চাপা কান্নার স্বর। চোখেও যেন তার সংযত অশ্রু। প্রাণের ব্যথাটা তার বুঝল সতী। করল অনুভব তার অন্তরের আঘাতটা। তাই শান্তস্বরে স্বাভাবিক মানুষের মতই ভাব-ভঙ্গী নিয়ে হাত নেড়ে বলে উঠল সে, "—বেশ বাবা বেশ, বলব না। এভাবে দুঃখ করো না তো তুমি। মনটাতে তোমার কষ্ট হলে প্রাণটাতে আমার কত যে লাগে তুমি বুঝি জান না। শান্ত হও ভূতুদা।

কথায় তার চুপ করল বটে ভূতুদা কিন্তু ভাব-গম্ভীর অবস্থাটা দেখে তার বুঝতে পারল সতী যায় নি তার মনের আঁচটা। যাবেও না সহজে জানে সতী। ছেলে মানুষের মত মনটা তার। তাই কোন কিছুর জন্য গোঁ ধরলে মুখটা তার ওমনি গোমড়াই থাকবে। থাকবে ততক্ষণ—যতক্ষণ না ঝোঁক ধরা ইচ্ছাটা তার পূর্ণ হবে। সামাল দেবার জন্য মনটাকে ভূতুদার, শান্তস্বরে বলে উঠল, সতী,—সত্যি তাহলে ভূত দেখবে তুমি?

"—ইচ্ছা তো তাই।" বলে উঠল ভূতনাথ,—কিন্তু ওভাবে যদি তুই কথা বলিস আমার সঙ্গে তবে দরকার নেই আমার সে কৌতূহলে। মনের ইচ্ছা মনেই থাক আমার।

—কিন্তু এটা যে বাবা কাল-ভৈরবের থান ভূতুদা। এখানে কারো ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না। বাবা আমার ইচ্ছা-পূরণ ঠাকুর। তার পবিত্র মণ্ডপে যখন অন্য কোন প্রার্থনা ছাড়া ওই ইচ্ছাই জেগেছে তোমার অন্তরে তখন বাবার কৃপায় তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু যেভাবে তাদের দেখা-শোনার কথা বলছো তুমি সেভাবে তাদের দেখা-বুঝা তোমার তো ওই স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে হবে না ভূতুদা। বাস্তবে মাঝে-মধ্যে স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে ওই অশরীরী সত্তাগুলো ক্ষণিকের জন্য কারো কারো দৃষ্টিগোচর হয় বটে কিন্তু তোমার তাদের সে দেখায় তৃপ্তিও হবে না বা যেভাবে তাদের দেখা, শোনা, বুঝার কথা বলছ তুমি সেভাবে দেখায় তোমার সে সাধ পূরণও হবে না।

কারণে সতী বলতে লাগল ভূতনাথকে যে ওসব ভূত-প্রেত অশরীরী আত্মারা হল অন্য-ভূমির বাসিন্দা। তাদের স্তর আলাদা। এক এক স্তরের প্রাণের স্পন্দন এক এক রকমের। সমভূমির বাসিন্দারা একই স্পন্দনশীল হওয়ায় পরস্পরকে দেখতে পায় ভাব-ভাষা আচার-ব্যবহারের বিনিময় করে। অবশ্য ভূলোকের সঙ্গে অশরীরীদের ওই ভুবর্লোক ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে এবং তারা ভূলোক থেকেই সদ্য সদ্য ওই লোকে যায় বলে ভূলোকের তাদের রূপ-ছাপ অনেকটা থেকে যায় নাইলে সে লোকে তারা রঙ-রূপ মনঃপ্রকৃতি, স্বভাবের গতি ভিন্ন নিয়ে ওই সূক্ষ্মলোকে নাকি বিচরণ করে। তবে সূক্ষ্মশক্তি থাকে যদি কারো, তাহলে ভূলোকের সেই শক্তিধর বাসিন্দারা তাদের সূক্ষ্ম-দৃষ্টির বলে দেখতেও পায় যেমন—দিব্যশক্তির বলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগও করতে পাবে তেমন। আসল কথা হল—ভূতুদাকে তার সেই সূক্ষ্মসত্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে করতে হবে সূক্ষ্ম দেহেই। স্থূল দেহ থেকে তাই বেরিয়ে আসতে হবে তাকে সূক্ষ্ম-সত্তায। সেই সত্তায় তাদের শুধু অবলোকন করতেই পারবে না সে—পারবে তাদের সঙ্গে মিশতে, কথায় বার্তায় তাদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করতে।

তাই যদি হয় তবে সূক্ষ্ম-সত্তাটাকেই তার নিয়ে যাক না সতী তাদের কাছে। ভূতনাথের চরম গোঁ। চঙ্ চড়েছে তখন তার মাথায় ভূত প্রেতদের চাক্ষুস দেখার স্পৃহাটা তখন যেন সে আর চেপে রাখতে পারছে না কিছুতেই। ধৈর্য্য ধরতে না পেরে তাই ছোট ছেলের মত ঝাঝাল স্বরে বলে উঠল সে,—কি করলে কি হয় সে তুই বুঝবি সতী। জানি না আমি এতসব। চাইও না জানতে। আমি ভূত দেখতে চাই। পারবি যখন দেখাতে তুই ভূত তখন দেখাতে তাদের হবেই তোকে আমাকে। ওসব সত্ত্ব-ফত্ত্ব তুই বুঝবি। আমাকে শুধু কি করতে হবে বল?

"—বেশ," কেমন যেন এক ভাব-গম্ভীর গলায় বলে উঠল সতী,—বোসো তাহলে এই বাবার থানে, ভৈরব নাথের দিকে মুখ করে।

ভৈরব নাথ মানে উঁচু একটা মাটির বেদীর উপর গাদা করা কতকগুলো পোড়া-মাটির ভাঙ্গা হাতী-ঘোড়া। উপরটা তার কাল-কুচিলা, নিম-বাবলা আঁকড় গাছের ছাওয়া। ডাল-পালাগুলো তার আশ পাশের অন্ধকারটাকে জাপটে ধরে স্থানটাকে করে রেখেছে বেশ ভাব-গম্ভীর, ঘোরালো। সতীর কথায় বসল ভূতনাথ সেই বেদীটার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় আদেশ হল তার,—চোখ দুটো বন্ধ কর তোমার।

বন্ধ করল ভূতনাথ তার চোখদুটো।

—এরপর মনে মনে চিন্তা কর আমাদের ভূতগ্রামের বাবা ভূতনাথের সেই কালো-পাথরের লিঙ্গমূর্ত্তিটা।

তাই চিন্তা করতে আরম্ভ করল ভূতনাথ।

তারপর এল সতীর তৃতীয় নির্দেশ,—যতক্ষণ না চোখ খুলতে বলব আমি ততক্ষণ কিন্তু কিছুতেই, কোনোমতেই চোখ খুলবে না তুমি।

বেশ বাবা—তাই সই। বাবা ভৈরব নাথের সামনে চোখ মুঁদে ধ্যানস্থ অবস্থায় বসে রইল ভূতনাথ—ধীর স্থির অচঞ্চল হয়ে। সতীর কোন আদেশ কোনো মতেই অমান্য করবে না সে। মনে নিয়ে এই ভীষ্ম প্রতীজ্ঞা রইল বসে ভূতনাথ।

(আঠারো)

গ্রাম-দেবতা পাথরমুড়ির এই ভৈরব থানটা মড়া নামাবারও জায়গা। বিভিন্ন গাঁয়ের মড়াকে ঘর থেকে বের করে শ্মশান যাবার পথে এখানে এনে নামান হয়। বাবার থানের মাটি ছুঁইয়ে আশীর্বাদ নেওয়া হয় তার আত্মার শান্তির জন্য। তারপর দাহ করতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় অদূরে গন্ধেশ্বরী নদীর বুকে "সতীঘাটার" শ্মশান ঘাটে। এই এখানের নিয়ম। এই নিয়মের জন্য গাঁয়ের মাথার এই স্থানটাতে রাত্রে তো দূরের কথা দিনের বেলাতেও পা মাড়ায়নি কেও। কিন্তু ভূতনাথ! বাবা ভৈরবরাজের স্থান মাহাত্ম্য—না সতীর বাক-শক্তির ফল কি না কে জানে দিব্যি রইল বসে সেই স্থানটাতে একা! নির্জন রাত্রে সেই জটলা-বাঁধা গাছ-গাছালিগুলোর নীচে চোখ মুঁদে, ভূতের মতন। অবাক।

চারধার ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। অন্ধকারের যেন সমুদ্র। সে সমুদ্রের বুকে স্থানটাকে মনে হতে লাগল যেন একটা সৃষ্টি ছাড়া দ্বীপ। আর ভূতনাথ তাব বুকে যেন একটা ছন্নছাড়া জীব। অবশ্য দলের দল জোনাকী পোকারাও ছিল সেখানে। আশা-পাশ ঝোপ-ঝাড় থেকে ঝাঁকের ঝাঁক ছড়াচ্ছিল তারা আলো দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। আর ছিল কাতারে কাতারে ঝিঁ ঝিঁ পোকা। বাপরে বাপ্ ঝিল্লির রব নয় যেন-শাকচুন্নির চিৎকার! গাছের আড়ে, ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে তারা চিৎকার করে চলেছিল সব একটানা, তারস্বরে। সাতে-পাঁচে বেশ জমিয়ে রেখেছিল সকলে ব্রহ্মডাঙ্গার এ কোলটাকে। জাঁকিয়ে রেখেছিল এই পরিবেশটাকে বেশ জমকালো ও ঘোরালোভাবে।

ভূতনাথের এসব দিকে মন ছিল কিনা কে জানে। তবে ঘনান্ধকারে নির্জন প্রকৃতির এই কোলটা অদ্ভুত একটা উপলব্ধি, অপূর্ব একটা অনুভূতি এনে দিচ্ছিল তার অন্তরে। নির্ভয়ে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে ছিল ভূতনাথ। বোধ হয় সতীর প্রভাবেই। না জানি কি মোহিনী ছিল তার বঁধু সতীর কথায়—এমন শান্ত-শিষ্ট ভদ্রছেলে হয়ে, বশংবদ নম্র ভালছেলে হয়ে, লক্ষ্মী ছেলে সেজে থাকেনি সে কখনও জীবনে। আর বাবা ভূতনাথের লিঙ্গ-মূর্ত্তি চিন্তা? রাম বল। ভূতগ্রামের উচ্চিংড়ে এ ভূতের ধাতে সেটা ছিল সম্পূর্ণ ধারনার বাইরে। তবু যে রইল বসে সে ধ্যান-মগ্ন ঋষির মত সেটা হল তার নিছক কৌতূহলের জন্য। নইলে কার বাপের সাধ্যি ভূতনাথকে এমন একদণ্ডও দেওয়ালে পেরেক-আঁটা ছবির মত ওমনি আটকে রাখে? অসম্ভব। অকল্পনীয়।

কিন্তু যাক গে ওসব কথা। হঠাৎ বসে থাকতে থাকতে মনে হল ভূতনাথের যেন একটা জমাট-বাঁধা ঠাণ্ডা বাতাস মাথার উপর থেকে শরীরের নীচ দিকে বয়ে গেল তার। একবার নয়—বারবার তিনবার। সত্যি এটা জমাট-বাঁধা ঠাণ্ডা হাওয়া না সতীর হাতের শীতল স্পর্শ ঠিক বুঝতে পারল না ভূতনাথ। তবে এ অবস্থায় কিন্তু তাকে বাহাদুর বলতে হবে। কারণ বার বার সে স্পর্শটা দেহটাতে তার শিহরণ জাগিয়ে চলে গেলেও চোখ কিন্তু কিছুতেই খুলল না ভূতনাথ। খুলবে কেন চোখ? সতীর আছে যে মানা। সে মানাকে অবমাননা করতে পারে কখনও ভূতনাথ? কিছুতেই না। খুললে আঁখি তার আশার পাখি যদি ফাঁকি দিয়ে পালায়! সুতরাং রইল ভূতনাথ সব সহ্য করে, ধৈয্য ধরে। শিহরনের কৌতূহলটাকে যেন টুঁটি চিপে দমন করে।

মনে হয় এক সম্মোহনী শক্তি ছিল ওই হিম-শীতল স্পর্শটার। কারণ গায়ে বুলতেই সেটা কেমন যেন একটা ঝিমুনির ভাব এল ভূতনাথের। আস্তে আস্তে জড়িয়ে আসতে লাগল তার চোখ। আড়ষ্ট হয়ে আসতে লাগল তার শরীরটা। নিদ্রার একটা আবেশ এসে ভুলিয়ে দিতে লাগল যেন তার সমস্ত কিছু। সঙ্গে সঙ্গে গুলিয়ে দিতে লাগল তার স্থান-কাল-পাত্র বোধ, অতীত বর্তমান চিন্তা। প্রাণপনে ভূতনাথ সচেতন থাকবার চেষ্টা করতে লাগল উৎকর্ণ হয়ে। কিন্তু কেমন যেন একটা ঘোর এসে আচ্ছন্ন করে দিতে লাগল তাকে। জোর করে যেন পাড়াতে চাইল তাকে ঘুম।

কাটল কতক্ষণ কে জানে। হঠাৎ কানে এল তার এক ডাক। বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহু প্রত্যাশিত এ যেন তার সতীর কণ্ঠস্বর,—ভূতুদা, উঠ এবার ভূতুদা। খোল এবার চোখ। তাকাও তুমি।

ওমনি ধড়ফড়িয়ে উঠল ভূতনাথ। কিন্তু তাকাতেই হল তার চক্ষু চড়কগাছ। একি ? কোথায় সে। কোন অবস্থায় সে। দাঁড়িয়ে আছে সে কোথায়—জমিনে না আসমানে। ভাসছে সে শূন্যে, না দাঁড়িয়ে আছে সে আলতোভাবে মাটির উপর। চাঁদও নেই, সূর্য্যও নেই। সুতরাং দিন না রাত এটা। আলো নেই অথচ চারধার এক অদ্ভুত আভা। সে আভা আবার এমন উজ্জ্বল যেন ভর দুপুরের সূর্য্যের জ্যোতিকেও হার মানাচ্ছে। স্নিগ্ধ আলোয় তার দেখা যাচ্ছে সব কিছু স্পষ্ট ভাবে এবং নিখুঁতভাবে। ঘুমন্ত না জাগ্রত ভূতনাথ অর্থাৎ স্বপ্নে আছে না জাগরণে আছে সে। কিচ্ছু বুঝতে না পেরে সে দাঁড়িয়ে রইল ভ্যাবা গঙ্গারামের মত। বিস্ময় বিহ্বল চোখে তাকাতে লাগল সে শুধু ফেল-ফেল করে। যেন সে কোনো এক অজানা গ্রহ থেকে ছিট্‌কে আসা এক জীব—হঠাৎ এসে পড়েছে অজ্ঞাত এ জগৎটাতে।

"—কি ভূতুদা ?" চমক ভাঙ্গাল তার সতী, "—দেখছো কি এমনভাবে ?" বলে উঠল সে তাকে,—ভূত দেখব বলেছিলে না ? দেখবে যদি তোমাদের কারখানার ভূত তবে তাকাও ওদিকে।

সত্যি, এসব কথা ভুলেই গেছল ভূতনাথ। একদম মনে ছিল না তার। সতীর কথায় চমক ভাঙ্গতেই তাকাল সে তার আঙুল বাড়িয়ে দেখান নির্দেশিত দিকটার দিকে। চোখে পড়ল অবিনাশ বাবুর কারখানাটা। নজরে এল সেখানের ঘর-বাড়ী মেশিন-পত্র সমস্ত কিছু। দেখল, কাটা বটগাছটার গোড়ায় গড়ে উঠছিল যে মেশিন ঘরটা সেটা আধভাঙ্গা অসম্পূর্ণ অবস্থায় যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল দিনের আলোকে যদিও দেখে এসেছিল ভূতনাথ যে মেশিন-ঘরটা করবার জন্য সমূলে উৎখাত করা হয়েছিল বটগাছটাকে তবুও দেখল সে সেখানটার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন একটা বটগাছের ছায়া। ছায়া-রূপটা গাছটার অবিকল সেই বট-গাছটার মতই। যেটা ভোজুর সঙ্গে এই কারখানায় প্রথম আসার দিন দেখেছিল সে। বসেছিল যেটার বুড়ো শিকড়ের উপর। শুধু সে শিকড়গুলোর ছায়া নিয়েই নয়—ডালপালা, ঝুলন্ত ঝুরির পর্য্যন্ত ছায়ার আকার-প্রকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। এর চেয়েও আশ্চর্য্য আবার বট-গাছটার পুব-পাশে তার চোখে-পড়া নানা ঝোপ-ঝাড় ও গাছপালা। রয়েছে যেন সব বয়ে-যাওয়া গন্ধেশ্বরী নদীর চড়া-ফেলা পাড়টার উপরই। অস্পষ্ট ছায়া-ছবির মত ভাসছে যেন ওসব অবিনাশবাবুর কারখানার পূর্ব-পাশের প্রাচীর ধারের ঘর-বাড়ীগুলোর উপর। অদ্ভুত তো।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই ভূতনাথ, বলে উঠল সতী,—ও হল জায়গাটার আদিরূপ ভূতুদা। নাম ছিল যখন স্থানটার "মড়া ফেলার ডাঙ্গা" বা " মানুষ পোতার চর।" জগতের কোন কিছুই একেবারে মুছে যায় না ভূতুদা। কায়া হারিয়ে গেলেও ছাপ থেকে যায় তার আপন আপন জায়গায়। মুছা শ্লেটে আগের আঁকা ছবির মত। ওছবি আবার স্পষ্ট করতে চা;হ তারা—যারা থাকে ওসব ছবির মায়ায় জড়িয়ে। কল্পনায় এনে অতীতটাকে বর্তমানের বাস্তব ভূমিতে ভোগ করতে চাইছে সেকালের সেই মৃতদের অজ্ঞান আত্মাগুলো। তাই দেখছো তুমি ওখানে ওসব হারিয়ে যাওয়া দৃশ্যগুলো।

সত্যিই তাই। অবাক চোখে দেখতে লাগল ভূতনাথ কতকগুলো ছায়ারূপী কায়া। আবছা অস্পষ্ট কতকগুলো মনুষ্যমূর্ত্তি। ঘুরছে ফিরছে সব সেখানের ঝোপে-ঝাড়ে। উঠছে কেও মাটি ফুঁড়ে, নামছে কেও গাছের থেকে। কবরের নাকি প্রেত ওসব—গাছ-গাছালির প্রেতাত্মা। নেমেই সব ঠেলা মেরে ফেলতে চাইছে যেন কারখানার সেই প্রাচীরটা। ভাঙ্গতে চাইছে ঘরবাড়ী। পারছে না। ছায়ার হাত তাদের ছায়ার মতই ঘোরাফেরা করছে শুধু। নিষ্ফলভাবে। রেগে উঠাতে চাইছে তারা মেশিনপত্র। টেনে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে সব কলকব্জাগুলো। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তাদের সব কায়দা-কসরৎ শূন্যে হাত-পা নাড়ার মতই বায়ু-রূপী হাতগুলো তাদের ঘোরা-ফেরা করছে শুধু সেই মেশিন-পত্র কলকব্জাগুলোর ভিতর। অবাস্তব হাতে তাদের বাস্তব জিনিস যাবে কেন ধরা। তাই যাচ্ছে ওসব তাদের হাত থেকে ফস্কে। ফস্কে যেতেই সব রাগে যেন উস্কে উঠছে তারা। ব্যর্থ হয়ে বাস্তবে সব ক্রোধোন্মত্ত হয়ে কল্পনায় ছুঁড়ো-ছুড়ি করছে ওসব মেশিন-পত্র। সকলে মিলে দেওয়াল ভাঙ্গার করছে অভিনয়। শব্দ তন্মাত্রা আশ্রয় করে উঠাচ্ছে-ওসব তারা হুড়-মুড়, দুদ্দাড় শদ, ঝন্-ঝনাৎ হঠ্-ঠঙ্গ ঠাং ; আওয়াজ, হড়-ধড় ধড় বিচিত্র সব ধ্বনি। দেখতে তাদের না পেয়ে ওই সব আওয়াজই তখন বোধ হয় শুনেছিল ভূতনাথ। অদৃশ্য-অলৌকিক এই সব ভৌতিক শব্দগুলোই মনে হয় ভয় ধরিয়ে লাল বাহাদুরদের করেছিল চঞ্চল।

বলে উঠল সতী,—সূক্ষ্ম জগতের অতি নীচুস্তরের আত্মা এরা। স্থূল জগতের উপরই নিজেদের বৃত্ত রচনা করে থাকে। তার মধ্যে এরা কল্পনাকে আশ্রয় করে। এ বৃত্তের মধ্যে উপরের কোন উচ্চাত্মার স্পন্দন যেমন প্রবেশ করতে পারে না—তারাও তেমনি নিজেদের কম্পন এ বৃত্ত ছাড়িয়ে উপরে নিয়ে যেতে চায় না। মানুষ এদের বৃথা ভয় করে। আসলে মানুষকেই এরা ভয় করে বেশী। বিশেষ করে সৎ-আধারকে। তন্মাত্রাকে আশ্রয় করে শব্দ গন্ধ ছাড়া বড়জোর ওই ছায়ারূপ ধরতে পারে তারা। তার বেশী আর অন্য কিছু করার এদের ক্ষমতা নেই। এদের কথাই তো বলছিলাম তোমাকে। এরা বড় অবোধ ভূতুদা, বড় অসহায় আত্মা।

"—এরাই তাহলে ভূত?" হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

"—এক ধরনের ভূত বলতে পার এদের।" বলে উঠল সতী,—দেখবে আর একধরনের ভূত? তাকাও তবে ওই গাঁ-গুলোর দিকে।

তাকাতেই ভূতনাথ দেখল এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। একবার তাদের বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের উপর উঠছিল সে। চড়েছিল তার শীর্ষদেশের উঁচু বড় চূড়াটায়। দেখেছিল দূর-দূরান্তের গ্রাম-নদী, রাস্তা-ঘাট, মাঠ-ময়দানগুলোর দৃশ্য। পায়ের নীচে, পাহাড়ের কোলের কাছে, অতি নিকটে তার হাতের নাগালের মধ্যে যেমন তখন মনে হয়েছিল সবকিছু তেমনি ভূতনাথের বোধ হতে লাগল এখন। দূর-নিকটের কুমারখুলি,-পাথরমুড়ি, পলাশডাঙ্গা—গদারডিহি ইত্যাদি গ্রামগুলোকে মনে হতে লাগল তার যেন কোলের কাছে। গায়ে-পিঠে জাপটা-জাপটি করে আছে যেন সব তার একেবারে হাতের মধ্যে। না জানি কি এক অদ্ভুত শক্তিলাভ করেছিল ভূতনাথের চোখ-দুটো। তাই গ্রামশুধু নয়—গ্রামের প্রত্যেকটা অলি-গলি, কুলি-কোণা; পাড়ার প্রতিটা ঘর-দোর, ঘরের প্রতিটি আনাচ-কোনাচ এত স্পষ্ট ও নিখুঁত ভাবে নজরে আসতে লাগল তার যা ভর-দুপুরে ভর্ত্তি রোদের মধ্যেও এত পরিষ্কারভাবে কোনদিন চোখে পড়েনি তার। এ দৃষ্টির এমন ঠিকরে পড়ার ক্ষমতা যে ঘরের বেড়-প্রাচীর, কুঠুরীর দেওয়াল-ছাদ সমস্ত কিছু ভেদ করে পড়তে লাগল গিয়ে একেবারে ঘরের ভিতর, কক্ষের অন্তরালে। কোঠা-কুঠুরী বার-ভিতর, আড়াল-আবডাল, কোন কিছুই বাদ যেতে লাগল না তার চোখের নজর থেকে! অবাক কাণ্ড! তাজ্জব ব্যাপার!

তা-তো হল। কিন্তু কি ওগুলো—পড়ছে এসে যেগুলো তার নজরে? গ্রাম চৌহদ্দির ভিতর-বাইরে, পাড়ার কুলির অলিতে-গলিতে, নালার পাশে, নর্দ্দমার ধারে ঘুরছে ফিরছে যে অদ্ভুত ধরনের জীবগুলো-কি ওসব! দেখতে কতকটা মানুষের মতই অথচ যেন ঠিক মানুষ নয়! কিম্ভুত কিমাকার অবয়ব সবার মাথার সঙ্গে ধড়ের, পিঠের সঙ্গে পেটের, অঙ্গের সঙ্গে প্রত্যঙ্গের কোন সামঞ্জস্য নেই তাদের। ছোট বেলায় কোনো এক বই-এ পড়েছিল ভূতনাথ ভূত-প্রেতদের আকার-আকৃতির সব অদ্ভুত বিবরণ। এদের ঢঙ্-ঢাঙ্ রং-রূপগুলোও ঠিক তেমনি। যেমন—

> হাতগুলো যেন সরু পেকাটি কানগুলো যেন কুলো।
> পা-গুলো সব কঞ্চির মত দাঁতগুলো যেন মূলো।।
> বুকটা কারো বুটির মত, মুখটা কারো হাঁড়ি—
> পেট্‌টা কারো শূন্য খোলা কারোর বড় কুঁড়ি।।
> কারো ছুঁচোমুখ, কেও পেঁচামুখী কেও বা কুকুর খেঁকি—
> কেও বা শুধুই হাড়-কঙ্কাল কেও কেঁদের ঢেঁকি।।

যেমনি গড়ন তাদের তেমনি বরণ। গঠনগুলোও সব ভিন্ন ভিন্ন। কেও ধোঁয়াটে ধূসর, কেও বাদামী-মেটে, কেও লম্বা, কেও বেঁটে, কেও কালো পাথর, কেও যেন আবার কামার ঘরের হাফর।

দেখিয়ে তাদের পরিচয় দিতে লাগল সতী। এরা হল নাকি আর এক ধরনের ভূত। সত্তাটা ভূতনাথের ভুবর্লোকে এসেছে বলে দেখতে পাচ্ছে। একেই বলে প্রেতলোক। পৃথিবী অর্থাৎ ভূঃলোক ও স্বঃলোকের মাঝে নাকি এ-লোক অবস্থিত। জাগতিক কর্মফল মানুষের আগে আগে যায়। মৃত্যুর পর কর্ম-ফলই সত্তাকে তার টেনে আনে এই ভুবর্লোকে। আতিবাহিক এক দেহ ধারণ করিয়ে জীবনের পাপ-পুণ্যের ফল তাকে ভোগায়। মৃত্যুর পর আত্মার বায়বীয় এই লিঙ্গ-শরীর পার্থিব দেহেরই ছাঁচে তৈরী হয় বটে কিন্তু অনুরূপভাবে তা পার্থিব

শরীরের মত ক্ষুধা-তৃষ্ণা নির্বারণ করতে পারে না। অথচ এই সূক্ষ্মদেহে পার্থিব ভোগাকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনা, লালসা-তাড়না সহস্রগুণ যায় বেড়ে। হয় নাকি অত্যন্ত প্রখর ও তীব্র।

"—তাহলেই কি কষ্ট বুঝ ভূতুদা।" বলে উঠল সতী,—পার্থিব দেহ নেই অথচ পার্থিব ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভোগাকাঙক্ষা, লালসা-কামনা আছে প্রবল ভাবে, প্রচণ্ড রকমের। কি অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা, কি অসীম দুঃখ-কষ্ট, কি অপরিমেয় অশান্তি নিয়ে সত্তাদের এখানে সূক্ষ্ম শরীরে ছুটে বেড়াত হয়, ছটফট্ করতে হয় বল দেখি? অবশ্য জীবনে পাপ-পুণ্যের মাত্রা যার যেরকম তাকে সেরকম এ লোকের আঁচ সহ্য করতে হয়। কিন্তু ভোগাসক্তিহীন যাদের জীবন, কামনা-বাসনার দাস নয় যারা তারা মৃত্যুর পর এ স্তর অতিক্রম করে উর্ধ্বলোকে যায় চলে। যায় দেবযানের পথে। উৎক্রান্তি হয় তার সূক্ষ্মসত্তার।

—ওরা কেও ক্রধোন্মত্তভাবে, কেও ঈর্ষাপরায়ণ দৃষ্টিতে, কেও কামনা-কাতর নজরে তাকিয়ে আছে কেন গ্রামের ঘর-গৃহস্থ লোক্‌জনের দিকে। ক্ষোভ, লোভ, ঘৃণা-আক্রোশ হিংসা-বিদ্বেষ যেন ফেটে পড়ছে ওদের চোখে। ব্যাপার কি সতী?

উত্তরে সতী বলে উঠল তাকে যে ওরা হল নাকি পাপাত্মা। পাপ-পূণ্য বোধহীনভাবে কাটিয়েছে ওরা জীবৎকাল। নির্বিচারে, বেপরোয়াভাবে পার্থিব জীবনটাকে ওরা করে এসেছে ভোগ। সেই সংস্কার নিয়েই মৃত্যুর পর ঘুরছে ওরা। দেহহীন অবস্থায় দৈহিক ভোগসুখ এ সূক্ষ্ম স্তরে নাকি কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু সে বোধ তাদের মনে স্থান পেলে তো। জীবনের ভোগ-সুখ তাই যতই এখানে পারছে না তারা মিটাতে ততই তারা হয়ে উঠছে ক্রোধোন্মত্ত। দেহ্-ধারী জগতের মানুষগুলোর উপর ততই যাচ্ছে তারা ঈর্ষা-হিংসায় ফেটে। কেও কেও নাকি তাদের পার্থিব ভোগ-তৃষ্ণা মেটাবার জন্য খুঁজছে অন্য পথ। অন্বেষণ করছে তাদের মত নীচ স্বভাব, হীন মনোভাব সম্পন্ন মানুষ। সম মনোভাবাপন্ন মানুষ পেলে তো কথাই নেই। না পেলেও মানুষের চরিত্রের ক্ষণিক দুর্ব্বলতার জন্য ওৎ পেতে থাকে ওরা। ইতর অন্যায় নীচ ভোগাকাঙক্ষী দুর্ব্বল মন পেলে কারো সেই সুযোগ ঢুকে পড়ে তারা তাদের দেহের মধ্যে। সত্তাটাকে তার আচ্ছন্ন করে কব্জা করে তার দেহ-মন-প্রাণ। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা করে তারা। অর্থাৎ পরের দেহ-যন্ত্রটাকে নিজের ইচ্ছায় পরিচালিত করে নাকি ভোগ তৃষ্ণা মেটাবার করে তারা প্রয়াস। পার্থিব জীবনের এ অবস্থাটাকে অনেকে বলে "ভূতে পাওয়া" বা "প্রেতে ভর করা।"

"—তাই নাকি?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ,—"মানুষকে তারা তাহলে এভাবে ভর করতে পারে?

"—সব মানুষকে নয়।" বলে উঠল সতী,—কামনা-বাসনার অধীন থাকে যারা—যারা লোভ-লালসার দাস তাদের মনেই সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এরা। অবিবেচক, অবোধ-অজ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকেই এরা সহজে কব্জা করতে হয় সমর্থ। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল মন যাদের অর্থাৎ হট করে যারা উত্তেজিত হয়ে উঠে, অকারণে হয় ক্রোধোন্মত্ত—তারাই হয় এদের সহজ শিকার। কিন্তু যে মানুষ নিজের রাগ-দ্বেষ হিংসাকে দমন করবার শক্তি রাখে—যারা কলহ্-ক্রোধের মধ্যেও নিজেকে বিবেক সচেতন রাখতে হয় সক্ষম তাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না এরা। পাশ ঠেসে না এরা তাদের যারা নাকি ভগবৎ-চিন্তনে, সৎ ভাবনা-চিন্তায় নিজেদের মনকে রাখে পবিত্র ও নির্মল।

কথায় কথায় আর এক অদ্ভুত ব্যাপার জানল ভূতনাথ। সেটা হল এই—মানুষ যে অনেক সময় হঠাৎ হঠাৎ অমানুষ হয়ে উঠে তার কারণ নাকি এইসব দুষ্ট-নষ্ট প্রেতাত্মাগুলোই। মাঝে-মধ্যে বোধ-বুদ্ধিহীন হয়ে মানুষ যে হঠাৎ অকাণ্ড কুকাণ্ড করে বসে—অঘটন ঘটিয়ে ফেলে তারও কারণ তলিয়ে দেখতে গেলে নাকি ওই নীচুস্তরের প্রেতাত্মাগুলোরই প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে।

"—কেন? করে কেন ওরা এমন কাজ?" অবাক হয়ে ভূতনাথ জিজ্ঞেস করল সতীকে,—মানুষকে এভাবে অমানুষ করে, তাদের দিয়ে এমন অঘটন ঘটিয়ে লাভ কি হয় এই প্রেতাত্মাগুলোর?

"—লাভ কি বরং অলাভই। আত্মাকে এভাবে কলুষ-কালিমা লিপ্ত করলে বরং ক্ষতি হয় তাদের। কারণ সত্তার এতে উর্ধ্বগমনে বিলম্ব ঘটে। আত্মার তাদের উৎক্রমনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পরকে এভাবে অসৎ

পথে পরিচালিত করার প্রকৃতি। কিন্তু—"মুখে টেনে হাসির রেখা বলে উঠল সতী, "—সেই কথায় বলে না স্বভাব যায় না মলে, চরিত্র যায় না ধোলে।"

অর্থাৎ ভূলোকের ওই আপ্তবাক্যটা সত্য নাকি এখানে। অর্থাৎ মরলেও নাকি মানুষের স্বভার-চরিত্র যার যেমন তেমনিই থেকে যায়। এসব হল নাকি মনের ব্যাপার! তাই দেহের লয়-বিলয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই স্বভাব প্রকৃতির। জীবৎকালে মানুষের যার যেমন মনের ভাব থাকে অর্থাৎ ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, স্বার্থপরতা পরশ্রীকাতরতা দেহের মৃত্যুর পর অবলুপ্তি হয় না তাদের। থাকে তারা মনকে আশ্রয় করে। মনের সঙ্গেই স্থূলদেহ ত্যাগ করার পর আসে তারা সূক্ষ্মশরীরে। স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্মের শক্তি বেশী। জড়দেহের গণ্ডি ও সীমাবদ্ধতা বিভিন্নভাবে তাদের সঙ্কুচিত ও সংযত করে রাখে। কিন্তু সূক্ষ্মেতে এসে তারা হয় বাঁধন ছাড়া, বাধা হারা, বাঁধ-ভাঙ্গা যেন স্রোতের ধারা। অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরে মানুষের ওসব প্রকৃতি নাকি বহুগুণ যায় বেড়ে। আসল কথা হল—মৃত্যু তো আত্মার দেহরূপ আবরণ ত্যাগ করা। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে বলতে হয় মৃত্যু হল জীব-সত্তার খোলস ত্যাগ করা মাত্র। খোলস ছাড়লেও সাপ যেমন যে সাপ ছিল সেই সাপই থাকে। মানুষ তেমনি দেহত্যাগ করলেও সে তার প্রকৃতি নিয়ে থেকে যায়। অর্থাৎ কামনা-বাসনা, সখ-সাধ, লোভ-লালসা তার কিচ্ছু যায় না। সব রয়ে যায় তার মনে। মনই তো হল মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। মৃত্যুর পর অর্চিমার্গে অর্থাৎ উর্ধ্বলোকে মুক্তির পথে মন যাবে কি জাগতিক ওই সব আশা-আকাঙ্খা মনকে করে রাখে এমন ভারী যে উঠতে দেয় না। তাই পরলোকের সর্ব্ব-নিম্নস্তরে ওই সমস্ত প্রবৃত্তি ও চরিত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মন। মনের ওইসব স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ীই আত্মা এখানে ওমনি ভূত-প্রেতের রূপ ধারণ করে করে বিচরণ।

শুনতে শুনতে মনে হল ভূতনাথের এ যেন সেই কঠোপনিষদের যম-নচিকেতার ব্যাপারের মত। সে যেন বাজশ্রবস ঋষির পুত্র নচিকেতা আর সতী হল যেন ধর্মরাজ যম। মর্ত্যপুরী থেকে এসেছে যেন সে এই মৃত্যুপুরীতে। অতিথি হয়ে ধর্মরাজের সে যেন তাকে তার তৃতীয় বরটি প্রদান করবার জন্য বাধ্য করেছে মৃত্যুপতিকে। নাছোড়বান্দা নচিকেতারূপ ভূতনাথের যেন তৃতীয় প্রার্থনা পূরণ করছে ধর্মরাজরূপী সতী। মৃত্যুর পর পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞানদান করে তাকে। যমপুরীতে বসে ভূতনাথ শুনছে যেন সতীরূপী ধর্মরাজের মুখ থেকে মরণোত্তর লোকের কথা অমৃতত্ব, আত্মতত্ত্ব। কর্মের মাধ্যমে আত্মোদ্ধারের জন্যই নাকি আত্মা—"দেহ ধরি জন্ম নেয় সংসার ভিতরে।" কিন্তু সেই মহাভারতে আছে না,—

> এক হয়ে আসে জীব এক হয়ে চলে।
> আমার আমার বলি মরয়ে বিফলে।।
> যেমত যাহার মন তেন তার মতি।
> যেমতকরিবে কর্ম হবে সেই গতি।।

অর্থাৎ জগৎ-জীবনে যে যেমন কর্মের গতি ও মতি-প্রকৃতি নিয়ে কাল কাটায় মৃত্যুব পর মনে সেই সমস্ত সংস্কার নিয়েই এই সূক্ষ্ম লোকে আসে। যারা—

> সংসারে জন্মি করে দুষ্কর্ম নিচয়।
> সেই সব নর প্রেতযোনি সদা হয়।।
> পিতৃযজ্ঞে দেবযজ্ঞে বিমুখ যে জন।
> সেই সব লোক প্রাপ্ত হয় প্রেতগণ।।

প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে এই সব পাপাত্মারা তাদের বদ-স্বভাব অনুযায়ী এই মরণোত্তর লোকে সূক্ষ্মশরীর নিয়েও অন্যায় অধর্ম, কদাচার করে বেড়ায়। তেমনি যাদের সৎ-স্বভাব অর্থাৎ পবিত্র-মনা পুণ্যাত্মারা মৃত্যুর পরও রত থাকে তাদের পুণ্য-কর্মে। সূক্ষ্ম দেহেও পরোক্ষভাবে করে বেড়ায় তারা জীব-কল্যাণ কর্ম। নীচ আত্মা যারা তারা হীন মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে যেমন অভীষ্ঠ পূরণ করার করে পরোক্ষ চেষ্টা। ভর করে আত্মাকে দোষ-যুক্ত করে তার মুক্তিকে যেমন করে সুদূর পরাহত। পুণ্যাত্মারাও তেমনি পুণ্যহৃদয়, সৎমনোভাব সম্পন্ন, শুদ্ধচেতা, পবিত্রমনা মানুষকে আশ্রয় করে। তার দ্বারা পরোক্ষভাবে করে তারা

জগন্মঙ্গল সাধন। এই সমস্ত উচ্চাত্মা, পুণ্যাত্মারাই হল নাকি দেব-দেবী। দেবতাদের কাজ হল মানুষের দিব্যভাবকে উদ্বোধিত করা। আসলে একক মুক্তি অর্থাৎ নিজের মুক্তি তো প্রকৃত মুক্তি নয়। সবাই আমরা সবার সাথে আছি যুক্ত হয়ে। তাই প্রকৃত মুক্তি হল সবার সাথে যুক্ত হয়ে মুক্ত হওয়া। একক মুক্তি হল নাকি স্বার্থপরতারই নামান্তর। তাই ওই সব পুণ্যাত্মারা নাকি উর্ধ্বলোক তথা ধ্রুবলোকের যাবার অধিকারী হলেও নেমে আসেন নিম্ন স্তরে। নিজের মুক্তির সঙ্গে বিশ্বের মুক্তির কামনায় করে বেড়ান তারা কর্ম। তারা আধার খুঁজেন। খুঁজেন পবিত্র হৃদয় শুদ্ধ-নির্মল চিত্ত। যার মাধ্যমে অর্থাৎ যাকে আশ্রয় করে তারা মানুষকে সৎপথে, পবিত্রপথে, মুক্তির পথে টানতে পারবেন। প্রকৃতভাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে অনু-পরমাণু থেকে আরম্ভ করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবাই কিন্তু মুক্তিকামী। মুক্তিপথের যাত্রী আমরা সবাই। আশি-লক্ষ জনম পার হয়ে এসেছি আমরা মানব জীবনে। মানুষরূপে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি মহামুক্তির সিংহ-দরজার সামনে। বোধ-বুদ্ধি-বিবেকের মাধ্যমে আত্মা আমাদের জাগতিক সমস্ত বন্ধন কেটে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য উদ্‌গ্রীব। উপরে পুণ্যাত্মারাও পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে চাইছেন আমাদের। আমরা আমাদের এই দুর্লভ জনম মানুষ জীবন যাতে সৎ-পবিত্রভাবে কাটাতে পারি, জীবনের কাটুকু শুদ্ধচিত্তে যাতে যথা কর্ত্তব্য পালনে অতিবাহিত করতে পারি তার জন্য সদা-সর্ব্বদা ওই উচ্চস্তরের আত্মারা আমাদের পাঠাচ্ছেন ইঙ্গিত। আর যাতে আমরা জাগতিক মোহে কর্ম-চক্রের আবর্তনে না পড়ি, জন্মান্তরচক্রে ঘুরপাক না খাই তার জন্য ওইসব দেবাত্মারা পরোক্ষভাবে করছেন চেষ্টা। পরোক্ষভাবে চেষ্টা করা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছু করার তাদের অধিকার নেই। কারণ ভগবান মানুষকে স্বাধীন-সত্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন এ ধরণীতে। সে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে সত্তাকে তার অপমান করা বেদ-বিরোধী কাজ। মানুষকে আত্মচেষ্টায় উন্নত হতে হবে, যেতে হবে পরামুক্তির পথে। উর্ধ্বলোকের দেবাত্মারা তাই মানুষকে তার বোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই নেমে আসেন এই নিম্নলোকে। অবস্থান করেন বিভিন্নভাবে। বিভিন্ন দেবস্থান, মেলা-মণ্ডপ, মন্দির-দেবালয়ে এঁরাই অধিষ্ঠিত হন দেবতারূপে। পোড়া মাটির হাতি-ঘোড়া, ঘট-পট, বিভিন্ন মূর্ত্তি-প্রতিমূর্ত্তি বিগ্রহ, গাছ-পাথর, বেদী-ঢিপি ইত্যাদি নানা রূপে এইসব উচ্চাত্মারাই করেন অবস্থান। উদ্দেশ্য, মানুষকে তার মুক্তি পথে সাহায্য করা। দেবতা হন তারা মানুষের মধ্যে দিব্য ভাবের বিকাশ করবার জন্য। তাদের সেবা-পূজা ও ভক্তির মাধ্যমে যদি তাদের চিত্ত হয় শুদ্ধ, মন হয় পবিত্র, ত্যাগে হয় রুচি, তাদের মতি প্রবৃত্তির পথ ছেড়ে যায় যদি নিবৃত্তির পথে তবে মুক্তিপথ হবে তাদের সুগম। তাই সুরলোক ছেড়ে মরলোকে তারা এভাবে করেন অবস্থান। মানুষ খুঁজেন তারা। খুঁজেন তারা উন্নত-মনা, পবিত্র-চেতা, বিবেক-সচেতন মানুষ। দেবত্বের পথে তাদের নিয়ে যাবার জন্যই থাকেন তারা জগৎ-জীবনের কাছাকাছি।

—তাঁদের দেখতে পাওয়া যাবে না সতী? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

"—কেন পাওয়া যাবে না?" চিত্ত তোমার শুদ্ধ ভূতুদা, মন তোমার পবিত্র। তাছাড়া এখন তুমি আছ তোমার সূক্ষ্ম সত্তায়। চোখে তোমার এখন দিব্যদৃষ্টি। নিশ্চয়ই পাবে তুমি তাঁদের দেখতে। বলেই সতী নির্দ্দেশ করল তাকে,—তাকাও একটু ভৌতিক স্তরটার থেকে সামান্য উপরে।

দৃষ্টিটাকে একটু উপরে তুলতেই দেখল ভূতনাথ নীলোজ্জ্বল, স্বর্ণাভ, শ্বেত-শুভ্র নানা জ্যোতির অবয়ব। ইতস্ততঃ ঘুরছে তারা নানা রঙের আলোর বিন্দুর মত। যেন সব নীল আকাশের চলমান তারকা। দেখিয়ে তাদের বলল সতী,—এদের কৃপালাভের জন্য মনকে সদাশুদ্ধ রাখতে হয় ভূতুদা। প্রভাবে এদের জন্ম হয় সার্থক, জীবন হয় ধন্য।

দেখবে কি ভূতনাথ দৃষ্টিটাকে টানল যে তার অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কতকগুলো হলদে সবুজ, মেটে-বাদামী ছায়া-ঘন অবয়ব। জিজ্ঞেস করল সে,—ওরা কারা সতী?

"—ওরাই হল আর এক ধরনের ভূত-প্রেত ভূতুদা।" উঠল বলে সতী।

—পরস্পর ওরা ঝুনোপুটি, ঝাগড়া-ঝাটি মারামারি করছে কেন?

—ওই তাদের স্বভাব। এই প্রকৃতি, মনের গতি নিয়েই মরেছে ওরা। এসেছে ওই সংস্কার নিয়েই মর্ত্যজীবন থেকে এই সূক্ষ্মলোকে। জীবৎকালে ওরা ছিল খল, কপট, স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর। জমিজমা নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে গণ্ডগোল, তুচ্ছস্বার্থ পূরণ নিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মনোমালিন্য, খেঁচামেচি এই নিয়েই কাটিয়েছে ওরা জীবন। সে স্বভাব মৃত্যুর পরও তারা ছাড়তে পারেনি। তাই তারা করছে এমন দুষ্টামি, গুণ্ডাটি।

—আর ওই যে কতকগুলো হলদে আভার নারী মূর্ত্তি, ছুটছে মনে হচ্ছে পুরুষদের পিছনে পিছনে—কারা ওরা? ওই সব সবজেটে রঙের পুরুষের মূর্ত্তিগুলোই বা কাদের, ঘুর ঘুর করছে যারা নারীর পায়ে পায়ে?

"—ওরা হল কামুক-প্রকৃতির প্রেতাত্মা ভূতুদা।" উত্তরে ভূতনাথকে বলে উঠল সতী,—পার্থিব জীবনটা কাটিয়ে এসেছে ওরা কাম-রিপুর দাসত্ব করে। সূক্ষ্মে এসে সে রিপুর তাড়না সহস্রগুণে অধীর করেছে তাদের। তাই নারীদেহ ভোগলালসায় পুরুষ-রূপী ওই প্রেতাত্মাগুলো ছুটছে যুবতীদের পিছনে, আর কামুকা পেত্নীগুলো ঘুর ঘুর করছে নর-পুঙ্গবদের কাছে-পিঠে। কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থতার আশায়।

দেখতে দেখতে ভূতনাথের নজর ঠিকরে গিয়ে পড়ল গৃহস্থ বাড়ীর অভ্যন্তরে এক জানালা-দরজা বন্ধ কক্ষের মধ্যে। দেখে ভূতনাথের নিজেকেই নিজের লাগতে লাগল অবাক! কি করে দরজা-জানালা, এমন কি ছাদ-দেওয়াল ভেদ করে পড়ল গিয়ে নজরটা তার ওই কুঠরীটার মধ্যে। সে ঘরে একই বিছানায় শুয়ে ছিল এক নারী ও পুরুষ। যুবক-যুবতীদ্বয় স্বামী-স্ত্রীই মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য। এখানেও দেখল ভূতনাথ কতকগুলো প্রেত-পেত্নী। বিছানাটাকে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সব ভীড় করে। লুব্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারা ঘুমন্ত নারী-পুরুষটার দিকে। ড্যাবড্যাবে লালসা-কাতর চোখ দিয়ে যেন গিলে খেতে চাইছে তারা দম্পতি-যুগলকে। ব্যাপার কি?

ব্যাপারে ভূতনাথ জানল সতীর কাছে সেই একই কথা। কামুকা খুঁজে-কামুককে আর কামুক খুঁজে-কামিনীকে। ষড়-রিপুর মধ্যে কাম নাকি হল সবচেয়ে শক্তিশালী রিপু। ভূ-ভুর্ব-স্বঃ এমনকি সপ্তলোক পর্য্যন্ত ধাওয়া করে সে সত্তাকে। একটু দুর্ব্বলতা পেলেই আত্মাকে টেনে নামায় নীচে। ভগবানের নাম ছাড়া নাকি কামকে তাড়ান যায় না কিছুতেই। নীচ স্বভাবের এই প্রেতাত্মাগুলো যায় না কভু ভগবানের নাম চিন্তনের ধারে পাশে। তাই কামের তাড়নায় তারা করে বেড়ায় ছটফট। কাম-লালসার মাত্রা অনুযায়ী সূক্ষ্মদেহী ওই প্রেতাত্মাগুলোর রং নাকি হয়ে যায় ওমনি মেটে-বাদামী, হলদে-সবুজ।

কামুক প্রকৃতির ওই আত্মাগুলো হয় নাকি মারাত্মক রকমের বদমাশ ও হিংসুটে। কামজ তৃষ্ণা বিদেহী অবস্থায় সেরকম মেটানো যায় না বলে ওরা দেহ খুঁজে বেড়ায়। খুঁজে তারা তাদের প্রকৃতির মানুষ। মানুষের চরিত্রে সামান্য কাম-ছিদ্রের পথ ধরে প্রবেশ করে তারা। উন্মত্ত করে তুলে মানুষকে। যত অকাণ্ড-কুকাণ্ড ব্যাভিচার-কদাচার করিয়ে মানুষ করে অমানুষ। নিয়ে যায় পশুর পর্য্যায়ে। তাদের কাম-লালসায় প্রভাবিত করে নর-নারীকে বেপথে-কুপথে পরিচালিত করে। জগতে এমন কোন অন্যায় পাপ বা অপকর্ম নাই যা এই কাম-রিপুর সূত্র ধরে এরা ঘটাতে না পারে। কাম-কাতর নর-নারীর দেহে প্রবেশ করে এরা শুধু তাদের কাম তৃষ্ণাই মেটায় না। প্রেম-ঘটিত ব্যাপারে তাদের আত্মহত্যা, খুন-খারাপি করিয়ে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়ে নরক করে গুলজার। মানুষকে পাপ-পথে টানবার, অধঃপাতে নামাবার, নীচুস্তরে ফেলবার সহজ উপায় হল মানুষের মনকে যেন-তেন প্রকারে কাম-রিপুর অধীন করা। তাই ঘুমন্ত জাগন্ত সব নর-নারীর পিছু-পিছু ফেরে এরা। সুযোগ খুঁজে কোন ফাঁকে কার চরিত্রের কোন দুর্ব্বলতার সূত্র ধরে ভিতরে তাদের প্রবেশ করে চ্যুতি ঘটানো যায় সত্তার। আত্মাকে করা যায় কলুষ-কালিমা লিপ্ত। তেমন সুযোগ পেলে সৎ মানুষকেও এরা ছাড়ে না। জাগন্ত অবস্থায় না পারুক—ঘুমন্ত অবস্থায় চেতনাকে তাদের আচ্ছন্ন করে দেখায় কুস্বপ্ন। এই কুস্বপ্নের মাধ্যমেই মনকে তারা মোহগ্রস্থ করার চেষ্টা করে। তাদের সৎ প্রকৃতিকে করে অসৎ। এতেই তাদের আনন্দ। নর-নারীর মনে কাম-প্রবৃত্তির কোন অসৎ আত্মা যাতে ভর করে বা কু-দৃষ্টি দিয়ে থাকতে না পারে তার জন্যই নাকি সমাজে বিবাহ-সংস্কার। নারায়ণ শিলার সম্মুখে অগ্নি-সাক্ষী করে যে শুভ-মিলনের ব্যবস্থা তাতে প্রেতের ওই কু-দৃষ্টির কাম প্রবৃত্তি কেটে যায়। বিয়ের যে এতসব নিয়ম-কানুন, লেগ-দস্তর তুকতাক-সতীর কথায় তা নাকি পরোক্ষভাবে ওই সব অসৎ প্রকৃতির কু-স্বভাবগ্রস্থ আত্মাদের কোন কু-প্রভাব বা কু-নজর থাকলে তা কাটানোর জন্যই। আর শাস্ত্রে যে "শয়নে পদ্মনাভ" কথাটার উল্লেখ আছে তাও নাকি অশুভ ওই শক্তিগুলো যাতে ঘুমের মধ্যেও কারো মনে প্রভাব ফেলতে না পারে সেই জন্যই। শয়নকালে পদ্মনাভ অর্থাৎ নারায়ণ স্মরণ করলে বা নাভিমূলে ঈশ্বরকে চিন্তা করে শুলে ওইসব দুষ্টু আত্মাগুলো কুস্বপ্ন দেখিয়ে মনকে বিব্রত বা চৈতন্য বিভ্রান্ত করতে পারে না।

বলতে বলতে সতী আবার ফিরে গেল তার পূর্ব্ব প্রসঙ্গে। এক শয্যায় শায়িত সেই নারী-পুরুষকে দেখিয়ে বলতে লাগল সে ওই যে ঘুমন্ত স্বামী-স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রেতাত্মাগুলো। তাকিয়ে আছে যারা লালসা-কাতর দৃষ্টিতে। ওদের উদ্দেশ্য কিন্তু নিছক দম্পতি-যুগলের মনে কামোত্তেজনা জাগিয়ে দেওয়াই নয়। যে ক্ষণ, যে সময়, যে মুহূর্ত্তটা যাচ্ছে এখন সেটা হল নাকি উপযুক্ত জন্ম গ্রহনের কাল। এ কালে তাই স্বামী-স্ত্রীকে কামোত্তেজনায় টেনে এনে তাদের ঔরসে ও গর্ভে আশ্রয় নেবার জন্য তারা হয়ে আছে উন্মুখ, উদগ্রীব।

তাদের মাধ্যমে দেহধারণ করে তারা আবার জন্ম নিতে চায় পৃথিবীতে। কিন্তু একটা গর্ভে একাধিক আত্মা তো জন্ম নিতে পারবে না। তাই এক্ষুনি হয়তো ওই নারী-পুরুষের গর্ভে-ঔরসে প্রবশে করার জন্য শুরু হয়ে যাবে তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি, ঝুনো-পুটি ঝগড়া। কিন্তু তার আগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কামোত্তেজনা জাগানো চাই, তাই তারা সকলে মিলে লুব্ধ-দৃষ্টিতে করছে চেষ্টা তাদের মনে ওই কামভাব আনার জন্য।

সত্যিই ব্যাপারটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক। প্রেতাত্মাদের জন্ম নেবার ব্যাপারটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য উৎসুক হল ভূতনাথ। কিন্তু এ কাল বড় সাংঘাতিক কাল। দৃঢ় সংযমী, অত্যন্ত উচ্চ-চেতা সত্ত্বা না হলে কাম-কলা স্বচক্ষে দেখে কেও কখনও নিজেকে স্থির রাখতে পারে না। তাছাড়া ওই প্রেতাত্মাগুলোর কাম-কাতর দৃষ্টি পড়তে পারে ভূত-নাথের উপর। এ দৃষ্টির শক্তিই আলাদা। মানবকে কেন দেবতাদেরও বিব্রত করতে পারে তারা। তাই জন্ম-মৃত্যুর কুম্ভকার-চক্রে পড়তে চায় না যে সব আত্মারা তারা এ মুহূর্ত্তে দূরে থাকে। যতই হোক ভূতুদার তার কাঁচা মন। এ মনে এসময় ওই কাম-কাতর আত্মাগুলো তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। হিতে তাহলে হয়ত বিপরীত হতে পারে ভূতুদার। তাই দৃষ্টিটাকে তার অন্যদিকে পরিচালিত করবার জন্য বলে উঠল সতী,—আর এক ধরনের ভূত দেখবে ভূতুদা? তাকাও তবে গদারডিহি গ্রামের মাথায় ওই স্থানটার দিকে।

তাকাল ভূতনাথ। দেখল সতীর নির্দ্দেশিত দিকটাতে অর্থাৎ গ্রামের শেষে ডাঙ্গার মাথায় একটা মদ-ভাটী। সে মদ-ভাটীটার ধারে-পাশে ঘুর ঘুর করছে নানা ধরনের ভূত-প্রেত। কেও শুঁকছে মদের হাঁড়ি, কেও চাটছে মদ-বাখরের ফেলে দেওয়া ভাঙ্গা হাঁড়ি খোলাগুলো। ভাঁটীর নালা কর্দ্দমাক্ত জলটাই কেও খাচ্ছে চকর চকর করে কুকুরের মত। শুধু চাটা-চাটি বা খাওয়া-খাওয়িই নয় মদের সেই ভাঙ্গা হাঁড়িখোলাগুলো নিয়ে পরস্পর করছে ঝগড়া—কাড়াকাড়ি মারা মারি। পাচ্ছে যারা পাল্লা দিতে একে অপরের সঙ্গে দিব্যি তারা খাচ্ছে মাতালদের সব ফেলে দেওয়া এঁঠো-কাঠা, মাংসের হাঁড় টুকরো ও মদ লেগে থাকা হাঁড়িভাঙ্গা ও বোতল-ভাঙ্গা। আর এঁটে উঠছে পারছে না যারা অপরের সঙ্গে তারা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ফোঁপরা নাকে টানছে মদ ভাটির বাতাস। মাতলা গরু-কাড়ার মত মাথা উঁচিয়ে। 'ঘ্রানেন অর্দ্ধ ভোজনং' আর কি। জিজ্ঞেস করতেই জানল ভূতনাথ সেই আগের কথাই। অর্থাৎ যার যা স্বভাব মলেও যায় না। মাতাল মাতালই থাকে। তাই তারা ওমনি ঘুর ঘুর করে শুঁড়ির দোকানে. মদ ভাটীতে, মাতালদের আড্ডায়।

দেখতে দেখতে হঠাৎ সিনেমার পর্দ্দার মত ভূতনাথের নজরটা গেল অন্য দিকে সরে। পড়ল গিয়ে গ্রাম-ঘরের সব রান্নাঘরগুলোর দিকে। দেখল সেখানেও অর্থাৎ রান্নাশালের ছাঁচাকোলে, হিঁসেল ঘরের আনাচে-কানাচে নানা ভূত-পেতনীর ভীড়। চেহারাগুলো তাদের একটু অন্য ধরনের। যেন সব বুভূক্ষুতার প্রতিমূর্ত্তি। ক্ষুধার মনে হয় অত্যন্ত কাতর তারা। তাই খালি পেটে, লালসা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সব খাবারগুলোর দিকে। কেও কেও লকলকে জিভ বের করে ঘুরোঘুরি করছে খাবারগুলোর আশেপাশে। খাবারের দোকানের কাছে-পিঠে নালা-নর্দ্দমায় এঁঠো-পাত চাটা খেঁকি কুকুরগুলো যেমন ঘুর-ঘুর করে ঠিক তেমনি।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই ভূতনাথ বলে উঠল সতী যে ওরা হল নাকি পেটুক-আত্মা, ভুখলি-ভূত। জীবনে ওরা ছিল ঔদরিক। মৃত্যুর পরও তাই ওরা তাদের পেটুক স্বভাব ছাড়তে পারেনি। রান্নাঘরের খাবারের দিকে তাই তারা ওমনি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাকানো ছাড়া তো আর সূক্ষ্মদেহে ওসব স্থুল বস্তু ভোগ করার উপায় নেই তাদের। তাই দৃষ্টিতে তারা ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু অবোধ তারা। মিটবে কি ক্ষুধা এতে, বরং উল্টো তাদের যাচ্ছে বেড়ে ক্ষুধা-ও তৃষ্ণা। তার জ্বালায় অস্থির হয়ে করছে তারা হুটোপুটি-ছুটোছুটি। দেখিয়ে তাদের কীর্ত্তি-কলাপ বলতে লাগল সতী যে এদের দৃষ্টি এড়াতে খাবারের ঘরকেও নাকি ঠাকুরঘরের মত পূত-পবিত্র রাখতে হয় গৃহস্থকে। শুদ্ধ-মনে পবিত্রভাবে খাদ্যবস্তু যেমন তৈরী করতে হয় খাদ্যগ্রহণও

করতে হয় তেমনি শান্তভাবে, নির্মল হৃদয়ে। তার জন্যই ব্রাহ্মণ-ঠাকুরদের দিয়ে সমাজে ভোজ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা এবং খাবারের আগে ভোজ্যপানীয় সর্ব-প্রথম ভগবানকে নিবেদন করে গ্রহণ করার নিয়ম। এতে নাকি ওই সব ক্ষুধাতুর লোলুপ আত্মাদের দৃষ্টি-দোষ কাটে। রান্নাঘরে পবিত্রতা বজায় রাখলে ওসব আত্মা হেঁসেলে ঢুকতে পারে না। গৃহিনীরা শুদ্ধমনে রন্ধন ইত্যাদি কর্ম করলে ওসব নীচাত্মারা খাবারে তাদের কু-নজর দিতে পারে না। জীবনে খাদ্য-গ্রহণও হল এক শ্রেষ্ঠ পূজা। পূজকের মতই শুদ্ধচেতা হয়ে খাদ্যগ্রহণ করতে হয়। খাবারের সময় মনকে কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি কোন রিপুরই অধীন রাখতে নেই। অধীন হতে দিতে নেই। সব চেয়ে বড় কথা হল নাকি অন্নের এক দানাও অন্যায়ভাবে সংগ্রহ করতে নেই। চোর দাগাবাজি, বাটপাড়ির পথে কেও যদি পেটের যোগাড় করে সে নাকি নরাধম। জীবনে অন্যায় অধর্ম, অনাচারের পথে আহারের সংস্থান করেছে বলেই ওই সব আত্মাদের মরণের পর এই দশায় ভুগতে হচ্ছে। চাটতে হচ্ছে আস্তাকুঁড়ে ফেলা এঁঠো পাতা, খেতে হচ্ছে নালা-নর্দ্দমার জল। তাও আবার খেঁকি কুকুরগুলোর মত অন্য পেটুক আত্মাদের সঙ্গে মারামারি, খাওয়া-খাওয়ি করে।

"—তা তো বুঝলাম," কথার মাঝে সতীকে বলে উঠল ভূতনাথ,—"কিন্তু ওই যে খাবারের জন্য ঝুনোপুটি করা প্রেতাত্মাগুলোর অদূরে দাঁড়িয়ে আছে খোলার মত শূন্য পেট-ওয়ালা প্রেতগুলো, তৃষ্ণা-কাতর শুষ্কদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যে প্রেতিনীগুলো ওদের এমন রুগ্নশীর্ণ অসহায় অবস্থা কেন? ক্ষুদ-পিপাসায় যন্ত্রণা-কাতর ওদের দশা দেখে যে আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছে সতী। পারব না আমি এনে কিছু দিতে ওদের মুখে।

"—কি দিবে?" শুকনা হাসি হেসে বলল সতী,"—বললাম তো বাস্তব জগতের কোন খাবার সূক্ষ্ম-স্তরে গ্রহণ করা যাবে না। বরং ওতে ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা এদের উল্টো যাবে বেড়ে। সবই কর্মফল ভূতুদা। দেহটার মৃত্যু হয় সত্যি কিন্তু কর্মফলটা তার নিহিত থাকে সূক্ষ্ম সত্তার মধ্যে। জন্ম হয় এই কর্ম-ফলের ভারেই। তবে মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের আগে এই প্রেত-শরীরে তার ফলটা ভোগ করতে হয়।

বলতে বলতে সতীর স্মৃতিতে মনে হয় জেগে উঠল তাদের ভূতগ্রামে বাবা ভূতনাথের মন্দিরে শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রে শোনা মহাভারত পাঠের কথা। ব্রত-ধারিনী অন্যান্য মেয়েদের মত সতীও থাকত উপোস দিয়ে। রাত কাটত ঠাকুর মশায়ের মুখে মহাভারত শুনে। সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে বলল ভূতনাথকে,— মহাভারতে সেই পঞ্চ-প্রেতোপাখ্যানের কথা মনে আছে ভূতুদা? সবতীর্থ ভ্রম করে কৌণ্ডিন্য মুনি এলেন কুরুক্ষেত্রে। সেখানে—

"শ্মশানের নিকটেতে আসি তপোধন।
দেখিলেন বসি আছে পঞ্চ প্রেতগণ।।
বিকৃত আকার সব বিকৃত বদন
লম্বা ওষ্ঠ লম্ব কেশ লম্বিত দশন।।"

—এদের নামগুলো তোমার মনে আছে ভূতুদা—সেই যে পুরুত ঠাকুরদা বলেছিলেন সূচীমুখ, শীঘ্রক, পর্য্যুষিত, লেখক, পাঠক ইত্যাদি? প্রেত হয়েছিল কেন তারা আছে মনে তোমার? আমার কিন্তু সব মনে আছে। উগ্রস্বভাব, অস্থির, অহঙ্কারী সূচীমুখ তার প্রেত হবার কারণ বলেছিল—"বলেই সতী আবার আওড়াতে লাগল মহাভারতের সুর,—

দিব্য অন্ন উপহারে ভার্য্যা-পুত্র লয়ে।
করিনু ভক্ষণ, অতিথিরে নাহি দিয়ে।।
দুরাচার পরস্বাপহারী শীঘ্রাকও তাই,"—ক্ষুধার্ত অতিথি জনে করিল বঞ্চন।।"
ক্রুরমতি পর্য্যুষিতও তার প্রেত হবার কারণ বলেছিল—
ক্ষুধাতুর আসি অন্ন মাগিল আমার।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিনু তাহারে।।

এমনি লেখক-পাঠক প্রেতও। শুধু নিজের পেটটাই ভরিয়ে এসেছিল ওরা জোচ্চুরি, দাগাবাজি, বাটপাড়ি ধাপ্পাবাজি-করে। পরের পেটের কথা চিন্তা করে নি তাই তো ওরা হয়েছিল "ভুখলি-প্রেত"। তেমনি এরাও ভূতুদা।

অর্থাৎ ওই রুগ্ন-শীর্ণ ক্ষুধাতুর খালি-পেটের প্রেতগুলো জীবনে শুধু সূচীমুখ-শূদ্রকদের মত নিজের পেটটাই দেখে এসেছে। পরের ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা চিন্তা করেনি। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ওই স্বার্থপর প্রেতগুলো পরের মুখে এক দানাও তুলে দেয়নি। ক্ষুধার্তদের শুধু কুকুরের মত তাদের দরজা থেকে মেরেধরে দূর-দূর করে তাড়িয়েই দিয়েছে। অপরের অন্নের সংস্থান জমি-জায়গা নিয়েছে তারা ছল-চাতুরী চালবাজি করে ছিনিয়ে। শ্রমিককে তারা যথোপযুক্ত মজুরী না দিয়ে ঠকবাজি করে নিয়েছে তাদের শ্রম, রেখেছে তাদের উপোসী করে। পরকে ঠকিয়ে নিজের পেট ফুলালে মৃত্যুর পর সত্তা এমনি নাকি প্রেতযোনিই প্রাপ্ত হয়। সেই ফলেই ভোগ করছে নাকি ওরা মরণের পর এই প্রেতলোকে এসে। দেখিয়ে তাদের বলতে লাগল সতী,—জগতে গায়ের জোরে হয়তো সবকিছু করা যায়। যায় হয়তো টাকার জোরে, কূট-কৌশলে ইহলোকে অপরের অনেক কিছু আত্মস্যাৎ করা। কিন্তু পরলোকে? যার যা কর্মের ফল তাকে তো তা এখানে ভোগ করতে হবেই ভূতুদা। পার পাবার উপায় নেই। অপরকে অনাহারী উপবাসী করে এসেছে বলে ওরা এখানে খালি-পেটে অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করছে। কিন্তু ওই দেখ ওদের পাশেই আর এক ধরনের পেটুক-আত্মা।

সতীর নির্দেশিত দিকে চোখ ফেলতেই দেখতে পেল ভূতনাথ লালচে রঙের অদ্ভুত কতকগুলো প্রেত-আত্মা। হাঁড়ির মত পেট, জালার মত ভুঁড়ি নিয়ে থুপথুপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। বলল সতী,—পেটুক শিরোমনি ওই ভূত-প্রেতগুলো হল খলা-শূন্য পেটের পিশাচগুলোর চেয়ে একটু উন্নত ধরনের। ওরা কবো বাড়া ভাতে ধূলো দিয়ে বা খাবারের থালা ছিনিয়ে নিয়ে জীবন কাটায়নি বা অন্যায় ভাবে, লোকের ক্ষতিসাধন করে নিজের অন্নের সংস্থানও করেনি। কিন্তু মর্ত্তে ওরা ছিল মস্ত কৃপণ। নিজের রোজগার নিজেই গণ্ডে-পিণ্ডে গিলে এসেছে শুধু। পরের জন্য কিছু ত্যাগ বা দান-পুণ্য করে আসেনি ওরা জীবৎকালে। সেই স্বভাবে এখানে এসেও নিজের পেটটা শুধু ভরাচ্ছে ওরা। একটু উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বলে এখানে ওরা মনের কল্পনায় তৈরী করছে নানাখাবার। কল্পনায় গড়া সেই সব হালুয়াপুরি, স্বপ্নের মত খাচ্ছে তারা। আর জালার মত বাড়াচ্ছে পেট, কুঁড়ির মত ফুলাচ্ছে ভুঁড়ি। কেমন ওরা মূঢ় প্রকৃতির বলতো ভূতুদা? এখানে এসেও পশুর মত শুধু খাই-খাই চিন্তা। কিন্তু দেহের ক্ষুধা ছাড়া মনেবও যে একটা ক্ষুধা আছে—তাকে সৎ-ভাবনা, অপরের মঙ্গল চিন্তা, জগতেব কল্যাণ-কামনা দিয়ে পূরণ ও ভগবানেব নাম-সাধন দিয়ে তৃপ্ত করতে হয়-সে সব দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই এদের। নীচু— স্তরে তাই তারা পড়ে আছে। থাকবে যে কতকাল কে জানে।

শুধু হিঁসেল কোণে বা রান্নাশালেই নয়—গৃহস্থের ঘর-উঠোনে, বাড়ীর এধার-ওধার রয়েছে আরোও নানা প্রেতাত্মা। কেও নারী, কেও পুরুষ। আধারগুলো অনেকটা স্বাভাবিক মানুষের মত হলেও প্রকৃতিগুলো কিন্তু অস্বাভাবিক। আধ-পাগলা, না সব বদ্ধ উন্মাদ কে জানে। তাদের আচার-আচরণ দেখে মাথা খারাপের মত মনে হতে লাগল ভূতনাথের। মৃত যে তারা জানে না বোধ হয়। তাই ছুটে যাচ্ছে তারা জীবন্ত ছেলেমেয়ের দিকে। বুঝিয়ে বলছে তাদের,—ওরে কাঁদিসনে তোরা। এই তো আমি বেঁচে আছি। দাঁড়িয়ে আছি তোদের সামনে।

কেও বলছে গিয়ে তার স্ত্রীকে, ধমকে—লজ্জা করে না মুখপুড়ি তোর! বেঁচে থাকতে আমি হাতের লৌহ-শাঁখা খুলেছিস তুই, মুছেছিস মাথার সিন্দুর। থান ধুতি পরে আছিস যে মাগী—আমি কি মরে গেছি? যা, এক্ষুনি শাঁখা-শাড়ী পরে মাথায় সিন্দুর নিয়ে দাঁড়া আমার সামনে।

কেও আবার ক্রুধোন্মত্ত তার ভাই-ভায়াদ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি "—হারাম-জাদারা, ভেবেছিস কি আমি মরে গেছি? তাই স্ত্রীপুত্রদের আমার ফাঁকি দিয়ে জমিজায়গা বাগাবার ষড়যন্ত্র করছিস? ধান্দা করছিস তাদের ঠকাবার। আমি বেঁচে থাকতে? মরে গেলেও না হয় হোত। কিন্তু জিন্দা থাকতে মাগ-ছেলেকে আমার পথে বসাবি? তোদের সব মতলব আমি বুঝতে পেরেছি। খবরদার বলছি তিনকড়ি। এসব ফন্দি-ফিকির বদ-বুদ্ধি ছাড়। নইলে আমি বাপ-বেটা-বৌ তোদের তিনজনকেই একসঙ্গে মেবে মড়া কবে খাটে চাপিয়ে পাঠাব তিনতলার শ্মশান ঘাটে। বুঝলি?"

আর এক প্রেতাত্মার সে কি তেজ। রেগে ফেটে পড়েছে সে তার জ্যেঠা-কাকা আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি,—"কান নেই তোমাদের নাকি—না হঠাৎ হয়ে গেছ তোমবা সব বদ্ধ কালা! এত চিৎকার করে বলছি তবু

শুনতে পাচ্ছো না আমার কথা। না শুনতে পাও চোখের সামনে যে জলজ্যান্ত রয়েছি আমি দাঁড়িয়ে তাও পাচ্ছো না দেখতে? চোখদুটোরও সবাই একসঙ্গে খেয়েছো মাথা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ?

আধবুড়ো ধরনের এক প্রেতকে দেখল ভূতনাথ আর একঘরে। মাথা ঠুঁকে করছে কাকুতি-মিনতি। মনে হয় তার বৌ-বেটাদের সামনে,—কাঁদিসনে বৌ, আমি মরিনি। মরলে কি আর তোদের সামনে এমনি এসে দাঁড়াতে পারতাম। এভাবে মড়াকান্না কাঁদলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়, ছেলে-পিলের অকল্যাণ হয়।

দেখল আর এক ঘরে ভূতনাথ অপর এক ভূতকে। কাণ্ড করছে যেন সে বদ্ধ-উন্মাদের মত। মরেনি সে-বেঁচে আছে একথাটা তার মা-বাবা দাদা-বৌদিকে বুঝাতে পারছে না বলে রেগে লাফাচ্ছে সে তিড়িং বিড়িং। কখনও ছিঁড়ছে নিজের চুল, ঠুকছে নিজের মাথা। চড় মেরে নিজের গালে বলছে সে চিৎকার করে,—খবরদার। আমার মৃত্যু সম্বন্ধে তোমরা এমন মিথ্যেকথা বলবে। এই তো আমার গাল। এই তো চোখ-নাক-কান-কপাল নিয়ে মুণ্ডুটা আমার ঠিকই আছে। ধড়-গর্দ্দান হাত-পা সব নিয়েই তো দাঁড়িয়ে আছি আমি তোমাদের সামনে। তবু তোমরা কেঁদে-মরছো রোলিং-মেশিনে আমি একেবারে থেতলানো গিয়ে মারা গেছি বলে? মা-বাবা হয়ে ছেলের মৃত্যু সম্বন্ধে মিথ্যে এমন অলুক্ষণে কথা বলতে একটু লজ্জা করছে না তোমাদের? গুরুজন হয়ে এমন বে-আক্কেলে তোমরা?

কিন্তু হায় কে শোনে কার কথা! পঞ্চেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মসত্তা নিয়ে যে স্তরে ভাসছে তারা সে স্তরের কোন কিছুই স্পর্শ করতে পারে না স্থূল জগতকে। কিন্তু অবোধ তারা। এসব বোঝার জ্ঞান তাদের থাকলে তো। তাই যতই গ্রাহ্য করছে না কেও তাদের কথা, ততই বাড়ছে তাদের রাগ। ভাবছে মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব সবাই বুঝি তাদের অগ্রাহ্য করছে, অবহেলা করছে। ক্ষোভ-দুঃখ রাগ-অপমানে তাই ফেটে পড়ছে তারা। ঘুরছে কেও সেই রাগ-অভিমান নিয়েই। কেও বা তার এই অপমানের নিতে চাইছে প্রতিশোধ।

সতীর কথায় জানল ভূতনাথ ওরা নাকি অপমৃত্যু, অপঘাতমৃত্যু, আকস্মিক মৃত্যুর প্রেতাত্মা। মরেছে কেও হঠাৎ বজ্রপাতে। কেও ধ্বস চাপায়, কেও ব্লাষ্ট-ফার্নিশে, কেও আচমকা ট্রেন-বাসের ধাক্কায় বা দেওয়াল চাপা পড়ে। আসলে মৃত্যুটা তাদের হয়েছে হঠাৎ এমনি যে মৃত্যুর বোধটা তাদের আসতে অবকাশই পায়নি চেতনার স্তরে। ভাবছে তারা তাই বেঁচেই আছে। এই ভাবনাটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের বেঁচে থাকার বাস্তব জীবনের চিন্তা, আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা। এগুলো সত্তাটাকে তাদের এমন ভারী করে রেখেছে যে উর্ধ্বে উঠতেই দিচ্ছে না। তাই ভাসছে তারা তাদেব জগৎ জীবনের কাছা-কাছি, আত্মীয়-স্বজনের পাশা-পাশি। কিছুতেই বুঝতে তারা পারছে না যে তারা জীবন্ত নয় মৃত। তাদের ঘর সমাজ আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। সম্পর্ক নেই পৃথিবীর সঙ্গে। অশরীরী হয়ে আছে তারা সূক্ষ্ম বৃত্তে। এ বৃত্তের থেকে স্থূল জগতের পুত্র-কন্যা আত্মীয়-পরিজনের জীবন্ত-বৃত্ত সম্পূর্ণ আলাদা, পৃথক। বুঝতে পারছে না বলেই আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিশতে গিয়ে পাচ্ছে তারা বাধা। বার বার এভাবে ধাক্কা খেতে খেতে মনটা তাদের উঠছে বিষিয়ে। সত্তা হচ্ছে ক্রধোন্মত্ত। রাগ-অভিমান নিয়ে তারা ক্রমশ হয়ে উঠছে আক্রোশ পরায়ণ, হিংসুটে, পাগলাটে পশু।

সতীর কথায় প্রসঙ্গক্রমে জানল ভূতনাথ আকস্মিক মৃত্যুর এই সব প্রেতাত্মাগুলো তাদের ঈর্ষাকাতর হিংসা পরায়ণ মনোভাবের জন্য নাকি এক হয়ে যায় চার-পাদ-দোষযুক্ত মৃত আত্মাদের সঙ্গে। অর্থাৎ তারাও নাকি পরিণত হয় "পুষ্কর ভূতে।" পুষ্করা লাগার মত তারাও ওমনি লেগে থাকে তাদের নিকট-আত্মীয় ঘর-গৃহস্থের পিছনে। পুষ্কর প্রেতদের মত করে তাবা ওমনি নানা দৌরাত্ম. উৎপাত। কারণ প্রেতুড়ে ভাবে ভাবিত হয়েই থাকে তখন তারা। তাই করে বেড়ায় নানা প্রেতুড়ে কাণ্ড। ঘরে এনে ফেলে কখনও শ্মশানের ছাই, চিতার কাঠ-কয়লা, ভাগাড়ের মরা পশুর হাড়-গোড় ইত্যাদি। সংসারের জিনিষ করে এধার-ওধার। স্ত্রীর কাপড়, ছেলের জামা রাখে কখনও চুলোর ভিতর, ছাঁচাকোলে, ভাতের হাঁড়িতে অর্থাৎ মানুষের পক্ষে যে সব জায়গায় এসব জিনিষ রাখা সম্ভব নয় সেই সব জায়গায়। করে এসব কাণ্ড দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু তারা স্ত্রী-পুত্র সকলের চোখের সামনে। উদ্দেশ্য দেখুক তাকে, জিজ্ঞাসা করুক তাকে কোথায় এসব? কেন সে করছে এসব? না করলে গ্রাহ্য তাকে কেও দৌরাত্মের মাত্রা সে দেয় আরো বাড়িয়ে। তাকে ছেড়ে খেতে বসলে ওমনি পাতে তার ফেলে দেয় নানা অখাদ্য-কুখাদ্য। ছেড়ে তাকে শুতে গেলে বিছানায় ফেলে গরুর মাথা। অদৃশ্য ওসব প্রেতাত্মাদের

এসব অকাণ্ড-কুকাণ্ড গুলোকেই বলে নাকি "পুষ্করা পাওয়া"। স্থূল-জগতের দুষ্ট-নষ্ট লোকের মত এই অবোধ-আত্মাগুলোও হল ওমনি বিকৃত প্রকৃতির। মুক্তি উদ্ধারের কোন চিন্তা স্থান পায় না সহজে এদের মনে বলে বহুকাল ধরে পড়ে থাকে তারা নাকি এ অবস্থায়, অসৎপ্রকৃতির পুষ্করভূত হয়ে।

"—এ প্রকৃতির আর কোন আত্মা আছে নাকি এ জগতে ?" জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

উত্তরে তার বলে উঠল সতী,—কতকটা এ প্রকৃতির হলেও অন্য আর এক ধরনের আত্মা বেড়ায় ঘুরে এ স্তরে। দেখবে যদি চল তবে ওদের মাঝেই যাই আমরা।

বলেই সতী তাকে নিয়ে নামতে লাগল যেন নীচে। আশ্চর্য্য হল ভূতনাথ। কারণ তার সঙ্গে সেও যেন নিরালম্ব হয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নামতে লাগল নীচের দিকে।

(উনিশ)

বিস্ময়ের মাত্রা বোধ হয় চরমে গিয়ে পৌঁছল ভূতনাথের। না জানি কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সতী তাকে কোথায় এনে কি অবস্থায় ফেলল। মনে হতে লাগল তার দূর-দুরান্তের গ্রাম-গঞ্জ, পাড়া-মহল্লা, গলি-কুলি এবং তাদের ঘর-বাড়ী অন্দর মহল সমস্ত কিছুর কাছে যেন সে। দাঁড়িয়ে আছে এমন জায়গায় যে কোন কিছুই চোখের আড়ালে যাচ্ছে না তার। অবাক চোখে দেখতে লাগল সে ধূম্রাকৃতি, কুয়াশা-আকৃতি, ছায়া শরীর নানান ধরনের প্রেতাত্মা। ঘুরছে সব গ্রাম-গঞ্জের কুলিতে-গলিতে, ঘরের আশে-পাশে, খিড়কি-সদরের ভিতর-বাইরে। নানা স্থানে নানা অবস্থায় কাতারে কাতারে। তবে এর চেয়েও যেটা অবাক লাগল ভূতনাথের সেটা হল তাদের গতিবিধির ধরণ-ধারণ ও স্বভাব প্রকৃতি। দিব্যি সব এর মধ্যে ও—ওর মধ্যে এ চলাফেরা করছে। কেও কারোর শরীরের বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। এমন কি ভূতনাথের শরীরটা! সেটাও যেন কোন বাধাই নয় তাদের কাছে। দিব্যি তারা তাদের সেই ছায়ার শরীর নিয়ে তার মধ্যেও করছে যাতায়াত। ঘুরছে তারা বেহুঁশভাবে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়। ঠিক নিশি পাওয়ার মত।

জিজ্ঞেস করতেই মনে হল ভূতনাথের সতী যেন সেই অমরনাথ-গুহায় শিব আর সে যেন পার্ব্বতী। পার্ব্বতী যখন নাছোড়বান্দা, কিছুতেই ছাড়ল না যখন সে শঙ্করকে। মৃত্যুলোকের অমৃতকথা বলতেই হবে তাকে। যখন শঙ্করীকে নিয়ে শঙ্কর অমরনাথের নির্জন গুহায় গোপনে, নিরালায় বসে বলেছিলেন তাকে গুহ্যতত্ত্ব—আত্মকথা। এসব তত্ত্ব অপাত্রে, অসৎ আধারে পরিবেশন নাকি করতে নাই। তাই গোপনে ভোলানাথ পার্ব্বতীকে বলেছিলেন এসব কথা। এখন সতী যেন ভোলানাথ—ভূতনাথ যেন পার্বতী। ঠিক তেমনি ঢঙেই সতী বলতে লাগল তার ভূতুদাকে ওইসব সূক্ষ্ম-দেহীদের প্রেতত্ত্ব-কথা। মৃত্যুর পূর্বে যে কাল-ঘুম মানুষকে আচ্ছন্ন করে মৃত্যুর পরও তা নাকি থেকে যায় যে যত বেশীদিন রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করে, সাংসারিকচিন্তায় অনিদ্রা-রোগে ভোগে, তামসিক মনোভাবাপন্ন হয়ে মরে বা জীবনের জ্বালায় পড়ে আত্মহত্যা করে—মৃত্যুর পর তার এই কালঘুম তত বেশী হয়। ততবেশী দিন এই কালঘুম সত্ত্বাকে তার আচ্ছন্ন করে রাখে। এই সূক্ষ্মস্তরে ওমনি ঘোরে ঘুরায় তাকে। বেহুঁশ বেহাল অবস্থায় থাকে তারা। জীবিত না মৃত সে বোধ তো থাকেই না তাদের—উপরন্তু কি করছে তারা, কোথায় ঘুরছে তারা, কেন ঘুরছে তারা, কি তাদের করনীয় কোন কিছুই খেয়াল থাকে না তাদের। মৃত্যুর পূর্বে তাদের জড়দেহটা থেকে স্থূল অবয়বের অনুরূপ যে একটা ধোঁয়াটে-ধূসর সূক্ষ্ম-শরীর নির্গত হয় সেই ধূম্রাকৃতি ছায়া শরীরটাকে নিয়েই এমনিভাবে নাকি বেড়ায় তারা ভেসে। তামসিক মন তাদের উপরে উঠতে দেয় না। জাগতিক কামনা-বাসনায় ভরা তাদের অন্তর বলে তাই তাদের থাকে ভারী হয়ে মাটির পৃথিবীর কাছাকাছি। বস্তু জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষার বন্ধন কেটে উচ্চাত্মাদের মত তারা উর্দ্ধলোকে যেতে পারে না। ধুলো-বালি সংলগ্ন বাতাস পুরো থাকলে বেলুন যেমন উপরে উঠতে পারে না, নীচেই গড়াগড়ি খায় ঠিক তেমনি। মনে তাদের কামনা-বাসনা পুরা থাকলে সত্ত্বা তাদের এমনি নীচুস্তরেই গড়াগড়ি খায়। টেনে রাখে তাদের জীবৎকালের স্থান—স্মৃতিভরা ওইসব ঘর-বাড়ী, জমি-জায়গা ইত্যাদি। ঘুমঘোরে অচেতন অর্থাৎ নিশি-পাওয়া লোকের মত ঘুরে তারা তাদের ওইসব স্থাবর-অস্থাবর ধন-সম্পত্তির কাছাকাছি, ছেলে-পিলের আশে-পাশে। জানে না তারা,

—ধর্ম নাহি চিন্তা যার ধন-ধন করে।
তাহার নিস্তার নাই এ ভব-সংসারে।।
কার পুত্র, কার ভগ্নী, কেবা কার পতি
কেবা কার ভাই হয় কেবা কার মিতি।।
পিতামাতা পুত্র-বন্ধু কেহ কারো নয়
মরিলে সম্বন্ধ নাহি শুন মহাশয়।।

বলতে লাগল সতী,—এ বোধ নেই বলেই এ জগতে তারা বড় অসহায় ভূতুদা। তাদের এই অজ্ঞানতার মোহ-বন্ধন শুধু এই জগতেই তাদের এমনিভাবে ঘুরায় না, ঘুরায় তাদের পৃথিবীরও প্রেত সাধকরা। বাস্তব জগতে সত্তাটাকে তাদের স্বার্থপূরণের কাজে ব্যবহার করে।

অর্থাৎ শব সাধক যারা তারা শ্মশান জাগিয়ে, চিতা চিয়িয়ে এইসব ঘোর-অচেতন, বেহুঁশ-বেহাল আত্মাগুলোকে করে বশ। বশ করে তাদের হস্তধৃত যন্ত্রের মত করে ব্যবহার। নানা কান্ড করিয়ে তাদের নিজেরা নেয় বাহাদুরী, সমাজে প্রতিষ্ঠা। অবশ্য নানা অকান্ড-কুকান্ড করলেও দায়ী হয় না এসব প্রেত্মাতারা। তাদের কৃতকর্মের ফল গিয়ে বর্তায় ওইসব তুক-তাককারী ভূত-উপাসক, পিশাচ সাধক প্রেত-পূজকদেরই উপর। কিন্তু তবুও ওই সব কর্মে আত্মারা তাদের কষ্ট পায়। সত্তার মুক্তি ও আত্মার উদ্ধারে ঘটে তাদের বিলম্ব। বেগ পেতে হয় তাদের উর্ধ্বগমনে। এই জন্যেই নাকি বিভিন্ন স্থানে শবদাহ ও শেষ কৃত্যের আছে নানা নিয়ম। মৃত্যুর পর আত্মা যাতে ভূত-প্রেত সাধকের হাতে না পড়ে তার জন্য শ্মশানে তার চিতাকে কেও কেও দেয় তিনদিন ধরে পাহারা। চিতার মাঝে পেরেক গেদে আসে কেও লুকিয়ে, অজান্তে। যাতে সত্তাকে তার বশ করে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে না পারে। কেও কেও বা আবার শবদাহের পর চিতায় তার মূর্ত্তি এঁকে অষ্টাঙ্গে তার আটটি পোড়া হাড় রেখে সেগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসে গঙ্গায়। গঙ্গা প্রাপ্তি হলে নাকি তার সত্তাকে কেও বশ করে কষ্ট দিতে পারবে না। মায়ার অধীন হয়ে আত্মা যাতে শবদাহের পর শবযাত্রীদের পথ অনুসরণ করে তার সংসারে আবার ফিরে এসে অশরীরী অবস্থায় মোহ-বন্ধনে পড়ে কষ্ট না পায় তার জন্য কাঁটা-দুয়ারী করে আসে অনেকে। অর্থাৎ ফেরার পথে তাদের কাটা ফেলে পরলোক-গামী আত্মাকে বলে,—তোমার ওই পথ আমাদের এই পথ। পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে তোমার পথে তুমি যাও, আমাদের পথে আর এস না তুমি।

ভূতনাথের কৌতূহলী দৃষ্টিটার বোধ হয় ছিল একটা বিশেষ আকর্ষণী-শক্তি। যার ফলে সতীর মুখ থেকে বেরুতে লাগল কথার পর কথা। পরলোকের সব গুপ্তকথা, অজানা রহস্য। শিবের জটা থেকে ভগীরথ যেমন উদ্ধার করে এনেছিলেন গঙ্গাকে। ভূতনাথ-ভগীরথও তেমনি ভুবর্লোকের রহস্য-জটিল জটাজাল থেকে সতীর মুখ মার্ফত যেন উদ্ধার করে আনতে লাগল পরলোকের জ্ঞান-গঙ্গাকে শোনাই শুধু নয় সূক্ষ্মজগতের নানা মূর্ত্তি তাদের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে শোনার সঙ্গে দৃষ্টি গোচরও হতে লাগল ভূতনাতের। দেখিয়ে তাদের বলতে লাগল সতী ভূলোকের পরপারে ভূবর্লোকের এই নিম্নস্তরে শুধু পাপী অসৎ আত্মারাই অবস্থান করেন না—করেন অনেক সৎ আত্মাও। কারণ কোন মানুষই তো আর সম্পূর্ণ সৎ বা সম্পূর্ণ অসৎ হতে পারে না। সম্পূর্ণ সৎ হলে তিনি তো সৎ-স্বরূপ ভগবানই হয়ে গেলেন। আসলে খাঁটি সোনায় অলঙ্কার হয় না। অলঙ্কার করতে গেলে তাতে কিছু খাদ মেশাতে হয়। তেমনি মানুষের মধ্যে পাপ-পুণ্য দুই থাকে। তবে মাত্রা অনুযায়ী তা কম-বেশী হতে পারে। সে যাই হোক—মৃত্যুর পর প্রথম কিন্তু পাপ ভোগ করতে আসতে হয় সব আত্মাকে এই সূক্ষ্মলোকে। যুধিষ্ঠিরকেও তাই প্রথমে আসতে হয়েছিল এই নরকেই। নরকের পর পুণ্য ভোগ স্বর্গে। ভোগকাল শেষ হলে আবার জন্ম। স্বর্গভোগের পুণ্যস্মৃতি বহন করে সত্তা পুনর্জন্ম লাভ করে অর্থাৎ মানুষের দেহ-মন-প্রাণ পেয়ে যাতে সে মানবোচিত কর্ম করে ক্রমোত্তরণের পথে যেতে পারে তাই এই ব্যবস্থা। পাপ করলেও যেমন ভোগ, পুণ্য করলেও তেমনি ভোগ। কু-হোক আর সু-হোক—ভোগ তো বটে। মানব জীবনে তাই এমন কাজ করতে হবে যাতে সত্তা আসক্তিহীন হয়ে ভূ-ভুব-স্বঃ এই ত্রিলোকের উর্ধ্বে উঠতে পারে। অর্থাৎ তার ব্রহ্মলোকের দিকে গতি হয়।

যাক গে ওসব কথা। ভুবলোকের ভিন্ন রঙের আত্মাদের দেখিয়ে সতী পরিচয় দিতে লাগল ভূতনাথকে

তাদের কথা। সর্বোচ্চ স্তরে বহুবিধ রঙ বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে সব সত্তার তারা নাকি আজ্ঞা- চক্রে মন রেখে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁরা নাকি অতি উচ্চস্তরের আত্মা। তাঁদের নিম্নস্তরে বেড়াচ্ছেন ঘুরে গভীর নীল বৈন্দব দেহী দু একটি সত্তা ভ্রূ-মধ্যস্থ বিশুদ্ধচক্রে মন রেখে প্রাণত্যাগ করেছেন তাঁরা। অনাহত চক্রে অবস্থান করে প্রাণবায়ু নির্গত করেছেন যারা—নীলাভ অবয়ব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা এ ধার ও ধার। তাদের নিম্নে রয়েছেন শরতের সাদা মেঘের মত উড়ন্ত ভাসমান কতকগুলি ভাবময় দেহ। বক্ষ স্থল অর্থাৎ মনিপুর চক্রে মন রেখে করেছেন তারা দেহত্যাগ। এরা সকলেই উচ্চাত্মা। দরদী মন এদের সহানুভূতিশীল হৃদয়। তাই অনেকে পরোক্ষভাবে নিম্নস্তরের আত্মাদের সাহায্য করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু সাহায্য না চাইলে অর্থাৎ অনিচ্ছুক, অপাত্রে তারা তো কিছু দিতে পারেন না। তাই ক্ষণিকের জন্য এলোকে কর্মফল ভোগ করে চলে যান তারা উর্ধ্বলোকে। নীচু স্তরের আত্মাদের নাকি সাধারণত রঙ হয় সবুজ ও লাল। মৃত্যু তাদের সচরাচর হয় দেহের পাতাল স্তর অর্থাৎ গুহ্য ও নাভিদেশের মধ্যবর্তী অংশ স্বাধিষ্ঠান ও মূলাধারে মন রেখে। জীবন্ত দেহে ষট্-চক্রে ভেদের মত ইচ্ছা করলে তারা সূক্ষ্মদেহেই সত্তাকে তাদের উর্ধ্বমুখে গতিশীল করতে পারে কিন্তু অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত চৈতন্যে তাদের সে ইচ্ছা ধারে পাশেও যায় না।

হঠাৎ ভূতনাথের চোখে পড়ল কতকগুলো কালো বাদামী মেটে রঙের প্রেতাত্মা। এদের বিশ্রী অবয়ব, কদাকার চেহারা, বীভৎস মূর্ত্তি। কারো গলা-কাটা, কারো মুণ্ডু থেত্‌লানো, কাঠ-কয়লার মত কালো পুড়ন্ত দেহ কারো। কারো আবার নাড়ি-ভুড়িগুলো গলন্ত পেট থেকে ঝুলে পড়েছে বাইরে। কেও গলায় দড়ি নিয়ে দম-বন্ধের কষ্ট-বেদনায় ঝুলছে-আসমানে। যন্ত্রণা-কাতর আর্ত্ত চিৎকার তাদের। কানে আসতেই করুণ আর্তনাদ সব ছেড়ে দৃষ্টিটা ভূতনাথের বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ হল তাদের উপর। আঁৎকে উঠে জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ,—ওরা কারা সতী?

"—ওরা আত্মহত্যাকারী প্রেত ভূতুদা।" বলল সতী বিষাদ ভাবে,—কেও ওরা মরেছে ট্রেনে মাথা দিয়ে, কেও নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে, কেও বিষ খেয়ে, কেও এসিড গিলে, কেও বা গলায় দড়ি দিয়ে।

তাই বুঝি কারো মাথা থেতলানো, গলাকাটা, আগুনে পোড়া মড়া কাঠের মত চেহারা। ভূতনাথ বিস্মিত হয়ে দেখতে লাগল সেই ভয়াল-ভয়ঙ্কর ভূত-প্রেতগুলোকে। বলতে লাগল সতী—আত্মহত্যা মহাপাপ ভূতুদা। ভগবান যাকে যা নির্দ্দিষ্ট জীবনকাল দিয়েছেন তাকে তা স্বাভাবিক ভাবেই শেষ করে আসতে হয়। এভাবে স্বইচ্ছায় অস্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করলে আত্মা বড় কষ্ট পায়, সত্তা তার বড় দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয় ভূতুদা। মুক্তি পেতে লাগে তার অনেক দেরী। দুঃখই জীবনের স্পর্শমনি ভূতুদা। কষ্টই জীবনকে খাঁটি সোনায় পরিণত করে। জন্মজন্মান্তরের পাপ ভগবান দুঃখ-কষ্ট দিয়েই কাটিয়ে দেন। ভোগ শেষ না হলে সত্তার ভোগান্তির যে অবসান হয় না ভূতুদা। তাই জীবনে যত কষ্টই আসুক—আসুক না দুঃখ জীবনে যতই ভয়ঙ্কর রূপ ধরে—ভগবানের দেওয়া আশীর্বাদ বলে সে সব হাসি মুখে বরণ করতে হয়। মেঘ কখনও চিরকাল আকাশকে ঢেকে রাখতে পারে না ভূতুদা। ঝড়-ঝঞ্ঝা যতই দুর্নিবার রূপ নিয়ে আসুক চলে তাকে যেতে হয়ই। বাদল কেটে সূর্য্য উঠে, রাত কেটে গিয়ে সকাল হয় বিধাতার নিয়ম। শুধু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। সহ্য করে সে-কালটুকুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়। ধৈর্য্য-সহ্য মানুষের মহৎ গুণ ভূতদা। জীবনের মস্ত বড় সম্পদ হল সহ্য-শক্তি। অজ্ঞান-অবোধ যারা তারা এসব গুণ-সম্পদে ভূষিত না হয়ে, দুঃখ-কষ্টের পিছনে ঈশ্বরের সদ্-অভিপ্রায়কে অবহেলা করে অযথা উত্তেজনার বশে ওমনি হঠকারিতা করে বসে। আত্মহত্যা করে আত্মাকে করে কালিমা-লিপ্ত।

—ওদের যে বড় যন্ত্রণা সতী। বলে উঠল ভূতনাথ,— যাতনা-কাতর গোঙানী ছট্‌ফটানি যে সহ্য করতে পারা যাচ্ছে না।

"—এর জন্য ওরাই দায়ী ভূতুদা।" বলে উঠল সতী,—মৃত্যুকালীন অবস্থাটাকে ওরা ধরে রেখেছে মনে। যে যেভাবে মরেছিল সে সেই ভাবে তার দেহটাকে দেখছে বলে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের জ্বালা যন্ত্রণা ওরা ভুলতে পারছে না। চিন্তাটাকে তাদের সেই এক জায়গায় নিবদ্ধ রেখেছে বলেই ওরা সেই সংস্কার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—এভাবে এরা ঘুরবে কতদিন? জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ।

"—যতদিন না এদের মনে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ বা অনুশোচনা আসছে।" বলে উঠল সতী, "— তবে মর্ত্তে যেমন মহৎ প্রাণ, সৎ হৃদয়, পবিত্র অন্তঃকরণ ব্যক্তি ছাড়া মনে কারো অনুতাপ বা অনুশোচনা জাগে না—এখানেও তেমনি। এরা সাধারণত অনুন্নত হৃদয়, নীচ-মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি হয় ভূতুদা। তাই নিজে যে-যেমন ভাবে মরে অপরকেও তেমনিভাবে মরতে প্ররোচনা দেয় তারা। উদ্দেশ্য সঙ্গী করা, সবাই তাদের মতকষ্ট পেয়ে নরক গুলজার করুক। এরা তাই মানুষের সামান্য উত্তেজনার সূত্র ধরে মনে তার প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। উস্কিয়ে দিয়ে উত্তেজনা, বাড়িয়ে দিয়ে ক্রোধ তাদের ওইরকম আত্মহত্যার দিকে টেনে নিয়ে যায়। মনে তাই কোন দিন ভুলেও কখনও আত্মহত্যার চিন্তাকে স্থান দিতে নেই ভূতুদা। আগুনে পুড়েই সোনা খাদ-মুক্ত হয়। ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা করতে হয়—মন থেকে আমার ক্রোধোন্মাদনা, উত্তেজনা দূর করে দাও প্রভু। দুঃখ জয়ের শক্তি দাও, কষ্ট জয়ের সাহস দাও।

"—কিন্তু ওরা এভাবে আত্মহত্যা করে কেন সতী? হঠ্ করে ওমনি জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

হাসল সতী শুষ্ক মুখে। বলল,— তুমিই গিয়ে জিজ্ঞেস কর না ওদের। নাও না জেনে ওদের মুখ থেকেই কেন ওরা জীবনে এমন ভুল করতে গেল। বললে হয়ত সাময়িকভাবে মনটা শান্ত হবে ওদের। এখানে এই মনোলোকে সবাই সবাকার মনের কথা জানে ভূতুদা। তাই জিজ্ঞেস করে জানবার কারো কোন প্রয়োজন হয় না। সবাই যে-যার কর্মফলে আপন আপন ঘুরে বেড়ায়। সাধারণতঃ নীচুস্তরের আত্মারা উচ্চ-স্তরের আত্মাদের দেখতে পায় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধঃলোকের বাসিন্দাদের ওরা অবলোকন করতে পারে। আমি ওদের চোখে দৃশ্য নই ভূতুদা। আমার বাতাসও ওরা সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু তুমি ভূঃলোকের অধিবাসী। ভূবর্লোকের ওরা তাই দেখতে পাবে তোমাকে। শুনতে পাবে তোমার কথা।

কি যেন ভাবতে লাগল ভূতনাথ। বলে উঠল সতী,—সাহসের মত ভয়ও তো মনের একটা ভাব ভূতুদা। ভয়ের ভাবে অভ্যস্ত নয় যখন মন তোমার তখন ভীতিগ্রস্থ হবে না তুমি—আমি জানি। তাছাড়া আধার তোমার শুদ্ধ, চিত্ত তোমার পবিত্র। মনে কোন পাপ চিন্তা বা অসৎ কামনা-বাসনা নেই তোমার। তাই ওই অসৎ আত্মাগুলো মনে তোমার কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না। সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে যাও তুমি ভূতুদা। দেখ ওই ভয়াল-ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি-ধরা প্রেতাত্মাগুলো কত দুর্বল, কত অসহায়, কত দয়া-করুণা কৃপা-অনুগ্রহের পাত্র। কথা বলিয়ে মনটা তাদের হাল্কা কর গিয়ে তুমি—শান্তি পাবে ওরা। নিজের পাপের কথা প্রকাশ করতে পারলে ভোগের মাত্রাটা তাদেব কমতে পারে। শুনলে হয়তো তাদের কথা উপকারও করতে পার তুমি। যাও ওদের কাছে।

বলতেই সতী হঠাৎ ভূতনাথ কেমন ভাবে যে হাজির হয়ে গেল তাদের কাছে কে জানে। তবে এর চেয়েও অবাক হল সে যখন সেই মাথা থেত্লানো প্রেতটা হাত-জোড় করে সামনে এসে তার বলতে লাগল করুণ ভাবে,—আমাকে বাঁচাও বাবা তুমি, রক্ষা কর এ যন্ত্রণা থেকে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না বাবা।

কিন্তু ভূতনাথও মনে হয় সহ্য করতে পারছিল না প্রেতটার মাথা থেত্লানো, হাড়-বেরুনো, চামড়া-মাংস ঝুলা, রক্ত-ঝরা বিশ্রী চেহারাটা। তাই বলে উঠল সে,—এর আগের চেহারায় ফিরে না গেলে যে আমি এ চোখে আমার দেখতে পাচ্ছি না আপনার এ অবস্থা। অসহ্য লাগছে আমার।

বলার পরই আস্তে আস্তে সেই প্রেতাত্মাটা প্রথমে হল ঝাপসা। জমাট-বাঁধা কতকটা ধুঁয়োর মত তারপর ধোঁয়াটে-ধূসর সেই ঝাপসা মূর্ত্তিটা থেকে অবছাভাবে ফুটে উঠল একটা মানুষের রূপ। তারপর অস্পষ্ট সে রূপটা স্পষ্ট হতে হতে পরিণত হল এক মানব-মূর্ত্তিতে। এক পূজোরী ব্রাহ্মণের চেহারায়। বেঁটে বেঁটে গড়ন তার। টিকি, পৈতে সব আছে। আছে তার বাম চোখের জীচে গালের উপর বড় একটা আঁচিল। থ্যাবড়া নাকে ও দ্বিধাবিভক্ত ঠোঁটটাতে চেহারাটাকে তার করে রেখেছে বেশ কাটখোট্টা পুরোহিতের মত। এ চেহারা ভূতনাথ আগে কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। কাজেই পারল না তাকে চিনতে। না চেনার কৌতূহলী দৃষ্টিটা তার সেই মানব দেহ-ধারী প্রেত-পুরোহিতটার উপর পড়তেই আপনা থেকে বলে উঠল সে,— আমি হলাম পাথরমুড়ির গোবিন্দ গোঁসাই। শুধু পাথরমুড়ি গ্রাম নয়, সে গ্রামের আশ-পাশ সমস্ত অঞ্চলের কাছে

পরিচিত ছিলাম আমি "গোঁসাই-ঠাকুর" নামে। মানত সবাই আমাকে। করত শ্রদ্ধা। দেখা হলেই পায়ে মাথা রেখে আমার প্রণাম করে জানাত ভক্তি।

"—তা তো হল," বলে উঠল ভূতনাথ,—কিন্তু এমন দশা হল কেন আপনার? এক্সিডেন্টে গাড়ী-চাপা পড়ার মত থেতলানো, হাড়বেরুনো রক্ত-মাংস ঝুলা, বিশ্রি চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?

"—এর জন্য আমিই দায়ী বাবা।" বলে উঠল সেই ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরূপী প্রেতাত্মাটা,—জীবিতাবস্থায় আমি ছিলাম পাথরমুড়ি গ্রামের শ্রীরাধা-গোবিন্দজী-ঠাকুরের মন্দির পুরোহিত। শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা করেই করতাম আমি জীবিকা নির্বাহ। দরিদ্র হলেও খাওয়া পরার এতে আমার কোন অভাব হত না। গরীব হলেও এ জীবিকাই দিয়েছিল আমাকে মান-সম্মান নিয়ে বাঁচবার অধিকার। কিন্তু একদিন কালে খেল আমাকে। পড়লাম লোভে। লোভের বশে একদিন সুযোগ পেয়ে বিগ্রহের গায়ের সমস্ত অলংকার করলাম চুরি। চুরি করে ঠাকুরের সেই সমস্ত গহনাগাঠিগুলো রাখলাম গিয়ে নিজের বাড়ীর রান্নাঘরের ঈশান কোণের মেঝেতে পুঁতে। কাসার কলসীর ভিতর রেখে সেগুলোকে এমন দিলাম মাটি-চাপা যেন অপরে কেন নিজ ধর্মপত্নীর পর্য্যন্ত চোখে না পড়ে। কিন্তু মুলোর ঢেকুর যেমন হাজার খাবারের চাপাতেও দেবে রাখা যায় না—তেমনি হল আমারও। ভাব দেখে আমাকে সন্দেহ করতে লাগল সবাই। গ্রাম-শুদ্ধো ছেলে-বুড়োর সকলের নজর পড়ল আমার দিকে। কি করব কি না করব ভাবছি হঠাৎ একদিন দেখি গ্রামের জমিদার অর্থাৎ আমাদের পাথর মুড়ির প্রাণকৃষ্ট চৌধুরী মশায় স্বয়ং থানা থেকে পুলিশ-বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন আমাদের বড়ীতে। ঘর আমার সার্চ করতে। অবস্থা গোলমাল দেখে বংশের মান-সম্ভ্রম, নিজের ইজ্জত বাঁচাতে আমি খিড়কি দরজা দিয়ে ঘর থেকে মারলাম ছুট। দূর থেকে ছুটতে দেখেই আমাকে সদর দরজা ছেড়ে গ্রামের লোকজন সহ থানার দারোগা-পুলিশ করল আমাবে ধাওয়া। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের মাঝে পাকা বড় রাস্তাটা ছুটে পার হতে যেতেই হঠাৎ ফাঁকা রাস্তায় বিদ্যুৎ গতিতে আসা একটা ট্র'ক আমায় দিল চাপা। সেই ট্রাকের চাকায় চেপ্টে গেল আমার মুখটা, থেতলানো গেল আমার মাথা। হাড়-গোড় সব গুড়ো হয়ে—ওঃ কি যন্ত্রণা, কি জ্বালা—" বলতে বলতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সেই গোবিন্দ গোঁসাই। যন্ত্রণা কাতর স্বরে করতে লাগল সে কাকুতি-মিনতি,—আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেন আপনি। মহাপাপ করেছি আমি। স্বর্ণচুরির ফলে একবার "সুরাপ" নরকে ও মিথ্যাকথা বলায় একবার "রৌরব" নরকে পড়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে আমাকে। দু-নরকের লুফালুফির মধ্যে থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেছি আমি আপনার কাছে। আমায় উদ্ধার করুন।

—কি করে উদ্ধার করব আপনাকে? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

—"রাধা-গোবিন্দজীর গহনা পুনরায় সেই যুগল বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে সংস্থাপন না করা পর্য্যন্ত মুক্তি নেই আমার।" বলে উঠল গোবিন্দ গোঁসাই, "—কিন্তু আমার এই সূক্ষ্ম পাপ অবয়বে বাস্তবের সে কর্ম করা সম্ভব নয়। তাই পূন্যবান এক বাস্তব দেহীর প্রয়োজন আমার। আপনার মধ্যে সে পুণ্যজ্যোতিচ্ছটা দেখে ছুটে এসেছি আমি। পারবেন আপনি আমার হয়ে সে কাজ করতে। এ উপকার টুকু করুন আমার, উদ্ধার করুন আমাকে ওই উভয় নরকের যম-দণ্ড ভোগের হাত থেকে।

—কি করতে হবে আমাকে বলুন?

"—আপনি তো সব আগেই বলেছি বাবা।" বলে উঠল সেই গোঁসাই ঠাকুর,—আমার বাড়ীর রান্না-ঘরের ঈশান কোণে মাটির নীচে পুঁতা আছে কাঁসার এক কলসের ভিতর আমার সেই চুরি করা দেবস্ব অর্থাৎ রাধার মুকুট, চন্দ্রহার, বালা, চুড়ি ও গোবিন্দজীর ধড়া-চূড়া তাবিজ-বালা ইত্যাদি সোনার গহনাগুলো। সৎ ব্রাহ্মন বংশের সন্তান আপনি। আপনি সেগুলো আমার বাড়ীর যথাস্থান থেকে কুঁড়ে বের করে নিজের হাতে সেই যুগল-বিগ্রহের গায়ে পরিয়ে দেবে বাবা। তারপব সেই ঠাকুরের কাছে আমার হয়ে প্রার্থনা করবে যেন তিনি তার এই অজ্ঞান সন্তানকে নিজগুণে কৃপা করেন। ক্ষমা করেন। দেবস্ব হরণের পাপে আমাকে যেন পাভুকৃমি হয়ে জন্মাতে না হয়। কথা রেখো বাবা, আমায় মুক্তি কর বাবা, আমায় উদ্ধার কর বাবা..... বাবা..... বাবা..... ....." বলতে বলতে সেই ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি আবার সেই মাথা থেত্‌লানো বিশ্রী কদাকার চেহারা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হল অদৃশ্য থেকে তাকে কোন শক্তি যেন টেনে নিয়ে চলে গেল। দূরে ভেসে যেতে যেতে তার

সেই করুণ আর্ত্তিটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতেই ওমনি আবার অপর পাশ থেকে ভূতনাথের কানে এল হঠাৎ আর এক করুণ আর্ত্তনাদ। এটা আবার নারী কন্ঠের;—উঃ, জ্বলে গেলাম, পুড়ে গেলাম আমি। এ জ্বলন্ত আগুনের হল্কা থেকে বাঁচাও আমাকে। রক্ষা কর এ লেলিহান শিখাগুলোর কবল থেকে। বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে এ জ্বলন্ত জ্বালা থেকে। উদ্ধার কর আমাকে।

চমকে উঠল ভূতনাথ। চমকেই ওমনি পিছন ফিরে তাকাতেই দেখল সে এক বীভৎস দৃশ্য! ভয়ঙ্করভাবে জ্বলন্ত এক নারী-মূর্ত্তি! সবুজ পাড়ের আকাশীরঙের উড়ন্ত শাড়ী সমেত তার এলোচুলের রাশি ধরেই জ্বলছে না আগুনটা। হাত-পা মুখ-চোখ সমেত তার সর্বাঙ্গটা ঘিরে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখাগুলো। জ্বলন্ত সেই অগ্নিদগ্ধ অবস্থাতেই ছুটোছুটি করছে মূর্ত্তিটা সামনে তার আর করছে চিৎকার আর্ত্তকণ্ঠে,—বাঁচাও আমাকে, পুড়ে খাক হয়ে গেলাম আমি।

কি সর্ব্বনাশ! এ অবস্থায় ছুটোছুটি করলে আগুন বাড়বে বৈ-তো কমবে না। তাই অধীর হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ,—শান্ত হন। থামুন থামুন।

থামল সেই অগ্নিমূর্ত্তিটা। আর কি আশ্চর্য্য থেমে দাঁড়াতেই ওমনি শান্ত হয়ে গেল সেই আগুনের লেলিহান শিখাগুলো। তারপর আস্তে আস্তে সেই অগ্নিময় রূপটা পরিণত হয়ে গেল তার কদাকার কুৎসিৎ এক রমনীর মূর্ত্তিতে। পোড়া কাঠ-কয়লার মত কালো চেহারা তার। যেন শ্মশান-চিতার পোড়া মুড়ো কাঠকেই কেও খোদাই করে দিয়েছে করে মূর্ত্তিটা তার। নিকষ-কালো পীচ-ঢালা মুখ-মণ্ডলের মিটমিটে দুটো চোখ দিয়ে এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে ভূতনাথের দিকে। ঠিক্‌রে পড়া তার তীক্ষ্ণ নজরটা দিয়ে সে যেন গিলে খেতে চাইছে তাকে। ভয়ে আচমকা চমকে উঠে অনেক সময় কারো কারো যেমন অজ্ঞাতেই তার হঠাৎ সাহসের স্বর ফুটে উঠে তেমনি কণ্ঠেই হঠাৎ বলে উঠল ভূতনাথ,—কে আপনি? স্বাভাবিক হোন। মানুষের মত না হলে চিনতে পারব না আপনাকে।

অবাক! বলার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল তার পেত্নী মূর্ত্তিটা। পরিবর্তে তার ভেসে উঠল সুন্দর এক নারী মূর্ত্তি। ফুটে উঠল তার মানবী রূপ। গড়নে বরণে সুন্দরী বলতে যা বুঝায় তেমনি হয়ে গেল তার চেহারাটা। এলোচুলে আকাশী রঙের সেই সবজে পেড়ে শাড়ীটা মানান সই রূপে যেন প্রতিভাত করল তাকে। আর তার সেই বিশ্রী দৃষ্টিটা, কাজল কালো টানা চোখে হয়ে গেল মিষ্টি-মধুর। টিকালো নাক, সুন্দর ঠোঁট, ঠোঁটের নীচের কালো তিল চিহ্নের একটা বিন্দু মুখশ্রীটা এমন দিল তার বাড়িয়ে যে আগের দেখা সেই পোড়া জুমড়ো কাঠের মত কালো-কুৎসিৎ চেহারাটা তার কোথায় গেল যেন মিলিয়ে। তলিয়ে যেন গেল সেটা তার বিস্মৃতির অতল তলে। তাকিয়ে তার দিকে বলে উঠল ভূতনাথ,—আপনার পরিচয়?

জিজ্ঞেস করতেই ভূতনাথ ফুটে উঠল তার স্বর,—জগৎ-জীবনে পরিচিত ছিলাম আমি মনোরমা দেবী নামে। মনোহরপুর গ্রামের মদনগোপাল ঘোষের একমাত্র মেয়ে ছিলাম আমি। বিয়ে হয়েছিল আমার কুমার খুলি গ্রামে। স্বামীর নাম আমার কুলদা চরণ ঘোষ। এখনও বেঁচে আছেন তিনি। কাজ করেন কলকাতায়।

"—কিন্তু এমন দশা হল কেন আপনার?" কথার মাঝে তার বলে উঠল ভূতনাথ।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে উঠল সেই মনোরমা,—আমার দোষে। নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছিলাম আমি। সেই মহাপাপেরই ফল ভোগ হচ্ছে আমার এই পরলোকে।

"—নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করতে গেছলেন কেন আপনি? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ,—স্বামী আপনাকে ভালবাসেননি?

"—না না, ওকথা বলবেন না।" ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে উঠল মেয়েটা,—তিনি মহান, তিনি দেবতা। তার প্রেম-ভালবাসায় পূর্ণ হয়েছিল আমার জীবন। কিন্তু আমারই ভুলে আমিই তার সেই প্রেমপূর্ণ ভালবাসার মর্য্যাদা রাখতে পারিনি। পারিনি তার হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়, অন্তরের সঙ্গে অন্তর যুক্ত করে তার সঙ্গে জীবনে চলতে।

—তবে ওভাবে মরতে গেলেন কেন আপনি?

উত্তরে তার বলে উঠল সে তার নিজের জীবন কথা। আসলে বাপের একমাত্র সাধের দুলালী হলে যা হয়

তাই নাকি হয়েছিল মনোরমা। অত্যন্ত স্নেহ-আদরে মানুষ হওয়ায় স্বভাবটা হয়ে গেছল কতকটা স্বার্থপর, বেপরোয়া। স্বামীর সংসারে সে স্বভাব নিয়ে পা দিতেই লাগল তার স্বাধীনতার আঘাত। বিধবা শাশুড়ী ও ননদিনীর সঙ্গে শুরু হল খিটিমিটি। সহ্য করতে পারল না সে ননদিনী-শাশুড়ীকে। তার সংসারে থাকবে, তার স্বামীর ধনে খাবে-পরবে আর তার বশে না থেকে উল্টো তাদের বশে থাকতে হবে তাকে? অসম্ভব। জীবনে সে কারো অধীন হবেও না, অধীনে থাকতেও পারবে না। স্বামী কুলদা চরণ বুঝিয়ে তাকে কোন কূল-কিনারা করতে পারলেন না। তার এক কথা—হয় তার মা-বোনকে ছাড়তে হবে, না হয় ছাড়তে হবে তাকে। কিন্তু তা-ই কখনও হয়? কেন হয় না? স্ত্রীকে নিয়ে স্বামী নিজের কাছে রাখে না? অন্যান্য পাঁচটা স্বামী যা করে তাই করতে হবে তাকেও। তার চাকুরী স্থল কলকাতায় নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে তাকে বাসায়।

বিবেকে বাঁধল কুলদাবাবুর। কিন্তু এধারে জেদ চাপল মনোরমার মাথায় মাত্রাছাড়া হয়ে। ফলে কেলেঙ্কারির ঝড় বইল তাদের জীবনে। সে ঝড় তুঙ্গে উঠল একদিন যেদিন কুলদাবাবু স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন,—তুমি বাপের বাড়ী যাবে যাও, মরবে মর আমি কিন্তু অসহায়া মা-বোনকে এখানে ফেলে সেখানে তোমাকে নিয়ে গিয়ে সুখে থাকতে পারব না।

এত বড় কথা! মরতে বলে তাকে! কথাটা এত জ্বালা ধরিয়ে দিল মনোরমার মনে যে রাগে তার বোধ-বুদ্ধি হল লোপ। এমন কান্ড-জ্ঞানহীন হল সে যে স্বামীর কাছে আপরাধ স্বীকার করা, ক্ষমা চাওয়াকেও গ্রাহ্য করল না সে। গোঁ-এ সে তার বিবেককেও দিল বিদায়। মরতে যখন বলেছে তাকে তখন করতেই হবে তাকে। মরে তাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে মনোরমা মুখে যা বলে তাই করে সে। মরণেই তার উচিত শিক্ষা হবে স্বামীর। বুঝবে সে তার ভুল। পাবে সে তার কথা না শোনার ফল। মরলেই সে জব্দ হবে তার টিকটিকি ননদিনী আর আক্কেল হবে তার কেঁকলাশ শাশুড়ীটার। ক্রোধচণ্ডালটার সঙ্গে তার জেদটা যুক্ত হয়ে রান্না ঘরে একলা পেয়ে তাকে গায়ে ঢালা করাল কেরোসিন। তারপর মূহূর্তের উত্তেজনায় অন্ধ করে তাকে গায়ে লাগা করাল আগুন।

"—উঃ! জ্বলে গেল, পুড়ে গেল।" বলতে বলতে আবার মনোরমা তেমনি আগের মত উঠল চিৎকার করে। সঙ্গে সঙ্গে তার সেই সুন্দর চেহারাটা রোশনাই কাঠির মত দাউ দাউ করে উঠল জ্বলে। যেন ফেটে পড়ল সে করুণ আর্ত্তনাদে,—আমাকে বাঁচান আপনি। এ আগুনের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করুন আমাকে। মুক্ত করুন আমাকে এই দহন জ্বালার হাত থেকে। আঃ কি জ্বালা। কি যন্ত্রণা।

স্মরণ মাত্রই পাপের আগুন সূক্ষ্মে যে এমন সত্তাকে গ্রাস করে জানা ছিল না ভূতনাথের। এই কি তাহলে নরক ভোগ? কিন্তু ভোগের এই নিষ্ঠুর দৃশ্যটা দেখে ব্যাকুল হয়ে উঠল মনটা ভূতনাথের। অধীর হয়ে উঠল হৃদয়টা তার তাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্য। তাই জিজ্ঞেস করে উঠল সে তাকে,—কি ভাবে উদ্ধার হবেন আপনি? কি ভাবে মুক্তি পাবেন আপনি আপনার এই অবস্থা থেকে? বলুন আমাকে কি করতে হবে?

সুন্দরী মানবী মূর্ত্তিটা তখন মনোরমার পরিণত হয়ে গেছে আগের মত সেই অগ্নিময় রূপে। সেই রূপেই সে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বলতে লাগল তাকে,—জীবিত স্বামীর পাবেন দেখা আপনি আপনার কারখানায়। আমার শোকে মনের দুঃখে সে এখনও হয়ে আছে দিশাহারা। স্মৃতি আমার সব সময় ব্যাথা হয়ে বাজছে তার অন্তরে। অনুতাপ ও অনুশোচনার আগুনে অনবরত দগ্ধ হচ্ছে তার হৃদয়। আমার জন্য তার এই শোকতাপ অন্তরের ব্যথা এখানে আমার এই আগুনের যোগাচ্ছে ইন্ধন। পরিহার করতে বলবেন তাঁকে আমার শোক। ভুলতে বলবেন আমাকে। বিয়ে করতে বলবেন তাঁকে। পরিবার-পরিজন পুত্র-কন্যা নিয়ে যে একটা সুখের সংসারের আশা করেছিলেন তিনি আমি সে আশা তার পূর্ণ হতে দিই নি। আমার মত জীবনে আর একজনকে গ্রহণ করে তিনি যেন তার পূর্ব-পুরুষদের সাধ পূরণ করেন, বংশধারা বজায় রাখেন। তা না করলে কিন্তু দায়ী হব আমিই। এতে আমার পাপের বোঝা আরো যাবে বেড়ে। সেখানে স্বামীর মন শান্ত হলেই এখানে আমার দহন-জ্বালা কমবে। নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে আমার উদ্দেশ্যে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলেই তিনি লাঘব হবে আমার দণ্ডভোগ। তারপর তিনি তার পুত্রের হাতে আমার উদ্দেশ্যে পিন্ডদান করালেই এ মহাপাপ থেকে উদ্ধার পাব আমি। মুক্ত হবে আমার আত্মা।

বলতে বলতে তার জ্বলন্ত, অগ্নিদগ্ধ মূর্ত্তি নিয়ে অদৃশ্য হতেই মনোরমা, হঠাৎ কানের কাছে ভূতনাথের ভেসে এল আর একটা ক্ষীণ কণ্ঠের খোনাটে স্বর,—কিন্তু আমি কি করে মুক্ত হব বলে দাও বাবা তুমি।

স্বরটাকে অনুসরণ করে ডানপাশে তাকাতেই দেখল সে আর একটা প্রেতাত্মা। এটাও নারীর। ভূতনী বা প্রেতিনী হবে। যন্ত্রণা-কাতর নাকি সুর তার। তবে চমকে উঠল ভূতনাথ তার চেহারাটা দেখে। কারণ এটা আরোও বীভৎস, আরোও কদাকার। পেট ফেটে বাইরে ঝুলছিল তার ছেঁড়া পঁচা আধ-গলন্ত নাড়ী ভুঁড়িগুলো। দাঁতে দাঁত চাপা তার চোখ চিমড়ানো, মুখ বাঁকানো অসহ্য যন্ত্রণা-কাতর চেহারাটা। মারাত্মক কষ্টে যেন দুমড়ে-মুচড়ে কুঁকড়ে আছে সে। দেখেই ভূতনাথের মায়া হল। সতীর চেহারাটাও হল যেন বিষাদ-বিষন্ন। সত্যি, এ কষ্ট তার চোখে দেখা যায় না। মনটা ভূতনাথের আনচান করে উঠল তাকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত করবার জন্য। কিন্তু করবে সে কি? জিজ্ঞাসু নেত্রে সতীর দিকে তাকাতেই টানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। তারপর বিষাদ-মাখা স্বরে বলে উঠল সে,—মানুষ শুধু ভবিষ্যৎ অন্ধমূঢ় জীব নয় ভূতদা, সে অতীত অজ্ঞ-মূঢ় প্রানী। কেটে আসা জীবনের বিস্মৃতির অন্ধকার নিয়ে চলে সে কুয়াশাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের অনিশ্চিয়তার পথে। এক কথায় অজ্ঞানতায় ভরা তাদের জীবন। অথচ বর্তমানের সামান্য এক-আধটু জ্ঞান নিয়ে তার কতই না বড়াই, কতই না গর্ব-অহঙ্কার। মানুষ শুধু—এই জন্মেই মানুষ হয়ে জন্মায় নি ভূতুদা। জন্ম-জন্মান্তরে কত মা-বাবার যে পুত্র-কন্যা হয়ে, কত পুত্র-কন্যার যে মা-বাবা হয়ে এসেছে সে এ জীবনে তার কি কোন ঠিক আছে।

বলেই সতী আরম্ভ করল সেই প্রেতিনীটার জীবন-কাহিনী বলতে। গত জনমে ছিল নাকি সে নিঃসন্তান এক রমনী। কিন্তু তার আগের জন্মে ছিল সে এক ছেলের মা। অত্যন্ত স্বার্থপর মা। নিজের ছেলের ভাল-মন্দ ছাড়া অপরের ছেলের ভাল-মন্দ সে চিন্তাই করত না। নিজের ছেলেকে ভাল ভাল নানা খাবার খাওয়াত। কিন্তু তার সঙ্গী-সাথী অন্যান্য দীন-দুঃখীদের ছেলেরা যে ড্যাব-ড্যাবিয়ে তার ছেলের খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকত—ভুলেও তাদের দিকে ছিঁটে-ফোটা এক কনা খাবারও ছুঁড়ে দিত না সে। অথচ বেশ বড় অবস্থাপন্ন ঘরের গৃহিনী ছিল সে। কিন্তু মনটা ছিল তার মস্ত নীচু, হীন। নিজের ছেলেকে দামী-দামী পোশাক-পরিচ্ছদ পরাত সে। রাত-দিন ঘন্টায়-ঘন্টায় পাল্টাত তার সে পোশাক। অথচ অন্যান্য গরীব ছেলেরা যে তার পাশে শীতে দাঁড়িয়ে কাঁপত, ছেঁড়া টেনা কোমরে জড়িয়ে কাতর চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকত—মা হয়ে ভুলেও সেসব ভ্রূক্ষেপ করত না সে। এ সবের ফল পেল সে পরজন্মে। ওইসব দরিদ্র-সন্তান নারায়ণদের দীর্ঘশ্বাসেই বোধ হয় নিঃসন্তান হল সে পর জীবনে। স্বামী তার গদার ডিহির গোকুল মুখুজ্জে। মস্ত বড় লোক। এত ধন তার খাবে কে? বংশ রক্ষা করাও তো দরকার। তাই প্রথমা স্ত্রী নূনীবালা থাকা সত্ত্বেও মুখুজ্জে মশায় দ্বিতীয়বার করলের দারপরিগ্রহ। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে একটি সন্তানও লাভ হল তার। নাম রাখলেন তার মানিক। সাত রাজার ধন এক মানিক আর কি। মানিক ছিল কিন্তু নূনীবালার সেই বিগত জন্মেরই সন্তান তার সে জন্মের আদুরে দুলাল। দুলালের তাই নিজের মায়ের চেয়েও সৎ-মা অর্থাৎ বড়-মার দিকে টানটা হয়ে গেল বেশী। কিন্তু তা হলে হবে কি তার মা চারুলতা ছিল মস্ত কুসংস্কার সম্পন্ন মেয়ে। বন্ধ্যা মেয়েদের চোখে নাকি বিষ আছে। তারা নাকি ডান হয়। তাই ছেলেকে চারুলতা কিছুতেই তার বড়-মার কাছে যেতে দিত না। সে এক মহা কেলেঙ্কারী। এ কেলেঙ্কারীতে মুখুজ্জে মশায় চারুলতারই পক্ষ নিতেন। কারণ সে তার বংশ ধারা বজায় রেখেছে। বড়-বৌকে তাই গাল-মন্দ এমন কি মাঝে-মধ্যে নির্য্যাতনও করতেন। কিন্তু বড়-বৌ এর মায়ের টান, নাড়ীর টান। আত্মা জন্ম-জন্মান্তর খোলশ ত্যাগ করলেও কিন্তু গতজন্মের মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা তার সূক্ষ্মমনে, অবচেতন স্তরে থেকে যায়। বর্তমান মন তার ধরা ছোঁওয়া না পেতে পারে। চেতন স্তর হয় তো এসবের কারণ না জানতে পারে। কিন্তু এ শাশ্বত সত্য অন্তরের অন্তঃস্থলে থাকে জাগরুক।

যাক গে ওসব কথা। মুখুজ্জে মশায় কিছুতেই যখন বড়-বৌ এর ওই ছেলে-টান স্বভাবটা ত্যাগ করাতে পারলেন না। আর বুঝলেন যখন তিনি ঘরে থাকলে নূনীবালা ছেলেটারও যখন বড়-মা নেওটা স্বভাবটা যাবে না তখন বড়-বৌকে তিনি আলাদা করে দিলেন। এক ঘরে এই পৃথক হয়ে থাকাটা নূনীবালার বড় প্রাণে লাগল। কি যে কালে খেল তাকে—মনে হল তার এই দুরবস্থার জন্য দায়ীতো ওই ছেলেটাই। সুতরাং মানিককে যদি জীবন থেকে সরানো যায় তবে ছোট-বৌ-এর অহঙ্কার, স্বামীর দাপট সব কমবে। তাই বিষ এনে একদিন

গোপনে খাওইয়ে দিল সে মানিককে। কিন্তু যতই হোক মায়ের মন। বিষ খেয়ে মানিকের ছট্‌ফটানি দেখে নিজেই সে গোল করে কাঁদতে আরম্ভ করল,—ওগো, আমি ছেলেকে আমার বিষ খাওইয়েছি গো। তোমরা কে কোথায় আছো ছুটে এসে ছেলেকে আমার বাঁচাও গো। মানিককে আমার রক্ষা কর।

মুখুজ্জে মশায়ের কপাল ভাল। তাই সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে মানিককে বাঁচিয়ে আনেন। কিন্তু এধারে নূনীবালা ভাবী লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও স্বামীর নির্য্যাতনের আশঙ্কায় এবং নিজের কৃতকর্মের অনুতাপ ও অনুশোচনায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। সেই নূনীবালারই এই নাকি প্রেতিনী-মূর্ত্তি। বিষ খাওইয়ে যে মা নিজের ছেলেকে মারতে যায় তার এ দুর্দ্দশা হবে না-তো কার হবে?

"—এর কি কোন ক্ষমা নেই সতী?" হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ,—মার্জ্জনা নেই এ অপরাধের?"

ঘাড় নাড়ল সতী। বলে উঠল শান্ত স্বরে,—এ লোকে তোমাদের ইহজগতের মত ক্ষমা-করুণা, দয়া-মায়া, মাফ-মার্জ্জনার কোন স্থান নেই ভূতুদা। যার যা কর্মফল তাকে তা ভোগ করতে এখানে হবেই হবে। তবে ভগবানের কাছে তার আত্মার মঙ্গল, সত্তার শান্তি কামনা করলে হয়ত ভোগটা তার কমতে পারে।

মনটা ভূতনাথের কেমন যেন বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। মাতৃভক্ত সে—তাই বুঝি ওই অসহায় মা-পেত্নীটার জন্য সহানুভূতিতে ভরে উঠল তার হৃদয়। তার কষ্টের কিছুই লাঘব করতে পারবে না সে? সতী বোধ হয় বুঝতে পারল ভূতনাথের মনের অবস্থাটা। তাই বলে উঠল সে,"—ভগবানের দেওয়া মাতৃ অধিকারকে যখন সংকীর্ন স্বার্থপরতার পথে নিয়ে গিয়ে ডেকে এনেছে ননীবালা তার জীবনের এই বিপর্য্যায় তখন ওকে নিঃস্বার্থপর, উদারমনা এক মায়ের চিন্তা নিয়েই এ লোকে তাকে থাকতে বল ভূতুদা। ধ্যান করুক সে যে জগতের সব সন্তানেরই সে জননী। ভাবুক সে জগতের বুকে উচ্চ নীচ যত ছেলে আছে সবাই তার নিজের কোলের সন্তান, বুকের ধন, আদরের দুলাল, সাধের মানিক। তাকাক সে জগতের দিকে স্নেহের চোখে, দেখুক সে সব ছেলেকে মায়ের দৃষ্টিতে। এভাবে দেখতে দেখতে, ভাবতে ভাবতে, মনটা যতই তার ওই ধ্যান-জ্ঞান-ভাব চিন্তামুখী হবে ততই সত্তাটা তার ওই মৃত্যুকালীন অবস্থা থেকে সরে আসবে ভূতুদা। শান্তি পাবে সে।

বলতেই বোধ হয় গেল ভূতনাথ। কিন্তু কোথায় বা কি। এর মধ্যেই সেই মা-পেত্নীটা কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেছে কে জানে। বিষাদ-ভাবে সতীর দিকে ফিরে তাকাতেই মুখে একটু হাসির রেখা টেনে বলে উঠল সে,—ওরা সদা চঞ্চল ভূতুদা। মূর্ত্তি ধরে বেশীক্ষণ থাকারও যেমন ক্ষমতা নেই ওদের, পাপও তেমনি এক জায়গায় থাকতে দেয় না তাদের। কর্মফলের যন্ত্রণা-কাতর ঠেলায় এধার ওধার অস্থির হয়ে ছুটে বেড়ায় তারা। তুমি বরং এক কাজ করতে পার ভূতুদা। গদারডিহির ওই গোকুল মুখুজ্জে মশায়কে বলে-বুঝিয়ে তার ছেলে মানিককে দিয়ে ওই নূনীবালার উদ্দেশ্যে গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করাতে পার। তাহলে হয়তো আত্মার তার এ অবস্থা থেকে উৎক্রমন হতে পারে।

—তাই করব আমি সতী। নিশ্চয়ই আমি করব চেষ্টা তার ছেলে ওই মানিক যাতে নূনীবালার উদ্দেশ্যে গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দেয়।

কিন্তু নূনীবালার কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ কানে এল ভূতনাথের আর এক ধরনের "কঁক-কঁকানি, গঁক-গঁকানি" আওয়াজ। দম-বন্ধ বা নিশ্বাস আটকে যাওয়া মানুষের এক যন্ত্রণা-কাতর কণ্ঠস্বর। অনুসরণ করে শব্দটাকে তাকাতেই দেখল সে গলায় দড়ি নিয়ে ঝুলছে এক প্রেতাত্মা। ইনি আবার পুরুষ-ভূত। দেখলে অবশ্য ভূত-প্রেত বলে কিছু মনে হবে না তাকে। হবে মনে মনে একজন ধোপ-দুরস্ত বাবু। পরনে সিল্কের পাঞ্জাবী, মোটা কালো-পেড়ে শান্তিপুরী ধুতি। কুঁচনো কোঁচার কি সুন্দর বাহার তার। ভূতবাবুটির চেহারা কিন্তু শিপ্‌শিপে। কোটর গত চোখদুটোর মধ্যে বাম দিকেরটা অপেক্ষাকৃত একটু ছোট। কপালে একটা কাটা দাগ। সে যাই হোক ঝুলছেন বাবু ভূতটি গলায় ফাঁশ আটকা অবস্থায়। চোখ-দুটো ড্যাবরা ড্যাবরা করে আসমানে। উপর থেকে লাইলনের একটা দড়িতে বাঁধা তার গলাটা। মুখটা অর্থাৎ ঘাড়টা একটু বাম দিকে তার কাত করা। আর ঝুলে থাকায় পা-দুটো হয়ে গেছে টান-টান। দম-আটকানো কষ্ট দেখে ভূতনাথ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল তার কাছে। ভাবল পা-দুটো ধরে তাকে একটু উপরে তুললেই আলগা হয়ে যাবে ফাঁশটা। তারপর খুলে দেবে সে তার গলার বাঁধনটা। পাড়া-গাঁয়ের লোকগুলো সব এমন আহাম্মকই হয়। সামান্য একটু ঝুনোপুটি হলেই মরতে ওমনি গলায় দড়ি নেয়। এ ছাড়া তো আত্মহননের অন্যকিছু পায় না তারা হাতের কাছে—তাই।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যতই ভূতনাথ হাত দুটো বাড়িয়ে তার ধরবার তাকে করতে লাগল চেষ্টা, ততই তার দেহটা উঠে যেতে লাগল উপরে। ঝাঁপিয়ে লাফিয়ে ধরবে কি, অবয়বটা তার শূন্য ছায়া, হাওয়ার মত। ধরেও ধরতে পারল না তাকে। হতাদুটো দেহটা কেটে তার ব্যর্থ হয়ে ফাঁকা চলে আসতে লাগল তার কাছেই, বার বার। হতভম্ব ভূতনাথ। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে তাকাতেই সতীর দিকে বলে উঠল সে,—"স্থূল মন নিয়ে তুমি ওই সূক্ষ্ম-সত্ত্বাটাকে ধরতে পারবে না ভূতুদা। তাছাড়া পাপাত্মাদের অবয়বে পূণ্য হাতের স্পর্শ লাগে না। বৃথা চেষ্টা কর না। ওটা ওমনি ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে থেকে যাবে তোমার।

—কিন্তু এভাবে আর কিছুক্ষণ থাকলে মারা যাবে যে লোকটা।

হাসল সতী। বলল,—মরেই তো এখানে এসেছে সে। মরার পর সে আবার মরবে কি?

তা তো বটে! দেখছে তো সে এখানে মৃত্যুর পরই সকলকে। সূক্ষ্ম লোকের অবাস্তব অবয়ব ওরা। ভাবতেই ভূতনাথের যেন ফিরে এল সম্বিৎ। আসতেই ওমনি জিজ্ঞাসা করে উঠল সতীকে,—মরল কেন সে? এমন সুন্দর ধোপ-দুরস্ত চেহারা! পোশাক-পরিচ্ছদ-হাব-ভাবে ভদ্র, বড়লোক বলেই মনে হচ্ছে তাকে! কিন্তু গলায় কেন দড়ি নিতে গেল সে?

—ওকেই জিজ্ঞেস কর না। বলবে সে তার সব কথা। সাজ- পোশাকেই তো কেও আর ভদ্র-বাবু হয় না ভূতুদা। যাত্রাদলে রাম-সীতা সাজলেই তো আর কেও হয়ে যায় না সত্যিকারের রাম-সীতা। নিজের স্বরূপ সাজ-পোশাকে ঢেকে জগৎ-জীবনে যেমন মুখোশধারী হয়ে চলত—সেই মানসিকতা নিয়েই এখানে সে ওমনিভাবে চলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কর্মফলকে তো এখানে বাবুয়ানিতে ঢেকে রাখা যাবে না। তাই ওভাবেই তাকে ভোগ করতে হচ্ছে তার মহাপাপের দন্ড। জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবে সমস্ত কিছু।

করল জিজ্ঞেস ভূতনাথ। উত্তর তার ভূত-বাবুটি বলতে লাগল তার জীবনের ইতিহাস। জগৎ জীবনে প্রহ্লাদ-পরামানিক নামে পরিচিত ছিল সে সবার কাছে। বাড়ী-ছিল তার পলাসডাঙ্গা গ্রামে। স্ত্রীর নাম ছিল তার প্রমীলা। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তার যেন-তেন প্রকারে বড়লোক হওয়া। হয়েওছিলেন তাই। জীবনে ধন-দৌলত, গাড়ী-বাড়ী করেছিলেন অনেক কিছুই। কিন্তু সম্পদ তো মানুষকে যখনও প্রকৃত শান্তি এনে দিতে পারে না। বরং এসব তৃষ্ণা দুঃখেরই কারণ হয় জীবনে। ধন-মদে মত্ত করলে মনকে সেই নেশাতেই তাকে উন্মত্ত হয়ে ছুটে বেড়াতে হয় সারাটা জীবন—আরো চাই, আরো অনেক চাই, সবার চেয়ে অনেক অনেক বেশী চাই। এই চাওয়ার নেশা কাটেনা তার জীবনে। যতই পায় সে ততই চায়। ছটফট করে। প্রকৃত সুখ বলতে যা বুঝায়, অন্তরের আসল শান্তি বলতে যা বুঝায়—তা থেকে মন থাকে অনেক, অনেক দুরে, চাওয়া পাগলা মন শেষে বলগাহীন ঘোড়ার মত ছুটাতে ছুটাতে তার জীবনে আনে পতন। এ পতন যে কার জীবনে কখন কি রূপ ধরে আসে কেও তা বুঝতে পারে না।

প্রহ্লাদ পরামানিকের জীবনে এ পতন এসেছিল তার ধর্মপত্নী প্রমীলা রানীর মনে তার স্বামীর প্রতি সন্দেহের রূপ নিয়ে। মেয়েদের এ এক সাংঘাতিক ঘোড়া-রোগ। স্বামী-চরিত্রের উপর স্ত্রীব চরিত্রের সন্দেহ-বাতিক একবাব মাথায় তাদের চাড়া দিয়ে উঠলে আর রক্ষা নেই। সে স্থান-কাল-পাত্র অবস্থা কিচ্ছু মানে না। জানে না মান-অপমান। বুঝে না সত্যাসত্যের বিচার। এক কথায় সে বোধ-বিবেক শূন্য হয়ে এক ধরনের পাগল হয়ে দাঁড়ায়। তাই হল প্রমীলার। উঠতে বসতে, স্বামীকে করতে লাগল সন্দেহ। কেও তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তার সাথে দেখা করতে এলে ওমনি চঙ্চাপত প্রমীলার—"লোকটা তার বৌকে নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে কেন?" তার বৈঠকখানাঘরে কোন অফিসার তার মেয়েকে নিয়ে যদি-প্রহ্লাদ বাবুর সঙ্গে কোন আলোচনা করতে আসতেন ওমনি ছ্যাঁক করে উঠত প্রমীলার বুক,"—তুমি কথাবলার সময় মেয়েটার দিকে বার বার বাঁকা চোখে তাকাচ্ছিলে কেন? ইসারা করছিলে কেন?

কি মুস্কিল! কি বলে বুঝাবে যে সে তার স্ত্রীকে কিছু খুঁজে পেত না। বুঝাতে গেলেই সন্দেহ বরং উল্টে বেড়ে যেত তার,—সব মিথ্যা, সব ধাপ্পা। সব তার ডুবে ডুবে জল খাওয়ার ফন্দি-ফিকির, কায়দা-কৌশল। বেরুতে দেখলেই ওমনি সন্দেহের চোখ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াততার প্রমীলা,—কোথায় যাওয়া হবে? কেন যাওয়া হবে? সে অফিসে কোন মহিলা কর্মী আছে কি না? ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু রাত করে বাড়ী ফিরলে তো

কথাই নেই। একেবারে তুলুকম্প কাণ্ড। দিন রাত এতঝগড়া-ঝাটি খিটি মিটি নিয়ে থাকা যায়? বাস করা যায় এমন সন্দেহ-বাতিক স্ত্রীকে নিয়ে সংসারে—চরম কেলেঙ্কারির মধ্যে, জ্বালার ভিতর? ভারসাম্য আর বজায় রাখতে পারলেন না প্রহ্লাদ বাবু। স্ত্রীর জ্বালায় অস্থির হয়ে একদিন নিলেন তিনি গলায় দড়ি।

গলায় দড়ি দেওয়ার পর পরলোকে এসে বুঝতে পারলেন তিনি তার জীবনের এই বিপর্যয়ের কারণ। জীবনে যে প্রশ্নগুলো বার বার তার মনে দোলা দিত—যেমন, "আমি তো কোন অন্যায় করিনি; কোন মেয়েছেলের প্রতি আমার তো কোন দুর্ব্বলতা ছিল না, স্ত্রীকে ছাড়া আর তো অমি কখনও কাকেও ভালবাসিনি। তবু প্রমীলা তাকে এভাবে সন্দেহ করল কেন?" ইত্যাদি নানা জিজ্ঞাসার উওর পেলেন তিনি এই সূক্ষ্মস্তরে এসে তার সূক্ষ্ম মনে। সব জন্মের সমস্ত কর্ম-সংস্কার তো সঞ্চিত থাকে মনেই।

আসলে এসব হল প্রহ্লাদ বাবুর গত জন্মের ফল। শুধু গত জন্মেই এভাবে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেননি তিনি। এ নিয়ে প্রায় ছ-সাত জন্ম গলায় ফাঁস লাগিয়ে এভাবে তিনি আসছেন মরে। সুদূর অতীতের কোন এক জন্মে করেছিলেন তিনি এই মহাপাপ। জীবনের হঠকারিতায়, মনের দুর্ব্বলতায় বিশেষ এক কুক্ষণে সংঘটিত হয়ে গেছল তার এই অপকর্ম, গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা। তারই জের চলে আসছে জন্ম-জন্মান্তর। এ ব্যাপারে অবশ্য বিশেষ দোষ ছিল না তার স্ত্রীর। গত জন্মের আগের জন্মেও প্রমীলা নাকি উর্ম্মিলা নামে ছিল তার স্ত্রী। ধীর-নম্র শান্ত-সুশীলা উর্ম্মিলাকে তিনি করেছিলেন মিথ্যা সন্দেহ। সে সন্দেহ দিনের পর দিন বেড়ে করেছিল তাকে এমন চঞ্চল-উতলা যে শেষ পর্য্যন্ত বাড়ীর পাশে এক আমড়া গাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে হয়েছিল তাকে। স্ত্রীর প্রতি সেই বিগত জন্মের মিথ্যা সন্দেহই গত জন্মে ব্যুমেরাং হয়ে পড়েছিল তার উপর অর্থাৎ প্রহ্লাদ-বাবুর চরিত্রের প্রতি প্রমীলার সন্দেহ রূপে। স্থুল-মন টাকা-কড়ি ধন-দৌলতের ফাঁদে পড়ে, তার ঘোরে থেকে বড় অজ্ঞান হয়ে যায়। সেই অজ্ঞানতার অন্ধকারেই অযথা সন্দেহের বিষময় জ্বালায় পড়ে গলায় ফাঁস লাগান পরামানিক বাবু। করেন আত্মহত্যা। হন বর্তমানের এই প্রেত। ঘুরে বেড়ান সেই সংস্কারের জ্বালা নিয়ে।

শুনতে শুনতে কেমন যেন তন্ময় হয়ে গেছল ভূতনাথ। বড় মায়া হল তার প্রহ্লাদ পরামানিকের প্রেতাত্মাটার প্রতি। কষ্ট দেখে তার তাকে সাহায্য করবার ইচ্ছা জাগল মনে। সরাসরি জিজ্ঞাসা করল তাকে যে সে তার কোন উপকারে লাগতে পারে কিনা। কিন্তু আশ্চর্য্য! এ প্রেতাত্মাটা আগের দেখা অন্যান্য প্রেতাত্মাগুলোর মত ছিল না। চাইল না সে কোন সাহায্য। বলল, তার কর্মফল তাকেই ভোগ করতে হবে। এবং করবেও সে তা—শেষ বিন্দু পর্যন্ত। কারো কৃপা বা করুণায় ভোগ তার লাঘব বা হ্রাস হলে সে পাপের বীজ তার থেকে যেতে পারে মনে, সত্তায়। তার ফলে ভবিষ্যতে তাকে আবার হয়তো ভুগতে হতে পাবে। অন্যান্য বারের মত আর সে ভুল করবে না। যত কষ্টই হোক তার, হোক না যতই তার নরক-যন্ত্রণা—তবু এর জ্বালায় পড়ে সে আর জন্ম-গ্রহণ করতে যাবে না ধরাধামে। সূক্ষ্ম-সত্তায় ভোগ শেষ না করে জের নিয়ে তার নিতে গেলে জন্ম পরিণত জীবনে আবার সেই পাপ এসে টানবে তাকে আত্মহত্যার পথে। রাগ, হটকারিতা, উত্তেজনা নানা রূপ ধরে এসে তাকে করবে প্ররোচিত গলায় দড়ি দিতে। সুতরাং এই সূক্ষ্মস্তরেই জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করবে সে তার আত্মহত্যা-রূপ পাপের দুষ্কর্মের বীজ। অর্থাৎ কারো কোনো সাহায্য না নিয়ে এই গলায়-ফাঁস নেওয়া দম-বন্ধের যন্ত্রণাতেই ঘুরবে সে—যতদিন না তার পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্য হয়।

কথাগুলো শুনে ভূতনাথ যার পর নাই হল বিস্মিত। কেমন যেন একটা শ্রদ্ধা-ভক্তির ভাব এসে আপ্লুত করতে চাইল তাকে। সে দৃষ্টিতে সেই পাপাত্মাটার দিকে তাকাতেই বলে উঠল সেই গলায় দড়ি দেওয়া ভূতটা ভূতনাথকে,—আপনার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ। সাহায্য যদি করতে চান তবে দয়া করে সাহায্য করুন গিয়ে আমার স্ত্রীকে।

স্ত্রী অর্থাৎ সেই উর্ম্মিলা; প্রমীলা হয়ে যে বেঁচে আছে নাকি এখনও পলাসডাঙ্গা গ্রামে-ওই ছেড়ে আসা প্রেতাত্মার অর্থাৎ মৃত প্রহ্লাদ পরামানিকের ঘরে। প্রহ্লাদ-প্রেতটার মুখ থেকেই অবগত হতে লাগল ভূতনাথ যে মৃত্যুর পর তার স্ত্রী অর্থাৎ প্রমীলা সুন্দরী নাকি বুঝতে পেরেছিলেন তার ভুলটা। অর্থাৎ স্বামীকে যে তার মিথ্যা সন্দেহের জ্বালায় আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে এটা সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তিনি। তার

সেই অন্যায়, ত্রুটির প্রায়শ্চিত্য করবার জন্যই তিনি নাকি নেমেছেন এখন দানপুণ্য, তীর্থ-ভ্রমন ধর্ম-কর্ম ইত্যাদি সেবাব্রতে। কিন্তু এতে প্রায়শ্চিত্য হচ্ছে না তার। তার কোন ফল এসেও নাকি লাগছে না প্রহ্লাদ পরামানিকের সূক্ষ্ম সত্তায়। ন্যায় পথে, সত্য-ধর্ম-পুণ্য পথে নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা স্ব-উপার্জ্জিত ধন-সম্পত্তি বা টাকাকড়ি যদি নিস্কাম ভাবে সৎ-পাত্রে দান করা হয় তবেই পাপের হয় প্রায়শ্চিত্য। সৎপাত্র মানে তেলা মাথয় তেল দেওয়া নয় বা নাম-যশ লাভের জন্য কোথাও কিছু দান করা নয়। প্রকৃতই যারা গরীব, নিঃস্ব, অসহায় সেই সমস্ত দীন-দুঃখীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে ভক্তিমনে নিঃস্বার্থভাবে দান করতে হবে। তবেই হবে প্রকৃত পুণ্য, আসল প্রায়শ্চিত্য। অর্থাৎ স্বামী শ্বশুরের ধন উড়িয়ে, দুহাতে তাদের উপার্জিত টাকা খরচ করে করছেন যে তিনি দান-ধর্ম সেবা-কর্ম—এটা ভুল তার। প্রকৃত প্রায়শ্চিত্য হচ্ছে না তার এতে। ওসব ফোঁটা তিলক কেটে, গায়ে নামাবলি জড়িয়ে, হাতে হরিনামের মালা ঠক্‌ঠকিয়ে পরের ধনে পোদ্দারী করলে ধার্মিক হওয়া যায় না। বক-ধার্ম্মিকদের পুণ্য-অর্জন হয় না। ধাপ্পা দিয়ে, অভিনয় করে মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া যায় কিন্তু নিজের মনকে বা বিধির বিধানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। অনুতাপ বা অনুশোচনা যা পাপস্খালনের মূল তা এখনও আসেনি ওর মনে। গত জন্মের পুণ্য ফলের জের তার শেষ হয়ে আসছে। এবার স্বামীকে মিথ্যা সন্দেহ করার পাপ দুর্ভোগ রূপে আসবে তার জীবনে। এখনও উপায় আছে। সেবা-পূজা দান-ধর্মে সে-পাপ ছাড়বে না তাকে। যে মিথ্যা সন্দেহে দুর্বিষহ করেছিল সে তার স্বামীর জীবন সে মিথ্যা সন্দেহে অপরকে ভুগতে দেখলেই তা দূর করার ব্রত নিতে হবে তাকে। দিতে হবে জ্বালাময় জীবনে অপরকে শান্তির বারি। বোধ-প্রবোধের প্রলেপ দিয়ে ক্রধোন্মত্তের ক্রোধ, উত্তেজিতের উত্তেজনা দূর করবার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে তাকে। মায়ের মন নিয়ে করতে হবে তাকে অপরের অশান্ত হৃদয়ে শান্তির প্রতিষ্ঠা। পারবে সে—কারণ সে বয়স, সে মন, পরামানিক সমাজে সে প্রতিষ্ঠা নাকি হয়েছে তার। এ ছাড়া পাপ-শান্তি, তাপ-শান্তি বা অপঃ-শান্তির আর অন্য কোন উপায় নেই তার।

কথাগুলো ঝড়ের মত বলে সেই শূন্যে গলায় দড়ি দেওয়া ঝুলন্ত প্রেতটা ভাসতে ভাসতে হয়ে গেল অদৃশ্য। ভূতনাথ ভ্যাবলাকান্তের মত তাকিয়ে রইল সেইদিকে। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সে বিচিত্র এই জগতের কথা। স্থূলের পিছনে লুকিয়ে আছে কত বড় সূক্ষ্ম জগৎ। জানার পিছনে লুকিয়ে আছে কত বড় অজানা। বুঝার আড়ালে লুকিয়ে আছে না জানি কত না বুঝা ব্যাপার। আশ্চর্য্য!!

চমক ভাঙ্গল তার সতীর হাসি-মাখা কথায়—কি ভূতুদা, ভাবছো কি? দেখলে তো, সাহায্য করব বললেই কাকেও সাহায্য করা যায় না। তেমনি সাহায্য চাইলেও কেও সাহায্য পায় না। উপকার করবার বা উপকার নেবার যোগ্য হতে হয় উভয়কেই। আধার-আধেয় উপযুক্ত না হলে সব কিছুই হয় ভয়ে ঘি ঢালা। দাতা-গ্রহীতার মানসিক আগ্রহ, আন্তরিক ইচ্ছা একই স্তরে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। বুঝলে?

"—আমি ও সকল কিছু ভাবছি না সতী।" বলে উঠল ভূতনাথ, "—ভাবছি, আমি ওই প্রেতাত্মাটার কথা। এ জগতে এমন আত্মাও আছে যে নিজের জ্বালায় জ্বলেও অপরে যাতে শান্তি যায় তার চিন্তা করে। যে পাপ-মৃত্যুর জন্য দায়ী তার স্ত্রী—সে-স্ত্রীকে ক্ষমার চোখে দেখে পরলোকবাসী স্বামী তার ভাবী দুর্ভোগের আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়।"

"—হয়।" বলে উঠল সতী, "—অনুতাপ অনুশোচনায় আত্মা যখন শুদ্ধ হয় তখন পর-মঙ্গল চিন্তার দিকে মন যায় ভূতুদা। তা ছাড়া কৃতকর্মের ফল ভোগ করে করে সত্তা ওর শুদ্ধ হয়ে আসছে ভূতুদা। তাই ওই প্রেতাত্মাটার ওমনি মতি-গতি। ভোগ করলেই পাপ কাটে। পাপ কাটলেই মন উর্ধ্বমুখী হয়। সূক্ষ্মস্তরে পাপ কাটিয়ে মনকে আবার শুদ্ধমুখী করে সত্তাকে পুনরায় জগতের মঙ্গল কর্মের জন্য জন্ম নিতে হয়, এই নিয়ম। কিন্তু পাপের ফল সম্পূর্ণ ভোগ না করে অনেক আত্মা সূক্ষ্মস্তর ছেড়ে জ্বালা জুড়োতে জন্ম নেয় মর্ত্ত্যধামে। তারাই জীবনে এসে করে সে পাপের অনুবর্তন। আত্মহত্যা পাপের এভাবে সাত জন্ম চলে অনুবর্তন। তাই স্থূলেই হোক আর সূক্ষ্মেই হোক জ্বালা-যন্ত্রণা, অশান্তি-দুঃখ যতই হোক না কেন ভোগের শেষ করতে হয়। তাহলে পাপের জের আর ইহলোক বা পরলোকে সত্তার পিছনে ধাওয়া করে না। প্রহ্লাদ পরামানিকের প্রেতাত্মাটা এত জন্মের পর সেটা অনুধাবন করতে পেরেছে তাই তার ওভাবে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা। ভোগের কাল ওর

শেষ হয়ে এসেছে ভূতুদা। আত্মহত্যার জের কাটাতে ভূর্বলোকের ও নীচুস্তরে ঘুরলেও মন তার উর্ধ্বমুখী। তাই ওদের একটু উঁচুস্তরের আত্মা বলা যেতে পারে। কিন্তু তাকাও নীচে, দেখ আর সব আত্মাগুলোর কাণ্ড।

পাহাড়-চুড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে নীচটা যেমন দেখা যায় তেমনি দেখতে লাগল ভূতনাথ আশ-পাশ কুমারখুলি, পাথর মুড়ি, গদার ডিহি, বাঁকা শোল, কালাপাথর ইত্যাদি গ্রামগুলোকে। দেখল সে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। গ্রামগুলোর ধারে-পাশে অদ্ভুত ধরনের নানা ভূত-প্রেতনীর ভিড়। তবে ঠিক প্রেতাত্মাদের মত অস্বাভাবিক, ভয়ালভঙ্কর চেহারা নয় তাদের, নয় তাদের অঙ্গ-অবয়ব তেমন কদাকার বা কিম্ভূত কিমাকার। দেখতে কতকটা তারা স্বাভাবিক মানুষের মত হলেও রঙগুলো তাদের কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন। কেও লালচে, কেও কালচে, কেও আবার ধোঁয়াটে ধূসর সবুজ। কারোর আবার নীল গোলাপীর আভা। ঘুরছে কেও গাঁ-গুলোর পাড়ায় পাড়ায়, কেও ঘুরছে পাড়াগুলোর অলিতে গলিতে, কেও আবার ঘুর ঘুর করছে কুলি-গলির ঘরগুলোর আনাচে কানাচে। যেন কিল বিল করছে তারা। মুখে-চোখে লালসার ছাপ।

—ওরা আবার কারা সতী? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

"—ওরা হল আর এক ধরনের ভূত-প্রেত ভূতুদা।" বলে উঠল সতী,

"—হল ওরা জন্মান্বেষনকারী প্রেতাত্মা। ভূবর্লোকে ভোগের কাল ওদের শেষ হয়েছে। এবার ওদের জন্ম নেবার পালা। এই পৃথিবীতেই জন্ম নেবে ওরা। তাই ঘুরছে ওমনি মানুষের কাছাকাছি। অন্যান্য ভূত-প্রেতপ্রেতদের মত মানুষকে ভয় দেখিয়ে বা ভয়ে মানুষের কাছ ছাড়া হয়ে ওরা দূরে সরে থাকতে চায় না। চায় ওরা মানুষের সান্নিধ্য। তাদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে আত্মার আত্মীয় হতে চায় ওরা। চায় মানুষের পুত্র-কন্যা হয়ে এই ধরনীর ধূলায় আবার লুটোপুটি খেতে। তাই খুঁজছে ও'রা নিজের নিজের মনোপযোগী ঋতুমতী মাতা ও সম-ভাবের ভাবুক সন্নিপাতমুখী পিতা। সাধারণত যার যেমন কামনা-বাসনা সে তেমন কামনা-বাসনারই পিতা-মাতা খুঁজে ভূতুদা। উচ্চাত্ম খুঁজে তাই উচ্চ স্পন্দনশীলা মাতা ও উন্নত চিন্তাশীল পিতা। নীচআত্মা যারা, যাদের চিন্তার তরঙ্গ ও ভাবনার স্রোত নিম্নমুখী তারা তেমনি কুচিন্তাগ্রস্থা মাতা ও বদবুদ্ধি সম্পন্ন অসৎ হৃদয় পিতাকে করে আশ্রয়। অনেকে আবার ফেলে আ[illegible] জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোকে চরিতার্থ করবার জন্য নেয় এমন পিতাব ঔরস এবং এমন মাতার গর্ভ যাদের মন সম আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত ও আলোড়িত।

শুনে অবাক হল ভূতনাথ যে এদের মধ্যেও আছে নাকি অনেক উচ্চাত্মা এবং পুণ্যাত্মাও। স্বর্গ ভোগের কাল শেষ করে যারা এসে নেমেছে এই ভূবর্লোকে—মা বসুন্ধরার কোলে আবার জন্ম নিতে। কেও নীল-উজ্জ্বল ডিম্বাকৃতি, কেও শুভ্র-উজ্জ্ব[illegible] গোলাকার। ছায়াশরীরগুলোর মধ্যেও ফুটে উঠছে কারো দিব্যকান্তি চেহারা। এদেরই নিম্নস্তরে কিলবিল করছে নানা আকারের সব অদ্ভুত রঙের ভূত-প্রেত। কালচে, লালচে, ঘন সবুজ, ফিকে হলদে, মেটে-বাদামী নানা রঙের প্রেতাত্মা। ওগুলো নাকি হল ওদের কামনা-বাসনার রঙ। মানুষেরও নাকি দেহ থেকে বিচ্চুরিত হয় এমনি নানা রঙ। যার মনের যেমন লালসা, যেমন মতি-প্রকৃতি তার দেহের আভায় ফুটে উঠে তেমনি রঙ্। এসব হল সূক্ষ্ম-রং তাই স্থূল-চোখে নজরে আসে না। আবলোকন করা যায় সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে। ভূবর্লোকের সূক্ষ্ম-দৃষ্টির প্রেতাত্মাদের চোখে এসব রঙ্ সহজেই ধরা পড়ে। এবং পড়ে বলেই তাদের ভাবের. মতের, কামনা-বাসনার অনুকূল পিতা-মাতা খুঁজতে বেগ পেতে হয় না। শুধু-স্থূলদেহ-ধারী মাতাপিতার কামনা-বাসনার ওই সূক্ষ্মরঙের জ্যোতির আভায় সম-প্রকৃতির প্রেতাত্মারাই যে আকৃষ্ট হয় তা নয়। সূক্ষ্মদেহীদের ওই সম- প্রকৃতির অদৃশ্য-অ[illegible]ক জ্যোতির আভায় স্থূলদেহবাসী সম- মনোভাবাপন্ন পিতৃ-মাতৃসত্তাও আকর্ষিত হয়। জড় মন হয়ত বুঝতে পারে না তা, স্থূল দৃষ্টি হয়ত ধরতে পারে না সেসব। অজ্ঞাতে তাদেব সূক্ষ্মসত্তার এই আকর্ষণ- প্রত্যাকর্ষণ কখনও স্বপ্নের মাধ্যমে কখনও হঠাৎ কোন অলৌকিক দর্শনে প্রতিভাত হয়। মানুষের কামনা-বাসনার এই সূক্ষ্ম-আভার আকর্ষণে সম কামনা-বাসনার প্রেতাত্মারা আকৃষ্ট হয়ে মানুষের মনের দুর্ব্বলতাব সুযোগ নিয়ে কখনও কখনও অনুপ্রবেশ করে তাদের মধ্যে। এসব আত্মার উদ্দেশ্য হল উক্ত দেহের [illegible] তার অতৃপ্ত জাগতিক কামনা-বাসনাগুলো পূরণ করা। যার জ্বালায় সে সূক্ষ্মদেহে অস্থির হয়ে ঘুরছে এ[illegible] ভূবর্লোকে। এ ভৌতিক দেহে তো আর স্থূল দেহের ওসব কামনা পূরণ হবে না তাই। এ অবস্থায় সেই দেহীর আত্মা থাকে আচ্ছন্ন হয়ে। প্রেতাত্মা তার অনভ্যস্ত দেহযন্ত্র ঠিকমত

পরিচালিত করতে পারে না বলে সে দেহের আচার-আচরণ, বলা-কওয়া, চিন্তা-ভাবনা অপরের কাছে সামঞ্জস্যহীন ও অদ্ভুত ঠেকে। হিতে হয় বিপরীত। একেই সাধারণ কথায় বলে "ভূতে পাওয়া" বা "প্রেত-ভর হওয়া"। "ঠাকুরে পাওয়া" বা "দেবতার-ভর হওয়া" ও হয় আবার অনেক সময় যখন কোন মানুষের অন্তরে সৎ আত্মা বা পবিত্র-সত্তার হয় অনুপ্রবেশ। তবে এক ধরনের উগ্রআত্মা আছে যাদের এই আকর্ষণটা হয় অত্যন্ত উগ্র-প্রকৃতির ও অস্বাভাবিক। এদের অনেক সময় বলা হয় "সন্ন্যাসী পাওয়া" বা "উপদেবতায় ভর করা"। অনুপ্রবেশ না ঘটলেও এই আকর্ষণের আর একটা পর্য্যায় হল হঠাৎ কোন আচমকা মুহূর্তে স্থূল চোখে ওসব সত্তার দর্শন হওয়া। অন্তর্জ্যোতির আকর্ষণে নিম্ন প্রকৃতির নীচ আত্মা এসে পড়লে হয় "ভূত-দর্শন" বা "প্রেত দেখা" আর উচ্চ প্রকৃতির উন্নত-আত্মা এসে পড়লে হয় "দিব্য-দর্শন" বা ঠাকুর-দেখা"। তবে বাস্তব অপেক্ষা এসব অবলোকন স্বপ্নেই সাধারণত হয় বেশী। বাস্তব মনের অজ্ঞাতে অন্তরপ্রকৃতির এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা বুঝতে পারে না সাধারণ মানুষ। তাই কি দেখে, কেন দেখে—কোন কিছু বুঝতে না পেরে তাদের স্থূল মনের সাধারণ ধারণা অনুযায়ী নানা কান্ড করে। তবে ওসব অদৃশ্য-সত্তা এসব অলৌকিক দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শন মানুষকে যত সহজে করাতে পারে তত সহজে কিন্তু তারা তাদের মাধ্যমে জন্মপরিগ্রহণ করতে পারে না। অসদাত্মা ও পুণ্যাত্মা অসৎ-সৎ মানব-মানবীর কামনা-বাসনায় বা অন্তর্জ্যোতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হয় বটে কিন্তু গর্ভদানকালে বিশেষ এক মুহূর্তে সংগুপ্ত অন্তরপ্রকৃতি সম-প্রকৃতির আত্মাদের আকর্ষণ করে। এই ত্রয়ীর যথাযথ মিলন ছাড়া গর্ভের অবক্রান্তি ঘটে না। সৃষ্টির সমস্ত উপাদান বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের সমস্ত জায়গায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপস্থিত থাকলেও যেমন বিশেষ এক শক্তি ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব হয় না তেমনি মানব-মানবী বা সূক্ষ্মদেহী আত্মাদের ইচ্ছার উপর গর্ভাধান বা জন্মগ্রহণ নির্ভর করে না। নির্ভর করে বিশেষ মুহূর্তে উভয় দেহীর সম-প্রকৃতি স্বভাব-গতি ও আন্তরিক ইচ্ছার উপর।

সতীর কথার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম-লাভেচ্ছুক আত্মাগুলোর আকুলি বিকুলি ও তাদের জন্ম-পরিগ্রহের লালসা-ভরা দৃষ্টি দেখে যার পর নাই বিস্মিত হল ভূতনাথ। রইল তাকিয়ে সে তাদের দিকে অবাক-বিস্ময়ে।

(কুড়ি)

জ্ঞান-পিপাসু, আগ্রহশীল শ্রোতা পেলে মনে হয় সূক্ষ্মলোকের অধিবাসীরাও ভূলোকের মানুষের মত মুখর হয়ে উঠেন। সতী তাই যেন বক্তা হয়ে উঠল ভূতনাথের কাছে। ভৌতিক স্তরের কথাপ্রসঙ্গে এসে হাজির হল তার মুখে জন্ম-মৃত্যুর অদ্ভুত রহস্য কথা।

আসলে জন্ম-মৃত্যু তো সত্তার আরম্ভ বা শেষ নয়। বাল্যের মৃত্যু যেমন কৈশোরের জন্ম দেয়, কৈশোর মৃত্যু যেমন এনে দেয় যৌবনকে, যৌবন যেমন সরে গিয়ে হাজির করে প্রৌঢ়ত্বকে-এমনি করে জন্ম-মৃত্যু, মৃত্যু জন্ম জীবনকে নিয়ে যায় ক্রম পরিণতির দিকে। এতে দেহেরই যা পরিবর্তন হয়। ব্যক্তি সত্তার কোন বিলোপ বিনাশ বা বিলুপ্তি হয় না। তেমনি জীবাত্মারও। স্থূলদেহ ছেড়ে সত্তার, সূক্ষ্মদেহে গমন, সূক্ষ্মদেহ ছেড়ে আত্মার স্থূল দেহে আগমন—এইযে আগমন নিগমন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু —এতে সত্তার বাহ্যিক রূপান্তরই হয় মাত্র আসল জীব-সত্তার অর্থাৎ আত্মার কোন পরিবর্তন, লয় বিলয় বা নাশ হয় না। জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনে এমনি আবর্তিত হতে হতে আত্মচৈতন্য চলেছে ক্রমশ বিকাশের পথে। জীবচৈতন্যের হচ্ছে বিবৃদ্ধি। অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু কোথাও স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে নাকি সত্তাকে সে তাব মূল উৎস বা পরম সত্তার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

তবে সবেরই একটা বিধি নির্ধারিত সময় ও নিয়তি নির্দ্দিষ্টকাল আছে। এ নিয়ম বা কাল-কে মেনে নিয়ে জীবনকে অতিবাহিত করতে হয়। একে উপেক্ষা করতে নেই। স্থূল জগতে জীবাত্মার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যেমন একটা সুনির্দ্দিষ্ট জীবৎকাল আছে তেমনি আবার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহনের আগে পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম জগতেও সত্তার একটা বিধি-নির্দ্দিষ্ট ও নির্ধারিত সূক্ষ্ম-জীবৎকাল আছে। কালের সঙ্গে আছে তেমনি সুখ-দুঃখ ভোগ। আছে হর্ষ-বিষাদ, শান্তি-অশান্তি, আশা-হতাশা ইত্যাদি। একটা অ

আর কি! তাই ভাল-মন্দ দুই-ই ভোগ করতে হয়। ভোগ করলেও আধ্যাত্মবাদী যাঁরা তাঁরা কিন্তু এ-সবের

কোনটাকেই বড় করে দেখেন না। তাঁরা শুধু সত্তার বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যান। অর্থাৎ সৎ কর্ম, পবিত্র জীবন যাপন ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের জীবনের কালকে অতিবাহিত করেন। কিন্তু যারা মনুষ্যত্ব বিহীন-"পশুভিসমানা" তারা জীবনে শুধু ভোগ-সুখটাকেই বড় বলে মনে করে এবং এর জন্য এরা কু-প্রবৃত্তি, অসৎ কর্ম, অপবিত্র পথ গ্রহণ করতেও কুন্ঠিত হয় না। ভগবানের দেওয়া বোধ-বুদ্ধি, জ্ঞান বিবেককে অবমাননা করে জীবনে এরা কর্মফলের বোঝা বাড়ায়। বাড়ায় পর লোকের দুর্ভোগ জীবনটাকে এরা বেপরোয়াভাবে কাটিয়ে। কেও কেও আবার এভাবে কাটাতে গিয়ে জীবনটাকে পায় যদি সুখে বাধা, শান্তিতে জ্বালা, আনন্দে দুঃখ, আশায় হতাশা তবে ভাবে তখন এ জীবন থেকে চলে গেলেই বুঝি পাওয়া যাবে শান্তি। পরলোকে গিয়ে মিলবে বুঝি তার সুখ, জুড়াবে যন্ত্রণা, মিটবে আশা, পাওয়া যাবে তার কামনার ধন। তাই বিধি নির্দ্দিষ্ট তার জীবৎকাল শেষ না করেই মরে অর্থাৎ আত্মহত্যা করে।

কিন্তু কোথায় সুখ? ইহজীবনকে বঞ্চনা করে পরজীবনে গিয়ে কি সুখ পাওয়া যায়? যায় না কখনও শান্তি পাওয়া ইহলোককে প্রতারনা করে গিয়ে পরলোকে। তাই আত্মহত্যা মহাপাপ তাদের ঠোক্কর খাওয়া ইহ জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট, শোক-হতাশা, নিরানন্দগুলোকে সহস্রগুণ বড় করে জ্বালা যন্ত্রণাময় করে হাজির করে তাদের সূক্ষ্ম-জীবনে। এসব চারধার থেকে ছেঁকে ধরে তাকে দগ্ধ করতে থাকে নিরন্তর। উল্টো তখন ভাবে আবার তারা পরলোক ছেড়ে ইহলোকে গেলেই বুঝি জুড়াবে তাদের জ্বালা, পাবে শান্তি। অব্যাহতি পাবে নরক-ভোগ থেকে তাই আবার স্ব-ইচ্ছায় সূক্ষ্মলোকে মরে সে। অর্থাৎ পরলোকের নির্দ্দিষ্ট ভোগ কাল শেষ না করেই জন্ম নেয় সে আবার ইহলোকে। মাতা-পিতা বিচার না করে, ভাবী জীবনের চিন্তা না করে যাব-তার গর্ভ-ঔরসে গিয়ে আশ্রয় নেয় সে। কিন্তু অসমাপ্ত কর্মফল, নরক ভোগের জের নিয়ে যায় তার সঙ্গে। কথায় বলে পাপ বাপকেও ছাড়ে না জন্মালে আবার জীবনটাকে সে ফুটাতে থাকে দুঃখ জ্বালায়। উদাহরণ দিয়ে বলতে গেলে তুলনা করে চলে নাকি এদের রাস্তা- ঘাটের সেই নেড়ি-ভুলি খেঁকি কুকুরগুলোর সঙ্গে। গ্রীষ্মকালে গরমের চোটে অস্থির হয়ে ছটফট করে বেড়ায় যারা এধার-ওধার। বোকা বাউন্ডুলে অজ্ঞান এই কুকুরগুলো জানে না কি করলে শান্তি পাবে, কোথায় গেলে দাবদাহের থেকে রক্ষা পাবে তারা, ঠাণ্ডা হবে তাদের গা-টা। ভাবে, ছুটে গিয়ে জলে নামলেই বুঝি শীতল হবে তাদের শরীরটা। এঁদো পুকর খানা-ডোবা কোন কিছু-বিচার না করে তাই তারা ছুটে গিয়ে পড়ে জলে। কিন্তু ও বাবাঃ। সে জল যে তপন-তাপে প্রায় ফুটন্ত অবস্থায় থাকে জলে নামলেই বুঝতে পাবে তারা। উষ্ণ-জলে সিদ্ধ হতেই তাদের শরীরটা ভাবে তারা আবার ডাঙ্গায় উঠলেই বুঝি পাওয়া যাবে শান্তি। উঠে ডাঙ্গায়। কাদা-বালি-আবর্জনায় লটপট করায় শরীরটাকে। কিন্তু হায় রে কপাল! সে গুলো যে আবার আগুনের হল্কা—ভাজা হতেই শরীরটা বুঝতে পারে তারা।

ভূতনাথের সামনে ঘোরা ওই ভূত পিশাচ প্রেতাত্মাগুলো নাকি সেই ধরনেরই সত্তা। আসল শান্তি যে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে, কি করে লাভ হবে—জানে না তারা। বাস্তব জীবন-জ্বালায় অস্থির হয়ে ভাবে বুঝি মরনের পরই শান্তি, পাওয়া যাবে সুখ। তাই মরে তারা। আত্মহত্যা করে। কিন্তু পরলোকে এসে পড়ে যখন নরকযন্ত্রণায় বুঝতে পাবে কি ভুলটাই না করেছে তারা। এ ভাবে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে পার্থিব জীবন তাদের অনেক ভাল। সেই ভেবে আবার তারা জন্ম নেয়। নামে পার্থিব জীবনে। কিন্তু এলে কি হবে? অসমাপ্ত কর্মফল আসে যে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের সেই অসমাপ্ত নরক-ভোগটাকেও। জীবনের দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-বিষাদ জ্বালা-যন্ত্রণা, বিরহের ব্যথা, অভাব তাড়না যে নরক যন্ত্রণারই নামান্তর। এমনি ভাবে সূক্ষ্ম স্তরে ইহলোকে প্রেত-ভৌতিক দেহে ও স্থূল-অবয়বে অস্থির অধীর চঞ্চল হয়ে ছটফট করে বেড়ায় ওই সব নীচ-আত্মা ও হীন-সত্তাগুলো।

শুনতে শুনতে মাঝ পথে হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠল ভূতনাথ সতীকে,—"তাহলে কি তুই বলতে চাস জন্ম-মৃত্যু সত্তার ইচ্ছাধীন? দেখছি যা তা কি ওই আত্মাগুলোর নরক ভোগ?

"—না ভূতুদা," বলে উঠল সতী,— দেখছো যা তা কিন্তু ওই আত্মাগুলোর প্রকৃত নরক ভোগ নয়। নয় এটা তেমনি নরকও। এটা হল ভূলোক ও ভূবর্লোকের মধ্যস্তর। ইহলোকের উর্দ্ধে ভাসমান স্তর। পরলোকের এই প্রারম্ভ স্তরের নিম্নে আছে নরক। ভোগ অনুযায়ী স্বর্গের মত নরকও ক্রম পর্য্যায়ে সপ্ত-স্তর বিশিষ্ট।

সতীর কথায়—এক একস্তরে আছে নাকি এক-এক রকমের নরক। নাম তাদের রৌরব, মহা-রৌরব, বিড়ভুজ, নিকৃন্তন ইত্যাদি। যার যেমন জীবনের পাপ মৃত্যুর পর সে নাকি যায় তেমন নরক। আপনা থেকে। এ সব নরকের নাকি আশ্চর্য্য ধরনের এক-এক রকমের আকর্ষণী শক্তি আছে। আছে পাপেরও তেমনি এক এক রমমের ভার। সেই পাপের ভার অনুযায়ী সত্তা নাকি নির্দ্দিষ্ট নরকের আকর্ষণী শক্তিতে হয় আকর্ষিত। এ টানকে কারো রোধ করার ক্ষমতা নেই। পাপের ভার অনুযায়ী মৃত্যুর পর কেও প্রজ্জ্বলিত অগ্নিগুহার সুড়ঙ্গ পথে আকর্ষিত হয়ে গিয়ে পড়ে তপ্ত কুন্ড নরকে। কেও জ্বলন্ত লাভায় উঠে-ডুবে জ্বলে-পুড়ে সাঁতার কাটতে গিয়ে হাজির হয় মহা-রৌরব নরকে। অসৎ কর্মের ফলে আটকে থাকে কারো আবার আত্মা গলন্ত লৌহার বিশাল-বিপুল সমুদ্রের তীরে। গলন্ত লৌহার উত্তপ্ত ঢেও বার বার এসে আছড়ে পড়ে তার অবয়বে। জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায় তার সত্তা। কিন্তু জ্বালাটাই যা ভোগ হয় অ্বর—মরে না কিন্তু সে। দুর্বিষহ তুষার-ঝড় নাকি কাকেও আবার উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে অতিশীত নামক নরকে। জমে যায় তার রক্ত, পড়ে যায় তার দাঁত। বরফাঘাতে চূর্ন-বিচূর্ন হয় তার দেহ তবু কিন্তু মরে না। মরণের পর তো আর মরণ হয় না তাই অতিশীতের জ্বালা শুধু সহ্য করতে হয় তাকে। সহ্যের মাত্রা আবার ছাড়িয়েও যায় কারো নিকৃন্তন নামক নরকের চাকায় পড়ে। সে চাকার চারধারে নাকি থাকে বিষাক্ত সব ধারালো ধারালো অস্ত্র। ঘুরপাক খেতে খেতে সে চাকা ওই সব অস্ত্র দিয়ে খণ্ড -বিখণ্ড, ছিন্ন-বিছিন্ন করে দেয় সত্তাকে। তবু কিন্তু প্রাণ যায় না সত্তার। আশ্চর্য্য এক আকর্ষণে ছিট্‌কে বেরুনো, শূন্যে ঠিকরে পড়া খন্ডিত সেই মাংসপিন্ডগুলো ঘুরে এসে আবার লাগে জোড়া। গঠিত হয় দেহ। সে দেহ আবার বিষাক্ত অস্ত্রাঘাতে হয় খণ্ডিত বিখণ্ডিত। রুধিরাক্ত নরকে পড়ে দেহের সেই টুকরোগুলো করে ধড়ফড়।

এদের যন্ত্রণা কাতর চিৎকার কানে শোনা যায় না। এদের নৃশংস ভয়ঙ্কর শাস্তি চোখে দেখা যায় না। সাধারণ দেহ এসব নরকের শাস্তি সহ্য করতে পারে না বলে তাদের নাকি যাতনাময়, ভোগায়তন বিশেষ এক ধরনের অতিবাহিক দেহ সৃষ্টি হয়। এ দেহ পুড়েও ছাই হয় না, কাটা যেয়েও নষ্ট হয়না, গলে গিয়েও অবলুপ্ত হয় না অর্থাৎ মরেও মরে না এ-দেহ। শুধু কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য টিকে থাকে। থাকে টিকে তার কর্মফল ভোগের অন্তকাল পর্য্যন্ত।

"—আর জন্ম-মৃত্যু ?" বলে উঠল সতী,— অর্থাৎ যাকে সত্তার ভূলোকে আগমন ও পরলোকে প্রত্যাবর্তন বলে ? এটা কিন্তু নিয়তি নির্দ্দিষ্ট ও বিধি নির্ধারিত হলেও সত্তার কতকটা ইচ্ছাধীনও বটে।

বুঝিয়ে ভূতনাথকে বলতে লাগল সতী যে মানুষ হল বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। উচ্চ কোটির জীব। ঈশ্বর তার এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে তার যাবতীয় গুণ অর্থাৎ বোধ-বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনা দিয়েই ক্ষান্ত হননি। হন নি তিনি তৃপ্ত তাকে শক্তি মেধা ইত্যাদি নানা অলঙ্কারে ভূষিত করেও। স্নেহের বশে তিনি তার এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে নানাভাবে মহীয়ান, গরীয়ান করবার জন্যও জগৎ-সংসারে তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ও উচ্চকোটির প্রাণী হিসাবে প্রতিপন্ন করার জন্য দিয়েছেন তাকে স্বাধীনতা অর্থাৎ স্ব-ইচ্ছায় চলবার ক্ষমতা। এ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে ভগবান কখনও তার দানের অমর্য্যাদা করেন না। ঈশ্বর প্রদত্ত এই স্বাধীনতার বলে মানুষ ইচ্ছা করলে খোদার উপর খোদকারী করতে পারে। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট জীবৎকাল শেষ হবার আগে ইচ্ছা করলে সে নিজেকে বিনাশ করতে পারে। তাই এই মর-জগতে দুর্ব্বল মন যাদের অর্থাৎ যারা জীবনের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করে, জ্বালা-যন্ত্রণাকে সহ্য করে চলতে পারে না সেইসব ক্ষীন-সত্তা, হীন মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের জীবৎকাল শেষ না হবার আগেই ইচ্ছা করলে আত্মহত্যা করে নিজেকে নাশ করতে পারে। তেমনি সূক্ষ্ম জগতের নীচ-দুর্ব্বল হীন-আত্মারা এরাও সেই ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতার বলে কৃতকর্মের ফল ভোগ অর্থাৎ সূক্ষ্মস্তরে নির্দ্দিষ্ট অবস্থানা তথা দুর্ভোগের কাল শেষ না করেই বিধি-নির্ধারিত ভাবে জন্ম-গ্রহণের আগেই জন্ম নিতে পারে। পারে নিতে জন্ম সেই নরক ভোগ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে জগতে কোন মায়ের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে গর্ভে তার প্রবেশ করে। সূক্ষ্ম জগতে এটাও তার আত্মহত্যারই নামান্তর। ইহ-পর যে লোকেই হোক ভোগ করলেই যে পাপ কাটে—আত্মার মুক্তি হয় জানে না এরা। ভগবানের দেওয়া স্বাধীনতার এভাবে অপব্যবহার করে মহাপাপ করে তারা। জন্ম-জন্মান্তর অসমাপ্ত কর্মফল সঞ্চিত হতে হতে অর্থাৎ প্রারব্ধ সঞ্চিত ক্রিয়মান কর্মফল জমা হতে হতে

তাদের সত্তাকে করে ভারী। তাই ভোগ তাদের ক্রমশ বেড়েই চলে। এই ভোগের ফলে অর্থাৎ কর্ম-বন্ধনের চক্রে পড়ে তারা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে বার বার। এর ফলে তাদের আত্মার মুক্তি পেতে লেগে যায় অনেক দেরী।

অবশ্য একেবারে নিষ্পাপ মানুষ থাকতে পারে না। একেবারে খাঁটি সোনায় যেমন গহনা হয় না, গড়তে গেলে কিছু তার মধ্যে যেমন খাদ মেশাতে হয়-মানুষের ব্যাপারেও ঠিক তেমনি। অর্থাৎ ভাল-মন্দ উভয় নিয়েই মানুষ। পুরোপুরি পাপী বা ষোলআনা পুণ্যবান মানুষ বোধ হয় হতেই পারে না। সু-কু সৎ-অসৎ গুণ কিছু না কিছু তারমধ্যে থাকবেই। অবশ্য গুণ-মাত্রার কিছু কম বেশী বা হেরফের হতে পারে। কারো মধ্যে থাকতে পারে হয়ত সুগুণের মাত্রা বেশী বদগুণের মাত্রা কম। কারোর মধ্যে পারে থাকতে হয়ত পাপের মাত্রা একটু বেশী—পুণ্যের মাত্রা কিছু কম। কম বেশী মাত্রার এই তারতম্যের ফলেই হয় তার স্বভাব। এই স্বভাবের বশেই মানুষ এগিয়ে চলে জীবনে। ভোগ করে সুখ-দুঃখ। পরলোকে গিয়ে স্বর্গ-নরকেও চলে তাদের এই পুণ্য-পাপের ফল ভোগ। তবে ভোগের মাঝে কখনও কেমনও হয় তাদের ক্ষণিক বিরতি, পড়ে সামান্য ছেদ। যখন পড়ে মনে তাদের তারা তো সোনা, স্মরণে আসে যখন সৎ চিন্তা, উদয় হয় যখন মনে তাদের ভগবানের নাম বা জীবনের কোন শুভকর্ম, পরহিতব্রত বা জগন্মঙ্গল সংকল্প তখন ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয় তাদের উপর পড়া কাল-দন্ড। মুহূর্তের জন্য হয় বন্ধ তার নরক ভোগ। সেই সৎ চিন্তনের ফলে যম-দন্ডের এই বিরতির মূহূর্তে কোন আত্মা ছিটকে বেরিয়ে আসে নরক গহ্বর থেকে। জীবনে ঈশ্বর স্মরণ-মনন বা শ্রবন-কীর্ত্তন অভ্যাস থাকলে সেই মুহূর্তে সে ভাসতে থাকে ইহলোক-পরলোকের মধ্য স্তরে। পাপের আকর্ষণ তথা কাল-দন্ডের টান পুনরায় তাকে নরক গহ্বরে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলার আগে সুযোগ পেলে কেও হয়ত ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন মায়ের গর্ভে। কাম-কাতর মায়ের দুর্ব্বল মুহূর্তের সুযোগে সে তখন তার বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিতের কোন ধার ধারে না। তার ভূত-ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষারও তোয়াক্কা করে না সে তখন। একমাত্র চিন্তা থাকে তখন তার যে কোন ভাবে যম-দণ্ডের হাত থেকে আত্মরক্ষা, নরক-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি। ক্ষণিকই হোক বা দীর্ঘই হোক মায়ের গর্ভই হচ্ছে তখন তার একমাত্র আশ্রয়স্থল, একমাত্র আত্মরক্ষার বলয়। নরকভোগী এসব আত্মারা ভালভাবেই জানে যে মায়ের গর্ভে থাকলে যম-দন্ড স্পর্শ করতে পারে না। নরকের আকর্ষণ ব্যর্থ হয়ে যায়। এমন কি মহাদেবের ত্রিশূলও সত্তার মাতৃ-গর্ভের এই রক্ষাবলয় ভেদ করতে পারেনা। পারে না তাকে স্পর্শ করতে।

বলতে বলতে সুন্দর একটা উপাখ্যান শোনাল সতী। শিব নাকি পার্ব্বতীকে একবার অমরনাথ গুহায় দিচ্ছিলেন উপদেশ। উপদেশ ন., বলছিলেন সতীকে নাকি তিনি মহাগুহ্য গোপন কথামৃত। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন নিরালা নির্জন অন্ধকারময় এই গুহাভ্যন্তর। কিন্তু হায়, সেই গুহার মধ্যে ছিল এক শুকপাখি। পাখি কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে শিব-পার্ব্বতীর সেই মহা তত্ত্ব শোনবার জন্য রইল সেই গুহা-কোটরে নিশ্চুপ হয়ে বসে। হর-পার্ব্বতী বিন্দুমাত্র টের পেল না তার উপস্থিতির। যাই হোক— আরম্ভ হল অমৃত কথা। শিবের আদেশে শুনতে শুনতে "হুঁ" দিয়ে চলল সতী। কিন্তু আস্তে আস্তে তিনি পড়লেন ঘুমিয়ে। "হুঁ" দেওয়া হয়ে গেল তার বন্ধ। মহা মুস্কিল। "হুঁ"-এর ধারা চালিয়ে না গেলে তো বন্ধ হয়ে যাবে মহাদেবের মহা-কথা। তাই শুক পক্ষী করল কি—পার্ব্বতীর অনুকরণে স্বরটাকে তাঁর নকল করে চালিয়ে যেতে লাগল সে তাঁর "হুঁ" দেওয়াটা। অমৃতত্ত্বের কথা শেষ করে পার্ব্বতীকে যখন জিজ্ঞেস করতে গেলেন তিনি তখন বুঝলেন শিব, সতী ঘুমন্ত। এতক্ষণ শুধু ভষ্মে ঘি ঢেলে এসেছেন তিনি। পার্ব্বতী শুনেনি তার কথা। কিন্তু পার্ব্বতীর মত এতক্ষণ "হুঁ" দিয়ে এল কে? কার এত বড় স্পর্ধা যে শিবকে ঠকায়? তাকে ভুলিয়ে তার অমৃত ধারা গোপনে পান করল কোন বেয়াদব? চাইলেন মহাদেব রুদ্র দৃষ্টিতে। ওমনি শুক ফুড়ুৎ করে গুহা থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেল উড়ে। কিন্তু যাবে কোথায়? কারচুপি যখন ধরা পড়েছে তার তখন রক্ষা করবে কে তাকে? আদেশ করলেন মহাকাল তার আয়ুধ ত্রিশূলকে,—সংহার কর ওই শুকপক্ষীকে।

প্রাণ ভয়ে শুক উড়তে উড়তে ছুটে গেল সব দেবতার কাছে। ঘুরতে লাগল চৌদ্দভূবন। কিন্তু কেও তাকে রক্ষা করতে পারল না। এমন কি শিব রোষে সে আশ্রয় পেল না কোথাও। এধারে শিবের ত্রিশূলও ছাড়ল-না তার পিছন। মর্তে এসে শুকপক্ষী ঘুরতে লাগল ব্যাস-পত্নীর চারদিকে। হঠাৎ হাই তুলতেই তিনি, ঢুকে পড়ল

শুক তাঁর মুখে। মুখ-গহ্বর থেকে সে সোজা গিয়ে আশ্রয় নিল ব্যাস- পত্নীর গর্ভে। মাতৃ-গর্ভ স্পর্শ করতে পারল না ত্রিশূল। ব্যর্থ হয়ে তাই ফিরে এল সে। এই গর্ভ প্রবিষ্ট শুক-পক্ষীই কালে জন্ম নিয়েছিলেন শুকদেব রূপে। আর শিবমুখে সেই অমৃতত্ত্ব শ্রবন ক্ষেত্র গুহাই নাকি পরিচিত হয় কালে অমরনাথ গুহা হিসাবে। কিন্তু শুকপক্ষীর মত সব সত্তাই তো আর অমৃতত্বের জ্ঞান নিয়ে ওই রকম মুনি-পত্নীর মত উপযুক্ত মাতৃগর্ভে আশ্রয় নিতে পারে না। পারে না তেমন পরম জ্ঞানী শুকদেব রূপে জন্ম পরিগ্রহণ করতে।বিশেষ করে নরক ভোগকারী পাপাত্মারা। ক্ষণিক শুভ চিন্তায় বা জীবনের অভ্যাস-গত ঈশ্বর স্মরণ মননের ফলে মুহূর্ত্তের জন্য যম-দন্ড থেকেতারা বিরতি পায় বটে। নরক ভোগের ছেদ পড়া সেই মুহূর্ত্তে ছিটকে তারা বেরিয়ে এসে ভাসতে থাকে পৃথিবীর উপরের স্তরে। যম-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য কেও কেও তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে জন্মাবর্তে। মাতা-পিতা, স্থান পরিবেশ, অগ্র-পশ্চাৎ কোন বিবেচনা না করে যে কোন মায়ের দুর্ব্বলতার সুযোগ পেলেই তারা ঢুকে পড়ে সে মায়ের গর্ভে। মায়ের গর্ভ হল এসব আত্মাদের উপযুক্ত আশ্রয় স্থল। ক্ষণিক যন্ত্রণা মুক্তির রক্ষা কবচ। কালের ত্রিশূল তাদের এই রক্ষা বলয় ভেদ করে সহজে সে সব আত্মাকে টেনে বের করে আনতে পারে না। কিন্তু তাহলেও ভোগ তো তাদের ফুরোয় না। নরক-দন্ড পিছনে থাকে তাদের। অসমাপ্ত কর্মফল, অসম্পূর্ন ভোগ সব সময় আকর্ষণ করে তাদের। এর ফলে হয় অনেকের গর্ভপাত। গর্ভশ্রাবের ফলে জন্ম নিতে ব্যর্থ হয় আবার অনেক পাপাত্মা। অনেকে আবার অসমাপ্ত দন্ড ভোগের আকর্ষণে ভূমিষ্ঠ হয়েই করে মৃত্যুবরণ। এই যে অকাল-মৃত্যু, অপঘাত মৃত্যু, দৈব-দুর্ঘটনায় মৃত্যু এসব হল পরলোকের সেই অসমাপ্ত কর্নফল ভোগেরই নাকি টান। এসবের মাধ্যমেই অসম্পূর্ন দন্ড ভোগ নাকি তাকে আকর্ষণ করে ইহজীবন থেকে আবার নিয়ে যায় তাকে আবার সেই ছিটকে বেরিয়ে আসা নরক-কুন্ডে। টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে তাকে তার সেই ফাঁকি দিয়ে ছেড়ে আসা যন্ত্রাণা-ময় গহ্বরে। অসমাপ্ত কর্মফল সমাপ্ত করার জন্য।

এসব আত্মাদের মধ্যে জীবনে অনেকের নরক ভোগের চিহ্নও থেকে যায়। এই যে জন্মান্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ , বিকৃত দেহ ও বিকৃত মস্তিষ্ক ইত্যাদি নিয়ে অনেকেই জন্মায়—এরা হল নাকি সেই সব নরক ভোগকারী আত্মা। সূক্ষ্মজগতের দন্ড-ভোগকারী অবয়ব নিয়েই তারা জন্মগ্রহণ করেছে। আসলে, জীবনকে ফাঁকি দিয়ে অর্থাৎ আত্মহত্যা করে যারা পরলোকে যায়—মরেও তারা শান্তি পায় না। তেমনি সূক্ষ্ম জগতকে ফাঁকি দিয়ে অর্থাৎ হটকারিতা করে যারা ইহ-জগতে আসে—জন্মেও তারা সুখ পায় না। জীবনভব দুঃখ কষ্ট, অসুখ-অশান্তি, অভাব-অভিযোগ তাদের লেগেই থাকে। এগুলো হল সেই নরক ভোগেরই নামান্তর।

"—আচ্ছা সতী" শুনতে শুনতে হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠল ভূতনাথ, পাপ-পুণ্যের কাটাকাটি যায় না? জীবনে সৎ কর্মের ফল অসৎ-অধর্ম কুকর্মের ফলকে নাশ কবতে পারে না? বাদ-সাধ দিয়ে অবশিষ্টের ভোগ হতে পারে না তাদের?

"—না ভূতুদা।" বলে উঠল সতী,—"সূক্ষ্মজগতে এসব স্থুল জগতের গানিতিক হিসাব চলে না। পাপ-পুণ্যের কাটাকাটি, শুভ অশুভের বাদ-সাধ দিয়ে অবশিষ্টের হিসাব এখানে অচল। আমাদের গ্রামে বাবা ভূতনাথেব থানে যে মহাভারত পাঠ হত, শুনোনি তাতে যুধিষ্ঠিবেব কথা? তাঁর সেই স্বর্গারোহনের উপাখ্যান? পাপ পুণ্যে-কাটাকাটি গেলে তাকে তো আর নরক দর্শন করতে হত না। সূক্ষ্ম জগতে পাপ-পুণ্য শুভ-অশুভ কর্মাকর্মের ফল এখানে পৃথক পৃথক স্থানে আলাদা আলাদা ভাবে ভোগ করতে হয় ভূতুদা। পাপের জন্য নরক ভোগ ও পুণ্যের জন্য স্বর্গভোগ হয় এখানে। তবে সাধারণতজীবাত্মার উৎক্রমন, সত্তার উৎকর্ষের জন্যই প্রথমে এখানে পাপেব ফল পবে পুণ্যের ফল হয় ভোগ। এতে জীবাত্মার হয় কল্যাণ সাধন, সত্তার হয় ভাবী মঙ্গল।

"— কি রকম?" প্রশ্ন করে উঠল ভূতনাথ।

উত্তরে সতী বলতে লাগল তাকে আর এক তত্ত্বকথা। জগৎ-জীবনে দুঃখের পর সুখ ভোগ মানুষের পক্ষে যেমন মঙ্গল জনক বা কল্যাণ-কারী হয়। সুখের পর দুঃখ ভোগ তেমনি হয় পীড়াদায়ক। হয় অত্যন্ত মর্ম্মপীড়ক। এত মানুষের মনের ভারসাম্য অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে এ মর্ম্ম-যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। আত্মহত্যা করে। পরলোকেও তেমনি-সত্তার পুণ্যফল ভোগের পর পাপ ভোগ হয় অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণাদায়ক। স্বর্গের পর নরক ভোগ করে সত্তা যদি জীবনে আসে তবে সদ্য নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে আসা অভিজ্ঞতা

অবচেতন মনে থেকে তার সমস্ত স্বভাবটাকেই বিকৃত করে দেয়। সূক্ষ্ম-জগতের জ্বালা-যন্ত্রণার ছাপ মানসিক গঠনটাকেই তার করে দেয় কদাকার। এক খিটখিটে বদ মেজাজী, ক্রোধী-নিষ্ঠুর-অত্যাচারী মানুষ হয় সে। হয় পাপী, পরানিষ্ঠকারী, ঈর্ষা-হিংসা পরায়ণ এক স্বার্থপর, আত্মলোলুপ নরপশু। জীবনের উদ্দেশ্য যে আত্মার উৎক্রমন, সত্তার শুদ্ধ নির্ম্মল পবিত্র পরম সত্তার দিকে গতিবান হওয়া—তা ভুলে যায় সে। জ্ঞান ও বোধের পথ থেকে অনেক দূরে সরে থাকে সে। কিন্তু নরকের পর স্বর্গভোগ করে সত্তা যদি নেমে আসে জীবনে তবে সদ্য ভোগ করা স্বর্গ-সুষমা রয়ে যায় তার দেহে-মনে প্রাণে। হয় সে সৎ-চরিত্রের অধিকারী। স্বভাবে আসে তার প্রেম-প্রীতি স্নেহ ভালবাসা। উন্নত-মনা মানুষ হয় সে। হয় সু-মনোভাব সম্পন্ন পরকল্যাণকামী, জগৎকল্যাণ ব্রতী ব্যক্তি। এক কথায় জীবনকে মাধুর্য্য-মন্ডিতকরার চেষ্টা করে সে। এর ফলেই হয় তার ইহজীবনের কর্ম্মের মাধ্যমে সত্তার উৎক্রমন, আত্মার উদ্ধার।

"—আচ্ছা সতী" কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ,—এই যে কর্ম্ম-বন্ধন যার ফলে স্বর্গ-নরক ভোগ, ইহ-পরলোকে যাতায়াত অর্থাৎ সত্তারএই যে জন্ম-মৃত্যুর ধারা—এর কি কখনও শেষ নেই?

কথাটা সতীর মনে কি ভাবে স্পর্শ করল কে জানে। তবে ভাব দেখে তার মনে হল যেন তার ভূতুদার এ প্রশ্নে সত্যিই সন্তুষ্ট হল সে। মুখে সন্তুষ্টির হাসি ফুটিয়ে তাই বলে উঠল সে,—সব শুরুরই সারা আছে ভূতুদা। আছে আরম্ভের শেষ। জন্ম-মৃত্যুর ধারায় যখন নেমেছে আত্মা তখন এ ধারার শেষে উঠবেই সে একদিন তার স্বস্থানে। পরিসমাপ্তি হবে তার কর্ম্মবন্ধনের। ইতি হবে ইহ-লোক পরলোক গমনাগমনের অর্থাৎ সত্তাকে আর জীবাবর্ত্তে ঘুরপাক খেতে হবে না।

আসলে নাকি এই যে জন্ম-মৃত্যু, কর্ম-জীবন, সুখ-দুঃখ এসবের কোন অস্তিত্বই নেই। সব মায়ার খেলা। পরমাত্মার বুকে জীব রূপে তার ছায়ার খেলা। আকাশের বুকে ভেসে বেড়ায় যেমন মেঘ নানা রূপ রঙ, আকার নিয়ে—তেমনি ভেসে বেড়াচ্ছি আমরা জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ ইহকাল পরকাল সমস্ত কিছু নিয়ে। আসলে সবাই আমরা এক। এসেছি সেই এক অনাদি অনন্ত, অক্ষয়-অব্যয় পরম সত্তা থেকে। জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে বার বার রূপ পরিগ্রহ করে কর্মচক্রের আবর্তনে আবর্তিত হতে এগিয়ে চলেছি আমরা সেই শাশ্বত পরম সত্তার দিকেই। উৎসে মিলিত হতে। পরমেশ্বরের অংশ আমরা। সুতরাং অংশকে একদিন সেই পরমেশ্বরের পূর্ণসত্তায় মিলিত হতে হবেই। অর্থাৎ "জন্মিলে মরিতে হবে" ঠিকই কিন্তু তখন আর মরলে জন্ম নিতে হবে না। সত্তাকে জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্মধারার স্রোতে আর ভেসে বেড়াতে হবে না। তার জীবাবর্তের হবে পরিসমাপ্তি। জগৎ গমনশীল। তাই জগতে জীবনের অর্থই হচ্ছে চলা। চলার পথে আসক্তিই হচ্ছে নাকি আমাদের বন্ধনের কারণ। জীবনের সুখ-দুঃখকে বড় করে দেখছি আমরা এই বন্ধনের জন্যই। প্রকৃতপক্ষে দেখতে গেলে এগুলো হল সব সাময়িক, আপেক্ষিক। কায়ার উপর ভেসে আসা ছায়ার মত। আত্মার উপর মায়া-মেঘ। মেঘের মতই আকাশের গায়ে ভেসে আসে আবার ভেসে চলে যায়। ভোগবাদীরাই এদের ফাঁদে পড়ে, হাবুডুবু খায়। আধ্যাত্মবাদীরা এসব জৈবিক প্রবৃত্তির বশে পড়েন না। বস্তুবাদীরা অজ্ঞান। তাই এসব কামনা-বাসনার তাড়নায় জন্ম-জন্মান্তর ঘুরপাক খায়। কিন্তু আত্মজ্ঞানীরা এসবের উর্দ্ধে থাকেন। ভাসতে ভাসতে সুখ-দুঃখ যাই আসুক না কেন জীবনে গ্রাহ্য করেন না। ভোগ করেন সব নির্বিকার চিত্তে, নিষ্কাম হৃদয়ে।

—এদের আর জন্ম হয় না? জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ।

"—সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় মুস্কিল ভূতুদা।" বলে উঠল সতী। আসল কথা হল নাকি সত্তায় কামনার বীজ অর্থাৎ আসক্তির অঙ্কুর থাকলে তা সু বা কু যাই হোক না কেন জীবনাবর্তে সে টেনে নামাবেই। তবে এ ব্যাপারে একটু রকমফের আছে। শুদ্ধাত্মারা নাকি প্রেতাত্মাদের মত হুড়োচাপা করে জন্ম নেয় না বা বিধি-নিয়মের ধারায় পড়ে দেহ ধারণ করে না। জন্ম এদের ইচ্ছাধীন। শিমূল তূলার মত সম্ভাবনার বীজ নিয়ে এরা ভেসে বেড়ান মহাকাশে। পবিত্রমনা পিতা-মাতার আধার এদের অনেক সময় আকর্ষণ করে জন্ম নেওয়ায়। অনেকেই আবার জীব-কল্যাণ বা জগন্মঙ্গল মানসে পূত-পবিত্র গর্ভে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এরাই হন নাকি অবতারকল্প পুরুষ—শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি দেহধারী ভগবান।

সতীর মুখে জন্ম-মৃত্যুর তত্ত্বকথা শুনতে শুনতে যেন তন্ময় হয়ে গেছল ভূতনাথ। হঠাৎ একটা আলোর

ঝিলিক চোখে পড়তেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। দেখল অদূরে একটা ঝোপ-ঝাড় ভরা গ্রামের মধ্য থেকে ঠিকরে উঠছে আলোটা। মনে হল ভূতনাথের আলোটা যেন সাধারণ আলো নয়। নয় ওটা নিছক একটা আভা। রঙটা তার ফিকে সোনালী। আভাটা যেন একটা দিব্য-জ্যোতির ছটা। ব্যাপার কি?

জিজ্ঞেস করতেই ভূতনাথ উত্তর দিল সতী যে অদূরের ওই গাছ-গাছালি ভরা গ্রামটার নাম হল নাকি গোবর ডাঙ্গা। জ্যোতিটা আসছে ওই গোবরডাঙ্গা গ্রামেরই একটা ঘরের খিড়কি পাশ থেকে। সে পাশে আছে একটা আম গাছ। সেই আম গাছ থেকেই নাকি ঠিকরে পড়ছে আলোটা। কিন্তু তা তো হল—আলোটা কিসের? কিসের যে আলোটা তা ভূতনাথ নাকি আলোটার দিকে মনঃসংযোগ করলেই জানতে পারবে। কারণ সূক্ষ্মসত্তায় আছে এখন সে। তাই সূক্ষ্মশক্তির সে এখন অধিকারী। এই অধিকারে সূক্ষ্ম-দৃষ্টির ক্ষমতা বলে অবলোকন করতে পারবে সে ওই আলোক বিন্দুর স্বরূপ এবং এ অবস্থায় সে তার মানসিকশক্তি প্রয়োগ করলেই উদঘাটন করতে পারবে ও জ্যোতির রহস্য।

সতীর কথায় তাই করল ভূতনাথ। কৌতূহলী মনটাকে সে নিয়োগ করল ওই ফিকে সোনালী উজ্জ্বল আভাটার পিছনে। দেখল সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সোনালী আভাটা এসে পড়ছে গোবর-ডাঙ্গা গ্রামের মাঝে একটা বাড়ীর উপর। বাড়ীর বেড়-প্রাচীর দেওাল ভেদ করে জ্যোতিটা যেন উপরের ছাদ ফুঁড়ে ঠিকরে এসে পড়ছে একটা ঘরের মেঝেতে। সে মেঝের উপর তক্তাপোশে শুয়ে আছেন এক দম্পতি। একই বিছানায়। ঘুমন্ত অবস্থায়। চোখে মুখে তাদের বিমল বিভা। চেহারাতে তাদের একটা শুদ্ধ সত্ত্বভাব যেন ফুটে বেরুচ্ছে। জ্যোতিটা এসে পড়ছে ঘুমন্ত এই দম্পতি যুগলের উপরই।

দেখতেই কিন্তু অবাক হল ভূতনাথ! হল অবাক এই ভেবে যে—চিন্তা মাত্রই আলোটার শেষ প্রান্তে সে এসে হাজির হল—না আলোটাই তার শেষ প্রান্তের দর্শনীয় বস্তু নিয়ে তার কাছে এসে উপস্থিত হল! কিচ্ছু বুঝতে পারল না সে। না পারুক-কিন্তু এসব দেখা যে তার পক্ষে মস্ত বড় একটা লজ্জার ব্যাপার। ছিঃ ছিঃ! স্বামী-স্ত্রীর গোপন কক্ষে এভাবে তাদের শয্যার পাশে লুকিয়ে এসে দাঁড়ানো মোটেই উচিত হয়নি তার। ইতঃস্তত করতেই ভূতনাথ দেখল সে একা নয়। সেই ঘুমন্ত দম্পতির শয্যার চারপাশে রয়েছে আরো নানা মূর্তি। রঙ্‌ঢঙ্ আকার প্রকৃতি দেখেই তাদের বুঝতে পারল ভূতনাথ সূক্ষ্ম-জগতের নানা স্তরের বাসিন্দা এরা। ভূত-প্রেত নীচাত্মা এমন কি দু-একটা অপেক্ষা কৃত উচ্চাত্মাও রয়েছে তাদের দলে। হুমড়ি খেয়ে যেন সবাই এক যোগে পড়তে চাইছে ঘুমন্ত ওই নারী-পুরুষের উপর।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল ঘুমন্ত দম্পতি যুগলের উপর পড়া সোনালী ওই আভাটা। ঘুরতে লাগল সেটা শায়িত সেই স্বামী-স্ত্রীর শয্যার চারপাশটাতে। ঘূরণ চরকির মত। কি আশ্চর্য্য অলৌকিক শক্তি ছিল সেই আভাটার মধ্যে কে জানে। স্পর্শে তার দূরে যেন ছিট্‌কে পড়তে লাগল দু-একটা প্রেতাত্মা। ছোঁয়া লেগে তার দু-একটা ভৌতিক দেহ যেন বিদ্যুৎ-পৃষ্টের মত আছড়ে পড়তে লাগল একদিকে। ভয়ে কারো মুখ হতে লাগল পান্ডুর। কারোর আবার ধূসর-ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগল চেহারাগুলো সেই অদ্ভূত আলোটার আতঙ্কে। তারপর এমন হল অবস্থা—আভাটার সেই আন্দোলনের চোটে আস্তে আস্তে শয্যার পাশে দন্ডায়মান সব প্রেতাত্মাগুলো হয়ে গেল অদৃশ্য। হাওয়ায় যেন মিলিয়ে গেল তারা! বিস্ময়ে ভূতনাথ হতবাক হয়ে রইল সেখানে দাঁড়িয়ে।

দাঁড়িয়ে রইল যে কতক্ষণ কে জানে। হঠাৎ সতীর কথায় ভাঙ্গল যেন তার চমক,-কি ভূতুদা? দেখছো কি?

আশ্চর্য্য! তাহলে সে শুধু নয় তার সঙ্গে এসেছে এখানে সতীও! কিন্তু এল তারা কি করে! অর্গল- বন্ধ ঘুমন্ত স্বামী-স্ত্রীর এই অন্দর মহলে প্রবেশ করল তারা কি ভাবে! কোন ইন্দ্রজালিক শক্তিতে এ বাড়ীর প্রাচীর, এ ঘরের দেওয়াল ভেদ করে ঢুকল তারা? আলাদিনের কোন আশ্চর্য্য প্রদীপ অদৃশ্যে থেকে এমনভাবে ঘুমন্ত এই স্বামী-স্ত্রীর শয্যার পাশে এনে হাজির করল তাদের? কে এই দম্পতি?

তার জিজ্ঞাসাটা যেন ত্বরিতে টেনে নিল সতী। ভাবতেই প্রশ্নটা তাই ওমনি উত্তর দিল সে, —এ দম্পতি কিন্তু তোমার আগের দেখা দম্পতি যুগলের মত সাধারণ স্বামী-স্ত্রী নয় ভূতুদা। শুদ্ধ চেতা, পবিত্র হৃদয় সম্পন্ন

এরা। পুরুষটি হলেন এই গোবরডাঙ্গা গ্রামেরই গোরাচাঁদ চক্রবর্তী। অত্যন্ত সরল প্রাণ, উদার ও উন্নত-মনা ব্যক্তি। পাশে শায়িত তার ধর্ম্ম-পত্নী শ্রীমতি কমলা দেবীও তেমনি। ধর্মপ্রাণা, সেবা পরায়ণা পুণ্যবতী ও পরদরদী মহিলা। লক্ষ্মী স্বরূপা তিনি।

প্রসঙ্গক্রমে সতীর মুখে ভেসে এল পরলোকের আর এক রহস্য কথা। ভুবর্লোকের উপরতলায় অর্থাৎ ভাসমান স্তরে যে সব আত্মা বিচরণ করে তারা নাকি মানুষের অন্তর প্রকৃতির টানে আকর্ষিত হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে নাকি বলতে হয় ভাসমান বিচরণশীল নানা প্রকৃতির আত্মা সম-প্রকৃতির মানুষের সংগুপ্ত ইচ্ছা বা কামনা-বাসনার টানে তাদের পাশে এসে জড়ো হয়। আগেকার দেখা কামুক প্রকৃতির দম্পতি যুগলের শয্যার পাশে তাই নাকি ছিল সব কামুক প্রকৃতির আত্মা। উদ্দেশ্য ছিল তাদের নাকি ঘুমন্ত দম্পতির মনে হঠাৎ কামভাব জাগিয়ে দিয়ে ভিতরে তাদের প্রবেশ করে তাদের কাম-ইচ্ছা পূরণ করা। কারো ইচ্ছা ছিল তাদের সংগুপ্ত ইন্দ্রিয় ভোগ-লালসার পথে সত্তাটাকে তাদের আকর্ষণ করে স্বপ্নের মাধ্যমে তাদের দেহ-সুখ ভোগটাকে চরিতার্থ করা। বিদেহী হলেও এসব নীচ আত্মারা নাকি মনে তাদের দেহের ক্ষুধা নিয়ে এই মানসিক স্তরে ঘুরে বড়োয়। স্থূলদেহ অপেক্ষা সূক্ষ্মদেহের ভোগ লালসা অত্যন্ত প্রাবল। সেই প্রবল্যে পড়ে ছট্‌ফট্ করে তারা। কিন্তু স্থূল দেহের ক্ষুধা দেহহীন সত্তার তো মেটানো সম্ভব নয়। তাই নাকি ওভাবে তারা ওখানে পরদেহ অর্থাৎ দম্পত্তি যুগলের ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ লোভাতুর দেহদুটোকে আশ্রয় করে দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর জন্য ঘুর ঘুর করছিল।

কিন্তু এখানের অর্থাৎ গোরাচাঁদ বাবু ও কমলা দেবীর শয্যার পাশে আসা আত্মাগুলোর ধান্দা অন্য রকম। জন্ম নিতে চায় তারা। অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে মানব দেহে এসে আবার পার্থিব ভোগ-সুখে লট্‌পট্ করতে চায়। তাই ঋতুমতী কমলার ও সন্নিপাত মুখী গোরাচাঁদ বাবুর শয্যায় পাশে এসে ভিড় জমিয়েছে তারা। নিঃসন্তান গোরাচাঁদ দম্পর্তি। তাই মনে তাদের জনক-জননী হওয়ার সাধ, প্রাণে তাদের সন্তান লাভের বাসনা।

তাদের প্রাণ-মনের সম কামনা-বাসনার আকর্ষণেই আকর্ষিত হয়েছে এখানে নাকি ওইসব সূক্ষ্ম-সত্তাগুলো। এদের মধ্যে নিম্নস্তরের সত্তা শুধু নয়, আছে উর্ধ্বস্তরেরও নানা উচ্চাত্মাও। আসল কথা হল নাকি— গর্ভাধানকালীন এই সময়টার মানব-মানবীর মধ্যে অদ্ভুতএক ধরনের চুম্বক শক্তির আবির্ভাব হয়। উদ্ভুত এই শক্তির ক্ষমতা কিন্তু অদ্ভুত। ভূ-লোকের উর্ধ্বে উচ্চ-নীচ সব স্তরেরই আত্মাদের নাকি এ শক্তি আকর্ষণ করতে পারে। পূতঃমনা, পবিত্র-চেতাদের এ সময়কার আন্তরিক আকর্ষণ কখনও কেমনও পরলোকের তৃতীয়-চতুর্থ স্তরের উর্ধ্বেও নাকি উঠতে পারে। পারে এ শক্তি কচিৎ কখনও এসময় জীব-কল্যাণ ও জগন্মঙ্গলমুখী অনেক দিব্যাত্মাকেও আকর্ষণ করতে। মেষপালকের ঘরে যীশুখৃষ্টের, যবনের ঘরে হরিদাসের, জোলার ঘরে ভক্ত কবীরের এই ভাবেই হয় নাকি আবির্ভাব।

তবে এর মধ্যেও একটু নাকি কিন্তু আছে। কারণ ওভাবে আকর্ষিত হলেও তাঁরা ঋতুমতী মাতার সন্নিপাত মুখী পিতার তৎকালীন মন-প্রাণ হৃদয়ে সমভাব—এক কথায় তাদের অন্তর প্রকৃতি ও স্বভাবের গতির সঙ্গে গর্ব্ধবের যথাযথ মিলন না হলে নাকি জন্ম নিতে পারেন না। অর্থাৎ তাঁদের গর্ভে অবক্রান্তি নাকি ঘটে না। কিন্তু যারা নীচ আত্মা অর্থাৎ পার্থিব কামনা-বাসনা ও ভোগ-লালসায় ব্যাকুল যেসব সত্তা জাগতিক সুখ মোহে অন্ধ হয়ে যারা অস্থির হয়ে বেড়ায় এই সূক্ষ্মস্তরে, সুযোগ পেলে যারা জাগতিক কারো দেহে প্রবেশ করে তার ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করবার চেষ্টা করে সেই সব নীচ সত্তা অর্থাৎ ভূত-প্রেতরা মাতা পিতার মনের এসব গতি-প্রকৃতি বিচার করে না। করে না বিচার মিলনোন্মুখ দম্পতির স্বভাব চরিত্র। সেই সব সত্তারা যারা নরক-যন্ত্রণার ছেদে ছিটকে বেরিয়ে আসে নরক গহ্বর থেকে। তারা যে কোন নারী-পুরুষকে যে কোন অবস্থায় দেখলেই জন্ম নেবার উদ্দেশ্যে তাদের গর্ভ ঔরসে ঢুকবার জন্য ছটফট্ করে। এরা হল জগতের বেপরোয়া, বেমক্কা, দুর্ম্মুখ মানুষের মত। কোন নিয়ম-কানুন মানে না। তোয়াক্কা করে না কোন রীতি-নীতির যে কোন প্রকারে জন্ম নেবার জন্য এরা পাগল হয়ে থাকে। হলেও পাগল, মাতা-পিতার গর্ভ-ঔরসে ঢুকবার জন্য করলেও ছটফট তাদের মন-প্রকৃতির সঙ্গে মাতা-পিতার তৎকালীন স্বভাবের গতি এক না হলে তো তারা স্থান পায় না। হয় না সমর্থ জন্ম নিতে। বিরুদ্ধ অন্তর শক্তির ঝটকা লেগে বিচ্যুত হয় তারা।

"—তবেই বুঝ ভূতুদা," বলতে বলতে মুচকি হাসিতে যেন ছুঁড়ে দিল সতী টোট্‌কা একটা উপদেশ,—সৎ সন্তানের জনক জননী হতে গেলে পিতা-মাতাকে কেমন সৎ-শুদ্ধ পূত-পবিত্র হৃদয়সম্পন্ন হতে হয়। বীজক্ষেত্র ভাল না হলে ভাল ফল কি পাওয়া যায়?

অর্থাৎ সতীর কথার মর্ম্ম হল বংশে সৎপুত্রের জন্মদান করা পিতা-মাতার সাধন সাপেক্ষ ব্যাপার। সাধন-সাধিকার মত পূত-পবিত্রভাবে জীবন যাপন না করলে নাকি গর্ভে-ঔরসে তাদের সৎ-সত্তার আবির্ভাব হয় না। আসল হল মন—শুদ্ধ সত্ত্ব মন, পবিত্র হৃদয়। বসুদেব-দেবকীর নির্মল চরিত্রের আকর্ষণেই শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন গর্ভে। মদালসার কোলে এসেছিলেন অলর্ক তাঁর ধর্ম্মপ্রাণ হৃদয়ের টানে। ওইরূপ হৃদয়েরই অধিকারী নাকি এই গোরাচাঁদ দম্পতি। পবিত্র মন তাদের। শুদ্ধ অন্তঃকরণ। তাছাড়া যাপন করছে তারা ধর্ম্ম-সঙ্গতভাবে সংসার জীবন। এই জীবনে গর্ভাধানের সময়ে তাদের উক্ত চুম্বক শক্তির আকর্ষণে আকর্ষিত হয়েও কিন্তু তাই গর্ভ-ঔরসে প্রবেশ করতে পারছে না ওই অসৎ-প্রকৃতির হীন-মনোবৃত্তির নীচ-আত্মাগুলো। তাদের পবিত্রোজ্জ্বল অন্তঃকরণের বিমল প্রভায় পারছে না তাদের পাশ ঠেসতে। ভাব-পরিপন্থী বিরুদ্ধ প্রকৃতির ঝট্‌কা লেগে তারা ছিট্‌কে পড়ছে একদিকে। দম্পতি যুগলের শুদ্ধ মনোভাবের সঙ্গে তারা খাপ খাওয়াতে পারছে না বলেই হয়ে যাচ্ছে অদৃশ্য। সৎ আধারের সামনে ওসব ভৌতিক দেহ বা প্রেত অবয়ব পারে না বেশীক্ষণ টিকে থাকতে। পবিত্র সত্তার হাওয়ায় তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার সামর্থ বা যোগ্যতা নেই বলেই নাকি ওমনি মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে তারা—শূন্যে হচ্ছে লীন।

"—কিন্তু আমার দেখে তো তা মনে হচ্ছে না সতী।" ভেসে উঠল ভূতনাথের মুখে প্রতিবাদের স্বর, "—মনে হচ্ছে আমার ওই আশ্চর্য্য আলোটার স্পর্শ লেগেই ওমনি ছিট্‌কে পড়ছে-ওইসব প্রেত-ভৌতিক অবয়বগুলোর। ওই অদ্ভুত রশ্মিটার ভয়েই তাদের ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে চেহারাগুলো এবং তার ফলেই তারা হয়ে যাচ্ছে অদৃশ্য।"

"—তাই তো হয় ভূতুদা।" বলে উঠল সতী,—শুদ্ধ যাদের অন্তঃকরণ, পবিত্র যাদের ইচ্ছা অন্তরীক্ষে থেকে সদাত্মারা তাদের এমনিভাবেই সাহায্য করেন। পুণ্যাত্মাদের এসব পরোক্ষকৃপা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না।

"—সদাত্মা! পুণ্যাত্মা! এসব কি বলছিস সতী? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।" বলে উঠল ভূতনাথ।

"—ও আলোটা সাধারণ আলো নয় ভূতুদা'। নিশ্চয়ই কোন পুণ্যাত্মার দিব্য-দেহচ্ছটা।" বলেই সতী-পড়ন্ত ওই আলোক-রশ্মিটার দিকে ফেলল তার এক অদ্ভুত কৌতূহলী দৃষ্টি। ক্ষণিক তাকিয়েই বলে উঠল সে, "—হ্যাঁ ভূতুদা, সত্যিই তাই। দেখে মনে হচ্ছে যা এই ভুবর্লোকেরই তিনি একজন সূক্ষ্মদেহী উচ্চাত্মা, অতীত জীবনে এই গোরাচাঁদ বাবুরই পূর্ব-পুরুষদের পরিবারের একজন ছিলেন তিনি। মৃত্যুর পরেও সূক্ষ্মদেহে তাই তিনি রয়ে গেছেন সেই টানে এই পরিবারেরই হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে। গোরাচাঁদ বাবু ও কমলাদেবীর মঙ্গল চান তিনি। চান তিনি এ বংশের কল্যাণ, ভাবী উন্নতি। তাই সদা-সর্ব্বদা দৃষ্টি রেখেছেন তিনি এই পরিবারটার উপর এবং ওই দম্পতি যুগলের প্রতি। ব্রহ্মার সৃষ্টি-ধর্ম রক্ষার কাল চলছে এখন গোরাচাঁদ বাবু ও কমলাদেবীর উপর। বংশে তাদের সদাত্মার জন্ম হোক, কোলে তাদের দিব্যসত্তার হোক আবির্ভাব তাই তিনি তার ওই পুণ্য দেহচ্ছটার মাধ্যমে তাড়িয়ে দিচ্ছেন তাদের গর্ভে-ঔরসে আশ্রয় নিতে আসা ওই সব নীচসত্তা ও অসদাত্মাদের। মা যেমন জেগে থেকে তার ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ের উপর উড়ে-পড়ে বসতে আসা মশা-মাছিগুলোকে হাত নেড়ে তাড়িয়ে দেন-তেমনি।

"—ওই সৎ-সত্তা পুন্যাত্মার দর্শন পাব না কি আমি? জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

জোর দিয়ে বলে উঠল সতী,—কেন পাবে না? স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্মের শক্তি যেমন তীব্র তেমনি প্রখর। সূক্ষ্ম অবস্থায় আছ যখন তুমি তখন এখন তোমার কোন মানসিক ইচ্ছাকে কোন স্থূল সত্তা বা বস্তু বাধা দিতে পারবে না। সুতরাং ওই আলোটার দিকে মানসিক ইচ্ছাটাকে তোমার প্রেরণ করাও। একাগ্র করে মনটাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওদিকে তাকাও। তাহলেই সব দেখতে পাবে তুমি।

সত্যিই অবাক কান্ড! আশ্চর্য্য ব্যাপার! অনুসন্ধিৎসাটা ভূতনাথের সেই রশ্মিটার পিছনে নিযুক্ত হতেই

দেখল সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। আসছে আলোটা গোরাচাঁদ বাবুর বেড়-বাড়ীর পিছনে খিড়কির পাশ থেকে। সে পাশে রয়েছে একটা ডোবা। সেই ডোবার পাড়ে আছে একটা আমগাছ। বহু পুরানো গাছটা। তা হলেও ডাল-পালাগুলো বেশ সতেজ-সবুজ এবং ঘোরালো। সেই ঝাকড়া-মাথা আমগাছটার একটা ডাল থেকে আসছে আলোর ওই অদ্ভুত রশ্মিটা।

কিন্তু একি দেখছে ভূতনাথ। আলোটা তো কোন দিব্যাত্মার দেহচ্ছটা নয়। পুরানো আমগাছটার প্রায় মগ্-ডালে গলায় দড়ি নিয়ে ঝুলছে যেন একটা প্রেতাত্মা। আলোটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার দেহ থেকেই। নিশ্চয়ই ছিল ওটা বিগত জন্মে কোন মেয়েমানুষ এবং মরেছিল সে গলায় দড়ি দিয়ে। গলায় দড়ি দিয়ে মরে যারা তারা তো প্রেত-পেত্নী বা ভূত ভূতনীই হয়। আত্মহত্যা মহাপাপে নরক-যন্ত্রণা ভোগে চেহারাগুলো হয় তাদের বিশ্রী, বিকট, কদাকার। কিন্তু এ নারী মূর্ত্তিটার চেহারাটা তো তেমন নয়। নরক-ভোগের কোন চিহ্ন বা ছাপ-ছোপ নেই। নেই তার দেহের আদল-অবয়বে ভূতনী-পেতনীর কোন আকৃতি প্রকৃতি। ঝুলছে যেন সদ্য মৃতা সতী-সাবিত্রী এক পুণ্যবতী মহিলা। হাতে শাঁখা, মাথায় সিন্দুর, পরনে চওড়া-পেড়ে শাড়ী। সুন্দর এক এয়োস্ত্রীর সাজে সজ্জিতা সে। তবু যখন আত্মঘাতিনী সে তখন নিশ্চয়ই সে ওই নীচ প্রেতাত্মাগুলোর পর্য্যায়ে। কিন্তু প্রেতাত্মাদের দেহ থেকে তো এমন ফিকে সোনালী দিব্য-ছটা বিচ্ছুরিত হয় না! ব্যাপার কি?

বিস্ময় বিহ্বল চক্ষে ভূতনাথ দেখতে লাগল ওই ঝুলন্ত দেহটাকে। কিছুক্ষণ পর দুলতে লাগল সেই অবয়বটা। ঘড়ির দোলকের মত। এধার ওধার। গাছের মগডালে যেমনভাবে দুলতে লাগল সেই মূর্ত্তিটা তেমনিভাবে তারদেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোটাও দুলতে দুলতে এসে পড়তে লাগল এধারে গোরাচাঁদ বাবু ও কমলাদেবীর উপর। পড়ে আবার ঘুরতে লাগল সেই রশ্মিটা। ঘুমন্ত দম্পতির শয্যারচার পাশে। ঠিকরে পড়া ওই আলোটাকে বেড়, প্রাচীর গাছ-পালা, কোন বাধাই প্রতিহত করতে পারছিল না। এমন কি ঘরের ছাদ— সেটাও যেন তার কাছে কোন বাধাই নয়। ভেদ করে ছাদ দিব্যি সেই আলোটা তার পূর্ণ জ্যোতি নিয়ে ঠিকরে যেন এসে পড়ছিল সেই ঘুমন্ত দম্পত্তির উপর। আশ্চর্য্য!!

ভাবতে লাগল ভূতনাথ নিশ্চয়ই ওই ঝুলন্ত নারী মূর্ত্তিটা সাধারণ কোন প্রেতাত্মা নয়। হতে পারেনা সে কখনও নীচ হীন ভৌতিক সত্ত্বা। তাহলে তার দেহ থেকে ফুটে বেরুত না এমন আভা। আর সে আভার শক্তিও হত না এমন যার ভয়ে ছিট্‌কে পড়তে, দূর সরতে বা অদৃশ্য হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হতে হত ওইসব ভূত-প্রেত ইত্যাদি নীচ সত্ত্বাগুলোকে। চিন্তা করতেই আবার মনে হল ভূতনাথের সূক্ষ্ম-দেহীরা নাকি আলোর ভাষায় কথা বলে। তাহলে কি ওই ঝুলন্ত এয়োস্ত্রী-প্রেতাত্মাটা আলোর ভাষায় কোন কথা বলতে চায়? জানাতে চায় কি সে কিছু ঘুমন্ত ওই দম্পতি যুগলকে? জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল সে সতীর দিকে। কিন্তু বলতে তাকে আর হল না কিছু। কৌতূহলী দৃষ্টিটাতেই ভূতনাথের ফুটাল ওমনি সতীর মুখে ভাষা। আপনা থেকেই বলতে আরম্ভ করল সে,"—তুমি ঠিকই ভাবছো ভূতুদা। আত্মহত্যাকারী পাপাত্মাদের উচ্চ-আত্মিদের মত ওমনি দেহের জ্যোতি হয় না। হয় না তাদের আভার এমন শক্তি যার ফলে নীচাত্মাদের চলে যেতে বাধ্য হতে হয়। গলায় দড়ি দিয়ে এই সূক্ষ্ম-স্তরে মরে এলেও জগৎজীবনে ছিলেন উনি একজন উচ্চ আত্মিক। ছিলেন ধর্ম্ম-প্রাণা, পর-দরদী সহানুভূতিশীলা, দেব-দ্বীজ-ভক্তিপরায়না, সেবাব্রতী, চরিত্রবতী এক মহিলা। কিন্তু—" দীর্ঘশ্বাস ফেলল সতী। বলল তারপর," —মুনিদেরও মতিভ্রম হয় ভূতুদা। দেবতারাও অনেক সময় চ্যুত হন তাদের দিব্যভাব থেকে। অবশ্য তার জন্য তাদের ফলও ভোগ করতে হয়। সোনাকেও পড়তে হয় নর্দ্দমায়। কিন্তু স্বভাব-জ্যোতি, অন্তর-ধর্ম যার-যা তেমনিই থাকে। পাঁকে পোঁতা থাকলেও যায় না মুক্তার উজ্জ্বল্য। আবর্জনার মধ্যে থাকলেও মনি-কাঞ্চন হারায় না তার বৈশিষ্ট্য।"

ভাব-গম্ভীর স্বরে বলতে লাগল সতী,—মানসিক দুর্ব্বলতায়, ক্ষণিক উত্তেজনার বশে বা হঠকারিতার মুহূর্ত্তে হঠাৎ যদি ভুল করে কেও একটা কিছু করেই বসে তবে সে নিয়ে তার গোটা জীবনটাকে বিচার করা উচিত নয় ভূতুদা। নয় উচিত কারো ক্ষণিক চিত্ত-চাঞ্চল্যে ত্রুটি ধরে তার সম্বন্ধে কোন খারাপ সিদ্ধান্ত করা। ভগবান তা করেন না। তিনি দেখেন মানুষের মনের ভাব। তাই তো তাঁকে বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। মানুষকে যার যা কর্মফল তাকে তা ভোগ করতে হয় ঠিকই। কিন্তু শুদ্ধ মন-প্রকৃতি বিশুদ্ধ অন্তর, নির্মল চিত্ত, সুন্দর হৃদয়

ও পবিত্র চরিত্রবত্তা তাকে ঈশ্বরের কিন্তু প্রিয়পাত্র করে রাখে। ওভাবে ওই ঝুলন্ত সত্তাটার নাকি কর্মফল ভোগ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার অন্তরজ্যোতি তো যাবার নয়।

যতই শুনতে লাগল ভূতনাথ ওই ঝুলন্ত প্রেতাত্মাটার কথা ততই যেন অবাক হতে লাগল সে। আত্মহত্যা মহাপাপ। সেই মহাপাপীর দিব্যজ্যোতি। আবার তার সম্বন্ধে সতীর বড় বড় কথা। শ্রদ্ধা। প্রশংসা। বড় বেশী কৌতূহল জাগিয়ে দিল ভূতনাথের মনটাতে। উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল অন্তরটা তার ওই নারী প্রেতাত্মাটার সম্বন্ধে জানবার জন্য। থামিয়ে সতীকে তাই ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করে উঠল সে,— কে ওই নারী? কেমন ওই নারী? বল না সতী। ওর সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জানবার জন্য বড় ইচ্ছা জাগছে মনে আমার।

"—বেশ। জানবেই যদি সব বলছি তার কথা। শোনই তাহলে।" বলেই সতী করল শুরু ঝুলন্ত ওই নারী প্রেতাত্মাটার জীবন-কথা।

সে কথা যেমনি করুণ তেমনি দুঃখের। হতাশায় ভরা ছিল ওই মেয়েটার জীবনটা। গোবর-ডাঙ্গা গ্রামেই জন্ম তার। মরণও এই গোবরডাঙ্গা গ্রামেই। মরেছিল সে গোরাচাঁদ বাবুর বাড়ীর পিছনের খিড়কি ডোবার পাড়ে—ঈশান কোণের ওই ঝাকড়া মাথা পুরানো আমগাছটার ডালে। গলায় ফাঁস লাগিয়ে। ওই আমগাছটা জীবনে বড় প্রিয় ছিল তার। ছিল বড় সাধের। গাছটা তার ঠাকুরদার হাতে লাগান ছিল বলে শুধু নয়। ও গাছের তলাটা ছিল তার বাল্যের ক্রীড়াভূমি। ছেলেবেলায় সকাল-দুপুর-বিকেল খেলত সে সেখানে খেলাসান। বসত সেখানে তাদের গল্প বলার আসর। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে জমত তাদের সেখানে পুতুলের বিয়ে-শাদী-খেলা। কাল-বৈশাখী তার প্রচন্ড তান্ডব নিয়ে আছড়ে পড়ত যখন ওই গাছটার উপর তখন কি আনন্দই না হত তার। সই-সয়লা ভাই-বোনদের সঙ্গে মেতে উঠত সে আম কুড়োবার স্ফূর্ত্তিতে। ঝড়-ঝাপটায় ছুটোছুটি হুটোপুটি লুটোপুটি করে সকলের সাথে ধুম পড়ে যেত তার আম কুড়োবাব। কি মজাটাই না লুটত সে তখন ওই আমগাছটার তলায়। কিন্তু ভাগ্যের কি বিচিত্র পরিহাস। অকালে ওই আমগাছটার ডালেই শেষে মরতে হল তাকে এবং হল মরতে গলায় দড়ি দিয়ে।

সে ইতিহাস বড় ব্যাথার—বড় বেদনার। সম্পর্কে ওই গোরাচাঁদ বাবুরই পিসিমা ছিলেন তিনি। নাম ছিল তার রানী। গোরাচাঁদ বাবুর বাবা অর্থাৎ রানীর ভাইএর নাম ছিল রাজা—রাজকুমার চক্রবর্ত্তী। রাজা-রানী দুই ভাইবোনে ছিল যেন এক দেহ—এক প্রাণ। ভাই-বোনের পারস্পরিক এই গভীর প্রেম-প্রীতি স্নেহ-ভালবাসা দেখে সত্যিই মুগ্ধ হত গায়ের সবাই। আদর্শ-স্থানীয় পুত্র-কন্যার অর্থাৎ রাজা-রানীর জনক হয়ে জানকী বাবু তেমনি হতেন প্রীত। গর্বিত ছিলেন তিনি মনে মনে। রানী শুধু রূপেই লক্ষ্মী ছিল না তার, ছিল সে গুণেও সরস্বতী। রানী নামটা সার্থক হয়েছিল তার পর-দরদী অন্তঃকরনে পর-হিত-ব্রতী চিত্তে ও সহানুভূতিশীল হৃদয়ে। বাল্যকাল থেকেই রানীর স্বভাবটা ছিল এমন যে কাবো কোন দুঃখ দেখলেই স্থির থাকতে পারত না সে। চিন্তা না করেই ঝাঁপিয়ে পড়ত সে পর-বিপদে। অভাব দেখলে কারো ছটফট্ করত সে। সাধ্য-অসাধ্য, সম্ভব-অসম্ভব তখন কোন ভাবনা-চিন্তা থাকত না তার মনে। থাকবে কেন? রানীর মত মন নিয়েই যে জন্মেছিল সে। তাই অনাথ-অসহায়দের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখলে চঞ্চল হয়ে উঠত তার মনটা।

এ-মন নিয়েই বড় হয়েছিল সে। হয়েছিল বড় শিক্ষায়-দীক্ষায়, গুণ-কর্মে আচার-ধর্মে ও ব্যবহারে এক অদ্বিতীয় মহিলা হয়ে। উন্নতমনা এ কন্যাকে তো আর অনুন্নত ঘরের, নীচ বংশের বৌ করে পাঠানো যায় না। যায় না তাকে অপাত্রে সম্প্রদান করে তার শিক্ষার অমর্য্যাদা করতে, গুণের অবমাননা করতে। রাজার মত ঘরে পাত্রস্থ না করলে যে রানীর জীবনটাই গোটা বরবাদ হয়ে যাবে। তাই ভাল ঘর ও বড় বরের সন্ধানে যেন উঠে-পড়ে লাগলেন জানকীনাথ বাবু। কিন্তু এখানেই ভুল করলেন তিনি অবশ্য স্নেহান্ধ সব পিতাই তার মা-মরা মেয়ের জন্য এরকম ভুল করেই থাকেন। আসলে তখন তাল-কানা হয়ে যান তাঁরা চিন্তা করেন না তখন যে নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী জীবনের ব্যবস্থা নিতে হয়। যেমন বিছানা তেমনি মেলতে হয় পা। বামন হয়ে আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়াতে নেই। কিন্তু সেই বলে না মতি ভ্রম, অর্থাৎ যাকে বলে ভীমরতিআর কি। সেই ভীমরতিই তখন ধরেছিল শ্রীমান জানকীনাথ বাবুর। অর্থাৎ বামন হয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে ছিলেন চাঁদে। চাঁদ মনে করে তিনি কি ধরতে কি ধরেছিলেন কে জানে। একবার ভালভাবে তাকিয়েও দেখেননি। এমন কি

চিন্তাও করেন নি—যে ধরলেন যেটাকে সেটা আসল চাঁদ কিনা বা চাঁদের নামে অন্যকিছু। রানীর তিনি দিলেন বিয়ে নদী-ওপারের সেকালের গোপালপুরের রাজবংশে। অর্থাৎ একালের স্তিমিত প্রদীপ রাজা রাজবল্লভ চক্রবর্তীর একমাত্র পুত্র রাজ নারায়ন চক্রবর্তীর সঙ্গে। এর জন্য জানকী বাবুকে খোয়াতে হল অনেক কিছু। ঘরে বাইরে জমা তার যা ছিল, গেল। গেল তার সঙ্গে জমিও প্রায় বলতে গেলে সবই। যাবে না? কুঁড়ে ঘরে হাতী ঢুকালে সাধারণত যে অবস্থা হয় সকলের—তাই হল জানকীনাথবাবুর।

গোপালপুরের রাজ-পরিবারের তখন "রাজা" নামটাই যা অবশিষ্ট ছিল। রাজ-রাজত্বের সম্বল বলতে তখন আর ছিল না কিছুই। শুধু হাস্যাস্পদ দেমাকটুকু নিয়েই রাজা রাজবল্লভ বাবু রাজ-পাটটা কোন রকমে বজায় রেখে চলছিলেন। তাল-দীঘি শুকিয়ে গেলেও আদলটা যেমন তার রুক্ষ-শূন্য পাড় ও ফুটো চৌহদ্দি ও ফাটা তলা নিয়ে সেকেলে নামটা মাত্র আঁকড়ে পড়ে থাকে গোপালপুরের রাজ-বংশটারও অবস্থা হয়েছিল তেমনি। তেল ফুরিয়ে এলেও প্রদীপের শেষ সলতেটো যেমন তলা-চোঁয়ানি এধার-ওধার যা-কিছু সব শুষে টেনে নিজের দপদপানিটা টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে—রাজ-বল্লভ বাবুও তেমনি ঘর-বাইরের সমস্ত কিছু নিঃশেষ করে অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর নিয়ে তখন বংশের রাজকীয় ঠাট-বাটটা আটকে রাখার চেষ্টা করে চলেছিলেন। পুত্র-রত্নটিও ছিল তার সেই "বাপকা বেটা ও সেপাইকা ঘোড়া"-র মত। তিনি তার রাজ-বংশের আভিজাত্য বজায় রেখে চলছিলেন তার মদ্য সেবনে সাজ-পোশাকের জৌলুষে ও বেপরোয়া জীবন যাপনে। এ সময়ে জানকীনাথ বাবু রানী-কন্যাকে তার রাজরানী করতে পাঠালেন ক্ষয়িষ্ণু এই রাজ পরিবারে। চমৎকার! মস্ত বড় একটা মকা পেয়ে গেলেন রাজা রাজবল্লভ চক্রবর্তী তথা তস্য পুত্র রাজনারায়ন বাবু। পণ-যৌতুক দান-সামগ্রী ইত্যাদি দেনা-পাওনা জানকীবাবুর কাছ থেকে যা পেলেন একেবারে শুষে নিলেন তারা। তবু তৃপ্ত হলেন না। কাজে-অকাজে, সময়ে-অসময়ে যখন-তখন হাত বাড়াতে লাগলেন তারা জানকী বাবুর দিকে। রাজজামাতা ও রাজ-বেয়াই—এর মান-সম্মান বজায় রাখতে রাখতে নাজেহাল হতে লাগলেন জানকীবাবু। হিমসিম খেতে লাগলেন তাদের ঠাট-আবদার রক্ষার ঠেলায়। নিঃস্ব হয়ে যেতে লাগলেন দিনের পর দিন। দেখে আর ঠিক থাকতে পারল না তার মেয়ে রানী। বড় প্রাণে লাগতে লাগল তার। তাই প্রতিবাদ করে উঠল সে একদিন—এটা অন্যায়। শুধু অন্যায় নয় চরম অত্যাচার তার বাপ-ভাইয়ের উপর। স্বামী-শ্বশুরের এসব পীড়ন চলতে থাকলে তার বাপ-ভাইয়ের সংসারের উপর ডুবে যাবে তাদের পরিবারটা। ফকির হয়ে যাবেন বাবা। তার ভাই হয়ে যাবে ভিখেরী। ভবিষ্যতে ভাইয়ের ছেলে-মেয়ে অর্থাৎ তার ভাইপো-ভাইঝিরা হয়ে পড়বে অনাথ আতুর নিরাশ্রয়। গাতে পড়বে গিয়ে তাদের শূন্য ডালি। পরের ঘরে, লোকের দরজার ভিক্ষে মেগে খেতে হবে তাদের। আর তাদের এ দারিদ্রতার জন্য, গরিবী অবস্থার জন্য, ভিখেরী জীবনের জন্য দায়ী হয়ে থাকবে রানী নিজে।

না-না। এ আর হতে দেওয়া চলবে না। চলতে দেওয়া চলবে তার স্বামী-শ্বশুরের এ পরিবারটার উপর স্টীম রোলার। তার সুখের জন্য এ রাজপাটে আর বাপ-ভাইকে তার বলি হতে দেবে না সে কিছুতেই। তাই প্রকাশ্যে সেদিন সে তার বাপ-ভাইকে দিব্য দিয়ে নিষেধ করে দিল এ রাজপরিবারে আর এক কপর্দকও না দেবার জন্য। ফল হল বিষময়। জানকীবাবুর ও তার রাজা ভাইয়ের বন্ধ হয়ে গেল রানীর সঙ্গে দেখা করা, তার বাড়ীতে আসা। ফতোয়া হয়ে গেল জারি আর কোন দিন বাপের বাড়ীতে পা দিতে পারবে না রানী। কিন্তু নাই বা গেল সে বাপের বাড়ী তবু ভাই-বাপকে তো আর তার জন্য ফতুর হতে হবে না। কিন্তু পীড়ন? মানসিক নির্যাতন? শারীরীক অত্যাচার পারল না রানী আর শেষ পর্য্যন্ত তা সহ্য করতে। তাই শেষে একদিন বাধ্য হয়ে সে আপনা থেকেই চলে এল বাপের বাড়ী। লুকিয়ে।

কিন্তু হায়! এসেও কিন্তু স্বস্তি পেল না সে। কারণ গোপালপুরের রাজবংশের একটা গোপন অলিখিত ইতিহাস ছিল। এ বংশে রানীরা কখনও নাকি রাজপুরুষদের উপর কথা বলতে পারত না। রাজাদের কোন কাজে-কর্মে আচরণে ব্যবহারে বাধা দিলেই গোপনে তার লাশ ভেসে যেত হয় গন্ধেশ্বরী নদীর স্রোতে না হয় সকলের চোখের আড়ালে চিরকালের মত পোতা থাকত ফুলবাড়ীর মাটির তলায়। সে রাম, সে রাজত্ব না থাকলেও সে রক্ত, সে বংশ তো আছে। সুতরাং সেই সঙ্গে আছে সেই বংশ তিলকদের রাজকীয় মন, মেজাজ

ও খেয়াল। সেই খেয়ালেরই বোধ হয় গন্ধ-পেয়েছিল রানী। পেয়েছিল তাদের নারী ঘাতক মনের আঁচ। ধাঁচ বুঝে তাই রাজমেজাজের আসতে বাধ্য হয়েছিল রানী। অর্থাৎ তার "সুখের সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।"

তাই হয়। মানুষ ভাবে এক—হয় আর এক। রানী নাম রাখলেই যদি কেও রানী হত জীবনে তাহলে আর ভাবনা ছিল না। রাজবংশে ঠেলে পুরে দিলে কেও কি কখনও রাজমাতা হয়? না রাজপুত্রের সঙ্গে বেঁধে দিলে কাকেও সে তার পাশে সিংহাসনে বসতে পায়? আসলে—"কপালে নাই ঘি, ঠকঠকালে হবে কি?" ভাগ্যে না থাকলে ভাজা মাছও নাকি লাফিয়ে পালায়।

যাক-গে ও সব কথা। নিজের সুখে, নিজের স্বামী-সংসার নিয়ে জীবন কাটাবার আশার মুখে রানী আগুন লাগিয়ে বাপ-ভাইয়ের সংসারে মুখ গুঁজতে এল বটে। কিন্তু সেখানের সেই স্বামীর সংসার তাকে কিন্তু এত সহজে ছাড়ল না। তার নামে নানা অবান্তর, অকথা—কু কথা, রটাতে লাগল তার স্বামী—শ্বশুর। সেই রটনাগুলোও কুৎসারূপে উড়ে আসতেলাগল এখানে রানীর উপর। একে তো মেয়ে মানুষ—তার উপর তার চরিত্র সম্বন্ধে নিজের স্বামী-শ্বশুর যদি যা-তা কথা বলে তাহলে কার মুখটা কি বলে আটক করবে সে? আর সমাজ তো কারো ভিতরটা দেখেও না। সে পরের মুখে ঝাল খায়। মানুষের বাইরেরটা নিয়েই বিচার করে। তেমনি ভাবে রানীকে বিচার করতে লাগল গোবর ডাঙ্গার পাড়া-প্রতিবেশীরা। চরিত্রে কারো খুঁট না থাকলে কি কেও কখনও স্বামী সংসার ছেড়ে আসে,—না বাপ-ভাইএর সংসারে এমনি ভাবে পেট পালে? স্ত্রী হয়ে স্বামীর ঘর করবে না— এ কেমন কথা! ছোট থেকে তাহলে এত শত বারব্রত উপোস করা কিসের জন্য? কিসের জন্য সে এতদিন ধরে পুণ্যি-পুকুর, টুসু, শিব চতুর্দ্দশী, মঙ্গল-চন্ডী, সাবিত্রী, সঙ্কট তারিনী ইত্যাদি ব্রতগুলো সব জীবনে এল পালন করে? শিবের মাথায় জল ঢালা ছিল কি তার শুধু ঢঙ করতে লোক দেখানোর জন্য? স্বামীকে নিয়ে ঘর করতে পারে না যে সে মেয়ের মুখে ছাই, কপালে আগুন। এয়োস্ত্রী হয়ে বাপ-ভাইয়ের সংসারে যে গলগ্রহ হয়ে থাকে তার মাথায় মুড়োঝাঁটা। "ছি-ছি" করতে লাগল সবাই। শুধু রানীকে নয় তার বাপ জানকী বাবুকেও।

কারণ জানকীবাবুরও উচিত নয় বিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে ওমনি ভাবে ঘরে আটকে রাখা। সমাজের একটা মান্যি-গুণ্যি লোক সে। মুখ্য মাতব্বর মানুষ। তার এরকমটা উচিত নয় কখনও। ঠিক নয় মেয়ের খাম-খেয়ালীপনাকে আমল দেওয়া, তার গোঁ-কে প্রশ্রয় দেওয়া। বেটার বৌ আসবে যখন ঘরে, দুটো কাচ্চা-বাচ্চাও হবে, তখন? কোন আক্কেলে সে বৌ-বেটার চোখের বালি করে রেখে দেবে মেয়েটাকে স্বামীর ঘর করতে না দিয়ে তাদের সংসারে? হাঁড়িতে হাঁড়িতে যখন ঠুকোঠুকি লাগে তখন ননদ-ভাজে খাওয়া-খাওয়ি লাগবে না? মেয়েলী ওই ঝগড়া-ঝাটিতে কি মুখটা পোড়া যাবে না বুড়োর? সংসারের কেলেঙ্কারিতে কি মান-ইজ্জতটা থাকবে তার? তার চেয়ে মেয়েকে মানে-মানে আপনার নিজের স্বামীর ঘরেই পুরে দিয়ে আসুক সে এবং তা সময় থাকতেই। নইলে হিতে হবে বিপরীত।

পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনের কথার খোঁচায় টিপ্পনীর চোটে তিঁতি বিরক্ত হয়ে উঠলেন জানকী বাবু। অতিষ্ঠ হয়ে ছুটলেন তিনি গোপালডাঙ্গা—বেয়াই বাড়ী। যেমন করেই হোক বেয়াই মশায়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবেন তিনি রানীর জন্য। হত্যা দিয়ে রাজ-বল্লভের দরজায় পড়ে থাকবেন দিনরাত। রানীকে তাকে নিতেই হবে ঘরে। বৌ হলেও রানী নিজের মেয়ের মত তো তার। সেরকম আক্কেল-বুদ্ধি না থাকাতে দোষ যদি সে কিছু করেই বসে তবে বাপ হয়ে তিনি কি ক্ষমা করতে পারবেন না তার মেয়েকে? গরীব ঘরের মেয়ে রানী, বড় হয়েছে অভাবের সংসারে তাই রাজ-বাড়ীর আদব-কায়দা না জেনে করে ফেলেছে কোন হটকারিতা। জ্ঞান গম্যি নেই বলে হয়তো ফেলেছে বলে সে কোন কথা---করেছে কোন উচ্চ-বাচ্য। সে দোষ জানকীবাবুরই। ছোট মুখে বড় কথা বলা অন্যায় হয়ে গেছে তার। সে অন্যায়ের জন্য যত শাস্তি নিজে নিবে জানকীবাবু মাথায় করে। কারণ এর জন্য দায়ী তো তিনি নিজেই। কারণ বাপ হয়ে মেয়েকে তিনি পারেন নি তেমন রাজবাড়ীর অনুকূলে শিক্ষা দিতে। সুতরাং ক্ষমা করে দিতেই হবে তার রানীকে। অরে রাজ-কূল-বধূকে তার দয়া করে ঘর এনে রাখতেই হবে তার মুখ।

ক্ষমা করাই রাজধর্ম। অতএব ক্ষমা করলেন রাজবল্লভবাবু তার বেয়াই মশায়কে। কিন্তু রাজরীতি। অপরাধীর তো একটা দণ্ড হওয়া দরকার। তাই দন্ড তিনি ধার্য্য করলেন তার পাঁচ হাজার টাকা। মেয়েকে তার ঘরে আনতে হলে দিতে হবে তাকে ওই অর্থ দণ্ড। অবশ্য মেয়ের তার সুখ-সুবিধার জন্যই। কারণ তার মেয়ের যে সোনার হারটা রাজবাড়ীর ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে ঘুচিয়েছে তার জামাই, খুইয়েছে সে পান-ভোজনে যে সোনার বালা দু-গাছা তার মেয়ের সেটা বাপ হয়ে তাকেই দিতে হবে পূরণ করে। তা ছাড়া রাজ কুলবধূ সে, বিনা অলঙ্কারে আনবে সে কি করে রাজবাড়ীতে।

কিন্তু বাদ সাধল তার মেয়ে। শুনেই এসব তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল রানী। রেগে বলে উঠল সে তার বাবাকে,—আর এক কানাকড়িও না। এসব দিয়ে তুমি আমাকে আর অপমান করো-না বাবা। একে তো বিনা দোষে তুমি আমাকে সেখানে দোষী সাজিয়ে দিয়ে এসে নিজের মাথাটা হেঁট করে এসেছ। এভাবে আমার জন্য দণ্ড দিতে যেয়ে ভাইকে আমার আর পথে বসিও না বাবা। কিচ্ছু দিতে হবে না বাবা। কিচ্ছু দিতে হবে না আর ওদের। তোমার মেয়ে বুক ফুলিয়ে সেখানে যেয়ে প্রমাণ করবে সে নির্দোষ। সেখানে গিয়ে দেখিয়ে দেবে সে তোমার বেয়াই কে যে বিনা দোষে ঘরের বৌকে বের করে দেওয়া অন্যায়। তার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনার অপরাধে অপবাধী সে। ঘরের বৌ করে নিয়ে গেছে যখন সে আমাকে এখান থেকে তখন সে ঘরে আমার অধিকার আছে। আমি সেই অধিকারেই যাব সেখানে। কিন্তু এভাবে রানীর অধিকারের কথায় সায় দিলেন না জানকীনাথ বাবু। ভদ্রঘরের মেয়ে সে। তাই দাবী আদায়ের এ কেলেঙ্কারীর পথটা গ্রহণ করা উচিত নয় তার। শুদ্ধ-সাত্বিক ব্যবহারে, শান্ত-শিষ্ট আচরণেই নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তাকে। তবেই আনন্দিত হবেন তিনি। স্বর্গে হবেন তৃপ্ত তার মায়ের আত্মা।

কিন্তু এভাবে টাকা দেওয়ার অর্থ তো জামাইকে তার মদ গিলতে সাহায্য করা। শ্বশুরকে তার বিলাসিতার মোজ-উড়ানো শূন্য আড়ম্বরের জন্য ইন্ধন যোগানো। তাই বেঁকে বসল রানী। গোমড়া মুখে বলে উঠল সে তার বাবাকে, — না বাবা, এভাবে টাকা আমাদের বরবাদ করতে দেব না আমি তোমাকে। আমার মাথা খাও এ টাকা তুমি দিও না কিছুতেই। তবু যদি দাও আমাব মরা মুখ দেখতে হবে তোমায়।

—বালাই ষাট্ মা : এমন কথা বলতে আছে?'' মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মেয়ের বুঝিয়ে তাকে বলতে লাগলেন জানকীবাবু,''—মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝবার একটু চেষ্টা কর মা। তোর স্বামী-শ্বশুরের কাছে আমি যে কথা দিয়ে এসেছি। না রাখলে কথা ফেলা যাব না আমি? ছোটো হয়ে যাবে না তোর বাবা তাদের কাছে? ছিঃ ছিঃ করবে না লোকে আমাকে?

''—কিন্তু বাবা, এত টাকা তুমি পাবে কোথায়?'' বলে উঠল রানী ''—বিয়ের জন্য তো আমার ঘুচিয়েছ সব। শেষে কি তুমি আমাদের এই বাড়ীটা পর্যন্ত বিক্রি করবে?''

''—দূর পাগলী! তাই কখনও পারি?'' বলে উঠলেন জানকীনাথ বাবু,—ভাবছি খিড়কি পাশের ডোবার অংশটা সহ আমাদের ওই পাড়ের আম-গাছটা দেব বিক্রি করে। পাঁচু বাড়ুজ্জের সঙ্গে দরদাম সব ঠিক হয়ে গেছে।

''—না বাবা না।'' মাথা ঝাঁকরে আপত্তি করে উঠল রানী,—''—ও আমার ঠাকুদার হাতে লাগনো গাছ। ও গাছ আমি কিছুতেই বিক্রি কবতে দেব না তোমাকে। ও গাছের তলায় ছোটবেলায় আমি যেমন খেলাসান খেলেছি তেমনি খেলাসান খেলবে আমার রাজু ভাইয়ের ছেলে-মেয়েবা। কাল বৈশাখির ঝড়ে ও গাছের তলায় যেমন রাজু আর দু-ভাইবোন মিলে ছুটোছুটি কবে আনন্দে আম কুড়িয়ে বেড়িয়েছি তেমনি রাজু ভাইয়ের আমার ছেলে-মেয়েরা ওমনি ঝড়ে স্ফূর্তি করে কুড়োবে আম। ও গাছ তুমি বিক্রি করতে পাবে না বাবা। কিছুতেই আমি খোযাতে তোমায় দেব না ও গাছ।

''—তাহলে উপায়।'' মহা মুস্কিলে পড়লেন জানকীনাথ বাবু। ওমনি রানীর রাজু ভাই এসে বাবাকে তার মুস্কিল আসানের জন্য বলে উঠল একটা উপায়,—''কেন, আমাদের তো এখনও যোলে দু-বিঘা জমি রয়েছে। সেটা বিক্রি কবলেই ওই হাজার পাঁচেক টাকা ও দিদিকে ভালভাবে বিদায় করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

''—না।'' বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে ওমনি আবার নিষেধ করে উঠল রানী,—আমার জন্য সব গেছে এ সংসারটার।

শেষে মায়ের নামের ওই জমিটুকু ঘুচিয়ে কি সুখ তুই কিনতে চাস আমার জন্য? ভেবেছিস কি, তোকে আমি এখানে গরীব করে সেখানে গিয়ে বড়লোক হব? তোর ছেলেদের আমি ভিখেরী করব, পথে বসাব?

"—কি যে বলিস দিদি," বলে উঠল রাজা, —তোর আশীর্বাদ থাকলে, জামাইদার আশীষ পেলে আমরা কি কখনও গরীব হতে পারি? তুই-সুখে থাকলে ছেলে মেয়েরা আমার দিব্যি সুখে থাকতে পারবে রে। তুই কষ্ট পেলেই বরং ছেলেরা আমরা দুঃখী হবে, পথে বসবে। বাবার কথা রাখ বোনটি। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনে গেছলেন। আর তুই—

"—পাকামি করিস না রাজু!" ভাই-এর মুখটা ধমকে বন্ধ করে দিল রানী। কিন্তু ধমকে মুখটা বন্ধ করে দিলে তার কি হবে—কাজটা কিন্তু রাজুর বন্ধ করতে পারল না সে। গোপনে বাবাকে উত্যক্ত করতে লাগল সে জমিটা বিক্রি করার জন্য। প্ররোচিত করতে লাগল তাকে ওই আমগাছটাবও খদ্দের দেখার জন্য। কারণ বোনের সুখের চেয়ে তার কোন সুখ বড় নয়। নয় তার বাবার অপমানের চেয়ে বড় তাদের জমি-জমা, গাছ-পালা। কিন্তু বিক্রির মুখে সব যখন হয়ে গেল ফাঁশ। কোনো বাধাই আর যখন টিকল না রানীব তখন দেখল সে একমাত্র তার মৃত্যু-ছাড়া এসব রক্ষা করার আর কোনো উপায় নেই তার। চলে গেলে সে জীবন থেকে তবেই রক্ষা পাবে তাদের এ সংসার। রাজ-বেয়াই ও রাজ-জামাতার অক্টোপাশ বন্ধন থেকে উদ্ধার পাবে তার সাধা-সিধা সরলমনা পিতা। ভাইয়ের সংসারটাও টিকে যাবে তাহলে ওই রাজ-পরিবাবের লালসার লেলিহান শিখা থেকে। মরে গেলে সে তার ওই মায়ের নামের দু বিঘা জমি ভবিষ্যতে তার ভাই-পো ভাইঝিদের আহারের সংস্থান রূপে থাকবে তাহলে বজায়। তাই বাধ্য-হয়ে রানী নিল গলায় দড়ি। ঝুলল তাব সেই ঠাকুরদার হাতে লাগান বড় সাধের সেই ডোবার পাড়ের আমগাছটার ডালে। তার খেলার সাথী ওই আমগাছটা হয়ে রইল তার মৃত্যুর সাক্ষী ও সাহায্যকারী হয়ে। ভাগ্যের কি বিচিত্র পরিহাস! নিয়তির কি বিচিত্র লিখন! গ্রহের কি বিচিত্র ফের! আর জীবনের কি বিচিত্র পরিণতি!!

টানা একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে রানীর কথা শেষ করল সতী। এ তো যেন তার কথা নয়—হত ভাগিনী রানীর জীবনের যেন তাকে ছায়া-ছবি দেখানো। বিষাদভরা কণ্ঠে বলে উঠল সতী,—সেই থেকে রানীর প্রেতাত্মা ওখানে ওই ভাবেই ঝুলছে ভূতুদা। সীতা-সাবিত্রীর শক্তি ধারিনী সত্তাটাকে তার না পারছে কাল-দণ্ড স্পর্শ করতে, না পারছে নরক তাকে আকর্ষণ করতে যম-গহ্বরে। ভাই এর-বংশের মোহেব ভাবে আটকে থাকা আত্মাটা তার না পারছে উর্ধ্বলোকে গমন করতে। জগতের সবাই নিজের ধারনা মত অপরকে দেখে ভূতুদা। নিজের স্বার্থপর মনোভাবের সীমার মধ্যেই বিচাব করে অন্যকে। অপরের মনকে কেও দেখেও না অপরের প্রাণের খবর কেও রাখেও না। রানীকে তাই কেও বুঝেনি ভূতুদা। বুঝেনি তার ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শুদ্ধ চিত্ত হৃদয় ও নিষ্কাম অন্তরকে। জানল ভূতনাথ ঘুমন্ত ওই গোরাচাদ বাবুই ঝুলন্ত ওই রানীব ভাইপো অর্থাৎ তার ভাই রাজকমলবাবুর ছেলে। আর তার পাশে ঘুমন্ত কমলা দেবী হল তাব ওই সেই সাধের ভাইপোবই স্ত্রী। গত হয়েছেন পিতা জানকীবাবু তার আত্মহত্যার অব্যবহিত পরেই। ভাই তার রাজুবাবু মারা গেছেন নাকি বেশ কয়েক বছর আগে। মৃত্যুর পর আপন আপন কর্মফল অনুযায়ী পরলোকের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে গতি হয়েছে তাদের। কিন্তু রানী—

—"রানী কি তার আত্মহত্যার পাপে ঝুলছে ওমনি অসহায়ভাবে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

"—না ভূতুদা।" বলে উঠল সতী,—আত্মহত্যা মহাপাপ হলেও সে পাপেব এমন কোন শক্তি নেই যারা ভগবানের নাম স্মরণ করে মরে তাদের স্পর্শ করতে পারে। শুধু মহাদেব মহাকালকে স্মরণ করেই না মরেছিল সে তার সমস্ত ধর্ম-কর্ম দান-ধ্যানের পুণ্যফল সকলের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করে। মৃত্যুকালে রানী সীতা-সাবিত্রীর কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নিয়েছিল যেন তার স্বামীর সুমতি হয়, শ্বশুরের ধর্মে-কর্মে মতি হয়। এমন কি জীবনভর তার নানা ব্রতউপবাস করে আসা যেমন-পুণ্যি পুকুর, শিবচতুর্দ্দশী, মঙ্গলচণ্ডী, সাবিত্রী, সঙ্কট হারনী ইত্যাদি সমস্তের ফলও সে তার মত অসহায় দুর্বল, এয়োস্ত্রী মেয়েদের মঙ্গলের জন্য করে গেছে অর্পন। শিবের মাথায় জল ঢালা, আশদগাছে জল দেওয়ার ইত্যাদি ফলও সে উৎসর্গ করে গেছে সকলের মনের শান্তির জন্য। মানুষ ইহলোকের সুখ ও পরলোকের শান্তি ও স্বর্গবাস কামনায় জীবনে নানা ধর্মাচরণ ও পুণ্য

কাজ করে। কিন্তু রানীর এর জন্য না ছিল মনে কোন ঐহিক সুখ কামনা না ছিল মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়ার কোন লোভ বা বাসনা। বরং মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করার সময় সে বলেছিল—যত দুঃখ, যত শাস্তি আমাকে দাও প্রভু তবু পরকে তুমি আর এভাবে আমার এত কষ্ট দিও না। সবার সর্বপাপের দন্ড আমাকে দাও, দাও তার বদলে সকলের মনে প্রেম-প্রীতি সুখ-শান্তি ও ভালবাসা।

সতীর মতে মৃত্যুকালে এ ভাবে নিজেকে পরের জন্য উৎসর্গ করতে পারে যে সেই পুণ্যাত্মা। পারে একমাত্র উচ্চাত্মারা এভাবে জীবনভর করে আসা ধর্ম-পুণ্য দান সৎ কর্মের সমস্ত ফল অপরের মঙ্গল কামনায় অর্পন করতে। তাছাড়া মনে কোন পাপ না থাকলে তো আত্মাকে তার নরক আকর্ষণ করতে পারে না। রানীর মনে কারো প্রতি দ্বেষ-হিংসা ছিল না। এমন কি মরার সময় সে তার স্বামী-শ্বশুরেরর প্রতি রাগ-আক্রোশ নিয়েও মরে নি। মরেনি কারো প্রতি কোন প্রতিহিংসা নিয়ে।

—তাহলে সে ও ভাবে ওখানে ওমনি ভাবে ঝুলছে কেন? জিজ্ঞাসা করে উঠল ভূতনাথ।

"—এই তো মায়ার খেলা ভূতুদা।" বলে উঠল সতী,—এ জগতে বৈষ্ণবী-মায়া ও জগতে মহামায়া—সত্তাকে এমনি মোহান্ধ করে রাখে। এ খেলায় সে এমন টেনে রাখে জীবকে যে সহজে তাকে উঠতে দেয় না। সেই টানেই সে আছে ওমনি তার ভাইয়ের সংসারটার দিকে তাকিয়ে, তার বাপের বংশধরদের দিকে ওমনিভাবে সু-দৃষ্টি রেখে। মৃত্যুকালীন গলায় দড়ি দেওয়ার স্মৃতি আর তার ওই আম-গাছটার প্রতি টান সে ভুলতে পারে নি। তাই ওমনি সে গলায় দড়ি দেওয়ার ছাপটা নিয়ে ঝুলছে।

"—ঝুলবে আর কত কাল?" জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

—যত কাল না তার জন্য নিঃস্ব হওয়া তার ভাইয়ের সংসারটা ভর-ভরন্ত হয়ে উঠছে। সুখ-স্বচ্ছন্দে ছেলে-পিলের হাসি আনন্দে যতদিন না উঠছে ভরে তার জন্য দুঃখ-কষ্টে পড়া ও অভাব-অনটনে ফেলে আসা তার বাপের পরিবারটা। তার জন্যই সে কোন অসৎ সত্তাকে কু-দৃষ্টি ফেলতে দিচ্ছে না ভূতুদা ওই সংসারটার উপর। আসতে দিচ্ছে না কোন নীচ-আত্মাকে বংশে তাদের জন্ম নেবার জন্য। এই জন্যই ওই দম্পতি যুগলের চারপাশ থেকে সে হীন-আত্মা, নীচ-সত্তা অর্থাৎ ওই সব ভূত-প্রেতগুলোকে ওমনিভাবে দিচ্ছে তাড়িয়ে। হটিয়ে দিচ্ছে তার দিব্যজ্যোতির প্রভায়।

—এ সংসারে সে নিজে-জন্ম নিতে পারে না?

"—ইচ্ছে করলেই পারে।" বলে উঠল সতী,—"কিন্তু তার মত আত্মহত্যাকারী আত্মাদের এ ইচ্ছাটা বাস্তব জীবনে রূপ নেবার জন্য সেভাবে তেমন জমাট বাঁধতে পারছে না ভূতুদা। যে জ্বালা-যন্ত্রনা থেকে সে অব্যাহতি পাবার জন্য শেষ করে এসেছে তার জীবনটাকে সেই জীবনে আবার যাবার আশা দানা বাঁধলেই মনে জেগে উঠছে তার সেই জ্বালা-যন্ত্রণাগুলোর স্মৃতি। মানসিক স্তরে এ স্মৃতি বড় বেদনাদায়ক হয় ভূতুদা। সূক্ষ্ম অবস্থায় এগুলো বাস্তবের চেয়ে সহস্রগুণ বেগ নিয়ে, তীব্রতা নিয়ে ছেঁকে ধরে সত্তাটাকে। বাস্তব মনে এ অবস্থা তুমি কল্পনা করতে পারবে না ভূতুদা।

"—পারবি না ওই আত্মাটার তুই কোন উপকার করতে? সতীকে হঠাৎ বলে উঠল ভূতনাথ,—" পারব না আমি ওর কোন উপকারে লাগতে? ওই ঝুলন্ত অবস্থা থেকে ওকে উদ্ধার করতে? সত্যি বলছি, ওর জন্য মনে বড় আমার দুঃখ হচ্ছে সতী। যে কোন ভাবে ওকে সাহায্য করতে পারলে শান্তি পাব মনে আমি।

কি যেন কিছুক্ষণ ভাবল সতী। বলল তারপর,—ইচ্ছা তো আমারও হয় ভূতুদা। কিন্তু অভিমানিনী সত্তা রানীর কারোর কোন সাহায্যের চিন্তা আনেই না মনে। ভাবেও না কখনও তার উদ্ধার বা মুক্তির কথা। তবে এদিক দিয়ে তোমাদের মত উন্নত-মনা জাগতিক সত্তাদের পরলোকবাসীর সূক্ষ্মাত্মাদের অপেক্ষা বিশেষ একটা চিন্তা শক্তির প্রভাব আছে। ইচ্ছা করলে তুমি তোমার ওই সৎচিন্তার তরঙ্গ প্রেরণ করতে পার ওই অজ্ঞান রানীর সত্তাটার কাছে। কম্পনে তার হয়তো কোন প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার মনে।

আশ্চর্য্য। মনে মনে ভূতনাথ সত্তাটার উপকারের কথা চিন্তা করতেই ওমনি দোলনটা তার বন্ধ হয়ে আসতে লাগল ক্রমশঃ। আস্তে আস্তে সুস্থির হল তার জ্যোতিটা। দেখে তাই বলে উঠল সতী, "—এরপর

তোমার আমার সৎ-ইচ্ছার তরঙ্গের সঙ্গে জ্ঞান শক্তির ঢেও প্রেরণ করলে পারে হয় তো ওই মোহ-গ্রস্থ সত্তাটার মায়ার প্রাচীর ভেঙ্গে বোধে তার আঘাত করতে। জগতে গোরাচাঁদ বাবুই হোক আর তার স্ত্রী কমলা দেবীই হোক যে-যার কর্মফল নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। নামে জীবনে নির্দ্দিষ্ট একটা ভোগকাল নিয়ে। সুতরাং তাদের রক্ষার জন্য, তাদের বংশের কল্যাণের জন্য কেন সে তার আত্মাটাকে ঝুলন্ত অবস্থায় এভাবে আটকে রেখে কষ্ট দেবে? এস ভূতুদা, আমরা একসঙ্গে তার আত্মার উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

বলেই সতী হাত-জোড় করে দাঁড়াল প্রার্থনা করার ভঙ্গীতে। চোখে-মুখে তার ফুটে উঠল পরম ভক্তিমতী মহিলার এক শুদ্ধ-সত্ত্ব ভাব। সে ভাবের ছোঁওয়া লাগল যেন ভূতনাথের মধ্যেও। সতীর দেখা-দেখি সেও হাত জোড় করে দাঁড়াল সতীর পাশে। ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে সতীর ভাব-গদ-গদ কণ্ঠটার সঙ্গে যেন আপনা থেকে মিলে গেল তার কণ্ঠটাও। সমস্বরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল এক মধুর সুর—"ত্বমা দিদেবঃ পুরুষঃ পুরান-স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম।

বেওাসি বেদঞ্চপরঞ্চধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।

বায়ুর্যমোহ গ্নির্বরুণঃ শশাঙ্ক প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে।।" একি! এযে গীতার শ্লোক! এ শ্লোক সতী শিখল কি করে? জীবনে তো ছিল সে নিরক্ষর। লেখাপড়া শিখা তো দূরের কথা পাঠশালের কখনও মুখ দেখেনি সে। ঘরেও তো শেখবার কোনো উপায় ছিল না তার। সৎমায়ের দাপটে সদা-সর্ব্বদা তটস্থ থাকত হত তাকে। খাটতে হত দিনরাত গাধার খাটুনি। সংসারে ভাতের হাঁড়ি ঠেলে, ফাই-ফরমাস খেটে চব্বিশঘন্টা নাজেহাল হতে হত তাকে। এক মূহূর্ত্তও হাঁফ ফেলবার সময় পেত না সে। কিন্তু গীতার এ কঠিন সংস্কৃত শ্লোক, তার সুমধুর উচ্চারণ, নিখুঁত এ বাচনভঙ্গী সে আয়ত্ব করল কি ভাবে? কখন?

কিন্তু সতীর ব্যাপারে ভূতনাথ আশ্চর্য্য হবে কি নিজের ব্যাপারে নিজেই সে যার পর নাই হতে লাগল বিস্মিত। গীতা পড়া তো দূরের কথা জীবনে সে কখনও বদ্—বিটকেলে সংস্কৃত ভাষার ধারে-পাশে পর্য্যন্ত যায় নি। কিন্তু সতীর সুরে সুর মিলিয়ে কণ্ঠটা তার শ্রীমদ্ভাগবদগীতার ওই জটিল শ্লোকগুলো এমন পরিষ্কার ভাবে গেয়ে চলেছে কি ভাবে! কোন শক্তিতে সতী তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে টেনে বের করছে অজানা তার এসব মন্ত্র ধ্বনি? পুলকিত করছে হৃদয় তার! ভক্তি-প্লুত করছে তার চিত্ত-মন প্রাণ। গেয়ে চলল ভূতনাথের কণ্ঠ সতীর কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে,—"

ত্বমেব ধাতা হিতং ধেয়ো বা
ভক্তি স্ত্বমেব ভজনঞ্চ ভক্তঃ।
কিং প্রার্থয়ামি পরম মহেশ্বর
ত্বমেব শান্তিং বিদধাসি নূনম।।
কল্পবৃক্ষ ইব দদাসি সর্ব্বম
কদাপ্য পেক্ষাং করোমি নার্ত্তেঃ।
শরনাগতোহ হম তব পাদ প্রান্তে
যথা ভি সন্ধং কুরু কল্যাণ ম্।।

না জানি কি শক্তি ছিল ওই প্রার্থনা মন্ত্রের। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির দোলকের মত রানীর দুলন্ত সত্তাটা একেবারে হয়ে গেল নিশ্চল-নিস্পন্দ। পরিণত হয়ে গেল সেটা ছোট গোলাকার একটা আলোর বিন্দুতে। সেই আলোর বিন্দুটা থেকে ফিকে সোনালী রঙের একটা আভা যেন বিচ্ছুরিত হয়ে এসে পড়তে লাগল ঘুমন্ত কমলা দেবীর উপর। ঠিক টর্চলাইটের ফোকাশের মত। আম গাছটার উপর থেকে এমনভাবে ঠিকরে এসে পড়তে লাগল সেই রশ্মিটা, মনে হতে লাগল বাড়ীর বাইরের গাছ-গাছালি, প্রাচীরের দেওয়াল, ঘরের ছাদ সব কিছু যেন ভেদ করে আসছে সেটা। কমলা দেবী কিন্তু গভীর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ লক্ষ্য করল ভূতনাথ সেই ঘুম-অচেতন কমলা দেবীর জড়-দেহটা থেকে তার আর একটা দেহ যেন ভেসে উঠছে উপরের দিকে। উঠছে ভেসে সেটা যেন সেই পড়ন্ত আলোক-রশ্মিটা ধরে বরাবর। ছায়া-ঘন হাল্কা অবয়ব সেটা। ভেসে উঠছে যেন

সেই ঠিক্‌রে পড়া আলোটার আকর্ষনেই। কিছুটা উঠেই সেই নিরালম্ব দেহটা হয়ে গেল স্থির। তারপর ভাসমান অবস্থাতেই উঠে বসল সেটা আসমানেই। মুখ, চোখ শুধু নয় কমলার এই দ্বিতীয় দেহটার প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন বরণ রং-ঢং আকার-প্রকৃতি ইত্যাদি সমস্ত কিছু তার প্রথম দেহ অর্থাৎ স্থূলদেহটার মত। কোথাও কোন খুঁত বা ইতর বিশেষ নেই। এটা যেন কমলার জড় দেহটারই অনুরূপ একটা কার্বন কপি। অবিকল নকল। আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্যের মাত্রাটা আরও বাড়ল ভূতনাথের দেখল যখন সে ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটা অবাক দৃশ্য! কমলা দেবীর উপর পড়ন্ত আলোটার সূত্র ধরে দৃষ্টিটাকে ভূতনাথ চালাল সেই রশ্মি বরাবর আমগাছটার দিকে। আশ্চর্য্য! দেখল সেই সোনালী আভার আলোর বিন্দুটা আর নেই! পরিবর্তে সেটা পরিণতহয়েছে ছোট্ট একটা শিশু-কন্যার মূর্ত্তিতে। কি সুন্দর চেহারা তার। কচি মুখে কি সুন্দর সহজ সরল মিষ্টি হাসি। যেন চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙ্গেছে তার সামনে। সে হাসি নিয়ে টানা চোখে মাধুরী মিশিয়ে তাকিয়ে আছে ফুট ফুটে কচি মেয়েটা অদূরে ভাসমান কমলা দেবীর দিকে। আশা-ভরা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে।

হঠাৎ মাতৃ-আবেগে কমলার সেই ছায়া-শরীরটা বাড়িয়ে দিল তার হাত দুটো। তাকে কোলে নেবার জন্য। বলে উঠল সে স্নেহ-ভরা কণ্ঠে,—আয় মা আয়। আমার কোলে আয়। তোর জন্যে মনে যে আমি কতসাধ নিয়ে বসে আছি। কোলে এসে আমার প্রাণের আশা পূর্ণ কর মা।

বলতেই ওমনি ফুটফুটে সেই ছোট্ট মেয়েটা বাড়িয়ে দিল তার কচি হাত দুটো কমলা দেবীর দিকে। ডেকে উঠল সে ''মা-মা'' বলে তারপর সেই পড়ন্ত আলোর রশ্মি-পথটা ধরে যেন উড়ে এসে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মা কমলার কোলে। পরম স্নেহে, আবেগ-আকুল আনন্দে সেজঁড়িয়ে ধরল বুকে তার সেই চাঁদ-সুন্দর মেয়েটাকে। ওমনি সঙ্গে সঙ্গে কমলার সেই ভাসমান অবয়বটা নেমে এসে মিলিয়ে গেল তার জড়-শরীরটার মধ্যে। স্থূল-দেহ-খাপে যেন ঢুকে গেল তার সূক্ষ্ম-শরীরটা। বিস্ময় বিমূঢ় ভূতনাথ! বুঝতে কিছু না পেরে সে হতভম্বের মত রইল দাঁড়িয়ে আম-গাছটার মগ-ডালে সেই ধোয়াটে-ধূসর আলোর বিন্দুটার দিকে তাকিয়ে। চমক ভাঙ্গল তার সতীর কথায়,—উদ্দেশ্য তোমার পূর্ণ হল ভূতুদা! দেখলে যা, তা তোমার ইচ্ছা-পূরণেরই প্রতিচ্ছবি।

''—তার মানে?'' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল সে সতীকে,''—আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ! ইচ্ছা পূরণ! কি যে বলছিস' তুই, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।''

হাসল সতী। বলল,—এর মধ্যেই সব ভুলে গেলে? তুমিই তো বলছিলে রানীর ওই ঝুলন্ত সত্তাটার মুক্তির কথা। বলছিলে না তুমি, —পারব না আমি ওর কোন উপকারে লাগতে? ওর আত্মার উদ্ধারের কাজে যে কোন ভাবে ওকে সাহায্য করতে পারলে তুমি নাকি শান্তি পাবে মনে। জল-পান হয়ে গেল তোমার খানিক আগে বলা এ সমস্ত কথাগুলো?

ভূতনাথ ভ্যাবা গঙ্গারাম। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল সে সতীর মুখটার দিকে। মিষ্টি হাসির ঝিলিক মেরে বলে উঠল সতী,—দেখলে যা তা তোমার ওই পরোপকারী সৎ-ইচ্ছাটারই প্রতিক্রিয়া ভূতুদা। তোমার চিন্তা তরঙ্গের ঢেও গিয়ে স্পর্শ করেছে রানীর ওই ঝুলন্ত সত্তাটাকে। তোমার আমার সমস্বরের শ্লোকের হাওয়া সাড়া জাগিয়েছে তার মনে। মুক্তি লাভের ইচ্ছায় তাই আন্দোলিত হয়েছে তার অন্তরাত্মা। কিন্তু জগৎ জীবনের কোলে না এলে তো আত্মার প্রকৃত মুক্তি হয় না। মানব জীবনের মাধ্যমেই সত্ত্বাকে উদ্ধার লাভ করতে হয়। তাই জাগিয়ে কমলার মাতৃসত্তাটাকে জন্ম নিতে গেল রানী। গেল পৃথিবীর মাটিতে আবার জীবনের খেলা খেলবার জন্য ঋতুমতী কমলার গর্ভে আশ্রয় নিতে।

অর্থাৎ সামনে ভূতনাথের ছায়াছবির মত ভেসে উঠল যে দৃশ্যপট তা অন্য কিছু নয়—রানীর জীবনে আসার ভাবী ছবি। কল্যাণ-ময়ী মূর্তি ধরে রানী গেল তার সেই ছেড়ে আসা রাজু-ভাইএর বংশে। এ বংশটার মঙ্গল ইচ্ছা নিয়েই এতদিন ধরে সে নাকি ঝুলছিল তাদের বাড়ীর পাশের আম-গাছটার ডালে। আশ্রয় করে থেকে ডোবার পাড়ের ওই গাছটাকে সব সময় সে রাখত সু-দৃষ্টি ফেলত এই পরিবারটার উপর। নজর রাখত যাতে কোন অসৎ-আত্মা, দুষ্ট সত্ত্ব, হীন-মনোবৃত্তি স্বভাব সম্পন্ন ভূত প্রেত এ বংশটায় এসে বা সূক্ষ্মস্তর থেকে

কোন কু-নজর ফেলে কোন ক্ষতি বা অমঙ্গল করতে না পারে। তাই তো ঋতুমতী কমলার গর্ভের আকর্ষণে তার শয্যার পাশে আসা ভূত-প্রেতগুলোকে সে ওমনিভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। দিচ্ছিল তাড়িয়ে সে তার দিব্য-জ্যোতির আলোকচ্ছটায়। আত্মহত্যা করে সে নীচু স্তরের প্রেতাত্মা হয়ে ওই আমগাছটাতে অবস্থান করলেও বিগত-জনমের পুণ্যফল, বার-ব্রত, উপোসকাপাশ পূজো ধর্ম তো তার বৃথা যায় নি। এসবের মাধ্যমে সে দিব্যভাবে জীবন কাটানোর ফলেই লাভ করেছে সে সূক্ষ্ম দেহে দিব্যজ্যোতি। নইলে এসব আত্মহত্যাকারী নীচ-আত্মাদের সাধারণত এরূপ জ্যোতি দেখা যায় না। এ জ্যোতির অলৌকিক শক্তি। সেই শক্তির বলেই রানী তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল কমলার গর্ভে আশ্রয় নিতে আসা ওই সব দুষ্ট-নষ্ট প্রেতাত্মাদের। কারন না তাড়ালে এসব সত্তা বংশে তাদের এলে যে তার রাজুদার বংশটা পাপে-অধর্মে, অনাচারে নষ্ট হয়ে যাবে। ওসব নীচ আত্মার আগমনে অধঃপাতেযাবে তার বাপের পরিবার। রানীর ওভাবে গর্ভে যাওয়াতে শুধু প্রেতাত্মাদের দৌরাত্ম্য থেকেই যে বাঁচল কমলা-তা নয়। গোরাচাঁদ বাবুও সৎ-সন্তানের জনক হবার সৌভাগ্য লাভ করল।

"—তাহলেই বুঝ ভূতুদা," প্রসঙ্গক্রমে হঠাৎ বলে উঠল সতী,—মানুষের মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদি হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলো মৃত্যুর পরও থাকে। সৎ-ইচ্ছারও বিনাশ নাই। জীবনের স্বভাব ধর্ম ভাল-মন্দ গুণ ইত্যাদি-গুলো মানুষের জড় দেহটা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তার আত্মাটাকে আশ্রয় করে টিকে থাকে। মানসিক দেহটার উপর ভর করে সেগুলো বিচরণ করে। মরার পরও সে তার জাগতিক ইচ্ছাটাকে পূরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে।

"—তা তো বুঝলাম।" বলে উঠল ভূতনাথ,—কিন্তু কমলা দেবীর দেহ থেকে আর একটা দেহ যে তার উঠে আসতে দেখলাম—সেটা কি?

উত্তর তার বলতে আরম্ভ করল সতী আর এক তত্ত্ব কথা। মানুষের দেহ নাকি স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ ত্রিদেহের সমষ্টি। অর্থাৎ তার জাগতিক এই জড়দেহটাই একমাত্র আধার নয়। স্থূলদেহের আবরণের ভিতর আছে তার দ্বিতীয় সত্তা অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ। এই সূক্ষ্মদেহের মধ্যে আছে আবার তার তৃতীয় সত্তা অর্থাৎ কারণ দেহ। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এ ভাবে সংগুপ্ত বা সংপুটিত হয়ে আছে যে তাদের পৃথগত্ব ধারনাই করা যায় না। অসীম-অনন্ত সত্তা এভাবে একটার পর একটা খাঁচায় বন্দী হতে হতে শেষে এই পঞ্চ ভৌতিক জড়দেহের খাঁচাটায বন্দী হয়ে কর্ম করে ও কর্মফল ভোগ করে। জাগ্রহ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার মধ্যে মানুষ তার এই ত্রিদেহের পরিচয় পেতে পারে ও তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। ভূতনাথ যে-টা দেখল সেটা নাকি আসলে হল কমলা দেবীর স্বপ্ন দেখা। অপেক্ষাকৃত একটু উঁচু স্তরের আত্মা যারা তারা নাকি ইচ্ছা করলে অপরের জড়-দেহ থেকে তার সূক্ষ্ম-দেহটাকে আকর্ষণ করে বাইরে বের করে এনে তাকে ওভাবে স্বপ্ন দেখাতে পারে। সাধারণত মানুষের ঘুমন্ত অবস্থাতেই এরূপ করতে পারে সূক্ষ্ম সত্তারা। কিন্তু মহর্ষি, মহাত্মা বা উচ্চ সত্তা যারা-তারা নাকি জাগ্রত অবস্থাতেও এই ত্রিদেহ-গ্রন্থী ভেদ করতে পারে। পারে তারা ধ্যানের বলে নিজ-জড়-দেহ থেকে বেরিয়ে সূক্ষ্ম দেহে কাজ করতে। পারে তারা যোগের বলে নিজের চিন্তা শক্তি অপরের সূক্ষ্মদেহে পরিচালিত করতে। পারে তারা সাধন বলে অপরের মন-গহ্বরে প্রবেশ করে তার দ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

"—কিন্তু ওসব কথা এখন থাক ভূতুদা।" বলেই সতী তত্ত্বকথা ছেড়ে আবার এল সেই আমগাছে ঝুলন্ত রানীর কথায়। বিষাদ-স্বরে বলতে লাগল সে,—মায়ের কোলে গেলেও রানী বেশী দিন বোধ হয় বাঁচবে না সে। কারণ কমলার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর তার দিব্যদেহ ছটাটা ধোয়াটে-ধূসর আলোর বিন্দুতে হয়ে গেল পরিণত।

"—বেশী দিন বাঁচবে না কেন?" দুঃখ মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাস করে উঠল ভূতনাথ।

"—এই-ই হয় ভূতুদা।" বিষাদ ভরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল সতী,—মা গঙ্গার কোলে এসেছিল যে অষ্টবসু তারা কি দীর্ঘদিন বেঁচেছিল? শান্তনুর ঔরসে জন্ম নিয়ে তারা কামদুখা ধেনু হরণের পাপ অর্থাৎ বশিষ্ঠের অভিশাপ খন্ডনের জন্য গঙ্গার গর্ভে জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু জন্মমাত্রই তারা মৃত্যুর মাধ্যমে তাই আবার ফিরে গেছল স্ব-ধামে। রানীও সেই রকম। আত্মহত্যার পাপ খণ্ডনের জন্য গেল বটে সে মা কমলার গর্ভে কিন্তু

জন্ম গ্রহণের পর পৃথিবীর কোলে থাকবে সে বছর কয়েক মাত্র। দিব্যাত্মা যাঁরা, তাঁরা কিন্তু বেশীদিন থাকতে চান-না জীবনে। কারণ বেঁচে থাকা মানেই তো সত্তাকে জগতের কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ করা। বন্ধন মানেই ফল-ভোগ। আর ফল-ভোগ মানেই আত্মাকে জন্ম-মৃত্যু তথা কর্ম-জীবনের চক্রে আবর্তন করা। এতে আত্মার মুক্তি হতে বিলম্ব ঘটে ভূতুদা।

"—কিন্তু সতী।" কেমন যেন এক ব্যথা-ভরা কণ্ঠে বলে উঠল ভূতনাথ,—কমলা দেবীর বহু আশার ফল হয়ে যাবে রানী, যাবে সে বড় সাধের ধন হয়ে তার কোলে। কিন্তু অকালে যদি সে' সাধের ধন, সে আশার ফল তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে-যায় তবে যে শোকে পাগল হয়ে যাবে তারা। এর কি কোন প্রতিকার নেই সতী? অন্ততঃ কমলা দেবীর জীবৎকাল পর্য্যন্ত রানীর জগতে টিকে থাকার কোন উপায় নেই?

কথাটা শুনে যেন বন্ধ হয়ে গেল সতীর মুখটা। গম্ভীর হয়ে গেল সে। ভাবনা-ভরা কেমন যেন এক ভাবাকুল চোখে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার ভূতুদার মুখটার দিকে। নিশ্চুপ দেখে সতীকে তেমনি সহজ-সুরে সরল ভঙ্গীতে বলে উঠল ভূতনাথ,— ছায়ালোকে দেখা ওই মা ও মেয়ের সুন্দর মুখের মিষ্টি হাসি, আশাভরা চোখের মধুর চাওনি, মধুমাখা স্বরের "মা-মা" ডাক আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না সতী। জগতে নামা ওই স্বর্গ-সুষমা, পৃথিবীতে আসা ওই পবিত্র-ভাব, ইহলোকে বয়ে আসা পরলোকের ওই আনন্দ-ঢল অকালে মিলিয়ে যাবে সতী? ভাবতে গেলে মনটা যে বড় আমার বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে সতী। পারবি না তুই এর কোন প্রতিবিধান করতে?

নির্বাক সতী কি যেন ভাবতে লাগল আকাশ পাতাল। ব্যাকুল ভূতনাথ বলে উঠল তাকে আকুল হয়ে,— তুই যদি না পারিস আমাকে তবে বল—আমি ওর কোন উপকারে লাগতে পারি কি-না? সত্যি বলছি সতী— মায়ের জীবনে আসা সন্তানকে যদি আমি বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করতে পারি তবে নিজেকে আমি ধন্য মনে করব। সার্থক হবে আমার জীবন। তৃপ্ত হবে আমার মন।

"—ব্যাপার কি জান ভূতুদা," ধীর-গম্ভীর স্বরে বলে উঠল সতী,—সংস্কার হল এক সাংঘাতিক জিনিস। সহজে সে ছাড়ে না মনকে। বিশেষ করে আত্মহত্যার সংস্কার। বাসা বাধলে একবার সে মনে ইহলোকে পরলোকে সত্তায় সে লেগে থাকে আঁঠার মত। জন্ম-জন্মান্তর একই চক্রে ঘুরায় সে আত্মাকে। অর্থাৎ জীবনে এলে টেনে নিয়ে যায় সে যেমন সত্তাকে আত্মহননের পথে। তেমনি মৃত্যুর পর সত্তাকে সে আটকে রাখে আত্ম-হননের ক্ষেত্রে এমন ভাবে যে আত্মার মুক্তির চিন্তা,সত্তার উর্দ্ধগতির ভাবনা সে স্থান পেতেই দেয় না।

তাই নাকি কথায় বলে এক জন্মের আত্মহত্যা সাত-জন্ম ভোগায়। ক্বচিৎ কখনও শুদ্ধাত্মার সংস্পর্শে এলে বা উচ্চ আত্মিকের কৃপায় পড়লে মনের নাকি এ ঘোর কাটে। সত্তার মুক্তি ঘটে। তবে রানীর আত্মা নাকি এতটা নীচু স্তরে নেই। সত্তায় তার শুদ্ধতার আমেজ, পবিত্রতার আকর্ষণ আছে। মনের তার আত্মহত্যার ঘোর কাটাতে হলে নাকি ভ্রূনাবস্থা থেকেই চেষ্টা করতে হবে। ইচ্ছে করলে ভূতনাথ নাকি রানীর এ মানসিকর পরিবর্তনের চেষ্টা করলেও করতে পারে। এতে জীবনে আসা রানীর আত্মহননের মোড় হয়তো ঘুরতেও পারে।

শুনেই ভূতনাথ ওমনি হয়ে উঠল ব্যস্ত। বলে উঠল সে সতীকে ব্যাকুলভাবে, —বল আমাকে কি করতে হবে? যা বলবি তুই তা-ই করব আমি। তাতে আমার যত কষ্ট বা যত অসুবিধাই হোক না কেন।

উত্তরে তার বুঝিয়ে ভূতনাথকে বলতে আরম্ভ করল সতী। মায়ের পবিত্র মনের ছোঁওয়াই নাকি ভ্রূনাবস্থায় সন্তানের সৎ-মানসিকতা গঠনের মূল চাবীকাঠি। গর্ভাবস্থায় মায়ের চিন্তা-ভাবনা গর্ভস্থ সন্তানের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাই তো সুভদ্রার অর্জুনের মুখ থেকে শোনা চক্রব্যূহভেদ কথা তার গর্ভস্থ সন্তান অভিমন্যুকে পরিনতজীবনে এক চক্র-ব্যূহ ভেদকারী বিশিষ্ট যোদ্ধায় পরিণতকরেছিল। মোটকথা গর্ভাবস্থায় মায়ের মনকে সৎ-পবিত্র-শুদ্ধ-সত্ত্ব রাখলে অনুরূপ মানসিকতা সম্পন্ন সন্তানের আশা করা যায়। তাই নাকি আমাদের দেশে গর্ভিনী মাকে দেবলীলা কীর্ত্তন, ভগবৎ-মাহাত্ম্য চিন্তন, পাঁচালী কথন, রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-চণ্ডী পাঠ শ্রবণ ইত্যাদির কথা বলা হয়ে থাকে। যাই হোক—রানী গর্ভে থাকাকালীন কমলাদেবীকে ওই রূপ শ্রবণ-মনন-চিন্তনের মধ্যে যেন রাখা হয় গোবাচাঁদ বাবুকে বলে ভূতনাথকে নাকি এ ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে জানল ভূতনাথ সতীর মুখ থেকে আর এক আশ্চর্য্য কথা। সত্তার পরিত্যক্ত স্থূল-সূক্ষ্ম ইত্যাদি দেহ-খোলশগুলোর নাকি এক ধরনের অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। পদ্যে-পড়া ছোট মেয়ের সেই পুরানো কাঁচের-চুড়ির টানের মতই একরূপ টান থাকে নাকি সত্তার এ খোলশগুলোর উপর। এ টানও একরূপ বন্ধন। বন্ধন মানেই আত্মাকে আটকে রাখা। তাকে পরমাত্মার সঙ্গে মিশতে না দেওয়া। অর্থাৎ তাকে পরামুক্তির পথে বাধা দেওয়া বা বিলম্ব ঘটানো। ইহজগতে মৃত্যুর পর স্থূল খোলসের মায়ার পড়ে যাতে আত্মা কষ্ট না পায়, যাতে সত্তার গতি হয় উর্দ্ধমুখী তার জন্যই তার জড়দেহটা পুড়িয়ে, কবর দিয়ে---নানা দেশে নানা ভাবে নষ্ট করে দেওয়া হয়। তেমনি সূক্ষ্ম-দেহের ব্যাপারেও। মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণের সময় সত্তাকে সূক্ষ্মাবয়বটা ত্যাগ করে আসতে হয়। তখন সেই পরিত্যক্ত আতিবাহিক খোলসটা যায় তার থেকে। সূক্ষ্ম জগতে তো স্থূলজগতের মত এ শব-দেহটাকে দাহ করা, কবর দেওয়া বা পশু-পক্ষী ইত্যাদির ভক্ষণ করে নস্যাৎ করে দেওয়ার মত তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। অবশ্য নষ্ট হয় সেটা। হয় আপনা থেকে। তবে বিলম্বে। পঞ্চভৌতিক সূক্ষ্ম অনু-কণাতেই একদিন যায় বিলীন হয়ে। হয় বিলুপ্ত সম্পূর্ণভাবে। তবে যতদিন না বিলুপ্ত হয় ততদিন এসব পরিত্যক্ত সূক্ষ্ম-দেহ-খোলসগুলো নাকি ভেসে বেড়ায় শূন্য লোকে। কোনটা কোনটা বা আটকে থাকে সূক্ষ্মস্তরের এমন এক জায়গায় যেখানে সূক্ষ্মদেহধারী সত্তাটা জীবনে নামার আগে তার মনের কল্পনায় বিশেষ একটা মানসিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করে বাস করতে ভাল বাসত।

তবে ভেসেই বেড়াক বা এক জায়গায় আটকেই থাক পরিত্যক্ত এই সূক্ষ্ম-দেহ খোলসগুলোর সত্তার উপর একরূপ আকর্ষণ নাকি থেকেই যায়। যায় থেকে সত্তারও নাকি একরূপ টান ছেড়ে আসা তার ওই সূক্ষ্মপোশাকটার উপর। সত্তা গর্ভাশ্রয়ে থাকলেও বা নবদেহে পরিণত জীবনে গেলেও পারস্পরিক এই আকর্ষণ বা টান কিন্তু যায় না। সূক্ষ্ম এই দেহ খোলসের প্রভাব যেন গর্ভাশ্রিত রানী-সত্তার উপর না পড়ে তার জন্য নাকি চেষ্টা করতে হবে ভূতনাথকে। চেষ্টা করা মানে কমলাদেবীকে পরোক্ষভাবে একটু সাবধান করে দেওয়া যেন সে গর্ভাবস্থায় তাদের ওই ডোবার পাড়ের আমগাছটার দিকে কোন সময়েই এক দৃষ্টিতেতাকিয়ে না থাকে। না যায় যেন ডোবার পাড়ের ওই আমগাছটার দিকে নির্জনে, একলা সেখানে বসে থাকতে বা সময় কাটাতে।

পরিত্যক্ত ওই সূক্ষ্ম দেহখোলশগুলোর সম্পর্কে আর এক ধরনের মজার কথা বলল সতী। শূন্যলোকে ভাসামান বা সূক্ষ্ম স্তরে ঝুলমান মরলোকের অদৃশ্য ওই সমস্ত খোলশগুলোতে নাকি মাঝে-মধ্যে ঢুকে পড়ে অন্য আত্মাও। বিশেষ করে যারা ইহলোকের নানা বিধ পাপের ফল পরলোকে এসে রৌরভ, মহা-রৌরভ, তপ্তকুন্ড, নিকৃন্তন, বিড়ভূজ,কুম্ভীপাক ইত্যাদি নরকে গিয়ে ভোগ করে। মাঝে-মধ্যে এসব নরককুন্ড থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা পাপাত্মাগুলো যম-যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য আশ্রয় নেয় এ সমস্ত ভাসমান খোলশে। এ খোলশেব উপর খোলশ পরিত্যাগকারী সত্তার অর্থাৎ জন্মে নামা নবদেহ ধারণকারী আত্মার পরোক্ষ একটা আকর্ষণ থেকে যায়। সেই আকর্ষণের টানে পড়ে ওই সমস্ত খোলশ আশ্রয়কারী সত্তা নবরূপধারী সত্তার ক্ষতিও করতে পারে। শুধু পাপাত্মাই নয়-স্বর্গচ্যুত অনেক উচ্চ আত্মিকও মাঝে-মধ্যে ঢুকে পড়ে নাকি ওই সমস্ত ভিন্ন আত্মার পরিত্যক্ত সূক্ষ্ম বহিরাবরণগুলোতে এর ফলে নাকি অনেক সময় আবার আশ্রিত আত্মার স্বভাব-প্রকৃতি যায় পাল্টে। অর্থাৎ যার পরিত্যক্ত বহির্বাস তার মতই তখন হয়ে যায় তার স্বভাব-প্রকৃতি। জগতে যেমন এক এক রূপ পোশাকের বৈশিষ্ট্যে মানুষের রুচি-প্রবৃত্তি মন-প্রকৃতি পাল্টে যেতে পাবে। যেমন গৈরিক পোশাকে মনে জাগে ত্যাগের ভাব, শুভ্র পোশাকে মনে আনে পবিত্রতা, রাজপোশাকে রাজার ভাব, দীন-দরিদ্র-গরীবী পোশাকে মনে নীচ-হীন দারিদ্রতার ভাব এনে দিতে পারে—সূক্ষ্মলোকের পরিত্যক্ত খোলশরূপ পোশাকগুলোও তেমনি আশ্রিত আত্মার মনোভাব পাল্টে দিতে পারে। এতে খোলশ-আশ্রিত উচ্চ আত্মিকও জন্মে নেমে বিরূপ মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি হতে পারে। বা খোলশে থাকাকালীন অবস্থায় সে তার আত্মিক ক্ষমতা বলে ওই খোলশ পরিত্যক্ত সত্তার প্রকৃতি স্থূল জগতে অপরের মনে সঞ্চার করতেও পারে। অর্থাৎ আত্মহত্যাকারী সত্তার পরিত্যক্ত সূক্ষ্ম-অবরণে-প্রবিষ্ট আত্মজগতের মানুষের দুর্বলতার সুযোগে মনে ভার আত্মহত্যার ভাব জাগাতে পারে। পারে হয়তো রানীর ছেড়ে যাওয়া আমগাছে ঝুলন্ত তার সূক্ষ্ম খোলশটাও

থাকা কোন আত্মা নবদেহধারী-রানীর মনে আত্মহত্যার ভাব জাগাতে বা তার মনে ওইরূপ কোন প্রভাব ফেলতে।

তাই সতীর কথা হল জন্মে নামা রানীর মনে যাতে ওরূপ কোন বিরূপ প্রভাব পড়তে না পারে তার জন্য ভূতনাথকে পরোক্ষভাবে একটু তাদের সাহায্য করতে হবে। সমূলে যদি গাছটাকেই নস্যাৎ করা যায় তবে সবচেয়ে ভাল। যেমন ভূতুড়ে গাছ বা ভূতুড়ে বাড়ী একেবারে নষ্ট করে দিয়ে অনেক সময় ভূতের উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যায়—এও কতকটা তেমনি। কিন্তু তাদের খিড়কির পাশের ওই আম-গাছটার একক মালিক তো গোরাচাঁদবাবু নন। তাই হয় তো গাছটাকে কেটে ফেলা সম্ভব হবে না। সুতরাং ভূতনাথ যেন গোরাচাঁদ বাবুকে লক্ষ্য রাখতে বলেন যাতে রানী মনের দুর্ব্বলতা নিয়ে ওই গাছটার দিকে না যায়। অর্থাৎ রাগ, ঝোঁক বা অভিমান করে না যায় যেন সে গাছটার দিকে। না পাতে যেন খেলাসান ওই আম-গাছটার তলায়। না খেলে যেন পুতুল ওর নীচে। হেলে-পড়া ওই গাছটার ডালে সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে লাফা-ঝাঁপা করতেও নিষেধ করে দিতে হবে বালিকা রানীকে। "ঝোরোল-ঝাঁপা খেলা" শুধু নয় ওই গাছটার ডালে উঠে সই-সয়লা সকলের সঙ্গে দোল খাওয়াও তার করতে হবে বারণ। মানা করতে হবে ছোট-রানীকে যেন খেলুড়ীদের সঙ্গে খেলায় মাতোয়ারা হয়ে ডোবার উপর ঝুঁকে-পড়া ওই আম-ডালটা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে মজা লুটতে বা সাঁতার কাটতে না যায় সে। বলা তো যায় না গত জনমের আত্মহত্যার টান কখন, কাকে, কোন অবস্থায় নিয়ে গিয়ে আত্মহননের ফেরে ফেলবে। তাই বাঁচাতে তাকে এসব চেষ্টা করতে হবে ভূতনাথকে। করাতে হবে তাকে এসব তার মা-বাবা অর্থাৎ কমলা দেবী বা গোরাচাঁদবাবুকে বলে। প্রত্যক্ষ ভাবে নয়—পরোক্ষ ভাবে অর্থাৎ মেয়ের তার অতীত জীবনের কথা না জানিয়ে। নবলব্ধ জনমের নির্দ্দিষ্ট জীবৎকাল যদি কোন রকমে রয়ে-সয়ে বা হত্যার টান থেকে অব্যাহতি পেতে পারে তার আত্মা। অপমৃত্যু বা অপঘাত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে সে।

আসল কথা হল—দেহের মৃত্যু হলেও মনের মৃত্যু হয় না। মন বেঁচে থাকে। টিকে থাকে সে শরীর নস্যাৎ, বিলয়, বিলুপ্ত হয়ে গেলেও। টিকে থাকে সে জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি অভিজ্ঞতা ও নানা ঘটনার ছাপ নিয়ে। এসব নিয়েই প্রাণকে নামায় সে পরবর্তী জীবনে এবং সেই অনুসারেই সে পরিচালিত করার চেষ্টা করে সেই নব দেহ-ধারীকে। এই যে অনেক সময় দেখা যায় মানুষের মন অযথা হঠাৎ দুঃখ ভারাক্রান্ত হয় বা থাকে সে দুশ্চিন্তায় গম্ভীর, নিরানন্দ বা বিষাদগ্রস্থ হয়ে। কখনও বা আবার সে হঠাৎ হয় হর্ষোৎফুল্ল। অহেতুক মন তার খুশিতে যায় ভরে, আনন্দে হয় ভরপুর। চিন্তা করলেও এসবের কোন কুল-কিনারা খুঁজে পাওয়া যায় না। যায় না পাওয়া এসবের কোন হেতু-হদিশ। কারণ কি ?

কারণ হল এর নাকি কোন বিগত জীবনের স্মৃতি। এসব হল নাকি কোন ফেলে আসা জীবনের প্রভাবের ফল। যে সময় মন অহেতুক এমন চিন্তা-ভারাক্রান্ত হয়, হয় অযথা-উৎফুল্ল বা হঠাৎ হর্ষোন্মত্ত, নিশ্চয়ই সে সময় অতীত জীবনে অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটে ছিল। যার স্মৃতি অবচেতন মনে উঠছে জেগে এবং চেতন মনে এসে লাগছে তার দোলা। কথা প্রসঙ্গে স্মিতহাস্যে বলে উঠল সতী,—বাঁকাদহে, তোমার ভোজু বন্ধুর ইটভাটায় গন্ধেশ্বরী নদীর পাড়ে বসে আনমনে যে তুমি তাকিয়ে থাকতে রোদ ঝিলমিল পশ্চিম আকাশটার দিকে দূর গগনের কোলে শুশুনিয়া পাহাড়ের মাথায় দেখতে যে সূর্য্য ডোবার দৃশ্য—কেন বলতো ? কেন বলতো লাগত তোমার ভালো মষের পিঠে চড়ে মষ—রাখালদের বাড়ী ফেরার দৃশ্য দেখতে ? দিনের শেষে মাঠ-চরানোর কাজ শেষ করে নদীর এপাড় ছেড়ে গন্ধেশ্বরীর বালি-ভরা বুকটার উপর দিয়ে ও পাড়ে যখন নিয়ে যেত তারা তাদের মঁষ পালটা তখন তাকিয়ে তাদের দিকে কি ভাবতে তুমি ? মষগুলো বালির উপর পা ফেলে ফেলে চলত ঠমক্-ঠমক দুলকি চালে। তাদের পিঠে বসা রাখাল ছেলেগুলো সেই তালে হেলে-দুলে হাঁকত মুখে কেও "ডাঙ্গাল্যা-গানের টান, কেও" "লেটো" গানের সুর। তাদের মেঠো-গলা প্রতিধ্বনিত হত নদীটার দু-পাড় ভরা গাছ- গাছালিগুলোব ডালে পালায়। খেয়ালি কোন রাখাল-বাঁশারয়া বাঁশির সুরে ভরিয়ে দিত শূন্য নদীর

বুকটা। পাটে-বসা সূর্য্যের ঝিলিকমারা রঙিন রশ্মিতে যেন স্নান করতে করতে ফিরতো তারা বাড়ী। লাগতো না ভালো তোমার এসব দেখতে?

ভূতনাথ চুপ। এত সব মনের কথা সতী তার জানল কি করে! সতী তার অবাক হওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে বলেই যেতে লাগল,— ভাল লাগতো বলেই তো প্রতি বিকেলে পড়ন্ত বেলায় ভাটার পাশে নদীর বাঁকে পাড়টায় গিয়ে বসতে তুমি। নদীর বুক বরাবর দৃষ্টিটা তোমার চালিয়ে দিতে আকাশে, দূর-দিগন্তের কোলে বসা শুশুনিয়া পাহাড়টার দিকে। দেখতে হেলে-পড়া সূর্য্যিমামার নানা আলোর রঙ ছড়িয়ে ডুবে যাওয়ার খেলা। সে রঙের খেলায় যেন গা ভিজাতে ভিজাতে কলসী কাঁখে সার বেঁধে নদীতে জল নিতে আসতো পল্লী-মেয়েরা। কুলু-কুলু স্রোতটার পাশের বালি সরিয়ে চুঁয়ো কুঁড়ে জল ভরতো তারা কলসীতে। কারো মুখে উঠত টুসুর গান, কারো মুখে ভাসত ভাদুর সুর। ভরা জলের কলসি নিয়ে মাঠের উপর পায়ে চলা সরু বাঁকা পথটি ধরে গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে যেত তারা। তুমি তাদের দিকে তাকিয়ে আনমনে থাকতে মোহিত হয়ে। এ দৃশ্যের ছোঁওয়া লেগে মনটা তোমার হয়ে উঠত উতলা। মনে হোত তোমার কোথায় যেন কি ফেলে এসেছি, কোথায় যেন কি হারিয়ে এসেছি। অজানা ব্যথায় ভরে উঠত তোমার মনটা। কেন বলতো? বলতো কেন লাগতো ভালো এসব তোমার? অবাক ভূতনাথ! বিস্ময়ে বেবাক দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে রইল সতীর মুখটার দিকে। সত্যি এসব কথা। সত্যি সে পড়ন্তবেলায় ভজনলালের ইটভাটায় গন্ধেশ্বরীর পাড়ে থাকত বসে। দেখত অদূরে ডুবন্ত সূর্য্যের রঙ লাগা মাঠে কলসী কাঁখে গ্রামের মেয়েদের নদী থেকে জল নিয়ে দল বেঁধে ঘরে ফিরে যাওয়ার দৃশ্য। এক বর্ণও মিথ্যে নয় সতীর ওই সমস্ত কথা বা বিবরণগুলো। নয় এসব তার বিন্দু মাত্রও রঙ চড়িয়ে বলা। তবে এসব কেন লাগত ভাল ভূতনাথের, ভরত কেন মনটা তার দেখলে এসব অজানা বিষাদে, হত কেন হৃদয়টা তার বেদনা ভারাক্রান্ত কিচ্ছু বুঝতে পারত না সে। পারত না সে আকাশ পাতাল ভেবেও এসবের কোন কূল-কিনারা করতে। কারন কি এসবের? কেন....?

সেই কেন-র উত্তরটাই দিতে আরম্ভ করল সতী তার ভূতুদার অবাক হওয়া চাওনি দেখে। বলল, এসব হল নাকি তার ফেলে আসা জীবনের ছবি। সম পরিবেশ পেয়ে অবচেতন মন থেকে ভেসে উঠা তার বিগত জীবনের স্মৃতি এসব। অতীতে কোন এক জীবনে সে নাকি ছিল বিহারের বৌলিয়া জেলার আহীর টোলা নামে কোন এক গ্রামের অধিবাসী। বাড়ী ছিল তার রোটস পর্বতে। বাবার নাম ছিল তার জ্বালা প্রসাদ। আর ভূতনাথের তখন নাম ছিল নাকি শঙ্কর প্রসাদ। পাহাড়ী গাঁয়ের গোয়ালার ছেলে ছিল শঙ্কর। তাই পাহাড়ে পাহাড়ে ম'ষ চরিয়ে ঘুরে বেড়াত সে। বাজাত কখনও বাঁশী। পাহাড়ী ঝর্নার পাড়ে কোন এক গাছের উপর চড়ে বসে। আহীর টোলার অদূরে এই ঝর্ণা ধারাটার নাম ছিল নাকি কুসমী-নদী। কুসমী নদীর ও পারেই ছিল কুসুম-টিক্‌রী নামক নাকি আর এক গ্রাম। সে গ্রামটাও ছিল আহীর অর্থাৎ গোয়ালাদের। সেই গোয়ালার গ্রাম কুসুম-টিকরীর গঙ্গারাম গোয়ালার মেয়ে হয়ে নাকি তখন জন্মেছিল সতী। নাম তখন তার ছিল উমা। যুবতী উমা সই সয়লা সাথী-বান্ধবীদের সাথে ওই কুসমী নদীতে আসত জল নিতে। ওমনি কলসী কাঁখে, সার বেঁধে। বাঁশী শুনে শঙ্করের যেন রাধা হয়ে যেত উমা। রাখালিয়া বাঁশীর সুর এমন তন্ময় করে দিত তাকে যেন মনে হত তার পাথরে পাথরে ঠক্কর খেয়ে চলা কুসমী নদীর ওই ঝিরি ঝিরি ঝরনা ধারা যেন যমুনা নদী। পাড়ের ওই গাছ যেন কদম্ব-বৃক্ষ। আর সে বৃক্ষের ডালে-বসা শঙ্কর যেন শ্রীকৃষ্ণ। রাধা নামে সাধা বাঁশী যেন ডাকছে উমাকে বার বার,—এস সখী, কাছে এস মোর। বস পাশে রাই ওগো মাধব মন-চোর।

যেত উমা। উপল খন্ডে নূপুর-পরা পা দুটো ফেলে রিমিকি-ঝিমিকি পার হত নদীটা। শুনত বাঁশী গাছটার তলায় বসে তন্ময় হয়ে। চোখে পড়তে চোখ কৃষ্ণের ফুটে উঠত রাধার মুখে হাসি। সে হাসিতেই পড়েছিল শঙ্কর উমার প্রেমে। হয়েছিল ভাব। জন্মেছিল ভালবাসা। ভালবাসার টানেই একের সঙ্গে অপরের জীবন যুক্ত করে সার্থক করতে চেয়েছিল তারা তাদের প্রেমকে। কিন্তু পারেনি তারা। বিধি হয়েছিল বাম। ভাগ্য তাদের জীবনধারা বহিয়ে দিয়েছিল অন্যখাতে। কিন্তু প্রেম তো অমর। জন্ম-জন্মান্তর থাকে সে নাকি সত্তার গহন

গভীরে। সেই জন্মে শঙ্করের সেই প্রেমেরে স্মৃতিই জাগত নাকি এ জন্মে ভূতনাথের অবচেতন মনে তার ভোজুবন্ধুর ইটভাটায়। পড়ন্ত বেলায় দূর গগনের শুশুনিয়া পাহাড় উঁকি দিত তার মনে সেই রোটাস পর্বত রূপে। আর তার কোল থেকে বয়ে আসা গন্ধেশ্বরী নদী ডুবন্ত সূর্য্যের রঙ মেখে সেজে-দাঁড়াত যেন সেই কুসমী-নদী রূপে। অনুরূপ দৃশে হাতছানিতে ভূতনাথের মনের গহ্বরে চাপা থাকা শঙ্করের হৃদয় তখন উঠত যেন মাথা চাড়া দিয়ে। খুঁজত সে গন্ধেশ্বরীর বুক থেকে জল নিয়ে চলে যাওয়া সেই কলসী কাঁখে মেয়েগুলোর মধ্যে তার উমাকে, তার গত জন্মের প্রাণ-প্রিয়া প্রেয়সীকে। এরকমই নাকি হয়। সম-পরিবেশ বা সম-ঘটনা কখনও কখনও দোলা দিয়ে মনকে জাগিয়ে দেয় অনুরূপ কোন জীবনের স্মৃতি। সে স্মৃতি রোমন্থন করতে ভালবাসে মানুষের অবচেতন মন। চেতন মন হয়ত তার ধরা-ছোঁওয়া পায় না। পায় না খুঁজে তার কোন কারণ বা হদিশ। শুধু আভাসে তার ভাবের হাওয়ায় বিহ্বল হয়ে থাকে সে। থাকে আনমনা দিশাহারা হয়ে।

শুধু তাই নয়—অবচেতন মনের এসব ভাবনা-স্মৃতির ঢেও মাঝে মধ্যে চেতন মনকে এমন দেয় দোলা; তার অহেতুক ওসব ভাললাগা মন্দলাগাগুলো দিয়ে বাস্তব-মনকে সে এমন করে আন্দোলিত যে সে-অনুসারে মানুষ হঠাৎ হঠাৎ এমন সব কাজ করে বসে যার কারণ সে নিজেই বুঝতে পারে না। কোন খেই-ই খুঁজে পায় না সে তার এসব হটকারিতার। এই যে সৎ মানুষ হঠাৎ এমন কুকাজ বা অসৎ-কর্ম করে বসে যা নিজে কখনও কল্পনাও করতে পারে না—এই যে দুষ্ট-নষ্ট চরিত্রহীন ব্যক্তি সহসা এমন ওভ কাজ করে বসে যা হয় সব চরিত্রবানেরই আদর্শস্থানীয়—এর কারণ কি?

সতীর মতে এসবের কারণ হল নাকি অবচেতন মনের অতীত জীবনের স্মৃতি। সে-মনে ধরে রাখা সব বিগত জীবনের অভিজ্ঞতা—যার তরঙ্গ মাঝে-মধ্যে উঠে এসে ছুঁয়ে চেতন মনকে। ভাঙ্গে তার পাড়। হঠকারিতায় ফেলে তাকে করায় এমন সব কাজ-যা তার সাধারণ মন বা বাস্তব বুদ্ধিব চিন্তা-ধারনারও বাইরে। কমলা দেবীর গর্ভাশ্রিত রানী আসন্ন জীবনে পড়তে পারে হয় তো এমনি ভাবে বিগত জীবনের প্রভাবে। অবচেতন মনে তার এই আত্মহত্যার ছাপ চেতন মনের স্রোতে ভেসে উঠতে পারে হয়তো কখনও তার বাস্তব জীবনে। বিশেষ করে তাদের খিড়কি পাশের ডোবার পাড়ের ওই আম গাছটা, বিগত জীবনের স্মৃতি ধরে কখনও হয়তো তার মনের দুর্ব্বলতায় টানতে পারে তাকে অনুরূপভাবে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার দিকে। সুতরাং বাঁচিয়ে রাখতে হলে রানীকে তার আগত জীবনে, ফুটিয়ে রাখতে হলে জীবনে তার চাঁদ সুন্দর হাসিটি, টিকিয়ে রাখতে হলে কমলা দেবীর ওই [illegible]-ভরা আবেগ-মাখা মায়ের মুখের মিষ্ঠি-মধুর "মা-মা"—ডাকটি—বিশেষ এক কাজ করতে হবে তার ভূতুদাকে।

সে কাজ হল নাকি গাছটার ওই আকর্ষণ থেকে রানীকে রক্ষা করা। গর্ভাবস্থায় কমলা দেবী কখনও যেন ক্রোধ-ঈর্ষা বা লোভ-রোষের নজরে খিড়কি পাশের ওই আম-গাছটার দিকে না তাকায়। গর্ভাবস্থায় মা-বাপের শুদ্ধ মন, পবিত্র জীবন-যাপন, হাসি-খুশি শান্ত থাকা ভাবের উপর সন্তানের মানসিক গঠন নির্ভর করে। মাতা পিতার ষড়-রিপুজয়ী মনোভাবের উপরই গর্ভস্থ সন্তানের শক্তিশালী মন গড়ে উঠার অনেকখানি নির্ভর করে। গোরাচাঁদবাবু ও কমলাদেবীকে অনুরূপভাবে থাকার জন্য উপদেশ বা সাহায্য দান করলেই নাকি ভূতনাথের প্রকৃতউপকার করা হবে রানীর ওই ঝুলন্ত সত্তাটার। সার্থক হবে নাকি তার আত্মার জীবনে আসার উদ্দেশ্য। এ জন্মের ফলে হয় তো মুক্তিলাভও করতে পারে তার সত্তা।

তদেকান্তরত চিত্ত হয়ে এধারে ভূতনাথ শুনতে লাগল সতীর কথাগুলো ওধারে দৃষ্টিটা তার যেন রইল গাঁথা রানীর ঝুলন্ত অতিবাহিক দেহটার উপর। ইতিপূর্বেই বন্ধ হয়ে গেছল তার দেহের দোলনটা। স্তিমিত হয়ে গেছল তার দেহ বিচ্ছুরিত আভা। বালিকার মূর্ত্তিকে কমলা দেবীর দিকে তাকিয়ে থাকা চেহারাটা—যেটা পরিণত হয়ে গেছল ছোট গোলাকার একটা আলোক বলয়ে সেটা আবছা হতে আরম্ভ করল ভূতনাথের সামনে আস্তে আস্তে। ঝাপসা হতে হতে চোখে সেটা ক্রমশঃ হতেলাগল অস্পষ্ট। তারপর অদ্ভুতভাবে সেটা হয়ে গেল অদৃশ্য। মিলিয়ে গেল গাছটার শাখায়, প্রশাখায়, পাতায় ও আকাশে। আশ্চর্য্য-ব্যাপার!

(একুশ)

হতভম্ব ভূতনাথ। বিস্ময়-বিহ্বলচিত্ত তার। গলায় দড়ি দেওয়া রানীর সেই ঝুলন্ত মূর্ত্তি, সে মূর্ত্তির সুন্দর ছোট্ট একটা বালিকায় পরিবর্তন, সেই বালিকার মিষ্টি-মধুর হাসি-মাখা মুখ আস্তে আস্তে আবছা হতে হতে বিলীন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারগুলো যার পর নাই বিস্মিত করে দিল তাকে। অবাক করে দিল ভূতনাথকে আরো বেশী দেখল যখন সে রানীর শুধু আতিবাহিক দেহটাই নয় গাছশুদ্ধো খিড়কি, ডোবা এক কথায় সমস্ত পরিবেশটাই অদৃশ্য হয়ে গেল তার চোখের সামনে থেকে। অলৌকিকভাবে। তাজ্জব ব্যাপার।।

তাজ্জবের মাত্রাটা ভূতনাথের আরো গেল বেড়ে অবলোকন করল যখন সে নিজেকে। কি আশ্চর্য্য। সেই বেড়-বাড়ী-চৌহদ্দির ভিতর সে আর নেই। নেই অর্গলবদ্ধ গৃহের মধ্যেও। শুধু গোরাচাঁদ বাবুর শয়ন-কক্ষ নয় গোরাচাঁদ বাবু ও তার পত্নী কমলা দেবী, ঘুমন্ত-অবস্থায় শায়িত ছিলেন যারা তার সামনে শয্যার উপর—সবশুদ্ধো হাওয়া, উধাও। উধাও শুধু তারাই নন, স্বয়ং ভূতনাথও যে কোন অদৃশ্য আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে কখন, কিভাবে, এসে দাঁড়িয়েছে পাথর মুড়ি গ্রামের মাথায় সেই বাবা কাল-ভৈরবনাথের থানে—কে জানে! যথা পূর্বং তথা পরং সে। অর্থাৎ আদৌ ভূতনাথ কোথাও গেছল কি না, না সেখানেই দাঁড়িয়েছিল কিচ্ছু বুঝতে পারল না সে। চারধার তার সেই শূন্যতা। সেই অবিনাশ বাবুর কারখানা ছেড়ে আসা রিক্ত ডাঙ্গা। দূর-দূরান্তের গ্রাম-চৌহদ্দি ঘেরা ফাঁকা মাঠ ঘিরে তাকে থম থম-ছম ছম করছে পীচ ঢালা ঘন কালো অন্ধকার নিয়ে। কাল-রাত্রির করাল মূর্ত্তিতে জন-প্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের বুকে ডুবে আছে যেন একা। কোথায় গোপাল ডাঙ্গা কোথায় গোবরডাঙ্গা, কোথায় আশ-পাশের গ্রাম-গঞ্জগুলো, কোনোও হদিশ নেই তার। না দেখা যাক সে-সব, থাক বা না থাক ভূতনাথ কোথাও। যাক বা না যাক সে কোনখানে। ধরেই না হয় নিল সে যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই অর্থাৎ পাথরমুড়ির ভৈরব থানে দাঁড়িয়ে আছে সে। কিন্তু এতক্ষণ ধরে দেখল যেসব, কি সেগুলো? মহাশূন্যের বুকে ছায়াছবি? অন্ধকার দিগন্তে সিনেমার পর্দ্দায় চলচ্চিত্র? রানীর যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করল সে এতক্ষণ—সে সব কি তার এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা জাগ্রত অবস্থার স্বপ্ন? এসব কি তার হ্যালুসিনেশন? দৃষ্টি-বিভ্রম? মনোবিকার? চোখের সামনের প্রত্যক্ষ করা তার সব ঘটনাই কি মিথ্যা? মায়া মরীচিকা? আলেয়ার খেলা? আশ্চর্য্য তো। অদ্ভুত। অবাক!

ভাবতেই ওমনি তার পাশ থেকে ভেসে এল সতীর কণ্ঠস্বর,—না ভূতুদা, মনে করছো যা তা কিন্তু নয়।

চমকে উঠল ভূতনাথ। সেই চমকেই যেন চ্যাঙ্গা হয়ে উঠল তার মনটা। সতী তাহলে আছে তার পাশে। মিথ্যা হতে পারে হয়তো তার দেখা সমস্ত কিছু। কিন্তু সতী তাহলে সত্যি তার। বিস্ময়ের সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়া অবস্থাটাতে সতীর স্বরটাকে ভাসমান একটা কুটোর মত বড় আগ্রহের সঙ্গে, বড় আশার সঙ্গে যেন ধরল ভূতনাথ। তাকাল সে তার পুরো সম্বিৎ নিয়ে তার কথায় সতীর দিকে। সেই চোখ, সেই মুখ সতীর। সে মুখে হাসি মাখিয়ে তেমনি সরল সহজ সুরের জের টেনে তার কথায় বলে উঠল শাশ্বতী,—ভাবছো তুমি যা, তা কিন্তু সত্য নয় ভূতুদা। নয় তোমার দেখা, শোনা, কোনো কিছুই অলীক, অসম্ভব, অলৌকিক বা অবাস্তব। মরীচিকার মায়া, আলেয়ার খেলা বা স্বপ্নও নয় এসব।

বিস্ময়ভাব আমেজটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল ভূতনাথ। তারপর বলে উঠল সচেতনতার সঙ্গে, "—সত্যি বলছিস তুই? দেখা-শোনা কোনো কিছুই মিথ্যে নয় আমার? সব সত্যি? সব বাস্তব? সবই ঠিক?"

"—হ্যাঁ ভূতুদা।" সম্মতি-সূচকভাবে মাথাটা নেড়ে বলে উঠল সতী,—দেখলে তুমি যা-কিছু সবই সত্যি। আমি যেমন তোমার কাছে সত্যি—তুমি যেমন আমার কাছে মিথ্যে নও। নই যেমন আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে অলীক অবাস্তব, স্বপ্ন-মায়া। তেমনি তোমার যাওয়া, দেখা, শোনা, বলা, জানা ও বুঝা কোনো কিছুই মিথ্যে নয়। সবই বাস্তব। সমস্তই লৌকিক।

সতীর মুখটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল ভূতনাথ। সচেতন রাখতে লাগল মনটাকে সে এমনভাবে যেন আর ভূত-ভৌতিক বা কোনো অলৌকিকতার ঘোরে না পড়ে সে। বলে উঠল সতীর উত্তরে সে বেশ ভাব-গম্ভীর চড়া সুরে,—"বেশ, তোর কথা নয় মেনেই নিলাম। দেখলাম যা, শুনলাম যা-কিছু, সব

সত্যি, সবই বাস্তব। মায়া-মরীচিকা বা আলেয়ার খেলা নয়। কিন্তু ওসব দৃশ্য চোখের সমানে আমার উদয় হলই বা কি করে আর ওমনি ভাবে ওগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলেই বা কেন? ভূত-ভৌতিক কোন কিছু যদি না-ই হয় তবে নিশ্চয়ই এসব যাদুর খেলা। এখেলা দেখাবার আমাকে উদ্দেশ্যটা কি? আর উদ্ভট এসব দেখে আমার লাভটাই বা কি?"

শুনে সতীর উঠল মুখে ফুটে মৃদু-মুচকি মধুর হাসি। হাসি মুখেই বলতে লাগল সে তার ভূতুদাকে,—"ব্রহ্মপটে জগৎ-জীবনের কারো কোনো ছবি কোনোদিন একেবারে মুছা যায় না ভূতুদা।" যায় না কখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে জীবনের বয়ে চলা দাগ, ঘটনার রেখা বা কর্ম-কীর্তি-আচরণের আঁচড়। থাকে সব বর্তমান। মনের মধ্যে স্মৃতির মত ভূর্ভুবঃ এই উভয় লোকের মধ্যস্থলে। বেড়ায় ভেসে সেসব জগতের অণুকনায়। ক্ষেত্র বিশেষে আধারের টানে, কখনও কখনও মানুষের চেতনা বা অবচেতন মনের আকর্ষণে আকর্ষিত হয় ওসব স্মৃতিকণা এবং বিশেষ শক্তিতে হয়ে উঠেসব রূপবন্ত। প্রেতাত্মারা জীবনের নানা স্মৃতি ও ভাব নিয়ে এমনিভাবেই ভুবর্লোকের নিম্নস্তরে বেড়ায় ভেসে। তাদের মত সম-মনা কোন মানুষ পেলে বা সম-দরদী কোন হৃদয় পেলে বা সমভাবের তেমন কোন ভাবুক বা আশা অনুরূপ তেমন কোনো আধার পেলে ভাসমান তাদের স্মৃতির অণুকনাগুলোকে সংহত করে তারা রূপ ধারণ করতে পারে। পারে তারা শূন্যের প্রেক্ষাপটে তাদের জীবনের অতীত ঘটনাগুলোকে ওমনি ভাবে ভাসিয়ে তুলতে। বিদেহীদের এ বিশেষ ক্ষমতা আছে ভূতুদা। সুতরাং দেখলে তুমি যা, শুনলে তুমি যা কিছু—মিথ্যা নয়। নয় অবাস্তব বা যাদুবিদ্যার খেলা। নয় ওসব তোমার মনের কোন বিকার বা বুদ্ধিভ্রংশের ব্যাপার। নয় স্বপ্ন, নয় অবাস্তব বা অলৌকিক। দৃষ্টি-বিভ্রমও হয়নি তোমার। অতএব সংশয়, সন্দেহ ইত্যাদি যা কিছু জাগছে তোমার মনে তা কিন্তু ঠিক নয় তোমার ভূতুদা। ঝেড়ে ফেলে দাও ওসব অবিশ্বাসের কচকচানি মন থেকে তোমার।

কিন্তু সেই কথায় বলে না,—"যতই বল রাই কিশোরী, বুঝবে কি তোমার বংশীধারী?" সুতরাং যতই বলুক সতী তার ভূতুদাকে তুবও বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোদুল দোলায় দুলতে লাগল তার মনটা। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। টিক-টিক ঠিক-ঠিক। কি ঠিক-কি বেঠিক? অর্থাৎ তার সত্য কোনটা—মিথ্যাই বা কোনটা ভাবতে লাগল ভূতনাথ।

প্রচলিত একটা বাক ধারা আছে—

ঘোল মথলে মাখন ভাসে, মন মথলে কি?

ভাবনায় মন মথলে জাগে অতীত স্মৃতি।।

কথাটা সত্যি। তাই ভাবতে ভাবতে ভেসে উঠল ভূতনাথের মনে বাঁকাদহের তার সেই অতীত স্মৃতি। সেই গন্ধেশ্বরীর তীর—তীরে তার ভোজুবন্ধুর ইট-ভাটা। ইট-ভাটার পাশে সেই ঝুরি-নামা বুড়ো বট-গাছটা। তার তলায় সেই কাল-সন্ধ্যায় নির্জন ভাটায় এক লা সে। চারধার তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা ইটের গাদা, ঝামা ইটের স্তূপ, হড়কা ইটের পাঁজা। আর সেই পাঁজার কোলে, গাদার আড়ালে, ঝামার স্তূপে সেই ভৌতিক স্বর। স্বর মানে মীনার কণ্ঠ, ভোজুরগলা। পরস্পরের কথাবার্তা, তর্কাতর্কি, বাক-বিতণ্ডা। অথচ অদৃশ্য তারা। দৃশ্য হল হঠাৎ তার চোখের সামনে মীনা। তাও অদ্ভুত ভাবে, আশ্চর্য্য ও ভয়ঙ্কর রূপে! সামনের তার বটগাছটার ডালটা থেকে গলায় শাড়ীর ফাঁশ লাগিয়ে ঝুলছে সে। অর্থাৎ ঝুলছে তার মৃতদেহটা। দম-আটকানো বীভৎস চেহারা তার। মনে পড়তেই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ,—"আচ্ছা সতী, আমার দেখা শোনা সমস্ত কিছু যদি সত্যি হয় তাহলে—

"—বাঁকাদহে তোমার ভোজুবন্ধুর ইটভাটায় যা শুনেছ, যা দেখেছ সে-সব সত্যি কিনা" কথাটা ভূতনাথকে সমাপ্ত করতে না দিয়ে ওমনি হঠাৎ বলে উঠল সতী,—এই তো?

অবাক হল ভূতনাথ। ওভাবে তার মনের কথাটা বলতেই সতী ভেবা-গঙ্গারাম হয়ে গেল সে! মুখ দিয়ে তার আর ভাষা সরল না। হাসি-মুখে বলে উঠল সতীই,—কল্পনা-প্রবন নও যখন তুমি, ভাবের ঘোরে চল না যখন কখনও, অবাস্তব-অলৌকিকের ধার ধারো না যখন কোনো দিনই তখন তোমার ওসব শোনা, দেখা মিথ্যে হতে যাবে কেন ভূতুদা?

সতীর কথাগুলো যেন ঝাঁকরা দিয়ে উঠল ভূতনাথের মনটাকে। ভাবতে লাগল সে—তার সব শোনা-ই যদি সত্যি হয় তবে বাঁকাদহ গ্রামে যেয়ে তার বন্ধু ভজনলালের সম্বন্ধেশুনেছিল যে সমস্ত কুৎসা, রটনা, ঘটনা সব-ই তাহলে সত্যি! সত্যি তাহলে সে গ্রামের গোপাল ঘোষের মেয়ে মীনার সঙ্গে ছিল ভোজুর গোপন প্রেম, ছিল নোংরা ভালবাসা। যে ভালবাসায় ভুলিয়ে মেয়েটাকে বশ করেছিল সে। বশ করে তাকে তার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ভোগ করেছিল নিরালায়। প্রেম-পীরিতের অভিনয়ে টেনে এনে তাকে ইটভাটায় নষ্ট করেছিল তার নারীত্ব। এসব শোনা কেলেঙ্কারি তাহলে মিথ্যে নয়? নয় গুজব তাহলে বাঁকাদহের আঁকে-বাঁকে ছিটকে ফট্‌কে কানে আসা তার ভোজু বন্ধুর চরিত্র সম্বন্ধে নানা অকথা-কুকথাগুলো? তিলাবেদ্যাগ্রামের গাজন থান থেকে সেদিন ফেরার পথে ওই উন্মত্ত কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মুখে শুধু পড়ার জন্যই নয়—আসত মীনা প্রায়ই তাহলে তার ভোজুদার ইটভাটায়। আড়ালে, আবডালে, গোপনে—সকলের চোখে ধূলো দিয়ে। কখন ভোজুদা তার একলা থাকত ইট-ভাটায়, থাকতকখন একান্তে, নিরালায়—জানত মীনা সব। আর জানত বলেই আসত তার ঠিক সেই সময়টি ধরেই সে একলা। আসত ভর্ত্তি দুপুর বেলায়। কাকেও না জানিয়ে ঘরের সকলের দৃষ্টির অগোচরে খিড়কি দরজা দিয়ে লুকিয়ে। এসে মিলত দুজনে। তারপর দৈহিক মিলনের ফল ফলল যখন মীনার গর্ভে তখন চট্‌কিল ভোজুর প্রেম। বিরূপ হল ভজনলাল মীনার প্রতি। মীনা বিয়ে করে তাকে, করতে বলল ভোজুদাকে তার এ বিপদ থেকে উদ্ধার। দিতে বলল তাকে তার গর্ভের স্বীকৃতি স্বামী-স্ত্রী রূপে। শুনল না ভোজু, মানল না তার কথা। স্বীকার করল না তাকে। ফলে—এই অবস্থায় যা হয় তাই অসহায় অবস্থায় পড়ে অনন্যোপায় হয়ে যা কবতে বাধ্য হয় মেয়েরা তাই করল মীনা। অর্থাৎ গলায় দড়ি নিয়ে নাকি আত্মহত্যা করল সে ওই বট-গাছটার ডালে। সব শোনা কথা যদি সত্যি হয় ভূতনাথের তাহলে তো এসমস্ত কথাও সত্যি? সত্যি তার বন্ধু ভজনলাল ছিল একটা লোফার, লম্পট, চরিত্রহীন, অসৎ ব্যক্তি। শুধু তাই নয়—সে একজন খুনী। কারণ মীনার মৃত্যুর জন্য সে দায়ী। সে মীনাকে ওভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে না দিলে সে মরত না। থাকত বেঁচে সে জীবনে।

"—ধারনা তোমার মিথ্যা নয় ভূতুদা।" হঠাৎ ভাবনার মাঝে তাকে চমকে দিয়ে বলে উঠল সতী, "—তোমার বন্ধু ভজনলাল ভিক্ষে—ভাই তোমার হয়েছিল ঠিকই কিন্তু প্রকৃত সুহৃদ তোমার হতে পারেনি। সম-চরিত্রের, সম-স্বভাবের হতে পারেনি সে তোমার। কিন্তু থাক-গে ওসব কথা। পরনিন্দা পরচর্চা চিত্তের কুষ্ঠব্যধি ভূতুদা।

কিন্তু সে বললে কি তার ভূতুদা শুনে? ফালতু কথা বলে যে এদ্দিন গ্রাহ্য করেনি ভোজুর ওসব কেচ্ছা-কাহিনী, গুজব বলে যে এতদিন উড়িয়ে দিয়েছিল তার সমস্ত কুৎসাগুলো—সে বন্ধু তার সৎ-স্বভাবের মুখোশ পরেছিল কি করে তার কাছে? সঙ্গে থেকে, মিশে, ঘুরেও সে তার তিলমাত্র পায়নি কোন আভাস এসবের! বড় কৌতূহল হল ভূতনাথের। জানতে বড় ইচ্ছা হল তার এভাবে ভোজুবন্ধু তার অসৎ পথে গেল কি করে? মেয়েটার সঙ্গে হলই বা কি করে তার ভাব? আর চরম সর্বনাশ তার করলই বা সে কোন হৃদয়ে? কোন মনে সে করল মীনার প্রতি এমন বিশ্বাসঘাতকতা? বদমাশটার আগা-গোড়া সব কিছু জানতে হবেই তাকে। আর জানে যদি তার সেসব কথা সতী তবে বলতেই হবে তাকে ভোজুর সমস্ত কীর্তি-কলাপ।

বেয়াড়া গোঁ ভূতনাথের। জানে সতী—তার ভূতুদার মাথায় একবার কোন কৌতূহলের চঙ্ চাপলে সম্যক তা অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত ঝোঁক সে ছাড়ে না কিছুতেই। সুতরাং বাই যখন চেপেছে তার তখন বলতেই হবে সতীকে তার ভজনলালের সব কথা—নইলে স্বস্তি নেই তার।

তাই শুরু করল বলতে সতী তার ভূতুদাকে মীনা-ভজনলালের প্রণয় কাহিনী। তাদের প্রেম-পীরিত আর ভালবাসার কথা। এ জগৎ সংসারটার ভিতরে ফল্গু-ধারার মত মনে হয় অদ্ভুত একটা নিয়ম আছে। সে নিয়ম হল এ জগতে কাঞ্চন যেমন কামিনীকে টানে তেমনি কামিনীও মনে হয় কাঞ্চনের আকর্ষণে আকর্ষিত হয়। ভাটার টাকায় ফেপে ফুলে উঠতেই মন গেল ভজনলালের নারীর দিকে। চোখে পড়ল মীনা। মীনা কুমারী তখন ফুল্ল-যৌবনা। যেন ফুটন্ত পদ্ম। ভজনলালের ইট ভাটার পাশেই ছিল নদীর ঘাটটা। সেই ঘাটেই গ্রামের সবাই আসত নদীতে খাবারের জল নিতে। আসত মীনাও। আসত সে তার সই সয়লা সঙ্গিনী বান্ধবীদের সাথে

কলসী কাঁখে, দল বেঁধে, সার (লাইন) দিয়ে। তাদের যাওয়া-আসার পথটা ছিল ভোজুর ভাটার-কুঁড়েটার পাশেই। দল বেঁধে তাদের টুসুগান, ভাদুর সুর, হিল-হিল খিল-খিল হাসি-মসকরা বাজাত প্রাণে বাঁশি ভজনলালের, জাগাত হৃদয়ে দোলা। মন-ভ্রমরা তার আঁখি-পাখা দুটো মেলে হতে চাইত তখন যেন বাঁধন ছাড়া বাধা হারা। উড়ে উড়ে ঘুরে-ফিরে গুণগুনিয়ে যাবার ইচ্ছা করত তখন তাদের মধ্যে। মানে তাদের মাঝ-দরিয়ায় ফুলেন্দু-কিশোরী মীনা-সুন্দরীর কাছে। কারণ তার মুখটাই টানত তাকে বেশী। উড়ে গিয়ে তাই কুমারীর মুখ-পদ্মে বসে মধু পান করার জন্য মনটা তার করত বড় আনচান। ইঙ্গিতে তাকে করতে লাগল আকর্ষণ। শুরু হল চোখে চোখে ইসারা। সে ইসারায় সাড়া পেল ভোজু। পেল সে মীনার চোখ টিপুনি, মুচকি হাসির ঝিলিক। গেল তার আগল খোলা। সে ইঙ্গিতের সূত্র ধরেই শুরু হল তাদের মনের ভাব বিনিময়। তারপর ইসারা একদিন পরিণত হল ঠারে ঠোরে কথায়, বাঁকা হাসির ভালবাসাবাসিতে। কথায় বলে পীরিতি কাঁঠালের আঁঠা লাগলে পরে ছাড়ে না। সুতরাং মীনার "যুবতী ধরম" আর রইল না। পড়ল মীনা ভোজুর ফাঁদে। ভালবাসার ছল-চাতুরীতে কব্জা করল ভজনলাল মীনাকে—পুরোপুরি। প্রেম-খাদে ভোজুর ডুবল মীনা। তারপর—

তারপর এসব ক্ষেত্রে সব প্রেমিকাই প্রেমিকের জন্য সচরাচর যা করে থাকে তাই করতে লাগল মীনা কুমারী। শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীরাধিকা আসত যেমন যমুনা পুলিনে—ভোজুকৃষ্ণের জন্য মীনা-রাধিকারও তেমনি যমুনা রূপ গন্ধেশ্বরী নদীর কিনারে হতে লাগল অভিসার। কখনও গোপনে কখনও প্রকাশ্যে। প্রকাশ্যে আসত মীনা নানা ছল করে। কখনও তাদের ধবলী গাইটা হারিয়ে গেছে বলে—তার সন্ধানে। কখনও ধবলীর বাছুরটা হারিয়ে গেছে বলে—সেটাকে খুঁজতে। কখন বা আসত সে নদী কিনারে তার ভোজুদার ইটভাটায় তাদের ঘরের ধাড়ি-ছাগলটা চরতে চরতে এখানে চলে এসেছে কিনা তার অনুসন্ধানে। আসত কখনও সে ছুতো করে সেই ধাড়ি ছাগলটার অবাধ্য বাচ্চাটাকে খুঁজতে। কারণ সেটা এমন বদমাশ যে ফাঁক পেলেই অন্য ছাগলের লেজুড় ধরে চলে আসে ওমনি নদীর এধারের পাড়টাতে। মাঝে-মধ্যে হেঁড়োলে তাদের ভেঁড়ি-বাচ্চাটা বা শেয়ালে তাদের হাঁসটা ধরে নিয়ে গেছে বলে লছ্না (ছলনা) করে ছুটে আসে সে নদীর পাড়ে। পাড়ের গাড়-গর্ত্তে, খালে-ডোবে হেড়োল-শেয়ালের আড্ডাখানা। সেখানে নাকি ওসব তারা ছুপিয়ে আনে, লুকিয়ে রাখে। তাদের এসব গুপ্তস্থানগুলো নাকি জানে মীনা। জানে তাদের সব ফন্দি-ফিকির। তাই নাকি সে খুঁজতে আসে ভজনদাব পাশের নদীর পাড়ের ওই ঝোপ-ঝাড়গুলোতে। এর সঙ্গে তো জল নিতে আসার ছল করে নদীর ঘাটে আসা তার আছেই। আছে নানা ছুতো ধরে দল ছেড়ে, সঙ্গীদের বাদ দিয়ে একলা, দেরী করে জল নিয়ে ঘরে যাওয়া। মাগো-মা! কত রঙ্গই না জানে মীনা। জানে কত ছল-চাতুরি—কারিকুরি। একেই বলে—চোরের চৌষট্টি বুদ্ধি। বুদ্ধিমানের নাকি নানা অজুহাত-অছিলার অভাব হয় না কোন দিন।

আসত শুধু নয়, ঢুকত ভোজুর ইটভাটায়। ইতিউতি সন্ধানী নজব ফেলে, চারপাশটা বেশ ভালভাবে দেখে নিয়ে করত প্রবেশ ভাটার মাথা-উঁচু ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটাতে। গিয়ে বসত সোজা তার একলা বসে থাকা ভোজুদার পাশটিতে। তারপর গুজুর-ফুসুর ফিসির-ফাসির হত কথা দু'জনে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হাসি হত কত-হি হি ফিক-ফিক। হোত কত মসকরা—হা-হা হো-হো। হাসাহাসি শুধু নয়—গলাগলি ঢলাঢলি চলত তাদের বেপরোয়া ভাবে। আবাব ঢলাঢলি শুধু নয়—স্বামীকে স্ত্রীব চা কবে খাওয়ানোব মত ভোজুকে মীনা নিজের হাতে কবে খাওযাত চা। খাওয়াতো খেতো। খেতে খেতে কত যে গাল-গল্পেব বইত তাদের ঝড় তার কি কোন ঠিক আছে? উচ্ছল চঞ্চল ভোজু-মীনা দিনের পব দিন এমন হযে উঠতে লাগল নির্লজ্জ বেপরোযা যে ভাটায লোকজনদের পর্য্যন্ত গ্রাহ্য কবতে ছেড়ে [illegible] তারা। এমনকি ইট কিনতে আসা খদ্দেব ইত্যাদি বাইরের লোককেও তাবা ভুলে গেল যেন তোয়াক্কা করতে। ভাটাব কুলি মজুর কামিন-মুনিস তাদেব তো থোড়াই কেয়ার। অবশ্য তাবা কাজেব মানুষ। খেটে খেতে এসেছে তাদের ইটভাটায। সুতবাং বাবু-সাব মালিক-বড়লোকের এসব কাণ্ড-কাববার হাসি-স্ফূর্ত্তি, আনন্দ দিল্লাগী দেখলে চলবে কেন তাদের? তাছাড়া জল নিতে আসা ওই মেযেটা আর বাবু পরস্পব তো ভিন গাযেব লোক নয। একই গ্রাম বাঁকাদহের ছেলে-মেযে তারা। পাড়া প্রতিবেশী। তাদের ওসব ঢলাঢলি, গলাগলি নিয়ে কথা বলতে গেলে তো হিতে বিপরীত হতে পারে? হতে পাবে হযতো খাল কেটে তাদের কুমীব আনা যদি তাবা ওদেব মিলন [illegible] মেশা নিযে গাঁয়ে

কাকেও লাগান-বাজান করে। সুতরাং কি দরকার তাদের নিজের পায়ে নিজের কুড়ুল মারা। তাই তাদের এসব ফাজলামি, বেয়াদপি দেখেও যেন দেখত না তারা। এড়িয়ে চলত তাদের হাসি-মসকরা। এমন কি এসব নিয়ে কোন চুক্‌লি কাটা বা নিজেদের মধ্যে কোনরূপ কানাঘুষা বা মুখ টেপাটেপি করা বা ঠারে-ঠোরে চিমটি কেটে ঘাটাঘাটি করার ধারে পাশে যেতনা তারা।

ভাটার লোকজন আর কুলি-কামিনদের এভাবে তাদের এড়িয়ে চলা, গ্রাহ্য না করা, কোন কিছু না বলা ইত্যাদি ব্যাপারগুলোই সুযোগ হয়ে দাঁড়াল রাই-কিশোরী ও বন-বিহারী মীনা-ভোজুর। গোপন প্রেমের ক্ষেত্রে যেন দাবার দান পেয়ে গেল তারা, "পয়ে বাবর তের"। মকা পেয়ে বেয়াল্লাপনা শুধু তাদের বেড়েই চলল যে তা নয়, পরস্পর পরস্পরের ব্যবহারেও তারা হয়ে উঠল বেহিসেবি। ধৈর্য্যের বাঁধ, সংযমের প্রাচীর ভাঙ্গল তাদের। সেই কথায় বলে না,—

"লাই পেলে গাই উঠে গাছে। আর বাই পেয়ে বানর মাথায় নাচে।।"—সেই হল ভোজু-মীনার।

স্বপ্ন দেখাতে লাগল ভোজু মীনাকে। দেখাতে লাগল সে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন, সংসার পাতার স্বপ্ন। সরলা মীনা সে স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভুলে গেল সব। গেল ভুলে সে তার ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান। নিজেকে সে সম্পূর্ণ ভাবে তুলে দিল ভোজুদার হাতে। খুলে দিল সে তার সমস্ত পাপড়িগুলি তার ভোজুদার সামনে। মন মজিয়ে মীনার, বিয়ের টোপ ধরিয়ে ভজনলাল করল তাকে বশ। আনল নিজের কব্জায়। তারপর সে তার নারীত্বে দিল হাত। ভাঙ্গল তার কুমারীত্ব। সরল বিশ্বাসে মীনা ভাবী স্বামীর কাম-লালসার লেলিহান শিখায় উৎসর্গ করে দিল নিজেকে—সম্পূর্ণ ভাবে। সেদিন যে তিলাবেদ্যার শিব-গাজনের মেলা থেকে সঙ্গী সাথীদের ফাঁকি দিয়ে ফট্‌কে চলে এসেছিল মীনা। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে আসার পথে পড়েছিল কাল-বৈশাখীর ঝড়ে। আশ্রয় নিয়েছিল তার ভোজুদার ইট-ভাটায়। সেটা শুধু কালচক্রে বা দৈব-দুর্বিপাকে পড়েছিল বলেই নয়। এমনিতেও সেদিন আসত মীনা। আসত কারণ ভোজুদা তাকে আসতে বলেছিল বলে। ভজনলাল ছিল সুযোগ সন্ধানী। কোন সুযোগ কেমনভাবে ব্যবহার করতে হয় জানত সে। তিলাবেদ্যার গাজন দেখার নাম করে মীনা যদি আসে তার কাছে। থাকে তার ভাটায়। তাহলে কেও কিছু এর টেরও পাবে না। এটাই ছিল কৌশালী ভজনলালের প্ল্যান। তার পূর্ব পরি-কল্পিত এই পরিকল্পনা মতই সেদিন এসেছিল মীনা তার প্রনয়াস্পদের কাছে। মেলায় যাবার সময় পারেনি সে ঢুকতে ইটভাটায় কারণ সই-সঙ্গিনীরা ছিল তার সাথে। তাই মেলায় গিয়ে গোলেমালে সাথীহারা হয়ে ফট্‌কে চলে এসেছিল সে তার ভোজুদার কাছে লুকিয়ে।

এমনি ভাবেই গোপনে আসার ফলে মীনা কুমারী কুন্তীর মত একদিন গর্ভে আনল তার কর্ণকে। প্রকাশ হয়ে পড়ল তার ভোজুদার কাছে গোপনে আসার ফল। তার মাথা ঘুরা, গা বমি বমি করা, লুকিয়ে টক-আচার, তেঁতুল খাওয়া ইত্যাদি নানা উপসর্গ দেখে জাগল মীনার বৌদিদেব মনে কেমন সমস্ত যেন সন্দেহ। এসব তো পোয়াতীব লক্ষণ! তাদের ভাবনা হল সত্যি। সর্ব্বনাশ। মীনা যে অন্তঃসত্ত্বা। হঠাৎ যেন বাজ পড়ল গোপাল ঘোষেব মাথায়। সংসারটায় হল যেন তার ভূমিকম্প। এসব ব্যাপার কি আর লুকোনো যায়? কিন্তু এত বড় সব্বনাশটা তাব করল কে? কে সেই হারামজাদা, নরাধম, নরকের কীট? কীর্তিমান সেই পুরুষ পশুটি কে? কে সেই পাষণ্ড যে এমনভাবে একটা মেয়ের মাথায় ঘোল ঢালতে পারে?

মীনা কিন্তু স্পিকটি নট। সেই কথায় বলে না—মেয়ে মানুষের বুক ফাটে তবু মুখ ফুটে না। তবে মীনা না বলুক, বাতাসেরও কান আছে, মনের না-বলা ভাবেরও একটা ভাষা আছে। সুতরাং বুঝতে আর বাকী রইল না তার বৌদিদের যে অবৈধ ভাবে মীনা-ননদিনীর গর্ভে এই ফলটি ধরাল কে? কিন্তু ভজনলাল হল গভীর জলের মাছ, তাকে ধরা এত সহজ নয়। আর ধরলেও সে হল মস্ত শয়তান। পাঁকের পাকাল মাছ। সুতরাং পিছলে পালাবার মত ক্ষমতা বা কৌশল আছে তার। এসব ক্ষেত্রে মেয়েরাই তো পড়ে বেশী বিপদে। বলা চলে নিজের থুতু নিজের গায়ে লাগান। ঘাঁটাঘাটি করলে আখেরে মীনারই বদনাম ছাড়া লাভ হবে না কিছুই। সুতরাং এ ব্যাপার নিয়ে ঢাক-ঢাক গুড-গুড না করে সব কিছু ধামা-চাপা দিয়ে চলাই উচিত। বুদ্ধিমানের কাজ হল গোপনে কাজ হাসিল করা। অর্থাৎ চট জলদি যেন তেন প্রকারেণ মীনার একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া। বিয়ের অবশ্য কথাবার্তা একটা চলছিল মীনার। বারুইপুরের বন-বিহারী বাসন্তের ছেলের সঙ্গে। এগিয়ে ছিল

কথাটা অনেকটাই। কিন্তু পণ-যৌতুক দেনা-পাওনার দর কষাকষিতে বন্ধ হয়ে ছিল তার গতি। সেটাই কোন রকমে জাগিয়ে তোলার জন্য খোঁচা দিতে লাগল মীনার বৌদিরা অপগণ্ড শ্বশুর ও তাদের উজবুক স্বামী দেবতাদের। খোঁচা তো নয়—যেন ব্রনে সূচ ফোটাতে লাগল তারা। সে কথার জ্বলনই আলাদা।

সবকথা কানে গেল ভজনলালের। লাইন করল সে মীনার বৌদিদের সঙ্গে। নূতন শাড়ীর টোপে গেঁথে বশে আনল তাদের। হাত করল হাতে কিছু টাকা দিয়ে। গহনার লোভ ধরিয়ে অনুরোধ করল দরদীদের—এ মুস্কিল তার আসান করে দিতেই হবে। আসান করা মানেই তো চটজলদি মীনার একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া। আর বিয়ে দিলেই তার অপকর্মের ফল গিয়ে পড়বে মীনার নব-বিবাহিতস্বামী-দেবতার ঘাড়ে। ব্যস কেল্লাফতে। মুক্ত ভজনলাল! সুতরাং লাগে যত টাকা দেবে ভজহরি। হোক মীনার বিয়ে। পাত্রস্থ করতে মীনাকে যে কোন রকমেরই ঝুঁকি নিতে হোক না কেন—নেবে ভজনলাল।

তবে আর কি! ভজনলালের কথাতেই বৌদিরা তার বুড়ো গোপাল ঘোষকে খোঁচা মেরে বলল চালাতে মীনার বারুইপুরের সেই ছেড়ে আসা সম্বন্ধটার কথা বলতে। স্বামীদের তারা যেন লেজ মলে চ্যাঙ্গা করে পাঠাল আবার সেই বনবিহারী বাবুর ছেলেটার সঙ্গে মীনার বিয়ের কথাবার্তাটার জের টানতে। দেনা-পাওনা, বরপণ ইত্যাদিতে কন্যাপক্ষ রাজি হতেই আবার এসেছিলেন পাত্রপক্ষ সেদিন বিয়ের কথা পাকা করতে গোপাল ঘোষের বাড়ী। গৌরি সেন অর্থাৎ ভজনলাল সেদিন সে বিয়ের কথায় উপস্থিত থাকতে বাধ্য হয়েছিল। তাই সে সেদিন সন্ধ্যায় ভূতনাথকে একলা ইটভাটায় রেখে চলে এসেছিল বাড়ী। বাড়ী আসতেই ভজনলাল ওমনি ভূতনাথের মাথায় উঠল চণ্ড। চঞ্চল হয়ে উঠল তার মন। চড় মেরে মায়াকে চলে আসাটা তার ঠিক হয়নি। না জানি কি অবস্থায় পড়ে আছে বেচারা সেই মেয়েটা। যে যাই বলুক বা যে যাই অপমান করুক তাকে—অন্যায় যখন করেছে সে তখন সকলের সামনে, মায়ার কাছে তার মাফ চাওয়াটা একান্ত উচিত।

উঠল বাই তো কটক যাই—সেই হল ভূতনাথের। অনুশোচনার তাড়ায় যে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তাকে। ভজনলালের ইট-ভাটা ছেড়ে নামল সে নদীতে। ধপধপে জ্যোৎস্নায় বালিভরা গন্ধেশ্বরীর বুকে পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলল সে উপত্যকা বরাবর বাড়ীর দিকে। থাকলে অবশ্য ভাটায় ভোজুবন্ধু তার ফিরে এসে কি বলত তাকে কে জানে। তবে সেখানে মীনার বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকাপাকি হয়ে গেছল। এমন কি শুভ-বিবাহের নাকি দিনও হয়ে গেছল ধরা। কিন্তু বেঁকে বসল মীনা কন্যা নাকি নিজেই। ঘোর আপত্তি তার—করবে না সে বিয়ে।

বিয়ে করবে না মানে? বৌদিরা তো রেগে আগুন। চিরকাল গর্ভটা কি তার ওমনি আঁচলা বেড়ানো, গাছ-কোমর আঁটা শাড়ী ঢাকা থাকবে? লোক জানাজানি হয়ে গেলে শুধু তার বাপ-ভাইদেরই মুখটা পোড়া যাবে না। গুষ্ঠিশুদ্ধো পূর্ব-পুরুষদেরও মুখে পড়বে চুণ-কালি। কেলেঙ্কারীর জন্মভূমিতে ছপছপ করবে গোটা বংশটা। সে কলঙ্কের ধাক্কা সইতে না পেরে বাপে নেবে হয়তো গলায় দড়ি আর তার দাদারা হয়তো ছুটবে ট্রেনে মাথা দিতে। নাংটা ননদের গোঁ-এর জন্য কি অকালে বিধবা হবে তার বৌদিরা? তার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য ভাল যে ছাড়া পাত্র আবার ফিরে আসছে। ছেঁড়া সুতোর আবার গিঁট বাঁধছে। ফেলা সম্বন্ধ আবার কুড়োনো যাচ্ছে। এ না হলে মুখপুড়ি মুখ ঢাকবে কি করে? তার লাজ রাখতে জায়গা হবে কোথায়? সুতরাং বিয়ে তাকে করতেই হবে।

কিন্তু না—শুনল না মুখপুড়ি। হল না রাজি কিছুতেই সে ও-পাত্রকে বিয়ে করতে। কাণ্ডজ্ঞানের মাথা খেয়ে এত বুঝানোতেও কেও যদি না বুঝে তবে মেজাজ ঠিক থাকে কারোও? বুড়ো বাপ গোপাল ঘোষ তো রেগে কাঁপতে লাগল থবথর। বৌদিরা তো দিন রাত গাল-মন্দে করতে লাগল মীনার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার। দাদারা তার আর সহ্য করতে পারল না। তাই বে-আক্কেলে ওই বুড়ো মেয়েটাকে রাগের চোটে দিল তারা ধা-কতক বসিয়ে। দমাদম-দমাদম।

দাদাদের সেই মারের জ্বালা নিয়ে গুলি-খাওয়া বাঘের মত মীনা এসে হাজির হল তার ভোজুদার ইট ভাটায়। অবশ্যই গোপনে এবং লুকিয়েই। সন্ধ্যেটা তখন সবেমাত্র একটু রাতে গড়িয়েছে। ভাটার "রাখা" বাগ্দী পাহারাদারগুলো তখন খেতে গেছে বাড়ী। তাই এসময়টায় যেমন একলা থাকে ভোজু তেমনি একলাই

ছিল সে। এটা জানত মীনা। তাই ঠিক এই সময়টাতেই এল সে হঠাৎ উটকো একটা ঝড়ের মত ঝাপটা মেরে তার কাছে। এল সে তার প্রেমিকের সাথে শেষ মোকাবিলা করতে। ফয়শলা করতে এল সে তার দয়িতের সঙ্গে শেষবারের মত। বুকে নিয়ে আগুন, মুখে নিয়ে জ্বালা, হৃদয়ে নিয়ে রাগ এল সে। কি মনে করে তাকে তার ভজুদা? সে কি বাজারের বেশ্যা, না তার কেনা বান্দি? রাখনি সে কি তার? টাকা দিয়ে সে তার বাবার মুখ বন্ধ করতে পারে, ভাটায় চাকরির লোভ দেখিয়ে সে তার দাদাদের ভুলিয়ে রাখতে পারে, নূতন শাড়ী পরিয়ে— গহনার টোপ ধরিয়ে সে তার বৌদিদের বশ করতে পারে। পারে সে তার ইচ্ছামত তাদের যা খুশি বলাতে বা করাতে। কিন্তু টাকা দিয়ে, গহনা-শাড়ী দিয়ে মীনার ইজ্জত সে কিনতে পারে না। বিয়ের আশা দিয়ে তাকে ভোগ করেছে যখন-তখন বিয়ে তাকে করতেই হবে। ফল ধরিয়েছে পেটে যখন তার তখন সে দায়িত্ব মীনা ফেলতে যাবে অপরের ঘাড়ে? লজ্জা করে না তার ভোজুদ্দার? জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে ছটফট করে মরছে সে— আর সে দেখছে মজা? এঁঠো করে তাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবে শেয়াল-কুকুরে ছেঁড়াছেঁড়ি করে খাবার জন্যে? কখ্খনও না। কোনমতেই না।

অর্থাৎ ভোজুর কুকীর্ত্তির বোঝা নিয়ে অপরের ঘরে কুলটা হতে যাবে না মীনা। দেবে না থাকতে সে সমাজের বুকে ভোজুদাকে তার সাধু হয়ে। কন্যাদায়গ্রস্থ গরীব বাপকে এভাবে ছলচাতুরীর মাধ্যমে উদ্ধার করে হতে দেবে না তাকে গন্যমান্য ব্যক্তি, মহাপুরুষ। শরীরটাকে যখন উচ্ছিষ্ট করেছে সে তখন এ এঁঠো দেহ মীনা পারবে না কিছুতেই অপরের পাতে তুলে দিতে। মন-প্রাণ-হৃদয় যখন সমর্পন করেছে সে তার ভজুদাকে তখন পর-পুরুষকে এ দেহ-মন-হৃদয় দিয়ে দ্বিচারিনী হতে পারবে না সে জীবনে। ভাবী স্ত্রীর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোগ করেছে সে যখন তার নারী-সত্তা তখন নিতেই হবে জীবনে তাকে এবং স্ত্রী রূপেই। অর্থাৎ ভজনলালকে মীনাকেই করতে হবে বিয়ে। মীনার যেমন তাকে ছাড়া অন্য কাকেও আর স্বামী রূপে বরণ করা সম্ভব নয়— তার ভোজুদারও তেমনি তাকে ছাড়া অন্য কাকেও ধর্মপত্নী রূপে গ্রহণ করা উচিত নয়। প্রাণ থাকতে মীনা পারবে না কিছুতেই অন্য কোন পুরুষের গলায় বরমাল্য দিতে। এ জীবন-মরণ পণ তার। ভীষ্ম-প্রতীজ্ঞা।

কিন্তু ভীষ্ম তো পুরুষ মানুষ। মীনা হল মেয়ে মানুষ, অসহায়। পুরুষ নির্ভর জাত্ হয়ে উচিত কি নারীর এভাবে কোন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা? ক্ষমতা কোথায় নারী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার? বিশেষ করে ভোজু শিকারীর হাতে পড়েছে যখন মীনা তখন সামর্থ কোথায় তার এভাবে মানসিক শক্তি অটুট রাখার? লম্পটদের কখনও হৃদয় বলে কোন পদার্থ থাকে না। থাকে না তাদের অন্তর বলে কোনো বস্তু। প্রেম থাকলে হৃদয়ে ভোজুর তবে তো সে বুঝবে তার প্রেমিকার অন্তরের আকুলতা। তাই মীনার সমস্ত আকুলি-বিকুলি, তার ভোজুদার কাছে কাতর প্রার্থনা সব হয়ে গেল অরণ্যে রোদন। তার মাথা ঠুকে অনুরোধ-উপরোধ সব ভজনলালের পাষাণ প্রাণটাতে ঠোক্কর খেয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। গেল তার ব্যর্থ হয়ে সমস্ত আশা ভরসা।

সেদিনের সেই মীনা-ভোজুর কথা কাটাকাটি, বাত-বিতণ্ডাগুলোই নাকি শুনেছিল ভূতনাথ নির্জন সন্ধ্যায় ভোজুর ইটভাটায় একলা যেয়ে। কাল সন্ধ্যায়, বিশেষ বিশেষ তিথি-নক্ষত্রের যোগে কাল-রাত্রিতে একরূপ শক্তির অধিকারী হয় ভূত-প্রেত পেত্নী-পিশাচগুলো। ফেলে আসা মানবজীবনের তাদের ভাললাগা মুহূর্ত্তগুলো বিশেষ সেই শক্তিতে টেনে এনে ক্ষেত্র বিশেষে তারা রূপবন্ত করতে পারে। পারে প্রথমে তন্মাত্রার শব্দ শক্তিকে আকর্ষণ করে তারা তাদের পার্থিব জীবনের বিশেষ কোন অতীত পর্য্যায়কে টেনে আনতে। তারপর পারে তার সূত্র ধরে আস্তে আস্তে রূপ তন্মাত্রায় নিজেদের প্রতিভাত করে তুলতে। স্মৃতির টানে তাদের ছেড়ে আসা জীবনের যে কোন অতীত ঘটনাকে যেখান থেকেই তারা বাস্তবে রূপ দিতে আরম্ভ করুক না কেন— সেখান থেকেই কিন্তু পর পর ঘটনাগুলো তাদের আপনা থেকেই ধারার টানে চলতে থাকে। এ ধারা রোধ করার বা পাল্টে দেবার নীচাত্মাদের কোন সাধ্য থাকে না। তাই মীনার প্রেতাত্মা ভজনলালের ইটভাটায় তাদের ভালবাসার শুভ মুহূর্ত্তটাকে বাস্তবের পটভূমিকায় ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হলেও কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঘটনা পরম্পরার স্মৃতির টানে যেতে হয়েছিল তাকে তার জীবনের অন্তিম পর্য্যায় অর্থাৎ জীবনের বিষময় পরিণতির দিকে।

"—কি হয়েছিল তার জীবনের শেষ পরিণতিটা?" কথার মাঝে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

'—সে ছবি তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছিল ভূতুদা সেদিন সেই কাল-সন্ধ্যায়। গন্ধেশ্বরী নদীর নির্জন পাড়ে। তোমার ভোজু-বন্ধুর শূন্য ইট-ভাটায় সেই মাথা-ঝাঁকড়া বুড়ো বট-গাছটার ডালে।" বলে উঠল সতী।

অর্থাৎ আত্মহত্যা করেছিল মীনা। ফাঁশ লাগিয়ে গলায় সেই বট গাছটার ডালে ঝুলেছিল সে তার প্রেমিক ভোজুদার প্রত্যাখ্যানের আঘাত সহ্য করতে না পেরে। এই রকমই হয়। সে সমস্ত নারীরা পুরুষদের ছল-চাতুরি যাচাই না করে সরল মন নিয়ে বিশ্বাস করে তাদের, তারাই এভাবে হয় পুরুষদের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। এবং শেষে উদার, দুর্ব্বল-মনা অসহায়া, সরলা প্রায় সব মীনাস্থ এমনিভাবে ডেকে আনে জীবনের পরিণতি।

ভজনলাল অবশ্য অনেক বুঝিয়ে ছিল মীনাকে। বলেছিল তাকে যে বারুইপুরের পাত্রটার সাথে এটা তো শুধু তার লোক দেখানো একটা বিয়ে হচ্ছে। হচ্ছে বিয়েটা তার নিছক একটা সংস্কারের বশে। আসলে সে যেমন তার আছে ঠিক তেমনি থাকবে। বিয়ের পর তাকে সংসার করতে শ্বশুর বাড়ীও যেতে হবে না বা স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় কখনও শোতেও হবে না। আয়ান ঘোষের সঙ্গে শ্রীরাধিকার বিয়ে হলেও সে যেমন ছিল চিরকাল শ্রীকৃষ্ণেরই। ঠিক তেমনি নাকি মীনাও থাকবে তার কাছে চিরকাল ভোজু-প্রেম-বিলাসিনী তার সোহাগী শ্রীরাধা হয়েই। অর্থাৎ বিয়েটা হচ্ছে তার শুধু লোক দেখানো বা নাম মাত্র। তার ওই পেটে আসা কাঁটাটার কলঙ্কের হাত থেকে তাকে নিছক বাঁচাবার জন্য। চিন্তা নেই মীনার কোনো। এসব ব্যাপারে যা করার সব সেই করবে। করবে সে এসবের সব পাকাপাকি ব্যবস্থা। মীনা শুধু নিয়মরক্ষা একবার বিয়েটা করলেই খালাশ। তারপর নাকি ভোজুর বাসুকি-চালে বর যেমন একা এসেছিল তেমনি একা যাবে ঘর। মীনা থাকবে তার—সে থাকবে মীনার। যথা পূর্বং তথা পরং।

কিন্তু না! এমন গোঁয়ার-গোবিন্দ বেয়াড়া বেমক্কা মেয়ে মীনা যে কিচ্ছুতেই শুনল না সে তার ভোজুদার কথা। মানল না তার কোনো মানাই। উল্টে কথাগুলো যেন জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালা হল তার। জ্বলে উঠল মীনা যেন দাউ দাউ করে,—"মিথ্যুক, ধড়িবাজ, ধাপ্পাবাজ," ইত্যাদি যা মুখে আসতে লাগল তার তাই বলতে লাগল সে তার ভোজুদাকে—মুষল ধারে। যেন সে উদাত ফনা কাল-নাগিনী! তার সেকি ফোঁস-ফোঁসানি গর্জ্জন! "লজ্জা করে না তোমার জীবনটাকে আমার এ ভাবে নষ্ট করতে? শেয়াল-কুকুরের মত ইজ্জতটাকে আমার এভাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে একটুও সরম লাগে নি তোমার? এভাব আমাকে রক্ষিতা-রাখনী বাঁধা বেশ্যা, কেনা বান্দী করে রাখবার জন্যই কি সর্বনাশ করেছিলে আমার? লম্পট! বদমাশ।

সে কি উগ্র-চণ্ডা মূর্ত্তি মীনার! কাল-ভৈরবী চেহারা! তার সেই তেজ-ভরা মুখে, জ্বলন্ত গোলারূপ কথাগুলোর সামনে আর তিষ্ঠিতে পারল না ভোজু। যে বোকা-বেকুব মেয়ে টাকা কড়ি, শাড়ী-গহনা ধন-দৌলতের লোভেও বশ মানে না তাকে হাতের মুঠোয় সে রাখবে কি করে? তাছাড়া রাগে, ক্ষোভে, কান্নায় মীনার গলার স্বরটা উদারা-মুদার-তারা ছাড়িয়ে উঠছিল উত্তরোত্তর পঞ্চমের দিকে। উপচিয়ে ইট-ভাটা, ছাপিয়ে মাঠ যাচ্ছিল তার গলা ক্রমশঃ আশ-পাশ চৌহদ্দি পেরিয়ে তাদের গ্রামের দিকে। শুনলে কেও হয়তো আসবে ছুটে। এ অবস্থায় এসে জুটলে কেউ ইট ভাটায় মহা মুস্কিলে পড়ে যাবে ভজনলাল। একসঙ্গে কেও দেখলে তাদের হাটে ভাঙ্গবে হাঁড়ি। ডি-ডিপড়ে যাবে চার দিকে। মহাকেলেঙ্ক.রিতে পড়ে যাবে সে। সুতরাং এখন উপায় কি ভজনলালের? উপায় হল—"যঃ পলায়তি স জীবতী"। অতএব সেই হেংলা, বেয়াড়া, কথা না শোনা সেই নাছোড়বান্দা মেয়েটাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিয়ে ওমনি প্রায় ছুটে গিয়ে উঠল সে তার মোটর সাইকেলে। চট-জলদি স্টার্ট দিয়ে তার যানটাকে ধমকে বলে উঠল সে মীনাকে,—তোর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই আমার। গলায় দড়ি দিয়ে মর তুই এখানে হারামজাদী।

ধূলো ঝেড়ে মাটি থেকে উঠল যখন হারামজাদী তখন ধনুর্ধর ভোজু হাওয়া। মীনার সামনে তখন কতকগুলো উড়ন্ত ধূলোবালি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। হায় ভগবান। মন-প্রাণ উজাড় করে এতদিন ধরে ভালবাসল যাকে, তার কাছে পেল সে এই প্রতিদান! এই তার ভোজুদা। এই তার স্বরূপ। বেহায়াদের অশবা কোন লাজ-লজ্জার বালাই থাকে না—ঠিকই। কিন্তু একলা একটা অসহায় মেয়েকে কাল সন্ধ্যায় নির্জন ইট-ভাটায়, নদীর শ্মশানের পাশে এরূপ অবস্থায় ফেলে যেতে তার একটু বিবেকে বাঁধল না, সহানুভূতিটাকে সামান্য একটু নাড়া দিল না পর্য্যন্ত! ছিঃ ছিঃ। সামনের ধূলি-মাখা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আহতা হরিণী, দলিতা সর্পিণী মীনা তার বৃথা ফোঁস-ফোঁসানি টুকুকে সম্বল করে দাঁড়িয়ে রইল জনশূন্য ডাঙ্গায় পোঁতা একটা পাথরের মূর্ত্তির মত।

এতটা ভাবতে পারেনি মীনা। কল্পনাও করতে পারেনি কোনোদিন যে মিষ্টির মধ্যে এমন বিষ লুকানো

থাকতে পারে, পারে থাকতে কখনও এমন ফুলের হাসির মধ্যে বজ্র। ভালবাসার ভরসাতে যাকে মীনা-কুমারী তার যুবতী-ধরম উৎসর্গ করেছিল, করেছিল প্রেমের বিশ্বাসে সে যাকে তার মান ইজ্জত, লজ্জা-সম্ভ্রম সমর্পন সে এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে—হতে পারে এতটা কঠোর হৃদয়, নীরস পাষাণ জঘন্য একটা নরকের কীট। মানুষ চিনতে ভুল করেছিল মীনা। পুরুষের প্রেম যে নিছক ছলনা ছাড়া কিছু নয় বুঝতে পারেনি সে। পারেনি কোন দিন সে ধারনা করতে যে তার ভোজুদা হবে তার ভাটার ইটগুলোর মতই এমন নিরেট ঝামা, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। কোন প্রাণে সে তাকে রাত আঁধারে, শ্মশান পারে নদীর পাড়ে, ভয়পূর্ণ ভীতিজনক জনশূন্য এই ইট ভাটাটায় একলা ফেলে চলে গেল? গেল চলে সে কোন হৃদয়ে তার ভরসায় আঁকড়ে থাকা, তার আশায় আস্থাবান হয়ে থাকা অসহায়া একটা মেয়েকে এমন ভাবে পরিত্যাগ করে? মন-প্রাণ-অন্তর-হৃদয়ের কথা না হয় ছেড়েই দিল সে। কিন্তু সামান্য একটু মানবিকতা বোধ—সেও কি নেই তার? ছিঃ। ছিঃ ছিঃ—।

ভোজুদার চলে যাওয়া শূন্য মাঠটার দিকে তাকিয়ে বাক্যহারা মীনা হতাশ-বিষাদ অন্তরে রইল দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ ভোজুদার তার দলে যাওয়া অপমানটা দুমড়ে মুচড়ে একাকার করতে লাগল তার হৃদয় ও মনটাকে। কিংকর্তব্য বিমূঢ় মীনা চারধার থেকে ছেঁকে আসা অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে ঢুকরে ঢুকরে কাঁদল কিছুক্ষণ। তারপর আপন মনেই নিজেকে সে নিজে দিতে লাগল ধিক্কার। ভোজুদা'কে তার দিতে লাগল অভিসম্পাত। হা-হুতাশ ভরা জীবনটাকে তার বিড় বিড় করে বলতে লাগল কত কথা। হায় ডানা-ভাঙ্গা কপোতী, শূন্য মাঠে প্রলাপ বকলেই বা কি হবে—হবে কিই বা বৃথা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলে? আখের রস কষ সব চুষে খেয়ে ছিবড়ে করে সেটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। কেও কি আবার নেয় কখনও সেটাকে কুড়িয়ে মাটি থেকে? লম্পট ভোজুদা, স্বার্থপর ভোজুদা, রস চুষে খেয়ে তার ছিবড়ে করে ফেলে দিয়েছে তাকে মাটিতে। আর কি কখনও নেয় কুড়িয়ে তাকে জীবনে? কি প্রয়োজন আর মীনার তাকে? সে মরুক বাঁচুক, খালকে যাক, নদীকে যাক—বয়ে গেছে ভাবতে বা চিন্তা করতে তার।

কিন্তু মীনা এখন করবে কি? কোন আক্কেলে যাবে সে এখন ফিরে? ফিরে যাওয়া তো দূরের কথা যে অবস্থায় জীবনে এসে দাঁড়িয়েছে সে সেখান থেকে পিছনে মুখ ফিরিয়ে তাকানও তার পক্ষে অসম্ভব। হায় ভগবান। এই জন্যই করেছিল কি সে হরেক রকম ব্রত উপবাস? এর জন্যই করেছিল কি সে নানা বার পালন, কৃচ্ছসাধন, বিভিন্ন দেবতার সেবা-পূজা? এইজন্যই কি মীনা মনোমত পতি পাবার আশায় পশুপতিনাথ মহাদেবের মাথায় ঢেলেছিল জল? হায় বিধাতা।—এই লিখেছিলে তুমি মীনার কপালে? এই ভাগ্য, এই ভবিতব্য তার? সেই মুহূর্তে কত চিন্তার উড়ন-পাড়ন, কত ভাবনার ঢেও যে উথাল পাথাল করছিল মীনার অন্তরটাকে তার কি কোন ঠিক আছে?

সেই চিন্তা-ভাবনার ঝড়ের মাঝেও নানা ভাবে মীনা বোধ-প্রবোধ দেবার চেষ্টা করল তার মনটাকে। কিন্তু মানল না তার অবোধ মনটা। অদৃষ্ট, বিধিলিপি সেকেলে কথার কোনো বুলিই ধরল না তার মন-ময়না। কি ধাতুতে যে গড়া ছিল মীনার মনটা কে জানে। কোনো কিছুতেই বুঝল না সে। অবশ্য বুঝা মানেই তো সেই বিয়ের পীড়িতে গিয়ে বসা। আর বিয়ের পীড়িতে গিয়ে বসা মানেই তো সেই ভোজুদাকে ছেড়ে বারুইপুরের বরটার গলায় বরমাল্য দেওয়া। আর বরমাল্য দেওয়া মানেই তো তার একজনের ভোক্তা দেহটাকে আর একজনের ভোগে লাগানো। তার উচ্ছিষ্ট নারী সত্তাকে আর একজনের সেবায় দেওয়া। সব কিছু গোপন করে পেটে ভোজুদার নিষ্ঠুরতার বীজটাকেনিয়ে অপরের শয্যা সঙ্গিনী হতে পারবে না সে। পারবে না অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করা স্বামীর সংসারে গিয়ে পরের বিষবৃক্ষটাকে বাড়িয়ে তুলতে! অসম্ভব। এত বড় পাপ, এত বড় অন্যায় করতে কখনও পারবে না মীনা। পারবে না কখনও জীবনে সে অপরকে এভাবে ধাপ্পা দিতে—ঠকিয়ে চলতে।

কিন্তু না পারলে করবে এখন কি মীনা? কোন মুখটায় যাবে ফিরে সে গ্রামে? কোন মূর্তিটা নিয়ে দাঁড়াবে গিয়ে সে ঘরে? সকলের সামনে দাঁড়াবে সে গিয়ে কোন চেহারায়? বিশেষ করে সই-সয়লা বান্ধবীদের কাছে? জানত যারা ভোজুদার সঙ্গে তার প্রেম-ভালবাসার কথা। তাকে ভোজুদার ভাবী স্ত্রী ও ভোজুদাকে তার ভাবী স্বামী ধরে নিয়ে করত যারা তার সঙ্গে নানা হাসি-মসকরা, ঠারে-ঠোরে ইসারা-ইঙ্গিতে বলত যারা কত কথা,

মাঝে-মধ্যে এ নিয়ে বইয়ে দিত যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপের তুফান; ইয়ার্কি ফাজলামির ঝড়; চোখ টেরা-টেরি মুখ টেপাটেপির বন্যা, লজ্জা রাঙ্গা গোমড়া মুখে শুনতে এসব না ভাল লাগায় ভান করলেও মীনা—বড় ভাল লাগত তাদের এসব গলাগলি ঢলাঢলি ঠোঁট-নাড়া-নাড়ি কথা— তাদের সামনে মীনা দাঁড়াবে গিয়ে কোন বদনটা নিয়ে? সেই হাসি-আনন্দ পুলক ভরা মুহূর্ত্তগুলোর কি জবাব দেবে সে তাদের কাছে?

সত্যি,—জীবনে বোধ হয় সব আঘাত সহ্য করা যায়, কিন্তু প্রেমের আঘাত সহ্য করার যায় না। অসহ্য প্রেমের প্রত্যাখ্যান। অসহনীয় ভালবাসার অবমাননা—অমর্য্যাদা। না, এ-ক্ষত নিয়ে সে থাকবে না আর জীবনে। এ দগদগে ঘা নিয়ে সে আর যাবে না ফিরে বাড়ী। দেখাবে না আর সে তার পোড়া মুখটা সাথী-সঙ্গী বান্ধবীদের কাছে। মরবে সে। মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় নেই তার।

কিন্তু মরবে সে কেমন ভাবে? ভাবতেই হঠাৎ ওমনি তার ভালবাসার দ্রষ্টা, প্রেমের সাক্ষী ভাটার, সেই বটগাছটার উপর থেকে যেন উড়ে এল একটা কণ্ঠস্বর,—কেন, গলায় দড়ি দিয়ে।

কিন্তু দড়ি সে পাবে কোথায়?

—কেন, পরনের ওই শাড়ীটা।

কিন্তু শাড়ীটা বেঁধে গলায় ঝুলাবে সে কোথায়, কোনখানে?

"—কেন? এই বট-গাছটার ডালে।" সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল তার উত্তর নিকটের ওই বটগাছটার উপর থেকেই। আর সেই সঙ্গে এল একটা দমকা হিমেল হাওয়া। হাওয়া তো নয় যেন ঠাণ্ডা হাতের ছোঁওয়া। সে স্পর্শ কে যেন তার বুলিয়ে দিল সমস্ত গায়ে, পিঠে, মাথায়—ফুর ফুর শুড়শুড়।

বাস—কেমন যেন হয়ে গেল মীনার মনটা। এক রকম যেন ঘোরে পড়ে গেল সে। সেই ঘোরেই হল সে বেহাল বেবশ, বেহুঁশ। তখন আর অন্য কোনো দিকে কোনো খেয়াল গেল না তার। মনে হতে লাগল তখন তার যে ভেসে আসা ওই কথাগুলোই একমাত্র সত্যি। আর সব মিথ্যা। তার মনের কথাই বলছে যে তাকে নিকটের ওই বট-গাছটা। এই বটগাছটাই তো সাক্ষী ভোজুদার সঙ্গে তার প্রেম করার। এই বৃক্ষ-দেবতাই তো মূল দ্রষ্টা তাদের ভাব ভালবাসার। প্রেমের মোহে ভালবাসার বন্ধনে মিলেছিল যখন সে তার ভোজুদার সঙ্গে তখন এই বট-গাছটাই তো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তাদের সোহাগ-স্পর্শ। সুতরাং তাদের এই ভালবাসার ক্ষেত্রে মরলেই উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে তার ভোজুদাকে। এই ইট-ভাটাতেই করলে সে আত্মহত্যা উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হবে তার। দেখবে যখন এসে সে যে তাদের প্রেম-ভালবাসার সাক্ষী-স্বরূপ এই বট-গাছটার ডালে ঝুলছে তার মীনার লাশটা তখন গালের মত চড পাবে তার প্রাণের ভজনলাল। সমুচিত শিক্ষা পাবে সে তাকে প্রত্যাখ্যান করার।

মৃত্যুচিন্তা এমন ভাবে বেবশ কবল মীনাকে যে জ্ঞান-বাদ্ধ বোধ-বিবেক সমস্ত কিছু গুলিয়ে গেল তার। সে যে এক অদৃশ্য-শক্তির ইচ্ছায় চলছে—চলছে এক অলৌকিক শক্তির ইঙ্গিতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে খেয়ালে রইল না তার। গেল সে বট-গাছটার কাছে। খুলল সে তার পরনের শাড়ীটা। লাগাল সে তার গলায় ফাঁশ। সেই ফাঁশ নিয়ে মীনা চড়তে লাগল সেই বট গাছটার। উঠে বসল সেটার উঁচু একটা ডালে। ডালে বসে সে বাঁধল শক্ত করে তার গলায় ফাঁশ লাগানো শাড়ীটার বিপরীত প্রান্তটা। তারপর কার যেন সে ইসারায় বা ইঙ্গিতে ঝুলে পড়ল হঠাৎ সেই হেলে পড়া ডালটা থেকে। এভাবেই নাকি আত্মহত্যা করে মীনা শেষ করেছিল তার আশার আশা ভালবাসার জীবনটাকে।

"—ছি ছিঃ!" শুনেই ওমনি ব্যথাহত সুরে বলে উঠল ভূতনাথ,—এভাবে মীনা মরতে গেল কেন? কেন সে ওই বদমাশ ভোজুটার দিল না মুখোশটা খুলে সকলের সামনে? সব কিছু গোপন না রেখে ফাঁশ করে দিল না কেন সে ওই লম্পটটার তার উপর লটঘটে কাণ্ডগুলো? মুখ বুজে বাপ-ভাইদের মার ধমক সব সহ্য না করে কেন সে সোচ্চার হতে হয়ে উঠল না ওই চরিত্রহীন পাষণ্ডটার উপর চরম প্রতিশোধ নিতে?

কথায় কথায় উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়তে লাগল ভূতনাথ। একদিকে মীনার প্রতি সহানুভূতি অপরদিকে তার বোকামির জন্য রাগ—ঠিক যেন উন্মত্ত টাইফুনের জল ঝড়ের মত চালাতে লাগল মাতন তার মনটাতে। অন্তরের সেই তাণ্ডবের মুখে ঝাপটা মারা কথাগুলো তার বেরুতে লাগল বেশ ঝাঁঝাল গলায় — এত ভয়

কাতুরে মিনমিনে মেয়ে ছিল যদি মীনা তবে ওভাবে গোপনে তার প্রেম করতে যাওয়ার দরকার কি ছিল? সাহস যদি না ছিল তার তবে গেছল কেন সে ওটাকে ভালবাসতে? ইজ্জতটাকে নিয়ে যখন তার ছিনিমিনি খেলতে চাইল নরকের ওই পশুটা তখনও বুঝতে পারল না সে ভোজুর প্রেমের স্বরূপটা? বিয়ে না করে ভালবাসার ভান করতে লাগল যখন ওই বেয়াদবটা তখনও কেন ফাঁদে পড়া তার শিকারের মত রইল নিশ্চুপ হয়ে ওই মেয়েটা? রটিয়ে দিয়ে তার কাণ্ডগুলো বিয়ে করতে বাধ্য করাল না কেন সে ওই বদমাশ-লম্পটটাকে।

ভূতুদার ক্রধোন্মও কথা-বার্তার মাঝে দাঁড়িয়ে রইল সতী ধীর স্থির শান্ত হয়ে। যেন সে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মাঝে মৈনাকের চূড়া। সে চূড়ায় বিচ্ছুরিত হল কিছুক্ষণ পর হাসির ঝিলিক। সব কথা শুনে ভূতুদার তার সেই হাসির ঝিলিক-লাগা মুখে বলে উঠল সতী,—প্রেমের অমর্য্যাদা না করলে হয়তো মীনা পেত তার জীবনে প্রেমিককে। ভালবাসার অবমাননা না করলে হয়তো ভজনলাল বাধ্য হত একদিন প্রেমিকাকে তার বিয়ে করতে। কিন্তু মীনা প্রেমের পবিত্র পথ আঁকড়ে থাকতে পারেনি ভূতুদা। পারে নি সে ভালবাসার আদর্শকে জীবনে ধরে রাখতে। আত্মশ্রদ্ধাকে অটুট রেখে যদি সে—

—কি সব আজে-বাজে বকছিস? এসব তোর উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ফেলার মত কথাবার্তা। প্রেমের অমর্য্যাদা কে করল শুনি? মীনা, না ওই লোফার-লুচ্ছার ভজনাটা? ভালবাসার অবমাননা ওই বাঁদরটাই তো করেছিল।

"—করলেও উচিত ছিল মীনার প্রেম-ভালবসার প্রকৃত আদর্শ থেকে নিজেকে কোনমতেই চ্যুত না কর।" নম্রসুরে বলতে লাগল সতী, ভূতুদা'কে,—ভালবাসা ভগবানের দান ভূতুদা। স্বর্গীয় বস্তু হল প্রেম। তাকে অসংযমের পথে দৈহিক নীচ কামনা-বাসনার মধ্যে ফেলে অপবিত্র করতে নেই। প্রকৃত প্রেমিকা কখনও তার প্রেমাস্পদকে অন্যায়, অধর্ম, অপকর্মের পথে যেতে দেয় না। সে তাকে সদা-সর্বদা পবিত্র রাখার চেষ্টা করে। তাকে সৎপথে, ধর্মপথে চলবার জন্য মনে-প্রাণে সহায়তা দান করে। জীবন দিয়েও সে তার প্রেমিকের স্বভাব শুচি-শুদ্ধ, প্রকৃতি পবিত্র নির্মল রাখার চেষ্টা করে। চরিত্রকে তার কখনও সে কলঙ্কিত করতে বা কালিমা লিপ্ত হতে দেয় না।

"—কি সব বড় বড় কথা বলছিস তুই?" বিরক্ত হয়ে যেন বলে উঠল ভূতনাথ,—অসহায়, দুর্ব্বল একটা মেয়ে ওই লম্পট রাক্ষসটার হাতে যে অবস্থায় পড়েছিল, যে রকমভাবে ভুলিয়ে তাকে কব্জা করেছিল ওই লম্পটটা এবং একরকম জোর করেই সে যাকে করেছিল তার ভোগের সামগ্রী, পারত কি মীনা তখন তার মান-সম্মান রক্ষা করতে ওই পশুটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে? ভোজুর উন্মত্ত পাশবিক শক্তিটার কাছে তোর বলা মীনার ওই সমস্ত আদর্শ বুলিগুলো তপ্ত-খলায় তখন ভাজা খৈ-এর মত উড়ে যেত না?

নম্রস্বরে উত্তর দিল সতী,—প্রকৃত প্রেমের অসীম শক্তি ভূতুদা। পবিত্র ভালবাসার অপার মহিমা। অন্তরের শুদ্ধতায় সব অসম্ভবই সম্ভব হয়। প্রকৃত প্রেমের সাধনাতেই তো কুমারী উমা মহাযোগী মহেশ্বর শঙ্করকে করেছিল বশ। তার প্রেমের তপস্যাতেই তো দেবাদিদেব মহাদেব বাধ্য হয়েছিলেন উমাকে তার পত্নীরূপে গ্রহণ করতে। তোমার বন্ধু ভজনলালও হয়তো হোতো বাধ্য তেমনি মীনাকে তার জীবনে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে। কিন্তু মীনা তার প্রেমের তপস্যায় সংযমী থাকতে পারেনি ভূতুদা। পারেনি সে তার ভালবাসাকে শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র রাখতে। বিয়ে রূপ শুভ সংস্কারের পূর্বেই সে তার দেহটাকে দিয়েছিল তুলে ভজনলালের লালসার আগুনে। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যে দেহটাকে ভোগ করার তার ছিল ধর্মীয় অধিকার সেটাকে অবৈধভাবে তার প্রেমাস্পদের কামানলে আহুতি দিয়ে ওভাবে পাপাচারের সহায়তা করা বা অধর্মাচরণ করা উচিত হয়নি তার।

"—তুই কি বলতে চাস, সব মীনার দোষ?" প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল ভূতনাথ – ভোজুদার কোন দায় নেই? নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক সে? জানিস, ওটা কত বড় মিথ্যেবাদী? জানিস, ওই বদমাশটা দিনের পর দিন কি ভলটাই না আমার কাছে ঝেড়ে গেছে? মিথ্যে কথার ফুলঝুরি দিয়ে কত কায়দাতেই না ঢেকে গেছে সে আমার কাছে তার আসল স্বরূপটা? বড় বড় কথা বলে মুখে আদর্শের ফোয়ারা বইয়ে বোকা করে রেখেছিল সে আমাকে তার কাছে হামেশা। শুনলে অবাক হয়ে যাবি তুই—মীনার ওই তিলাবেদ্যার গাজন থান থেকে

ফেরার ঘটনাটা কি রকমভাবে সে ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে পবিত্র গঙ্গাজলের মত পরিবেশন করেছিল আমার কাছে। বলেছিল, ওই জল-ঝড়ের প্রকোপে পড়ে মীনা তার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল বলে গ্রামের লোকে নাকি তার নামে মিথ্যে অপবাদ রটিয়েছিল। বলেছিল মীনার ইট-ভাটায় আসা নিয়ে তাকে সবাই নাকি যা-তা কথা। কিন্তু সে নাকি মীনাকে নিজের মায়ের পেটের ছোট বোন ছাড়া অন্য কোন চোখে দেখেনি। কত বড় মিথ্যা কথা। কুলাঙ্গারটা যে সেদিন মীনার রক্ষক হয়ে ভক্ষক হয়েছিল ঘৃণাক্ষরেও সে কথা জানায় নি কোনদিন ভুলেও আমাকে। আভাসে-ইঙ্গিতেও দেয়নি তার কোন হদিশ। এমন ধূরন্ধর, এমন ধড়িবাজ, এমন শয়তান ওই ভোজুটা।

শুধু তাই নয় প্রসঙ্গক্রমে ভূতনাথ তার ভোজুবন্ধুর কত ধাপ্পা, কত ধোঁকাবাজির কারসাজিগুলো যে ঝড়ের মত বলে যেতে লাগল সতীর কাছে তার কোন সীমা-সংখ্যা নেই। আজ যখন সব পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে তখন তার ছল-চাতুরিগুলো প্রকাশ হয়ে যাওয়াই উচিত। ক্ষোভে দুঃখে অপমানে যেন ফেটে পড়তে লাগল ভূতনাথ। ক্রোধে যেন হতে লাগল সে অগ্নিশর্মা। সেদিন মীনার বিয়ের কথায় তাকে ভাটায় একলা রেখে যখন গেছল ভজনলাল তখনও যদি বেয়াদবটার এসব বদমাশি বা বাঁদরামির বিন্দু-বিসর্গও জানত সে তবে বাড়ী ফেরার পথে ভূতনাথ পা না বাড়িয়ে যেত বাঁকাদহে, মীনাদের বাড়ী। সেখানে মীনার বিয়ের কথা-বার্তা বলার আসরের মাঝে ফাঁস করে দিত তার সব কাণ্ড-কারবারগুলো। হাটে ভাঙ্গত হাঁড়ি তার। খুলে দিত তার মুখোশটা। বুঝিয়ে দিত সকলকে মীনার চট জলদি বিয়ে দেবার জন্য বাপকে যে তার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি—এ হল তার জুতো মেরে গরু দান। ডুবে ডুবে জল খাওয়াটা তার বের করে দিত চিরকালের মত যদি কণামাত্রও আভাস পেত সে তার ভোজুবন্ধুর ওইসব ফন্দি-ফিকির ও চালবাজির। ঘাড়ে ধরে বসাত সে ভজনলালকে বিয়ের পীড়িতে। এবং ওই মীনাকেই বিয়ে করতে বাধ্য করাত সে তাকে। এবং সেটাই হত তার উপযুক্ত শাস্তি।

পাষণ্ডটার কি মনাবিকতা বোধ বলেও একটু কিছু ছিল না। সহানুভূতি, বিবেক? বাস্কেলটা ভাবল না একটুও যে ফল ধরিয়ে মীনার পেটে তাকে যে পরের ঘাড়ে চাপাতে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে তার অবস্থাটা কি হবে? প্রকাশ হয়ে পড়বে যখন তার কেলেঙ্কারিটা তখন কি মুস্কিলে পড়বে সে। স্বামী-শ্বশুরের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, শাশুড়ী-ননদিনীর গাল-মন্দ. আত্মীয়-স্বজনের ঘৃণা-নিন্দা, দিন-রাত্রি কাঁটাব মত বিঁধবে তাকে। বাঁচা-মরা তখন সমান হবে তার। হয়তো পতির মার-ধর. নির্য্যাতন. অত্যাচার, আত্মহত্যাব দিকে ঠেলে দিবে তাকে। এসব বিষময় পরিণতির কথা একবারও তলিয়ে একটু চিন্তা করল না নরাধম ওই ভোজু-ভূতটা।

অবশ্য ওসব ভাবনা-চিন্তার মানুষ সাধারণত হয় না ওরা। কারণ লম্পট লুচ্ছাদের হৃদয়ে কখনও মানবিকতার বালাই থাকে না। নারী-দেহ-লোভী পশু ওবা। পাশবিক কামনা চরিতার্থতার পথে ওসব দয়া-মায়া, করুণা-সহানুভূতির ধাব ধারে না তারা। ছলে-বলে কলে-কৌশলে ভোগ করে নারীকে নরকের দিকে ঠেলে দেওয়াই হল তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মা-বোনের জাতকে এভাবে আস্তাকুঁড়েব দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেখে তারা মজা পায় মনে একরূপ আনন্দ, করে পাশবিক উল্লাস।

কিন্তু ভজনলালের শুধু দোষ ধরলে তো চলবে না, মেয়েটাও তো কম দোষী নয়। এত বড় ভুল জীবনে করতে গেল কেন মীনা? নারীর যদি নারীত্বটাই চলে গেল. জীবনে তাহলে তার বইল কি? বল-ভরসা-শক্তি-সাহস বলতে নারীর তো ওইটাই সম্বল। না জেনে-শুনে বিয়ের আগে ভজনলালকে তার আসল সত্ত্বাটা দিয়ে মীনা নিজের সবনাশ নিজে এমনভাবে ডেকে আনল কেন? পাষণ্ডটার স্বভাব-চবিত্র একবার চর্চে দেখল না! যাচাই করল না তার মন-প্রকৃতি, স্বভাবের গতি। মিথ্যা মোহে অন্ধ হয়ে বিশ্বাস কবল তাকে! বিশ্বাস করে বোকার মত করতে গেল সে ওই লম্পটটার পায়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ। ছিঃ- ছি ছি! এমন ভুল কখনও মানুষে করে?

"—যাকে তুমি যতটা দোষী বলে ভাবছো ভূতুদা আসলে কিন্তু সে ততটা দোষী নয়।" হঠাৎ ভূতনাথের চিন্তার সূত্র ধরে পাশ থেকে তার বলে উঠল সতী,—"সব কিছু তলিয়ে দেখতে গেলে কিন্তু তোমার বন্ধু ভজনলাল বা ভজনলালের প্রণয়িনী মীনা কুমাবী কাকেও তুমি দোষীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করাতে পারবে না তেমনভাবে।

"—তার মানে?" শুনে কথাটা সতীর অবাক-বিস্ময়ে ভ্রূ-কুঁচকে ওমনি জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ,— কি বলতে চাস তুই? আমি তোর কথার মাথা-মুণ্ড কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

"—সাধারণ অবস্থায় এসব বুঝা অবশ্য সম্ভবও নয় ভূতুদা।" বলে উঠল সতী,—তবে প্রকৃত পক্ষে বিচারকের আসনে বসে ঠিকভাবে যদি বিচার করতে যাও তাহলে কিন্তু আসামী-ফরিয়াদীর শুধু বাহ্যিক মনটিকে ধরেই বিচার করলে চলবে না ভূতুদা। যেতে হবে এ-স্থূলমনের গভীরে, তার সূক্ষ্মস্তরে। সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে সব কিছু, খুঁজতে হবে এসবের আসল কারণ।

কারণ বাহ্যিক মন ও চোখ থাকে তো তাদের স্থূল গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ অবস্থায়। তাই জ্ঞান-বুদ্ধি বিচার বোধ তাদের দৃশ্য জগতের বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু স্থূল জগতের বাইরেও একটা বিশাল জগৎ আছে ভূতুদা—অদৃশ্য জগৎ। এই অদৃশ্য সূক্ষ্মজগতের অধিবাসীরা অনেক সময় এই দৃশ্য জগতের মানব-মানবীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পরিচালিত করতে সমর্থ হয় তাদের আপন ইচ্ছায়। এ সব ব্যাপার স্থূল জগতের অধিবাসীরা হয়তো ধারনাও করতে পারে না। বাস্তবের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তারা যাকে যেমন ভাবে দেখে তাকে তেমনি তার কৃতকর্ম ও আচরণ অনুযায়ী পাপী-পুণ্যবান ঠাওরায়। দোষীগুণি ভেবে বিচার করে। কিন্তু তার কর্ম ও জীবনে চলার পিছনে যে অদৃশ্য শক্তির হাত থাকতে পারে তা ভাবা তো দূরের কথা হয়তো কল্পনাও করতে পারে না।

আশ্চর্য্য! অদ্ভুত কথা!!

কথাটা কিন্তু অদ্ভুত নয়। নয় এসব ব্যাপার আশ্চর্য্যেরও। অনেক সময় সূক্ষ্মজগতের আত্মিকরা স্থূল জগতের মানব-মানবীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এবং সে প্রভাবে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের বাস্তব জীবন-পথকে পরিচালিতও করতে পারে। এ ভাবে পরিচালিত হয়ে চলা মানুষের প্রারব্ধ-সঞ্চিত বা ক্রিয়ামান কর্মের ফল নয়। নয় এ কোন গ্রহের প্রভাব, বিধাতার লিখন, ভবিতব্য বা ভাগ্যের ফল। উচ্চ আত্মিকদের প্রভাবে পড়লে মানুষ উচ্চ চিন্তা, সৎ-কর্ম ও পুণ্যপথে পরিচালিত হয়। তেমনি নিম্ন আত্মিকদেব কবলে পড়লে সে নীচ চিন্তা, হীন-কর্ম ও অসৎপথের পথিক হয়। অবশ্য যে যেমন আধার অর্থাৎ যে মানুষের যেমন প্রকৃতি বা স্বভাব সে সেই স্বভাবের বা প্রকৃতির সূক্ষ্মাত্মাদের সচরাচর প্রভাবে পড়ে। সব সময় যে পড়ে বা সব মানুষেই যে পড়ে তার কোন মানে নেই। তেমনি সূক্ষ্ম স্তরের আত্মিকরা ইচ্ছামাত্রই যে যার-তার উপর নজর বা প্রভাব ফেলতে পারে তাও নয়। আধার আধেয় উভয়ের যেমন মতি-গতি-স্বভাব- প্রকৃতি এক হওয়া চাই তেমনি আবার উপযুক্ত তিথি-নক্ষত্র যোগ-ক্ষণও অনুকূল হওযা চাই। তবে উচ্চ আত্মিক অপেক্ষা নিম্নাত্মারাই মানুষের উপর প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয় নাকি বেশী। কারণ সাধারণত থাকে তারা ভূলোকেব ঠিক উপরে অর্থাৎ সূক্ষ্মলোকের গোড়ার স্তবে। জাগতিক কামনা-বসনায ভারী থাকে তাদেব সত্ত্বা। তাই উর্ধ্বলোকে যেতে পারে না। মনে নিয়ে পার্থিব লালসা তারা ভূ উর্ধ্ব সূক্ষ্মস্তবে ভেসে বেড়ায়। দেহহীন বলে দৈহিক ভোগ-লালসা শবা চরিতার্থ করবার জন্য সম-প্রকৃতিব সম-ভোগাকাঙ্খী নব-নাবীর উপর নজর ফেলে। এবং তাদের মাধ্যমে তারা জাগতিক ভোগকাঙ্খা, ইচ্ছা-বাসনা পবি-পূরণ কববার চেষ্টা করে। করে চেষ্টা সত্ত্বায় তাদেব জগৎ থেকে নিয়ে আসা ঈর্ষা হিংসা-ঘৃর্ণা-বিদ্বেষ ইত্যাদি মানসিক ব্যাধিগুলি দেহধারী অর্থাৎ মানুষেব মাধ্যমে চরিতার্থ করতে। ভূত-প্রেতাদি এসব নীচুস্তরের আত্মাবা মানুষের মনেব দুর্ব্বলতার সুযোগে ভিতবে কবে তাদের অনুপ্রবেশ। ঘোরাচ্ছন্ন কবে তাদেব মনটাকে। তারপর মানুষের দেহটা করে কব্জা। অর্থাৎ বেহুঁশ করে মনটাকে সেই মুহূর্ত্তে অপরের দেহের দেহী হয়ে তারা নিজেব ইচ্ছামত তাব দেহ-যন্ত্রটাকে পরিচালিত করার করে চেষ্টা। এই যে "ভূতে-পাওয়া", "প্রেতেব ভর কবা", অপ দেবতাব বাতাস লাগা", "উপদেবতাব হাওয়া পাওয়া" ইত্যাদি যেসবগুলো হয় বা শোনা যায় এগুলোই হল নাকি ওইসব ব্যাপার।

আসল হল মন। মানুষ যদি মনকে তাব কু-চিন্তা, অসৎ-ভাবনা, নীচহীন প্রবৃত্তির দাস করে রাখে তবে সে মন হয সচরাচব দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বল মনই নীচ-হীন প্রেতাত্মাদেব হয আকর্ষণের বস্তু। তারা মানুষের বিশেষ মুহূর্ত্তে ওই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে মানষেব মনে প্রভাব বিস্তাব করে। অবশ্য সবল মনা মানুষেবও অনুরূপ ভাবে হতে বা সূক্ষ্ম আত্মাদেব প্রভাবগ্রস্থ হতে দেখা যায। যাবা শুদ্ধ চিন্তার, সৎ ভাবনায পবিত্র সংকল্পে বা উচ্চ

ধ্যান-ধারনায় নিজেদের মনকে নিমগ্ন রাখে—তাদেরই মন হয় সবল। এই সবল মন অনেক সময় সৎ-সত্তা বা উচ্চ আত্মিকদের আকর্ষণের বস্তু হয়। "দেবতার ভর" "ঠাকুরে পাওয়া" "ঝুপাল আসা" "সন্ন্যাসী লগা ইত্যাদি যে সব কাণ্ড আমরা দেখে বা শুনে থাকি—এগুলো হল নাকি ওই রূপ উচ্চ-আত্মিকদের প্রভাবে পড়া ব্যাপার। বিশেষ মুহূর্ত্তে সবল মনের আকর্ষণে দেব-আত্মারাও মাঝেমধ্যে মানুষের দেহ আশ্রয় করে অবতীর্ণ হন। সাময়িকভাবে মনকে তারা একরূপ ঘোরে রেখে অপরের দেহকে তারা আশ্রয় করে ব্যবহার করে। অবশ্য নীচাত্মাদের মত তারা সে দেহের কোন ক্ষয়-ক্ষতি করে না, বা তাকে অধঃপাতের দিকে কখনও নিয়ে যায় না। সে দেহকে তারা সৎ-ধর্ম-ন্যায় পথে করে পরিচালিত। ওই সব উচ্চ-আত্মিক বা দেব-প্রতীম সত্তাদের কৃপা লাভ করলে নাকি জীবন ধন্য হয়ে যায়। পাপ কাটে, কর্মফল নাশ হয় এবং দয়ায় তাদের এক জন্মেই বহু জন্মের কাজ হয়ে যায়। তাই সতীর কথা হল কু-চিন্তায় বা বদ-ভাবনায় নিজেকে অসৎ পথে নিয়ে গিয়ে কখনও নিজের মনের লাগামটা ওইসব ভূত-প্রেত ইত্যাদি নিম্ন আত্মিকদের হাতে তুলে দিতে নেই। দিলে নাকি ফল হয় ওই ভজনলাল আর মীনা কুমারীর মত। এবং জীবনের পরিণতি হয় তাদেরই মত বিষময়।

"—অর্থাৎ তুই বলতে চাস," সতীর কথার মাঝে হঠাৎ বলে উঠল ভূতনাথ, "মীনা-ভোজুর এই যে জীবনের অধঃপতন এর জন্য দায়ী নাকি আসলে তারা নয়? এর পিছনে আছে ওইরূপ কোন অসৎ প্রকৃতির নীচ আত্মার প্রভাব? আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না সতী। সব কাণ্ডের কাণ্ডারী হল তারা আর এর জন্য দায়ী হল অদৃশ্য কোন এক অসৎ অশরীরী সত্তা? এ কি করে হয়?

"—এই রকমই হয় ভূতুদা।" বলে উঠল সতী,—নির্দোষ, নিষ্কলঙ্কভাবে চলার জন্যই তো মানুষকে বোধ-বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে উচ্চ কোটির জীব পাঠিয়েছেন ভগবান পৃথিবীতে। অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে সুন্দর ভবিষ্যতের চিন্তা নিয়ে সে যদি তার ওই জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা নিজের বর্তমান জীবনকে পরিচালিত করতে পারে ভূতুদা তাহলে সে অসীম শক্তির অধিকারী হতে পারে। পারে সে দেবতাদের চেয়েও মহীয়ান হতে। কোন দুষ্টশক্তি অসৎ আত্মা তার উপর তো কোনো প্রভাব ফেলতে পারবেই না উপরন্তু তার সৎ-চিন্তার স্পন্দনে উচ্চ ভাবনার তরঙ্গে ইহলোক পরলোকের অনেক সত্তার হয় উপকার। তাদের সংস্পর্শে মানুষই শুধু সৎপথে যায় না—অজ্ঞানতার ঘোর কাটিয়ে অসৎ আত্মারাও উর্ধ্বলোকে হয় গতিবান। আত্মস্বরূপ চিন্তনে হয় তারা নাকি উদ্বুদ্ধ।

কিন্তু মানুষ তার নীচ কামনা-বাসনা দ্বারা আধারকে অশুদ্ধ করে বলেই তো উচ্চ আত্মিকদের সু-নজর থেকে বঞ্চিত হয়। পাশবিক কামনা-বাসনায় যত সে মনুষ্যত্বহীন হয় ততই পড়ে সে নীচ আত্মাদের কু-দৃষ্টিতে। তাদের স্বার্থপরতা, আত্মসুখ ভোগেরচ্ছার সূত্র ধরে শয়তানরূপী প্রেতাত্মারা মনে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। টানে তাদের পাপ পথে—ঘটায় প্রমাদ। যে মন যত বেশী কাম-ক্রোধ লোভ ইত্যাদি ষড় রিপুর দাস হয় সে মন ততই হয় শক্তিহীন। এই দুর্ব্বলতার সূত্র ধরেই পাপাত্মারা ধরে মানুষের মনের রাশ। মানুষের আসল শক্তি ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য, সহনশীলতা নষ্ট করে মনকে করে তার উত্তেজনার বশ। উত্তেজনার বশে মানুষ হারায় তার বোধ-বুদ্ধি-জ্ঞান বিবেক, মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হয় তার ভূত-ভবিষ্যৎ সৎ ভাবনা-চিন্তা। এমন ঠুনকো হয়ে যায় মনটা তার যে সামান্য বাধা-বিপত্তিগুলোকেও সে জয় করতে পারে না। হতাশা-নিরাশার সূত্র ধরে দুষ্ট-নষ্ট আত্মহনন কারী প্রেতাত্মারা মনে জাগায় তার আত্মহত্যার ইচ্ছা। মীনার ওভাবে গলায় ফাঁশ লাগিয়ে আত্মহত্যার ওই ব্যাপারটা নাকি এই রকমই এক দুষ্ট পেত্নীর কবলে পড়ার ফল।

কিন্তু কথাটা সতীর মানতে ভূতনাথের দ্বিধাগ্রস্ত হল মনটা। তাই বলে উঠল সে,—ভোজুর প্রত্যাখ্যান তার বিশ্বাসঘাতকতা, ভালবাসার আঘাত কি এর জন্য দায়ী নয় বলতে চাস?

উত্তরে তার বলে উঠল সতী—জীবনে এমন কত মীনা যে ভালবাসার আঘাত, প্রেমের প্রত্যাখ্যান সয়েও বেঁচে আছে তার কি কোন ঠিক আছে ভূতুদা। পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেমের অপমান, ভালবাসার শেষ পরিণতিতে ঘৃণা-তাচ্ছিল্য অবমাননা নিয়েও টিকে আছে অনেক মীনা তাদের জীবনে। কেও আছে সাধিকা মীরা হয়ে, কেও আছে তার প্রেমিক রূপী দয়িত-কৃষ্ণের প্রেমের স্মৃতি বক্ষে ধরে শ্রীরাধিকা হয়ে। মীনাও হয়তো পারত তেমনভাবে থাকতে জীবনে—যদি না সে সীতা-সাবিত্রী সমা মনকে তার ভোজুদার অবৈধ

ভোগ লালসায় উৎসর্গ করত। না করত যদি সে দময়ন্তী-সদৃশ সত্তাকে তার অধর্মের পথে কলুষিত। পাপ-অন্যায় অসৎ অধর্মাচরণের পথেই তো পাপাত্মারা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এই সব ছিদ্র ধরেই তো নলের শরীরে শনি ঢুকার মত দুষ্ট-নষ্ট প্রেতাত্মারা মানুষের সত্তাকে করে গ্রাস। আচ্ছন্ন করে মনকে তার এক রকম ঘোরে রাখে তাকে। ঘোরের বশেই করায় তাকে তাদের ইচ্ছা মত কাজ।

মীনার অন্তরে তার ভোজুদার জন্য শুদ্ধ-একনিষ্ঠ প্রেম থাকার জন্য প্রথমে নাকি প্রেতাত্মাটা তেমন কব্জা করতে পারেনি মীনার মনটাকে। তাই সে প্রথমে কু-বাতাস বহাতে শুরু করেছিল তার আর ভজনলালের মধ্যে। তারপর দুর্ব্বলতা পেয়ে ভোজুর নারীদেহ লোভী স্বার্থপর পাপ মনটাকে সে কামনা লালসায় করেছিল উত্তেজিত। তারপর কামোত্তেজিত নীচ-মনটাকে তার লেলিয়ে দিয়েছিল মীনার দিকে। অসহায়া মীনা শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়েছিল তার কাম-লালসার শিকার হতে। এইখানেই নাকি ভুল করেছিল মীনা। তার এই ভুলের পথ ধরেই নাকি ও নীচাত্মাটা মীনার দেব-দ্বিজে ভক্তি পরায়ণা মনটাকে ক্রমশ করেছিল কব্জা। নিয়ে গেছল অসৎ পথে। সংযমের মাধ্যমে প্রেমকে তার পবিত্র রাখতে না দিয়ে করেছিল তাকে অপবিত্র, ভালবাসাকে করেছিল সে কালিমা লিপ্ত, আদর্শচ্যুত। নষ্ট করে মীনাকে তারপর আবার বিরুদ্ধ বাতাস বহিয়ে ওই নীচ সত্তাটাই ভজনলালকে করেছিল বিরূপ। করিয়েছিল তার প্রেমের অবমাননা, মীনাকে প্রত্যাখ্যান। মীনার মন তখন ওই পাপ পথে যাওয়াতে এমন হয়ে গেছল দুর্ব্বল যে আত্মহত্যা ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় চিন্তা করতে পারে নি সে। আত্মহননের ইচ্ছাই নাকি মানুষের চরম মানসিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ। অবশ্য এ ইচ্ছাটা নাকি মীনার দুর্ব্বল মনে ওই প্রেতাত্মাটাই দিয়েছিল জাগিয়ে। আত্মহত্যাকারী ভূত-পেত্নিরা এমনিভাবেই নাকি মানুষকে আত্মহননের পথে নিয়ে যায়। নিয়ে গেছল তেমনি নাকি সরলা মীনাকেও।

—কি ভাবে? কেমন করে? হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ।

"—তোমাকে তো আগেই বলেছি ভূতুদা।" বলে উঠল সতী, —তোমার ভোজু-বন্ধু প্রত্যাখ্যান করে যখন চলে গেল মীনাকে সম্পূর্ণ একলা অসহায় অবস্থায় সন্ধ্যারাতের সেই নির্জন ইট-ভাটাটায়। তখন নিরাশ অন্তরে নিরুপায় মীনা বেদনাভরা মন নিয়ে সেই বট গাছটার দিকে তাকাতেই উপরের ডাল থেকে তার ভেসে এল এক কণ্ঠস্বর। সেই স্বরটাই ছিল ওমনি হীন-মনা দুষ্ট একটা নীচআত্মার। জীবনে নারী ছিল সে। ওই বটগাছের ডালে গলায় ফাঁশ লাগিয়ে আত্মহত্যা করে প্রেতিনী হয়ে অবস্থান করছিল সেটা। সেই আত্মহত্যাকারী পেত্নিটাই মীনার মনের দুর্ব্বলতায় প্রভাব ফেলে তার উপর আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল তাকে। তার সেই ভেসে আসা কণ্ঠস্বরের মোহে একরূপ ঘোরে পড়েছিল মীনা। সেই ঘোরেই খুলেছিল সে পরনের শাড়ী। সেই অদৃশ্য পেত্নীটার ইঙ্গিতেই লাগিয়েছিল সে তার গলায় শাড়ীর ফাঁশ। ফাঁশ লাগিয়ে গলায় উঠছিল সে সেই বটগাছটার ডালে। ডালে বেঁধে শাড়ীর অপরপ্রান্ত তার ইঙ্গিতেই ঝুলে পড়ে করেছিল সে আত্মহত্যা। মানব-জীবনে ওই পেত্নীটা যেমনভাবে মরেছিল ঠিক তেমনিভাবেই।

"—তাই নাকি!" বিস্ময়ান্বিত স্বরে বলে উঠল ভূতনাথ,—"কিন্তু ভোজুর ইট ভাটায় ওই বট-গাছটার তলায় বাতে-ভিতে নির্জন অন্ধকারে ছিলাম তো আমিও এবং অনেকদিন ধরেই। কৈ, ক্ষণিকের জন্যও তো দেখতে পাইনি আমি গাছের ওই প্রেতাত্মাটাকে। এমন কি পেত্নীটার কোনো আভাসও পাইনি আমি কোনদিন!

—ওসব নীচ সত্তারা সৎ মানুষের বাতাস সহ্য করতে পারে না ভূতুদা। ভয় করে তারা দেব-স্বভাব সম্পন্ন পবিত্র-হৃদয় মানুষকে। শুদ্ধ-চিত্ত, নির্মল আধার থেকে তাই তারা দূরে থাকে, এড়িয়ে চলে তাদের। সেই জন্যই দেখতে তুমি পাওনি তাকে। পায়নি মীনাও যতদিন সৎ-অন্তঃকরণে ছিল সে। কিন্তু পাপ-পঙ্কে পড়ে সে যখন মনটাকে করল আত্মহত্যার চিন্তার দূষিত তখনই পড়ল গিয়ে সে সেই বট-গাছের পেত্নীটার কবলে।

"—কিন্তু পেতনীটা জীবনে ছিল কে?" জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ।

—সুলোচনা নামে এক মেয়ে।

—কিন্তু আত্মহত্যা করল কেন সে? মরে সে সূক্ষ্মসত্তায় এই বট-গাছটাতেই নিতে গেল কেন আশ্রয়? বট-গাছটার পেতনী হয়ে ভোজু-মীনার প্রেমের জীবনে বহাল কেন সে বিরূপ হাওয়া? বিপর্য্যয় ঘটিয়ে তাদের জীবনে কি তৃপ্তিই বা লাভ করল সে?

একের পর এক ভূতনাথের কৌতূহলী-প্রশ্নগুলো যেন ছেঁকে ধরতে লাগল সতীকে। কিন্তু ওসবের উত্তরে আসবে তো পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা। অপরের নিন্দা-চর্চ্চাও মনকে পাপ-গ্রস্থ করে, করে দুর্ব্বল। এভাবে দুর্ব্বল কাঁচা মনে ভূতুদার উপর ওই পাপাত্মাটা যদি ফেলে তার প্রভাব। প্রেতাত্মাদের আলোচনার সূত্র ধরে ওসব নীচ সত্তারা মানুষের মনেও ছায়া ফেলতে পারে। তাই জিজ্ঞাসু ভূতুদার বিস্ময়-বিহ্বল মুখটার দিকে তাকিয়ে চুপ দিয়ে রইল সতী। ভাবতে লাগল সে ভূতুদাকে তার এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ঠিক হবে কি-না।

(বাইশ)

নছোড়বান্দা ভূতনাথ। মস্ত একগুঁয়ে স্বভাব তার। কোন বিষয়ে একবার ঝোঁক ধরলে সে ঝোঁককে তার মাথা থেকে নামায় কার বাপের সাধ্যি। শুধু তাই নয়-চাপলে গোঁ—স্থান, কাল, পাত্র কোন কিছু তার জ্ঞান থাকে না। থাকে না তার বাস্তব-অবাস্তব কোন বোধ বা সম্ভব-অসম্ভব কোন জ্ঞান। কিন্তু সে হলে হবে কি—সে তো এখন বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই। সুতরাং এটা তার সে রকম গোঁ বা ঝোঁক ধরারও ক্ষেত্র নয়। তাছাড়া বাস্তব অবস্থাতেও দাঁড়িয়ে সে নেই এখন। নয় সতী তার জীবন্ত স্ত্রী। অর্থাৎ রক্ত-মাংসের দেহ-ধারিনী সে তার সহ-ধর্ম্মিনী নয়। অপার্থিব সত্তাটা তার হয়ত তার ভূতুদা'র আকর্ষণে সূক্ষ্মরূপে সামনে তার দাঁড়িয়ে আছে—এই যা। কিন্তু এমন নির্বোধ ভূতনাথ সে-সব জ্ঞান তার থাকলে তো। এমন করতে লাগল তাকে পীড়াপীড়ি যেন স্ত্রীকে তার স্বামীর কথা শুনতেই হবে।

পড়ল সতী মহা মুস্কিলে। কারণ ইতিপূর্বে তার ভূতুদার বেয়াড়া গোঁ এর সাংঘাতিক রূপ দেখেছে সে। কি করতে যে কি করে বসবে সে তার কোন ঠিক নেই। সুতরাং বাধ্য হল সতী ভূতুদাকে তার বটগাছটার সেই সুলোচনা নামক পেতনীটার জীবন-ইতিহাস বলতে।

সে অনেক দিনের কথা। মীনার মৃত্যুর প্রায় বছর পঞ্চাশ আগে ক্ষোভে-দুঃখে-হতাশায় ফাঁশ লাগিয়ে গলায় আত্মহত্যা করেছিল সুলোচনা। ওই গন্ধেশ্বরী নদীর পাড়ে এবং ওই বট-গাছটার ডালে ঝুলে পড়ে। জীবনে ছিল সুলোচনা এক ব্রাহ্মণ কন্যা। বাড়ী ছিল তার মীনাদের গ্রামেই। অর্থাৎ বাঁকাদহে-বামুন পাড়ায়। বলদেব বাড়ুজ্জের মেয়ে ছিল সে। চারছেলের পর একমাত্র কন্যা সুলোচনা। তাই বলদেব বাড়ুজের সে ছিল বড় আদরের। মা মাধবী দেবীরও ছিল সে বড় স্নেহের। কিন্তু দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল কন্যা। ভগবান তাকে প্রথমে সুখের কোটায় ফেললেও পরে ফেলে দিয়েছিলেন তাকে দুঃখের সাগরে। সুখের পর দুঃখে পড়া জীবনগুলো হয় বড় জ্বালাময়, বড় মর্ম্মপীড়ক। স্নেহের দুলালী অকালে মাকে হারিয়ে ভাসতে লাগল দুঃখের বন্যায়। সে বন্যায় কুটোর মত বাবাকে ধরে যদিও সে সাঁতার কেটে বাঁচবার চেষ্টা করছিল কিন্তু হঠাৎ এক পথ দুর্ঘটনায় তার বাবা গেল মারা। অর্থাৎ হাতের কুটো তার হয়ে গেল হাতছাড়া। বাপের মৃত্যুর পর ভাইদের সংসারে সুলোচনা যেন মাঝ দরিয়ায় পড়ে করতে লাগল হাবুডুবু। বাপের আদর মায়ের স্নেহে পালিতা কন্যা অভিমেনে মনটা নিয়ে পড়ল গিয়ে বৌদিদের খপ্পরে। বাড়ুজ্জে মশায়ের চার ছেলে ছিল চার রকমের। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ নিয়ে চারজন ছিল এমন ব্যস্ত যে সংসারে তাদের উড়ে এসে জুড়ে বসা বোনটার জন্য চিন্তাই করত না। সংসারের টানা-পোড়েন অভাব-অনটন নিয়ে হিমসিম এমন খেত তারা যে সুলোচনার জন্য ভাববার বা চিন্তা করবার কোন অবসরই পেল না। ছঁচের লাতার মত সুলোচনা কোনদিন বড়দা'র ঘরের ছাদে, কোন দিন মেজদার রান্নার চালায়, কখনও সেজদার গোয়ালের দাওয়ায়, কোনদিন বা ছোটদা'র হিঁসেল কোণায় পড়ে কাটাত দিন। দাদা-বৌদিদের এঁঠো-কাঁটা ভরাত সে পেট। তাও মনে হয় আধ-পেটা খেয়ে। তবে দাদা-বৌদিদের অনাদর অবহেলায় কাটাতে লাগলেও, হতে লাগল সে বড় লাউ-ডগার মত-লকলিকয়ে, রঙ্ ফলিয়ে। তাই তো কথায় বলে,—

মেয়ে মানুষের বাড় পুঁই লতার ঝাড়—
যায় না রাখা ধামা-চাপা বয়স দিলে ছাড়।।

যতই বড় হতে লাগল সুলোচনা ততই ফুটে বেরুতে লাগল তার রূপ, ফুঁড়ে উঠতে লাগল তার যৌবন। দেহটা তার ফুলের মত পাপড়ি মেলে প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খেলাতে লাগল তার কুমারীত্বের সৌন্দর্য্য। অবশ্য আশ্চর্যেরই ব্যাপার। কারণ অভরা পেটে লাথি-ঝাঁটা খেয়েও এত রূপ তার আসে কোত্থেকে। এমন বাড়-

বাড়ন্ত তার হয় কি করে? দিনের পর দিন বৌদিদের যেন চক্ষু-শূল হতে লাগল সুলোচনা। দাদাদের হতে লাগল সে মাথা ব্যথার কারণ। কারণ ফুল ফুটলে তো আর সে ফুল নষ্ট করতে কীটের অভাব হয় না। উঠতি বয়সের ফুটন্ত ফুল সুলোচনা তার রূপ-যৌবনের পসরা নিয়ে আসত যখন গ্রামের ঠাকুর দালানে, যেতযখন গ্রামের চন্ডী মণ্ডপে মাদুলি দিতে বা শিব-মন্দিরে সন্ধ্যা দিতে তখন গায়ের উঠতি ছোকরা, ঢেংড়া ছোঁড়াদের দল পিছনে পিছনে ঘুর ঘুর করে বেড়াত তার। শুধু তাই নয়—মারত চোখ, করত ইসারা, ঠারে-ঠোরে ছুঁড়ে মারতকথা, আর কত কি। এসব কাণ্ড করলেও কিন্তু দোষী হতনা ওসব ঢেংড়া-ছোকরারা। বরং বলতে গেলে উল্টেমা-বাবারা তাদের তেড়ে আসতসুলোচনাদের ঘরে। ঝেড়ে দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে যেততারা দাদাদের,— আইবুড়ো রেখে মেয়েটাকে গাঁয়ের ছেলে-ছোকরাদের যে মাথা খাচ্ছিস, উচ্ছন্ন পাঠাচ্ছিস পাড়াটাকে সে খেয়াল নেই। লজ্জা করে না তোদের মাথার উপর ওমনি এঁটা ধাংড়ি মেয়েকে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে?

পাড়া-প্রতিবেশীনিরাও পড়নে পেলে বেশ গরম গরম দু-কথা শুনিয়ে দিত তার বৌদিদের,—"কুড়ি পেরিয়ে বুড়ি করলি ননদিনীটাকে তবু থুবড়ি করে রাখলি তোরা। শ্বশুরের টিপায় আইবুড়ো রেখে ছুঁড়িটাকে কি গলায় গেঁথে মরবি তোরা? এঁড়ে-দামড়া, বুড়ো-উঠ্‌পড়া যে কোন গরু-কাড়া বর এনে দেগে দেওয়া মাথার সিন্দুরটা। নইলে যে নরকেও গতি হবে না তোদের।

যত দোষ নন্দঘোষ। কথার ঝালগুলো ঝাড়ত তার বৌদিরা ঘুরে ফিরে সেই সুলোচনার উপর। উঠতে বসতে শোনাত তাদের স্বামী-দেবতাদের নানা কথা। সত্যি-মুখপুড়িকে কি গড়নেই না গড়েছিল বিধি কে জানে। মা- বাপের সঙ্গে সে-ও যদি যেত চলে যমের বাড়ী তবে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ত তার বৌদিদের। দাদাদেরও হাড়ে লাগত বাতাস। কিন্তু তা-না। পিণ্ডি-খাওকি এমন বদমাশ যে দিনের পর দিন ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে নিজের ধুমসা গতরটাকে বার-লোকের বার কথা সহ্য করাবার জন্য রইল বেঁচে তাদের ঘাড়ে চেপে। কথার খোঁচায় বৌদিরা শেষে এমন উত্যক্ত করল সুলোচনার দাদাদের যে বড়কত্তা, মেজকত্তা শেষ-মেষ রেগেই একদিন ধরে আনল পাশের গ্রাম বামুন-তোড়ের রাধানাথ গোস্বামীকে। রাধানাথ তখন তার শ্রীরাধিকাকে হারিয়ে থুবড়ো হয়েছিলেন। তার প্রথম পক্ষের তখন দু-ছেলে এক মেয়ে বিয়ে করে নিজের নিজের ঘর-সংসার নিয়ে সব ব্যস্ত। দ্বিতীয় পক্ষের দুটি ছেলেই কুলাঙ্গার। মা তাদের গত হওয়ার পর যেন উঁকো ষাঁড়ের মত শিং উচিয়ে থাকত তারা তার উপর। মাঝে-মধ্যে গুতিয়ে বুড়োকে টাকা-কড়ির শ্রাদ্ধ করা ছাড়া আর তাদের কোন কাজ ছিল না। সেই পাষণ্ডগুলোকে দণ্ড দেবার জন্যই রাধানাথের তৃতীয় পক্ষ গ্রহণের পরিকল্পনা। সুলোচনার মত ধাংড়ি মেয়েই চায় সে। ডাগর-ডোগর। ওমনি স্ত্রী পেলে কোন পণ-যৌতুক বা দানসামগ্রী তো সে গ্রহণ করবেই না। উপরন্ত বিয়ের সমস্ত খরচ এমন কি ছাদনা তলায় সিন্দুরদান, পুরোহিতের পাওনা গণ্ডা এবং নাপিত কামিন বিদায়ের পর্য্যন্ত সম্যক ব্যয় বহন করবে সে। শুধু তাই নয়—বিয়ের পরই সে তার সম্যক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, মায় জোত-জমা সমস্ত কিছু লিখে দেবে সে তার এই তৃতীয় পক্ষের ধর্মপত্নী সুলোচনার নামে। যাতে তার ওই প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষের কুলাঙ্গার, পাষণ্ড ছেলে-মেয়েগুলো মাথা নত করে চিরকাল তার এই তৃতীয় পক্ষের দাবে থাকে, বশে থাকে।

আহা। এতো মেঘ না চাইতেই জল! সত্যি বড় ভাগ্য করে এসেছে সুলোচনা নইলে ষোল-কলা পূর্ণ করে আকাশের চাঁদ এমনিভাবে এসে ধরা দেয় তার হাতে। একেই বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ। পতি-পত্নীর সম্বন্ধ বিধির বিধান। যে যতই ছটফট করুক না কেন—এতো ডাক পুরুষের কথা,"

—বিয়েব ফুল যার যখন ফুটে,
অলি এসে তার আপনি জুটে।
রাধার কৃষ্ণ, কৃষ্ণের রাধা,
জন্ম-জন্মান্তর যে বাঁধা খুঁটে।।

কিন্তু কৃষ্ণ যে তেজবরে! তা হোল-তো কি হবে? কুলীন ব্রাহ্মণের আবার কেও তেজবরে-চৌবরে বিচার করে নাকি? সেকালের কুলীনরা এক এক সঙ্গে তিন-তিনটে করে বিয়ে করতেন। সে তুলনায় গোসাই-বুড়ো তো মহাপুরুষ। কারণ তিনি আগের স্ত্রীকে যমের বাড়ী বিদায় করার পর তো সুলোচনাকে বিয়ে করছেন। কিন্তু

পাত্রটির যে বয়েস-চাপা, বুড়ো। ছিঃ—ওকথা বলতে নেই। বিয়ের ব্যাপারে কখ্খনও পুরুষের বয়স দেখতে নেই। তারা হল শিবের জাত। উমা কি শিবের কখনও বয়স দেখেছিল? বুড়ো বলে গৌরি কি শঙ্করকেবিয়ে করতে অরাজি হয়েছিল?

কিন্তু অরাজি হল সুলোচনা। কারণ রাধানাথ মুখুজ্জে তো শিব নয়। আর পার্ব্বতীও নয় সুলোচনা। তাছাড়া হর-গৌরির যুগও নয় একটা। ওই তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা বুড়ো-হাবড়া ঘাটের মড়াটাকে বিয়ে করাও যা, গলায় কলসী বেঁধে গন্ধেশ্বরীর বানে ডুবে মরাও তা। মনে পড়তে লাগল সুলোচনার সেই ছোটবেলায় শোনা তার ফোকলামুখী দিদিমার কথা। বুড়ো মুখে দু-গাল ভরা হাসি নিয়ে শোনাতেন তাকে কত কাহিনী কত গল্প। মামা বাড়ীর উঠোনে সেদিনের চাঁদনী রাতে তাঁর জমিয়ে বলা গল্পটা যেন ধকধকিয়ে উঠল তার মনটাতে। রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প। সুন্দরপুরের রাজপুত্রের সঙ্গে ভাব হয়েছিল রূপনগরের রাজকন্যার। কিন্তু হঠাৎ অদের ভালবাসার মাঝে পাতাল পুরীর দৈত্য এসে একদিন হরে নিয়ে গেল রাজকন্যাকে। তারপর সে কি কাণ্ড। ধর্মরাজের সাধনা করে রাজপুত্র নিল তার পক্ষীরাজ ঘোড়া, শিবকে সন্তুষ্ট করে লাভ করল সে এক মহা খড়্গ। তারপর মা মহামায়ার কৃপার তাঁর বর্মপরে যাত্রা করল রাজপুত্র রাক্ষসপুরী। সেখানে দৈত্যকে হত্যা করে উদ্ধার করল সে রাজকন্যাকে। তারপর সুন্দরপুরে নিয়ে গিয়ে তাকে ঘটা করে করল বিয়ে। "আমার কৈনি ফুরোলো নটে গাছটি মুড়োলো"—বলেও কিন্তু বুড়ী সেদিন সুলোচনার সেই রূপকথাটার ঘোর কাটাতে পারেনি। কচি ঠোঁটটা নেড়ে তার সম্বিৎ ফিরিয়ে বলেছিলেন,—তুই-ই তো সেই রূপ নগরের রাজকন্যা-লো ছুঁড়ি। এত ভাবনা কিসের? দেখবি, সুন্দরপুরের রাজপুত্র এসে একদিন বিয়ে করে নিয়ে যাবে তোকে।

সত্যি বলতে কি রূপনগরের রাজকন্যা বলেই ভ'বত সুলোচনা নিজেকে। সত্যি সে ছিল রূপবতী। ভর যৌবনে সবাকার নজর লাগা চেহারাটা নিয়ে ঘুরত যখন সে তখন সব যুবকেরই চোখ টাটিয়ে দিত সে—ঘুরিয়ে দিত মাথা যদি এর উপর সাজ-পোশাক পরে বেরুত সে। রূপের বেশ একটু অহঙ্কারও ছিল তার। ছিল বলেই দাদা-বৌদিদের লাঞ্ছনা—গঞ্জনা তেমন কিছু তোয়াক্কা করত না সে। কারণ ভাবত সুলোচনা—সুন্দরী যখন সে তখন বিয়ে করতে আপনা থেকেই আসবে তাকে দিদিমার সেই গল্পে শোনা কোন এক সুন্দরপুরের রাজপুত্র। দাদা-বৌদিদের এই রাক্ষসপুরী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে তাকে। বসাবে তাকে রাজরানী রূপে। সুতরাং এই ক'টা দিন তাকে দাদাদের সংসারে কোন রকমে মাথা গুঁজে কাটিয়ে দিতে হবেই। তারপর ব্যাস! কল্পনার উপর ভর করে এই ভাবী আশাতেই বুক বেঁধে কাল কাটাতো সুলোচনা। কিন্তু হায় ভগবান। তার কপালে এই বুড়ো বরটা উঠে ন আবার কোন ভাগাড় থেকে! বৌদিরা তো ঘর থেকে আপদ বিদেয় করলেই বাঁচে। দাদাদের সংসারে সে-তো ভেসে আসা শেওলা—সুতরাং হাত ঝেড়ে হেলিয়ে তাকে অন্য-ঘাটে পাঠাবার জন্য তো ছটফট করবেই। কিন্তু তার তো এ টা ভবিষ্যৎ আছে। বোধ-বুদ্ধি থাকতে এ বুড়ো হাবডাটার গলায় ববমালা দিতে যাবে কেন সে? কেন সে চিন্তা না করে দাদা- বৌদিদের কথায় নিজের জীবনটা এভাবে বরবাদ কবতে যাবে? সুতরাং বেঁকে বসল সুলোচনা।

সোজা করতে এল তাকে দরদী তার বৌদি-কুল। বুঝাতে লাগল তাকে.—রাধানাথ গোঁসাই-এর ভরা সংসারের মালিক হবি তুই। পাবি বুড়োর ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি, জমি-জমা সব। ভাঁড়ার ঘরের চাবী থাকবে তোর হাতে। তোর হুকুমেই চলবে বুড়োর ঘরের মুনিস-মন্দার, ঠাকুর-চাকর সবাই। এধারের কুটোটি ওধারে করতে হবে না তোকে শশ্বর বাড়ীতে। পা উপর পা দিয়ে খাবি। গর্ভে না ধরলেও বুড়োর ওই সমস্ত যোয়ান-যোয়ান ছেলেরা গোলাম হয়ে থাকবে তোর। তাদের গুরু-গিরি, প্রণামীর, পুরুত গিরির টাকা, দশ-কর্মের দশদিক থেকে আনা পাওনা-গণ্ডা সব তোর হাতে "মা-মা" বলে তুলে দেবে তারা। যেখানে যত আছে বুড়োর ভক্ত-শিষ্য সব এসে গড়াগড়ি দিবে তোর পায়ে। "গুরু-মা" বলে মাথায় তুলে রাখবে তারা সবাই। পাড়া-প্রতিবেশীরা কাকের মত কা-কা করবে এসে তোর দরজায়। তোর পাতের পড়ে থাকা এঁঠো-কাঠা খাবার জন্য। তোষামোদ করবে তোর বুড়োর গ্রাম-চৌহদ্দির সবাই। পাট-রাণীর মত থাকবি তুই। তোর কথাব উপর কথা বলবার কেও থাকবে না। বরং তোর হুকুমে—হুজুরে হাজির হবার জন্য ব্যস্ত থাকবে সবাই। তোর নাগাল পাবে এমন সাধ্যি-কার?

কিন্তু হায় "—মন ময়না বুলি ধরে না—তাকে যতই পড়াও না কেনে।" সেই হল সুলোচনার। বৌদিদের এত বলা-বুঝানোতেও টোপ কিছুতেই ধরল না মুখপুড়ি। একেই বলে—সুখে খেতে ভূতে কিলোয়। এক ধরনের ছারপোকা আছে যারা না খেতে পেয়ে বরং শুকিয়ে মরবে, সাদা-চুপসি ফ্যাকাশে হয়ে থাকবে তবু এক খাটিয়া ছেড়ে অন্য খাটে যাবে না—তেমনি হল সুলোচনা। মত করল না সে বিয়ে করতে। দাদারা পড়ল মহা মুস্কিলে। রাধানাথ গোস্বামীর মত পাত্র। বুড়ো হলেও কুলীন বনেদী বংশের ছেলে সে। এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের মুখপাত অর্থাৎ কুলোচূড়ামনি তিনি। তিনি এসে হাত পেতেছেন তাদের দরজায় সুলোচনার জন্য। তাদের সাত-পুরুষের ভাগ্য ভাল যে এমন একজন সু-পাত্রের হাতে পড়ছে সুলোচনা। তাও আবার বিনা পণে, বিনা দানে, বিনা-খরচায়। ভগ্নি-উদ্ধারের এমন সুবর্ণ সুযোগ ওই গোমড়া-মুখীর অমতে হারানোও যা—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ফেলাও তা। জের টেনে তাদের কথার পাকা-মাথা খাড়া-প্রতিবেশিনী মাসি-পিসিরা যখন বলেও সুলোচনাকেবুঝাতে পারলনা তখন ঘাড় দুলিয়ে বলে উঠল তারা, "বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের আবার মতামত কি? আমাদের আমলে তো বাপু কাঁচা হাঁড়িকে জিজ্ঞেস করে কেও কখনও পোয়ানে (আগুনে) চাপাত না। এই আমলেই দেখছি যত সব ঢঙ্। পুরুষদের কথার উপর কথা বলতে লজ্জা করে না মুখপুড়ীর।

পাকা-মাথা টেঁকো-টিকিধারী রাসবিহারী, নরহরি ইত্যাদি মুখ্যামাতব্বরা বেশ জোর দিয়েই উঠলেন বলে, "—যাচা কনে, মাগা বর কখনও ছাড়তে নেই। কুলীন মাগলে কন্যাদান বিধেয়। শেষ পর্য্যন্ত বুড়ো-ধাংড়ি ওই আইবুড়ো মেয়েটাকে নিয়ে কি গলায় গেঁথে মরবি তোরা? মিলেছে যখন গণনায়, হয়েছে যখন রাজ-জোটক মিল তখন আর কোন কথা নয়। শুভস্যশীঘ্রম।

কিন্তু তবু যখন বেঁকে বসল সুলোচনা তখন ক্ষেপে উঠল তার বৌদিরা। ধরল তারা উগ্রচণ্ডা ভৈরবী মুর্ত্তি। ঝাঁঝ কেরে গলায় ধমকে তারা বলে উঠল সুলোচনাকে,—এক পয়সার পুনকো শাক, যেমন মুরোদ তেমনি থাক। ছুঁড়ির অসটা (আদিখ্যেতা) দেখনা। হারামজাদীর জন্য দাদারা তার রাজপুত্র ধরে এনে দেবে! পাটরানী হবে সর্বনাশী। ভেবেছিস কি মুখপুড়ি? চিরকাল ভাইদের কপালে বসে কাঁড়িকাঁড়ি খেয়ে ভুঁড়ি বাগাবি? ওসব চালাকি আমাদের কাছে চলবে না। কুড়ি পেরিয়ে বুড়ী হয়েছিস—তোর আবার এত কিসের কচি-দামড়া, হালি-কাড়া পোয়ালি (ছোট) ষাঁড় বাছ-বিচার লো ছুঁড়ি? কেন, আমাদের গোঁসাই-ঠাকুর কি এঁড়ে মরদ নয়? ফুল পেলে ফল সে ধরাতে পারবে না? বাঁজা করে রাখবে তোকে ভেবেছিস?

সাত-পাঁচ কথার গুঁতোয় যেন বোবা হয়ে গেল সুলোচনা। শেষ-মেষ তার অমত-আপত্তির আর কোন তোয়াক্কাই করল না তার বৌদিরা। দাদাদের তার স্পষ্ট গলায় জানিয়ে দিল তারা,—"উনুনকে জিজ্ঞেস করে কেও কোনদিন যেমন কাঠ দেয়না তেমনি হাঁড়িকে শুধিয়ে কেও কখনও তাকে হাটেও নিয়ে যায় না। তোমরা যেমন আহাম্মক তোমাদের বোনটাও তেমনি নির্লজ্জ, বেহায়া। তাই লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে এমন বেয়াল্লাপনা করছে। কুন্দে পড়লে সব বাঁকা কাঠই সিধে হয়ে যায়—কোথায় সুলোচনা। দাও বিয়ে, আপনিই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অর্থাৎ টিপে কাঁঠাল পাকাল তারা। সুলোচনা অবশ্য এ বিয়ের আগে পর্যন্ত নানা চেষ্টা করেছিল দাদা-বৌদিদের-আগল-ভাঙ্গার, বাঁধন ছেঁড়ার। আসলে বিয়ে করতে ইচ্ছা ছিল তার নাম-পাড়ার চণ্ডী চক্রবর্তী ছেলে কার্ত্তিক চন্দ্রকে। কার্ত্তিক ছিল তার মনের মানুষ। কুলীন ব্রাহ্মণ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে না হলেও রূপ ছিল তার। অর্থাৎ নামে শুধু নয় দেখতে শুনতে সত্যি সে ছিল মেড়-প্রতিমার কাঁচা-কার্ত্তিকটির মত্ত। সুন্দর পুরের রাজপুত্র। তাই ভালবেসেছিল সুলোচনা তাকে। সুলোচনাকেও ভালবেসেছিল কার্ত্তিক। দিয়েছিল কথা তাকে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু শুনল যখন বিয়ে হচ্ছে সুলোচনার তাদেরই কুলগুরু রাধানাথ গোস্বামীর সঙ্গে তখন আশা-ভরসা ভাবী-স্বপ্ন তার সব হয়ে গেল ভণ্ডুল। সুলোচনাকে নিয়ে কল্পনায় ঘর বাঁধা তার শূন্যে হয়ে গেল বিলীন। কারণ গুরু সোঁসাই এর নজর পড়া মানেই তো সুলোচনা গুরু পত্নী হয়ে যাওয়া। ভাবী গুরু-মা'র উপর ওসব প্রেম ভালবাসার জের টানা অন্যায় শুধু নয়—মহাপাপ। সুতরাং সুলোচনাকে নিয়ে উধাও হয়ে, গোপনে তার মাসির বাড়ী কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাকে কালীঘাটে বিয়ে করার যে প্ল্যান-প্রোগ্রাম ঠিক করা ছিল তার সব হয়ে গেল গোলমাল। উল্টে গেল সমস্ত কিছু।

সুলোচনা কার্ত্তিককে কত বুঝাল। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। লজ্জা করে না তার ঠাকুরদার মত বয়েস নিয়ে তার মত একটা কম বয়েসী মেয়ের সঙ্গে জীবনের শেষবেলায় গাঁট-জোড়া বাঁধতে? টিকি পৈতের জোরেই তো আর গুরু হওয়া যায় না।, জীবনের আচরণে, ব্যবহারে মনে-প্রাণে যে তার চরিত্রকে গুরুত্ব দিয়ে চলতে পারে সে-ই তো গুরু। এমন গুরুর অভিশাপে পড়লে সর্ব্বনাশ হবে না তার মা-বাবার। মহাপাপে পড়বে না সে। তাদের বংশেরও হবে না কোন অমঙ্গল বা অকল্যাণ। কারণ টাঁকে তেল দিয়ে গোঁসাই-বুড়োর এভাবে বিয়ের পীড়িতে বসা অন্যায়।

কিন্তু শুনল না কার্ত্তিক-চন্দ্র তার কথা। সুলোচনার শত আকুলি বিকুলিতেও মানল না কিছুতেই তার মনটা। মহা মুস্কিলে পড়ল সুলোচনা। কাপুরুষ কার্ত্তিকটার প্রতি ঘৃণায়, তার প্রতি ধিক্কারে ভরে গেল তার মনটা। প্রাণে নিয়ে ক্ষোভে, মনে নিয়ে দুঃখ, হৃদয়ে নিয়ে অভিমান, অন্তরে নিয়ে অপমান ফিরে এল সে বাড়ীতে। সমস্ত পুরুষ জাতটার প্রতি সুলোচনার মনটা উঠল বিষিয়ে। কার্ত্তিক চন্দ্রের এতদিনের প্রেমভালবাসা ও গোপন প্রণয়ের সঙ্গে চিরদিনের মত বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বুকে জ্বলতে লাগল তার আগুন। সে আগুনে পুড়ে খাঁক হয়ে যেতে লাগল সুলোচনার সমস্ত অন্তরটা। কার্ত্তিকের প্রত্যাখ্যানের শাস্তি কিভাবে দেবে যে তাকে খুঁজে পেল না। প্রতিহিংসায় যেন রি রি করে করতে লাগল সমগ্র সত্তাটা। ভাবল শেষে মরবে না সে। এবং ওই রাধানাথ গোস্বামীকেই করবে বিয়ে। কারণ ওবুড়ো লোকটা শুধু কার্ত্তিকদের কুল-গুরুই নয়, এ অঞ্চলের একজন দাপট-ওয়ালা লোক সে। বিয়ে করে তাকে তার এই দাপটটাই কাজে লাগাবে সুলোচনা। গালের মত চড় দেবে সে ওই কাপুরষ কার্ত্তিকটাকে। শুধু পা-চাটা কুকুরই করবে না তাকে। বাপ চণ্ডী চক্রবর্তীসহ তাদের ওই চক্রবর্ত্তী বংশটাকে এ গ্রাম থেকে সে করবে উৎখাত। বনেদ তাড়া করে তাদের সমুচিত শিক্ষা দেবে ওই বেইমান, ভীতু, নেমকহারাম কার্ত্তিকটাকে। ভালবেসে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার শাস্তি চিরকাল স্মরণ থাকবে তার।

বাজল সুলোচনার বিয়ের বাজনা। তার রুচি-অরুচির নিকুচি করে বৌদিরা তাকে পরাল হলদে শাড়ী। গোমড়া মুখটাতে তার পুরে দিল অব্যুঢ়ান্নেরভাত। ওল-বদনটাকে তার গ্রাহ্য না করে বসাল তাকে বিয়ের পীড়িতে। লেগ-দস্তর বিয়েব নিয়ম-কানুন, মেয়েলি প্রথা-আচার এমনভাবে পালন করতে লাগল তাবা যেন পাড়ার পাঁচ-জন বলতে বাধ্য হয় যে মা-বাপ মরা মেয়ে হলেও সুলোচনা, তার বৌদিরা ননদিনীর বিয়ের লেগ-নিয়মের কোথাও কোন ত্রুটি রাখেনি। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়েও সুলোচনার মনটাকে একটা ভাবনা বার বার তোলপাড় করতে লাগল। সেটা হল-এই ঘাটের মড়াটার জন্যই কি সে ছোট থেকে দাদা বৌদিদের এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে বেঁচেরইল। এমন সুন্দর রূপ-যৌবন নিয়ে বড় হল সে কি ওই বুড়ো বরটার গলায় বর-মাল্য দেবার জন্য। গড়নে-বরণে সই-সয়লা সঙ্গী সাথীদের সবার সেরা ছিল সে। ছিল রূপে-গুণে সবার সে সকল বান্ধবীদের ঈর্ষার বস্তু। তা কি ওই বুড়ো গলন-তপড়া ফোক্‌লা-মুখো রাধানাথ গোস্বামীর জন্য। তার গঙ্গাজল (বান্ধবী) রেবার সুন্দর চেহারা না থাকলেও বিয়ে হল রাজপুত্রের মত মাত্র রাজেন্দ্র নাথের সঙ্গে। তার সই কামিনী, গায়ের রং তার কাল হলেও বর পেল সে পূর্ণিমার চাঁদের মত পূর্ণচন্দ্রবাবুকে। কাঞ্চনীর রূপ বলতে মোটেই কিছু ছিল না কিন্তু স্বামী পেল সে ময়ূরে-চড়া কার্ত্তিকের মত কান্তিময়বাবুকে। কিন্তু সুলোচনা— সুলোচনা, সু-বদন, সু-গড়ন এককথায় রূপে গুণে ষোলকলা তার পূর্ণ হলেও জীবনে সে বর পাচ্ছে কিনা ভাগাড়-মুখো একটা বুড়ো-হাবড়া মড়াকে ! ছিঃ ছিঃ। দাদাদের দাঁত-খিঁচুনি, বৌদিদের মুখ-ঝামটানির ভয়ে এভাবে সে নিজের জীবনটা বরবাদ করতে যাচ্ছে কেন? কেন সে যাচ্ছে দিতে তার এমন সুন্দর রূপ যৌবন একটা তেজবরে কুৎসিৎ জরদগব পাত্রের পায়ে? জীবনে টাকা-কড়িটাই কি সব? ধন দৌলত জমি-জমা, এগুলোই কি আসল? সখ সাধ বলে তার কিছু নেই. নেই জীবনের আশা আকাঙ্খা. নিজের রুচি অরুচির কোন মূল্য? জীবনটা তো তার নিজের ভবিষ্যৎটা তো তার দাদাদের নয়, বৌদিদেরও নয়। তবে? এমনি ভাবে নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারতে যাচ্ছে-কেন সুলোচনা? কেন যাচ্ছে সে নিজের সর্বনাশ নিজে করতে। সে তো তার দাদাদের গোয়ালের গরু নয় যে যেখানে খুশি সেখানে তারা তাকে বেঁধে দেবে বা বিক্রি করবে। নয় সে তো কচি-খুকি। দস্তুর মত বড় হয়েছে সে। বড় হয়েও নিজের ভবিষ্যৎ নিজে চিন্তা করে চলবে

না সে। তা যদি না করে তবে ইট, কাঠ, পাথরের সঙ্গে তার পার্থক্যটা কোথায়? সুতরাং ঝড় উঠল সুলোচনার মনে। হৃদয়ের শূন্য ডাঙ্গায় হল শুরু যেন কাল-বৈশাখীর তুমুল তাণ্ডব। না—এ বিয়ে করবে না সে। নেবে না মেনে সে প্রজাপতির এ নির্বন্ধ, বিধাতার লিপি বা তার ভাগ্যের বিধানটাকে।

কিন্তু আর কি হয়। ভাবতে বড় বিলম্ব করে দিয়েছে সুলোচনা। ছোঁড়া হয়ে গেছে তীর। লক্ষ্যের দিকে যখন গতি হয়ে গেছে তার তখন ফেরা তার পক্ষে অসম্ভব। বুড়োর সঙ্গে গাঁট-জোড়া বাঁধবার জন্য খেয়েছে যখন অবুঢ়ান্নের ভাত, পরেছে যখন পাত্র-ঘর থেকে পাঠানো হলদু শাড়ী, বিয়ের প্রথা, লেগ-দস্তুর যখন ঠেলে নিয়ে গেছে তাকে শুভ পরিণয়ের দিকে তখন এ বন্ধন তাকে স্বীকার করে নিতেই হবে জীবনে।

হয়ত তাই নিত সুলোচনা স্বীকার করে। কিন্তু বিয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত্তেই বরকে দেখে তার ভক্তি গেল চটে। উপর কোঠায় একুড়েঘরে তার কামিনী-কাঞ্চনী বান্ধবীরা সাজাচ্ছিল তাকে কনের সাজে। চন্দনের ফোঁটা, কুমকুমের টিপ, আলতা-আতর, স্নো-পাউডার ইত্যাদি বুড়োর পাঠানো নানা প্রসাধন দ্রব্য দিয়ে বেশ পরিপাটি করে। সাজ্‌তে সাজাতে সুলোচনা ভাব-গম্ভীর গোমড়া মুখটায় হাসি ফোটাবার জন্য করছিল তারা নানা চেষ্টা—ইয়ার্কি, ফাজলামি-দিল্লাগী, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাসি মসকরা ইত্যাদি। এমন সময় এল বর। আলোড়িত হয়ে উঠল সমস্ত গ্রাম। তোলপাড়িয়ে উঠল পাড়া। বাপরে বাপ। সে-কি ধূম-ধড়ক্কা তার। আলোয় আলোময় করে দিল গ্রামের অলি-গলি কুলি মেলা। যেমনি বাজি-ফটকা রোশনাই তেমনি ব্যাণ্ড-পার্টির বাজনা আর টিকরা-সানাই। তুলুকম্প ধরিয়ে দিল সব-চৌহদ্দি, চারধার। সদর দরজায় বর আসতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই। আলোর ফুলঝুরি, আলোর ঝালর তার মাঝে বর-বুড়ো এল চতুর্দ্দোলায়। সে-এক হৈ হৈ ব্যাপার রৈ-রৈ কাণ্ড। হুলস্থুল পড়ে গেল কনে-ঘরে। সুলোচনার বৌদিরা ছুটল বর বরণ করতে বরণের ডালা নিয়ে। এত সমস্ত হৈ-হুল্লোড় ছেড়ে কি রেবা-কাঞ্চনী সহেলীরা সুলোচনার কাছে বসে থাকতে পারে? নূতন দেখার সাধই আলাদা। সুতরাং কনেকে ছেড়ে তারা চট-জলদি ওমনি কৌতূহলের তাড়ায় ছুটল সদর দরজার দিকে। বর দেখতে শুধু-নয়, সুলোচনার হবু স্বামীকে স্বাগত জানাতে।

কনে সেজে সুলোচনা রইল উপর কোঠায় একুড়ে ঘরে একলা। বেনারসী শাড়ী পরে, চন্দন চর্চিত কপাল নিয়ে একলা বসে ভাবল সে কিছুক্ষণ। তারপর কি মনে হল তার কে জানে। উঠল সে। কৌতূহলের তাড়ায় একবার গেল সে জানালার দিকে। খোলা জানালায় স্পষ্ট এসে চোখে পড়ল তার ভবিতব্য অর্থাৎ স্বামী দেবতাকে। আহা! কি ঢঙ্। তপড়া গালে চন্দনের ফোঁটাতেও ভ্যালসে মাছের মত বদনটাকে সে পাল্টাতে পারে নি। টেঁকো মাথায় তার টোপর দেখে মনে হচ্ছে যেন বাঁননের মাথায় কেও চাপিয়ে দিয়েছে হাঁড়ি। লাজ লজ্জার কি একেবারে মাথা খেয়েছে মিনসে? দু-গণ্ডা ছেলের বাপ হয়ে, জীবনে প্রায় আঠার গণ্ডা বছর পার করে এসেছে সে এই বয়সে বিয়ে করতে। দু-দুটো বৌকে খেয়ে তৃতীয়বার দার পরিগ্রহণের জন্য এসেছে বুড়ো প্রথম বিয়ের মত পাত্র সেজে চতুর্দ্দোলায় চেপে আড়ম্বর করতে। এমন বেহায়া নির্লজ্জ মুখপোড়া। ছিঃ ছিঃ। বাংলা পাঁচের মত চামড়া-ঝুলো মুখটা নিয়ে আবার বৌদিদের দিকে তাকিয়ে ফোকলা-মুখে হাসছে কেমন খিল খিল। হায়া নেই হারামজাদার? একটু লজ্জাও করে না। দেখে তার মুখটায় থুতু দিতে ইচ্ছে গেল সুলোচনার। ঘিন্-ঘিন করতে লাগল তার গা-টা। যেন বমি আসতে লাগল তার। শুভদৃষ্টির আগেই যদি এমনি ভাব হয় তার তবে বুড়োর গলায় সে মালা দেবে কেমন করে? কিন্তু পিছোবারও এখন রাস্তা নেই। জীবন রথের চাকা যে ঘর ঘর করে এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে সামনা-সামনি তার। সুতরাং উপায়...?

একটা উপায় আছে। আছে তার কপালে তেঁতুল গুলতে আসা ওই বুড়োটার টেঁকো মাথায় উল্টো তেঁতুল-গুলার একটা ব্যবস্থা। বিয়ের সাধে ঘোল ঢেলে তার কপালে ছুঁচের হাঁড়ি ভাঙ্গার একটা মাত্র রাস্তা আছে খোলা। এটাই হচ্ছে বুড়োর মোক্ষম দাওয়াই। তার ছুঁচো মুখটা বুচো করার একমাত্র ওষুধ। এবং এ দাওয়াই প্রয়োগ করার এই হল উপযুক্ত সময় তার। একলা সে এখন। দৃষ্টি সবাকার এসময়ে সদর দরজার বাইরে অর্থাৎ বুড়ো বরটার দিকে। মাতোয়ারা হয়ে ভীড় জমিয়েছে সবাই চতুর্দ্দোলার চারদিকে। সুতরাং এই হল তার সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগকে ভয় সঙ্কোচ বা অবহেলায় অর্থাৎ হেলায় হারানো চলবে না তার। তা হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

সুতরাং চলো মুসাফিব। উপর কোঠা থেকে নেমে সুলোচনা গেল সদর দরজার বিপরীত পাশে তাদের খিড়কি দরজার দিকে। তারপর চুপিসাড়ে লুকিয়ে, গোপনে তার সেই বিয়ের হৈ-হট্টগোলকে পিছনে রেখে খিড়কি দরজা দিয়েই মেরে দিল চম্পট। কি যে মাথায় তখন ভর করেছিল তার কে জানে। কোন দিক্-বিদিক্ জ্ঞান ছিল না তার। হুঁশ ছিল না পথ-বেপথের। এমন কি সে যে একটা ভীতু মেয়ে মানুষ, যাচ্ছে যে সে ঘুরঘুট্টি পীচঢালা নিকষ-কালো অন্ধকারের মধ্যে তাও ছিল না বোধ। চলতে লাগল সে নিশি পাওয়ার মত। পা-দুটোই তাকে যেন বয়ে নিয়ে এসে হাজির করল গন্ধেশ্বরী নদীর পাড়ে। একুড়ে সেই বট-গাছটার তলায়। অদূরে নদীর বুকে শ্মশানটা তার দিকে তাকিয়ে কি যেন জানাতে চাইছিল তাকে। ভাবতে লাগল সুলোচনা। ফুরফুরে বাতাসে, মর্মরে ভাষায় বট গাছটার পাতাগুলো তাকে কিছু বলতে চাইছিল কিনা কে জানে। তবে বট-গাছটার কোলে দাঁড়াতেই মনে পড়তে লাগল সুলোচনার ফেলে আসা জীবনের সমস্ত অতীত স্মৃতিগুলো। এই রকমই হয়। মৃত্যুর আগে মানুষের ফেলে আসা নানা ঘটনা ভিড়িয়ে আসে স্মৃতিতে। মনে পড়তে লাগল সুলোচনার সেই ছোটবেলায় রেবা-কাঞ্চনী, বীনা-কামিনীদের সঙ্গে দল বেধে আসত সে নদীর এই ঘাটটায় জল নিতে। জল নিতে তাদের গড়িয়ে যেত বেলা। কারণ এই বটের ঝুরিগুলো ছিল তাদের বড় আকর্ষণের বস্তু। তাই কলসীগুলো নামিয়ে গাছের তলায় ঝুরি ধরে দোল খেত তারা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কি যে আনন্দে—কি যে পুলকে ভর করে তখন থাকত তারা তা বোধ হয় ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। পালা করে পরস্পর পরস্পরকে দোল খাওয়াতো আর সমস্বরে গাইত ছড়া,—

"দোলা দোল দোলনা, ছোটো বেলার খেলোনা
বাড়লে সুন্দরী হব, বরের সঙ্গে বাজার যাব
শাঁখা কিনবো পরবো চুড়ি—তোমরা কিছু বোলো না।
হাতটি ধরে বরের ঘুরবো—তোমরা মানা করো না—
কোরো না-গো, কোরো না।
দোল দোলা দোলনা, আইবুড়োর খেলোনা,
বরের সঙ্গে মেলায় যাব, সোহাগ করে খিলি খাব
নাগর দোলায় দুলব দুজন, তোমরা কিছু বোলনা।
বরের কাঁধে চড়ে ফিরব তোমরা মানা করো না
করো না গো—করো না।।

স্মৃতিগুলো ছুরি হয়ে কাটতে লাগল যেন সুলোচনার অন্তরটাকে। এর সঙ্গে তাদের বাড়ী থেকে ভেসে আসা তারই বিয়ের সানাই-এর সুরটা মোচড়াতে লাগল যেন তার সমস্ত হৃদয়টাকে। তাদেরই বাড়ীর উপরের অন্ধকার আকাশটার বুক চিরে উড়ে যাওয়া হাওয়াই, ছরকি, বাজি ফটকা রোশনাই-এর আলোর ফুলকিগুলো যেন ভেংচি কাটতে লাগল তাকে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে লাগল ভেসে-আসা উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনিগুলো। দেখে-শুনে সেসব চোখে জল আসতে লাগল সুলোচনার। তার কান্নায় বোধ-হয় হাসতে লাগল তার ভাগ্য, টিট্‌কারী দিতে লাগল তার ভবিতব্য। না,—জীবনে এসব টিট্‌কারী বিদ্রূপের পাত্রী হয়ে আর বেঁচে থাকবে না সে। মরতে তাকে হবেই। কিন্তু মরবে সে কি ভাবে?

কেন? গলায় ফাঁশ লাগিয়ে।

ফাঁশ পাবে সে কোথায়?

কেন? তার পরনের ওই বেনারশী শাড়ীটা।

এ ফাঁশ লাগিয়ে ঝুলবে সে কোথায়?

কেন? যে বট-গাছটার ডালের ঝুরি ধরে ঝুলত সে ছোটবেলায় সেই বাল্যের সঙ্গী, খেলার সাথী এই বটগাছটার ডালে ঝুলবে সে।

আসলে, মানুষকে যখন কালে খায় তখন এই রকমই হয়। কে যে তাব এই সময় মন-মতলবের হাল ধরে কে জানে। কোন অদৃশ্য শক্তি জাগিয়ে যে দেয় তার মনে এসব চিন্তা, কে করে প্রশ্ন—কে দেয় উত্তর, কোন

অলৌকিকের ইঙ্গিতে বা ইসারায় পরিচালিত হয় যে সে তখন কেও তা জানে না। আসলে একরকম ঘোরে তখন আচ্ছন্ন হয় মানুষ। সেই ঘোরেই সুলোচনা শাড়ী খুলে তার বাঁধল গলায় ফাঁশ। উঠল বট-গাছটায়। ঝুলল গাছটার ডালে। এভাবেই আত্মহত্যা করে সুলোচনা বুড়ো রাধানাথকে গালের মত দিল চড়। বাঁচাল নিজেকে সে ঘাটের মড়াটার হাত থেকে। ঘুচল তার ভাইদের চক্ষুশূল, দূর হল তার বৌদিদের চোখের বালির কচকচানি—খচখচানি বন্ধ হল সকলের।

সেই আত্মহত্যার পাপেই নাকি পেতনী হয়ে আছে সুলোচনা ওই গন্ধেশ্বরী নদীর পাড়ে, বট-গাছটার ডালে। বহুদিন আগে মরা সুলোচনাকে হয়ত ভুলে গেছে বাঁকাদহের সবাই। সে নদীর ঘাটে বট-গাছটার পাশেই হয়েছে ভূতনাথ-বন্ধু ভজনলালের ইট-ভাটা। কিন্তু অপমৃতের আত্মার মুক্তি নাই। আত্মহত্যাকারীর সত্তার সহজে-উদ্ধার লাভ নাকি হয় না। প্রেতাত্মাটা তাই এখনও নাকি আছে ওই বট-গাছটাকে আশ্রয় করে। জীবনের ব্যর্থতা নিয়ে মরেছে সে। তাই সব জীবনের আশাকে সে ব্যর্থ করতে চায়। পায়নি জীবনে সুলোচনা সুখ-সাধ-আহ্লাদের ছোঁওয়া তাই তার সামনে কোন জীবন সুখী হোক—এটা দেখতে পারে না সে। মরেছে সে ভালবাসার আঘাত নিয়ে। প্রেমের প্রত্যাখ্যানের ব্যথা নিয়ে। তাই কারোর সঙ্গে কারোর প্রেম-ভালবাসা-প্রণয় দেখলেই সত্তাটা তার জ্বালায় হয় অস্থির। কিছুতেই এসব সহ্য করতে পারে না সে। শান্তি পায় না মনে যতক্ষণ না তাদের মধ্যে বিরূপ বাতাস বহাতে পারে সে। কব্জা করে মনটাকে তাদের। যতক্ষণ না তাদের মধ্যে প্রত্যাখ্যানের আঘাত হানতে পারে ততক্ষণ কিছুতেই স্বস্তি পায় না সুলোচনার সত্তা।

প্রসঙ্গক্রমে আরোও জানল ভূতনাথ,—মৃত্যুর সময় যেরূপ চিন্তা, যে রকম মনে ভাব নিয়ে মরে মানুষ মৃত্যুর পর সূক্ষ্মশরীরে সে ভুবর্লোকে সে ভাব নিয়েই করে অবস্থান। একদিকে প্রেম-ভালবাসা অপরদিকে মানুষের প্রতি ঈর্ষা-হিংসা, ঘৃণা-অবজ্ঞা নিয়ে মরেছিল সুলোচনা। মরে ছিল মনে রাগ-আক্রোশ ও হতাশা নিয়ে। আত্মহত্যাকারী এসব আত্মারা তাই থাকে নাকি ভুবর্লোকের নিম্ন-স্তরে-ভূলোকের মধ্যেই। তাদের রাগ-বিদ্বেষ হতাশা-আক্রোশ সত্তাটাকে তাদের এমন ভারী করে রাখে যে উপরে উঠতে দেয় না। কামনা—বাসনার টানে মনটা তাদের বাঁধা তাকে এই বাস্তব পৃথিবীতেই। সূক্ষ্মদেহটা তাদের ঘুরে-ফিরে বেড়ায় আত্মহত্যার স্থানগুলোতেই। অর্থাৎ তাদের জলে ডুবে মরা পুকুরে, জ্বলে-পুড়ে মরা ঘরে, ট্রেনে মাথা দিয়ে মরা জায়গায়, বিষ খেয়ে মরার স্থানে, গলায় ফাঁশ বা দড়ি দিয়ে মরার গাছের ডাল-বা.কড়িকাঠ ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে আটকে থাকে তাদের সত্তাটা। ভাবে তারা তাদের বাস্তব দেহটার অবলুপ্তি বা অবসানের জায়গাগুলোতে থাকলেই বুঝি আবার ফিরে পাবে তারা তাদের স্থূল শরীরটা। সে শরীর নিয়ে আবার করবে তারা বাস্তব জীবনকে ভোগ, চরিতার্থ করবে তাদের জাগতিক কামনা-বাসনা, পুরাবে মনের ফেলে আসা আশা-আকাঙ্খাগুলোকে। এমন মোহান্ধ মূঢ়-অজ্ঞান সত্তা তারা যে মুক্তির চিন্তা তাদের মনেই আসে না, জাগে না বোধে তাদের আত্মোদ্ধারের ইচ্ছা বা কামনা।

আবার শুধু যে এভাব নিয়েই তারা তাদের বিলয়-বিলুপ্তি বা আত্মনাশের স্থানগুলোতে অবস্থান করে তা নয়। বিরাজ করে তারা আত্মহত্যার ক্ষেত্রগুলোতে তাদের হিংসুটে স্বভাব, বিদ্বেষী মনোভাব ও আক্রোশ-পরায়ণ সত্তাটা নিয়ে। তাদের মত উক্ত স্বভাব-প্রকৃতি সম্পন্ন বা দুর্ব্বলচেতা কোন মানুষ যদি বিশেষ কোন ক্ষণ-তিথি বা বিরূপ কোন যোগ-মুহূর্ত্তে আসে তাদের কাছে বা ক্ষেত্রগুলোতে তবে তাকে পেয়ে বসে তারা। কব্জা করে মনটাকে তার, তাদের বশে ফেলে তারা তাকে। তারপর তারা যে যেভাবে আত্মহত্যা করেছিল—যেমন গলায় ফাঁশ, গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে ঝাঁপ, বিষ খাওয়া, নিজের কাপড়ে আগুন লাগানো ইত্যাদি—সেই সব দিকে মনটাকে তাদের ঠেলে নিয়ে যায়, এবং প্ররোচনা দেয় তাকে আত্মহত্যার। তাই দুর্ব্বল-মনা সাধারণ মানুষের অর্থাৎ যারা কাম-ক্রোধ-লোভ রিপুর বশ বা উত্তেজনার অধীন, হট্‌কারী, বদ-মেজাজী তাদের এসব আত্মহননের ক্ষেত্র, অপমৃত্যুর স্থান ও অপঘাতে জীবন-নাশের জায়গাগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। অন্ততঃপক্ষে মনে রাগ-দ্বেষ-উত্তেজনা নিয়ে এসব ক্ষেত্রগুলোতে যাওয়া ঠিক নয়। এমন কি এসব অসৎ আত্মাদের আত্মহত্যার বস্তু—যেমন গলায় দেওয়া দড়ি, আত্মনাশের ছোরা-ছুরি কুঠার-কাটারি, অসমাপ্ত বিষ বা বিষের বোতল ইত্যাদিগুলোর প্রতিও একরূপ দৃষ্টি থাকে। থাকে তাদের ওসবরে উপর এক রূপ মোহ বা

আকর্ষণ। আশাহত, বিষাদ-গ্রস্থ, রাগ-অভিমানক্ষুব্ধ মানসিক দুর্ব্বলত গ্রস্থ কোন মানুষকে পেলেই তারা তাদরে ওইসব আত্মনাশের বস্তর প্রতি আকর্ষণ করে। এসব দেখলেই সেই সব মানুষের মনটা পড়ে একরূপ ঘোরে। সেই ঘোরাচ্ছন্ন মনটাকে তখন তারা পরিচালতি করার চেষ্টা করে ওই সব দ্রব্য সামগ্রীর মাধ্যমে আত্মহত্যার দিকে। বিশেষ করে রাগ-দ্বেষ বা উত্তেজেনার মুহূর্ত্তেএসব জিনিষ দেখলে বা ওইসব আত্মনাশের ক্ষেত্রগুলোতে গেলে তো কথাই নেই। তাই আত্মহত্যাকারীর ওইসব ছুরি ছোরা বা দড়ি ইত্যাদি জিনিসগুলো সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে বা যে কোনভাবে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিতে হয়। আর আত্মনাশের ওই ক্ষেত্রগুলোতে কোন ধৈয্যহীন, ক্রোধোন্মত্ত মানুষকে যেতে দিতে নেই। পারত পক্ষে সব মানুষেরই নাকি এসব ক্ষেত্রগুলো এড়িয়ে চলা উচিত।

প্রসঙ্গক্রমে আরো এক অদ্ভুত কথা জানল ভূতনাথ সতীর মুখ থেকে। আত্মহননের স্থান-বস্তর অনুকণাকে কেন্দ্র করে নাকি আবর্তন করে আত্মহত্যাকারীর মৃত্যু-কালীন মনোভাব, ভাবনা-চিন্তাগুলো। সূক্ষ্ম-সত্তায় ভেসে বেড়ায় তারা তাদের স্বভাব-প্রকৃতি ও তৎকালনী মনের গতি ও ঈর্ষা-হিংসা রাগ-আক্রোশ ইত্যাদি নিয়ে। ওসব অসৎ আত্মাদের বাতাবরণে পড়লে সাধারণ মানুষ অদ্ভুতভাবে তাদের ভাব-প্রকৃতির বশে পড়ে যায়। প্রেতাত্মারা বিশেষ করে তাদের মৃত্যুকালীন তিথি-নক্ষত্রের ক্ষণ ধরে তাদের এক্তিয়ারে আসা যে কোন মানুষের প্রতি ছায়া ফেলতে পারে। পারে বহাতে সেরকম মানুষের উপর তাদের মনের কু-বাতাস। তাছাড়া সেখানের বস্তুকণাকে আহরণ করে অবয়বও ধারণ করতে নাকি পারে তারা। তাদের এই মূর্ত্তিধারণ হয়তো ঠিক ঠিক তাদের বাস্তব দেহের মত হয় না। হয় না দেহাবয়বের গঠন ইত্যাদি যথাযথ বা বাস্তবানুগ। তাদের ওই কিম্ভুত কিমাকার আকার দেখে অনেকে ভয় খায়। ভয়ে অনেকে মূর্চ্ছা যায়। অনেকে আবার তাঁদের সেই ভৌতিক-রূপের যাদুশক্তিতে বা মোহে যায় পড়ে। এ মোহের বশে মানুষ তখন তার নিজস্বতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে। প্রেতাত্মাটাই তখন তার ইঙ্গিতে বা ইসারায় চলতে তাকে বাধ্য করে। ওই সমস্ত ভৌতিক ঘোরে, মোহে বা যাদুতে পড়লে মানুষ নাকি ভুলে যায় তার সব—আত্মীয়-স্বজন, স্থান—কাল-পরিবেশ ইত্যাদি সমস্ত কিছু। থাকে না তার ঘর-সংসারের চিন্তা। প্রেতাত্মাটার পিছনে পিছনে সে শুধু ঘুরতেই থাকে। চলে তার কথায়, বলে তার কথায়। এমন কি তার সমস্ত ক্রিয়া-কাণ্ড, আচার-আচরণ হয় সেই প্রেতাত্মাটারই মত বা অনুরূপ। তাকে বশ করা প্রেতাত্মাটাকে হয়ত অপরে কেও না দেখতেও পারে। না শুনতেও পারে হয়ত তার কথা। কিন্তু সেই ভূত-ভর বা প্রেতাত্মা-বশীভূত মানুষটা তাকে এমন স্পষ্টভাবে দেখতে পায় বা শুনতে পায় তার কথা যে সাধারণ মানুষ[illegible] তত ভালভাবে দেখতে পায় না। পায় না হয়ত তত ভালভাবে শুনতে বা বুঝতে সাধারণ মানুষের কোন কথা। আত্মনাশকারী এসব নীচাত্মা কোন মানুষকে একবার বাগে পেলে সহজে কিন্তু ছাড়ে না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যতদিন না তাকে তার মত আত্মহত্যা করাতে না পারছে ততদিন তার পিছনে লেগে থাকে আঁঠার মত। যে কোন দুর্ব্বল মুহূর্তে ফাঁকে পেলেই তাকে ফাঁদে ফেলে আত্মহননের। সূক্ষ্ম-সত্তায় সঙ্গী করে তাকে তারা নরক করে গুলজার। তাই নাকি বিশেষ করে রাগ-দুঃখ, ক্ষোভ-অভিমানের অধীন হয়ে কখনও যেতে নেই ওসব আত্মহত্যার স্থানে। আর ওসব জায়গায় যদি মাড়াতেই হয় তাহলে মনকে সবল-সতেজ বিবেক সচেতন করে বা ভগবানের নাম-চিন্তায় নিমগ্ন রেখে যেতে হয়।

আত্মহত্যার পর থেকে সুলোচনার প্রেতাত্মা তার নাকি ওই ক্রুর স্বভাব, নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও নীচ-হীন প্রেতীয় মনোভাব নিয়ে অবস্থান করছিল ওই বট-গাছটার [illegible]লে। ভোজু-মীনার প্রেমের বাতাস; ভালবাসার আঁচ জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল তার ঈর্ষা-কাতর হিংসা-পরায়ণ সত্তাটাকে। যে সুখ সে জীবনে পায়নি, যে সাধ-আহ্লাদ তার জীবনে পূর্ণ হয়নি—সে আশা আকাঙ্খা তার সামনে, অপরের জীবনে পূর্ণ হবে—তাই কি কখনও হয়? ফেলল সে তার বিষের নজর। মীনার একনিষ্ঠ প্রেম-সাধনার শুদ্ধসত্তায়, সাবিত্রী স্বভাবা দেব-দ্বিজে ভক্তি পরায়ণা পবিত্র হৃদয়ে সে নজর তার হয়নি প্রথমে কার্য্যকরী। তাই আশ্রয় করল সে নারী দেহ-লোভী ভোগ-পরায়[illegible] ভোজুর মনকে। বহিয়ে তার বাতাস মনকে ভোজুর কামোত্তেজনায় উত্তেজিত করে মীনার দেহকে অবৈধভাবে করল সে ভোগ। অধর্মাচরণের পথ ধরে নলের শরীরে শনির প্রবেশ করার মত মীনার উপর বহাল তার বিরূপ হাওয়া। এ দুর্ব্বলতায় না পড়লে মীনা হয়তো প্রেমের বলেই পেত জীবনে সে ভজনলালকে। শুদ্ধ রাখলে

ভালবাসাকে তার সেই পবিত্রতার পথেই জয় করতে পারত সে সমস্ত কিছু। কিন্তু জীবনে এভাবে ভুল করেই সে নাকি ডেকে আনল তার জীবনে এ বিপর্যয়। আত্মহত্যার হীন ইচ্ছা মনে জাগতেই মীনার বট-গাছটার ওই নীচ সুলোচনার প্রেতাত্মাটা করল তাকে কব্জা। বহাল তার মধ্যে আত্মনাশের হাওয়া। বশে এনে তার ঘোরে ফেলল তাকে। তারপর তারই মত গলায় শাড়ীর ফাঁশ লাগা করিয়ে উঠাল তাকে বট-গাছটায়। তারপর তার আশ্রয় করা ডালটাতে গিয়ে ঝুলাল তাকে। করাল মীনাকে আত্মহত্যা।

—কিন্তু আমি এতদিন ছিলাম তো ইট-ভাটায়। কাল-সন্ধ্যায়, রাত-আঁধারে কতবার তো একলা ঘুরেছি, বসেছি, থেকেছি ওই বট-গাছটার তলায়। পাইনি তো দেখতে কোনদিন সুলোচনার প্রেতাত্মাটাকে।

উত্তরে ভূতনাথের বলে উঠল সতী,—তোমাকে তো আগেই বলেছি ভূতুদা। ওসব নীচ আত্মাদের সৎ সত্তাদের সামনে আসার ক্ষমতা নেই। নেই তাদের শক্তি তোমাদের মত শুদ্ধ-মনা, পবিত্র-চেতা, দেব-স্বভাবের মানুষের গায়ের বাতাস সহ্য করার বা দেহের আভার সামনে দাঁড়াবার।

—কিন্তু গলায় ফাঁশ লাগিয়ে আত্মহত্যা করা মীনার আত্মাও তো নীচ? তাহলে ওই অসৎ-সত্তাটার কথা শুনতে পেয়েছিলাম কেন আমি? দেখতে পেলাম কেন তার সেই ভৌতিক-দেহটা ঝুলন্ত অবস্থায় ওই বট-গাছটার ডালে?

"—সে অন্য এক কারণে ভূতুদা।" বলে উঠল সতী,—"আসলে কিন্তু মীনার আত্মাটা সুলোচনার আত্মার চেয়েও অনেক হীন। পড়ে আছে সে অনেক নীচু পর্যায়। সুলোচনা শুধু আত্মহত্যার পাপে পাপী। কিন্তু মীনার আত্মহত্যার পাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার ভ্রূণ হত্যার পাপ। পেটে সন্তান নিয়ে মরেছিল সে। তাই সে মহাপাপী। এই মহাপাপের ফলে "শাকচুন্নী" নামক প্রেতাত্মা হয়ে অবস্থান করছে মীনা তোমার ভোজু বন্ধুর ইট-ভাটার ওই বট-গাছটার ডালে। এরা শুধু নীচাত্মাই হয় না ভূতুদা—হীন পর্যায়ের পেত্নী পিশাচিনীদের চেয়েও হয় এরা মারাত্মক। ভয়ঙ্করতা ছাড়া এদের স্বভাবে আর অন্য কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। প্রকৃতি হয় এদের নিষ্ঠুর। সাধারণ ভূত-প্রেতরা গন্ধ-শব্দ শুধু নয় রূপ তন্মাত্রা আশ্রয় করেও মাঝে-মধ্যে অবয়ব ধারণ করতে পারে। কিন্তু এরা এসব ব্যাপারে এমন হীন শক্তি সম্পন্ন যে তাও পারে না সহজে। ধাত পাতলা, রাশ-দুর্ব্বল মানুষ পেলে তারা ওই শব্দ-গন্ধ ইত্যাদি তন্মাত্রার নীচু পর্যায়ের উপাদানগুলোকে আহরণ করে ভয় দেখায়। আর ভয়ে মানুষ সেরকম কাবু হয়ে গেলে—তাদের সেই ভয়কেই আশ্রয় করেই কখনও কেমনও মূর্ত্তিমান হয়ে উঠে। সে ভৌতিক চেহারা হয় তাদের যেমনি কদাকার তেমনি ভয়ঙ্কর।

তবে সতীর কথা হল নাকি ভূতনাথদের মত শুদ্ধ সত্ত্ব, মানসিক শক্তি সম্পন্ন মানুষের সামনে তারা সেরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিধারণ করতে পারে না। পারে না মানে—রূপ ধারনের নিমিত্ত কোন বাস্তব অনুকেই নাকি তারা পবিত্র আধারের সামনে আহরণ করে সংবদ্ধ রাখতে সমর্থ হয় না। হয়—এসব দেহের বাতাস লেগে সে-সব অনু উড়ে যায় কিংবা সাহসিকতার আঁচ-লেগে সে সব বাষ্পীভূত হওয়ার শূণ্যে যায় মিলিয়ে। শুধু রূপ-তন্মাত্রা কেন—শব্দ-গন্ধ-ইত্যাদি তন্মাত্রার বাস্তব অনু বা উপাদান কনাগুলোকেও তারা সৎ আধারের সামনে তেমন আকর্ষণ করে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে না। চেষ্টা করলেও সে সব অনুকনা তারা ঠিকমত সন্নিবেশ করতে সমর্থ হয় না। পারে না তাদের ইচ্ছেমত সেসব ঠিকমত টেনে রূপে আনতে। পবিত্রতার হাওয়ার সে সব এলোমেলো হয়ে যায়। এদিক দিয়ে তাই তারা অন্য প্রেতাত্মাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতা সম্পন্ন। তবে ভূতনাথ যে শুনেছিল ভোজুর ইট-ভাটায় মীনার ভৌতিক স্বর, ভোজুর গল্পা বা দেখেছিল যে সে মীনাকুমারীর গলায় ফাঁশ লাগিয়ে বট-গাছটার ডাল থেকে তার ঝুলন্ত প্রেতাবয়ণ মূর্ত্তি তা নাকি অন্য কারণে।

কারণটা হল এসব নীচু স্তরের আত্মাগুলো নাকি তাদের মৃত্যুর তিথি-নক্ষত্র যোগ-ক্ষণে বিশেষ এক ধরনের শক্তি পায়। তাদের মৃত্যুকালীন কালক্ষণে বিশেষ একরূপ ক্ষমতার অধিকারী হতে নাকি পারে তারা। ভূতনাথ যে সময় গিয়ে হাজির হয়েছিল তার ভোজু-বন্ধুর ইট-ভাটায়, সেই বট-গাছটার তলায় কাল-সন্ধ্যার সেই সময়টা ছিল মীনার মৃত্যুক্ষণ। তার মৃত্যুকালীন তিথি-নক্ষত্রের যোগটাও পড়ে গেছল ঠিক সেই সময়টাতেই। এসব যোগ পেলে নাকি ওইসব নীচাত্মা বা হীন সত্তারা তাদের সেই বিশেষ ক্ষমতা বলে শব্দ সৃজন, রূপ ধারণ

সহজে করতে পারে। পারে তারা জীবনের সুখক্ষেত্র, আনন্দ-স্থান, স্ফূর্ত্তি লোটার জায়গাগুলোতে জীবনের সেই সমস্ত ঘটনার স্মৃতি আকর্ষণ করে সেগুলোকে বাস্তব রূপ দিতে। অবশ্য রূপ দিতে পারলেও সে সব ঘটনা ঠিক মত বাস্তবের আকার প্রাপ্ত হয় না। হয় ছায়া ছায়া, ভাসা-ভাসা, হাল্কা হাওয়ার মত এসে মেলো। তাহলেও এ ছায়া-ছবিতে তারা তাদের জীবনের ফেলে আসা সুখকর স্মৃতি, স্ফূর্ত্তি-মজার মুহূর্ত্তগুলো অভিনয় করে একরূপ আনন্দ পায়—প্রেতীয় আনন্দ। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মত এক অসম্পূর্ণ তৃপ্তি। তবে তাদের এই ভৌতিক সুখ উপলব্ধি বেশীক্ষণ নাকি স্থায়ী হয় না। কারণ সুখের পরই তো আসে আবার জীবনের সেই দুঃখময় মুহূর্ত্তগুলো। অর্থাৎ জীবনে পর পর যা ঘটেছিল তাদের অভিনয়ের, টানে পর পর গাঁথা-থাকা সেই সব ঘটনাগুলোও নাকি এসে পড়ে আপনা আপনি। সুখের ঘটনার সুখটা যেমন ভোগ করে তারা তেমনি দুঃখের ঘটনার দুঃখ-কষ্ট বা অশান্তির জ্বালা-যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয় তাদের। বলে উঠল সতী,—এসব কথা তোমাকে তো আগেই বলেছি ভূতুদা। একটা টানলে পরেরটা আপনিই এসে পড়ে। এসে পড়ে ঠিক সিনেমার রিলের মত পর পর। পর পর টেপে বাঁধা সুরের মত বাজতে থাকে সেসব ঘটনার কথা-বার্তা বাক-বিতণ্ডা ইত্যাদি।

এমন অজ্ঞ-অবোধ সত্ত্বা তারা যে সুখের লোভে দুঃখের স্মৃতি বার বার এসে আত্মাকে যে তাদের কষ্ট দেয়, মনকে করে যে অযথা বেদনা ভারাক্রান্ত তা কিন্তু বুঝেও বুঝে না তারা। স্বল্প-শক্তির আত্মা হওয়ার জন্য সুখানুভূতির লোভে তাদের ফেলে-আসা জীবনের যে কোন ঘটনা, স্মৃতির টানে যেখান থেকেই রূপ দিতে আরম্ভ করুক না কেন, একবার শুরু করলে তা কিন্তু আর বন্ধ করতে পারে না। সেই ঘটনা পরম্পরার ধারা মাঝ-পথে থামিয়ে দেবারও সামর্থ নেই তাদের। তাই জীবন-নাট্যের যবনিকা পতন পর্য্যন্ত অভিনয়ের ছলে সবকিছু ভোগ করতে হয় তাদের।

সেদিন কাল-সন্ধ্যায় ইট-ভাটায় ভূতনাথের সামনে মীনারও হয়েছিল তাই। প্রেমভালবাসার ক্ষেত্রে তার উপযুক্ত ক্ষণ যোগে আকর্ষণ করেছিল সে তার ভোজুদার সঙ্গে প্রেমালাপের সেই আনন্দজনক শুভ মুহূর্ত্তটাকে। কিন্তু তারপর, পরের পর জীবনের তার সব ঘটনাই এসে যেতে লাগল আপনা আপনিই। প্রথমে শব্দ-তন্মাত্রায় ভেসে উঠা তা দের সেই কথা-বার্তা বা বাগ-বিতণ্ডা গুলোই এসেছিল ভূতনাথের কানে। এসব শুনে সামান্য যখন ভয়গ্রস্থ হল ভূতনাথের মনটা তখন তার সূত্র ধরে মীনা সামনে তার ভেসে উঠতে চাইল তার বাস্তব রূপটা নিয়ে। উদ্দেশ্য, অবশ্য তাকে ভয় দেখানোর জন্য নয়—তার কাছে থেকে তার ভোজুদার সন্ধানটা জানবার জন্য। কিন্তু রূপ ধরতে সমর্থ হল সে যখন তখন ঘটনার ধারা ঠেলে এনেছে তাকে জীবনের শেষ পর্য্যায়। তাই বট-গাছটার ডালে গলায় ফাঁশ লাগানো অবস্থায় ঝুলন্তরূপ দেখল ভূতনাথ মীনাকে অর্থাৎ মীনার প্রেতাত্মাটাকে। দেখল তা ও রূপ কদাকার ও বীভৎস অবস্থায় কারণ নিম্ন-আত্মিক সে রূপ জাগতিক আকার ধারণ করার মত তার তেমন ক্ষমতা ছিল না। ক্ষীণ শক্তি সম্পন্ন, নীচ সত্ত্বা ছিল বলে সে তার পরিণতির ধারা রোধ করতে পারেনি শেষ পর্য্যন্ত। স্মৃতি টান তাকে তার অন্তিমের সেই গলায় ফাঁশ আটকে যাবার যন্ত্রণা, দম-বন্ধ হবার কষ্ট, কাতরানি-ছটফটানি সব ভোগ করতে হয়েছিল। সেই যন্ত্রণা-কাতর অবস্থাটাই ভূতনাথ দেখেছিল বলে মীনাকে তার তখন এত ভয়ঙ্কর ঠেকেছিল।

শুনে ভূতনাথ বিস্ময়ে হল হতবাক। তার বিস্ময়ভরা বাক্যহারা মুখটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল সতী,—"আসল কথা হল ভূতুদা," জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। মনের পর্দ্দায় আঁচড় কাটা জীবনের কোনো ঘটনাই যায় না একেবারে মুছা। বিশেষ করে জীবনের প্রেম-ভালবাসার ছাপ। মনের রঙে রাঙিয়ে যাকে একবার হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করা হয় তার স্মৃতি মৃত্যু পরও ধরে থাকে সত্ত্বা তেমনি আবেগ-আকুল আকর্ষণে।

মরেও তাই মীনার সত্ত্বা ছাড়তে পারনি ভজনলালকে, ভুলতে পারেনি তার প্রেম-ভালবাসার স্মৃতি। সে স্মৃতি আঁকড়ে ধরে এখনও অবস্থান করছে সে পেত্নী হয়ে তার ভাটার ওই বট-গাছটার ডালে। আশা তার—তার ভোজুদা কখনও প্রত্যাখ্যান করে যেতে পাবে না তাকে। সাময়িক রাগের বশে সে ছেড়ে গেলেও একেবারে ভুলে থাকতে পারবে না সে তাকে। রাগ পড়লেই আবার আসবে সে তার কাছে। সোহাগভরে আবার তাকে টানবে নিজের বুকে। আসবে সে তো তাদের এই গোপন প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্র ইট-ভাটাতেই কিন্তু এসে যদি তাকে না দেখতে পায় তাহলে তো পড়া রাগ তার আবার যাবে বেড়ে। তাই প্রতীক্ষা করে আছে মীনা বট-

গাছটার ওই ডালে। সেখান থেকে ফেলছে তার সন্ধানী নজর এধার ওধার—কোথায় তার ভোজুদা। যকের মত আগলে আছে সে তার ভোজুদার ইট-ভাটা। ভাটার একটা ইটও যদি কেও চুরি করার মতলবে আসে তবে জেগে উঠে মীনার প্রেতুড়ে স্বভাবটা। নিস্তব্ধ নিঝুম ঝড়-বিহীন ভাটাটায় আচমকা সে বট-গাছটার তার গলায় ফাঁশ লাগিয়ে মরা ডালটাতে তুলে এমন ভূতুড়ে ঝড় যে ভয়ে ছুটে পালায় লোক। শুধু তাই নয়, তার আস্থানায় তার ভোজুদার কেও কোন ক্ষতি করার কুমতলব নিয়ে এলে সূক্ষ্ম-সত্তাটা মীনার বেজায় উঠে ক্ষেপে। চিতার কাঠ-কয়লা, মড়ার খুলি, শ্মশানের মুড়ো কাঠ, ছাই, হাঁড়িভাঙ্গা, খোলাম-কুচি চারধার থেকে তার দুপদাপ করে এমন শুরু করে ফেলতে যে ভৌতিক কাণ্ড দেখে তার রাশ-ভারি মানুষ হলেও ভয়ে চিৎকার করে সে স্থান ছেড়ে পালাতে পথ পায় না। সবাই নাকি জানে এখন ভোজুর ভাটাটা "ভূতুড়ে-ভাটা" হয়ে গেছে। গলায় দড়ি দিয়ে মরে মীনা শাকচুন্নী হয়ে আছে সেখানে। তাই কাল-সন্ধ্যায় শুধু নয় দিন-দুপুরেও কেও নাকি যায় না গন্ধেশ্বরী-নদীর বটতলার ওই ঘাটটার দিকে। ভাটার চৌহদ্দির ধারে-পাশে ছাগল-গরু পর্য্যন্ত চরাতে আসে না বাঁকাদহ গ্রামের কোন বাগাল ছেলে বা রাখাল—মুনিস। ওধারের ধারে-পাশে কেও না গেলে মাঝে মধ্যে অনেকেই নাকি হঠাৎ শুনতে পায় শাকচুন্নীটার করুণ আর্ত্তনাদ, প্রাণ-ফাটানো চিৎকার। মাঝ-রাতে এ চিৎকার কানে এলে নাকি ঘুমও প্রায় ঘুচে যায় আশ-পাশ গ্রামের লোকের। আতঙ্কিত হয়ে থাকে ওই আর্ত্তনাদে।

এর কারণটা নাকি অদ্ভুত। পেটে বাচ্চা নিয়ে মরার জন্যই তো হয়েছে মীনা শাকচুন্নী রূপিনী প্রেতিনী। যে আত্মাটা তার মাধ্যমে পার্থিব জীবনে আসবার জন্য গর্ভে তার নিয়েছিল আশ্রয়—তাকে তো আসতে দেয়নি মীনা। নিজে মরার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণ অবস্থায় মেরে তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে তার জীবনে আসার আশা। সেই রাগে নাকি বাচ্চাটা সূক্ষ্মসত্তায় এঁঠুলীর মত লেগে থাকে তার পেটে। ভৌতিক সত্তায় চুষে খায় তার রস রক্ত সমস্ত কিছু। মাঝে-মধ্যে এমন নাকি বিত্তাপ করে তার গর্ভের মধ্যে যে নাড়ী-ভুঁড়ি ছিড়ে তার করে তছনছ। সেই ফুটি-ফাটা পেট আর ছেঁড়া ঝুলন্ত নাড়ি-ভুঁড়ি নিয়ে চিৎকার করে সে যন্ত্রণায়। বাঁনরের মত লাফিয়ে বেড়ায় নাকি মীনা-পেতনীটা সেই বট-গাছটার এডাল ওডাল। তার এই যন্ত্রণা-কাতর চিল চিৎকারই নাকি ডাঙ্গা ছাপিয়ে গ্রামগুলোতে গিয়ে ভাঙ্গায় সকলের রাতের নিদ্রা দিনের সোয়াস্তি। আতঙ্ক গ্রস্থ করে রাখে সমস্ত অঞ্চলটাকে। ভোজুর ভালবাসার সুখের পরশ বা গোপন প্রণয়ের সুখানভূতি স্মৃতি ধরে টানতে গেলেই ওমনি মীনার মনে জেগে উঠে তার ওই গর্ভের কথাটা। আর জাগলেই ওমনি তার পেটের প্রেতাত্মা খুঁচিয়ে খেতে থাকে তাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য এক জ্বালায়, অবর্ণনীয় এক যন্ত্রণায় ছটফট করে বেড়ায় মীনা।

শুনে বড় বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল ভূতনাথের মনটা। তাই জিজ্ঞেস করে উঠল সে সতীকে,—এ অবস্থা থেকে মীনা ওভাবে কষ্ট পাবে কতদিন। প্রেতীয় অবস্থা থেকে সে কি মুক্তি পাবে না?

—তোমার বন্ধু ভজনলালের আশায় আটকে থাকা সত্তাটা তার যতদিন না এই স্থানটার মায়া ত্যাগ করতে পারছে ততদিন তার এ অবস্থা থেকে মুক্তি নেই ভূতুদা।

—ভোজুর আশায় এখানে তাকে আটকে থাকতে হবে কেন? সে তো সূক্ষ্মাত্মা। সূক্ষ্মাত্মারা সূক্ষ্ম-দৃষ্টির বলে ইচ্ছা-মাত্রই যাকে-তাকে দেখতে পায়। সূক্ষ্ম-অবয়বে চিন্তা মাত্রই তারা যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সামনে হাজির হতে পারে। আমি না হয় সন্ধানে তার ইট-ভাটা, গাছ-তলা, এধার-ওধার ঘুরে বেড়াতে পারি। কিন্তু সে? তার তো শক্তি আমার মত সীমাবদ্ধ নয়। সূক্ষ্ম-শক্তির অধিকারী সে। এ শক্তিকে বাস্তবে কোন কিছুই বাধা দিতে পারে না। তীব্র, তীক্ষ্ম, প্রখর বিদ্যুৎগামী এ শক্তি। এ শক্তির বলে সে তো সর্বত্র গামী, সম্যগ-দৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারে। সব জান্তা এ শক্তি নিয়ে বোকার মত এখানে বসে তার ভোজুদার জন্য অপেক্ষা করার দরকার কি?

ভূতনাথের কথার বেশ একটু ভাবল সতী। তারপর দিল উত্তর তাকে,—শোন ভূতুদা, পৃথিবীতে জন্মালেই যেমন কেও সীতা-সাবিত্রী, জ্ঞানী বুদ্ধ—আচার্য্য শঙ্কর বা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ হতে পারে না তেমনি মৃত্যুর পর সূক্ষ্মস্তরে এলেও কেও ওমনি সূক্ষ্ম শক্তির অধিকারী হতে পারে না। বিশেষ করে মীনার মত আত্মহত্যাকারী, ভ্রূণ-নষ্টকারী, পাপাত্মারা। পাপের ভারে তারা যেমন সর্বত্রগামী হতে পারে না তেমনি জাগতিক কামনা-বাসনায় মোহাচ্ছন্ন থাকার জন্য সম্যগ্-দৃষ্টিও লাভ করতে পারে না তারা। এসব হীন-সত্তারা অবশ্য এর-ওর

বশে পড়ে সূক্ষ্ম নানা কাজ বা নানা স্থানে গমনাগমন করতে পারে। কিন্তু তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টি ইত্যাদি শক্তি স্থূলদেহধারী মানুষ অপেক্ষা খুব একটা বেশী নয়।

বুঝল ভূতনাথ—তাই মীনার প্রেতাত্মাটা ওমনি শবরীর মত প্রতীক্ষা করে আছে তার ভোজুদার জন্য ভাটার ওই বটগাছটার ডালে। জানল সে সেদিন যে সূক্ষ্ম-সত্তাটা তার শব্দ তন্মাত্রা আহরণ করে ভোজুর গলা অনুরণিত করেছিল তা ভূতনাথের মনটাকে তার দিকে আকর্ষণ করবার জন্য। তার ভোজুদার বন্ধু বলে ভূতনাথকে জেনে ছিলই বলেই মীনা নেমে এসেছিল ওই বট-গাছটার ডাল থেকে। তার কাছ থেকে তার ভোজুদার সন্ধান জানবার জন্য। শাকচুন্নী মূর্ত্তি ত্যাগ করে সে যে বাস্তব রূপে ভূতনাথের কাছে ধরা দিতে চেয়েছিল—তার উদ্দেশ্য অন্য কিছু ছিল না। ছিল-ভূতনাথ যাতে ভয়গ্রস্ত হয়ে না পালায়; মানুষ হিসেবেই জানায় যাতে তাকে তার ভোজুদার সমস্ত কথা। পরিণতির ধারা তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ওই গলায় ফাঁশ লাগান ঝুলন্ত অবস্থায় না ফেললে হয়ত সে তার ভোজুদার খোঁজ নেবার জন্য করত তাকে অনুনয় বিনয়।

কিন্তু তা তো হল—ভোজু তাহলে কোথায়? কোথায় গিয়ে সকলের কাছে এভাবে লুকিয়ে রইল সে? হারিয়ে গেল সে এমনভাবে কোন জায়গায়? আচ্ছা—বেঁচে আছে তো সে? থাকলে বেঁচে কোনখানে, কি ভাবে, কেমন অবস্থায় আছে সে? আর না বেঁচে থাকলে—হঠাৎ ধ্বক্ করে উঠল ভূতনাথের মনটা। প্রেম-স্নেহ-ভালবাসার বোধ হয় স্বভাবই এই—অকারণ অনিষ্ট আশঙ্কা করা। ভজনলালের মৃত্যুর কথা চিন্তা করতেই কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল ভূতনাথের অন্তরটা। যতই হোক এবং যাই করুক জীবনে ভজনলাল—তবুতো সে তার বন্ধু। স্নেহের ভিক্কে—ভাই ভোজু, একান্ত আপনজন তার। অজানা আশঙ্কায় তোলপাড় করতে লাগল ভূতনাথের হৃদয়টা। তাকে হারানোর ব্যথা উদয় হতেই মনে বিমর্ষ করে দিল ভূতনাথকে। দুশ্চিন্তায় চিত্তটা হল তার বেদনা-ভারাক্রান্তি।

চিন্তার স্পন্দন ভূতনাথের বোধ হয় স্পর্শ করল সতীকে। তাই না জিজ্ঞেস করতেই বলে উঠল সে,—তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই ভূতুদা। বন্ধু তোমার বেঁচে আছে। তবে এ বন্ধু তোমার সে-বন্ধু আর নেই। নেই তোমার ভিক্কে-ভাই আর সেই বাঁকাদহের ইট-ভাটার মালিক। পাল্টে গেছে সে। সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে তার জীবন।

"—আছে বেঁচে ভোজু? কোথায়? কোনখানে? কেমন ভাবে?" ব্যাকুলতায় যেন ফেটে পড়ল ভূতনাথ।

"—তোমার বন্ধুর ভাগ্য খুব ভাল ভূতুদা।" বলে উঠল সতী,—"তার পূর্ব জন্মের সুকৃতির সঙ্গে ইহ জীবনে পিতা-মাতার পুণ্য-ফল যুক্ত হয়ে তাকে রক্ষা করেছে আত্মহত্যার কবল থেকে। এর সঙ্গে হয়েছে যুক্ত আত্মহত্যাকারিনী তার প্রেমিকা মীনা কুমারীর তার প্রতি সৎ ইচ্ছা ও পবিত্র কামনা। বলতে গেলে তারই এই ঐকান্তিক ইচ্ছা-কামনাই নিয়ে গেছে বন্ধুকে তোমার সৎ-পথে।

সে-কি কথা! হতভম্ব ভূতনাথ! বুঝতে কিছু না পেরে সে তাকিয়ে রইল সতীর মুখটার দিকে বোকার মত। না থেমে সতী বলে যেতে লাগল তাকে তেমনি ভাবেই,—আত্মহত্যা করে মরলেও মীনা. হলেও মহাপাপের পাপী, তার ভোজুদার প্রতি সে কিন্তু তার আশা-ভরা সৎ ইচ্ছা নিয়েই মরেছে। ভোজুদা'র কোন অমঙ্গল চিন্তা বা মৃত্যু কামনা করেনি সে। ভোজুদা তার সৎ হোক, আদর্শ প্রেমিক হোক তার, তার মত সেও তাকে ভালবাসুক একান্তভাবে, বাসুক তাকে ভালো তারই মত সে তাকে মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, হৃদয় এবং অন্তর দিয়ে। সুমতি হোক তার, দূর হোক তার—তার প্রতি বিরূপ মনোভাব। ভুল ভাঙ্গুক তার। এই ছিল তার মৃত্যু-পূর্ব ইচ্ছা। ভগবান বোধ হয় কারো অন্তিম-কামনা অপূর্ণ রাখেন না। তাই মনে হয় বন্ধুর তোমাব ফিরেছে জীবনের মোড়। অবলম্বন করেছে সে সৎ-পথ। এক মহা তাপসের আসনে আসীন হয়ে আছে সে এখন।

"—তোর কথার রহস্য আমি কিছু বুঝতে পারছি না সতী।" বলে উঠল ভূতনাথ,—হেঁয়ালী রেখে স্পষ্ট করে বল আমাকে ভোজুর কথা। তার জন্য চিত্ত আমার চঞ্চল। বড় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি আমি তার সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জানবার জন্য। বল, কোথায়, কিভাবে আছে সে।

—সাধু হয়ে গেছে তোমার বন্ধু। আছে সে এক আশ্রমে। এক মহা তপস্বীর পাটে বসে করছে সে ভগবৎ সেবা। জগন্মঙ্গল কর্মে উৎসর্গ করে নিজেকে করে চলেছে সে পরোপকার।

আশ্চর্য্য! এযে অদ্ভুত কথা শোনাল সতী-তাকে। পশ্চিম দিকে সূর্য্য উঠা, আকাশে ফুল ফোটা, অমাবস্যার রাতে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হওয়ার মতই এযে অসম্ভব। অবিশ্বাস্য যে ভোজুর মত নীচ-স্বভাব, হীন চরিত্রের লোকের পক্ষে হঠাৎ ওমনি সাধু হওয়া। অনুরোধ করে উঠল ভূতনাথ সতীকে,—তোর কথা অস্বীকার করার মত ক্ষমতা আমার নেই সতী। কিন্তু দেখাতে পারিস আমাকে একবার ভোজুকে। তার সাধু রূপটা দেখবার জন্য প্রাণটা আমার আনচান করছে। পারবি না তাকে দেখাতে আমাকে একবারটি?

"—পারি দেখাতে" বলে উঠল সতী, "—কিন্তু কথা দিতে হবে তোমাকে, দেখলে তাকে তার সঙ্গে কোন কথা-বার্তা বলতে পারবে না তুমি। করতে পারবে না তাকে কোন ইসারা বা ইঙ্গিত। এককথায় তার সঙ্গে কোনরকম ভাবেই কোনরূপ যোগাযোগ করতে পারবে না তুমি।"

দিল কথা ভূতনাথ। কারণ যার সম্বন্ধে যা কখনও কল্পনাও করতে পারেনি ভূতনাথ। পারে নি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে বা ভুলেও চিন্তা করতে এসব কথা, সেই ভজনলালকে সাধু রূপে দেখবে সে—একি কম কথা, কম আশ্চয্যের ব্যাপার? একটা কেন দশটা শর্ত পূরণ করবে সে।

বলল সতী,—বেশ, তাহলে স্পর্শ কর আমাকে। স্পর্শ করে চিন্তা কর তোমার বন্ধু ভজনলালের মূর্ত্তি। চিন্তা করতে করতে ভাব একই আত্মা নানা রূপে নানা-ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এই বিশ্ব-সংসারে। সেই অখণ্ড, সর্ব্বব্যাপ্ত আত্মারই এক খণ্ড রূপ হল তোমার বন্ধু। খণ্ড আত্মার সেই বন্ধু-রূপটি দেখবার জন্য তুমি প্রার্থনা কর ভগবানের কাছে।

তাই করল ভূতনাথ। সতীর সেই সূক্ষ্মদেহ স্পর্শ করে মুঁদল সে চোখ। মুঁজে চোখ তার মনের ভাবনা, চিন্তা সমস্ত কিছু পরিচালিত করতে লাগল সে সতীর কথা মত।

(তেইশ)

কি অলৌকিক শক্তি ছিল সতীর সূক্ষ্মদেহে কে জানে। স্পর্শ করতেই দেহটা তার সে-শক্তি যেন সঞ্চারিত হল ভূতনাথের মধ্যে। চোখ খুলতেই দেখল সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! পৃথিবী ছাড়িয়ে সে যেন দাঁড়িয়ে আছে বহু উঁচুতে। কোথায় কোনখানে, কেমন ভাবে, কি অবস্থায় তা কিন্তু সে জানে না। জানে না সে আছে দাঁড়িয়ে পর্বতের চূড়ায় না পাহাড়ের মাথায়। আছে সে নিরালম্ব অবস্থায় না কোন আধারের উপর, না ভাসছে সে আসমানে? কিচ্ছু কিন্তু বুঝতে পারল না ভূতনাথ। অথচ মনে হতে লাগল তার দাঁড়িয়ে আছে সে যেন শক্ত একটা আশ্রয়ে। আর শূন্যের এই আশ্রয় থেকে নজরে আসছে তার নীচের পৃথিবীর সমস্ত কিছু। ঠিক পাহাড়ের উপর থেকে দূর-দূরান্তের গ্রামগঞ্জ, নদী-নালা, পথ-ঘাট ইত্যাদি যেমন অতি নিকটে, কোলের কাছে বলে মনে হয়—এও যেন ঠিক তেমনি।

নীচে তাকাতেই দেখল ভূতনাথ সামনে একটা নদী। বেশ বড় নদী। বুকভরা জল নিয়ে সে নদী বয়ে যাচ্ছে মনে হয় উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে। সেই নদীরই উপত্যকায় অদূরে একটা পাহাড়। উঁচুতে শুধু নয়, লম্বা-চওড়াতে বেশ বড়-সড় পাহাড়টা। সেই পাহাড়ের বুকে দেখল ভূতনাথ সুন্দর একটা গুহার সামনে বড় একটা পাথরের চাথাল। বাড়ীর সামনে মেঝের মত। সেই চাথালটার বাম-পাশে ছোট্ট একটা মন্দির। মনে হয় সমাধি-মন্দির আর ডান পাশে বেশ বড় একটা শিব লিঙ্গ। শিব লিঙ্গটার মাথায় বেড়ানো রূপোর ফণা মেলা একটা সাপের মূর্ত্তি। করছে সেটা চকচক। পিছনে গাদা রয়েছে একটা ত্রিশূল। ত্রিশূলের আগায় মালা, চাঁদমালা, পৈতে, ছোট্ট পিতলের একটা ডুগডুগি ইত্যাদি নানা জিনিস। রয়েছে ঝুলন্ত অবস্থায়। আর শিবলিঙ্গ ও সমাধি মন্দিরের মাঝে, চাতালের একটা উঁচু বেদীর উপর বসে আছেন একজন সাধু। গৌরিক বস্ত্র তার। মাথায় গেরুয়ার পাগড়ী। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। চন্দন চর্চিত কপাল। আছেন তিনি বসে ধ্যানস্থ অবস্থায়।

তবে তাঁর ধ্যান-মৌন পরিবেশটাকে বেশ জমিয়ে রেখেছে ছোট একটা পাহাড়ী ঝর্ণা। পাহাড়ের উপর মাথার কোন সুড়ঙ্গ থেকে সেটা যে বয়ে নামছে কে জানে। তবে ঝিরঝিরিয়ে পড়ছে সেটা বেশ সুন্দরভাবে শিবলিঙ্গটার ঠিক পিছনেই। পড়ে সেটা বয়ে গিয়ে চাথালটার নীচে সৃষ্টি করছে। ছোট্ট একটা ডোবার মতন। আর সেই ডোবা থেকে উপচে-জলটা নীচে পড়ে যাচ্ছে বয়ে ক্ষীণ একটা জলধারার মত। সেই ধারাটাই ক্রমশ

পাহাড় কেটে নীচে গড়িয়ে পরিণত হয়েছে ছোট্ট একটা কান্দর বা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীতে। তারপর সেই স্রোতস্বিনীই বাড়িয়ে তার ধারাটা বড় হতে হতে উপনদীরূপে মিশেছে গিয়ে অদূরের ওই বড় নদীটাতে।

জিজ্ঞেস করতেই জানল ভূতনাথ ওই নদীটার নাম নাকি শোন নদী। আর এই পাহাড়টার নাম "মহাদেব খো"। ব্যাস—আর কিছু বলতে হল না সতীকে। কারণ বিহারের ওই শোন নদীর কূলে, "মহাদেব-খো"-এর কোলে এই "লিঙ্গেশ্বর আশ্রমটার" কথা অনেকবার শুনেছে ভূতনাথ। শুনেছে ভোজুর ইট-ভাটায় বসে এবং তারই মুখ থেকে। আশ্রমটা বিহারে অবস্থিত হলেও আশ্রম-স্বামী নাকি বিহারী নন—বাঙ্গালী। নাম নাকি তার শঙ্করানন্দ। সাধুদের পূর্বাশ্রমের কথা নাকি বলতে নেই। তাই শঙ্করানন্দ পশ্চিম বাংলার যে কোন জেলার কোথাকার অধিবাসী ছিলেন, কোথায় ছিল তার বাড়ী তা কিন্তু জানত না ভজনলাল। তবে জন্মভূমির টানে না-কি মাঝে-মধ্যে আসতেন সাধুবাবা বাংলা মুলুকে। ঘুরতেন বেশীর ভাগ বাঁকুড়া জেলাতেই। বিশেষ করে বাঁকুড়ার উত্তরঅঞ্চলটাতে। ডেরা লাগাতেন কখনও কোঁড়ো পাহাড়ের চূড়ায়, কখনও শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে। ডেরা গাদলেই কাঙ্গালী ভোজন করাতেন তিনি। এই কাঙ্গাসী ভোজনের সূত্র ধরেই নাকি হয়েছিল ভজনলালের বাবার সঙ্গে তার জানা-পরিচয়। সামান্য চাল-ডাল তরি-তরকারির সংস্থানে তিনি শ-শ লোককে খাওয়াতেন? যে-ই আসুক, যখনই আসুক, আর যতই আসুক পাত পাড়লেই সবাই পেত ভাত। একবার 'ব্যোম-শঙ্কর বলে শঙ্কর বাবা রান্না শালটা ঘুরে দিলেই হল। ব্যাস টান পড়ত না কোনো কিছুতেই।

তার ওই অলৌকিক শক্তির আকর্ষণেই নাকি পড়ে গিয়েছিল ভজনলাল। হয়ে গিয়েছিল প্রায় তার চেলার মতই। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ভজনলালের। ছিল ধনবান, বিত্তবান হবার লোভ। এই লোভের বশেই সে একদিন নাকি বাবাকে দিয়ে ভাগ্য গণনা করিয়েছিল তার। সাধুবাবা খড়ি পেতে গণনা করে নাকি বলেছিলেন তাকে,—তোর মাটির ব্যবসায় উন্নতি হবে। আসবে অনেক টাকা কড়ি। ধনবানও হতে পারিস তুই। কিন্তু......

এই "কিন্তু"—টি যে কি তা কিন্তু বাবা বলেন নি তাকে। জানবার জন্য ভজনলাল যখন একবার নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছিল বাবার পা দুটোতে তখন তিনি বলেছিলেন, "—আমি আশ্রম ফিরে যাচ্ছি। আর বাংলা মুলুকে আমার আসা হবে কি না কে জানে। তবে যাবার সময় বলে যাচ্ছি আমি শোন। কাঞ্চণ কামিনীকে টানে। কামিনী কাঞ্চনকে টানে। যে কোন একটা টানের মোহে পড়লে অপর আকর্ষণটা আপনিই এসে যায়। কারণ তারা একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ কি না। এই উভয় টানের মোহে পড়ে মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়। অধঃপাতে যায়। সেই হচ্ছে প্রকৃত ব্যবসায়ী যে কোন টানেই আকৃষ্ট না হয়। আর সেই হচ্ছে প্রকৃত পুরুষ যে এই দু "কা"-রূপ ঘোড়ার লাগাম শক্ত করে ধরে চালাতে পারে। নইলে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠলেই এ ঘোড়া জীবন থেকে তার হঠাৎ কোন অসতর্ক মুহূর্তে যে খাদে ফেলে দেয় কেও বুঝতেও পারে না। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তার বর্তমান-ভবিষ্যতের আশার চূড়া।

মনে পড়তেই কথাটা চমকে উঠল যেন ভূতনাথ। সাধু-মহন্তরা এমনি ভাবেই পরোক্ষরূপে বুঝি ভবিষ্যতের কথা বলেন। মাটির ব্যবসা মানে ইটের ব্যাবসা। সে ব্যবসায় সত্যিই উন্নতি হয়েছিল ভজনলালের। আর কামিনী মানে মীনা। ধনমদে মত্ত ভজনলাল সত্যিই আকৃষ্ট হয়েছিল সেই কামিনীর প্রতি। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে না দিলেও ভোজুকে তার সেই "কিন্তু"-র উত্তর পরোক্ষভাবে উপদেশের ছলে দিয়েছিলেন যে তিনি—সে কথাটা আজ স্পষ্ট বুঝতে পারল ভূতনাথ। বোকা ভোজু, তাই ধরতে পারেনি সে ইঙ্গিত। কিন্তু যাক সে ওসব কথা। গতস্য শোচনা নাস্তি। যা হবার তা শেষ হয়েই গেছে। ভেবে ওসব আর কি হবে। উনিই তাহলে সেই শঙ্করবাবা।

"—না ভূতুদা।" ভাবতেই ওমনি পাশ থেকে ভূতনাথের বলে উঠল সতী,—দেহ রেখেছেন সে শঙ্কর বাবা। চাথালটার পাশে দেখছো যে ছোট্ট মন্দিরটা? ওটাই হচ্ছে সেই সাধুবাবার সমাধি-মন্দির। আর মন্দিরটার পাশে তাঁর ইষ্টদেব লিঙ্গেশ্বরকে ডাইনে রেখে চাথালের বেদীটার উপর বসে আছেন যিনি—যাকে শঙ্করবাবা বলে ভাবছো তুমি, উনিই হলেন তোমার বন্ধু তথা ভিক্ষেভাই বাঁকাদহের ভজনলাল।

শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল ভূতনাথ। সত্যি, জীবনে মনে হয় এমন ভাবে বিস্মিত হয়নি কখনও সে। দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ করে দেখল সে—হাঁ, সেই নাক, সেই চোখ ভোজুর। পাগড়ী বাঁধা থাকলেও মুখের আদল

অবয়ব গড়ন বরণ ভজনলালের মতই বটে। কিন্তু তা-তো হল এই বিভুঁই-বিদেশে এলই বা কি করে ভোজু এবং হট্ করে এমন সাধুই বা হয়ে গেল সে কোন যাদু-শক্তিতে। ভাবলে তো মনে হয় মীনাকে নিয়ে তার কাণ্ড-কেলেঙ্কারি, জীবনের বিপর্য্যয় সেরকম কিছু বেশী দিনের ব্যাপার নয়। এর মধ্যেই "ব্যোম-শঙ্কর" তার জীবনের তলার মাটি উপরে এবং উপরের মাটি তলায় করলেন কি করে। আশ্চর্য্য।

জিজ্ঞেস করতেই ভূতনাথ শুরু করল তাকে বলতে সতী তার ভোজু-বন্ধুর অজানা ইতিহাসটা। কথায় আছে—এক হাতে নাকি তালি বাজে না। সেটা কিন্তু গণ্ডগোলের ব্যাপারে। প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এক-তরফা একনিষ্ঠ প্রেম প্রেমিকের মনোজগতের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তাই মনে হয় মীনার প্রেম ঘটিয়েছিল ভজনলালের ক্ষেত্রে সে মানসিক পরিবর্তন। অবশ্য তার মৃত্যুর পর। অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে কুৎসা-কেলেঙ্কারী মাথা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ভোজু ঘর ছেড়ে। অনুশোচনার খোঁচা এমন অস্থির করে তুলেছিল তাকে, করেছিল বিবেকের দংশন তাকে এমন বিব্রত যে শেস পর্য্যন্ত ভেবে ঠিক করেছিল সে যখন মীনার মৃত্যুর জন্য সে দায়ী তখন এ জীবন আর রাখবে না সে। তার মত সেও মরবে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা করতেই গেছল সে লাইন ধার। ট্রেনে মাথা দেবার জন্য। কিন্তু ভাগ্যের কি বিচিত্র লীলা! আসতে আসতে ট্রেনটা তার মাথা দেবার কিছুটা আগেই মাঝে-পথে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। লাইন খারাপ নয়! সিগনেল নেই! ব্যাপার কি? তাহলে কি কেও চেন টানল? অসময়ে, অজায়গায়, রাত্রে বেলায় হঠাৎ এমনভাবে টানল কে চেন? কি বিপদ তার? জানতে ব্যাপারটা কৌতূহলী মনটাকে নিয়ে ভজনলাল এগিয়ে গেল দাঁড়িয়ে থাকা সেই ট্রেনটার কাছে। কি মনে হল তার কে জানে। উঠল সে একটা কামরায়। তারপর কি আশ্চর্য্য। উঠতেই কামরায় ছেড়ে দিল ট্রেনটা। কোন কিছু ভাবার আগেই দিব্যি গতি তার বাড়িয়ে দিল ট্রেনটা। সব কিছু ছাড়িয়ে রাতের অন্ধকারকে ভেদ করে ছুটে চলল সে বিদ্যুৎ গতিতে—ঝকাঝকা ঝন্‌ঝন, ঝন্‌ঝন্ ঝকা ঝকা।

ভালই হল কোথাও কোন দূর দেশে গিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে সে। যে অন্যায়, যে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি করেছে সে, যে কুৎসা রটেছে তার নামে, যার ফলে সকলের ঘৃণা-ধিকার-অপমান মাথায় নিয়ে বেরুতে হয়েছে তাকে বাধ্য হয়। তার আর বাড়ী ফেরা উচিত নয় কখনও মোটেই। আত্মীয়-স্বজন, কুটুম-বন্ধুর কাছ থেকে হারিয়ে যাবে সে। চিরকালে মত। নিয়ে যাক ট্রেনটা তাকে যেথায় খুশী, যত দূরে। এ যাত্রা হোক নিরুদ্দেশ যাত্রা তার, শেষ যাত্রা তার, জীবনের মত বিলুপ্ত হয়ে যাবার যাত্রা তার।

ট্রেনটার নাম নাকি—পাঞ্জাব মেল। কানে আসতেই নামটা মনে পড়ে গেল ভূতনাথের তার ভোজুবন্ধুর মুখে শোনা সেই সাধুবাবার কথা, সেই অলৌকিক শক্তিধর শঙ্করা নন্দের কথা। প্রায়ই তিনি নাকি বলতেন ভোজুকে,—"বিপদ-আপদ যাই ঘটুক, চলে আসবি তুই আমার কাছে। আসবি চলে সোজা আমার বিহারের ডেরা লিঙ্গেশ্বর-আশ্রমে। দুর্গাপুরে গিয়ে ধরবি পাঞ্জাব মেল। সেই মেলেই একেবারে এসে নামবি "ডিহরি-অন-শোন" স্টেশনে। স্টেশনে নেমেই ধরবি "বৌলিয়ার" বাস। সেই বাসে নামবি এসে "মহাদেব খো" স্টপেজে। নামলেই সামনে দেখতে পাবি পাহাড়। সেই পাহাড়ের উপর ঝরনার পাশে পাবি দেখতে বাবা লিঙ্গেশ্বরের ত্রি-কোণা শালুর উড়ন্ত পতাকা। সেই শিব-ঝাণ্ডাকে লক্ষ্য করে উপরে উঠলেই পেয়ে যাবি আমার আশ্রম। মনে একাগ্র ইচ্ছা বা নিষ্ঠা থাকলে বাবাই নাকি নিজেই পথ হয়ে নিয়ে যান তাঁর ভক্তকে। সন্তানকে তাঁর কোন কষ্ট না দিয়ে পৌঁছে দেন তার আস্তানায়।

সুতরাং চলো মুসাফির। মৃত্যুকাঙ্খী ভজনলালের ঘুরে গেল মনের মোড়টা। সেই সংকল্প নিয়েই চলল সে বাবা শঙ্করানন্দের আশ্রম। বাবাই পথ হয়ে তাকে পৌঁছে দিলেন—না পথই মনের টানে তাকে বাবার কাছে পৌঁছে দিল কে জানে। তবে পৌঁছল যখন "মহাদেব-খো"—এর কোলে তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া সূর্য্যটা পাহাড়ের মাথায় অস্ত যাবার জন্য তৈরী হয়ে গেছে। দূর থেকে তে-কোণা শালুর ঝাণ্ডাটাকে লক্ষ্য করে চড়াই-উতরাই পথটা ধরে আশ্রমে পৌঁছল যখন ভজনলাল তখন সন্ধ্যা। ঢুকতেই আশ্রমে ভেসে এল বাবার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর,—"বাবা ভোজু, এলি? আমি তোর কথাই ভাবছিলাম রে।

আশ্চর্য্য। শুনেই কথাটা যেন চমকে উঠল ভজনলাল। কণ্ঠস্বরটাকে অনুসরণ করে ঢুকল সে আশ্রমের সেই পাহাড়-গুহাটার মধ্যে। ঢুকেই ভিতরে দেখল সে গুহার ভিতরটা সুন্দর, সানে-বাঁধানো। দেখতে ঠিক

মাঝারি ধরনের একটা কক্ষের মত। সে ঘরের এক কোনায় মেঝেতে লম্বালম্বি শুয়ে আছেন বাবা। আপাদ-মস্তক তার কম্বল-মোড়া। কাছে যেতেই ভজনলাল, মুখের ঢাকা খুললেন বাবা। উঠলেন বলে মৃদু স্বরে,—তোর মনের স্পন্দন, হৃদয়ের কম্পন সব আমায় এসে স্পর্শ করেছে বাবা। আত্মহত্যা করে কখনও পাপের প্রায়শ্চিত্তহয় না বাবা। এতে পাপের বোঝা আরো যায় বেড়ে। অনুতাপ এসেছে যখন অন্তরে তোর, অনুশোচনায় যখন দগ্ধ হচ্ছিস তুই তখনই মন-সোনা তোর পুড়ে হচ্ছে খাঁটি। ভজনলাল, তুই এখানে বসে ভগবানের ভজনা করে শুদ্ধ হ বাবা। পাপ মুক্ত কর সত্তাকে তোর। সেই জন্যই স্মরণের মাধমে তোকে আমি টেনে আনলাম আমার এখানে।

যার পর নাই বিস্মিত হয়ে ভজনলাল পড়ল গিয়ে সেই সাধুবাবার পায়ে। কিন্তু পা-দুটো তাঁর ছুঁতেই ওমনি চমকে উঠল সে। সাংঘাতিক গরম! জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছেন বাবা। সহায়-সম্বলহীন নির্জন দ্বীপের মত একলা বাবা এই আশ্রমটায় এই অবস্থায় পড়েআছেন কি করে। এক্ষুনি তো তাকে ডাক্তার দেখানো দরকার। কিন্তু কোথায় ডাক্তার? কাছে-পিঠেকি কোনো হস্‌পিটেল নেই?

"—ব্যস্ত তোকে হতে হবে না বাবা।" বলে উঠলেন শঙ্করানন্দ—এতটা পথ হয়রাণ হয়ে এসেছিস। সারাটা দিন খাস-নি কিছু। কোনার হাঁড়িতে ছাতু, চিড়া, সমস্ত কিছু আছে। ঝরনার জল নিয়ে আগে খেয়ে নে কিছু তারপর তোকে বলছি সমস্ত কথা।

সে সমস্ত কথার সারমর্ম হল—পরলোকের নাকি ডাক এসেছে তাঁর। এ দেহ ত্যাগ করে যেতে হবে তাকে। দেহের যা ধর্ম তা তো দেহীর হবেই। সুতরাং সেজন্য নাকি ভাবনা নেই তাঁর। চিন্তা শুধু নাকি বাবার তাঁর আশ্রমের ধারা বজায় রাখার। আশ-পাশ গ্রাম থেকে নানা লোক আসে এ আশ্রমে। বড় গরীব তারা, বড় অসহায়। এ আশ্রমের শঙ্করানন্দের পূর্বগুরু তপস্বী বাবা তাদের জন্য ওষুধ-পথ্য, সাধ্যমত দান ইত্যাদি করার ধারা প্রবর্ত্তন করে গেছেন। সে ধারা এ আশ্রমে তার বজায় রাখতে না পারলে নাকি তপস্বী বাবার কাছে তার দেওয়া কথার খেলাপ হবে। এখানে কোন রোগী চিকিৎসার জন্য এলে যেন বিনা ওষুধে ফিরে না যায়। অশান্ত হৃদয়ে শান্তির জন্য এলে তাকে উপদেশামৃত পান করিয়ে শান্ত করে যেন বিদায় করা হয়। আশ্রমের এ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার দায়িত্ব নাকি ভজনলালকে গ্রহণ করতে হবে। নিতে হবে তাকে তাঁর কার্য্যভার।

কি সর্ব্বনাশ। তাঁর এ গুরু দায়িত্ব নেবার ভোজুর যোগ্যতা কোথায়? সে যে মহাপাপী, খুনারু, অর্থ গৃধ্নু, কদাচারী, নরাধম ব্যক্তি। সব কথা তার এককথায় জল করে দিয়ে বলে উঠলেন বাবা, যে তার ব্যাপার নাকি সমস্ত কিছুই জানেন তিনি। কিন্তু ভোজুর আত্মা যে শুদ্ধ-হতে চায়, সৎ হতে চায় তার সত্তা। তা ছাড়া মীনাও তাকে সৎ দেখার, পবিত্র দেখার সাধ নিয়ে মরেছে। মরেছেতাকে তার আদর্শ প্রেমিক রূপে দেখার আকাঙ্ক্ষায়। তার সে ইচ্ছা পূরণ না হলে নাকি আত্মার তার উদ্ধার হবে না। আর ভজনলালের সত্তাও নাকি পাবে না কখনও শান্তি। মীনা মনে-প্রাণে যখন স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছিল তাকে তখন ভজনলালকেও তাকে প্রাণে-মনে গ্রহণ করতে হবে স্ত্রী রূপেই। দ্বিচারিণী হবার ভয়েই মীনা বিয়ে না করে তার স্মৃতি হৃদয়ে গেঁথে করেছিল যখন আত্মহত্যা তখন ভজনলালকেও তার স্মৃতি হৃদয়ে রেখে দিতে হবে তার জীবন-ত্যাগের মূল্য। ধর্মপত্নীরূপে তাকে গ্রহণ করার লোভ দেখিয়ে করেছিল যখন তার দেহ-ভোগ তখন এ দেহ থাকতে ভজনলালের চলবে না আর অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা। শ্রীরামচন্দ্র দিয়েছিলেন যেমন সীতা দেবীকে তার প্রকৃত স্ত্রীর মর্য্যাদা। মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহণ করা তো দূরের কথা আমরণ তিনি সীতার স্মৃতি অন্তরে রেখে কাটিয়ে ছিলেন জীবন। ভজনলালকেও তেমনি দিতে হবে মীনাকে তার স্ত্রী হওয়ার মানসিকতার সম্মান। বিয়ে না করে আজীবন কাটাতে হবে তার জীবন মীনার স্মৃতি হৃদয়ে তার গেঁথে রেখে। স্ত্রী যেমন স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহে কল্পনা না করে পরলোকে তার পুণ্য গতি ও উর্ধ্ব গমনের উদ্দেশ্যে পালন করে বৈধব্য ব্রত। ভজনলালকেও তেমনি বিধবার মতই মীনার উচ্চগতি ও পাপ মুক্তির জন্য করতে হবে জীবন ব্রত। তবেই হবে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত তার।

সাধুবাবা যেন ভজনলালের মনের কথাটিই বললেন। কারণ ভজনলাল নাকি মনে-প্রাণেই সংকল্প করেছিল যে জীবনে আর বিয়ে করবে না সে। কিন্তু এখানে আশ্রমে থেকে আশ্রমের ওই পরকল্যাণ ব্রতপালন; ওষুধ পথ্য, সেবাদান, অপরকে উপদেশামৃত পরিবেশন পারবে সে কি করে? সাধু নয় সে। সাধুর মত জপ-ধ্যান,

ঈশ্বর স্মরণ-মনন-ও সম্ভব নয় তার পক্ষে। এমন কি দীক্ষাও কারো গ্রহণ করেনি সে। করবেও না কখনও। তাহলে?

"—দীক্ষার তোমার প্রয়োজন নেই বাবা।" বলে উঠলেন শঙ্করানন্দ,—দীক্ষা মানে তো সৎ সংকল্প গ্রহণ। একটা আদর্শের কাছে নিজের দেহ-মন- প্রাণ উৎসর্গ করা। তুমি আমার এ আশ্রমের আদর্শ ধারা বজায় রাখবার জন্য মনে প্রাণে সংকল্প গ্রহণ কর বাবা। মরে গেলেও আমি তোমার সাথে থাকব। থাকব মনকে তোমার অবলম্বন করে। অন্তরকে তুমি আমার চিন্তায় নিমগ্ন করলেই আমি তোমার দেহের দেহী হয়ে করব সমস্ত কাজ। আমার এ অবয়ব ত্যাগ করার সময় ঘনিয়ে এসেছে বাবা। কথা দাও, আমি নিশ্চিন্তে এ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে যাই।

কি যে হল ভজনলালের কে জানে। সেই মুহূর্তে হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল তার,—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক বাবা। আমার আমিত্ব, আমার দেহ-মন-প্রাণ সমস্ত কিছু তুমি গ্রহণ করে আমাকে তোমার হস্ত-ধৃত যন্ত্রের মত পরিচালিত কর বাবা। এ পাপ দেহ তোমার মন্দির হয়ে পবিত্র হোক।

তারপরই নাকি মারা যান বাবা। বাবা শঙ্করানন্দের পাটে বসে নাকি ভজনলাল। দেখিয়ে ভূতনাতকে বলে উঠল সতী, গুহ্য গৃহের সামনে ওই যে পাথরের চাথালে উঁচু বেদীটার উপর ধ্যানস্থ অবস্থায় বসে আছে তোমার বন্ধু যোগী-ভজনলাল। তারই বাম-পাশে ছোট্ট ওই সমাধি মন্দিরটাই হল বাবা শঙ্করানন্দের। আর তার ডান-পাশে ওই যে পাথরের দাওয়ায় বসানো শিব লিঙ্গ, উনিই হলেন তাঁর ইষ্টদেব লিঙ্গেশ্বর। যার নাম অনুসারে এই আশ্রমের নাম লিঙ্গেশ্বর আশ্রম।

বিস্মিত ভূতনাথ। সত্যিই—বিচিত্র এই জগৎ। আর এই জগৎ-সংসারে বিচিত্র ভগবানের লীলা। তিনি যে পঙ্গুকেও গিরিলঙ্ঘন করাতে পারেন, পারেন যে অন্ধকে দিয়েও চক্ষুষ্মানের কাজ করাতে তা ভোজুকে দেখলেই বুঝি প্রত্যক্ষ করা যায়। চরিত্র হীন লম্পট ভোজুকে দেখতে হবে যে এভাবে সাধুর বেশে ধ্যানস্থ অবস্থায় এ যোগীর সিদ্ধপীঠে তা কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি ভূতনাথ।

"—এখন রাত ভূতুদা, তাই দেখছো তোমার বন্ধুর একক রূপে ওই ধ্যানস্থ মূর্ত্তি।" বলে উঠল সতী,— "কিন্তু দিনে দেখলে দেখতে তার আর একটা রূপ, কর্মময় মূর্ত্তি। তখন তিনি প্রকৃত আশ্রম-স্বামী হয়ে বসেন বাবা শঙ্করা-নন্দের পাটে। ভক্তকে দেন উপদেশ, আর্ত্তিকে দেন আশা, অবহেলিতকে দেন ভালবাসা। সব চেয়ে বড় কাজ হয়ে যায় তখন তার রোগীকে চিকিৎসা করা তথা উপযুক্ত ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

"—সে কি।" অবাক হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ,—ছোটবেলায়' "ক" বলতে কপাট ফাটত যার। যেত না যে জ্ঞান-উপদেশের ধারে পাশে। চিকিৎসা বলতেই যে হত চিৎপটাং। সে দিচ্ছে জ্ঞান উপদেশ। করছে রোগীর চিকিৎসা। দিচ্ছে রোগীকে রোগ বুঝে ওষুধ। চমৎকার।

—অবশ্য তোমার বন্ধু তখন ভজনলালের জ্ঞান-বোধে থাকে না ভূতুদা। হয়ে যায় সে তখন আশ্রমের বৈদ্যি-মহারাজ বাবা শঙ্করানন্দ। লিঙ্গেশ্বরকে প্রণাম করে বাবা শঙ্করানন্দের কৌপিন, বস্ত্র, উত্তরীয় পরিধান করে তোমার ভোজু বন্ধু বসে যখন বাবার ওই সমাধি-মন্দিরের পাশে, তাঁর আসনে, তখন তার আধারে অদৃশ্যে ভর করে বাবা শঙ্করানন্দের আত্মা। সেই আত্মা তখন ভজনলাল হয়ে করেন তাঁর কাজ। আর ভজনলালের সত্তা থাকে তখন দেহের বাইরে। আচ্ছন্ন অবস্থায়। অচেতন হয়ে।

শুনে কথাটা—ভূতনাথের বাস্তব অবাস্তব সমস্ত জ্ঞান যেন তাল-গোল পাকাতে লাগল—এ কি রকম কথা। ভাবতেই ভূতনাথ বলে উঠল সতী,—প্রত্যক্ষ করবে সে দৃশ্য। ঠিক আছে,-ফুটিয়ে তুলছি আমি তার দিনের সেই কর্ম-যজ্ঞের ছবি তার শব্দ-রূপ ইত্যাদি তন্মাত্রার বাস্তব অণু-পরামাণুগুলোকে সন্নিবেশিত করে। চিন্তা কর তুমি দিনের রূপ। ভ্রূ-মধ্যে দৃষ্টিটা রেখে মন-সংযোগ কর তুমি সে দৃশ্য দেখবার জন্য।

অদ্ভুত ব্যাপার। সত্যই ভূতনাথ প্রত্যক্ষ করতে লাগল সিনেমার পর্দার ন্যায় ওই গুহাটার সামনে ছায়াছবির মত দিবাভাগের দৃশ্য। সমাধি-মন্দির ও লিঙ্গরাজের মাঝে চাথালের উপর পদ্মাসনে বসে আছে ভজনলাল। সুন্দর, শান্ত-সৌম্য মূর্ত্তি তার। স্মিত-হাস্যে ভরা মুখ। সামনে তার অনেক মা-বোন,-ছেলে-মেয়ে, যুবক-বৃদ্ধ আছে বসে। বসে আছে সব শিষ্য-প্রশিষ্যের মত। লোক আসছে আরোও, কাতারে কাতারে। পাহাড়ের আশ-

পাশ গ্রাম-বস্তি, ছোট-বড় জনপদগুলো থেকে। আসার দৃশ্যটা দেখতে ভূতনাথের লাগতে লাগল বেশ চমৎকার। কোন মা আসছে তার ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে, কোন বড় ছেলে আসছে তার বুড়ো বাপকে ধরে নিয়ে, আসছে সধবা-বিধবা বুড়ী-আধবুড়ী নানা পিসি-মাসির দল। পাহাড়ের নীচের ঝোপ-ঝাড় ভরা ঢাল বেয়ে উঠছে তারা উপরের দিকে, আশ্রম মুখে। ঠিক পিঁপড়ের সারির মত। আশ্রমের সামনে চাথালের পাথর-বেদীর উপর বসে ভজনলাল নানা জনকে দিচ্ছে তাদের নানা প্রশ্নের উত্তর। কাকেও দিচ্ছে উপদেশ, কাকেও বিতরণ করছে জ্ঞান, শোকে কাকেও দিচ্ছে সান্ত্বনা। হতাশায় দিচ্ছে কাকেও আশার আলো। উপদেশের সঙ্গে উপচে উঠছে তার বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারতের নানা কথা, নানা উপাখ্যান। গীতা-চণ্ডীর ভাব-ভারিক্কী শ্লোকগুলো ফুটে উঠছে তার মুখ দিয়ে এমনভাবে যেন মস্ত বড় সংকৃতজ্ঞ পণ্ডিত সে। তত্ত্বদর্শী একজন বিজ্ঞ আচার্য্য। তবে সবচেয়ে বেশী অবাক করে দিল ভজনলাল ভূতনাথকে তার চিকিৎসা বিদ্যায়। খুঁটি-নাটি রোগ পরীক্ষা করে এমন দিতে লাগল ওষুধ যেন সে মস্ত বড় একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। ওষুধের মধ্যে কবরেজি পুরিয়া বড়ি ইত্যাদিই বেশী বলে মনে হল। তবে এর সঙ্গে জড়ি-বুটি দেওয়াও লক্ষ্য করা গেল। দেখা গেল তার হাতের কাছেই নামান রয়েছে গেরুয়া কাপড়ের একটা থলি। থলি তো নয় যেন সিদ্ধের ঝোলা। সে ঝোলা থেকে শিকড়-বাকড় বড়ি-পুরিয়া থেকে আরম্ভ করে ঠাকুরের ফুল-বেলপাতা পর্য্যন্ত যা উঠছে তার হাতে তাই যেন ওষুধ হয়ে যাচ্ছে রোগীর কাছে। এত তত্ত্ব, এতজ্ঞান ভোজু আয় - করল কি করে? কখন? এযে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপকেও হার মানাল সে।

হঠাৎ ভাবনা-ভরা দৃষ্টিটা ভূতনাথের ভজনলালের উপর পড়তেই মনে হল এ চেহারা তো ভজনলালের নয়। তার চেহারাটার উপর ভাসা ভাসা ছায়া-ছায়া রয়েছে যেন আর একটা মূর্ত্তি। যেন শ্মশ্রু-গুম্ফ যুক্ত জটাজুটধারী একটা সূক্ষ্ম অবয়ব আবৃত করে রেখেছে ভজনলালের সমস্ত দেহটাকে। মনে হতে লাগল, তার মধ্যে আসল ভজনলাল রয়েছে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়। জড়বৎ, চেতনাহীন সত্তা তার। বোধ-বুদ্ধি চিন্তা-ভাবনা সব যেন তার নিষ্ক্রিয়। তার হয়ে বলছে কথা, করছে কাজ, দিচ্ছে ওষুধ সব ওই ভজনলালের শরীরের উপর আলতোভাবে আচ্ছাদিত হয়ে থাকা ভাসা-ভাসা ছায়া ছায়া ওই সূক্ষ্ম কায়াটাই। দেখিয়ে সেই সূক্ষ্ম কায়াটাকে বলে উঠল সতী ভূতনাথকে—বাস্তবের স্থূল নজরে থাকলে তুমি অশরীরী ওই সত্তাটাকে দেখতে পেতে না ভূতুদা। সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে আছ বলেই তুমি পাচ্ছো দেখতে পরলোকবাসীর এই কর্ম-রহস্য। তোমার ভোজু-বন্ধুর আধারের উপর দেখছো যে সূক্ষ্ম আধারটা-ওটাই হল পরলোকগত সাধু শঙ্করানন্দের সূক্ষ্মাবয়ব। সূক্ষ্ম দেহে বাস্তব-কর্ম তেমন করা যায় না বলেই তিনি তোমার বন্ধুর বাস্তব শরীরটাকে অবলম্বন করে বজায় রেখে চলেছেন তাঁর আশ্রমের ধারা। জনসেবা, জগন্মঙ্গল-কর্ম, মানব কল্যাণ ইত্যাদি পরহিত ব্রত তিনি করে চলেছেন পালন অদৃশ্যভাবে। তোমার বন্ধুর উপর মহা-মানবের এ ভর কিন্তু ভূত-প্রেত বা নীচ প্রেতাত্মার ভরের মত নয় ভূতুদা। এতে উন্নতি ছাড়া ক্ষতি হয় না। মহা ভাগ্যগুণে উচ্চ-আত্মিকদের এ-ভর লাভ করা যায়। দিব্যাত্মাদের এ দেহ অবলম্বনে তোমার বন্ধুর আধার শুদ্ধ হবে, পবিত্র হবে তার মন, সত্তার তার হবে সৎ গতি।

—কিন্তু ভোজুর মত ওই পাপ-পঙ্কিল শরীরে তার মত একটা পুণ্যাত্মা ভর করলেন কি করে? এছাড়া আর কি তিনি কোন আধার খুঁজে পেলেন না?

বিস্ময়ভরা প্রশ্নে ভূতনাথের ভেসে উঠল সতীর মুখে উত্তর,—মানুষের বাইরের রূপটাই তার আসল রূপ নয় ভূতুদা। নয় জীবনের রাগ, ক্ষোভ বা উত্তেজনার বশে সাময়িক কীর্ত্তি-কলাপগুলো তার আসল সত্তার পরিচয়। মীনার সঙ্গে তোমার ভোজু-বন্ধুর বিগত জীবনের স্বামী-স্ত্রী বিষদৃশ সম্পর্কই ঘটিয়েছিল তাদের এ জীবনে এমন বিরূপ বিপর্য্যয়। প্রকৃত দৃষ্টির অন্তরালে এসব অপ্রাকৃত সম্বন্ধ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মহাত্মারাই অবগত হতে পারেন। এবং পারেন বলেই তারা সেভাবে মানুষের জীবনের ঘটনাকে পর্য্যবেক্ষণ বা বিচার করে থাকেন।

আসলে, জন্মাবামাত্রই বসুন্ধরার বৈষ্ণবীমায়া নাকি পূর্ব-জন্মের সমস্ত কিছু দেয় ভুলিয়ে। বিলোপ করে দেয় তার অতীত জীবনের সমস্ত স্মৃতি। কিন্তু তবুও মানুষের আত্মজ্ঞানের যে ক্ষয় হয় না, লয় না সৎ বোধের,

রোধ হয় না তার আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার গতির তার প্রমাণে নাকি অনুতাপ অনুশোচনা। বিরুদ্ধ পরিবেশ, চারধারের বিরূপ প্রভাব সাময়িক ভাবে হয়ত তা ধামা-চাপা দিয়ে রাখতে পারে। পারে হয়ত সামনে তার নানা রূপ বাধার প্রাচীর তুলে কিছুকাল সে ধারাকে রুদ্ধ করে রাখতে। কিন্তু তার অন্তরের দিব্য কামনাকে জগৎ-প্রকৃতি কখনও জগদ্দল পাথরে আটকে রাখতে পারে না। জীবনে হঠাৎ কারো মৃত্যু শোক, আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ ব্যথা, জীবনের হটকারিতা-জনিত কোন কর্মের অনুতাপ বা অনুশোচনা এসে সে বাধার প্রাচীর দেয় ভেঙ্গে। জগদ্দল পাথরকে দেয় সরিয়ে। তখন মানুষের অন্তরের শুদ্ধজ্ঞান ও পবিত্রতার স্রোত তোড়ে আসে বেরিয়ে। চোর সহসা সাধু হয়ে যায়, ডাকাত পরের জন্য করে সর্বস্ব উৎসর্গ। আর খুনারু পরের জীবন রক্ষার জন্য নিজে করে মৃত্যু বরণ। সুতরাং কখন কার কোন আঘাতে যে জীবনের মোড় কোন দিকে ঘুরে যায় কেও তা বুঝতে পারে না। মীনার আত্মহত্যাই নাকি ঘুরিয়ে দিয়েছিল ভজনলালের জীবনের মোড়। তার অন্তরের দিব্য-কামনাই নাকি ট্রেনে মাথা দেওয়ার মানসিকতা থেকে উদ্ধার করে তাকে শঙ্করানন্দের আকর্ষণের দিকে দিয়েছিল ঠেলে। এনেছিল এখানে, পূর্বজনমের সঞ্চিত সৎ-কর্ম ভজনলালের ইহ-জীবনের শুদ্ধ আধারটাকেই দিব্য-কর্মের উপযুক্ত বলে বেছে নেন শঙ্করানন্দ। নেন বেছে তাঁর নিজের অতীত জনমের কর্ম-ফল ভোগ শেষ করার যন্ত্র হিসেবে। জ্ঞানীগুরু, সিদ্ধ-সাধক যোগী-হলেও কর্ম ফলের ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নাকি মুক্তি নেই। মুক্তির জন্যই তো জন্মান্তর গ্রহণ। কিন্তু অনেক যোগী মহাপুরুষ গর্ভ-যন্ত্রণা বা জন্মমৃত্যুর কালচক্রে না পড়ে মৃত্যুর পর বিগত জন্মটারই অবশিষ্ট কর্মফল বা জীবন-ব্রত এরূপ পরোক্ষভাবে পর দেহ অবলম্বন করে সমাপন করতে পারেন। পারেন নিজ তথা পর সত্তাকে বাসনা-কামনার উর্ধে রেখে এভাবে পূর্ণতার দিকে গতিবান করতে।

"—বেশ, তা নয় হয় বুঝলাম।" বলে উঠল ভূতনাথ,—"কিন্তু অপরের দেহে এভাবে কাজ করা কি সম্ভব?"

—দিব্যাত্মা, উচ্চ আত্মিক, মহামানবদের ক্ষেত্রে এসব কোন ব্যাপারই অসম্ভব নয় ভূতুদা। মনে নেই তোমার সেই কাশীধামের এক যোগী বাবার মুখে আমাদের ভূতগ্রামে বাবা ভূতনাথের মন্দিরে শোনা জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যের অলৌকিক জীবন-কাহিনী।

বলা মাত্রই পড়ল ভূতনাথের মনে সে কথা। পরিব্রাজক অবস্থায় আচার্য্য শঙ্কার শ্রীবেলীতে এসে পৌঁছলে প্রভাকর নামে এক ব্রাহ্মণ তার তের বছরের ছেলেকে ফেলে দেন তাঁর পায়ে। পায়ে ফেলে তাঁর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে নিবেদন করে তাঁকে যে তাদের সন্তান না কি বোবা। থাকে জড়বৎ। সুতরাং প্রার্থনা, প্রভু যেন কৃপা করেন। অবশ্য বাক্যস্ফূর্ত্তি হল তার। কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হতেই সে বালক বলে উঠল তাদের যে সে নাকি তাদের সন্তান নয়।

মা-বাবা তো ছেলের কথা শুনে অবাক! ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বিস্ময় কাটাবার জন্য সেই বোবা ছেলেই উঠল বলে তাদের তার সব আদি বৃত্তান্ত। আসল কথা হল নাকি বহু বৎসর আগে ছেলেকে কোলে নিয়ে তাঁরা যখন যমুনায় স্নান করতে যান তখনই তাদের কোল থেকে যমুনার জলে পড়ে নাকি মারা যায় তাঁদের সে সন্তান। বহুকষ্টে জলের তলা থেকে তুলা হয় তার মৃতদেহটা। মৃতদেহটাকে নিয়ে যখন কান্নাকাটি করেন তাঁরা তখন সবার অলক্ষ্যে তাদের সন্তানের সেই প্রাণহীন ধড়টাতে ঢুকে পড়েন এক সিদ্ধ মহাপুরুষ। উদ্দেশ্য প্রারব্ধ ক্ষয় করা। অর্থাৎ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ না করে, জন্ম-জীবনে আর না নেমে এই দেহকেই অবলম্বন করে তাব কর্মফল-ভোগ নষ্ট করা।

জানিয়ে এসব কথা বলল সেই বালকেব দেহে প্রবেশকাবী মহাত্মা যে যেহেতু সন্তান স্নেহে তাকে বোবা ও জড়বৎ অবস্থায় নানা কষ্ট সহ্য করে পালন-পোষণ বর্দ্ধন করেছেন তাঁরা সেহেতু তিনি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এর জন্য শীঘ্রই তাঁরা এক পুত্র-সন্তানের জনক-জননী হবেন। সেই সন্তানই তাদের সুখী করবে। সুতরাং তাকে যেন আর তাঁরা আদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে না যান। ছেড়ে দেন তাঁকে যেন তাঁরা এই জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যের কাছে।

তাই অবশ্য করেছিলেন তাঁরা। বালকের দেহে অনুপ্রবেশকারী এই আত্মাই সেই আধারেই শঙ্করাচার্য্যের

কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে হয়েছিলেন একজন বিখ্যাত সাধক। সুবিখ্যাত হয়েছিলেন তিনি পরিণত জীবনে হস্তামলকাচার্য্য নামে।

শুধু তাই নয়—শঙ্করাচার্য্য নিজেই নাকি করেছিলেন পরকায়ায় প্রবেশ। সে কথাটাও প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে গেল ভূতনাথের। আচর্য্য শঙ্কর তখন অদ্বৈতবাদ প্রচারে রত। এই অবস্থায় তিনি এসে পড়েন দক্ষিণের মাতি-নগরের পন্ডিত মণ্ডন মিশ্রের কাছে। উদ্দেশ্য তাঁর মত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র বিদ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, প্রসিদ্ধ যাজ্ঞিক ধর্মগুরুকে শাস্ত্র বিচারে পরাজিত করলে সমস্ত ভারত গ্রহণ করবে তার মতবাদ। স্থাপিত হবে তার বেদান্তের ধর্ম। উড্ডীন হবে তার অদ্বৈত বাদের পতাকা। বিচার-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবার আগে শর্ত হল যিনি পরাস্ত হবেন তাকেই গ্রহণ করতে হবে বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর শিষ্যত্ব। তর্কযুদ্ধে পরাজিত হলেন মণ্ডন মিশ্র। শর্ত অনুযায়ী শঙ্করাচর্য্য তাকে তাঁর সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করাতে হলেন উদ্যোগী। সামনে এসে দাঁড়ালেন মণ্ডন-পত্নী উভয় ভারতী। কথা হল তার—যেহেতু স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী সেইহেতু তাকে পরাজিত না করা পর্য্যন্ত জয় তার অর্ধ-সমাপ্ত। সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে হলে তাঁকেও তাঁর পরাজিত করতে হবে।

যুক্তি পূর্ণ কথা। মেনে নিলেন শঙ্করাচার্য্য উভয় ভারতীয় কথা। তার আহ্বানে শাস্ত্র বিচারের তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন তিনি। বিষয় বেছে নিতে বললেন উভয় ভারতীকে তারই ইচ্ছামত। বিষয় হল কামশাস্ত্র।

চমকে উঠলেন শঙ্করাচার্য্য। কারণ সর্বশাস্ত্রে পন্ডিত হলেও তিনি কামশাস্ত্রের তত্ত্বিক দিক ছাড়া ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে কিচ্ছু জানেন না। অনাস্বাদিত অনুভূতিতে অসম্পূর্ণ জ্ঞান তার। আজন্ম সন্ন্যাসী তিনি—ব্রহ্মচারী। সুতরাং এ বিষয়ে কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই তার। পড়লেন তিনি মহা মুস্কিলে। কিন্তু যেহেতু তিনি গ্রহণ করেছেন নারী-প্রতিদ্বন্দ্বীর আহ্বান সেইহেতু হয় তাঁকে নামঁতে হবে তার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে, না হয় স্বীকার করতে হবে পরাজয়। এ ছাড় কোন উপায় নেই তার।

শেষে প্রস্তুতির জন্য সময় চাইলেন তিনি একমাস। স্থির করলেন এই সময়ের মধ্যে কোন ভোগী, কামুক দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবেন তিনি। অবস্থান করে তার শরীরে আয়ত্ব করবেন কাম-কলার ব্যবহারিক জ্ঞান। উপলব্ধি ও অনুভব করবেন কাম-তত্ত্বের সম্যক দিক প্রত্যক্ষভাবে। কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া কোন বিদ্যা সম্পূর্ণ হয়না। তারপর এসে তিনি আহ্বান করবেন মণ্ডন-পত্নী উভয় ভারতীকে কাম-শাস্ত্রের বিচার দ্বন্দ্বে।

কিন্তু মুস্কিল হল—এরূপ দেহ পাবেন কি ভাবে তিনি? হঠাৎ একটা সুযোগ এসে উপস্থিত হল তার সামনে। খবর পেলেন তিনি যে তৎ ণ রাজা অমরুকের নাকি মৃত্যু হয়েছে। এবং তার দেহ দাহ করার জন্য আনা হয়েছে বনভূমির শ্মশানের মাঝে। উত্তম সুযোগ। অমরুক ছিলেন অত্যন্ত ভোগ-বিলাসী, কামুক রাজা। সুতরাং তার দেহে প্রবেশ করে কিছুদিন অবস্থান করলে সে আধারের মাধ্যমে কাম-তত্ত্বের ব্যবহারিক দিক সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব হবে তার। তারপর সেই প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞান নিয়ে ফিরে এসে আহ্বান করবেন তিনি মিশ্র-পত্নী উভয় ভারতীকে কাম-শাস্ত্রের আলোচনায় অর্থাৎ তর্কযুদ্ধে।

বনের মাঝে এক গোপন গহন গুহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্য তার গুটিকতক অনুগত ভক্ত শিষ্যকে নিয়ে গিয়ে জানালেন সব কথা। বললেন তিনি যে এ-গুহায় তাঁর নিজ দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম সত্তায় তিনি গিয়ে প্রবেশ করবেন ওই শ্মশানে আনা মৃত রাজা অমরুকের শবীরে। সুতরাং নির্দ্দেশ তার, যতদিন না ফিরে আসছেন তিনি তার এই পরিত্যক্ত দেহে ততদিন যেন এ দেহ কাকে- স্পর্শ করতে না দেওয়া হয়। তার এ স্থান এবং তার এ পরিকল্পনা বা মতলব সমস্ত কিছু যেন গোপন রাখা হয়। আগলে রাখা হয় যেন তার ছেড়ে যাওয়া এ শরীর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে।

ব্যাস। এধারে শরীর ছেড়ে চলে গেলেন তিনি—ওধারে বেঁচে উঠলেন মৃত রাজা অমরুক। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তিনি। মহানন্দে পাত্র, মিত্র-অমাত্য পুরোহিতরা তাকে শ্মশান থেকে নিয়ে গেলেন রাজপ্রসাদে। মৃত রাজার জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দে মহাধুমধাম পড়ে গেল রাজ্যে। কিন্তু রাজমহিষীর রাজার স্বভাব গতি, মতি-প্রকৃতি ও আচরণ দেখে মনে জাগল সন্দেহ। ভোগ বিলাসে বিমুখ। তাকে ব্যবহারে সংকুচিত। না,—এ রাজা তো সে রাজা নয়। জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ রাজমহিষী সব দিক রাজার ভালভাবে

পর্য্যবেক্ষণ করে স্থির-নিশ্চয়ই হলেন যে ইনি নিশ্চয়ই কোন যোগ-বিভূতি সম্পন্ন মহাপুরুষ। নিজের দেহ ত্যাগ করে প্রবেশ করেছেন এ রাজ-দেহে। সুতরাং যেমন করে হোক এ দেহে আটকে পড়া সত্তাকে তার কোন ক্রমেই আর ছেড়ে দেওয়া হবে না। আজীবন রাজা অমরুকের আধারেই বন্দী রাখতে হবে তাকে। তার উপায়, পরিত্যক্ত তার সে-দেহকে খুঁজে বের করে তা পুড়িয়ে একেবারে নষ্ট করে দেওয়া। নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

ছুটল রাজ-মহিষীর অনুচর চারদিকে। খোঁজ করে যোগীর পরিত্যক্ত দেহ নষ্ট করে দিতে। খবর পেয়ে গোপন গুহায় শঙ্করাচার্য্যের পরিত্যক্ত দেহরক্ষী ভক্ত-শিষ্যরা উঠলেন চঞ্চল হয়ে। ভীত হয়ে তারা ভিখারীর বেশে রাজ-প্রাসাদে অমরুক-রূপী শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে করলেন দেখা। দোঁহার হেঁয়ালীতে তাঁকে জানালেন সমস্ত বিপদের কথা। শোনা মাত্র শঙ্করাচার্য্য রাজা অমরুকের দেহত্যাগ করে প্রবেশ করেন লুকিয়ে রাখা তার নিজের দেহের মধ্যে। এধারে মারা গেলেন অমরুক ও ধারে জেগে উঠলেন শঙ্করাচার্য্য।

সুতরাং আসল কথা হল অনেক যোগী-মহাত্মারা নাকি ইচ্ছা করলে অপরের দেহে অনুপ্রবেশ করে এভাবে জগন্মঙ্গল করতে পারেন। পারেন তারা পরকায়া প্রবেশের মাধ্যমে অনেক সাধারণ মানুষকে দিয়েও অনেক অসাধারণ কাজ করাতে। দৃশ্য জগতের অন্তরালে তাদের এই অলৌকিক কর্ম স্থূল-চোখে দেখা যায়না। যায় না উপলব্ধি করা তেমনি বাস্তব বুদ্ধি বা মনেও। এসব দেখবার বা বুঝবার জন্য চাই নাকি দিব্যদৃষ্টি অতীন্দ্রিয় মন। শুনতে লাগল এসব কথা যতই ভূতনাথ ততই তার অবাক হওয়ার মাত্রা যেতে লাগল বেড়ে। অসম্ভব হলেও এসব অসত্য নয়। অবাস্তব হলেও নয় এসব অবিশ্বাস্য। দৃশ্য জগতের অপচ্ছায়ায় অদৃশ্য জগতের যে সত্য প্রত্যক্ষ করল ভূতনাথ তা বাজে বলে মন থেকে তো উড়িয়ে দেওয়া বা মুঝে ফেলা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সুতরাং ভাবতে লাগল ভূতনাথ। ভাবনার মাঝে হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠল সে সতীকে, আচ্ছা—এভাবে ভোজুর দেহকে অবলম্বন করে কতদিন কাজ করে যাবেন মহাযোগী, ওই মহাত্মা ?

"—যতদিন না তোমার ভজুবন্ধুর জগতের জীবৎকাল না শেষ হচ্ছে।" বলে উঠল সতী,—"তোমার বন্ধুর পরমায়ুর শেষ মুহূর্ত্তে সুদূর পূর্বপ্রান্ত থেকে আসবেন এক পরিব্রাজক সাধু। কেদার-বদরী যাবার পথে তিনি সাময়িকভাবে ডেরা নিবেন এই লিঙ্গেশ্বর আশ্রমে। আটকে পড়বেন তিনি অসুস্থ ভজনলালের সেবায়। তার হয়ে তিনিই দিন কতক চালিয়ে যাবেন বাবা লিঙ্গেশ্বরের নিত্য পূজা তথা আশ্রমের কাজ। এই কাজই আস্তে আস্তে পেয়ে বসবে তাকে, চেপে বসবে তার মাথার উপর। তারপর ভজনলালের মৃত্যুর পর এমন পড়বেন তিনি আশ্রমের মায়ায় বাঁধা যে আর যেতে পারবেন না। থেকে যাবেন লিঙ্গেশ্বর আশ্রমেই। আশ্রম স্বামী করুণানন্দ মহারাজ নামে তিনি পরিচিত হয়ে থাকবেন এ অঞ্চলে।

শুনে ভূতনাথের হারিয়ে গেল যেন বাক্‌শক্তি। চোখে-দুটোর দৃষ্টি যেন আটকে গেল তার সতীর মুখটার উপর। বিস্ময় কাটাবার জন্য ভূতনাথের তার পূর্ব কথার জের টেনে বলে উঠল সতী,—"তবেই বুঝ ভূতুদা, সৎ সংকল্পের বিনাশ নেই, বিলয় নেই সৎ চিন্তার। সৎ ভাবনার মৃত্যু নেই। নেই ক্ষয় আত্মজ্ঞানের। আত্মোন্নতির ধারা, আধ্যাত্মিকতার গতি, আত্মোপলব্ধির পর্য্যায় মানুষের যে জীবনে যতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়—মৃত্যুর পর সত্তায় ততদূর পর্য্যন্ত কিন্তু থেকেই যায়। পরবর্তী-জীবনে সেই অসমাপ্ত ধারা অর্থাৎ উচ্চ চিন্তা বা দিব্য ভাবনার গতি সাধারণত আবার তার সেই থেকে-যাওয়া স্তর থেকেই আরম্ভ হয়। তবে কার ক্ষেত্রে, জীবনের কোন ভাগে কখন কি ভাবে যে শুরু হবে তার আত্মোপলব্ধির এই গতি, টানা যাবে তার বিগত জীবনের বিদ্য ভাবনার জের, প্রবাহিত হবে তার সেই অসমাপ্তি আধ্যাত্মিক চিন্তা ও কর্ম-জীবনের ধারা তা কিন্তু বল্গার কারও সাধ্য নেই।

অনেকের ক্ষেত্রে এসব নাকি হঠাৎ হয়। হঠাৎ জীবনে কোন আঘাত এসে, শোক-দুঃখ-হতাশা-বিষাদ এসে, অনুতাপ-অনুশোচনা এসে এমনভাবে ঘুরিয়ে দেয় তার জীবনের মোড়, পরিবর্তন করে দেয় তার জীবনে চলার পথের গতি—কেও তা বুঝতে পারে না। তবে কোন ঘটনা যে ভগীরথের মত পূর্বাপর জীবনের দিব্য-ভাবের গঙ্গা-ধারাকে অবচেতন মনের জটাজাল থেকে উদ্ধার করে বহিয়ে দেবে তার বর্তমান জীবনের সৈকত ভূমিতে আগে থেকে কেও তা জানতেও পারে না। বুঝতে পারে না সে নিজেও কখন কি ভাবে, কার সাহায্যে উদ্ধার পাবে তার সত্তা। মুক্ত হবে তার আত্মা।

"—সুতরাং" বলে উঠল সতী,—"এসব ক্ষেত্রে তোমার ভোজুবন্ধুর মৃত্যু কোন ব্যাপারই নয় ভূতুদা।

ভূতুদা উঠল চমকে। কি—ভোজুর হবে মৃত্যু। এখানে। এই বিভুঁই বিদেশ, বিহারের "মহাদেব খো"-এ। শুনে আসতেই সতীর কথাটা সমস্ত মন-প্রাণ যেন মোচড় দিয়ে উঠল ভূতনাথের। হো-হো করে উঠল অন্তরটা তার। জন্মভূমি বাঁকাদহে আর ফিরে যাওয়া তাহলে হবে না ভোজুর? পাবে না দেখতে সে তার আর মা-বাবাকে? আর মীনা? দেহ-মন-প্রাণ-হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিল যে তাকে। সেই ভালবাসার টানেই ভাটাটা আগলে যে শাকচুন্নী হয়ে আছে নদী কিনারের সেই বটগাছটার ডালে। তার আশায়। তার অপেক্ষায়। সেই মীনার কি হবে? কতকাল থাকবে সে ওভাবে, ওখানে, প্রেতীয় অবস্থায়? উদ্ধার কি পাবে না সে? মুক্ত কি হবে না তার আত্মায়? একের আত্মহত্যা, অপরের আত্মোন্নতির হতে পারে দুটো পথ আলাদা। একের নিম্নগতি, অপরের উচ্চগতি পারে হতে পরস্পর পরস্পরের বিপরীত। একটা অপরটার সম্পূর্ণ উল্টো দিক। কিন্তু প্রেমিক তো তারা। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে একই মূল আত্মার দু দিকের দুটো শাখা-সত্তা মাত্র। প্রেমের টানে, প্রাণের আকর্ষণে, হৃদয়ের বন্ধনে মিলিত তারা হবে না কখনও? নানা প্রশ্নের ঝড় উঠে মনটাকে ভূতনাথের চঞ্চল, ব্যাকুল ও কেমন যেন উতলা করে তুলল।

ভূতনাথের মনের স্পন্দন, চিন্তার কম্পন লাগল বুঝি গিয়ে সতীর সত্তায়। তাই প্রশ্ন না করতেই ভেসে উঠল সতীর মুখে উত্তর। বলে উঠল ভূতনাথকে সে হাসি-মাখা কথায়,—তোমার শিব-হৃদয় ভূতুদা। তাই সব সতী, পার্বতী-উমাদের মনের কষ্ট, আত্মিক—দুঃখ লাগছে এসে হৃদয়ে তোমার। পরোপকারী সত্তা তোমার তাই অপরের কষ্ট এসে দিচ্ছে এসে প্রাণে তোমার নাড়া, করছে এসে মনে তোমার আঘাত।

আসলে নাকি এ জগৎ-সংসারে সবাই তার আপন আপন কর্মফল ভোগ করে। কেও কারো কর্মের জন্য দায়ী নয়। তাই ফল ভাগীও নয়। কর্ম এবং ফল এক অমোঘ নিয়মে বাঁধা। জগৎ-জীবনের কর্মের মাধ্যমেই তো আত্মার উদ্ধার। আর এই জন্যই মনুষ্য জীবন। বোধ-বুদ্ধি-জ্ঞান পেয়েও মানুষ যদি বিবেক সম্মতভাবে কাজ না করে তবে পরিণাম ফল তো তার তাকে ভোগ করতে হবেই। সে যদি তার অন্তরসত্তা তথা মনুষ্যত্বকে বিকাশের পথে না নিয়ে গিয়ে, নিয়ে যায় বিনাশের পথে তবে তো দণ্ড তার হবেই পেতে।

মীনার প্রসঙ্গে বলতে লাগল সতী,—দৈহিক লালসা ও নীচ কামনার কুয়াশায়, হীন বাসনার মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার সত্তা। তবে অন্যান্য আত্মহত্যাকারী পাপাত্মাদের চেয়ে মীনার আত্মার পাপের ঘোর নাকি শীঘ্র যাবে কেটে। যাবে কেটে ভজনলালেরই শুভ-কর্ম-জনিত দিব্য আলোরচ্ছটায়। পরশমনির স্পর্শে লৌহও সোনা হয় ভূতুদা। তোমার ভোজু-বন্ধুর সত্তা শঙ্করানন্দের স্পর্শে তাই হয়েছে সোনা। সে সোনার আলোর কিরণ গিয়ে পড়বে মীনার উপর। যেহেতু মীনা নিষ্ঠাভরে, তার মন-প্রাণ এক করে পড়ে আছে সেখানে ভজনলালের চিন্তায়। সূর্য্যের আলোকে যেমন মেঘ কাটে, কুয়াশায় আবরণ হয় অপসারিত। তেমনি ভজনলালের পুণ্যফলের সূর্য্য কিরণে মীনা-সত্তার অন্ধ-মোহের ঘোর যাবে কেটে। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য আর কি। মৃত্যুর পর ভোজুর আত্মা মিলিত হবে গিয়ে ওই মীনার সত্তার সঙ্গে। তারপর পরস্পর পরস্পরের কামনা-বাসনায় পরিপ্রেক্ষিতে আবার পৃথিবীতে করবে জন্মগ্রহণ। এভাবেই হবে তাদের মুক্তি। কারণ জন্মান্তর ছাড়া সত্তার উদ্ধার, আত্মার মুক্তি হওয়া নাকি অসম্ভব।

মন্ত্রমুগ্ধের মত ভূতনাথ শুনতে লাগল সতীর কথা। এতো কথা নয়, যেন ফুল ঝরা। শরতের শিউলী যেন লাগল পড়তে ঝরে ভূতনাথের মন-প্রাণের উপর, ঝাঁকের ঝাঁক। বলতে লাগল সতী,—তোমার ভোজু-বন্ধুর পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের কথা বলছ ভূতুদা। কিন্তু উর্ধ্বলোকের এই শূণ্য স্তরে এসে যদি অবলোকন কর তখন দেখবে কেও কারো পিতা বা কেও কারো মাতা নয়। এ জীবনে কে কার? বাঁকাদহে তোমার বন্ধুর বাড়ী ফেরার কথা বলছো? হায় ভূতুদা কে কোথাকার? কার কোথায় বাড়ী? এটাই তো মায়া ভূতুদা। বৈষ্ণবী মায়া ভুলিয়ে আমাদের এমনি ভাবেই তো খেলাচ্ছে, নাচাচ্ছে আমাদের। সঙ সাজিয়ে রেখেছে সংসারে। সবই আপেক্ষিক ভূতুদা। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবন-যুদ্ধ সবই তো সাময়িক। কামনার বীজ যার যেমন সে তেমন স্থানে, তেমন মাতা-পিতাকে অবলম্বন করে নিচ্ছে জন্ম, কাটাচ্ছে কাল। মৃত্যু এসে আবার মুছে দিচ্ছে জীবন পটের সমস্ত ছবি। জগতে এলাম, ভোগ করলাম, চলে গেলাম—এতো মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য

নয়। লক্ষ্য তো আত্মমুক্তি। সে-পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই তো জীবন। মূল লক্ষ্যকে ভুলে এসব ঘর-সংসার রূপ পান্থশালায় আটকে থাকা; পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন ভাই-বন্ধুর মায়ার টানে আবদ্ধ হয়ে থাকা তো অজ্ঞানতারই নামান্তর ভূতুদা।

অর্থাৎ সতীর কথা হল-চরৈবতি। এগিয়ে যেতে হবে। নিজের জ্ঞান বিবেককে জাগ্রত করে আত্মা—সত্তার পূর্ণ-জ্ঞান লাভের দিকে। যেতে হবে এগিয়ে। কত কত জন্মের কত কত ঘর-সংসার মাড়িয়ে এসেছে সত্তা, ত্যাগ করে এসেছে কত মা-বাবা ভাই-বোনকে। জন্ম-জন্মান্তরের মাধ্যমে এভাবেই সে এগিয়ে চলেছে সে আত্মস্বরূপ উপলব্ধির দিকে। চলার মাঝে বদ্ধজলার মত এক জায়গায় আটকে থাকলে যে সত্তার মূল লক্ষে পৌঁছতে অযথা হবে বিলম্ব। বার বার জন্ম-জীবন কর্ম-মৃত্যুর আবর্তে ঘুরপাক খেতে হবে আত্মাকে। তাই ভূতনাথের চেতনাকে যেন নাড়া দিয়ে বলে উঠল সতী;—সব সময় নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনাকে জাগ্রত রেখে চলবে ভূতুদা। সচেতন রাখবে নিজের বোধকে এই চিন্তায় যে কে তুমি? কোত্থেকে এখানে এসেছ তুমি? এখানে আসার উদ্দেশ্য কি তোমার? সে উদ্দেশ্যমত কি কাজ করছ তুমি এখানে?

কথাগুলো সতীর কেমন যেন ঝট্‌কা মেরে উঠল ভূতনাথের মনটাতে। তার বাস্তব চিন্তায় চেতনায় দিল যেন হেঁচকা টান। সত্যিই তো কি ঘোরে আছে সে? সে যে ভূতগ্রাম নামক গ্রামের বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছেলে। ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কথাটা যে সে একেবারে বেমালুম আছে ভুলে। এসেছে সে এখানে অর্থাৎ এই শালী নদীর তীরে বাবলা-ডাঙ্গায় অবিনাশ বাবুর কারখানায় কাজ করার উদ্দেশ্যে—সেটাও মনে নেই তার। নেই হুঁশ তার যে সে স্বেচ্ছায় কারখানার সেপাই দারোয়ান লালবাহাদুর, ভীমচন্দ্র ও রাম সিং-কে নিয়ে রাত্রে আবিনাশ বাবুর কারখানা পাহারা দেবার ও রক্ষনাবেক্ষণ করবার নিয়েছে দায়িত্ব। এ যে অবাক বিস্মরণ তার। চঞ্চল হয়ে উঠল ভূতনাথ।

একেই বলে—উল্টো বুঝলি রাম। সতী বলতে গেল এক আর ভূতনাথ বুঝে বসল অন্য আর এক। মনটা ভূতনাথের বাস্তব চিন্তায় নেমে আসতেই সামনে সতীর তন্মাত্রায় টেনে আনা সেই "মহাদেব-খো"-এর দৃশ্য, লিঙ্গেশ্বর আশ্রমের দিনমানের কর্মব্যস্ততার ছবি, ভজনলালের শঙ্করানন্দের পাটে বসা সাধুবেশী চিকিৎসকের মূর্ত্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে গেল যেন উবে। আর সেই আশ্রমটা তার লোক-লস্কর, ভক্ত-শিষ্য সমস্ত কিছু নিয়ে হয়ে গেল যেন হাওয়া। শূন্যে পটে ভেসে উঠা সেই সমাধি-মন্দির লিঙ্গেশ্বর মূর্ত্তি শূন্যেই গেল যেন মিলিয়ে।

হতভম্ব হয়ে ভূতনাথ রইল দাঁড়িয়ে কাঠের পুতুলটার মত। হঠাৎ নীচ থেকে তার ভেসে এল উঠে মানুষের চিৎকার। ভাঙ্গল চমক তার। চিৎকারটাকে অনুসরণ করে নীচে তাকাতেই আরোও অবাক হয়ে গেল ভূতনাথ। দেখে যা বুঝল সে তা হল—মহাদেব খো কেন কোত্থাও, কোনোখানে, কোনো স্থান বা জায়গাতেই যায়নি সে। দাঁড়িয়ে আছে সেই ভৈরব থানেই। তবে নীচে, অর্থাৎ মাটির বুকে নয়—উপরে, আসমানে। আসমানে যে কত উঁচুতে কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে সে তা কিন্তু বুঝতে পারল না ভূতনাথ। না পারলেও বুঝতে, নীচের অন্ধকারে ডুবে থাকা সমস্ত কিছুই কিন্তু পড়তে লাগল তার চোখে। নীচে নজর ফেলে, দেখল সে চিৎকার করা মানুষগুলো অন্যকেও নয়—অবিনাশ বাবুরই কারখানার লগদী লাল বাহাদুর, সেপাই ভীম চাঁদ ও দারোয়ান রাম সিংহ। ঘাড়-মোটা, পুরু গালপাট্টা, জমাট-ভারী মোছ-ওয়ালা তাগড়া যোয়ান বীর পুঙ্গবরা ছুটছে ভয়ে ভৈরবথান থেকে সামনের ডাঙ্গাটার দিকে। যে ডাঙ্গাটা ছিল অবিনাশ বাবুর কারখানা আর পাথর মুড়ি গ্রামের মাথার ঠিক মাঝখানে।

যা বাবাঃ। একি কাণ্ড। যার পর নাই বিস্মিত হল ভূতনাথ ওই লাল বাহাদুর, ভীমচাঁদ ও রাম-সিং-দের ব্যাপার স্যাপার দেখে। অবশ্য অবাক হওয়ারই কথা। কারণ যে কালে তারা তাকে এই নির্জন ডাঙ্গার কোণে ভৈরব থানের ঝোপ-ঝাড়ের মাঝে একলা ফেলে ছুটে পালিয়েছিল সে কালটা যে কেটে গেছে কতক্ষণ আগে তার তো কোন হিসেব-নিকেশ নেই। অথচ তাকে ছেড়ে যেমন ভাবে ছুটতে আরম্ভ করেছিল তারা ছুটছে ঠিক তেমনি ভাবেই। আশ্চর্য্য। সে ছুটা শেষ হওয়া তো দুরের কথা—সামান্য ডাঙ্গাটাও ছেড়ে যেতে পারেনি তারা। এখনও। অথচ সতীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত কেটে গেছে যে ~~কত~~ ঘণ্টা তার তো কোন ঠিক নেই। ঘণ্টা কেন—বোধ হয় প্রহরের পর প্রহর কেটে শেষেই হয়ে এসেছে প্রায় রাতটাই। কিন্তু......।

কিন্তু—"কিন্তু"-র কথা কি আর বলবে ভূতনাথ? ধারনাটা যে তার এক্কোবারেই ভুল। তার ঘণ্টা-প্রহর অতিবাহিত হওয়ার হিসেবটা যে মোটেই ঠিক নয় আকাশের দিকে তাকিয়েই তা বুঝতে পারল ভূতনাথ। অন্ধকার রাতের তারাগুলো যে যেখানে ছিল প্রায় সে-সেখানেই আছে দাঁড়িয়ে। সরেনি একটুও। নড়েনি এক চু-ও। সময়টা তা হলে কি তার চলৎ-শক্তি হারিয়েছে? কালের গতি কি রুদ্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ কোন ইন্দ্রজালিক শক্তিতে? তা-তো অসম্ভব। তবে কি সূক্ষের সময় আর বাস্তবের সময় সম্পূর্ণ আলাদা—পৃথক? কেও কারো হাত ধরে চলে না? পরস্পর ভিন্ন ধাতের, না বিপরীত ধর্মী?

"—ঠিক তাই ভূতুদা।" বলে উঠল সতী,—বাস্তবের ঘড়ির কাঁটা দিয়ে যেমন সূক্ষ্মের সময় পরিমাপ করা যায় না তেমনি সূক্ষ্মের মুহূর্ত্তকাল ধরে বাস্তবেরও সময় মাপা যায় না। সূক্ষ্মের এক পলকে যেমন বাস্তবের ঘন্টা-প্রহর-দিন-বৎসর পর্য্যন্ত কেটে যেতে পারে—তেমনি আবার বাস্তবের এক পলকে সূক্ষ্মের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যেতে পারে। মুহূর্ত্ত নিমেষ কালে যুগ-যুগান্তও গড়া হয়ে যেতে পারে। সতুরাং স্থূল-সূক্ষ্মের কাল-দণ্ডে উভয়ের ভিন্নমুখী সময়ের ধারা বিচার করা যাবে না ভূতুদা। সূক্ষ্মে বাস্তবের সময়ের ধারা অচল বলেই তুমি বাস্তবের মুহূর্ত্ত-ক্ষণে অনেক কিছু দেখতে পেলে, বুঝতে পারলে এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সূক্ষ্মের অনেক সত্তার সঙ্গে মিলে-মিশে জানতেও পারলে।

সতীর কথায় বিস্ময়ের মাত্রাটা আরো বেড়ে গেল ভূতনাথের। তার সমস্ত ভাবনা-চিন্তাগুলো বাস্তব-সূক্ষ্মের মাঝে পড়ে যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। নীচে তাকাতেই চোখের সামনে ভূতনাথের ভেসে উঠল আর এক মজার দৃশ্য। এত বড় সেপাই ভীম চাঁদ পালোয়ান ভয়ে হয়ে গেছে এমন তালকানা যে ডাঙ্গার মাঝে একটা মাথা-ভাঙ্গা খেজুর গাছকে ভূত মনে করে সে ছুটে পালাতে গিয়ে উঠছে আর পড়ছে। পড়ছে আর উঠছে। ভয়ে। বার বার। অথচ মনে সাহস আনবার জন্য মুষল ধারে মুখে একটা বর্ষণ করে চলেছে—"জয় সীয়ারাম, জয় রঘুনন্দন, জয় জানকী বল্লভ"—ইত্যাদি নানা প্রকার বুলি, সে বুলিগুলো ভয়-কাঁপা দাবা গলায় উচ্চারিত হচ্ছে কিম্ভুত কিমাকার ভাবে। কাঁপছে ভয়ে চোখ মুঁদে, কাটা ছাগলের মত। না পারছে এগিয়ে যেতে, না পারছে পিছনে হটে আসতে। মানে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। ভয় কাতুরে মানুষদের নাকি এরকম অবস্থাই হয়। ভীতু মনের কল্পনায় রাত-আঁধারে ওরকম বাজ-পড়া, মাথা-ভাঙ্গা ন্যাড়া-বুচো তাল খেজুরের গাছকে দেখলে ভূত মনে করে। খাগড়া গাছকে দেখলে মনে করে প্রেত। আর লতা-জড়ানো গাছের কোন ডাল-পালা দেখলে মনে করে ঝাঁকড়া মাথাওয়ালী পেতনী কিংবা এলোকেশী ভূতনী। এভাবে নিজের মনের ভয়ের কল্পনায় নিজেই তারা আতঙ্কে হয় " ড়ষ্ট। ঘটায় নানা বিপদ বা অঘটন। কেও হারায় সংজ্ঞা, কারো লাগে দাঁত-কপাটি। হঠাৎ ভয়ে হার্টফেল করে মারাও যায় নাকি কেও কেও।

এই ভয়ের প্রসঙ্গেই বলল সতী আর এ ধর"নর অদ্ভুত কথা। মিথ্যা এরূপ ভয়ের কল্পনায় কেও কখনও আবার পড়ে যায় সত্যি ওমনি প্রেত বা ভূতের কবলে। ভয়গ্রস্থ মানুষের মনের আকর্ষণে অনুরূপ ধরনের ভূত-প্রেতের হয় নাকি আবির্ভাব, আচমকা। রূপ ধরে তারা ভয়ার্ত মনেরই কল্পনা মত। এসব ভূত-প্রেতগুলো হয় নাকি অত্যন্ত নীচু স্তরের। হীন স্বভাব এবং নীচ মনোভাবের। তাদের গতি-প্রকৃতি, গতি-বিধিও হয় তেমনি উদ্ভট এবং উৎকট। এরা আবার ভয় করে মানুষকে। রাশ-ভারী বা সাহসী মানুষের বাতাস তারা সহ্য করতে পারে না। পবিত্রতার সামান্যতম আঁচও এদের অসহ্য। লোক-লোকালয় ছেড়ে তাই তারা বেড়ায় ঘুরে নির্জন বনে বা ফাঁকা তড়ায়। থাকে তারা পাথর মুড়ি " "মের মাথার মত এমনি জনহীন প্রস্তরে বা শূন্য ডাঙ্গায়। রাশপুরু বা ধাত্-ভারী (সাহসী) লোককে এড়িয়ে চললেও কিন্তু তারা ওই রকম ভীমচাঁদের মত রাশ-পাতলা, হালকা ধাতের অর্থাৎ মানসিক দুর্বলতাগ্রস্থ, ভীরু মানুষকে পেলে তারা পেয়ে বসে। পেয়ে বসলেও অবশ্য তারা প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না বা সরাসরি তাদের সামনেও তারা নীচ সত্তা বলে উদয় হতে বা হট করে রূপ ধরতে পারে না। তবে তাদের সাহসহীন অবস্থায় পেলে এরা একটু মজা করে আনন্দ পায়। যাকে বলে "প্রেতুড়ে-আনন্দ" আর কি। প্রথমে তারা নাকি তাদের প্রেতুড়ে বাতাস বহিয়ে পরিবেশটাকে করার চেষ্টা করে ভীতি-জনক। তারপর আগে-পিছে গাছের পালায়, ঝোপে-ঝাড়ে নানাপ্রকার শব্দ তুলে, এধার ওধার আওলি বাউলি ভূতুড়ে হাওয়া বহিয়ে মানুষের মনকে করে ভীত, আতঙ্কগ্রস্থ। ভয়ার্ত মন স্বভাবতই

হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত। তার ফলে হয় তারা দিশাহারা, পাগল পারা। হারায় পথ। ভুলে দিক। দিক-ভ্রান্ত হয়ে তারা শূন্য ডাঙ্গার মাঝে বা বনের মাঝে বন বন করে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে হাঁফিয়ে, হয়রান হয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় কেও। কেও আবার হয়ে যায় উন্মাদ। "ওই তো আমাকে ডাকছে", "ওই তো আমাকে ইসারা করছে" ইত্যাদি বলে শূন্য মাঠে, ফাঁকা ডাঙ্গায়, ঝোপে-ঝাড়ে, বনের মাঝে পাগলের মত ছুটোছুটি করে। অনেকে একে বলে "ভূত-ভেল্কিতে পড়া। কোথাও কোথাও গেঁয়ো-কথায় একে কেও "ভুলানো ভূতে পাওয়া" বা "ঘুরানো প্রেতে লাগা" বলে থাকে। থাকে বলে কোথাও আবার "বন-বাঁওরা" বা "বাগাল্যা ভূতে" লাগা।

এ অবস্থায় পড়লে ওসবরে হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য অনেকে আবার নানারকম "তুক" করে তাকে। যেমন হাততালি দেওয়া, বুকে চাপড় মারা, গায়ে থুতু লাগানো, চুলে গিঁট মারা ইত্যাদি। অনেকে আবার বন বা ডাঙ্গার মাঝে দিকভ্রম হওয়ায় ওই রকম ভূত-প্রেতের কবলে পড়েছে মনে করে পশ্চিম দিকে মুখ করে নিজের জামা-কাপড় খুলে আবার ঝেড়ে পরে। এসব তুক-তাক আসলে হল ভীতু মনটাকে সাহসী করা বা অন্যমনস্কতাটা কাটিয়ে একটু নিজেকে সজাগ বা সচেতন রাখার চেষ্টা করা। মনটাকে একটু চ্যাঙ্গা বা একটু সবল রাখলে ওসব ভূত প্রেতরা নাকি ভয়ে পাশ ঠেসে না। কারণ আগেই বলা হয়েছে সে সাহসী মনের আঁচ বা হাওয়া তারা মোটেই সহ্য করতে পারে না।

কথায় কথায় জানল ভূতনাথ স্থূল জগতের ইয়ার্কি-ফাজলামি করা হাল্কাধাতের মানুষের মত সূক্ষ্ম জগতের হল নাকি ওই সমস্ত ভূত-প্রেত। ভীতু মানুষ পেলে ভয় দেখিয়ে তারা মজা করে। মানুষের মনের ভয়ের মাত্রাটা যতই যায় বেড়ে ততই নাকি ভয় দেখিয়ে মজা লুটার মাত্রাটা উঠে তাদের চরমে। নীচে লালবাহাদুর ও রাম সিং-এর অবস্থাটা দেখে সেই রকমই মনে হল ভূতনাথের। ভৈরব থানটা থেকে ছুটছে তারা এমনভাবে ডাঙ্গটার দিকে যে দেখে মনে হচ্ছে এ যেন সেই স্বপ্নে ভয় পেয়ে বা ভূত দেখে ছুটার মত। পা পড়ছে কি পড়ছে না কোন ঠিক নেই তাদের। ছুটছে অথচ মনে হচ্ছে পিছনের দিকে যেন টানা আছে তারা। এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে কোন হুঁশ নেই তাদের। যেন শূন্যে ছুঁড়ছে হাত-পা। কিন্তু পাগলের মত করছে তার চিৎকার। হিন্দি-বাংলা জগা-খিঁচুড়ি ভাষায়,—বাঁচাও, কোই কাঁহা হে বাঁচাও। ভূতের হাতে হামরা মরিয়ে যাচ্ছে। হামাদের রকষা করো। মোটা পৈতা-গাছা হাতে ধরে কি বলতে যে কি বলে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছে রাম সিং কে জানে। হেঁড়োলে ধরা ছাগলের মত মাঝে মধ্যে উঠছে যেন সে মেঁমিয়ে."—ভূঁত মেঁ, নেঁহি নেহি প্রেঁত মে হামকো পাকড় লিয়া। জিন মে হামকো মার দেনা চাহতে হে। তুরন্ত কোই আ-কর হমলোককো উদ্ধার করো মেহের বানী করকে বাঁচাও, ছুটিয়ে আসিয়ে রকষা করো। হামরা মরিয়ে গেলাম। হায় রাম—।

আর্তনাদ করতে করতে ছুটছে তারা। ছুটতে ছুটতে খাচ্ছে হোঁচট। পড়ছে দুম্-দাম্। পড়েই আবার উঠছে। উঠেই ভয়ে তাকাচ্ছে এধার ওধার। পাগলের মত। তাকিয়ে আবার ছুটছে উর্ধ্বশ্বাসে। কোন দিকে জানে না। জানে না বোধ হয় তারা ডাঙ্গাটার কোন দিকে গোড়া, কোন দিকে শেষ। হুঁশ নেই কোন দিকে গ্রাম, কোথায় গেলে পাবে রেহাই। শুধু ছুটছে তারা। উঠছে পড়ছে, পড়ছে উঠছে, ছুটছে আবার। ছুটছে বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে। আসলে ঘুরছে তারা। ঘুরছে ডাঙ্গাটার চারধার। চাঁই ঘুর-ঘুর ঘুরন-চাকীর মত। সে এক মজার ঘুরা—পাঁই পাঁই বাঁই বাঁই। মনে হয় ঘুরছে না তারা, ঘুরানো হচ্ছে তাদের। ছুটছে না তারা, ছুটানো হচ্ছে তাদের। কারণ নজরটা একটু স্পষ্ট করতেই দেখল ভূতনাথ কতকগুলো ছায়া ছায়া কায়া। কালো কালো মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তিগুলোরই কতকগুলো করছে তাদের পিছনে তাড়া, কতকগুলো আবার সামনে গিয়ে আটকে দিচ্ছে তাদের পথ। থামলেই ওমনি আবার তাদের ঘিরে নাচতে শুরু করে দিচ্ছে তারা। কিম্ভুত কিমাকার মূর্ত্তিতে, বিদ্‌ঘুটে ধরনের ভঙ্গীতে। সুতরাং রাম সিং আর লাল বাহাদুররা পড়েছে এমন ফ্যাসাদে যে না পারছে তারা ছুটে পালাতে, না পারছে একটু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে আর না পারছে তাদের অক্টোপাশ ভৌতিক বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসবার কোন পথের দিশা। সুতরাং উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একনাগাড়ে একটানা ডাঙ্গাটার পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ করে শুধু ঘুরেই চলেছে তারা। আচ্ছা বিপদে পড়েছে তো তারা।

সতীর মুখটার দিকে তাকাতেই ভূতনাথ বলে উঠল সে,—বলছিলাম না, এমন কতকগুলো নীচ প্রেতাত্মা আছে যারা এমনিতেই মানুষের পাশ ঠেসে না কিন্তু ভয়-দুর্বল কোন মানুষ-জন পেলেই তারা তাদের নিয়ে মজা

করে আনন্দ পায়। ওরা হল সেই ধরনের ডাঙ্গার ভূত ভূতুদা। লাল বাহাদুর, রাম সিং-দের ভীতু মনটাকে অবলম্বন করেই ওরা ওদের পেয়ে বসেছে। বলতে গেলে ওরা ওদের ভয়ার্ত মনেরই সৃষ্টি ভূতুদা। রূপ ধরেছে ওমনি তারা তাদের ভীতু মনটারই কল্পনার অনুরূপ। ঘুরাচ্ছে ছুটাচ্ছে তাদের মনের ভয়েরই ভাবনার মত।

আসল কথা হল নাকি ভৈরব থানে হঠাৎ সতীর মেঘ-ঘন শাদা অবয়বটা দেখেই আঁৎকে উঠে তারা। ভূত মনে করে ভয়ে তারা ভূতনাথকে সেখানে একলা ফেলেই মেরে দেয় ছুট। ছুটতে ছুটতে মনে করে তারা ভৈরব থানের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিটা করছে তাদের পিছনে পিছনে তাড়া। সেই ভীতি-বিহ্বল দুর্ব্বল মনটাকে নিয়ে ডাঙ্গার মাঝে পড়তেই তারা পড়ে যায় ডাঙ্গার ওই সব প্রেতাত্মাদের কবলে। মজা লুটতে ধরে তারা তখন ওই লাল বাহাদুর, রামসিংদের ভয়ার্ত মনের কল্পনা মত রূপ। সেই রূপ ধরেই ছুটাচ্ছে তারা তাদের। ডাঙ্গার মাঝে ঘুরিয়ে তাদের লুটছে মজা। করছে আনন্দ।

"—কিন্তু এভাবে আর কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করলে যে দম আটকে মারা যাবে তারা। হাঁফাতে হাঁফাতে পড়ে হঠাৎ হয়তো, হার্টফেলও করতে পারে।" ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ভূতনাথ বলে উঠল সতীকে।

সতী বলল ধীর গম্ভীর স্বরে,—ওরা ওদের অপকর্মের উপযুক্ত শাস্তিই পাচ্ছে ভূতুদা। দুরভিসন্ধি ছিল ওদের মনে। কারখানা থেকে তারা ভূতের ভয়ে ভৈরব থানে তোমাকে টেনে আনলেও তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। অবিনাশবাবুকে ফাঁকি দেওয়া। ভৈরব থানে হাত দেওয়া করিয়ে তোমাকে সেই শপথই করিয়ে নিত। প্রতিশ্রুতি আদায় করত তোমার মুখ থেকে যে তাদের কথা মতই চলতে হবে তোমাকে। তাদের মতে মত না দিলে তুমি, করত তোমাকে মার-ধর। এমন কি অসংযত প্রকৃতির ওই মানুষগুলো তোমাকে মেরে একেবারে শেষ করে ফেলেতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হত না। তাই তো আমায় আসতে হল তোমার কাছে ভূতুদা।

—কিন্তু আমি থাকতে ওরা মারা গেলে, অবিনাশ বাবুর কাছে যে মুখ দেখানো আমার ভার হবে সতী। বাঁচা ওদের। নইলে যেরকম দেখছি ওই প্রেতাত্মাগুলো একেবারে মেরে ফেলবে ওদের।

—ওসব নীচ আত্মাদের সে ক্ষমতা নেই ভূতুদা। মারা তো দূরের কথা মানুষকে স্পর্শই করতে পারে না ওরা। দূর থেকে ওমনি ভয় দেখানো ছাড়া আর তাদের অন্যকিছু করার ক্ষমতা নেই।

—কিন্তু বুঝছি যা, দেখছি যেরকম, ভয়ের চোটেই তো মারা যেতে পারে ওরা। বল কি করে ওদের হাত থেকে রক্ষা পাবে ওরা।

—ওরা যখন ওদের ভয়েরই সৃষ্টি ভূতুদা। মন থেকে তখন ভয় দূর হলেই উবে যাবে ওরা। একটু মনে সাহস এলেই ওদের ওইসব ভয়াল- ভয়ঙ্কর-ভৌতিক মূর্ত্তিগুলো হাওয়ার সঙ্গে যাবে মিলিয়ে।

"—তাহলে তো এক্ষুনি ওদের মনে সাহস সঞ্চার করা দরকার।" বলেই ভূতনাথ ঝাঁপ দিয়ে যেন পড়তে উদ্যত হল সেই লাল বাহাদুর ও রাম সিং এর সাম নে। ওমনি চঞ্চল হয়ে উঠল সতী। বলে উঠল সে ব্যাকুল স্বরে,—যেও না ভূতুদা। আমার সত্তায় সত্তাবান হয়ে আছ তুমি। আছ তুমি এখন আমার আধারেই আসীন হয়ে। হঠাৎ এ অবস্থায় ওমনিভাবে তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে বিপদ ঘটতে পারে তোমার। ঘটতে পারে হঠাৎ কোন অঘটন। সূক্ষ্ম-সত্তাকে তোমার স্থূল আধারে পুনরায় অনুপ্রবেশ না করানো পর্য্যন্ত ওভাবে হটকারিতা করে যেও না নামতে বাস্তবের মাটিতে। যা করবার আমি-ই করছি।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। নবকুমারের মত পরোপকারী মন যাদের, তারা স্থির থাকতে পারে নি কখনও অপরের বিপদ দেখলে? ভাবে কিকখনও তারা পরের বিপদের মুখে নিজের বিপদের কথা? ভাবলেও কখনও পরের বিপদের চেয়ে নিজের বিপদকে বড় বলে মনে করে না তারা। সুতরাং—"ভয় নেই, লালবাহাদুর যাচ্ছি আমি। মনে সাহস অবলম্বন কর রাম সিং আসছি আমি। ভয় নেই-নেই ভয়।" বলেই ভূতনাথ মেরে দিল যেন পাহাড়ের উপর চূড়া থেকে ঝাঁপ। যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে একবার ছোটবেলায় সেই গন্ধেশ্বরী নদীর উঁচু পাড় থেকে। বানে ভেসে যাচ্ছিল একটা ছেলে। ডুবে উঠে বাঁচবার জন্য চিৎকার করছিল সে। কিন্তু পড়তি বানের ঘূরনিতে পড়ে পরকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণটার ঝুঁকি নিতে পারছিল না কেও। কিন্তু বেপরোয়া ভূতনাথ দেখেই ওমনি নিজের বিপদ-আপদের কথা চিন্তা না করে, কারো কথা না শুনে পড়েছিল সে ঝাঁপিয়ে। এ ঝাঁপ যেন ঠিক তার সেই ঝাঁপের মতই।

অনন্যোপায় হয়ে সতীস্মরণ করল সেই পাথরমুড়ির ডাঙ্গার মাঝে বাবা কাল ভৈরবকে,—হে বাবা, রক্ষা কর ভুতুদাকে। সন্তাকে তার দেহছাড়া হতে দিও না ভগবান। কোলে তুলে নিয়ে বাঁচাও তার জীবন। হে কাল-ভৈরবরূপী মহান আত্মা, ভুতুদার দায়িত্ব তোমাকেই দিলাম প্রভু।

কথাগুলো ভূতনাথের কানে গেল কি না কে জানে। তবে একবার বোঁটা ছাড়া হয়ে গেলে তাল যেমন গাছ থেকে তীব্র বেগে মাটির আকর্ষণে পড়তে বাধ্য হয় নীচে। বাস্তবের আকর্ষনে ভূতনাথও যেন তেমনি তীব্র বেগে পড়তে চলল মাটিতে। তারপর যে কি হয়ে গেল তার আর কোন হুঁশ রইল না ভূতনাথের। শেষ পর্য্যন্ত পড়ল কি না সে নীচে আর পড়লই বা কোথায়, রইল না তার আর কোন খেয়াল। বোধ হয় সে হয়ে গেছল সংজ্ঞা হারা। কিংবা সে হারিয়ে ফেলেছিল তার বোধ সচেতনতা।

(চব্বিশ)

নদীপাড়ের অবিনাশবাবুর কারখানার শেষ চৌহদ্দিটা ধরে এই যে দুর, নাতি দূরের দশ-বারোটা গ্রামের মাঝে ব্রহ্মডাঙ্গাটা—এটার নাম হল 'ভৈরব ডাঙ্গা।'নামকরণ অবশ্য বাবা কাল-ভৈরব নাথের এ ডাঙ্গার ঈশান কোণে অবস্থানের ফলেই। সে কোণের কতকগুলো ঝাঁকড়া মাথাওয়ালা নিম-কুচ্‌লা, আকড়-বাবলা, সিধা—আমলা ইত্যাদি গাছের জটলা করা তলাতেই হল বাবার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। উঁচু মাটির বেদীর উপর কতকগুলো গাদা করা ভাঙ্গা-আধভাঙ্গা পোড়ো মাটির হাতি ঘোড়াই হল বাবার মূর্ত্তি। তবে ক্ষেত্র বিগ্রহ বাবার যেরকমই হোক না কেন এ অঞ্চলের ওই আশ -পাশ গ্রামগুলোর হলেন তিনি গ্রাম্য দেবতা তথা জাগ্রত দেবতা "ডাঙ্গাল্যা-বাবা"। এই জাগ্রত দেবতাটিকে রোজ সকালে জাগাতে আসেন ধারে পাশের ওই সব পাথর মুড়ি, কুমার খুলি, গদার ডিহি, পলাস ডাঙ্গা, গোবর ডাঙ্গা ইত্যাদি গ্রামের সব বৌ-কনে, মেয়ে ঝিরা। এ দলে কুঁড়ি থেকে উঠতি ছুঁড়ি বুড়ী পর্য্যন্ত অর্থাৎ আইবুড়ো, সদ্য বিবাহিতা, সধবা বিধবা কারো আসতে মানা নেই। আসে সবাই রাত ভোর করা কাক্-কোকিলার অর্থাৎ বিভিন্ন বিহগ কুলের শেষ প্রহরের কল-কলানি শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। রাত পোহানো ফর্সা হওয়া ভোরে এগ্রাম সে-গ্রাম থেকে সব দল বেঁধে, সার দিয়ে আসে বাবাকে জাগাতে। জাগাতে আসা মানে হল বাবার থানে ছড়া-মাডুলি দিতে আসা। এ ছড়া-মাডুলি দেওয়া থাকে কারো মানত করা, কারো ব্রত বা কৌলিক করা। কারো আবার থাকে অগ্রিম বাবার কৃপা লাভের আশায় সংকল্প করা। যেমন বিয়ে হওয়া, পুত্র-সন্তান লাভ, রোগ-জ্বালা নিবারণ, আসন্ন বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি, গ্রহ-শান্তি, দৈব-দুর্বিপাক থেকে রক্ষা বা উদ্ধার ইত্যাদি। এ সংকল্প গ্রহণে কাকেও যেমন কখনও নিষেধ করতে নেই তেমনি কখনও কাকেও কোন অবস্থাতেই বাধা দিতে নেই। জীবনে তাই শুরু করলে এ ধারা শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়-বৃষ্টি, বান-বাদল কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়েই বন্ধ করতে নেই। এ কাজে ঘটলে ব্যত্যয়, হলে ব্যাঘাত, পড়লে ছেদ বা দিলে বাধা ডাঙ্গালা বাবার পড়ে কোপ। এ কোপ কার উপর কখন যে কিরূপ অমঙ্গলের মূর্ত্তি বা অকল্যাণের রূপ নিয়ে পড়ে আগে থেকে কেও তা বুঝতে পারে না।

থাকগে ওসব কথা। তবে আলো ফোটা ভোরে ফর্সা হওয়া প্রকৃতিতে ডাঙ্গাটার পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ দিক থেকে সার দিয়ে আসে যখন বিভিন্ন গ্রামের বৌ-ঝিরা তখন দেখার মত হয় দৃশ্যটা। এক হাতে তাদের জলের ঘটী, অপর হাতে গোবরের ডেলা। আর মুখে তাদের সে এক অদ্ভুত সুরে বাবার ঘুম ভাঙ্গানী ছড়াগান। ভোরের আনকো আলোয় আলতো বাতাসে সমবেত বামা কণ্ঠের সুর মাধুরী যেন মধু ছড়াতে ছড়াতে আসে দূর গ্রামের মাঠ-ঘাট, পথ-ঘাট ছাপিয়ে ক্রমশঃ ডাঙ্গালা বাবার থানটার দিকে। টানা সুরের ঝঙ্কারে তাদের যেন ঝঙ্কৃত হয় বাতাস, অনুরনিত হয় আকাশ। এককথায় সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি যেন আমোদিত হয়ে উঠে সে প্রভাতী সুরের ভৈরবী তানে লয়ে,—"জাগো জাগো হে মহা-ভৈরব, জাগো কল্যাণকারী মঙ্গলময় রূপে তুমি জাগো হে কল্মষহারি। সূর্য্য রূপো জাগো তুমি, ঘুচাও মনের আঁধার, বাতাস রূপে দাও উড়িয়ে প্রভু বিপদ....সবার। জেগে উঠে সু-নজরে দূর কর সব দুর্গতি তোমার হাসির ছোঁয়ায় প্রভু থেকে সবাকার সুমতি, জাগো ভৈরব সর্বপাপ তাপ হরণকারী—মেয়েরা নামিতে এসেছে তোমায় জাগো বাবা ত্বরা করি।।"....
ইত্যাদি ইত্যাদি। গান শুধু নয়, শিব গাজনের ভক্ত্যার দল মাঝে মধ্যে যেমন "নাথমনি মহাদেব" বলে সমস্বরে

চিৎকার করে উঠে তেমনি "ধরম ডাকের" মত গানের মাঝে মেয়েরাও সমস্বরে উঠত চিৎকার করে। গাইতে গাইতে থেকে থেকে তাদের সমবেত কণ্ঠের উতর-চাপানের মত পারস্পরিক হর্ষ-ধ্বনি শুনতে লাগত বেশ চমৎকার। যেমন —"জাগে জাগে, কে জাগে?"

"ডাঙ্গাল্যা বাবা ভৈরবনাথ জাগে।"

"জাগায় জাগায়, কে, জাগায়?"

পাথর মুড়ি গ্রামের মেয়েরা বলত,—"পাথর মুড়ির মেয়েরা জাগায়।" কুমার খুলির মেয়েরা হাঁক তো, —"কুমার খুলির মেয়েরা জাগায়।" ওমনি গদার ডিহি মেয়েরা বলে উঠত,—গদার ডিহির মেয়েরা জাগায়।"

এ জাগানো ডাকের ঢঙ্ যেমন ছিল অদ্ভুত, স্বরটাও তেমনি ছিল উদ্ভট। চিৎকারে তাদের ভৈরব থানের গাছ-গাছালির পাখ-পাখালিগুলো ডানা ঝাপ্‌টে ধড়-ফড়িয়ে উঠে চট জলদি তারস্বরে সব কিচির মিচির রবে শুরু করে দিত প্রভাতী। পাখী মানুষের চিল চিৎকারের চোটে মনে হয় ডাঙ্গার ভূতগুলো সব লেজ তুলে ও গাছের প্রেতগুলো সব পাখা মেলে সে চৌহদ্দি ছেড়ে পালাতে পথ পেত না।

সেদিন কিন্তু গাইতে গাইতে ভৈরবথানে আসতেই মেয়েদের মুখের ছড়া হঠাৎ গেল বন্ধ হয়ে। চমকে উঠে থমকে দাঁড়াল তারা। দেখল একটা লোক। পড়ে আছে ডাঙ্গাল্যা বাবার থানে। জাগন্ত নয় ঘুমন্ত লোকটা। আছে শুয়ে বাবার বেদীটার ঠিক নীচেই। চিৎ হয়ে—লম্বালম্বি। মাতাল নয়। তাহলে মদের গন্ধ উঠত। পাগল নয়। তাহলে তাড়া খেয়ে বেঁহুশ হয়ে পড়ে থাকার লক্ষণ থাকত তার দেহে। তবে? হয় পথহারা কোন পথিক অথবা দূর গ্রামের রাতকানা কোন লোক। পথ ভুল করে কিম্বা আসতে আসতে অন্ধকারে হঠাৎ এখানে এসে আটকে পড়েছে। আঁধার রাতে কোন ঠিক ঠাওর করতে না পেরে এলিয়ে দিয়েছে শরীরটা। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন খেয়াল নেই। কিন্তু সে খেয়াল না থাকলেও এটা যে বাবা কাল-ভৈরবের থান এ খেয়াল তো তার থাকা উচিত। ভদ্রলোকের মত চেহারা লোকটার। সাজ-পোশাকও বেশ সভ্য-ভব্য। কিন্তু এ জ্ঞান নেই লোকটার যে এখানের এই ডাঙ্গাল্যা বাবার থানে রাত্রেবেলায় থাকতে নেই। নিষেধ আছে বাবার। আর থাকা তো দূরের কথা, সন্ধ্যার পর এধারে পা মাড়ানোও মানা। এ নিয়ম না মানলে কেও বাবার নাকি কোপে পড়ে সে। হয় নানা অঘটন। পড়ে নানা দৈব-দুর্বিপাকে। বাবার থানে রাতে এসে সেই দৈব-রোষেই কি পড়েছে লোকটা? অজ্ঞান হয়ে আছে কি সেইজন্যই?

ঘিরে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে নানা চিন্তা করছিল সেই মাডুলি দিতে আসা মেয়েরা। হঠাৎ তাদের মধ্য থেকে যেন জটলার জাল কেটে ছিট্‌কে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে। মেয়েটা পাথরমুড়ির। ত্রয়ো স্ত্রী। ঝাঁপিয়ে পড়ল সে সেই ঘুমন্ত বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা লোকটার পাশে। তারপর আকুলি বিকুলি করে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল লোকটা জীবন্ত না মৃত। তারপর ঝুঁকে মেয়েটা তার উপর অতি পরিচিত স্বরে নাড়া দিয়ে তাকে বলতে লাগল বার বার,"—ভূতুদা', ও ভূতুদা, পড়ে আছ কেন তুমি? কেন তুমি এখানে? কি হয়েছে তোমার? বল না? উঠনা তুমি ভূতুদা।

না উঠতেই ভূতুদা তার স্বরটা মেয়েটার ক্রমশঃ কেমন যেন হয়ে উঠতে লাগল কান্না জড়ানো। বুড়ী, আধবুড়ী দু-একটা বয়স্কা পাকা মাথা অভিজ্ঞ মেয়ে ঝুঁকে এসে তার কাছে শান্ত্বনার সুরে বলতে লাগল তাকে, —বাবার থানে মাডুলি দিয়ে তাঁর পা ধোওয়া জল মাথায় দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে বাছা। উতলা না হয়ে বাবাকে ডাক তার কৃপায় টল খায় না কেও এখান। ভূতুদাও তোমার খাবে না।

সে তো হল কিন্তু ব্যাপারটা কি? সব মেয়েদের মুখে-চোখে কৌতূহলের ছায়া। ব্যাপারটা জানা গেল সেই মেয়েটার মুখ দিয়ে। মেয়েটা হল নাকি পাথরমুড়ির প্রথম বাড়ুজ্জের স্ত্রী। নাম হল তার উজ্জ্বলা। বাপের বাড়ী তার এই বাঁকুড়া জেলারই সুদূর উত্তরের এক গ্রামে নাম ভূতগ্রাম। সেই ভূতগ্রামেরই বলরাম বাড়ুজ্জের নাকি একমাত্র সন্তান হল এই লোকটা। নাম এর ভূতনাথ। ভূতনাথ তাদের বাপের বাড়ীর সম্বন্ধেই আপনজন শুধু নয় তার সই শাশ্বতীর সে স্বামী। বিয়ের পর তার স্ত্রী অর্থাৎ তার সই শাশ্বতী মারা যেতেই নাকি এমনি পাগল পারা হয়ে গেছে লোকটা। তার স্ত্রী-হারা শোক ও আধপাগলা হওয়া অবস্থাটা দূর করার জন্য নাকি পুনরায় তাকে বিয়ে দেওয়া হয় তারই সেই বান্ধবী শাশ্বতীর ছোট বোন মায়ার সঙ্গে। কিন্তু তবু তার এই উদাস ঘাউণ্ডুলে

হতাশ হওয়া ভাবটা নাকি কাটে নি। দিন কতক আগেই নাকি খবর এসেছিল তাদের গ্রাম থেকে তার এই ভূতুদা নাকি রাগ করে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। পালিয়ে গেছে কোথায় কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেই ভূতুদা' যে তার এখানে এ অবস্থায় পড়ে থাকবে এযে কল্পনারও বাইরে ছিল তার। পাবে দেখা তার এভাবে বাবা ভৈরবনাথের থানে নিঃসঙ্গ, অনাথ, অসহায়, অবস্থায় ভাবতে পারেনি উজ্জ্বলা। তাই নাকি হকচকিয়ে গেছল প্রথমটায় দেখে তাকে। কিন্তু কি হবে এখন? অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ল উজ্জ্বলা।

আহা বেচারা! লোকটার প্রতিদরদে, মায়ায় ও সহানুভূতিতে যেন উদ্বেল হয়ে উঠল বুড়ী-বয়স্কা মা-মাসি ও গাঁয়ের মেয়ে ঝি-এর দল। বিশেষ করে স্ত্রী-হারা লোকটার শোকাহত অবস্থার কথা শুনে অবিভূত হয়ে গেল তারা। একটা কু-রূপা অসহায় মেয়েকে সম্পূর্ণ বিরূপ অবস্থায় বিয়ে করে যে উদ্ধার করে জীবন থেকে, রক্ষা করে সৎমায়ের হাত থেকে, সে দেব-স্বভাব, পরোপকারী মহামানব নয় তো কি? শুধু তাই নয়, এ যুগে যে স্বামী-স্ত্রীর শোক বুকে নিয়ে এভাবে সতী হারা শিবের মত পাগল-পারা অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় সে তো এ যুগের সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র, মনুষ্যরূপী দেবতা। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে একযোগে সব ঝুঁকে পড়ল ভূতনাথের উপর। কেও করতে লাগল তাকে বাতাস, কেও দিতে লাগল তাকে জলের ছিঁটা। বুড়ীরা সব ভক্তিভরে ডাঙ্গাল্যা বাবার মাটি, পূজোর ফুল দিতে লাগল তার মাথায়—মায়ের মত।

জ্ঞান ফিরল, না ঘুম ভাঙ্গল ভূতনাথের কে জানে। চোখ খুলতেই সে তো অবাক! কোথায় সেই অদৃশ্য লোকের সূক্ষ্ম সত্তারা আর কোথায় এই দৃশ্যলোকের বাস্তব দেহগুলো। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে যে মা-মাসিদের দল, বোন দিদিদের ঝাঁক—কারা এরা? দিচ্ছে তাকে জলের ঝাপটা করছে তাকে আঁচলার বাতাস—কেন? আপন জনের মত করছে তাকে তারা সেবাযত্ন অথচ আপনজন বলে তো মনে হচ্ছে না তাদের? হচ্ছে না তো স্মরণ তার এর আগে তাদের অন্য কোথাও দেখেছিল কি না। চক্ষু তো চড়ক গাছ ভূতনাথের। ফ্যাল ফ্যালিয়ে তাকাতে লাগল সে এর-ওর মুখের দিকে। ভ্যাবলা কান্ত হাবা গঙ্গারামের মত। কোথায় সে? কারা এরা? একি তার স্বপ্ন, না কোন এক নূতন গ্রহে এসে পড়েছে সে! নিজের গায়ে নিজে চিমটি কেটে নাক-মুখ-চোখ সব নিজের হাতে স্পর্শ করে পরীক্ষা করতে লাগল সে নিজেকে। না—সে ঘুমন্ত নয়, জাগন্ত। তাকে ঘিরে থাকা কায়াগুলোর নয় ছায়া ছায়া, ভাসা ভাসা অবয়ব। সুতরাং সূক্ষ্মস্তরের বাসিন্দা নয় তারা। জাগতিক দেহে মাটির কোলেই রয়েছে যখন এরা তখন এরা মানুষ। সেও রয়েছে ভূলোকের স্থূল বক্ষে। দেখছে যা, পড়ছে যা চোখে তার, যেমন—আলো, আকাশ, গাছ-পালা সবই মাটির পৃথিবীর। ভৈরব থান, থানের গাছ-গাছালি ও তার উঁচু মাটির বেদীর উপর পোড়ো মাটির হাতি ঘোড়া ইত্যাদি বাস্তব চোখে দেখেছিল যেমন আগে তেমনিই সব নজরে পড়ছে তার। ব্যাপার কি?

হঠাৎ পাশ থেকে ভূতনাথের কানে এল পরিচিত এক মেয়েলী কণ্ঠস্বর,—ভূতুদা, চারধার তুমি দেখছো কি এমন করে? তাকাচ্ছো কেন বোকার মত?

চিনতে পারছো না আমাকে? আমি উজ্জ্বলা, তোমাদের গাঁয়ের উজ্‌লী গো, তোমার সতীর সই,—গঙ্গাজল।

অবশেষে চিনল ভূতনাথ উজ্জ্বলাকে। চিনতেই যেন সম্বিত ফিরে এল তার। চোখ রগড়ে কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলে বলে উঠল সে তাকে, —তুই এখানে? কি ব্যাপার?

"—বা রে!"' অবাক হয়ে বলে উঠল উজ্জ্বলা, "—এখানেই তো আমার শ্বশুর বাড়ী, পাশের গ্রাম পাথর মুড়িতে বিয়ে হয়েছে আমার—জান না তুমি? ভোরে ডাঙ্গাল্যা বাবার থানে ছড়া—মাদুলি দিতে এসেছি। কিন্তু তুমি এখানে কেন ভূতুদা? পথ ভুল করে এসে পড়েছো? পড়েছিলে যখন এসে তখন এই তো পাশেই ছিল পাথর মুড়ি গ্রাম, আমার শ্বশুর বাড়ী, সেখানে গেলে না কেন?

কি যে বলবে ভূতনাথ বোধ হয় খুঁজে পেল না। তাই উদাসভাবে বেবাক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল সে। গোমড়া মুখে, অভিমানী স্বরে বলে উঠল উজ্জ্বলা,—এখানে নিঃস্ব-রিক্ত দীন হীন ভিখারীর মত পড়ে থাকাতে তুমি লজ্জায় আমার মাথাটা কাটা যাচ্ছে। আর নয় ভূতুদা'। উঠ, চল আমার সঙ্গে বাড়ী। এক দণ্ডও আর থাকা চলবে না তোমার এখানে।

বলেই উজ্জ্বলা হাত দুটো ধরে তার টানতে লাগল উঠাবার জন্য। উজ্জ্বলার সঙ্গে সায় দিয়ে বলে উঠল বুড়ী-বয়স্কা পাকা-মাথা মা মাসির দল—"যাও বাবা ওর সঙ্গে বাড়ী। রাত্রে এখানে কেও থাকে না বাবা। থাকতে নেই। ডাঙ্গাল্যা বাবার নিষেধ আছে। তবু এখানে তোমার রাত কাটানোর অপরাধের জন্য বাবার কাছে আমরাই তোমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেব। অজ্ঞানের অপরাধ নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন বাবা। দিবেন তিনি তোমার মনে শান্তি। ভুলাবেন শোক। উচিত নয় বাবা এখানে থাকা।

"—কিন্তু এখানে তো আমি ছিলাম না মা।" স্বপ্নাবিষ্টের মত বলতেই ভূতনাথ ওমনি ঝাঁকরে তাকে বলে উঠল উজ্জ্বলা, —তবে তুমি কোথায় ছিলে?

"—সেটাই তো বুঝতে পারছি না আমি। ছিলাম কোথায়। এলামই বা কি করে এখানে।" কেমন যেন একরূপ ঘোরের সঙ্গে বলতে লাগল ভূতনাথ,—এমন কি ছিলাম যেখানে সেখানটা রাত না দিন তাও আমার হচ্ছে না খেয়াল। সেপাই-দারোয়ানগুলোর বিপদ দেখে হঠাৎ সতীর কাছছাড়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেই—

"—ও মুখপুড়ির নাম তুমি আর মুখে এনো না ভূতুদা।" চাপা ধমকে থামিয়ে দিয়ে ভূতনাথকে বলে উঠল উজ্জ্বলা,—"উচ্চারণ করো না আর ওই সতী শব্দটা পর্য্যন্ত। মুখপুড়ি সৎমায়ের লাথি ঝাঁটা, গালমন্দ খেয়ে মরছিল তুমি তাকে বাঁচালে। উদ্ধার করলে ভেসে যাওয়া জীবনটাকে তার তোমার জীবনের সঙ্গে বেঁধে। বাপ মায়ের মানা, পাড়া-প্রতিবেশীর নিষেধ, গ্রাম-সমাজের ঝুট ঝামেলা এমন কি নিজের ভাল-মন্দ রুচিকে পর্য্যন্ত তোয়াক্কা না করে করলে তুমি তাকে বিয়ে। বিয়ে করে প্রকৃত আদর্শবান হৃদয়বান স্বামী স্ত্রীকে যেমন তার যথাযোগ্য সম্মানের আসনে বসায় তেমনি জীবনের মাঝে নিজ সংসারে নিয়ে গিয়ে তুমি তাকে বসালে, স্থান দিলে। কিন্তু সুখে খেতে ভূতে কিলোলে মুখ পুড়িকে। নানারকম তুফান, ঝড়ঝাপটা সহ্য করে এসে শেষে ঘাটে বাঁধা জীবন তরীটাকে তার স্ব-ইচ্ছায় উল্টাল সব্বনাশী। হারামজাদী কাকেও কিছু না বলে, এমন কি তোমার মত, দেবতার মত স্বামীকেও কোন কিছু না জানিয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গেল মুখপুড়ি। ছি ছি—ছিঃ।

বলতেই উজ্জলা ওমনি বাধা দিয়ে তাকে ব্যাকুলস্বরে বলে উঠল ভূতনাথ,—না উজ্জ্বলা না। সতীর সম্বন্ধে এমন খারাপ কথা বলিস না তুই। ধারনা তোর ভুল। ওসব মিথ্যে কথা। সতী আমার আত্মহত্যা করেনি রে, করতে সে পারে না কখনও। তোদের কাছে মরে গেলেও সে আমার কাছে বেঁচে আছে, থাকবেও চিরকাল। আমাকে ছেড়ে থাকতে সে পারে কি কখনও? আর আমিও কি পারি কখনও তাকে ছাড়া থাকতে? শিব-দুর্গা পরস্পর ছাড়াছাড়ি হয় না বলেই তো সতী সমস্ত রাত ছিল আমার কাছে। বলল কত কথা, দেখাল সে কত কি। সর্বনাশী সে নয় উজ্জ্বলা। আমিই বরং নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি। কথা না শুনে তার ছেড়ে, এসেছি তাকে।

"—সতীর কথা তুমি ভুলে যাও ভূতুদা। ব'ল উঠল উজ্জ্বলা —সতীর চেয়েও যে মায়া তোমাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসত সে মায়াকে যখন ভগবান তোমার স্ত্রীরূপে জীবন সাথী করে দিয়েছেন তখন তাকে নিয়েই সুখে থাক তুমি। ঘর বাঁধ। সংসার কর। এভাবে আর অযথা রাগ করে পাগলের মত এধার-ওধার ঘুরে বেড়িও না তুমি।

—আমি পাগল নই উজ্জ্বলা। আর রাগও করিনি আমি কারোর উপর।

"—আমি সব শুনেছি ভূতুদা।" বলে উঠল উজ্জ্বলা—ভূতগ্রাম থেকে লোক এসেছিল আমার শ্বশুর ঘরে, আমার কাছে। তোমার সন্ধান নিতে। মায়ার উ..র রাগ করে নাকি তুমি চাকরির সন্ধানে ঘরছাড়া হয়েছ?

হাসল ভূতনাথ। আশ্চর্য্য। এর মধ্যেই তার কথা এধার-ওধার চারধার চাউর হয়ে গেল। বেবাক বিস্ময়ে উজ্জ্বলার দিকে তাকাতেই ওমনি মাঝবয়েসি একটা মেয়ে দরদী হৃদয়ে এসে দাঁড়াল ভূতনাথের ঠিক চোখের সামনে। মায়ের টানে স্নেহ-ভরা স্বরে বলে উঠল সে, ভূতনাথকে, —এমন সৌম্য শান্ত চেহারা বাবা তোমার, রাগী বলে তো তোমাকে মনে হয় না বাবা। ভূতনাথ হল বাবা মহাদেবের নাম। ভোলানাথ, আশুতোষের নামে নামী যে তার তো কখনও রাগ থাকতে পারে না বাবা। ছিঃ বাবা, রাগ করতে নেই। স্ত্রীর উপর অভিমান করে এই যে ঘরছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো তুমি—এতে সেই মেয়েটার মনে কত কষ্ট হচ্ছে বলো তো? মেয়েটার মনে আর দুঃখ দিওনা বাবা তুমি। বাড়ী ফিরে যাও।

ভূতনাথ তার কথা শুনবে কি—মেয়েটার মুখটার দিকে তাকিয়েই সে হয়ে গেল হতভম্ব। ড্যাবে ড্যাবে চোখে এক দৃষ্টিতে সে দেখতে লাগল সেই মেয়েটাকে, বেবাক বিস্ময়ে। চাওনি দেখে তো তার অবাক সবাই। থ হয়ে গেল সেই মেয়েটাও। উজ্জ্বলা পড়ল মনে হয় মহা লজ্জায়। অবস্থাটাকে সামাল দেবার জন্য বলে উঠল আবার সেই মেয়েটাই, কি হল বাবা? এভাবে তাকিয়ে আছ কেন আমার দিকে? কিছু বলবে? বল না—

বলল ভূতনাথ। স্বরে তার এক অদ্ভুত কৌতূহল, "—আচ্ছা মা, আপনার নাম কি কমলা? গোবর ডাঙ্গায় আপনার বাড়ী?

—হ্যাঁ বাবা।

—আপনার স্বামীর নাম কি গোরাচাঁদ বাবু?

আশ্চর্য্য। মেয়েটাতো যার পর নাই হল বিস্মিত। তার সম্বন্ধে এমন নিখুঁত কথা লোকটা জানল কি করে। জিজ্ঞেস করে উঠল সে,—"তুমি কি বাবা চেন আমাকে? জান আমার স্বামীকে? ভালভাবে চেনা-জানা না থাকলে তো বাবা এমন নিখুঁত ভাবে কারো সম্বন্ধে কোন কিছু বলা সম্ভব নয়। আগে তো তোমাকে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। কে তুমি বাবা? পরিচয় দিলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারব। এমনভাবে জান আমাকে অথচ আমি তোমাকে চিনতে পারছি না। বড় লজ্জায় ফেললে বাবা তুমি আমাকে। বল না বাবা তুমি কে?

ভূতনাথ কিন্তু তার এসব কথার কোন উত্তর দিল না। এমন কি তার চেনা-জানা বা পূর্ব-পরিচয়ের কোনরূপ সে ধারে পাশে পর্য্যন্ত গেল না। কেমন যেন একরূপ স্বপ্নালু দৃষ্টিতে ভূতনাথ তাকিয়ে রইল মেয়েটার মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ একসময় উঠল সে বলে, —"আপনার মনের আশা অর্থাৎ মনস্কামনা আপনার পূর্ণ হবে মা।

দুম করে হঠাৎ এভাবে কথা বলতেই কমলা দেবীর মনে জাগল ওমনি সন্দেহ। লোকটা সত্যিই তাহলে কি আধ পাগলা? নইলে কোন কিছু-না জিজ্ঞেস করেই তার সম্বন্ধে এমন কথা হট্ করে বলে উঠবে কেন? কেমন যেন একটু কৌতূহল হল কমলার। মজা করবার জন্যই একরূপ হাসি-মাখা মুখে সে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথকে—কি আমার মনের আশা জান তুমি? পারবে বলতে মনস্কামনা কি আমার? কই, বলতো দেখি?

ভূতনাথ কমলাদেবীর এ কথাটাকেও এড়িয়ে গিয়ে বলে উঠল তেমনি ভাব-গম্ভীর স্বরে,—আপনার কোলে এক সন্তান আসছে মা। শীঘ্রমধ্যে এক কন্যা-সন্তানের জননী হবেন আপনি। গতরাতে স্বপ্নেই তো মা দেখেছেন আপনি তাকে। আপনাদের বাড়ীর পিছনে খিড়কি পাশের ডোবাটার পাড়ের বড় আম গাছটা থেকে নেমে এল একটা চাঁদের মত সুন্দর মেয়ে। হাসি মুখে "মা-মা" বলে দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে আপনার কোলে। মায়ের স্নেহ ভরা হৃদয় নিয়ে পরম আবেগে জড়িয়ে ধরলেন তাকে আপনি আপনার বুকে। এ স্বপ্ন আপনার বৃথা যাবে না মা। ওই ফুলের মত সুন্দর মেয়েটাই আসছে আপনার কোল আলো করতে। সংসার আপনাদের হাসি-আনন্দে ভরিয়ে দিতে। তাই তো বলছি মা আপনার মনস্কামনা পূর্ণের কথা।

আশ্চর্য্য হয়ে গেলেম কমলা দেবী। হলেন যার পর নাই বিস্মিত। বিস্মিত হবারই কথা। কারণ অপর কাকেও বললে স্বপ্নের কথা নাকিফলে না। তাই অন্যজন তো দূরের কথা নিজের স্বামীকে পর্য্যন্ত বলে নি সে। ভাঙ্গতেই ঘুম, অবশিষ্ট রাত জেগে কাটিয়ে ভোর হতেই সে সেই স্বপ্নের স্মৃতি মনে নিয়ে ধূলি-মুঠি কাপড়ের আশায় ছড়া-মাডুলি দিতে সোজা চলে এসেছে বাবার থানে। সুতরাং তার এ স্বপ্নের কথা, মনের কথা তো সে ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অথচ এই অজানা অপরিচিত লোকটা সে কথা তার জানল কি করে? তবে কি লোকটা সাধারণ মানুষ নয়? নয় কি সে ভূতনাথ নামে কারো পরিচিত জন? এ কি তবে তার মনের দেবতা, অন্তর্য্যামী বাবা কাল-ভৈরব। এসেছে তার সামনে মানুষের রূপ ধরে, তাকে পরীক্ষা করতে? হায় ভগবান। কি ভুলটাই না করেছে সে। দেবতাকে তার পাগল বলে তাচ্ছিল্য করেছে। মজা করবার জন্য মসকরা করতে গেছে তার সঙ্গে। আবেগে কমলা জড়িয়ে ধরল ভূতনাথের পা দুটো, —আমায় ক্ষমা কর বাবা। চিনতে পারিনি আমি আপনাকে। তাই ওমনি নানা কথা বলে করেছি আপনাকে বিব্রত। পরীক্ষা করতে গেছি আপনাকে সন্দেহ করে। অজ্ঞান অবোধ মেয়ে আমি আপনার। নিজগুণে কৃপা করে আমার সমস্ত ভুল-ত্রুটি, দোষ-অপরাধ ক্ষমা করে দাও বাবা। করুণাময় ঈশ্বর তুমি। এ অধীনে দয়া কর বাবা।

মহা মুস্কিলে পড়ল ভূতনাথ। বিশেষ করে তার রাত্রেবেলার কথা বলে বড় ফ্যাসাদে পড়ল সে'—"ছিঃ, মা, পা ছাড়ুন। মা হয়ে ছেলের পায়ে হাত দিলে যে মহাপাপে পড়ব আমি। এ উজ্জ্বলা," বলে উঠল ভূতনাথ, "—দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? হাতদুটো মায়ের পা থেকে আমার ছাড়িয়ে দে-না।"

কিন্তু পা ছাড়াবে কি উজ্জ্বলা, সে শুদ্ধো তাকে ঘিরে থাকা প্রত্যেকটা মেয়েই তখন ব্যাপার-স্যাপার দেখে হতভম্ব, বিস্ময়ে হতবাক। নানভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোন রকমে কমলাকে নিবৃত্ত করল ভূতনাথ। ছাড়াল তার পা জোড়াটা। কিন্তু পরক্ষণেই এসে হাজির হল তার সামনে আর এক মুস্কিল। মানে উটকো আপদ আর কি। হঠাৎ দূর থেকে দেখেই তাকে ছুটে এল সেই কারখানার দারোয়ান রাম সিং, লগ্‌দী লাল বাহাদুর ও সেপাই ভীম চাঁদ। এসেই তারা বিনা ভূমিকায় কোন কথা না বলেই ওমনি দুপ্-দাপ্ করে কাটা গাছের মত পড়ল তার পায়ে, "হাপনি আমাদের মাফ করিয়ে দেন বাবু। মায়-বাপ আপনি, কসুর হামাদের ক্ষমা করিয়ে দেন দ্যাব্‌তা। বহৎ গলতি হো গেছে হামাদের। হাপনি যে খুদ-হি ভৈরব বাবা আছেন তা হামরা পহলে বিলকুল পহ্‌চানতে পারে নাই। থোড়া সা হি সমঝতে পারে নাই বাবুজী। ইস্‌লিয়ে বেওকুবকা মাফিক্ হাপনার উপর কাম করিয়ে ফেলিয়েছে। গুস্তাফি হামাদের মাফ করিয়ে দেন।

তাকিয়ে দেখল ভূতনাথ শুধু ভীম-রাম সিং লাল বাহাদুর নয় পিছনে তাদের এসে দাঁড়িয়েছে খুদ মালিক স্বয়ং অবিনাশ বাবু। বাবু তার দিকে তাকিয়ে আছেন অবাক অপলক, বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে। এধারে সেই ত্রিমূর্ত্তির পা ছাড়াবে, না অবিনাশ বাবুর সঙ্গে কথা বলবে কিছুই ঠিক করতে পারল না ভূতনাথ। বড় মুস্কিলে ফেলল তারা তাকে পায়ে ধরে তার লুটোপুটি করাতে। ভীম চাঁদ ছাড়ে তো রাম সিং ছাড়ে না, আবার রাম সিং ছাড়ে তো লাল বাহাদুর জড়িয়ে ধরে। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড, বিচিকিচ্চি ব্যাপার।

"—আরে ব্যাপারটা কি আগে খুলে বলবে তো? প্রায় বিরক্তি ভরা স্বরেই বলে উঠল ভূতনাথ। কিন্তু বলল তারা যা এক অদ্ভুত ব্যাপার। অবাক কাণ্ড। সে কাণ্ডের কাণ্ডারি হল স্বয়ং ভূতনাথই। প্রথমে নাকি তারা ভূতনাথকে সাধারণ মানুষ ভেবেই কারখানা থেকে বের করে এনেছিল এই ভৈরবথানে। জোর করে তাকে তারা তাদের মতে চালাবার জন্য করেছিল তার উপর যে আচরণ, যে ব্যবহার হুবহু সমস্ত কথা সত্য বলল তারা। বলল তারপর তাকে ছেড়ে এসে মাঝরাতে এই ডাঙ্গার মাঝে তাদের ডাঙ্গাল্যা ভূতের কবলে পড়ার কথা। নাস্তানাবুদ করেছিল তাদের। এক আধটা ভূত নয়, ডাঙ্গাটার চারধার থেকে প্রায় ডজন-চারেক ভূত, মানে পেত্নী পিশাচ ঝেরু-শঙ্খী, খেচর-কালজঙ্ঘ, প্রেত কন্ধকাটা ইত্যাদি মিলে একযোগে সব আগলে ছিল তাদের। ধরতে তাদের করছিল তাড়া। হয়রান করে হয়ত দম আটকানো অবস্থায় ফেলে ঘাড় মটকে মারত তাদের। কিন্তু ভূতনাথবাবুই নাকি হঠাৎ তাদের মাঝে আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে করে তাদের রক্ষা। ত্রিশূল হাতে তার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখে নাকি ভেগে যায় সব ভূতগুলো। আর তাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে তারাও নাকি মেরে দেয় দৌড়—সোজা অবিনাশবাবুর বাড়ী।

"—ওদের কথা আমি বিশ্বাস করিনি ভূতনাথবাবু।" বলে উঠলেন গম্ভীর স্বরে অবিনাশবাবু—"গাঁজায় দম দিলে ওরা এমন অনেক কিছু দেখতে পায়। এর সঙ্গে আবার যদি ওদের সিদ্ধির নেশা যুক্ত হয় বা ভাঙ্ আফিমের কৃপা চড়ে যায় তাহলে আর রক্ষে নেই। দেখার সঙ্গে তখন ওরা ওমনি হরবোলা হয়ে যায়। সুতরাং ওদের কোন কিছু দেখা বা বলা আমার কাছে বড় কথা নয় ভূতনাথবাবু। আসল ব্যাপারটা জানতে চাই আমি আপনার কাছ থেকে। তার জন্যই ওদের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বেয়াদপগুলোকে নিয়ে আপনার সন্ধানে গেছি কারখানায়, খুঁজেছি ডাঙ্গায়। শেষে বদমাশগুলো আপনাকে ভৈরবথানে নিয়ে আসার কথা বলায় টেনে এনেছি এখানে। এখন ব্যাপারটা কি বলুন তো?

কি যে বলবে ভূতনাথ খুঁজে পেল না। কারণ রাত্রে সতীর কাছ থেকে এই ভীম পালোয়ান রাম সিংদের বিপদ দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে ঠিকই কিন্তু তারপর তো তার আর কিছু মনে নেই। পড়ল কোথায়, কি হল তার কোন কিছু আর খেয়াল নেই তার। হুঁশ হতেই দেখছে সে নিজেকে এখানে—ভৈরব তলায়। মাদুলি দিতে আসা মেয়েরা ঘুম ভাঙ্গাচ্ছে তার। চুপ দিয়ে থাকতে দেখে ভূতনাথকে অবিনাশবাবুই আবার চালালেন তার পূর্বকথার জের, —সত্যি কি বেইমানগুলো আপনাকে, ভূতের ভয় দেখিয়ে কারখানা থেকে জোর-জবরদস্তি

করে রাত্রে বেলায় এখানে, এই ভৈরব থানে টেনে এনে ছিল? মারধর করার ভয় দেখিয়ে সত্যি কি ওরা আপনাকে তাদের মতে চলতে বাধ্য করতে চেয়েছিল? মতলবটা কি ছিল ওদের? কেন ওরা আপনাকে ওই মাঝ রাতে, একলা, এই ব্রহ্মডাঙ্গায় ফেলে পালাল? উদ্দেশ্যটা কি? কোন চোর-চণ্ডাল বদমাশ-বাটপাড়দের সঙ্গে ওদের গোপন কিছু সম্বন্ধ ছিল কিনা আমি জানতে চাই ভূতনাথবাবু। যার জন্য ওরা আপনাকে রাত্রে বেলায় সরাতে চেয়েছিল কারখানা থেকে। না পেরে শেষে বেকায়দায় পড়ে ছুটে গেছল আমার কাছে। দোষ ঢাকতে নিজেদের ভুলাতে আমাকে ঝাড়ছিল এসব গুল। আসল ব্যাপারটা আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই ভূতনাথবাবু।

ভূতনাথবাবু ব্যাপার বলবে কি, তার রাতের দেখার স্মৃতির সঙ্গে বাস্তবের এই পরিবেশটা তখন সমস্ত কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছিল। কিছুতেই সে তার সেই অদৃশ্যলোকের অবস্থার সঙ্গে দৃশ্যলোকের এই বর্তমান অবস্থাটার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারছিল না। ক্রোধদীপ্ত চোখে বেশ গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন অবিনাশ বাবু—ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন ভূতনাথবাবু। কিছু না বললেও আপনি আমি বুঝতে পারছি সব। বদমাশগুলো একটা কিছু আপনার অঘটন ঘটিয়ে বসলে আমি আর মুখ দেখাতে পারতাম না। নিশ্চয়ই এদের সঙ্গে কোন দুষ্টচক্রের যোগ বা সম্বন্ধ আছে। তাই তো ভাবি—দিনের পর দিন কারখানাটার আমার এমন অবস্থা হচ্ছে কেন। এধারের জিনিস ওধারে, মালপত্র তছনছ, ভাঙছে উঠতি দেওয়াল, ফাটল ধরছে ভিতে—ভূতপ্রেতের নামে মিথ্যা রটিয়ে করছে এসব এরাই। এরাই যে রক্ষক হয়ে ভক্ষক হয়েছে আমার—গত রাত্রে আপনার কাবখানায় থাকাটা তো চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে আমাকে। নিমকহারামগুলোকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করলেই শুধু উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে না। উদের আমি পুলিশে দেব ভূতনাথবাবু।

শুনেই ওমনি হাতজোড় করে মিনতি করে উঠল ভীমচাঁদ—থানা পুলিশমে হামাদের ভেজবেন না বাবু। হামরা নিমকহারাম নাই আছে। চোর-বদমাশদের সঙ্গে ভি হামাদের কুছু সম্বন্ধ নাই আছে। রামজীকা কসম, হামরা যো বোলিয়েছে সোব সাচ বোলিয়েছে বাবু।

—সাচ মুছ বাত বাতালে হাপনি হামাদের গুস্তাফি সোব মাফ কোরিয়ে দেবেন বোলিয়েছিলেন। হামরা বেইমান নাই আছে বাবু। এই দ্যাবতা বাবুকে সব কুছ পুছিয়ে হাপনি-জানিয়ে লেন। হামরা চোর-চণ্ডালকে ফ্যায়দা দেবার জন্য হাপনার কারখানা ছাড়িয়ে আসে নাই বাবু, লেকিন ভূত প্রেতকা ডরমে হামরা বাবুজীকে লইয়ে চলিয়ে আসিয়েছিলাম।" বলে উঠল রামসিং। অনুরোধে যেন ফেটে পড়ল লাল বাহাদুর,—কাম কাজ চলিয়ে গেলে হামরা আর বাঁচবে না বাবু। হামাদের বাল-বাচ্চা ভি সোব না খাইয়ে মরিয়ে যাইবে। স্রেফ এক দফে হামাদের গুস্তাফি মাফ করিয়ে দেন বাবু। ভৈরবজীকা কসম, হামরা ইস মাফিক গলতিকা কাম আর দোষরা বার, কভি-ভি কোরবে না বাবু।

—এদের মাফ করে দেন অবিনাশবাবু। গম্ভীর ভাবে বলে উঠল ভূতনাথ।

"—সে কি কথা।" কতকটা অবাক হওয়া স্বরেই বলে উঠলেন অবিনাশবাবু, —জানেন, আজ শুধু নয়, দিনের পর দিন ওরা কেমন কাজে-ফাঁকি দিয়ে গেছে? প্রায় রাত্রে কারখানায় পাহারা দেবার নাম করে গোপনে ওরা লুকিয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছে আশপাশ গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, মনসা মেলায়, দুর্গা-মন্দিরে, মহাদেব থানে। ধরা পড়েছে বলে আজ নিজের মুখেই স্বীকার করেছে ওরা ওসব। এদের আর রাখা উচিত নয় ভূতনাথবাবু।

"—কিন্তু ও দোষে তো দোষী আমিও অবিনাশবাবু।" বলে উঠল ভূতনাথ—আমিও তো রাত্রে থাকব বলে কারখানা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম এখানে। ছিল না কি উচিত আমার সব কিছুকে তোয়াক্কা না করে জীবন-মরণ পণ করেও কারখানায় আমার আটকে থাকা। এ অপরাধ যদি আমার ক্ষমা করতে পারেন তবে ওদেরও এবারের মত আপনাকে ক্ষমা করতে হবেই অবিনাশবাবু। প্রতিজ্ঞা করছি আমি —ভূতপ্রেত বা মানুষ যাই হোক না কেন, যতদিন না আপনার কারখানায় ওসব দৌরাত্ম্য না বন্ধ করতে পারছি ততদিন আর কোন রাতেই কারখানা ছেড়ে যাব না আমি। লাল বাহাদুর, রাম-ভীমচাঁদকে নিয়ে আমাকে এ রহস্য উদঘাটনের একটু সুযোগ দেন অবিনাশবাবু।

অবাক হলেন অবিনাশবাবু। যে সেপাই দারোয়ানগুলো তার উপর এত কাণ্ড করল তাদের সঙ্গে আবার

কারখানায় থাকার কথা। একি বলছেন ভূতনাথবাবু। কিন্তু ভূতনাথের সেই একই গোঁ কোন মতেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা চলবে না তাদের। চলবে না করা থানা-পুলিশও। কারণ সত্যি কথাই অবিনাশবাবুকে বলেছে তারা। রাখেনি কোন গোপন, বলেনি নিজেদের দোষ ঢাকাতে কোন মিথ্যা বা অবান্তর কথা। সুতরাং সত্যের মর্য্যাদা রাখতে যার যা চাকরি তাকে তার সে কাজে রাখতেই হবে বহাল, এ নাকি ভূতনাথবাবুর বিশেষ অনুরোধ। কথার খেলাপ করে এ বিশেষ অনুরোধ ভূতনাথ বাবুর না রেখে আর পারলেন না অবিনাশবাবু। পূর্ববৎ যার যা কাজে নিযুক্ত রইল রাম সিং, ভীমচাঁদ, ও লাল বাহাদুর। কৃতজ্ঞ রইল তারা ভূতনাথবাবুর উপর। কিন্তু তা —তো হল, আসল রহস্যটা কি? জিজ্ঞেস করতেই অবিনাশবাবু, বলে উঠল ভূতনাথ—"সব কথা সব জায়গায় বলা ঠিক নয় অবিনাশবাবু। কারখানায় চলুন। সেখানে গিয়েই বলব আপনাকে আমার সমস্ত কথা।

"—আর তোমায় আমি কারখানায় যেতে দেব না ভূতুদা।" পাশ থেকে হঠাৎ বলে উঠল উজ্জ্বলা,—যা কাণ্ড শুনলাম তাতে ওই সিদ্ধি-গাঁজা-আফিম্ খোর, ওই পশ্চিমা পালোয়ানগুলো নেশার ঘোরে আবার যে তোমাকে বিপদে ফেলবে না তার কি ঠিক আছে?

"—ঠিক বলেছ মা।" উজ্জ্বলার সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠল সেই কমলা দেবী, —তার চেয়ে বরং আমার বাড়ী চল বাবা। এত কাণ্ড শোনার পর আর তোমাকে আমরা কিছুতেই কারখানায় যেতে দিতে পারি না। ওসব বেয়াড়া মানুষের মন বিচলিত হতে কতক্ষণ।

শুধু তারাই নয় আপত্তি করে উঠল তাদের সঙ্গের আরো মা-মাসিরা। সকলের সেই একই বক্তব্য—তারা তাকে নিয়ে যেয়ে তাদের বাড়ীতে—ঘরে পাঠিয়ে দেবার করে দেবে ব্যবস্থা। এটা নাকি তাদের কর্ত্তব্য।

কিন্তু সবার সব আপত্তি বুঝিয়ে তাদের নস্যাৎ করে দিল ভূতনাথ। কারণ রাত্রেবেলায় কারখানা ছেড়ে এসেছে সে। সে কারখানার ফাঁকায় পড়ে থাকা নানা মাল-পত্র টুকি-টাকি জিনিস দেখা শোনার দায়িত্বে ছিল সে-ই। সুতরাং তাকেই ফিরে যেয়ে দেখা উচিত বা বাবুকে দেখানো কর্ত্তব্য সব কিছু ঠিক ঠিক-ঠাক যথাস্থানে আছে কি না। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে অন্যায় হবে তার। হবে অপরাধ। একে তো রাত্রে সে-সব ছেড়ে এসে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে সে এখন ফিরে না গিয়ে সেখানে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার বোঝা আর বাড়াতে সে পারবে না।

ভূতুদার চরিত্র বেশ ভালভাবেই জানে উজ্জ্বলা। বলে যা করেও তা। দিলে তার ইচ্ছায় বাধা হয়তো হিতে বিপরীত হতে পারে। হয়তো কোনদিন আর সে না যেতেও পারে তার বাড়ী। তাই আপত্তি আর করল না উজ্জ্বলা, করতেও দিল না তার সঙ্গী-সাথী কোন মেয়েকেও। অবশ্য অবিনাশবাবু নিশ্চিন্ত করলেন তাদের। দিলেন কথা তাদের বাবা কালভৈরবনাথকে সাক্ষী রেখে যে অজ্ঞাতে তার যা হবার তা হয়ে গেছে। এসবের পুনরাবৃত্তি হওয়া তো দূরের কথা, ভুলেও কোনদিন কুশের কাঁটাটি পর্য্যন্ত ফুটতে দেবে না সে ভূতনাথবাবুর পায়ে। শুধু কাজ দিয়ে তাকে একজন সাধারণ কর্মীর মতই রাখবে না সে। রাখবে তাকে সে তার সহোদর ভাই-এর মতই। কারখানার মালিকের আসনে এবং সম্মানের সঙ্গে।

সুতরাং কারখানাতেই ফিরে গেল ভূতনাথ। মালিকের সঙ্গে এবং সেই লগ্দী বাহাদুর ও ভীম-রাম সিংকে সঙ্গে নিয়ে। ওধারে মেয়েরাও ভৈরব বাবার ছড়া-মাদুলি সেরে তেমনি দল বেঁধেই আবার যে যার ফিরে গেল বাড়ী। কিন্তু কথায় বলে না,—মেয়ে মানুষের দল—

> তারা তিলকে করে তাল।
> কথায় কথা বাড়িয়ে তারা
> সূচকে করে ফাল।।"

অর্থাৎ ডাঙ্গাল্যা বাবার থানে ভূতনাথের তাই অদ্ভুত আবির্ভাবটা এমনভাবে চাউর করে দিল তারা চারিদিকে যেন সে মানুষই নয়—পাতাল ফোঁড় শিব। বাবা কাল-ভৈরব নাকি কাল-রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছেন হঠাৎ মানুষরূপে এবং ভূতনাথ নামে। তা না হলে কি সে পারত কখনও ভয়াল ভয়ঙ্কর রাত্রে একলা ওই মহা-স্থানে পড়ে থাকতে? মানুষ হলে বাবার কোপে পড়ে কোন গাঁয়ের যে কোন আস্তাকুঁড়ে ছিটকে পড়ত সে—

তার কি কোন ঠিক থাকত? স্বয়ং বাবা না হলেও বাবার অংশ অবশ্য সে নির্ঘাত। এ বিষয়ে নাকি কোন সন্দেহই নেই। ফালতু হলে সে গোবরডাঙ্গার কমলাদেবীর স্বপ্নের কথা পারত কি জানতে? পারত কি সে তার মনের কথা ওরকম নিঁখুতভাবে বলতে? অসম্ভব। তাছাড়া কারখানার ওই মোটা গোঁফ, ভীম পালোয়ান, পুরু গালপাট্টা রাম সিং আর ঘাড় মোটা লাল-বাহাদুর পড়েছিল যারা বাবার থানের পাশেই সেই রাত্রেই ব্রহ্ম-ডাঙ্গার মাঝেভূতের কবলে। ডাঙ্গাল্যা প্রেত, ভূতনী-পেতনীর দল আগেলে যাদের মারতে বসেছিল। তারা বাবাকে স্মরণ মাত্রই ওই মানুষ-ভূতনাথ আসবে কেন? আসবে কেন ওমনি ত্রিশূল হাতে, জ্যোতির্ময়রূপে? হবে কেন উদয় ভূতপ্রেতদের কব্জা থেকে তাদের উদ্ধার করতে?

এসব কথা এমুখ থেকে সেমুখ, এখান থেকে সেখান হতে হতে রঙের উপর রঙ চড়িয়ে প্রচার হতে লাগল এমনভাবে যে আশ-পাশ গ্রামের ছেলে-ছোকরা থেকে আরম্ভ করে বুড়ো হাবড়ারা পর্যন্ত কাতারে কাতারে আসতে লাগল অবিনাশবাবুর কারখানায়। সেই ভৈরব-ভাবন ভূতনাথবাবুকে দেখতে। সত্যিই তিনি পাতাল ফোঁড় শিব বা আকাশ ফোঁড় রুদ্রদেব বটেন কিঁ-না।

ভূতনাথবাবু পড়লেন মহা মুস্কিলে। এ মুস্কিল যে আসান করবেন তিনি লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোথাও —তারও কোন খুঁজে পেলেন না উপায়। সব সময় কারখানাটায় থেকে কারখানাটার সমস্ত রকম কাজ দেখা শোনার দায়িত্ব দিয়েছেন তাকে অবিনাশবাবু। ধারনা তার ভূতনাথবাবুর সুনজর ছাড়া কারখানাটা তার সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠবে না। ভূতনাথবাবুও তার কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ যে কারখানাটা পূর্ণরূপ না পাওয়া পর্য্যন্ত রাতে-দিনে থাকবেন তিনি এখানে। সেইজন্যই কারখানার মধ্যেই অবিনাশবাবু তাকে থাকবার জন্য দিয়েছেন ঘর, করেছেন অন্যসব ব্যবস্থা। সেপাই-দারোয়ানদেরও দিয়েছেন তিনি বিশেষ নির্দ্দেশ যেন সব সময় ভূতনাথবাবুর হুকুমে হাজির থাকে তারা। সুতরাং রেহাই পেতে ভূতনাথবাবু যাবেন কোথায়? ঘর?

ঘরেও ভূতনাথের খবর পাঠিয়ে অবিনাশ বাবু জানিয়ে দিয়েছেন তার মা -বাবাকে যে এখন তাদের ছেলের বাড়ী যাওয়া হবে না। কারণ কাজ করছে এখানে সে। আছে ভালভাবে। শরীর স্বাস্থ্য মন-মতলব সব ভাল তার। তা ছাড়া সে এখন যেতেও চাইছে না। সুতরাং তার জন্য কোন চিন্তা নেই। স্বয়ং ভূতনাথও স্ত্রী মায়াদেবীকে জানিয়ে দিয়েছে তার এখন বাড়ী না যাওয়া খবরটা। এককথায় বাড়ী যাওয়ারও পথটাও তার বন্ধ। তবে—?

তবে অবশ্য তাকে দেখতে আসা মানুষের ঢল কমতে লাগল আস্তে আস্তে। কারণ আসছিল সব তো হুজুগের বশে। এসে যখন দেখতে লাগল সবাই যে ভূতনাথ ভৈরবনাথ নয়। লেজ-ঝুলানো টিকি, চুল-ছুচালো ঢাঁক বা ব্যোম শঙ্করদের মত বট—ঝুরি নামানো জটাজুটও নেই তার। তখন ভাব-ভক্তি চটকিল তাদের। ছিটে গেল সবাকার তাকে কেওকেটা কোন সাধু-সন্ত ভাবার ধারনাটাও। কারণ লোকটার লাল গেরুয়া, আলখাল্লা, মালা-ঝোলা থাকা তো দূরের কথা কপালে ফোঁটা-তিলকের পর্য্যন্ত নাম-গন্ধ নেই। সুতরাং যতসব বাজে কথা। ওসব ভূত তাড়ানো, প্রেত খেদানো সব গুল। অলৌকিকত্বের তো কোন বালাই নেই লোকটার। এমন কি সামান্য ছিঁটে-ফোঁটা তুক-তাক দেখিয়েও কাকেও তাক লাগাবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নেই তার। মাদুলি দিতে আসা, মাদার (মজা) করা কতগুলো মেয়ে আজে -বাজে সব ফালতু কথা ছড়াচ্ছে। মিথ্যে গুজব রটিয়ে ঢাক ঢাক গুড় গুড় করছে চারদিকে। বোকা বানাচ্ছে সব আশ-পাশ গ্রামের সকলকে। ছুটে আসা করাচ্ছে যতসব গোঁয়ার গোবিন্দদের। ছিঃ। এভাবে অপরকে ভাওতা দিতে বা ধাপ্পা দিয়ে লোক ঠকাতে লজ্জাও করে না মুখপুড়িদের?

সুতরাং নিবৃত্ত হতেই কৌতূহল সবার ক্রমশঃ শুকিয়ে আসতে লাগল কারখানায় ভূতনাথ দেখা জন-স্রোতের ধারা। অবশ্য শূন্য হলেই বাঁচত ভূতনাথ, রক্ষা পেত কারখানাটা। বেনাহক সব বাজে ঝুট ঝামেলার হাতে থেকে উদ্ধার পেতেন অবিনাশবাবু। কিন্তু হঠাৎ একদিন ঘটল একটা কাণ্ড। পাশের গ্রাম কুমোর খুলি থেকে কুলদা ঘোষ এলেন কারখানায়। বন্ধু অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। লোকটা 'ব্যাচেলার' নন বিবাহিত। কোনকালে নাকি হয়েছিল তার একবার বিয়ে। কিন্তু বৌটা মারা যেতেই আর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহণ করেন নি তিনি। এখনও নাকি চাঁপদানী না বৈদ্যবাটীতে কোথায় কাজ করেন। বিশেষ একটা বাড়ী আসেন না। ঘরে

বিধবা মা-বোনকে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে কর্ত্তব্য সমাধা করেন। তবে বাড়ী এলে অবিনাশবাবুর কাছে না এসে তিনি নাকি থাকতে পারেন না।

কারখানায় পা দিতেই বন্ধু কুলদাবাবুকে অবিনাশবাবু সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ভূতনাথবাবুর কাছে। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। নাম-ধাম সব শুনতেই কুলদাবাবুর ভূতনাথের হল ভূত দেখার মত অবস্থা। বেবাক-বিস্ময়ে রইল সে তাকিয়ে কুলদা ঘোষের মুখটার দিকে। আসলে "কুলদা ঘোষ" নামটা শুনতেই ভূতনাথের পড়ে গেল মনে সেদিনের সেই সতীর সঙ্গে সূক্ষ্মে দেখা "মনোরমা" নাম্নী প্রেতাত্মাটার কথা। কি সাংঘাতিক, বীভৎস ব্যাপার। "বাঁচাও বাঁচাও' বলে চুল-শাড়ীসহ সমস্ত দেহে আগুন লাগা অবস্থায় জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে ছুটে এল নিকটে তার একটা সূক্ষ্মসত্তা। আর্ত্ত চিৎকারে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় জ্বলন্ত জ্বালায় ছুটোছুটি করতে লাগল সে তার সামনে। হঠাৎ অজান্তে ভূতনাথের "শান্ত হও" কথাটা মুখ থেকে উচ্চারিত হতেই শান্ত হল সে। আর আশ্চর্য্য। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষান্ত হয়ে গেল তাকে দগ্ধান সেই আগুনের লেলিহান শিখাগুলোও। অবাক হয়ে দেখল ভূতনাথ নিভতেই আগুন তার অগ্নিময় মূর্ত্তিটার পরিবর্তে ভেসে উঠল একটা পোড়া, কালো শ্মশানের কাঠমুড়ো বা জুমড়ো কাঠের মত নারী মূর্ত্তি। মনোরমার প্রেতিনী মূর্ত্তি। সে এক তার ভয়াল-ভয়ঙ্কর চেহারা।

দেখতেই সে চেহারা হঠাৎ ভূতনাথের মুখ থেকে "কে আপনি?" বলার সঙ্গে সঙ্গে কি করে যে ধমকের সুরে তাকে স্বাভাবিক হতে বলার কথাটা বেরিয়ে এল তার তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি। না পারলেও কিন্তু সে বলার ফল ফেলেছিল তার। তার সেই অগ্নিদগ্ধ বীভৎস মূর্ত্তিটা আস্তে আস্তে পরিণত হয়েছিল সামনে তার সুন্দর এক মানবী মূর্ত্তিতে। টিকালো নাক, টানা চোখ, ঠোঁটের নীচে কালো একটা তিল চিহ্নের বিন্দু নিয়ে— এক কথায় গড়নে বরণে পরণে অর্থাৎ সবুজ পেড়ে আকাশে রঙের শাড়ী-শাঁখার আভরণে সুন্দরী এক ত্রয়োস্ত্রীর মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়েছিল সে তার সামনে। জিজ্ঞেস করতেই সব পরিচয় দিয়েছিল সে তার। জীবনে নাকি সে ছিল মনোহরপুরের মদন ঘোষের একমাত্র মেয়ে। নাম ছিল তার মনোরমা। বিয়ে হয়েছিল তার কুমোরখুলি গ্রামে। স্বামীর নামটা বলেছিল সে তার—কুলদা চরণ ঘোষ। শুধু তাই নয়—সূক্ষ্মস্তরে বোধ হয় গোপনতার কোন বালাই থাকে না। তাই মনোরমা তার জীবনের সমস্ত কথা, মায়-শ্বশুর-শাশুড়ী তথা ননদিনীর উপর অহেতুক রাগ করে স্বামীকে ভুল বুঝে তার উপর মিথ্যা অভিমান করে নিজের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে তার আত্মহত্যার ঘটনা পর্য্যন্ত জানিয়েছিল সে তাকে। সূক্ষ্মের কথা মিথ্যা হয় না। সে সব কথা মনোরমার এমন ভীড় করে এল ওই "কুলদা ঘোষ নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথের মনে যে অবিনাশবাবুকে তাকে আর ঘোষবাবুর সমস্ত পরিচয় দিতে হল না। তার আগেই ওমনি হট্ করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল তার,—আপনার বন্ধুর স্ত্রীর মুখেই উনার সব পরিচয় ইতিপূর্বে জ্ঞা না হয়ে আছে আমার। তবে কুলদাবাবুকে আমি দেখিনি এর আগে। আজ আপনার মাধ্যমে এই তাকে প্রথম দেখলাম নিজের চোখে।

শুনেই তো চক্ষু চড়কগাছ অবিনাশবাবুর। কুলদাবাবুর ও আক্কেল তাক। তাজ্জব ব্যাপার। বলে কি লোকটা।

"—আমার স্ত্রীকে দেখেছেন আপনি? ওমনি হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করে উঠলেন কুলদাবাবু,—কোথায়? কখন?

মুস্কিলে পড়ল ভূতনাথ। হঠাৎ এমনি বেফাঁসভাবে কথাটা বলা বোধহয় তার উচিত হয় নি। কিন্তু চুপ দিয়ে থাকতে তাকে দিলেন না কুলদাবাবু। সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে মারলেন তাকে আর এক প্রশ্নবান,—কই বলুন তো দেখি, স্ত্রীর আমার চেহারা কেমন ছিল?

না বললে বোধহয় মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে ভূতনাথ। ধাপ্পাবাজ রূপে হবে সে প্রতিপন্ন। গুল ঝাড়েনি যে সে তাদের কাছে সেটাই প্রমাণ করার জন্য সূক্ষ্মে দেখা মনোরমার মানবী রূপের সমস্ত বর্ণনা ভূতনাথ দিল তাদের কাছে। তার ঠোঁটের তিল চিহ্ন থেকে আরম্ভ করে গড়ন-বরণ মুখ-চোখের বিবরণ এমন সবিস্তারে বলল সে যে তাক লেগে গেল কুলদাবাবুর। অবিনাশবাবু বিস্ময়ে হলেন যেন বাকবদ্ধ। আর বিশ্বাস না করে ভূতনাথকে থাকতে পারেন কুলদাবাবু? বিশেষ করে মনোরমার ওই সবজে পাড়ের আকাশী রঙের শাড়ীটার কথা শুনে? সেটা সে তার সঙ্গে একবার কলকাতায় গিয়ে নিজের পছন্দ মত কিনেছিল সখ করে। বড় প্রিয় ছিল তার ওই

শাড়ীটা। আর এটাও সত্যি—মরেছিল সে তার ওই সখ করা শাড়ীটা পরেই এবং কেরোসিন তেল ঢেলে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে। কিন্তু এসব কথা ভূতনাথবাবু জানলেন কি করে।

বলতেই হল ভূতনাথকে তার এসব জানার কথা। বিশেষ করে অবিনাশবাবুর অনুরোধে। মৃত্যুই যে জীবনের শেষ নয়। মৃত্যুর পরও যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে। থাকে সে এ জগৎ ছেড়ে অন্য এক জগতে—সূক্ষ্মলোকে, সূক্ষ্ম সত্তায়। সে সত্তায় গত জীবনের কর্মফল অর্থাৎ পাপ-পুণ্য ইত্যাদি সৎ-অসৎ কর্মের ফল ভোগ যে করতে হয় গিয়ে সেই পরলোকে—তা বিশ্বাস করতে হল কুলদা ঘোষ তথা অবিনাশ-বাবুকে।

শুধু তাই নয় সেই ভোগায়তন দেহে মনোরমার অগ্নিদাহের জ্বালা শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না কুলদাবাবু। বড় ভাল ভালবাসতেন তিনি তার স্ত্রীকে। তাই অন্তরটা উঠল তার মুচড়ে। প্রাণটা উঠল হো-হো করে। অজান্তে তার কোন মুহূর্তে যে চোখে গড়িয়ে এল জল তা তিনি নিজেই খেয়াল করতে পারলেন না। আবেগে হঠাৎ জড়িয়ে ধরলেন তিনি ভূতনাথের হাত দুটো। বলে উঠলেন ব্যথা ভরা কণ্ঠে,—আমি বড় ভুল করেছিলাম ভূতনাথবাবু। যদি আমি তার জিদটা সমর্থন করে কলকাতায় বাসা ভাড়া করে রাখতাম তাকে, নিজের কাছে তাহলে সে ওভাবে হয়ত আত্মহত্যা করত না। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি, বাড়ীতে বিধবা মা-বোনকে ওভাবে অসহায় ভাবে ফেলে রেখে কলকাতায় গিয়ে থাকতে কিছুতেই মন যায়নি আমার। কিন্তু কে জানত তখন যে তার মনের ইচ্ছা, প্রাণের সাধ পূরণ না করলে এভাবে পুড়ে মরতে যাবে সে। বড় অন্যায় করেছি জীবনে আমি ভূতনাথবাবু।

—কোন অন্যায় করেন নি আপনি। কোন ভুলও করা হয় নি আপনার জীবনে। স্ত্রী আপনার অহঙ্কারের বশে চলেছিল। আপনাকে নিয়ে স্বার্থপরের মত জীবনটা সে ভোগ করতে চেয়েছিল। তার এ অন্যায় সমর্থন না করে আপনি ভালই করেছিলেন কুলদাবাবু। আসলে আপনার অন্তরের সঙ্গে সে তার নিজের অন্তর মেলাতে পারেনি। যা প্রকৃত পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্ম। তাই আপনার অন্তরের পরিচয় পায় নি সে। ইচ্ছে করলে সংসারটাকে সে আপনার স্বর্গে পরিণত করতে পারত। কিন্তু শাশুড়ী-ননদিনীকে সহ্য করতে না পেরে তাদের সঙ্গে গণ্ডগোল ঝগড়ায় সংসারটাকে সে নরকে পরিণত করেছিল। নিজের ইচ্ছায় কেও যদি পাপ পথে যায় আপনি তার কি করতে পারেন। সুতরাং তার আত্মহত্যার জন্য মিছিমিছি নিজেকে দায়ী করে জীবনটা আপনি এভাবে হতাশা বিষাদ ও আফশোসে নষ্ট করে দেবেন না কুলদাবাবু।

কুলদাবাবু চুপ। কারণ একটা কথাও মিথ্যে নয় ভূতনাথবাবুর। কিছু বলারও নেই তার উপর। ভাবতে দেখে ভূতনাথবাবুই আবার তাকে উঠলেন বলে,—জীবনের ভুল মৃত্যুর পর বুঝতে পেরেছেন স্ত্রী। সূক্ষ্মে গিয়ে সূক্ষ্মবোধ-বুদ্ধি বিবেক শক্তিতে তার অনুধাবন করতে পেরেছে সে আপনার উদার হৃদয়, সরল অন্তর, প্রেমিক মন। কিন্তু ভাঙ্গলেও তার ভুল অবগত হলেও তার অন্যায় পাপ তো তার ফল ভোগ করাতে ছাড়বে না কুলদাবাবু। তাই যে জ্বালাতে জ্বালিয়েছে সে সংসার সেই জ্বালাতেই জ্বলছে সে নরকে। আত্মহত্যার আগুন লেগে আছে তার সত্তায়। এর সঙ্গে তার জন্য আপনার শোক মনঃকষ্ট, অনুতাপ অনুশোচনার জ্বালা সূক্ষ্মে গিয়ে লাগছে তার আত্মায়। তার সে যন্ত্রণা কাতর অবস্থা মনে পড়লে মনটা আমার এখনও উতলা হয়ে উঠে কুলদাবাবু।

—তার এ অবস্থা থেকে উদ্ধার কি পাবার কি কোন উপায় নেই?

—আছে। তা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে আপনার উপর।

—কি উপায় এক্ষুনি বলুন।" চঞ্চল হয়ে উঠলেন কুলদাবাবু— 'মনোরমার আত্মার মুক্তির জন্য আপনি যা বলবেন তাই করব আমি।

"—সত্যিই আপনি মহান কুলদাবাবু।" বলে উঠল ভূতনাথ,—"স্বামীর মৃত্যুর পর বৈধব্য ব্রত সাধারণত পতিব্রতা পত্নীরাই পালন করে থাকেন দেখি। কিন্তু স্বামীরা যে পত্নীর মৃত্যুর পর তার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে এভাবে স্ত্রীদের বৈধব্য-ব্রতের মত অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেন আপনার মত, তা কিন্তু বিরল। মা-বোন-আত্মীয় স্বজনের অনুরোধেও আপনি আর দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন নি। সময়, সুযোগ, বয়স থাকতেও আপনি আপনার মনোরমার আসনে আর কাকেও বসান নি। সত্যি সতীর শঙ্কর আপনি। একনিষ্ঠ পত্নী-

প্রেমের দিক দিয়ে আপনাকে সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু আপনার এই এক নিষ্ঠ প্রেমিক হৃদয়ের প্রশংসা করেও আপনার স্ত্রীর আত্মার মুক্তির ইচ্ছায় ও আপনার পরলোকগতা পত্নীর কথায় বলতে হচ্ছে আপনাকে এক বিশেষ কথা। সে কথা কিন্তু আপনাকে রাখতে হবে কুলদাবাবু।

কুলদাবাবু ওমনি সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বলে উঠলেন, —নিশ্চয়ই রাখব। মনোরমার আত্মার শান্তির জন্য আমি কোন কাজ করতেই কুণ্ঠিত হব না। বলুন আপনি।

—আপনাকে আবার বিয়ে করতে হবে কুলদাবাবু।

'—সে কি কথা!'' যেন চমকে উঠলেন কুলদা চরণ।

''—এ আমার কথা নয় কুলদা বাবু।'' বলে উঠল ভূতনাথ,—এ হল আপনার পরলোকগতা পত্নী মনোরমা দেবীর কথা। তিনি তার আত্মহত্যা মহাপাপের দণ্ড বড় সাংঘাতিকভাবে ভোগ করছেন ভূবর্লোকে। ভূবর্লোক হল ভূর্লোকের কর্মফল ভোগক্ষেত্র কুলদাবাবু। সেখানের ভোগ কাটাতে গেলে এই ভূলোকের ক্রিয়া-কর্ম ও পুণ্যানুষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হয়। নতুবা ফল ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানের নরক ভোগ থেকে মুক্তি পাবার আর অন্য কোন উপায় নেই। ভূবর্লোকে গিয়ে সত্তা সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্মশক্তির অধিকারী হয়। এর ফলে সে জানতে পারে কি করলে সত্তার উপর লেগে থাকা পাপের তার স্খালন হবে। মনোরমাকে আপনি মন-প্রাণ-হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলেন কিন্তু আপনার মন প্রাণ হৃদয় বুঝে সে আপনার সে ভালবাসার মর্য্যাদা দিতে পারে নি। স্বার্থপরের মত ভোগ করতে চেয়েছিল আপনাকে। জীবনে সে আপনাকে সকলের কাছ ছাড়া করে পেতে চেয়েছিল একান্ত আপনভাবে। এটা যে তার কত বড় ভুল ছিল, ছিল কত বড় অন্যায় মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম-শক্তিতে সে তা অনুধাবন করতে পেরেছে। পেরেছে বলেই সে আপনার হৃদয়ের ধন, আপন গাঁটে বাঁধা সম্পদকে অপরের হাতে তুলে দিয়ে নিজের স্বার্থপরতা—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে। তাই বিয়ে করতে বলেছে সে আপনাকে।

গম্ভীর হলেন কুলদাবাবু। বলতে লাগল ভূতনাথই, —''বিয়ে আপনি করুন কুলদাবাবু। অপরের মত জীবনে আপনাকে পূর্ণ হতে দেখলে সত্তা তার শান্তি পাবে। সংসার ধর্ম বড় ধর্ম কুলদাবাবু। এ ধর্ম থেকে সে আপনাকে বিচ্যুত করে যে মনের জ্বালা ভোগ করছে জীবনে আপনাকে বিবাহিত দেখলে সে জ্বালা তার জুড়োবে ঘোষবাবু। নব বিবাহিতা পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে আপনি আপনার মনোরমার উদ্দেশ্যে করবেন শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, পরলৌকিক পুণ্য-অনুষ্ঠান তবেই শান্তি পাবে তার আত্মা। আত্মহত্যার অগ্নি তাকে হয়ত মুক্তি দেবে দহন-জ্বালা থেকে। তারপর পর[illegible]কে আপনার পত্নীর অধিকারে পাবে যখন সে আপনার পুত্রের হাতের পিণ্ড তখন সত্তা তার উদ্ধার পাবে নরকগহ্বর থেকে। মানসিক গতি অনুযায়ী আবার নেমে জীবনে সার্থক করবে, হয়ত জনম। আপনার কাছে এ উপকারের সে প্রত্যাশী কুলদাবাবু।

এ রকমটা কখনও ধারনা করতে পারেন নি কুলদাবাবু। এ যে তার মত বিরুদ্ধ কর্ম, রুচি বিগর্হিত কাজ। এই বয়সে বসলে আবার বিয়ের পিঁড়িতে করলে আবার সংসার লোকে বলবে কি? মনোরমার প্রেমকে তাহলে যে অবমাননা করা হবে তার। কিন্তু ভূতনাথবাবুর কথা হল—ভুলতেই হবে তাকে তার সেই স্ত্রী মনোরমাকে। এখানের তার শোক-দুঃখ তাপের জ্বালা লাগছে গিয়ে সেখানে তার সূক্ষ্ম-সত্তায়। তার মনঃকষ্ট, হৃদয়ের ব্যথা, অন্তরের বেদনা দিচ্ছে বাড়িয়ে পরলোকে মনোরমার অগ্নিদাহের জ্বালা। এ জ্বালা থেকে উদ্ধার করতে তাকে করতেই হবে এ কাজ। স্মৃতি থে[illegible]ব মুছে ফেলতে হবেই মনোরমাকে। নইলে মুক্তি হবে না তার। যতদিন পর্য্যন্ত নাকি জীবিত থাকবেন কুলদাবাবু ততদিন পর্য্যন্ত তার স্মৃতির সূত্র ধরেই আত্মহত্যার অগ্নি দাহ করতে থাকবে সূক্ষ্ম-সত্তাকে তার। সুতরাং ভুলতে তাকে করতেই হবে বিয়ে।

তাছাড়া তাকে আরোও বুঝিয়ে বলতে লাগল ভূতনাথ, —আত্মা হল সর্বব্যাপী। সর্বভূতাশ্রয়স্থিত আত্মা। সুতরাং কামনার টানে, একনিষ্ঠ প্রেমের আকর্ষণে তার মনোরমার আত্মা হতে পারে সংস্থাপিত তার নব বিবাহিতা পত্নীর মধ্যে। নব পরিণীতা বধূকে তার মনোরমা রূপে দেখলেই সত্তা তার হতে পারে আরোপিত তার মধ্যে। তখন মনোরমাকে সে তার জীবনে যেভাবে চালাতে চেয়েছিল সেভাবে তার আদর্শমত দ্বিতীয়া পত্নীকে তার পরিচালিত করলেই তৃপ্ত হবে তার আত্মা। তৃপ্তিতে কুলদাবাবুর মুক্তি পাবে তার সত্তা। ফেলে

আসা জীবনের সাধও মনোরমা পারবে করতে পূরণ তার দ্বিতীয়া স্ত্রীর মাধ্যমে। তার মাধ্যমেই সংসার-জীবনের অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করে সে পাবে মুক্তির পথ, যাবে আত্মোদ্ধারের দিকে।

ভাবতে লাগলেন কুলদাবাবু। ভূতনাথবাবুর কথাগুলো সত্যিই ঝড় তুলল তার মনে। এ ঝড়ে তার ধারনার ধারা বইবে কি না বিপরীত মুখে, হবে কি-না উলোট পালট তা তার ভবিতব্যই জানেন।

(পঁচিশ)

কথায় বলে,— "ঘাঁটলে যেমন উঠে পাঁক, মথলে ভাসে ঘি।
মননে মন মথলে ভাসে অতীত স্মৃতি।"

প্রেতাত্মা মনোরমার কথাটা কুলদাবাবুর জীবনে সত্য হতেই সেদিনের সেই সূক্ষ্মে দেখা সব স্মৃতিরই মনে রোমন্থন হতে লাগল ভূতনাথের। স্মরণে এল তার সেই রানী-প্রেতাত্মাটার কথা। গোবর ডাঙ্গার গোরাচাঁদ বাবুর স্ত্রী কমলা দেবীকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল সে। দিয়েছিল দেখা সে তার মনের কামনার সূত্র ধরে চাঁদ-সুন্দর রূপ নিয়ে ছোট্ট এক শিশুকন্যা রূপে। সেই রূপেই পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছিল সে তাকে তার কোলে আসার ইঙ্গিত। কিন্তু তার এ জীবনে আসা সফল করতে হলে ভূতনাথেরও যে কিছু করণীয় আছে মনে পড়ে গেল তার। তাদের বাড়ীর পিছনে খিড়কির পাশের ডোবায় পাড়ের আম-গাছটায় বিগত জীবনের গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল সে। সে আত্মহত্যার আকর্ষণ থেকে মুক্ত করতে হবে তাকে। সত্তাকে তার রক্ষা করতে হবে সে টান থেকে। চঞ্চল হয়ে উঠল ভূতনাথের মনটা। অন্তর থেকে কেমন যেন একটা তাগিদ অনুক্ষণ অনুভব করতে লাগল সে। গোরা-চাঁদ-বাবুকে জানিয়ে সব কথা, তার ভাবী কন্যাসন্তানের জীবনটাকে ভবিষ্যতে আত্মহননের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল ভূতনাথ।

হঠাৎ মেঘ না চাইতেই জল। ভূতনাথের ভাবনার টানেই হোক বা কুমোর টুলির কুলদাবাবুর অজানা অতীত জানিয়ে দেবার কল-কলানিতেই হোক একদিন স্বয়ং গোরাচাঁদবাবুই এসে হাজির হলেন তার কারখানায়। বোধ হয় তার স্ত্রী কমলা দেবীর খোঁচায় ভূতনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। দেখা করতে আসা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে। কারণ গোরাচাঁদ বাবু আসলে ছিলেন সম্পূর্ণ বাস্তববাদী মানুষ। অলৌকিকতার যেমন ধার ধারতেন না তেমনি কারও আদিখ্যেতাও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই স্ত্রী কমলাদেবীর কাকলিতে অস্থির হয়ে তিনি এলেন ভূতনাথবাবুকে আসলে যাচাই করতে। সত্যই তিনি ভাঙ্গা ফুঁড়ে উঠা ডাঙ্গাল্যা বাবা বা আকাশ থেকে পড়া কালভৈরব বটেন কি না। অদ্যাবধি স্ত্রীকে তার ঠকিয়ে অনেক সাধু-মহন্ত জড়ি-বুটে দিয়ে হাতিয়েছেন তার অনেক কিছু। ছেলে হওয়ানোর লোভ দেখিয়ে অনেক ওজা গুনিন তুক-তাক দেখিয়ে তাকে মাথায় তার তেরেকিটি বাজিয়ে হয়েছেন উধাও। মা হবার টোপ ধরিয়ে কমলাকে কত যে পীরবাবা শিকড়, বাকড়, খাওইয়ে তাকে করেছে নাস্তানাবুদ, কত যে ফকির বাবা তাবিজ-মাদুলি দিয়ে তাকে করেছে ফতুর তার কোন সংখ্যা নেই। ভুলিয়ে তাকে টাকা-কড়ি নিয়ে ভেগেছে অনেক লালবাবা। ঠকিয়ে তাকে নূতন শাড়ি বাগিয়ে কলা দেখিয়েছে অনেক গেরুয়া-মা। সেইসব ধড়িবাজ-দলের নয়তো লোকটা। ভূতনাথ বাবা হয়ে তেমনি ঠকাতে আসেনি তো এখানে। বুজরুকিতে বোকা বানিয়ে কমলাকে কোন ধান্দা করবার মতলবে সে ডেরা করেনি তো কারখানায়? মা হবার আশায় অন্ধ কমলা। সহজ-সরল সাধা-সিধা মন তার। তাই হয়তো কাক-তলীয় একটা স্বপ্নের কথা বলে কব্জা করেছে তাকে। এরপর হয়তো একদিন বাড়ীতে এসে তার একলা পেয়ে তাকে ভুলিয়ে হাতাবে সোনা-দানা ঝোপবুঝে কোপ মেরে তাকে বাগিয়ে নেবে টাকা-কড়ি। তারপর যা করে সব ওই জাতের ধুরন্ধররা—চোখে ধূলো দিয়ে চম্পট। না আর না। অনেক ঠকেছেন গোরাচাঁদবাবু। এবার কোন ভেল্কি শুনে বা মুখের কথায় নয়। পাতাল ফোঁড় শিব বা আকাশ ফোঁড় ত্রিশূল বাবা যাই হোন না কেন তিনি নিজের চোখে দেখে, বাজিয়ে পরীক্ষা করবেন—আসল না নকল।

কিন্তু পরীক্ষা করবেন কি গোরাচাঁদবাবু—দূর থেকে দেখেই তাকে ভূতনাথবাবু এমন করলেন সম্বোধন যেন কতদিনের সে তার চেনা জানা। আশ্চর্য্য। লোকটা দেখেনি কখনও তাকে। সেও তাকে ইতিপূর্বে দেখেনি কোথাও। দেখা তো দূরের কথা, মেয়ে ভেল্কিতে পড়ে তার নামটা জানা ছাড়া তো চেহারার কোন পরিচয় পায় নি সে। তারও চেহারা আদল, ভাবভঙ্গী, গড়ন বরণ জানবার তার কথা নয়। অথচ এত লোকের মাঝে এক

নজরে দেখেই তাকে চিনে নিল গোরাচাঁদবাবু বলে। চেনা শুধু নয় দূর থেকে দেখেই তাকে একেবারে অতিপরিচিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত কথা বলা—"এই যে, আসুন গোরাচাঁদবাবু। আপনার কথাই ভাবছিলাম। কথা আছে আপনার সঙ্গে। আপনি আমার কাছে না এলে হয়ত আমাকেই যেতে হত আপনার কাছে।

গোরাচাঁদবাবু তো থ। ভাবতে লাগলেন তিনি আকাশ পাতাল। লোকটা তাকে চিনল কি করে। ভীমরতি হয়নি গোরাচাঁদবাবুর। সব কিছু বিস্মরণ হয়ে যাবার বয়সও হয়নি তার। প্রখর স্মৃতিশক্তির তার তারিফ করে সবাই। অথচ সে স্মৃতিশক্তির ... এ ধরে কিছুতেই তিনি মনে করতে পারছেন না লোকটার সঙ্গে আগে তার কোথাও আলাপ হয়েছিল কি না। আশ্চর্য্য। স্বচক্ষে না হয় তাকে কোথাও সে না দেখে থাকতে পারে কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের মুখে পরোক্ষভাবেও তো সে তার কোথাও, কোনদিন নাম পরিচয় শুনেছে বলে মনে হল না।

মাথা ঘামিয়ে, স্মৃতির শেষপাতা পর্য্যন্ত উল্টিয়ে হাতড়ে কিছুতেই যখন ভূতনাথবাবুর সঙ্গে তার পূর্ব-পরিচিতির কোন সূত্র খুঁজে পেলেন না তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তাকে তার জানার ইতিহাস। সে ইতিহাস শুনেই তো গোরাচাঁদবাবুর হল আক্কেল তাক। তার স্ত্রী কমলা দেবীর স্বপ্ন দেখার দিন রাত্রে বেলায় অর্গল বদ্ধ শোবার ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় নাকি তার সঙ্গে ভূতনাথবাবুর হয় প্রথম সাক্ষাৎ। এযে আকাশ থেকে পড়ার মতই অবস্থা তার। কিন্তু মোটেই ধাপ্পা নয়। এমন ভাবে সে তার শয্যার উপর ঘুমিয়ে থাকার বর্ণনা দিল যা না দেখলে তার পক্ষে বলা অসম্ভব। তাছাড়া তার শোবার ঘরে কোথায় কোন্ জিনিস কি অবস্থায় রাখা আছে হুবহু সব এমন দিল বলে ভূতনাথবাবু, যা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। গোরাচাঁদবাবুকে হাবা গঙ্গারাম বানিয়ে দিলেন ভূতনাথবাবু তাকে না জিজ্ঞেস করেই তার বাবা ঠাকুরদার নাম পরিচয় ইত্যাদি দিলেন বলে। শুধু তাই নয় অতীতে তাদের সংসারের অবস্থা কেমন ছিল, কেমন দুঃখ কষ্টের মধ্যে তার ঠাকুরদা জানকীনাথ বাবু তার দু ছেলে মেয়ে অর্থাৎ গোরাচাঁদবাবুর বাবা ও পিসিমা রাজা-রাণীকে মানুষ করেছিলেন সব কথা পাকা বুড়ীর মত এমন ভাবে বলে গেলেন ভূতনাথবাবু যে গোরাচাঁদবাবুর তাকে পরীক্ষা করতে আসা উঠল ডকে। ক্যাবলাকান্ত হয়ে গেলেন তিনি।

বিস্ময়ের মাত্রাটা তুঙ্গে উঠিয়ে দিল তার রাণী-পিসিমার কথা বলে। গোপাল ডাঙ্গার রাজ পরিবার রাজ নারায়ণ বাবুর সঙ্গে তার বিয়ে। বিয়ের পর সেই পাওনা নিয়ে কেলেঙ্কারি, শ্বশুরবাড়ীতে পিসিমার নির্য্যাতন, স্বামী শ্বশুরের অত্যাচারে তার বাপের বাড়ীতে চলে আসা, শেষ পর্য্যন্ত দারিদ্রতার হাত থেকে তার বাপ-ভাইএর বংশকে রক্ষা করবার জন্য তাদের খিড়কি পাশের ডোবার পাড়ের আম গাছটায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা সব কথা এমন নিখুঁত ভাবে বলে গেলেন ভূতনাথবাবু যা বাড়ীর আপন জন ছাড়া জানা একেবারে অসম্ভব। এসব গোপন কথা, কেলেঙ্কারির ইতিহাস মান সম্ভ্রম বজায় রাখতেই বলেননি তার বাপ-ঠাকুরদা কাকেও। বংশের ইজ্জত বজায় রাখতে এসব ভুলে যেতে বলা হয়েছিল গোরাচাঁদ বাবুকে। কিন্তু ভূতনাথবাবু এসব কথা জানলেন কি করে। কি করে তাদের বংশের এসব লুকিয়ে রাখা, ছাপিয়ে রাখা কথা অবগত হল সে। কারো কাছে শোনাও তো সম্ভব নয় তার। কারণ তার পিসিমার এসব কুলজীর ছিঁটে ফোঁটা জানত যারা সে সব পাকা-মাথা, মুরুব্বিরা গ্রামে তাদের একটাও বেঁচে নেই। কমলারও অজানা এসব। তবে কি সত্যই লোকটা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। না কমলার মতে অন্তর্য্যামী ভাঙ্গাল্যা-বাবা ভূতনাথবাবু। তাই মনেরও মনের কথা এমন ভাবে পারছেন তিনি বলতে। পরীক্ষা করতে এসে পরীক্ষক এভাবে যে পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় পড়বেন কল্পনাও করতে পারেন নি গোরাচাঁদবাবু।

গোরাচাঁদবাবুর বিস্ময় বেবাক মুখটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল ভূতনাথ—মায়া বড় সাংঘাতিক জিনিস গোরাচাঁদবাবু। প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা মৃত্যুর পরও নষ্ট হয় না। আপনার রানী পিসিমা তাই মৃত্যুর পরও পারে নি যেতে তার বাপ-দাদার সংসারটা ছেড়ে। আত্মহত্যার ক্ষেত্র আপনাদের ওই বাড়ীর পাশের ডোবার পাড়ের আমগাছটাকেই আছে সে আশ্রয় করে। সব সময় ফেলছে সে তার কল্যাণ দৃষ্টি আপনাদের উপর। মঙ্গলময় ইচ্ছা নিয়ে সব সময় সে তাকিয়ে আছে আপনাদের দিকে। কোন অসৎ আত্মার হাওয়া বইতে দিচ্ছে না সে আপনাদের সংসারটার উপর। ফেলতে দিচ্ছে না সে কোন দুষ্ট নষ্ট কু-সত্তার নজর আপনাদের ঘর-গৃহস্থে। কৃতজ্ঞতার বাঁধনে বাঁধা সত্তাটা তার গলায় দড়ি দেওয়া দমবন্ধের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেও টিকে আছে সেই

আমগাছটার ডালে শুধু আপনাদের সুখ-শান্তি দেখবার জন্য। আপনার স্ত্রীর সন্তানাদি না হওয়ায় মনের দুঃখ বড় বেশী উতলা করেছে তার সত্তাটাকে। অন্য কোন উপায় না দেখে তাই রানী-পিসিমা আপনার কন্যা হয়ে আসছে আপনার স্ত্রীর গর্ভে।

'—তাই নাকি? বিস্ময়াভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠলেন গোরাচাঁদবাবু।

'—হ্যাঁ। গোরাচাঁদ বাবু তার জন্ম নেওয়ার ভাবী ইঙ্গিতই সেদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেছিলেন আপনার স্ত্রী। কিন্তু থাক গে ওসব কথা। বলে উঠল ভূতনাথ, —এখন যে কথাটা বলা আপনাকে আমার বিশেষ দরকার সেই কথাটাই বলছি, শুনুন দয়া করে।

ভূতনাথের কথায় তখন যেন মন্ত্রমুগ্ধ গোরাচাঁদবাবু। তাই পরম আগ্রহে কৌতূহল ভরে একনিষ্ঠভাবে তিনি শুনতে লাগলেন ভূতনাথবাবুর কথা। বলতে লাগল ভূতনাথ, "—আত্মহত্যার কালি কোনরকমে সত্তায় একবার লাগলে তা কিন্তু সহজে ছাড়ে না গোরাচাঁদবাবু। জন্ম-জন্মান্তর সে দাগ প্রায় থেকেই যায়। তাই রানী পিসিমা আপনার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলেও কিন্তু আত্মহত্যার টান তার থেকে যেতেও পারে। জীবনে সে টান কখনও হয়ত তার মানসিক দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে সেই আত্মহত্যার দিকে আকর্ষণ করতে পারে তাকে।

—সে কি?

—হ্যাঁ গোরাচাঁদবাবু, পূর্ব-জীবনের জের পরজীবনে মানুষের অবচেতন মনে এমনভাবে বাসা বেঁধে থাকে যে সজ্ঞান মন তার বিন্দু বিসর্গ পর্যন্ত টের পায় না। জীবনে সে যতই জ্ঞানী গুনী, সৎ, আদর্শপরায়ণ হয়ে উঠুক না কেন তার অবচেতন মনে বাসা বাঁধে তার অতীত জীবনের সংস্কার। অপরিণত, পরিণত যেকোন অবস্থাতেই ঠুনকো সম্মান রক্ষা, ভাবাবেগ, মান-অভিমান ইত্যাদি বিভিন্ন সূত্র ধরে মনকে বিভ্রান্ত করে, ঘোরে ফেলে, এমনভাবে জীবনকে তার আত্মহত্যার দিকে টেনে নিয়ে যায় যে আগে থেকে সে তা কল্পনাও করতে পারে না। কন্যারূপী আপনার রানী-পিসিমার জীবনে অতীত জীবনের জের যাতে অনুরূপ অঘটন ঘটাতে না পারে তার জন্য আপনাকে তথা আপনার স্ত্রী কমলা দেবীকে এখন থেকে সচেতন থাকতে হবে। কল্যাণময়ী মূর্ত্তি ধরে পিসি-মা, আপনার মঙ্গলময় ইচ্ছা নিয়ে আপনাদের সংসারে আসছে। এ জীবনেই তার সত্তার সেই আত্মহত্যার টান নষ্ট করতে হবে গোরাচাঁদ-বাবু। তবেই সে এ জীবনের শুভ কর্মফলে সংসাধিত করতে পারবে তার আত্মার উন্নতি। একমাত্র মাতা-পিতাই ইচ্ছা করলে পারে সত্তার সে টান নষ্ট করতে। আপনাদেরও তা পারতে হবে গোরাচাঁদবাবু।

"—কি করতে হবে বলুন.? বলতেই গোরাচাঁদবাবু, শুরু করল বলতে ভূতনাথ, তাকে অদ্ভুত কথা। সৎ আত্মারা নাকি জন্ম জীবনে আসেন না সহজে নেমে। কাম-কাতর, লালসা ভরা মনের সুযোগ নিয়ে অসৎ আত্মারাই সাধারণত গর্ভে আসে বেশী। তবে ভাল মন্দ, সৎ-অসৎ যে কোন সত্তা, যেকোন মনোভাব নিয়ে আসুক না নিতে গর্ভে আশ্রয় গর্ভাধানকালীন অবস্থায় পিতার মনোভাব ও মাতার নিষ্ঠা নাকি পারে তার মনের গতি পরিবর্তন করতে। বিশেষ করে ভ্রূণাবস্থায় মাতার জীবনাচরণ তথা মনোভাব সন্তানের মানসিক গঠনে নাকি বিশেষ হয় সহায়ক। অর্থাৎ বদ্-ভাবনা, অসৎ চিন্তা, কু আলোচনায় এ সময় মগ্ন রাখলে মনকে গর্ভে . ২-আত্মারাও জীবনে হয়ে যান অসৎ। তেমনি সু—আলোচনা সৎ ভাবনা-চিন্তায় এসময় মগ্ন রাখলে মনকে গর্ভাশ্রয়ী অসৎ আত্মারাও অনেক সময় হয়ে যান সৎ আদর্শ পরায়ণ। মানুষের জীবন গঠনে তাই মাতা পিতা হল স্রষ্টা। সবচেয়ে বড় সাধক সাধিকা তারা। তাদের সাধনার ফলই হল আদর্শ সন্তান, সু-নাগরিক ও পবিত্রমনা মানব-মানবী, যাদের লাভ করে দেশ জাতি ও সমাজ হয় উপকৃত—ধন্য হয়। মাতা-পিতা তাই জীবন্ত দেবতা, সংসারের জাগ্রত দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। কমলা দেবী এবং গোরাচাঁদবাবুকেও নাকি অনুরূপ দেব-দেবীর আদর্শে আসীন হয়ে থাকতে হবে। শুদ্ধ পবিত্র মনে এখন তাদের যাপন করতে সাধক সাধিকার জীবন। বিশেষ করে মায়ের মনকে নাকি এসময় রাখতে হবে সদানন্দময়, প্রফুল্লমুখী ও হাসিখুশি ভরা। মায়ের মনে এসময় কোন আঁচড় লাগানো চলবে না যা গর্ভস্থ সন্তানের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। জীবনের জ্ঞান-বোধের শুরু হয় নাকি ভ্রূণাবস্থা থেকেই। সুভদ্রার গর্ভে থাকা-কালীন ভ্রূণাবস্থাতেই তাই হয়েছিল অধিগত অভিমন্যুর চক্রব্যূহ ভেদ-বিদ্যা।

বলতে বলতে এল ভূতনাথ আবার সেই গোরাচাঁদবাবুদের বাড়ীর পাশের খিড়কী ডোবাটার সেই আমগাছটার কথায়। যেটার ডালে গলায় ফাঁশ লাগিয়ে ঝুলে মরেছিল তার রানী পিসিমা। সূক্ষ্ম সত্ত্বা জন্মে নামলেও নাকি খোলশটা তার সহজে নষ্ট হয় না। থেকে যায় সেটা নাকি তার আশ্রয় করা স্থানে। পরিত্যক্ত সে খোলশেরও নাকি থাকতে পারে ছেড়ে দেওয়া পোশাকের মত একটা মানসিক আকর্ষণ। সে আকর্ষণ চেতন মনের অজ্ঞাত হলেও অবচেতন মনে থাকতে পারে তার প্রতিক্রিয়া। সুতরাং গর্ভাবস্থায় কমলা দেবীর ওই ঘাটের পাশের আমগাছটার দিকে না যাওয়াই উচিত। বিশেষ করে মনে কোন মান-অভিমান, দ্বিধা দন্দ্ব বা জটিলতা নিয়ে। না তাকানো উচিত তার খিড়কি পাশের উঁকিমারা ওই গাছটার দিকে। বিশেষ করে হতাশ উদাস-নিরাস মনে বা উত্তেজিত অবস্থায়। গর্ভিনী কমলাকে যত বেশী ধর্ম চর্চায় পবিত্র চিন্তায় সৎ আলোচনায় রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠে, আদর্শ মূলক উপখ্যান বা তার অংশ শ্রবনে যত বেশী মগ্ন রাখা যায় ততই নাকি মঙ্গল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মায়ের মন যত বেশী শান্ত সৌম্য অবস্থায় থাকে, থাকে যত নিরুদ্বেগ চিত্তে ততই নাকি গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে হয় তা উপকারক। শুধু তাই নয়, কন্যারূপী রানী হয়ত অতীত জীবনের টানে বাল্যকালে খেলতে যাবে সচরাচর তার খেলুড়িদের সাথে ওই আমগাছটার তলায়, করবে লাফা-ঝাঁপা, খেলবে ঝোরল ঝাঁপ ওই আম গাছটার ডালে। লক্ষ্য রাখতে হবে সেখানে যেন খেলার মুহূর্ত্তে কোন উত্তেজনায় না পড়ে সে, না যায় যেন একলা মনে কোন রাগ অভিমান নিয়ে ওই আমগাছটার দিকে। কারণ কখন কি সূত্রে বিচলিত হয়ে মন তার টানা যাবে যে অতীত জীবনের অঘটনের দিকে বলা তো যায় না। গাছটার ডাল ভেঙ্গে পড়া বা ঝুলতে ঝুলতে ছিটকে ডোবাটার জলে পড়ে ডুবে যাওয়া ইত্যাদি আত্মহত্যার সামিল নানা বিপর্য্যয় ঘটতে পারে তার। বাল্য কৈশোরেই নাকি বিগত জীবনের জেরটা থাকে বেশী। অজ্ঞানতার এ পর্য্যায়ে সে জের ধরে থাকা অবচেতন মনটা এসময় পরিচালিত করার চেষ্টা করে জীবনে নামা সত্ত্বাকে বেশী। অপরিণত বুদ্ধির এ কালটা কোন রকমে অতিক্রম করালে নাকি পরিণত জীবনে আর রানী-কন্যার তাদের ততটা আশঙ্কার কিছু থাকবে না। কারণ চেতন মনের জ্ঞানই তখন তাকে করবে পরিচালিত। আসলে রানী পিসিমা তো তার অসৎ সত্ত্বা ছিল না। আত্মহত্যা করেনি সে আত্মস্বার্থ অপূরণের জ্বালা নিয়ে। তার বাপ-ভাইকে বিপদমুক্ত অর্থাৎ পরোপকারের বাসনা নিয়েই মরেছিল সে। আত্মহত্যা করেছিল তাদের রক্ষা করার আর কোন উপায় পায় নি বলে সে। মরেছিল সে ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে। তাই আত্মহত্যার পাপ ততটা গ্রাস করতে পারেনি তাকে। সুতরাং তাদের মত মা-বাবার কৃপা পেলে এই জীবনেই উদ্ধার হয়ে যেতে পারে সে।

ভূতনাথের কথায় উড়ে গেল গোরাচাঁদবাবুর অবিশ্বাসী মন। নস্যাৎ হয়ে গেল তার উপর সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সন্দেহ। বিশ্বাস করল কমলা দেবীর স্বপ্নটাকে সে। সেই বিশ্বাসের ঘোরেই ভূতনাথ বাবুর কথাগুলোকে মনে প্রাণে ধরে নিয়ে ফিরে গেলেন তিনি বাড়ী।

গেঁয়ো একটা কথা আছে,—"যা রটে তার কিছুও বটে।
লেজ তুলে দেখার আসল মরদ
খাঁটি বাপের বেটা বটে।।"

সেরকম আসল মরদ বা খাঁটি বাপের বেটা বলতে বোধ হয় এ অঞ্চলে একজন মাত্রই ছিলেন। তিনি হলেন গদার ডিহি গ্রামের মানিক চাঁদবাবু। বাবুর একটা অদ্ভুত নেশা ছিল। আশ-পাশ গ্রামে যেখানে যাই রটুক ওমনি গন্ধ শুঁকে তার কারো ডাঁকা-হাঁকা বলা কওয়ার পরোয়া না করেই ছুটে গিয়ে হাজির হতেন সেখানে। উদ্দেশ্য রটনার রহস্য উদঘাটন করা। ফালতু কোন ফটিকচাঁদ এসে তাদের অঞ্চলে ফঁপরদালালি করবে— এটা তিনি সহ্য করতে পারতেন না কিছুতেই। বাপ তার গোকুল বিহারী বাবুও ছিলেন ওই রকম। অঞ্চলে তার তুক-তাকের গন্ধ, অলৌকিতার ঘ্রান পেলেই ওমনি ছুটে যেতেন তার গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ করতে। আসল নকল খুঁজে বের করে ওসবের ঘাট শ্রাদ্ধ তের-শান্তি না চুকান পর্য্যন্ত স্বস্তি পেতেন না মনে তিনি। সেই বাপের বেটা মানিক চাঁদের কানে উঠল যখন ভূতনাথের সব অদ্ভুত কথা বা অসম্ভব ব্যাপার-স্যাপারগুলো তখন ফোঁস করে উঠল তার বাপতে স্বভাবটা। রহস্য উদঘাটনের রক্তের নেশায় ছুটে গেলেন তিনি অবিনাশবাবুর কারখানায়। ভূতনাথবাবুর অদ্ভুততার গুঁড়ি গুলতে, তাঁর অলৌকিকতার মাথায় ঘোল ঢালতে। কেমন তিনি পাতাল

ফোঁড় শিব হয়ে মেয়েদের ভেঙ্কি দেখান ও কেমন তিনি আকাশ ফোঁড় ত্রিশূল-বাবা হয়ে লগদী-সেপাইদের ধাঁধা লাগায়—ব্যাপারটা জানতে।

এসেই তিনি কোন ভূমিকা না করে বলে উঠলেন অবিনাশবাবুকে,—আচ্ছা, মেয়েরা না হয় তিলকে তাল করতে পারে; বিহারী লগদী ও পশ্চিমা সেপাইরা না হয় গাঁজার ঘোরে ও ভাঙের নেশায় বুঁদ হয়ে সূচকে ফাল করতে পারে—কিন্তু আপনি? ওসব মেয়ে ভেঙ্কির সূত্র ধরে, নেশা-খোরদের কথা আঁকড়ে ও লোকটাকে এখানে এমনভাবে ধরে রেখেছেন কেন বলুন তো? কারখানার আপনার পশার বাড়াবার জন্য? ভেবেছেন চিড়িয়াখানার একটা জন্তুর মত ভূতনাথবাবুকে এভাবে একটা দর্শনীয় বস্তু করে রাখলেই সকলের এখানে সহানুভূতি, ভালবাসা ও দরদ পাবেন আপনি? প্রচার হবে আপনার কারখানাটার? সে গুড়ে বালি।

কি যে বলবেন অবিনাশবাবু খুঁজে পেলেন না। লোকটাকে এখানে ভয়ের সঙ্গে ভক্তিও করে সবাই। রগচটা মানুষ মানিকবাবু। আদিখ্যেতা কারো সহ্য করতে পারেন না। মুখে কোন কাঁটা-খোঁচা নেই তার। নেই মনেরও তার কোন ভিতরবার। ভাল-মন্দ দোষ-ত্রুটি যার যা দেখেন চটাপট্ ফটাফট্ তার মুখের সামনেই দেন তিনি তা বলে। এদিক দিয়ে তার নামও আছে যেমনি এবং এর জন্য এ অঞ্চলের সবাই তাকে মানে গুণেও তেমনি। সুতরাং বুজে-সুজে কোন কথা না বললে বা উত্তরে কোন বেফাঁস কথা বলে ফেললে মুস্কিল। তাই দূর থেকে মানিকবাবুকে তার কারখানার দিকে মজালোটা লোকগুলোর সঙ্গে আসতে দেখে ইতিপূর্বেই অবিনাশবাবু সাবধান করে দিয়েছিলেন ভূতনাথবাবুকে তার মন-মতলব স্বভাব-প্রকৃতি ইত্যাদির পরিচয় দিয়ে। কেমন পিতার সন্তান তিনি তার নাম-ধাম ইত্যাদিও জানিয়ে রেখেছিলেন ভূতনাথবাবুকে। কিন্তু তিনি ভূতনাথবাবুকে ছেড়ে এসেই যে তাকে এমন প্রশ্নবান ছুঁড়ে মারবেন ভাবতে পারেন নি। আসরে গায়কের সঙ্গে বাজাতে না পেরে তাল কানা তবলচির যেমন অবস্থা হয় তেমনি অবস্থা হল অবিনাশবাবুর।

ওধারে ভূতনাথও তথৈবচ। 'মানিক বাবু'' নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে মূক-বধিরের মত বসে রইলেন তিনি যেন ষ্টেচু। স্পিকটি নট—নট নড়ন, নট চড়ন। তবে কি ঘাবড়ে গেল লোকটা, ঠোঁটকাটা কাট-খট্টা মানিকবাবুর কথার চোটেই বাক-বন্ধ হয়ে গেল সে?

না। আসলে তা কিন্তু নয়। মানিক চাঁদের নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই পড়েছিল মনে তার সেই সূক্ষ্মে দেখা ননী বালার প্রেত্মাটার কথা। তারই কথাগুলো ভাবছিল সে। ভাবছিল বেবাক বিস্ময়ে মানিকবাবুর মুখটার দিকে তাকিয়ে। কিন্তু বড় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় অবস্থা হল অবিনাশ চৌধুরীর। আর এধারে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকাও মানিকবাবুর অভ্যাস নয়। তাই বাহাদুরী দেখানোর ভঙ্গীমায় বেশ ভ্রুকুটি করে কুটিল ভঙ্গীতেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন তিনি। বলে উঠলেন ভূতনাথবাবুকে ঘাড় বাঁকিয়ে বেশ ভারিক্কিভাবে,—জানেন আপনি, আমি কে?

''—জানি।'' বেশ গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিল ভূতনাথ,—গদারডিহির গোকুলবাবুর ছেলে আপনি। কিন্তু মা আপনার দুজন। অর্থাৎ দুমায়ের একমাত্র সন্তান আপনি। বড় মার নাম হল আপনার ননী বালা আর গর্ভধারিনী জননীর নাম হল চারুলতা। তবে আপনার নিজের মায়ের চেয়েও আপনার বড় মায়ের কিন্তু আপনার উপর টান ছিল বেশী। তার প্রানের প্রাণ, হৃদয়েরও হৃদয় ছিলেন আপনি। বাল্যে আপনি ছিলেন তার অত্যন্ত নেওটা। তাকে ছাড়া আপনি যেমন ছোটবেলায় থাকতে পারতেন না এক দণ্ডও, আপনাকে ছাড়া তেমনি আপনার বড় -মাও থাকতে পারতেন না এক মুহূর্ত্তও।

—তাই নাকি? মানিক বাবুর কণ্ঠে বিদ্রূপাত্মক জিজ্ঞাসা।

''—শুনুন মানিকবাবু,'' বলে উঠল ভূতনাথ,—মায়ের স্নেহ ভালবাসা ছেলেকে তার পরিণত জীবনে কখনও রুক্ষ স্বভাবের হতে দেয় না। কিন্তু আপনি দৈব-দুর্ঘটনায় বড় মার আপনার সে স্নেহ-থেকে চ্যুত ও সে ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাই বাল্যের আঘাত পাওয়া সে মন পরিণত বয়সে আপনাকে এমনি কঠোর চরিত্রের তিরিক্ষি মেজাজের ও অপরের প্রতি অসহ্য স্বভাবের মানুষে পরিণত করেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি—'বলতে বলতে হঠাৎ ওমনি বেরিয়ে গেল তার মুখ থেকে,—ননী বালা অর্থাৎ বড়-মা আপনাকে বিষ খাওইয়ে ছিলেন ঠিকই কিন্তু বিষ খাওইয়ে আপনাকে মারতে তিনি চান-নি। এটা একটা এক্সিডেন্ট। মনের

ভুলে অজ্ঞানতার ঘোরে সম্পূর্ণ নিজের বোধ-চেতনাহীন হটকারিতার মুহূর্তেই এরকম একটা কুকাণ্ড করে ফেলেছিলেন তিনি।

শুনে কথাটা যেন চমকে উঠলেন মানিকবাবু। বাল্যে তাকে বড় মার বিষ খাওয়ানোর ব্যাপারটা এ লোকটা জানল কি করে। কিন্তু বিস্ময়ে মনের দুর্বলতা অপরের কাছে প্রকাশ করলে সকলের কাছে তার ওজন পাছে কমে যায় তাই ঠাট্-টা তার বজায় রাখবার জন্য আগের মত জমিদারী গলাতেই বলে উঠলেন তিনি,—শুনুন· ভূতনাথবাবু, এর ওর সম্বন্ধে শোনা কথা কায়দা করে বলে বেশ ফায়দা লুটতে পারেন আপনি। গোরাচাঁদবাবুর স্ত্রীর কথা কৌশলে জেনে নিয়ে তা কপচিয়ে আপনি তাকেও কব্জা করেছেন বেশ—শুনেছি। কুলদাবাবুর কুলুজী জেনে তাকেও পেরেছেন কাবু করতে। কিন্তু আমাকে এত সহজে বোকা বানাতে পারবেন না আপনি। গভীর জলের মাছকে আপনি ওদের মত চার খাওইয়ে টোপ ধরাবেন ভেবেছেন? ঘুঘু দেখেছেন ভূতনাথবাবু এখনও ফাঁদ দেখেননি। তবে বুদ্ধিমান আপনি সে কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। কারণ বড় মা যে আমাকে ছোটবেলায় বিষ খাওইয়ে ছিলেন সে কথাটা আমি আসবার আগে জেনে নিয়ে বৈশ কৌশল করে উগারে সেটা ধরবার আমাকে ফন্দি করেছেন। কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে মুখ ফসকিয়ে যে ফালতু একটা কথা বলে ফেললেন আপনি তাতেই যে আপনার সব চাতুরি বানচাল হয়ে গেল। আপনারাই বলুন—" বলেই মানিকবাবু তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে, মাথা দুলিয়ে বেশ ভারিক্কিভাবে টিপ্পনি কেটে বলে উঠলেন, "—কেও কি কাকেও বাঁচাবার জন্য বিষ খাওয়ায় —না স্নেহান্ধ হয়ে কোন মা ভালবাসতে তার ছেলের মুখে বিষ ঢেলে দেয়?

হেসে উঠল সবাই হো হো করে। কিন্তু হঠাৎ বেশ জোর দিয়েই বলে উঠলেন ভূতনাথবাবু,—বলছি যা সব সত্যি কথা। এবং এসব কথা আমার কোন লোকের মুখে শোনা কথা নয়। আপনারই মৃত বড় মা অর্থাৎ ননী বলার সূক্ষ্ম সত্তার মুখে শোনা আমার এসব। মৃতাত্মারা কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। ইহলোকবাসীদের মত পরলোকবাসীরা কখনও কাকেও ধাপ্পাও দেন না। স্মরণ করে দেখুন আপনি। কারণ ছোট হলেও তখন আপনার জ্ঞান যথেষ্টই হয়েছিল। সত্যকে চাপা দেবার চেষ্টা না করে বলুন দেখি আপনি সেদিন হটকারিতায় হঠাৎ ভুলের বশে বড় মা আপনার মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে উঠেন নি,—"ও গো আমি কি সর্ব্বনাশ করলাম গো। নিজের হাতে ছেলেকে আমার বিষ খাওয়ালাম গো।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে কোলে নিয়ে ঘর ছেড়ে পাড়া, পাড়া ছেড়ে গ্রাম, গ্রামের অলি গলির সমস্ত ঘরে পাগলিনীর মত ছুটে বেরিয়ে লোকজন জড় করে আকুলি-বিকুলি করে অনুরোধ করে বেড়াননি তিনি?—'ওগো ছেলেকে আমার বাঁচিয়ে দাও গো। আমার মত মুখপুড়ি সব্বনাশীকে মেরে তোমবা আমার ছেলের জীবন যেমন করেই হোক ফিরিয়ে এনে দাও গো। শুধু তাই নয় সে পাগলিনী মা আপনার তার যেখানে যত লুকোনো ছুপানো জমানো নিজের টাকা-কড়ি, সোনার গহনা-গাটি ছিল সব বের করে, নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করে তুলে দিয়েছিল আপনার চিকিৎসার জন্য। সত্যি বলতে কি আপনার বড় মারই আন্তিক ইচ্ছায় নানা-ঠাকুরের থানে মাথা ঠুঁকে প্রার্থনা করার ফলেই ফিরে পেয়েছিলেন আপনি আপনার জীবন। আর আপনার বড় মা —অনুতাপ, অনুশোচনা ও নিজের প্রতি ধিৎকারে আপনার মুখে তুলে দেওয়া সেই অসমাপ্ত বিষ নিজের মুখে ঢেলে দিয়ে করলেন আত্মহত্যা। বিষের জ্বালায়, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতেও ভগবানের কাছে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন আপনার মঙ্গ ল, দীর্ঘজীবন, সুস্থদেহ, সবল মন। তারই অন্তিম ইচ্ছায় ও আশীর্বাদে এবং ঈশ্বরের কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনায় আপনি কল্যাণময় সুখী জীবন যাপন করছেন মানিকবাবু। রাগ অভিমান ত্যাগ করে সেই বড়-মার প্রতি আপনার তাই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

মানিকবাবু হলেন বাক্যহারা। কারণ কথাগুলো ভূতনাথ বাবুর, স্তম্ভিত, বিস্মিত ও হতচকিত করে দিল তাকে। কচিমনে দাগ কেটে বসে থাকা তার এসব ঘটনা মিথ্যা নয়। কি শক্তি ছিল যে ভূতনাথবাবুর ওই বলার মধ্যে কে জানে, বাল্যকালের অজ্ঞান মনের সে সব স্মৃতি কেমন যেন এক রূপ অর্থবহ রূপ নিয়ে প্রতিভাত হতে লাগল তার চেতন স্তরে। গুলিয়ে গেল তার ভূতনাথবাবুকে সকলের কাছে হেয় করার মনোভাব। শরিয়ে গেল তার অলৌকিকতার মুখোশ খুলে টিট্ করে তাকে বাহাদুরি নেবার ইচ্ছাটা। পরিবর্তে চোখ দুটো

তার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল ভূতনাথ বাবুর দিকে। এসব কথা তো কারো কাছে শোনা হতে পারে না তার। পারে না হতে কারো কাছে জেনে নিয়ে এসব তাকে কব্জা করার ধান্দা। এযে তার প্রত্যক্ষদর্শীর মত কথা। এসব ভূতনাথবাবু জানলেন কি করে? বড়-মার সম্বন্ধে বলা কথা তার ফালতু নয়, ধাপ্পা নয়, নয় একটুও বাড়িয়ে বলা বা বাজে বকা। কিন্তু এমন স্নেহময়ী, করুণাময়ী বড়-মা তার ও রূপ বিপরীত ধর্মী চরিত্রের হলেন কিকরে?

কারণ যা বলল ভূতনাথ তাতে বড় বেশী অবাক হতে হল মানিকবাবুকে। ক্ষণিক আচরণে মানুষের যেমন সম্পূর্ণ জীবনকে বিচার করা চলে না তেমনি এক জনমের হটকারিতায় তার সমগ্র সত্তাকেও বিচার করা ভুল। মানুষের জীবন-কর্মে থাকে পূর্বাপর জনমের সংস্কার। এ জনমে মানিকবাবু চারুলতা দেবীর সন্তান হলেও তিনি তার পূর্ব জীবনে ছিলেন ননীবালা দেবীরই পুত্র। সে জীবনে ননীবালা দেবী ছিলেন অত্যন্ত স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণচেতা মা। নিজের সন্তান ছাড়া পরের ছেলের ভাল-মন্দ তিনি বুঝতেন না। সকল সন্তানকে আপন সন্তান বলে গ্রহণ করার মত তার উদারতা ছিল না। মাতৃত্বের ও অবমাননার জন্যই এ জন্মে তিনি হন বন্ধ্যা। বংশ রক্ষার জন্য গোপালবাবু চারুলতাকে দ্বিতীয় বার করেন বিবাহ। ননীবালার ভগবানের কাছে ধূলিমুঠি কাপড়ের প্রার্থনায় গত জন্মের সন্তান মানিকবাবু আসেন চারুলতার কোলে। বড়মার দিকে টান তাই তার হয় প্রবল। গত জন্মের মায়ের আকর্ষণেই হয় সে বড়-মার অত্যন্ত প্রিয়, নেওটা, মনের মানিক হৃদয়ের ধন।

বড়মার স্নেহ আদরে হচ্ছিল মানিক বাবু বড় ভালভাবেই। হঠাৎ চারুলতার কানে ঢুকিয়ে দিল কে মন্ত্র— বন্ধ্যা নারীরা নাকি ডান হয়। ওদের চোখে নাকি বিষ থাকে। ডানে ছেলে খায়। বিষে তাদের লাট-পাট খায় ছেলেরা। আর যায় কোথা। গেঁয়ো মেয়ে চারুলতা, তাই সহজেই ওই কুসংস্কারটা কব্জা করে নিল তাকে। বদ-ধারনার বশে মানিককে করল তার বড়-মার কাছ ছাড়া। কিন্তু প্রাণের টান তো সহজে যাবার নয়। তাই লুকিয়ে, গোপনে, মানিককে নিয়ে কোলে জুড়াতে লাগল সে বুক, চুমু খেয়ে তার ভরাতে লাগল সে প্রাণ। উঠল ঝড়। কেলেঙ্কারির বন্যা বইয়ে দিতে লাগল চারুলতা সংসারটাতে। শান্ত রাখতে পরিবারটাকে শেষ পর্য্যন্ত পৃথক করে দিতে হল ননীবালাকে সংসার থেকে। দূরে খামার বাড়ীতে পড়ে ছিল যে পোড়ো ঘরটা—সে ঘরটাতেই আলাদা থাকতে বাধ্য করা হল তাকে। পৈ পৈ করে নিষেধ করে দেওয়া হল তাকে যেন এধারের বাড়ীতে সে না আসে। সাবধান করে দেওয়া হল তাকে যেন চারুলতার ছেলেকে সে আর স্নেহ-আদর না করে। কোলে নেওয়া তো দূরের কথা—কখনও যেন তার মুখ সে না দেখে। ভুলেও সে যদি কখনও তার ওই বাঁজা বিষ নজর দিয়ে মানিকের দিকে তাকায় তবে চোখ দুটো তার কানা করে দেওয়া হবে চিরকালের মত।

কিন্তু যতই বলা হোক—জন্মান্তরের টান, তার আত্মার আকর্ষণ, সহজে ছাড়তে পারে সে কি কখনও? মনিহারা ফণীর মত ছটফটকরতে লাগল ননীবালা। ওধারে মানিকেরও হল সেই দশা। বড়-মা অন্ত প্রাণ তার। তাই বড়-মাকে না দেখে থাকতে পারল না সে। দূর থেকে দেখেই একদিন ননীবালাকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল মানিক। আর যায় কোথা! সেই দোষে চারুলতা বড় সতীনকে তার শুধু গাল মন্দ করা নয়, ঝাঁটা মেরে তাকে রক্তারক্তি করে ছাড়ল। ছোট হয়ে বড়র গায়ে হাত তুলা! বেটার মা হয়েছে বলে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছে সে। স্বামী গোকুলবাবুকে বলতে যেতেই কথাটা হিতেহল বিপরীত তার। দিদি হয়ে দিদির মত না থাকলে মার, ঝাঁটা খাবে না তো কি সে লাড্ডু-রস-গোল্লা খাবে? সহ্য হল না ননীবালার। হয় ছোটর এ বাড় ভাঙ্গবে সে— না হয় নিজে মরবে বিষ খেয়ে। নিয়েও এল সে কতকটা ফলিডল। পাশের বাড়ী চাষী-বৌ-এর কাছ থেকে। কিন্তু এসে যুক্তি দিল তাকে পাড়ার এক মন্থরা, তুই মরলে কার বয়ে যাবে? বরং ভালই হবে চারুর। কারণ মরণটাই তো তোর চায় সে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বে তার। হাড়ে লাগবে বাতাস। পথের কাঁটা সরে গেলে স্বামী-পুত্র নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে সুখে ঘরকন্না করতে পারবে সে।

না, সেটা সহ্য হবে না ননীবালার। স্বামী, সংসার, পুত্র ছাড়া করেছে সে যখন তাকে তখন সে-ও দেবে না তাকে সুখে থাকতে। তার গায়ে হাত তুলার প্রতিশোধ সে নেবেই। যে গরবে গরবিনী সে, যার জন্য অহঙ্কারে তার মাটিতে পড়ছে না পা, ধরাকে করছে সরা জ্ঞান—তার দেমাক সে ভাঙ্গবেই নিজে মরার সঙ্গে মানিককেও মেরে—মা-বেটাতে দুজনে মিলে চলে যাবে স্বর্গে। সুখে থাকবে সেখানে তারা। বিষ দাঁত ভাঙ্গবে চারুর। উপযুক্ত শাস্তি হবে তার ছেলের অহঙ্কারে তার গায়ে হাত তোলার।

সুযোগ একদিন পেল ননীবালা। লুকিয়ে সেদিন কাছে আসতেই মানিক, তার দুষ্টু বুদ্ধিটা উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। ভাবল মানিকের মুখে ঢেলে দিয়েই বিষটা নিজে খাবে সে। তারপর চলে যাবে দুজনে একসঙ্গে পরলোকে। মা-বেটার দুটো মৃতদেহ দেখলেই এধারে স্বামীর সঙ্গে ছোটও পাবে তার আক্কেল সেলামী। ঢিলটি মারলে যে পাটকিলটি খেতে হয় বুঝবে তারা হাড়ে হাড়ে। কিন্তু যতই হোক মায়ের মন। সামান্য একটু ফলিডল মুখে দিতেই মানিক যখন উঠল ছটফট্ করে তখন ননীবালার সব প্ল্যান পরিকল্পনা গেল ভেস্তে,। নিজে মরবে কি ছেলেকে তার বাঁচাবার জন্য হয়ে উঠল সে উতলা। নিজের ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে বোকা ননীবালা কোলে নিয়ে মানিককে ছুটল সে ঘরের বাইরে। পাগলিনীর মত। ছেলেকে তার নিজের হাতে বিষ খাওয়ানোর কথা চিৎকার করে বলতে বলতে ছুটতে লাগল সে এ-গলি —ও গলি। তার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের ধন, সাধের দুলাল, মানিক চাঁদের জীবনের আশায়।

তারপরের ঘটনা সবই তো স্মৃতিতে আছে মানিক বাবুর। সুতরাং সেসব কথায় আর গেলেন না ভূতনাথ বাবু। নিশ্চুপ মানিকবাবুর চিন্তা—ভারাক্রান্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন তিনি, —শুনুন মানিকবাবু, বর্তমান জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন নয় বা বর্তমান জনমের মা-ই আমাদের একমাত্র জননী নন। কত মায়ের কোলে যে আমরা কতবার সন্তান হয়ে জন্মেছি তার কোন ঠিক নেই। জন্ম-জন্মান্তর এই ভাবেই তো আবর্তিত হতে হতে ক্রমশঃ পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলে আমাদের সত্তা। এই এগিয়ে যাওয়ার পথে কার আকর্ষণে কে যে কোথায় কার ছেলে হয়ে জন্মায় কেও তা বলতে পারে না। ননীবালার আত্মিক আকর্ষণেই তার বিগত জন্মের সন্তান আপনি গোকুল বাবুর বংশে এসেছেন মানিকবাবু রূপে। গত জন্মে সে তার মাতৃসত্ত্বাকে সংকীর্ণ ও স্বার্থপরতার পথে পরিচালিত করেছিল বলেই এ জন্মে বন্ধ্যা হয় সে। কিন্তু তার আত্মিকটান, আপনার প্রতি একনিষ্ঠ স্নেহ ভালবাসা ও মাতৃত্বের আকর্ষণ চারুলতা দেবীর গর্ভে এনে আপনাকে তার সান্নিধ্যে হাজির করে। মৃত্যুতে সত্ত্বা তার পূর্ব দেহ ত্যাগ করে জন্মের মাধ্যমে পুনরায় সে আবার নব কলেবর ধারন করে ঠিকই। কিন্তু হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলো—যথা প্রেম-প্রীতি, স্নেহ ভালবাসা সেসব কিন্তু বিলুপ্ত হয় না। মনের অবচেতন স্তরে সংগুপ্ত অবস্থায় জন্ম-জন্মান্তর সেগুলো বর্তমান থাকে। সেই জন্য আপনার প্রতি আপনার বড় মা'র, বড়মা-র প্রতি আপনার ছিল ওমনি প্রাণের টান, হৃদয়ের আকর্ষণ।

মানিকবাবু যেন হতভম্ব। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন তিনি ভূতনাথবাবুর কথাগুলো। বলতে লাগল ভূতনাথ, —আপনার সেই স্নেহ কাঙ্গালী অবোধ অজ্ঞান বোকা মায়ের আশীর্বাদ পুষ্ঠ আপনার এই বর্তমান জীবন। তারই আত্মিক কামনায় আপনি রোগমুক্ত সুস্থ দেহ ও সবল মন নিয়ে করছেন বিরাজ। মা তার ছেলের সব দোষ ক্ষমা করতে পারেন মানিকবাবু। কিন্তু ছেলে হয়ে আপনি পারবেন না মায়ের দোষ, ভুল-ত্রুটি সব ক্ষমা করতে?

—কি করতে হবে আমাকে?" গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন মানিকবাবু।

"—সত্তাকে তার উদ্ধার করতে হবে মানিকবাবু।" বলে উঠল ভূতনাথ—"আত্মহত্যা মহাপাপের ফলে বড় কষ্ট পাচ্ছে তার আত্মা। বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে পরলোকে। বিষে গলন্ত ফুঁটি-ফাটা পেট ও ঝুলন্ত ছেঁড়া নাড়ী ভুঁড়ি নিয়ে অবর্ণনীয় এক মারাত্মক যন্ত্রণা কাতর অবস্থায় আছে সে। তার প্রতি রাগে, ক্ষোভে দুঃখে ও ঘৃণায় গোকুলবাবু অর্থাৎ বাবা আপনার কোন ঔর্দ্ধদৈহিক কাজ পর্য্যন্ত করেন নি তার। ছেলে হলেও আপনাকে দিয়েও করান নি তিনি তার কোন পারলৌকিক ক্রিয়া কর্ম। এর ফলে কতদিন যে তার কর্মফলভোগ হবে তার কোন ঠিক নেই মানিক বাবু। বড় মার অর্থাৎ মায়ের আপনার সেই সমস্ত না-করা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকর্ম সমাধা করলে বড় উপকার করা হবে তার। তার উদ্দেশ্যে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে বর্তমান নরক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাবে সে, শান্তি পাবে তার আত্মা।

ভাবতে লাগলেন মানিকবাবু। পরলোকের কথাগুলো যাই হোক না কেন — ইহলোকের যে সমস্ত কথা বলে গেলেন ভূতনাথ বাবু তা কিন্তু সত্যি। গুল ঝাড়া যে নয়, তার মিথ্যা ধাপ্পা দিয়ে ঠকাবারও কোন রূপ মতলব যে নেই তার মধ্যে—মনে প্রাণে বিশ্বাস করলেন মানিকবাবু। ভূতনাথবাবুর উপর তার পাল্টে গেল ধারনাটা। তার প্রতি কুণ্ঠা দ্বিধা, সন্দেহ অবিশ্বাস যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন তিনি মনে, তা যেন কোথায় গেল

তার মিলিয়ে। এক কথায় যে ভূতনাথকে ভূত বানাতে এসেছিলেন তিনি কারখানায় তার কথায় নিজেই হয়ে গেলেন তিনি অভিভূত। সেই অভিভূতের স্বরেই বলে উঠলেন তিনি ভূতনাথকে, — যা বললেন আপনি তা করলে যদি আমার মায়ের আত্মার শান্তি হয়। হয় মুক্তি যদি আমার বড়-মার সত্তার, উদ্ধার পান যদি তিনি তার আত্মহত্যা মহাপাপের দণ্ডভোগ থেকে তবে নিশ্চয়ই আমি করব সে কাজ।

অর্থাৎ ভূতনাথবাবুকে কথা দিলেন মানিকবাবু যে বড়-মার তার কুশ পুত্তলিকা দাহন করে অসমাপ্ত শেষ কৃত্য অগ্নিসংস্কার থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করবে সে। করবে সে তার শ্রাদ্ধ-শান্তি তর্পণাদি ইত্যাদি সমস্ত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, শ্রদ্ধা ভরে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে। এমনকি প্রেতমুক্তির জন্য ভূতনাথবাবুর কথামত গয়ায় গিয়ে শ্রী বিষ্ণুপাদ পদ্মে তার বড়-মার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দানও করে আসবে সে।

বড় তৃপ্তি পেলেন ভূতনাথবাবু মানিকবাবুর দেওয়া কথায়। আবেগ ভরে জড়িয়ে তার হাতদুটো বলে উঠলেন তিনি, —সূক্ষ্মে আপনার বড়-মাকে আমার দিয়ে আসার কথার সম্মান রক্ষা করে সত্যিই আমাকে কৃতজ্ঞ করলেন মানিকবাবু। মনে বড় আনন্দ পেলাম আমি আপনার কথায়। আনন্দ আপনাকেও ভর করে থাকবে চিরকাল আপনার সেই পরলোকগতা অনাথা মায়ের আশীর্বাদে। তার আত্মার শান্তিতে শান্তিময় হয়ে উঠবে আপনার জীবন। তার সত্তার উদ্ধারে জীবনের সমুদয় বিপদ-আপদ বিপর্যয় থেকে উদ্ধার পাবেন আপনি। আমি বলছি, সূক্ষ্মে আপনার মায়ের মুখের মুক্তির হাসি—হাসি ছড়াবে আপনার জীবনে।

ভূতনাথের হঠাৎ এসব অহেতুক আন্দোচ্ছাসের কারণ যেমনি কেও খুঁজে পেল না তেমনি তার এসব ভাবাবেগপূর্ণ ভাষনেরও কোন মাথা মুণ্ডু কেও বুঝতে পারল না। তবে যার পর নাই বিস্মিত হয়ে গেল তারা মানিক চাঁদের মতির পরিবর্তন দেখে। কোন্ যাদুর খেলায়, কি মন্ত্র বলে এমন রগচটা ধূরন্ধর তুখোড় লোকটাকে যে শান্ত সুশীল সুবোধ বালকে পরিণত করে দিল ভূতনাথ কে জানে। কে জানে কোন সম্মোহনী শক্তিতে কেমন সিংহের বেটা বাঘকে সে বশ মানিয়ে করল তার কুকুরে পরিণত। সত্যিই বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেল সবাই ভূতনাথের সব অদ্ভুত শক্তি দেখে। লোকটা কে? লোকটা কি?

কি যে লোকটা, কে যে লোকটা —এসব বিস্ময়ের সীমা ছাড়া করে দিল ভূতনাথ একদিন সমগ্র অঞ্চলটাকে। এদ্দিন তার চলছিল যা তা ছিল সব ব্যক্তিগত ব্যাপার, ভাবের বিষয়। কিন্তু সেদিন যা কাণ্ড করল সে তা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে এল সমষ্টিতে। পরোক্ষভাবে নয়—প্রত্যক্ষ ভাবে এবং ভাবে ভাষায় নয় চোখের দেখায়।

আগেই বলা হয়েছে পাশের গ্রাম পাথরমুড়িতে ছিল ভূতনাথের গ্রাম ভূতগ্রামের এক মেয়ে। অর্থাৎ উজ্জ্বলার ছিল শ্বশুর বাড়ী। সে উজ্জ্বলার 'গঙ্গাজলের' অর্থাৎ সতী-সই এর স্বামী ভূতনাথ। সে ভূতনাথ আসবে না উজ্জ্বলার বাড়ী—তাই কখনও হয়? ভৈরব থানে দেখা হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকদিন তার আশার আশায় দিন কাটাল উজ্জ্বলা। এল না যখন তখন স্বামীকে পাঠাল তার দূত হিসাবে। তাতেও যখন আসবার ফুরসৎ হল না ভূতুদা'র তখন স্বামীর সঙ্গে নিজেই সে একদিন এসে হাজির হল কারখানায়। ধরল ভূতনাথের হাত, টানতে লাগল হিড় হিড় করে। কোন কথা নয়। কোন ওজর আপত্তি নয়। শুনবে না উজ্জ্বলা কারো কথা। ভূতুদা'কে তার বাড়ী যেতেই হবে এবং এক্ষুনিই তার সঙ্গেই। নাছোড়বান্দা উজ্জ্বলা, তাছাড়া সতীত্ব জোরে জোর তার। তাই তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাবার অধিকার উজ্জ্বলার আছে। আছে বলেই আর তার দাবী ঠেলে ফেলে দিতে পারল না ভূতনাথ। উপরোধে ঢেঁকি গিলতে, অনুরোধ রক্ষায় উজ্জ্বলার গেল সে পাশের গ্রাম পাথরমুড়ি।

পাথরমুড়ির মাঝ পাড়াতে ছিল উজ্জ্বলার শ্বশুর বাড়ী। তার শ্বশুর বাড়ীর সামনেই ছিল রাধাগোবিন্দজীর মন্দির। সে মন্দিরটার পোড়ো, জীর্ণ অবস্থা দেখে বলে উঠল ভূতনাথ উজ্জ্বলার স্বামী প্রবীরবাবুকেই, আপনাদের গ্রামের যখন একমাত্র দেবস্থান এটা এবং এর চত্বরেই এখানের বিখ্যাত উৎসব হয় যখন দোলযাত্রা তখন আপনাদের এই মন্দিরটার এমন দশা কেন?

"—হবে না কেন বলুন'। বলে উঠলেন প্রবীরবাবু—ঠাকুরের যেমন মুরোদ তেমনি দশা হবে না তো আর কি হবে?"

"—মুরোদ মানে? জিজ্ঞেস করতেই ভূতনাথ শুরু করলেন প্রবীরবাবু বলতে এ মন্দিরের এক গহনা

চুরির ইতিহাস। সে ইতিহাস শেষ করে বলে উঠলেন তিনি, — আপনিই বলুন, পূজক ঠাকুর করলেন গহনা চুরী, পূজোর সময়, বিগ্রহের সামনেই। অথচ রাধা গোবিন্দজী হয়ে রইলেন ঠুটো জগন্নাথ। সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েও অদ্যাবধি সে গহনার আর কোন হদিশ পাওয়া গেল না। সেই পূজক-চোর গোবিন্দ গোসাইকে এ মন্দিরের রাধা গোবিন্দজী সেদিন যদি হাতে নাতে ধরিয়ে দিতেন তাহলে তার এ মন্দিরের আজ কি এমন দশা হত? না জাগ্রত দেবতা বলে অতীতের তার খ্যাতি এমনভাবে আজ লোপ হতে বসত?

"—আজে বাজে কথা বলো না তো তুমি।" ধমকে বলে উঠল উজ্জ্বলা তার স্বামীকে, —ঠাকুর আমাদের জাগ্রত দেবতা না হলে কি গোবিন্দ গোঁসাই ওমনিভাবে ধরা পড়তো। সমস্ত গহনাই ঠাকুরের উদ্ধার হত যদি পুলিশের তাড়ায় লোকটা ছুটতে গিয়ে ওভাবে রাস্তায় ট্রাকে চাপা পড়ে না মারা যেত। রাধা গোবিন্দজী তার পূজক ঠাকুর গোবিন্দ গোঁসাইকে হাতে-নাতে এভাবে তার চুরি করার সাজা দিলেন আর তুমি বলছ আমাদের ঠাকুরের মুরোদ নেই? তিনি জাগ্রত দেবতা নন?

—ফালতু ওভাবে শাস্তি পেয়ে লাভটা কি হল শুনি? বলে উঠলেন, প্রবীরবাবু, —ঠাকুর তাকে চাকার তলায় ফেললেন, না সে নিজেই মান সম্মান রক্ষার জন্য ট্রাকের চাকার তলায় পড়ে আত্মহত্যা করল কে জানে। আসলে ঠাকুরের গহনাগুলো তো উদ্ধার হল না। চিরকালের মত খোয়া গেল। এর চেয়ে ঠাকুর যদি সেদিন হাতে নাতে গোবিন্দ গোসাইকে মন্দিরের মধ্যে তার সামনেই ধরিয়ে দিতেন তবেই বুঝতাম তিনি জাগ্রত দেবতা। ওসব মুরোদহীন সব ঠাকুরেরই মন্দিরের দশা এমন হয়।

"— খবরদার বলছি, আমাদের রাধা গোবিন্দজীর সম্বন্ধে তুমি এমন খারাপ কথা বলবে না" ধমকে উঠল উজ্জ্বলা, —" দেখছো ভূতুদা লোকটার কেমন কথার ছিরি। ঠাকুরের মুরোদের কথা তুমি বলছো, কিন্তু তোমার আক্কেলটা কি শুনি? মরে যাওয়া লোক গোবিন্দ গোঁসাই এর নাম ধরে—

"—থাম দেখি তোরা।" বলেই ভূতনাথ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল মন্দিরটার দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবতে লাগল সে। তারপর পরম কৌতূহলে চিন্তাভারাক্রান্তস্বরে জিজ্ঞেস করে উঠল সে উজ্জ্বলাকে,
— কি নামটা বললি — গোবিন্দ গোঁসাই?

—হ্যাঁ ভূতুদা।

—এই মন্দিরেরই পূজক ঠাকুর ছিল সে?

—হ্যাঁ ভূতুদা।

—ছিল সে এই পাথরমুড়ি গ্রামেরই বাসিন্দা?

"—হ্যাঁ, কিন্তু কেন?" বলে উঠল উজ্জ্বলা, —তার সম্বন্ধে এত জানার কি আছে?

"—আছে আছে। সব কথা খুলে একটু বল দেখি তোরা তার।" বলে উঠল ভূতনাথ,

"—মিলিয়ে একবার দেখে নি আমি। তাহলে এই গ্রামেরই নামপাড়ায় ছিল তার বাড়ী। চেহারাটা ছিল তার একটু বেঁটে ধরনের। নাকটা ছিল তার একটু চেপ্টা। আর তার বাম চোখের নীচে ছিল সামান্য ঝুলন্ত একটা আঁচিল। গোঁসাই-এর ঠোঁটটা ছিল একটু থ্যাবড়া, মানে দ্বিধা বিভক্ত। আর গায়ের রংটা ছিল তার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কি তাই না? ঠিক বলছি তো প্রবীরবাবু?

প্রবীরবাবু উত্তর দিবেন কি —বিবরণ শুনেই সে ভ্যাবাচেকা। আক্কেল গুড়ুম তার। কথাগুলো সব সত্যি। আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে তাই জিজ্ঞেস করে উঠল সে ভূতনাথকে, —আপনি এসব কথা জানলেন কি করে দাদা?

"হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার।" বলে উঠল ভূতনাথ।

"—কি কথা ভূতুদা? কৌতূহলী হয়ে ওমনি তাকে জিজ্ঞেস করে উঠল উজ্জ্বলা, — কি মনে পড়ল তোমার?

উজ্জ্বলার সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রবীরবাবুর অবাক হওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল ভূতনাথ, —তোমাদের ওই গোবিন্দ গোঁসাই-এর বাড়ীটা একবার আমায় দেখিয়ে দেবে চল তো ভাই।

"—বাড়ী থাকলে তো তার গিয়ে দেখবেন।" বলে উঠলেন প্রবীরবাবু।

"—তার মানে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ।

"—সে অনেক কথা দাদা।" বলেই শুরু করলেন প্রবীর কুমার, "—শোনা যায় নাকি চৌরাস্তার মোড়ে ট্রাক-চাপা মৃত গোবিন্দ গোঁসাই এর কাছে ঠাকুরের গহনা-গাটি না পেয়ে গাঁয়ের লোক সব এসে হাজির হয় গোঁসাই ঠাকুরের ঘরে। কিন্তু চোরের বৌ বাটপাড়। এমন ধুরন্ধর মেয়েটা যে গহনা বের করে দেবে কি বেমালুম সে উড়িয়ে দিতে চাইল তার স্বামীর গহনা চুরির ব্যাপারটাই। ক্ষেপে গেল গাঁয়ের লোক। ঘর সার্চ করতে চাই তারা। কিন্তু এমন ধড়িবাজ গোঁসাই গিন্নি যে গলার দাপটে তাদের ঢুকতে দিতে চাইল না ঘরে। শেষে মহা কেলেঙ্কারি। জোর করে গোঁসাই গিন্নিকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে গ্রামের সবাই তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল তার ঘর। ঘরের বাক্স-পেটরা থেকে আরম্ভ করে হাঁড়ি কুঁড়ি টোঁকা-পেছে কিছুই বাদ দিল না তারা। এমন কি উপরের ঘরের চালার ছাদনের খড় পর্য্যন্ত তেড়ে ফুঁড়ে করল তারা তছনছ। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না ঠাকুরের গহনা গুলো। গোঁসাই গিন্নিকে ঘর ছাড়া করার পর আর নাকি তিনি ঘরে ঢুকেন নি। চলে যান বাপের বাড়ী। চিরকালের মত। টিপা হয়ে যায় গোঁসাই বাড়ীর ঘর ভিটেটা। এখন সে ভিটায় ঘুঘু চরে।"

"—সেই ঘুঘু চরা গোঁসাই ঠাকুরের ঘর-ভিটাতেই যাব আমি।" বলে উঠল ভূতনাথ—আমাকে একটা গাঁইতি, শাবল ও একটা কোদাল এনে দাও তো দেখি।

"—এসব নিয়ে তুমি কি করবে? জিজ্ঞেস করে উঠল উজ্জ্বলা।

"—তুই এইমাত্র জিজ্ঞেস করছিলি না যে কি মনে পড়ল আমার?" বলে উঠল ভূতনাথ—"সেই মনে পড়াটা একবার পরখ করে দেখতে যাব আমি গোঁসাই এর ঘর টিপায়। খুঁড়ে যদি দেখি সব সত্যি—"তাহলে এনে তোদের দেখাব কি মনে পড়েছিল আমার। কই প্রবীরবাবু, দাও না এনে একটা কোদাল ও আর একটা গাঁইতি।"

"—ওসব ক্ষেপামি এখন রাখ দেখি তুমি।" শাসনের সুরে বলে উঠল উজ্জ্বলা—আগে বাড়ী চল আমাদের। ঐ তো মন্দিরটার পিছনেই আমাদের বাড়ী। ঘরে গিয়ে আমাদের আগে নাওয়া-খাওয়া করবে তুমি। তারপর দিবে একটা লম্বা ঘুম। মধ্যাহ্নের ঘুম সেরে তারপর তুমি তোমার ভগ্নীপোতকে নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের মত যেখানে পার লঙ্কা-কাণ্ড করতে যাবে। আমি কিচ্ছু বলব না। কিন্তু এখন ওসব চলবে না।

"—না উজ্জ্বলা, বাধা দিসনে।" বলে উঠল ভূতনাথ,—পড়েছে যখন মনে তার কথা আর এসেও যখন পড়েছি তার স্থানে তখন আগেই আমাকে করতে হবে তার কাজ। দেখতেই হবে আমাকে যাচাই করে, বলেছিল যা সে আমাকে তা ঠিক কিনা। সত্যি কিনা।

—কার কথা বলছ তুমি ভূতুদা? জিজ্ঞেস করে উঠল উজ্জ্বলা।

—কি কথা বলছেন আপনি? প্রশ্ন করে উঠল প্রবীর।

—আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

—আমারও তো কিছু মাথায় আসছে না।

"—তোদের কারো কিছু বুঝবার বা মাথায় আসবার দরকার নেই—গম্ভীর হয়ে বলে উঠল ভূতনাথ, এখন যা বলছি শোন। নইলে কারখানায় ফিরে গিয়ে আনতে হবে আমার গাঁইতি-কোদাল। বুঝলি?

বুঝা-বুঝির আর দরকার নেই। কারণ চোখের সামনে উঠল ভেসে উজ্জ্বলার গ্রামে দেখা ভূতুদার সেই একরোখা চেহারাটা। স্বভাবটা তো তার ভালভাবেই জানে উজ্জ্বলা। গোঁ ধরলে একবার আর রক্ষে নেই। বলবে যা, করবেও তা। ঝোঁকের মাথায় বাধা দিতে গেলে তাকে, হিতে হবে বিপরীত। ঘরের সামনে এসে ফিরে গেলে একবার আর হয়তো সে এ মুখো হবে না। বহু সাধ্য সাধনা করে এনেছে যখন তাকে তখন আর হাত ছাড়া করা চলবে না। তাই কথার উপর ভূতুদার আর কোন কথা বলল না উজ্জ্বলা। দমন করল নিজের কৌতূহলটা। স্বামী প্রবীর কুমারকেও ইসারা-ইঙ্গিতে করে দিল নিষেধ যেন চণ্ড-চড়া ভূতুদা'র কথার উপর আর কোন কথা না বলে বা কোন ওজর-আপত্তি না করে। চোখ টিপে তাকে চাপা ধমকে বলে উঠল উজ্জ্বলা, —হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? ভূতুদা কি বলল শুনতে পাচ্ছো না? চট করে আমাদের সিঁড়ির নীচের চোরা-কুঠরী থেকে গাইতি, কোদাল, শাবল ইত্যাদি নিয়ে এসে যাও ভূতুদার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি ফিরে না এলে নাইতে খেতে বেলা হয়ে যাবে না?

স্ত্রীর ইঙ্গিতে চট্ জলদি কোদাল, গাঁইতি নিয়ে হাজির হল প্রবীরবাবু। চলল ভূতনাথকে সঙ্গে করে গাঁয়ের কুলি কুলি, সেই গোঁসাই পাড়া। গোবিন্দ ঠাকুরের ঘর টিপাটা দেখাতে। উজ্জ্বলা ভূতুদা'কে তার তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার জন্য বাড়ীতে বলে উঠল, —অতিথি নারায়ণের সেবা না হওয়া পর্য্যন্ত ঘর গৃহস্থের কেও মুখে কুটোটি পর্যন্ত কাটবে না, কিন্তু মনে থাকে যেন।

প্রবীরবাবুর পিছু পিছু হাজির হল ভূতনাথ প্রায় গ্রাম ছাড়িয়ে বামুন পাড়ার শেষপ্রান্তে। ঠাকুর মশায়ের ঘর টিপাতে। সত্যিই বাড়ীটার ঘুঘু-চরার মতই দশা। প্রাচীরের নাম গন্ধ নেই। পরিবর্ত্তে আঁকড় আকন্দ, বোয়ান বাসক ইত্যাদি না না ঝোপ ঝাড় ঘিরে রেখেছে তার চৌহদ্দিটা। বেড়ের ভিতর এধার-ওধার ঘরগুলো তাদের ভাঙা-পড়া জলে ধ্বসা গলা ও ক্ষয় হয়ে যাওয়া দেওয়ালগুলো নিয়ে কোনরকমে সামান্য একটু উঁচু হয়ে ধরে রেখেছে তাদের অস্তিত্ব। বজায় রেখেছে তাদের স্মৃতি। মেঝের উপর তাদের নানা গাছগাছালি হরেক রকম লতা পাতার ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে করছে বেপরোয়া রাজত্ব। তাদের সেই রাজত্বের মধ্যেই দেওয়ালের চিহ্ন ধরে বহু কষ্টে প্রায় হাতড়ে খুঁজে বের করার মত খুঁজে বের করা হল গোঁসাই ঠাকুরের রান্না ঘরটা। তারপর সেই রান্না ঘরের ঈশান কোণ ধরে মারা হল গাঁইটির চোট। বার কতক কোপাতেই উঠল ঠঙ ঠঙ আওয়াজ। সেই আওয়াজ ধরে কোদাল নিয়ে সেখানের মাটি সরাতেই নজরে পড়ল একটা কাঁসার ছোট কলসী। সে কলসী উপরে উঠিয়ে উবুড় করতেই দেখা গেল সূক্ষে বলা সেই গোবিন্দ গোঁসাই এর প্রেত্মাতার একটা কথাও মিথ্যা নয়। কারণ দিব্যি তার মধ্যে থেকে পড়তে লাগল সোনার ধড়া, চূড়া, মুকুট, বালা, চুড়ি টায়রা, তাবিজ, চন্দ্রহার অর্থাৎ পাথরমুড়ির মন্দির দেবতা রাধা-গোবিন্দজীর বহুকাল আগে চুরি যাওয়া গায়ের গহনাগুলো।

কি আশ্চর্য্য। এ স্বপ্ন দেখছে প্রবীরবাবু, না দেখছে যাদুর খেলা। কিছুক্ষণ তো কোন কিছুর ঘেরই পেল না সে খুঁজে। দেখেই তো তার চক্ষু চড়কগাছ। বিস্ময় বিমূঢ়ভাবে হতভম্বের মত সেগুলোর দিয়ে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে কাট-পুতুলটার মত। তারপর সেগুলো তাকে নেড়ে-চেড়ে দেখিয়ে ভূতনাথ যখন সম্বিত্ ফেরাল তার তখন আর এক দণ্ডও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না প্রবীরবাবু। ছুটলেন তিনি বাড়ীর দিকে মুখ করে। তার ভূতুদা'র এত বড় একটা তাজ্জব ব্যাপার, অসম্ভব কাণ্ড উজ্জ্বলাকে প্রথমেই না বলে কি থাকা যায়?

শুনতেই শুধু উজ্জ্বলা নয়—দেখতে দেখতে পাথরমুড়ির গ্রাম ভেঙ্গে ছুটে এল সব ছেলে বুড়ো কুঁড়ি-বুড়ীর দল। সব কাজ ফেলে রেখে হন্ত দন্ত হয়ে। সে এক হৈ হৈ ব্যাপার—রৈ রৈ কাণ্ড। মৃত গোঁসাই এর আগাছা ভরা বাড়ীটা মুহূর্ত্তে গেল লোকজনে ভর্ত্তি হয়ে। শুধু তাই নয় খবরটা হাওয়ার মত চটজলদি গেল চারিদিকে ছড়িয়ে। নিমেষে সেট। কেবল মাত্র গ্রামে গ্রামে নয় গ্রাম ছেড়ে অঞ্চলে, অঞ্চল ছেড়ে তল্লাটে, তল্লাট থেকে মুলুকে গেল রাষ্ট্র হয়ে। অবাক সবাই। এরূপ অসম্ভব সম্ভব হল কি করে? কে করল এ কাজ? এমন অলৌকিক শক্তিধর মহাপুরুষটি কে? পলকে সবাই পুলকিত অন্তরে ভিড় জমাতে এল ছুটে গোবিন্দ গোঁসাই-এর ভিটেতে।

এসে যখন দেখল সবাই সেই চুরি যাওয়া গহনাগুলোর মাঝে ধীর গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এই অবাক কান্ডের কান্ডারী ভূতনাথ অর্থাৎ সেই ডাঙ্গাল্যা বাবার থানে উঠা গুজবের সেই মহাপুরুষ, তখন সকলের চক্ষু হল ছানাবড়া। লোকটা দেবতা না মানুষ। ভৈরববাবা না রাধা-গোবিন্দ! কোন ঈশ্বরাদিষ্ট দূত না পীর-পয়গম্বর। ভেবে কেও কুলকিনারা পেল না তার। হঠাৎ এল বাঁধ ভাঙ্গা যেন ভক্তির বন্যা। চোখের জলে কেও হল ভাবে গদ গদ, ঠাকুর ভেবে ভূতনাথের কেও পড়তে লাগল পায়ে লুটিয়ে। কেও বা কেঁদে আকুল হয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল তার চরণ যুগল। কি মুস্কিল। এ অবস্থায় ছুটে পালাবারও পথ নেই ভূতনাথের, সরে দাঁড়াবারও নেই উপায়। চক্রব্যূহের চারদিকে তার নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা। বুড়ো-বুড়ীরা পর্য্যন্ত চারধার থেকে ঘিরে তাকে গলবস্ত্র হয়ে হাটুমুড়ে বসে করতে লাগল নানা নিবেদন।

সকলের মাঝে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বার বার মিনতি করে বলতে লাগল ভূতনাথ, —আমি দেবতাও নই, দেবদূতও নই। নই আমি বাবা ভৈরবনাথ বা রাধা-গোবিন্দজী। এমন কি কোন দেব-বিগ্রহের পায়ের ধুলোও নই আমি। আমি মানুষ, মানুষ হয়ে আমি আর এক মানুষের অন্তরাত্মার কথা শুনেছি এই যা। সেই থেকে

আমি বুঝেছি মানুষ মাত্রই সৎ। চুরি-ডাকাতি বা যে কোন ধরনের অন্যায় বা অধর্মের কাজ সে কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি রিপুর বশে করে থাকুক না কেন তার মনুষ্যত্ব অর্থাৎ অন্তরের সৎভাব কিন্তু বিলুপ্ত হয় না কখনও। বেঁচে থাকতে এ ভাব যেমন বিবেকরূপে মানুষকে অনুতাপ ও অনুশোচনার মাধ্যমে তাকে তার সৎ বৈশিষ্টে আসীন রাখার চেষ্টা করে—মৃত্যুর পরও তেমনি সেভাব তাকে সেই সৎ-এর দিকেই আকর্ষণ করে রাখে। মোট কথা জন্ম-জীবন-মৃত্যু অর্থাৎ ইহলোক পরলোক যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন সে—সৎসত্তার বিনাশ নেই। তার অন্তর নিহিত গুণ বৈশিষ্টের লয় নেই, নেই ক্ষয়। তা বিলুপ্ত হয় না কখনও। গোবিন্দ গোঁসাই-এর সৎভাবের তাই বিনাশ হয়নি। তাঁরই বলা কথার উপর নির্ভর করে আমি এ কাজ করেছি। বেঁচে থাকতে তিনি তার জীবনের যে ভুল শোধরাবার অবকাশ পান নি, মৃত্যুর পর সেটাই তিনি আমার মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। সূক্ষ্মরূপে তিনি তার জীবনের সমস্ত অপকর্মের কথা প্রকাশ করে তার হয়ে একাজটুকু করতে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমি তার অনুরোধ রক্ষা করলাম মাত্র। এতে আমার কোন বাহাদুরি বা কৃতিত্ব নেই। কথা শুনে ভূতনাথের, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সবাই তার মুখটার দিকে বাক্যহারা হয়ে। তেমনি আবার হাত জোড় করে বলে উঠল ভূতনাথ, মিনতির সুরে, —এবার আমার একটি অনুরোধ আছে আপনাদের কাছে। অনুগ্রহ করে এ অনুরোধ যদি রক্ষা করেন আপনারা তবে আমি ধন্য হই।

নির্বাক মুখগুলো ওমনি সবাক হয়ে উঠল এক সঙ্গে, —বলুন, বলুন।

বলতে লাগল ভূতনাথ, —কথায় আছে মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। মানুষ মাত্রই ভুল করে। মানুষের সে ভুল তো আবার মানুষই ক্ষমা করে। ক্ষমা হল মানুষের বড় গুণ। অপরকে পাপ-পঙ্ক থেকে উদ্ধার করা হল মানুষের মহান ধর্ম। সে গুণ থেকে আমারা বঞ্চিত হব কেন? হব কেন আমরা সে মনুষ্য-ধর্ম থেকে বিচ্যুত। চলুন, সকলে মিলে আমরা রাধা-গোবিন্দজীর উদ্ধার করা গহনা পবিত্র দেহে, মনে, প্রাণে আবার সেই রাধা-গোবিন্দের শ্রীবিগ্রহে পরিয়ে দিই। শুদ্ধ সত্বভাবে অর্থাৎ মনে কোন পাপ—অভিমান, ঈর্ষা, হিংসা বা ক্ষোভ না রেখে সেই ভগবানের কাছে সকলে মিলে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের পরলোকগত গোবিন্দ গোঁসাই-এর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন। পাপ-পঙ্ক থেকে উদ্ধার করেন তাকে। শান্তি দেন তার সত্তার। মুক্তি দেন তার আত্মার।

সত্যিই একটা দেখবার মত কাজ হল সেদিন পাথরমুড়ির গ্রামদেবতা রাধা-গোবিন্দ মন্দিরে। বহুদিনের হারানো গহনা দেব-বিগ্রহের গায়ে উঠল জ্বল জ্বল করে। গম গম করে উঠল মন্দির প্রাঙ্গন। ভূতনাথের সঙ্গে গ্রামের ছেলে থেকে বুড়ো পর্য্যন্ত প্রায় সকলে স্নান সেরে শুদ্ধ দেহে, শুচি বস্ত্রে ভীড় জমাল এসে সমগ্র মন্দির চত্বরে। পুরোহিতের পূজোর পর বহুদিন বাদে খোল-করতালের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের আবেগ জড়িত ভক্তিপ্লুত আরতির গান ও প্রার্থনা সঙ্গীত মুখরিত করে তুলল মন্দিরের আকাশ-বাতাস সহ সমস্ত গ্রামটাকে। পূত-পবিত্র মনের ভাবের বিভায় স্বর্গ যেন নেমে এল মাটির পৃথিবীতে।

চাউর হয়ে গেল চারিদিকে যে পাথর মুড়ির জাগ্রত দেবতা আবার জেগে উঠেছেন। আর তাকে জাগিয়েছেন যিনি সেই ভূতনাথের নামটাও প্রচার হয়ে গেল তার সঙ্গে জাগ্রত দেবতার প্রতিনিধি হিসাবে। সেই প্রতিনিধির মাধ্যমে পাথরমুড়ি আবার মেতে উঠতে চাইল তাদের ঠাকুরের অতীতঐতিহ্য ফিরিয়ে আনবার জন্য। শুধু আগেকার মত বিশেষ তিথি-নক্ষত্রের যোগে পূজা-পাঠ বা পূর্ণিমা উৎসবের জমক ধরে নয়, নিত্যপূজার জমক ধরেও এ দেব মন্দির যেন সেই পূর্বের মত সকলের আকর্ষণীয় হয়ে উঠে তার জন্য যেন উঠে পড়ে লাগতে চাইল সবাই। ভাবল সকলে অতীতের মত এ মন্দিরকে এ মুলুকের মধ্যমনি, শিরোমনি করবার জন্যই বোধ হয় ভগবান ভূতনাথের মত এমন মানুষকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এটা যেন তাদের গ্রাম দেবতার পুনরায় প্রকাশ হওয়ার, বিকাশ হওয়ারই ইঙ্গিত। এ ইঙ্গিতকে ব্যর্থ হতে দেবে না তারা। ভূতনাথবাবুকে ধরেই তারা আনবে ফিরিয়ে এ.দেবতার পুরানো দিনের দোলযাত্রার জমক, রাস-যাত্রার জৌলুস।

কিন্তু মন্দিরটা? যাকে কেন্দ্র করে হারিয়ে যাওয়া সেসব স্মৃতি তারা করবে বাস্তবায়িত তার এই জরা-জীর্ণ, হাড় বেরুনো দশা দেখে অর্থাৎ দেব স্থানটার পলস্তরা ছাড়ানো রূপ, ফাটা দেওয়াল, ভাঙ্গা চূড়ো, চাঁছা ছুলো অবস্থা দেখে হাসবে না সবাই? জাক-জমকের মাঝে নগ্ন ভঙ্গ মন্দিরটা ভেংচি কাটবে না তাদের? তাহলে উপায়?

উপায় একটাই। মন্দিরটা-মেরামত করা। কিন্তু সে যে বহু টাকার খরচ। পাথরমুড়ির সমস্ত পাতা উল্টালেও এমন হিম্মতদার পুরুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও যে টেঁক থেকে টাকা খসিয়ে টাকটা ঢাকাবে এই দেবস্থানটার। চিন্তায় পড়ল গ্রামের সবাই।

কিন্তু ঈশ্বর যে কাকে দিয়ে কি কাজ করান তা তিনিই জানেন। পাথর মুড়ির রাধা গোবিন্দজীর হারিয়ে যাওয়া গহনাগুলোর ফিরে পাওয়ার ইতিহাসটা কানে গেছল নদীর ও পারের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম পলাসডাঙ্গার স্বর্গত ধনী প্রহ্লাদ পরামানিকের বিধবা পত্নী শ্রীমতি প্রমীলা দেবীর কানে। হঠাৎ একদিন এলেন তিনি পাথরমুড়ি। সেখানের মন্দির দেবতা শ্রীরাধা গোবিন্দজীকে দর্শন করতে। দেব-বিগ্রহের সঙ্গে তিনি তাঁর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র মন্দিরটাও দেখলেন। দেখে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল তার। মন্দিরটা মেরামতের কথা বললেন তিনি। বলা মানেই যে তাঁর নিজে করার ইচ্ছা প্রকাশ করা, এটা পাথরমুড়ির জানত কয়েকজন মালিক-মুখ্যা মাতব্বর শ্রেণীর লোক। এর সঙ্গে জানত তারা প্রমীলা দেবীর একটা দুর্ব্বলতার কথা। সেটা হল নাকি তার জন্যেই স্বামী তার অর্থাৎ প্রহ্লাদ পরামানিক মরেছিল গলায় দড়ি দিয়ে। এ অঞ্চলের একজন নাম করা ধনবান ব্যক্তি ছিল সে। ধনের নেশা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল জীবনে যে এ পথে সে অন্যায়, অধর্ম বা অপকর্মের কোনদিন পরোয়া করত না। কিন্তু ধনী হলে কি হবে, সুখ পায়নি সে জীবনে। অশান্তির তাব কারণ নাকি ছিল তার এই ধর্ম-পত্নী প্রমীলা। শেষে টাল সামলাতে আর না পেরে প্রমীলার জ্বালাতেই সে করেছিল আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা মহাপাপ জানত প্রমীলা। ধারনা হয়েছিল তার যে দান-ধ্যান, সেবা কর্ম, পুণ্য-ধর্ম করলেই বুঝি সে মহাপাপ থেকে উদ্ধার হবে তার স্বামীর আত্মা, মুক্ত হবে সে। তাই স্বামীর রেখে যাওয়া ধন দৌলত মঠ-আশ্রমে দান করে, মন্দির মণ্ডপ মেরামত করে ব্যয় করতেন তিনি। করতেন নানা তীর্থ-ধর্ম, সেখানে নানা সাধু-সন্তকে দান ইত্যাদি। উদ্দেশ্য অবশ্য একটাই তার স্বামীর আত্মার কল্যাণ। অপমৃত্যুর পাপ থকে তার পতির সত্তার মুক্তি। এই দুর্ব্বলতার সূত্র ধরে যখন পাথরমুড়ির পতিত পাবন উপাধ্যায় ও যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পাকামাথাটা নেড়ে তাদের অনুরোধ করল প্রমীলা দেবীকে যে ঠাকুর যখন তাদের জাগ্রত তখন জাগ্রত দেবতার মন্দিরটা মেরামত করে দিলে তাদের রাধা-গোবিন্দজী নিশ্চয়ই উদ্ধার করবেন তার স্বামীর আত্মাকে। আত্মহত্যার মহাপাপ কিছুতেই ঠেলে নিয়ে যেতে পারবে না তার পতির সত্তাকে নরকের দিকে। তাছাড়া তাদের জাগ্রত দেবতার প্রতিনিধি ভূতনাথবাবু, শিরোমনি করে রাখবেন তাকে যদি তিনি তাদের এ মন্দিরটাকে আবার সেই আগের রূপে ফিরিয়ে দিতে পারেন।

ভূতনাথবাবুর কথাটা কানে আসতেই কেমন যেন একটা কৌতূহল জাগল হঠাৎ প্রমীলা দেবীর মনে। বলে উঠলেন তিনি যে ভূতনাথব[illegible] যদি বলেন তবে নিশ্চয়ই তিনি নেবেন তাদের এই মন্দির মেরামতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব। শুধু মেরামত নয় তার স্বামীর জমানো যথা-সর্বস্ব ব্যয় করে তিনি নাকি নূতন রূপ দিবেন এ মন্দিরটার। করবেন এটিকে এঅঞ্চলের একটি দ[illegible]র্শনীয় বস্তুতে পরিণত। অবশ্য যদি তাঁরা এ মন্দিরটিকে তাকে তার স্বামীর পুণ্যস্মৃতিব উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে দেন।

এটা এমন কিছু বিচিত্র শর্তনয়। যার নামেই হোক না কেন, মন্দিরটা তো তাদের হবে। আর ভূতনাথবাবুকে তাকে মত দিতে বলা? সেটাও তেমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। তিনিও তো তাদেরই একজন। সুতরাং উল্লাসে সব উৎসাহিত হয়ে প্রমীলা দেবীকে সঙ্গে নিয়েই হাজির হলেন অবিনাশবাবুর কারখানায়। যজ্ঞেশ্বরবাবু বেশ ঘটা করেই পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রমীলা দেবীর সঙ্গে ভূতনাথবাবুর। পতিত পাবনবাবু বললেন তাঁকে তাদের আসার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু ভূতনাথবা[illegible]থা বলবেন কি প্রমীলা দেবীকে দেখে তার অবস্থাটা হয়ে গেল ঠিক যেন ভূত দেখার মত।

এই তাহলে সেই প্রমীলা দেবী। যার কথা বলেছিল তাকে সেই সূক্ষ্মস্তরে প্রহ্লাদ পরামানিকের প্রেতাত্মা। শুধু কথা মনে পড়ে যাওয়াই নয় তার সঙ্গে সেই পরামানিকের সূক্ষ্ম সত্তার গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দমবন্ধের যন্ত্রণা নিয়ে শূন্যে ভেসে বেড়ানো ছবিটাও উঠল তার চোখের সামনে ভেসে। এই প্রমীলার জন্যই তাহলে সে আত্মঘাতী। এর জন্যই তাহলে তাকে মরতে হয়েছিল গলায় দড়ি দিয়ে। সূক্ষ্মাত্মার অর্থাৎ পরলোকবাসীর কথা কখনও মিথ্যা হয় না। স্মরণে আসতেই সব প্রমীলা দেবীর উপর কেমন যেন একটা

রাগের ভাব চেপে বসল ভূতনাথকে। ফোঁটা-তিলক-কাটা, নামাবলী গায়ে নেওয়া, হাতে মালা-জপা তার বিড়াল-তপস্বী রূপটা দেখে যেন জ্বালা করতে লাগল তার চোখ দুটো। হঠ্ করে বেরিয়ে গেল তার মুখ থেকে, অন্তর শুদ্ধ না হলে সঙ্ সাজলে কেও কি কখনও সাধু হয়। লোক দেখানো তিলক কাটলে বা মালা ঠক-ঠকালে কেও কখনও ধার্মিক হয় না প্রমীলা দেবী।

'—কি বলছেন আপনি?" বলে উঠলেন যজ্ঞেশ্বর বাবু,—জানেন, মঠ আশ্রমে কত দান করেছেন উনি, কত করেছেন কাঙ্গালী ভোজন?

—ও সব তো হল পরের ধনে পোদ্দারী করা। আত্মধর্মের সঙ্গে কি সম্পর্ক তার?

"—আর তার পতি-ভক্তি, স্বামী সেবা?" প্রায় রাগত স্বরেই বলে উঠলেন পতিতবাবু,—সতী সাবিত্রী, পতি পরায়ণা প্রমীলাদেবীর ওগুলো কি ধর্ম নয়?

"—চিরজীবনটা স্বামীকে জ্বালিয়ে আজ মৃত্যুর পরতাকে ভক্তি দেখাতে এসেছেন উনি।" বলে উঠল ভূতনাথ—"বেঁচে থাকতে একদিনের জন্যও পতিকে শান্তি না দিয়ে কখনও কি তাকে পরলোকে পাঠিয়ে শান্তি দেওয়া যায়? এতো গরু মেরে জুতা দান পতিতবাবু। স্বামীকে গলায় দড়ি নিয়ে মরতে বাধ্য করে তারই পাপের ধনে তাকে করবেন তার আত্মহত্যা মহাপাপ থেকে উদ্ধার। ভেবেছেন কি? কৌশলে করবেন বাজি মাৎ? এক ঢিলে মারবেন দুটো পাখি? ওধারে আপনার স্বামীর হবে মহাপাপ থেকে মুক্তি আর এধারে আপনার ছড়িয়ে পড়বে নাম, যশ, খ্যাতি? ধর্মাত্মা, ভক্তিমতি, পুণ্যাবতী মহিলা হিসাবে হবেন আপনি পরিচিত? চমৎকার। শাগ দিয়ে কখনও কি মাছ ঢাকান যায় প্রমীলা দেবী? মানুষকেহয়ত ভুলাতে পারেন আপনি। কিন্তু ধাপ্পা দিয়ে ধর্ম্মকে, ধোঁকা দিয়ে পুণ্যকে কখনও ভুলানো যায় না—মনে রাখবেন।

শুনে কথাগুলো মুখটা গেল প্রমীলা দেবীর ফ্যাকাশে হয়ে। ওধারে তাকে সম্মান করে এখানে আনা লোকগুলোর হল আক্কেল তাক। ফিসফিসিয়ে উঠল তারা, অচ্ছা ঠোঁটকাটা লোকটা তো। কাকে কি বলছে খেয়াল নেই। এমন বেহিসেবি তালকানা বলে তো ভাবা যায় নি তাকে। কত সাধ্য সাধনা করে মন্দিরটা মেরামতের জন্য মত করানো গেছে তার। আনা গেছে তাকে এখানে কত আশা নিয়ে। কিন্তু এমন অভদ্র ভাবে কথা বললে তো ডাঙ্গার মাছ আবার জলে চলে যাবে তাদের। প্রমীলা দেবীর সম্বন্ধে লোকটাকে বলে বুঝিয়েও পারা গেল না। বড়লোকের খেয়াল—একটু তোষামোদ, খোসামোদ করলেই মন পাওয়া যায় তার। তাদের হয়ে সেটুকু পর্য্যন্ত করছে না লোকটা। কে যে গলায় দড়ি দিয়েছে আর কে যে পাপ পথে, অন্যায় ভাবে করেছে ধনার্জ্জন, সে সব ঘেটে তোর কি লাভ বাপু? কাদা ঘেটে জলটা ঘোলা করলে আর কি পান করা যায়? আখের গুছিয়ে নেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু না —লোকটা এমন নির্বোধ, বেয়াড়া যে ইসারা ইঙ্গিতেও বশে আনা গেল না তাকে। কাটখট্টা ভূতনাথবাবু একটা কথাও বললেন না প্রমীলা দেবীকে তোয়াজ করে। কাজেই বোধ হয় বিগড়ে যেতে লাগলেন প্রমীলা দেবী। কারণ চোখে-মুখে তার ফুটে উঠতে লাগল বিরূপ হওয়ার ছাপ, বিরক্ত হওয়ার ভাব। ওধারে গুঞ্জন উঠতে লাগল সমবেত গ্রামবাসীদের মধ্যে। না, বেমক্কা একটা লোককে নিয়ে এভাবে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ফেলা উচিত নয়। তাই পাথরমুড়ির পাকা মাথা হলধর চাটুজ্জে এগিয়ে এলেন নিজের হাতে হালটা ধরবার জন্য।

ধমকে ভূতনাথবাবুকে বলে উঠলেন তিনি,—"তুমি ক'দিনের ছোকরা হে? উড়ে এসে জুড়ে বসতে পার তুমি অবিনাশবাবুর কারখানায় কিন্তু এখানের কার সম্বন্ধে কতটুকু জান তুমি যে পাকামি করছ? চেন তুমি প্রমীলা দেবীকে? এ অঞ্চলের তিনি একজন সবার শ্রদ্ধেয়া মান্যগুণ্য দানশীলা মহিলা। সবাই ভক্তি করে তাকে। তার সম্বন্ধে কোন অসম্মান জনক অবান্তর কথা আমরা সহ্য করব না কিছুতেই।

তার সঙ্গে যোগ ছিলেন ফণী চাটুজ্জেও— চুল পাকল [illegible]াদের আর তুমি জ্যেঠামি করতে এসেছো প্রমীলা দেবীর সম্বন্ধে আমাদের উপর কথা বলে। কতটুকু জান তুমি তাকে? কি বুঝ তুমি তার সম্বন্ধে? জান, বেঁচে থাকতে প্রহ্লাদবাবু তার এই ধর্মপত্নী স্বামীর পা-দোদক ছাড়া জলগ্রহণ করতেন না। ঘরে ঠাকুর চাকর থাকতেও নিজের হাতে তাকে খাওয়াতেন, সেবা যত্ন করতে[illegible]। আর করতেন বলেই স্বামীর মৃত্যুর পরও সে ধারা তিনি বজায় রেখে চলেছেন তার পতিদেবতার নামে দান-পুণ্য সেবা-ধর্ম ইত্যাদি সব মহৎ কাজ করে।

কিন্তু ভূতনাথের হল বেপরোয়া স্বভাব। মুখ খুললে একবার সে কাকেও তোয়াক্কা করে না। মনে ধরা তার কথাগুলো স্পষ্ট ভাবে, জোর গলাতেই বলতে সে পছন্দ করে। এতে কার যে সম্মান নষ্ট হবে, কে যে তার প্রতি বিরূপ হবে, লাভ হবে না কারো লোকসান হবে, তুষ্ট হবে না, কেও রুষ্ট হবে—সেসবের কোন ধার ধারে না সে। তাই চলতে লাগল তার মুখ,—লোক দেখানো পাদোদক সেবন বা পতির পাতে খাওয়াই আসল পতিভক্তি নয় ফণীবাবু। নয় স্বামীর মনটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, প্রাণটাকে কষ্ট দিয়ে, হৃদয়টাকে মথিত করে কেবলমাত্র দেহটার তার একটু সুখ বিধান করাই পতির প্রকৃত সেবা করা। পতির পতন রোধে সাহায্য করা, তাকে সৎপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করা, ধর্মের দিকে তার মতি ফেরান, ন্যায়-পুণ্য কর্মের দিকে গতি করে দেওয়াই হল স্বামীর সেবা, পতিভক্তি। সতী-সাধ্বী স্ত্রী কখনও তার স্বামীকে 'চাই-চাই' এর খোঁচায় বিব্রত করবে না, তাকে তার স্বার্থ-পূরণের গাধা করে রাখবে না, চরিত্রটাকে তার সন্দেহের বানে জর্জরিত করে জীবনটাকে তার অতিষ্ট করে তুলবে না।

–আমি কি তাই করেছি? হঠাৎ মুখ খুললেন প্রমীলা দেবী।

—নিজেই ভেবে দেখুন। বলে উঠল ভূতনাথ।

"—ভাবব আবার কি?" গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন প্রমীলা দেবী,—"আমাকেই উদ্দেশ্য করে বলছেন যখন এসব কথা তখন বলতে হবে আপনাকেই।"

কাজেই হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গল প্রমীলার। বলতে সব কথা ইচ্ছে না গেলেও ভূতনাথের, বলতে তাকেকরানো হল বাধ্য। না বললে মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে সে। গুলবাজ-ধাপ্পাবাজ হিসাবে পরিগণিত হয়ে যাবে সে সকলের কাছে। তা ছাড়া যে পাল্লায় পড়েছে সে মান-সম্মান নিয়েও হবে তার টানাটানি। এমন কি এখানে থাকাও তার হয়ে উঠবে অসম্ভব। তাই সূক্ষ্মে শোনা প্রহ্লাদ পরামানিকের সমস্ত কথা গড় গড় করে বলতে লাগল ভূতনাথ অর্থাৎ কেমন ভাবে সন্দেহ বাতিক মনটা প্রমীলার আজীবন সন্দেহ করে এসেছে তার স্বামী অর্থাৎ প্রহ্লাদ পরামানিকের চরিত্রটাকে কেমন ভাবে কু-ধারনার ভূতটা ঘাড়ে চেপে তার মানসিকভাবে নির্য্যাতন করত তাকে; অকথা কুকথায় হত পঞ্চমুখ ইত্যাদি। স্মরণ করিয়ে দিল তাকে যে হঠাৎ কোন ভদ্রলোক স্ত্রীকে নিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এলে কেমনভাবে সেই বেয়াড়া বাতিকটা চেপে বসত তার মাথায়। স্থান-কাল-পাত্র না বুঝে ক্ষেপিয়ে তুলত তাকে, বলা করাত সকলের সামনেই স্বামীকে তার লম্পট, নীচ, চরিত্রহীন, পরনারী আসক্ত ইত্যাদি সব প্রাণে লাগা, মনে ঘা দেওয়া কথা। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল—কখন, কোন ঘটনায় প্রহ্লাদবাবুকে চোখের জলে রাত কাটানো করিয়েছে প্রমীলা, কোনদিন কোন দৌরাত্মিতে কেড়ে নিয়েছে তার স্বামীর শান্তি-সোয়াস্তি, মনের সুখ, প্রাণের আরাম—সব পরিচয় দিতে লাগল ভূতনাথ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। সত্য হলেও তার সম্বন্ধে এসব সত্য কথা এমন ভাবে কেও কোনদিন যে বলতে পারবে ধারনা ছিল না প্রমীলাদেবীর। বিশেষ করে তার অন্তঃপুরের কথা, স্বামী-স্ত্রীর একান্ত গোপন খিটিমিটি ঝঞ্ঝাট ঝামেলার বিবরণ এমন নিঁখুতভাবে বলল লোকটা যে বিস্মিত না হয়ে পারল না সে।

বেবাক প্রমীলার বিস্ময়ভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল ভূতনাথ—ভেবে দেখুন, আপনার স্বামীর আত্মহত্যার জন্য প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে আপনি দায়ী কি না। স্ত্রী হয়ে যদি কেও স্বামীর নামে বদনাম রটায়, কলঙ্ক ছড়ায় তবে তার চেয়ে বড় দুঃখ স্বামীর পক্ষে আর কি হতে পারে? আপনার নির্য্যাতনের জ্বালায়, মানসিক পীড়নে কেলেঙ্কারীর কচ-কচানিতেই গলায় দড়ি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রহ্লাদবাবু। আজ তার আত্মহত্যার পাপ ঢাকাতে চান আপনি মন্দির মেরামত করে? ভেবেছেন কি আপনি এভাবে দান-ধর্ম করলেই অপযশ ঢাকবে আপনার? খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে? পুণ্য-কর্মের ঘটায় আপনার চাপা পড়ে যাবে মনের পাপ, আর স্বর্গে উঠবেন আপনার স্বামী? কখনও না। ধর্ম-পুণ্য কি এমন খেলো জিনিস যে ভাত ছড়ালেই কাকের মত উড়ে এসে বসবে আপনার কাছে। ধন দিয়ে কখনও ধর্ম কেনা যায় না। পাপের ফল আপনার স্বামীকে যেমন ভোগ করতে হচ্ছে তেমনি আপনাকেও ভোগ করতে হবে আপনার কর্মফল। এসব কাজে তার বা আপনার কোন পুণ্য হবে না প্রমীলা দেবী। পাপ-পুণ্যে কোন কাটান-ছিটান বা বাদ সাধও হয় না কখনও। যার যা দণ্ড বা ভোগ তাকে তা ভোগ করতে হবেই হবে।

বিস্ময়-স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে গেলেন প্রমীলা দেবী। ভূতনাথের কথাগুলো একদিকে তার মনে তুলল যেমন ঝড় অপর দিকেও তেমনি তার মুখটাকে করে দিল মূক। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশটাও হয়ে গেল যেন নিস্তব্ধ নিঝুম। ভাবতে লাগলেন প্রমীলা দেবী তাদের স্বামী-স্ত্রীর এসব গোপন কথা, মনের ইতিহাস লোকটা জানল কি করে। স্বামী ছাড়া তো তার জীবনের এসব খুঁটিনাটি ব্যাপার বা ত্রুটি বিচ্যুতির কথা জানবার নয়। স্বামীর মৃত্যুর জন্য সে দায়ী—এ কথাটা মরার আগে স্বামীও তাকে গেছল বলে। কিন্তু রাগে তখন মাথায় আগুন জ্বলছিল তার। তপ্ত খোলায় ধান দিলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা যেমন খৈ হয়ে উড়ে যায় তেমনি স্বামীর মরার কথা তখন রাগের কানে তার খৈ-এর মতই ছিটকে গেছল বেরিয়ে। তা ছাড়া জানত প্রমীলা—চরিত্রহীন লম্পট যারা তারা সাধারণত ভীতু হয়, হয় কাপুরুষ। এমন মরার কথা তারা অনেকবার বলে। কিন্তু মরবার মত থাকে না তাদের সাহস। তাই গ্রাহ্য করেনি প্রমীলা তার কথা। উল্টো বরং উত্তেজনার মুহূর্তে ঠোক্কর দিয়ে তাকে, সূত্রধরে তার কথায় বাড়িয়ে দিয়েছিল একটা নাইলন দড়ি। ফাঁশ লাগিয়ে নিজের গলায় মরবার জন্য তাকে। কথাগুলো অবশ্য অপ্রিয় হলেও সত্য ভূতনাথবাবুর। কিন্তু প্রশ্ন হল এসব তাদের মনের গহন আঁধারে লুকিয়ে থাকা গোপন কথা অবগত হল কি করে লোকটা। কি করেই বা হল তার এত সাহস ওসব কথা স্থির নিশ্চয় ভাবে সত্য জেনে তার মত একজন সমাজে প্রতিষ্ঠিত ভদ্র মহিলার মুখের উপর সবার সমক্ষে ছুঁড়ে মারতে? এ যে স্বপ্নেরও অগোচর তার, কল্পনারও বাইরে। ভাবতে লাগল প্রমীলা।

ওধারে গ্রামের মুখ্যা মাতব্বর ইত্যাদি সমবেত জনতার মধ্যে উঠল গুঞ্জন। কোথাকার এক উড়ো খৈ গোবর-গোবিন্দ এসে বাক্যবানে, কথার জালে বানচাল করে দেবে পাথরমুড়ির প্ল্যান, নিভিয়ে দেবে তাদের আশার আলোটা। না, কখনও তা হতে দেওয়া যাবে না। আহাম্মকটার কথার চোটে হাতছাড়া হয়ে গেলে প্রমীলা দেবী যে হার হয়ে যাবে তাদের। ফস্কে গেলে প্রমীলা দেবী ভেস্তে যাবে যে তাদের মন্দির মেরামতের স্বপ্নটা। গাঁয়ে তারা ফিরে যাবে কোন মুখটা নিয়ে। তাই রণ-রণিয়ে রাগের মাথায় একেবারে রণংদেহি ভাবটা নিয়ে ভূতনাথবাবুর সামনে এসে দাঁড়লেন রনজিৎ বাবু, —বলি, কার মুখে ঝাল খেলেন আপনি? কে বশ বরল আপনাকে? কি দিয়ে ? রাধা গোবিন্দজীর মন্দিরে হঠাৎ মধুসূদন হয়ে আমাদের গ্রাম থেকেএখানে এসে যে আচমকা আমাদের উপর এমন ফণা মেলে বিষধর সর্প হয়ে উঠলেন—কারণ কি তার? কে আপনার কানে দিল আমাদের বিরুদ্ধে গোপন মন্ত্র যার ফলে হঠাৎ এমন বিরূপ হয়ে গেলেন আমাদের প্রতি? বলি কার কথায় পাল্টাল এমন বোল? এসব বুলি ধরলেন আপনি কাদের শিক্ষায়?

'— শুনুন রনজিৎ বাবু," গম্ভীর ভাবে বলে উঠল ভূতনাথ, —আমি কখনও পরের মুখে ঝাল খাইনা। নিজের চোখে যা দেখি, কানে যা শুনি, মনে যা বুঝি একমাত্র সেই ভাবেই চলি-বুলি আমি। অপরেব কথার ধার ধারি না। কারো গোপন মন্ত্রে আমি কোনদিন কানও করি না বা কাকেও কিছু বলি না।

"—মিথ্যে কথা।" প্রায় গর্জে উঠলেন যজ্ঞেশ্বর বাড়ুজ্জে, —দেখুন ভূতনাথবাবু আপনি বলুন—আর নাই বলুন, মানুন—আর চাই নাই মানুন, আমরা কিন্তু সবাই জানি এসব হল আপনার ওই পলাশ ডাঙ্গার রায় বাবুদের চাল। কোনদিন ওরা আমাদের গ্রামের কোন উন্নতি দেখতে পারে না। চায় না ওরা কখনও যে আমাদের গ্রামে একটা কিছু ভাল কাজ হোক। তাই যেই শুনেছে, প্রমীলা দেবী আপনার মাধ্যমে গ্রামের আমাদের রাধা-গোবিন্দজীর মন্দিরটা মেরামত করতে মনস্থ করেছেন তাই ওমনি সরাসরি প্রমীলা দেবীকে কিছু বলতে সাহস না করে বিষ ঢেলেছে আপনার কানে। আর নূতন লোক আপনি তাই তাদের ভয়ে ভোল পাল্টেছেন।

—ওসব আপনাদের ভুল ধারনা।

"—ভুল ধারনা মানে?" সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথের কথায় প্রতিবাদ করে উঠলেন ফণী চাটুজ্জে, —রায় পাড়ার বাবুরা আপনাকে শিখিয়ে পড়িয়ে বুঝিয়ে না গেলে প্রমীলা দেবীর এত সমস্ত হাঁড়ির খবর আপনি জানলেন কি করে শুনি? আপনি সব জান্তা বা অন্তর্য্যামী নারায়ণ তো নন।"

"—দেখুন, আগেই তো বলেছি আমি, ও সব কথা আমার একটাও নয়। বলে উঠল ভূতনাথ, —পরলোকগত প্রহ্লাদবাবু সূক্ষ্ম দেহে দর্শন দিয়ে আমাকে যা বলেছেন আমি তারই কথা বলছি-মাত্র।

পাকা মাথাটা কেঁকলাসের মত নাড়তে নাড়তে বলে উঠলেন হলধর চাটুজ্জে, —বলি, তুমি কি মনে

করেছ হে ছোকরা? আমরা কি তোমার অবিনাশবাবুর কারখানার সেপাই-দারোয়ান যে ওমনি সব ফালতু কথা বলে ভুলাবে আমাদের? না, আমরা ভৈরব থানে মাদুলি দিতে আসা উজবক কতকগুলো মেয়ে যে ভেঙ্কি লাগাবে আমাদের? বলি মরা গরুতে কখনও কি ঘাস খায়, না মরা মানুষে কখনও কথা বলে? আর বলল যদি, বেছে বেছে তোমার কাছে? আর কোথাও বেচারা বলবার লোকজন পেল না? এমন কি তার কথা শোনবার মত কোন আত্মীয় স্বজনও খুঁজে পেল না? নিজের স্ত্রীকেও না? বলি আমরা কি এতই বোকা যে, যে-কোনভাবে গুল ঝাড়লেই আমরা তা বিশ্বাস করে নেব? ভেবেছো কি? আমরা কি সবাই ঘাসে মুখ দিয়ে চরি? না মাথায় আমাদের শিং ছাড়া আর কিছু নেই।

—ছিঃ। এসব বলে লজ্জা দেবেন না আমাকে। আপনারা আমার প্রণম্য, গুরুজন। এসব বলে মহাপাপের ভাগী করবেন না দয়া করে। বিশ্বাস করুন রায়-বাবুদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের কথা শোনা, মুখ দেখা তো দূরের কথা, ভুলেও কখনও পলাসডাঙ্গাও যাইনি আমি। প্রমীলা দেবীর সম্বন্ধে আমার সব বলা কথা তার মৃত স্বামীর অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহধারী প্রহ্লাদবাবুর। মিথ্যে ধারনা নিয়ে রায় বাবুদের সঙ্গে গণ্ডগোল করতে যাবেন না আপনারা। মিছেমিছি আমাকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি দু-গ্রামের মধ্যে ঘটাবেন না কোন মনোমালিন্য। বিশেষ অনুরোধ আমার।

চাপা-গুঞ্জনটা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল জনতার। তাই দেখে একটা কিছু গোলমালের আশঙ্কা করে হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন অবিনাশবাবু। মিনতি করে বলে উঠলেন তিনি পাথর মুড়ির বাবুদের, —দয়া করে আপনারা আপনাদের তর্কবিতর্ক বন্ধ না করলে কিন্তু কাজের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে আমার। কারখানার কুলি মজুর, ছুতোর-মিস্ত্রিরা সব কাজ বন্ধ করে এসে জুটেছে এখানে। তাই বলছিলাম—

'—বুঝেছি, "বলেই উঠে দাঁড়াল মুরুব্বি মাধব গোঁসাই। বলে উঠলেন তিনি প্রমীলা দেবীকে, —"সত্য-মিথ্যা কিছু জানি না মা। তবে এটা জানি, চাল-চারিত্রি ধড়ি বাজি করে কেও কারো কোন সৎ কাজে বাধা বা ধর্মে-পুণ্যে ব্যাঘাত ঘটালে উচ্ছন্ন সে যাবেই। এই পৈতে উঁচিয়ে অভিশাপ দিচ্ছি আমি আপনার এ মহৎ কাজে ফেংড়া তুলে কেও বেংড়া দিলে নরকেও তার স্থান হবে না। নির্বংশ হয়ে যাবে সে। উঠুন মা আপনি। চলুন এখান থেকে। সৎ-সংকল্প করেছেন যখন মনে-প্রাণে তখন এ দেব-কার্য করতেই হবে আপনাকে। এসব কাজ সবার দ্বারা হয় না মা। করবার সুযোগও পায় না অনেকে। ইচ্ছে থাকলেও অর্থের অভাব, অর্থ থাকলেও মনের অভাব পণ্ড করে দেয় সব কিছু। ঈশ্বর যখন মন-সামর্থ, ইচ্ছা-অর্থ সব কিছুই দিয়েছেন আপনাকে তখন রাধা-গোবিন্দজীর সেবায় আপনি তা অর্পন করুন। আমি বলছি সৎকাজ কখনও বৃথা যায় না। ফলে এর ইহলোকে আপনার, পরলোকে আপনার স্বামার সর্ববিধ মঙ্গল হবেই হবে। ব্রাহ্মণের মুখের কথা কখনও মিথ্যা হবে না মা।"

—"আরে, তাই যদি না হবে তাহলে এসব :ম্ম-কম্ম সেবা-পুণ্যের উদ্ভব বা প্রচলন হল কি করে?" মাথা ঝাঁকরে বলে উঠলেন পতিত উপাধ্যায়, —ভূতনাথের মত ভূতদের কথা সত্যি হলে জগতে মন্দির-দেবস্থান থাকা তো দূরের কথা ঠাকুর দেবতাদেরও থাকত না অস্তিত্ব। শ্রাদ্ধ-তর্পন, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে পুণ্য-ধর্ম উধাও হত ধরা থেকে। আর আমাদের মত বামুন পুরোহিতদের তাহলে টিকির বদলে গজাত লেজ আর পায়ের বদলে হত ক্ষুর। ধরণীর বুকে বিরাজ করতাম আমরা এক একজন গো-বৎস বা মহিষ শাবক হয়ে।

পতিত খুড়োর কথা শুনে হঠাৎ হেসে উঠল সবাই। আসরটা গেল হাল্কা হয়ে। অবশ্য হাল্কা হাসির তুবড়ি মেরে আসরটাকে উড়িয়ে দেবারই উদ্দেশ্য ছিল পতিতবাবুদের। কারণ বুঝতে আর বাকি রইল না কারো যে এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে প্রমীলা দেবী, কথার চাটিতে ভূতনাথ তাদের আশার ভিটেমাটি দেবে উৎখাত করে। মৃত প্রহ্লাদের সূক্ষ্ম সত্তার নামে বাজে বুলি ঝেড়ে কব্জা করে তাকে তাদের মন্দির মেরামতের কলকাঠিটা দেবে নস্যাৎ করে। গুঁড়ি গুলবে তাদের আকাঙক্ষায়। সুতরাং নয় কাজ ভালো—এখান থেকে যত শীঘ্র প্রমীলা দেবীকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। তাই মুরুব্বি মুখ্যার দল তোয়াজ করে প্রমীলা দেবীকে হাতে ধরে চাইল উঠাতে। নিয়ে যেতে চাইল তারা তাকে সত্বর সেখান থেকে।

কিন্তু না, উঠলেন না প্রমীলা দেবী। কেমন যেন একটা সন্দেহ জাগল তার মনে। ভাবলেন তিনি—হতে পারে হয়তো ভূতনাথবাবুর তার সম্বন্ধে বলা কথাগুলো সব তাদের গ্রাম পলাসডাঙ্গার রায় বাবুদেরই মুখে শোনা। কিন্তু শেষ পরীক্ষাটা করতে হবে তাকে। দেখতে হবে যাচাই করে লোকটা খাঁটি কিনা। তাই ছেঁকে ধরলেন তিনি, —আচ্ছা ভূতনাথবাবু, আমার স্বামীর মুখ থেকেই যদি শুনে থাকেন আমার সব কথা তখন নিশ্চয়ই আপনি নিজের চোখে দেখেছেন তাকে? তাছাড়া বলেওছেন আপনি নিজের চোখে দেখা, কানে শোনা ছাড়া আপনি কাকেও কিছু বলেন না।

'—আমি কোন কথা মিথ্যা বলি না।" গম্ভীর হয়ে উঠল ভূতনাথ।

—বেশ, তাহলে বলুন তো দেখি কেমনভাবে দেখেছিলেন আপনি আমার স্বামীকে? বলতে পারবেন তার চেহারা? দেখতে সে ছিল কেমন?

উত্তরে তার যা বলল ভূতনাথ তাতে তো যার পর নাই বিস্মিত হলেনই প্রমীলাদেবী—উপরন্তু তার মনের মধ্যে পাথরমুড়ির মুখ্যা মাতব্বরদের কথায় যেটুকু সন্দেহ বা অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল তার উপর তাও গেল সমূলে নস্যাৎ হয়ে। রইল না আর ভূতনাথবাবুর উপর কোন কুণ্ঠা বা দ্বিধা দ্বন্দ্বের ছিঁটে ফোঁটা। কারণ ভূতনাথবাবুর একটা কথাও বাজে, অবান্তর, গুল বা ধাপ্পা বলে মনে হল না তার। সব সত্যি।

সত্যি তার স্বামী মরে ছিল ধোপ-দুরস্ত বাবুর মতই। পরনে ছিল তার শান্তিপুরী ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী। আর গলায় দড়ি নিয়েছিল সে তারই রাগের মাথায় ছুঁড়ে দেওয়া নাইলনের দড়িটা নিয়ে। একলা ঘরে বাড়ীর ছাদের, নীচের হুকটাতে বেঁধে দড়িটা ঝুলেছিল সে গলায় ফাঁশ লাগিয়ে। ঝুলন্ত মৃতদেহটার সত্যি টান টান হয়ে গেছল পা দুটো। ঘাড়টা ছিল তার একটু বাঁকা অর্থাৎ মুখটা ছিল তার বাম দিকে একটু ঝোঁকানো। সত্যি ছিল তার স্বামীর কপালে একটা কাটা দাগ। ছোটবেলায় খেলার সময় আছাড় খাওয়ার চোট ছিল সেটা। চেহারাটাও ছিল তার শিপশিপে। কোটরগত চোখদুটোর মধ্যে সত্যি তার বাম দিকেরটা ছিল অপেক্ষাকৃত একটু ছোট। এসব বিবরণ নিজের চোখে দেখে বলা ছাড়া শুনে পরিচয় দেওয়া কখনও সম্ভব নয়।

শুনতে শুনতে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলেন না প্রমীলা দেবী। তার ভাব-গাম্ভীর্য দেমাক অহঙ্কার, বড়লোকি ঠাট-বাট সমস্ত কিছু গেল ঘুচে। সব ভুলে তিনি আছড়ে পড়লেন ভূতনাথবাবুর পায়ের কাছে। দু-হাতে নিজের কানদুটো চেপে মাথা নাড়তে নাড়তে ঢুকরে কান্না ভরা গলায় বলে উঠলেন তিনি, —"আর বোলো না বাবা তুমি। আমি তার কষ্টের কথা আর সহ্য করতে পারছি না। দয়া করে এখন দাও বাবা বলে আমাকে কি করলে তার ওই গলায় ফাঁশ লাগানো ঝুলন্ত অবস্থার, দম-বন্ধের যন্ত্রণার লাঘব হবে। কি করলে তার ওই কোটরগত চোখ দুটোর ফুটে বেরিয়ে আসা মর্মান্তিক অবস্থা থেকে উদ্ধার হবে?"

"—ছিঃ। পায়ে ধরবেন না মা আমার।" ব্যস্ত সমস্তভাবে বলে উঠল ভূতনাথ, —"মনে কষ্ট পাবেন বলেই আমি বলতে চাইনি এসব। কিন্তু বলতে আপনি বাধ্য করলেন বলেই যা দেখেছি চোখে আমি—তাই হল আমাকে বলতে। এতে দোষ কিছু আমার ধরবেন না মা আপনি।

'—তোমার আবার দোষ কি বাবা? অপরাধি তো আমি।' বলে উঠলেন প্রমীলা দেবী, —স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারছি আমি এখন জীবনের আমার অন্যায়, অধর্ম সমস্ত কিছু। বুঝতে পারছি আমি আমার ভুল ত্রুটি দোষ অপরাধ। আমি মহাপাপী বাবা। আমার দোষেই মরেছে আমার স্বামী। পরলোকে তার এই দণ্ডভোগ, নরক যন্ত্রণা সব হচ্ছে আমার জন্য। "ব্যাকুল হয়ে উঠলেন প্রমীলা দেবী' —দাও বাবা বলে, কি করে আমার স্বামীর আত্মার মুক্তি হবে? হবে কি করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। চাই না আমি আর ধর্ম-পুণ্য। চুলোয় থাক আমার দান-সেবা ব্রত। কোন ঠাকুর দেবতা, মন্দির মেরামত চাই না আমি প্রতিষ্ঠা করতে। একটা উপায় বলে দাও বাবা আমাকে।

"—আমি তো আপনাকে দান-ধর্ম, সেবা কর্ম পরিহার করতে বলছি না মা। বলছি না তো আমি আপনাকে ওসব মন্দির মেরামত বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত হতে।" বলে উঠল ভূতনাথ—বলছি আমি ওসব কাজের মধ্যে আপনার যশ-প্রতিষ্ঠা, সম্মান-লিপ্সা বা কোন লাভ-লোভ অথবা স্বার্থ জড়িত থাকলে তা কখনও ধর্ম বা পুণ্য বলে পরিগণিত হয় না। ধর্মের সঙ্গে কোনরূপ দেনা-পাওনা বা স্বার্থের সম্পর্ক নেই মা। আত্মদোষ

অনুসন্ধান ও তা সংশোধনের চেষ্টা করাই তো হল জীবনের প্রকৃত সেবা-পূজা ও ধর্মের কাজ মা। তাছাড়া মানুষের মনই তো হল আসল মন্দির। কাম-ক্রোধ-লোভ আদি রিপু প্রমুহ সে মন্দিরকে করছে প্রতি নিয়ত ভগ্ন, বিধ্বস্ত, জরাজীর্ণ। সে সবের হাত থেকে মনকে মুক্ত করাই হল প্রকৃত মন্দির মেরামত করা। নিজের জাগতিক কামনা-বাসনা, আরাধনা অর্থাৎ রাধাকে নিজের অন্তরস্থিত পরমাত্মা অর্থাৎ গোবিন্দের সঙ্গে যুক্ত করলেই হয় মন-মন্দিরে প্রকৃত যুগল মূর্ত্তির আরাধনা। ভগবান তো সকলের মধ্যেই বিরাজ করছেন। তাকে খুঁজতে যেমন তীর্থক্ষেত্রে ঘুরতে হয় না তেমনি মন্দির গড়ে তাকে পূজো করতেও হয় না। লাভ-লোভশূন্য বিষয়াসক্তিহীন হয়ে সৎভাবে সেই অন্তরস্থিত ভগবানের বিকাশ সাধন করাই হল জীবনের প্রকৃত ধর্ম ও জনমের সার্থকতা।

বেবাক হয়ে প্রমীলা দেবী অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে ভূতনাথের মুখটার দিকে শুনতে লাগল তার কথা, —শ্রম-সাধক ছাড়া ভগবানের মন্দির গড়া হয় না মা। নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, সৎভাবে উপার্জিত অর্থে, স্বার্থ-লোভহীন পবিত্র মনে, পরকল্যাণকামী অর্থাৎ শুদ্ধ অন্তঃকরণে পারে যদি কেও মন্দির নির্মাণ বা মেরামত করতে তবেই তার সেই কাজ ধর্মের কাজ, পুণ্যের কর্ম।

"—কিন্তু এ বয়সে আমার তা তো সম্ভব নয় বাবা। কথার মাঝে বলে উঠলেন প্রমীলা দেবী।

"—কি দরকার মা।" বলে উঠল ভূতনাথ, —ভগবান যখন এ বয়েসে আপনাকে বসাতে চাইছেন মায়ের আসনে তখন এ অঞ্চলের সকলের মা হতে হবে আপনাকে। প্রকৃত মা। মায়ের ধর্ম সব চেয়ে বড় ধর্ম মা। মায়ের চোখে দেখতে হবে সকলকে। মায়ের হৃদয়ে বাসতে হবে ভালো সব পরিবার গুলোকে। যে ভুলে আপনার স্বামী গেছে আত্মহত্যার পথে সে ভুল যেন আর না করে কোন স্ত্রী। কোন মানুষও যেন ক্রোধের বশে না করে বসে আপনার স্বামীর মত হঠকারিতা—নজর রাখতে হবে আপনাকে। আপনার মত ভুল বাতিকে বা মিথ্যা সন্দেহে কেও যেন আর কারো জীবন নষ্ট না করে, না আনে সংসারে যেন এরূপ কোন বিপর্য্যয়। স্বামী-স্ত্রীদের এসব মনের ময়লা দূর করবার ব্রত নিতে হবে আপনাকে। নিতে হবে সংকল্প চোখে-পড়া বিরূপ দম্পতির পরস্পরের হৃদয়ের আবর্জনা দূর করার, ভুল বোঝাবুঝির অবসান করার।

এক কথায় যে পথে গেছেন প্রমীলা দেবী এই পথটা নাকি পরিষ্কার করবার দায়িত্ব নিতে হবে তাকে। বাপের আদর, মায়ের স্নেহে, ভগ্নীর হাসি-মাখা মুখে বোধ-প্রবোধের প্রলেপ দিয়ে শান্ত করতে যেতে হবে তাকে বিনা আহ্বানেই প্রতিটা উত্তেজিত পরিবারে। কারণ সংসার ধর্ম হল বড় ধর্ম। এই ধর্মে স্বামী-স্ত্রীকে প্রকৃতভাবে আসীন করতে পারাই হল নাকি তার মহা পুণ্যের কাজ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ কচায়ন, পরিবারের অশান্তি, সংসারের ঝগড়া-ঝাটি নাকি এক একটা মহা যুদ্ধের চেয়েও মারাত্মক। এতে নাকি সৎ আত্মা বা পবিত্র-সত্তারা জন্ম জীবনে নামতে পারেন না। মাতা-পিতার বিরূপ মানসিকতাকে আশ্রয় করে যত সব দুষ্ট নষ্ট প্রেতাত্মারা পৃথিবীতে নেয় জন্ম। মানুষ হয়ে অমানুষ হয় তারাই। তারা নীচ মনোভাব ও হীন-স্বার্থে ধরাকে করে নরকে পরিণত। সংসার আশ্রমে স্বামী-স্ত্রীকে সৎভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই ঈশা-মুসা, বুদ্ধ-বিবেকানন্দদের জগৎ জীবনে আসার পথ হয় সুগম। সৎ পিতা-মাতার পবিত্র মানসিক আকর্ষণে স্বর্গের দেবতারা তাদের গর্ভে-ঔরস অবলম্বন করে বসুন্ধরাকে আসেন স্বর্গভূমিতে পরিণত করতে। জীবনে শ্রীকৃষ্ণ না নামলে, জগতে রামচন্দ্রদের আবির্ভাব না হলে হিরণ্য-কশিপু ও রাবনে যে ভরে যাবে দেশটা। পাপ-পঙ্কে ডুবে যাবে ধরণী। এক কথায় সংসারকে প্রকৃত ভাবে ধরে রাখাই হল আসল ধর্ম ও প্রকৃত পুণ্যের কর্ম। সুতরাং পরিবার রূপ মন্দিরগুলিতে যদি স্বামী-স্ত্রী রূপ রাধা-গোবিন্দের বিগ্রহ নিচয়কে নিষ্ঠা ভরে, পবিত্র মনে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হন প্রমীলা দেবী এবং বাকী জীবনটা এই চেষ্টায়, এই ধ্যানে এবং এই সাধনায় অতিবাহিত করেন তিনি তবেই নাকি হবে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এবং তার এই পুণ্য-কর্ম ও সেবা-ধর্মের ফলে তার স্বামীর আত্মারও হবে নাকি কল্যাণ।

নির্বাক প্রমীলা। স্থির-নিশ্চল চোখ দুটো নিয়ে সে শুধু তাকিয়েই রইল ভূতনাথের মুখটার দিকে, পটে আঁকা ছবির মত, তন্ময় হয়ে। বলবার তার আর রইল না কিছুই। শুনে কথাগুলো কি প্রতিক্রিয়া যে হতে লাগল তার মনটাতে কে জানে। তবে এধারে পাথরমুড়ির চাটুজ্জে বাড়ুজ্জে, গোঁসাই-উপাধ্যায় ও মুখুজ্জে—মাতব্বরদের দল হয়ে গেল যেন ভেবাচেকা। হল বুঝি তাদের গেল উল্টে। হায় ভগবান। এ যে হল তাদের "উল্টো বুঝলি

রাম' —এর মত। বেচারাদের "অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।" এরকমটা তারা আশা করতে পারেনি। ভাবতে পারেনি ভূতনাথ নামক ব্যক্তিটির পেটে এমন থাকবে বদগুণ। ঠাকুরের গহনা উদ্ধার করা থেকে বিগ্রহের গায়ে পরিয়ে দেওয়ার ঘটা পর্য্যন্ত ভেবেছিল তাকে তাদের ঘাটেরই জল। কিন্তু সে জল তাদের এমনিভাবে বইবে হঠাৎ অন্যখাতে— কল্পনারও অতীত ছিল তাদের। শুরু হল পরস্পরের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি। তারপর ঘাড় নাড়ানাড়ি, ঠোঁট টেপাটেপি ও পরে চোখে চোখে ইসারা। পরে আবার ইসারাটা পরস্পরের কান ফিস-ফিসানি ও স্বগতোক্তিতে হল পরিণত। চাপাস্বরে এর ওর মধ্যে শুরু হল কথা ছুঁড়াছুঁড়ি, — হয় লোকটা ভৌতিক বিদ্যা জানে, না হয় ওটা একটা পিশাচ সাধক। তা না হলে ভূত হয়ে থাকা প্রহ্লাদ পরামানিকের এসব কথা সে বলতে পারে কি করে?

কেও বলল—টেলিপ্যাথি অর্থাৎ চিন্তাচালন বিদ্যা জানা আছে ওর। তাই তার চিন্তাগুলো প্রমীলা দেবীর মধ্যে সঞ্চারিত করে এমনভাবে তাকলাগিয়ে দিয়েছে তাকে। বহাচ্ছে তাকে নিজের গতে।

কেও আবার তাকে মন-পঠন বিদ্যার অধিকারী বা সামুদ্রিক বিদ্যায় শক্তিধারী বলে ভেবে বসল মনে। ওসব বিদ্যায় নাকি অপরের মনের কথা যেমন জানা যায় তেমনি নিজের কথায় অপরকেও বশ করা যায়।

কারো ধারনা উঠল আর একটু উপরের দিকে। বলতে লাগল কেও—কোন কোন মানুষ আবার এমন অতীন্দ্রিয় শক্তিরও অধিকারী হতে পারে যার বলে সে অপর কারো সূক্ষ্ম সত্তায় আবিষ্ট হয়ে বা অশরীরী কোন আত্মাকে নিজের মধ্যে আবিষ্ট করিয়ে তাদের মনের কথা বা অতীত জীবনের ইতিহাস জানতে পারে বা বলাতে পারে। প্রহ্লাদ পরামানিকের প্রাণের কথা সেইভাবেই জেনেছে কিনা লোকটা কে জানে।

তবে তুকতাক যাই জ্ঞান থাক, লোকটা নিশ্চয়ই যাদু জানে। আর তার এই জানার সঙ্গে আয়ত্ব করা আছে তার সম্মোহনী বিদ্যা। যার বলে আসল বলীয়ান সে। নইলে পারে কি সে কখনও ওই দেমাকী, অহঙ্কারি, ধন-মদে মত্তা প্রমীলা দেবীর মত একজন দজ্জাল, ধুরন্ধর মেয়েকে এমনভাবে কব্জা করে কেঁচোয় পরিণত করতে? অসম্ভব। অসাধ্য।

ইচ্ছা তাদের পূরণ হবে কি না তা ইচ্ছা-পূরণ ঠাকুর শ্রীরাধা গোবিন্দজীই জানেন। আপাততঃ এভাবে তাদের দুধের সাধ ঘোলে মেটান ছাড়া আর তো কোন উপায় ছিল না। তবে যাদের উদ্দেশ্যে তাদের এসব গুপ্তকথা বা গুঞ্জনের হচ্ছিল হরির-লুট তাদের অর্থাৎ ভূতনাথ বা প্রমীলা দেবীর এসব কানে যাচ্ছিল কি না কে জানে।

(ছাব্বিশ)

মানুষ মনে হয় আপন ব্যাপারে আপনি কখনও অবাক হয় না। হয় না বুঝি নিজের কথায় নিজে কখনও বিস্মিত। ভূতনাথ কিন্তু তাই হল। আপন মনে নিরালা নির্জনে যতই সে ভাবতে লাগল কুলদাচরণ, মানিকবাবু, প্রমীলা দেবীকে বলা তার কথাগুলো, ততই আশ্চর্য্য লাগতে লাগল তার। সত্যি, এসব কথা বলল সে কি করে? কি করে তার মুখ দিয়ে বেরুল এসব জ্ঞানগর্ভ উক্তি! ধর্ম-টর্ম ব্যাপারে চিরকাল তার অনীহা। শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনার ধার ধারে নি কখনও। যায়নি কখনও মঠ-মন্দির, আশ্রম আখড়ার ধারে পাশে। অথচ উপদেশের ছলে এমনভাবে কথাগুলো বেরুতে লাগল তার মুখ দিয়ে যেন সে কোন মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী। সাধু গুরু-বৈষ্ণবের দলের লোক। কথা শুনে তার যেন কেঁচো হয়ে গেলেন কুলদাবাবু! মেঁদা মেরে গেলে মানিকবাবু। আর এ অঞ্চলের মহা গণ্যমান্য প্রমীলা দেবী — আধ্যাত্মিকতার বানী শুনে তার একেবারে গেলেন যেন গলে জল হয়ে। আশ্চর্য্য।

বোধ হয় এই রকমই হয়। সূক্ষ্ম দেহের স্পর্শ পায় যারা, পায় যারা উচ্চাত্মার হাওয়া, দিব্য দেহীর দৃষ্টি লাগে যাদের উপর —তাদেরই মনে হয় হৃদয় বীনার তারে এমনি ভাবে বেজে উঠে উচ্চ আত্মিকদের ধ্যান-ধারনা, উচ্চভাবনা চিন্তা। অর্থাৎ এভাবেই বোধ হয় বাস্তব মনকে মাধ্যম করে তাঁরা করে থাকেন জগৎ-জীবনের মঙ্গল কর্ম।

যাক গে ওসব কথা। এধারে কিন্তু এ অঞ্চলের ওইসব তাবড় তাবড় লোকদের ওভাবে কাবু করে দিতেই

ভূতনাথের উপর কারখানার সেপাই লগদীদের ধারনাটা গেল পাল্টে। নিছক তাকে আর ভক্তি-শ্রদ্ধাই করল না তারা সংস্পর্শে থেকে তার তাদের ভয়-ডরগুলোও কেমন যেন যেতে লাগল উবে। কারখানার ভিতর, ধারে পাশে, আর ভূতুড়ে আওয়াজ, প্রেতুড়ে শব্দ শুনলে তারা ভয়ে আড়ষ্ট জড়ি-পুটি হয়ে "রাম" নাম জপ করে না। এমন কি কারখানার ওই শ্মশান পাশের কোণার ঘরগুলোতে যদি আচমকা কোন দুম-ধড়াক্কা ঠুং-ঠরক্কা ভৌতিক দৌরাত্মিও শুরু হয় তবু তারা ভয়-ভিড়কে গরুর লেজ তুলে ছুটার মত কারখানা ছেড়ে গ্রামের দিকে ছুটে পালায় না। ভূতনাথের ঘরে আসে। উঠিয়ে তাকে বলে সব কথা। সে সব কথা শুনা মাত্রই ভূতনাথবাবুর উপর কি যেন ভর করে। উঠেই ওমনি ছুটে যায় সে তাদের নির্দ্দেশিত কারখানার দূর কোণায়, শ্মশান পাশের ঘরের পিছনে। লাঠি-লণ্ঠন কিচ্ছু না নিয়ে। মাঝ রাত, অন্ধকার কোন কিছুকে পরোয়া না করে। তারপর —

তারপর সে এক অদ্ভুত কাণ্ড তার। দু-হাত তুলে, উপরের দিকে মুখ করে উদ্দেশ্য করে ওইসব ভূত-প্রেতদের চিৎকার করে বলতে থাকে সে, —শোন তোমরা, কেন মিছেমিছি মায়ার টানে এই মরলোকে পড়ে থেকে নিজেদের আত্মাকে কষ্ট দিচ্ছো। অমৃতলোকের সন্তান তোমরা। মৃত্যু তোমাদের সেই লোকের দিকে গতিবান করবার জন্য সূক্ষ্মলোকে এনেছেন। জগতের মায়ায় জড়িয়ে না থেকে সেই উর্ধ্বলোকে যাও। যে দেহ তোমাদের এখানের এই শ্মশানের মাটিতে লীন হয়ে গেছে সে দেহ আর ফিরে পাবে না তোমরা। যারা একদিন তোমাদের পঞ্চভৌতিক দেহকে এখানের শ্মশান চিতায় বিলীন করে দিয়ে গেছেন তাঁরা আর কোনদিন আসবেন না তোমাদের সেই দেহকে পুনরায় তাদের মাঝে ফিরিয়ে নিতে। তাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের। নেই সম্বন্ধ আর কোন তোমাদের স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সঙ্গে। ঐন্দ্রিয়িক ছায়া রূপ আলেয়ার পিছনে ছুটে কেন নিজেদের অন্ত্যর্জীবন নষ্ট করছো? কেন মনকে এখানে বেঁধে রেখে তোমরা নিজেদের আত্মিক শক্তিকে দুর্ব্বল করছো? চিন্তাকে কর উন্নত। মনকে কর মায়াহীন, নিজের শাশ্বত স্বরূপ উপলব্ধির জন্য হও প্রস্তুত। যাও চলে ওই অন্ধকার জগতের আস্তাকুঁড় থেকে মুক্ত হয়ে ওই উর্দ্ধলোকের আলোর জগতের দিকে। প্রার্থনা কর ভগবানের কাছে—অসতো মা সৎ গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ। মৃত্যোর্মা অমৃত গময়...

বলতে বলতে নিজের কথায় নিজেই হঠাৎ চমকে উঠে থমকে দাঁড়াতো ভূতনাথ। এসব কথা সে বলছে কি করে? অন্তরের তার কোন অন্তঃস্থল থেকে আসছে ওসব মন্ত্র-বানী। হৃদয়ের কোন উৎস স্থল থেকে উৎসারিত হচ্ছে তার এসব বাক্য ধারা। বলছে সে নিজে না তার মুখে বলছে অন্য কেও? বুঝতে কিছু পারত না ভূতনাথ। ভূতের মত দাঁড়িয়ে তাই ভাবত সে।

তবে যেভাবেই বলুক সে বা যেখান থেকেই আসুক তার কথাগুলো মুখে, ফল কিন্তু ফলত তার। কারণ বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওই সমস্ত প্রেতুড়ে আওয়াজ, ভূতুড়ে শব্দ কারখানার এ কোণার ঝড়-ঝড় ও কোণার খড়-খড়, অর্থাৎ ভৌতিক দৌরাত্মি, অশরীরী তাণ্ডব নিমেষে যেত বন্ধ হয়ে। শান্ত হত পরিবেশ। রাতটা শুধু তার অন্ধকার বুকে গোটা কতক ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক নিয়ে থাকত ডুবে নিস্তব্ধ নিঝুমতায়। নিঃসাড় হলে সব কিছু ভাবত কারখানার সেপাই লগদীর দল বাবু বুঝি বিলকুল ভাগিয়ে দিয়েছে ভূত-প্রেতগুলোকে। তাই কিছুক্ষণ পর কাছে আসত তারা। ভাঙ্গাত ভূতনাথের চমক। আশ্বস্থ করে তাকে নিয়ে যেত তার নিজের ঘরে অর্থাৎ ফটক গোড়ার তার কুঠুরিতে।

দিনের পর দিন ভূতনাথের এসব কাণ্ড-কারবার দেখে পাল্টে গেল রাম সিং আর ভীমচাঁদদের ধারনাটা। ভাবল তারা ভূতনাথকে এক মস্ত বড় ভূতের ওঝা—'গুণিন-গুরু মন্ত্ররিয়া"। মন্ত্ররিয়া ভূতনাথের ওসব শূন্যে বলা কথাগুলো ফালতু বাত নয়—মন্ত্র। ওভাবে মন্ত্রের জোরেই ভূত ভাগায় সে। হাত তুলে তুকতাক করে তাড়ায় প্রেত, চিৎকারে খেদায় পেত্নী-ভূতনী। সুতরাং এত বড় একটা মন্ত্ররিয়া পাশে থাকতে ভয় কি তাদের? ক্রমশঃ যেন সাহসী হবার চেষ্টা করতে লাগল লাল বাহাদুরের দল। রাত্রে বেলায় তারা বেরুতে লাগল ফটকের বাইরে। ঘুরতে লাগল তারা কারখানার চারপাশ। কিন্তু হায়! মন যাদের দুর্ব্বল ভয় কি তাদের যায় সহজে? অদূরে নদীর ধূ-ধূ করা বালি-বুকটার দিকে তাকালেই কি যেন দেখতে পেত তারা। পাড়ের গাছ-পালাগুলো থেকে মাঝে মধ্যে ভূতের হাঁচি, প্রেতের কাশি যেন পেতত তারা শুনতে। মনে হত তাদের ছেলে পুতার চর থেকে যেন "বাল-বাচ্চার' কান্না ভেসে আসে। মড়া ফেলার ডাঙ্গায় যেন মালুম হয় তাদের পেত্নী-পিশাচগুলো

পরস্পরের মধ্যে হুটোপুটি, লুটোপুটি, ঝুটোপুটি ঝগড় লেগে গেছে। আর তাই দেখে পাড়ের বাগানের শাকচুন্নিরা চিলের হাসি হাসছে ও মড়া পোঁতার ডাঙ্গার চিড়কুনগুলো হা-হা করে তাদের মুখের আলোর দপদপানি নিয়ে চারধার যেন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সত্য এসব, না গাঁজা, চরস সিদ্ধি আফিং এর কৃপা বলা মুস্কিল।

কি শুনতে কি শুনত ভীম চাঁদ, কি দেখতে কি দেখত রাম সিং আর কি ভাবতে কি ভাবত লাল বাহাদুর তারাই জানে। মোট কথা তাদের মুখে শুনেই এসব কথা সব ছেড়ে মাথা ঝেড়ে উঠত ওমনি ভূতনাথ। ভূত-প্রেতের গন্ধ পেয়ে তার চেহারাটাই যেত যেন পাল্টে। রুখে ছুটত সে তাদের বলা নদীর পাড়, চিতা শ্মশান বা ছেলে-পুঁতা চরের দিকে। দুরন্ত কাল বৈশাখীর মত সে সব স্থানে আছড়ে পড়তে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, পীচ ঢালা রাতগ্রাহ্য করত না। ঝোপ-ঝাড় কাঁটা-ঝাটাকে তোয়ক্কা করত না। এমন কি রাত্রে যাদের নাম করতে নেই সেই লতা-পাতা অর্থাৎ সাপ-খোপ, বনের পোকা অর্থাৎ হায়না-হেড়োল তাদের পর্য্যন্ত পরোয়া করত না সে। অন্ততঃ পক্ষে হাতে একটা টর্চ, সামান্য একটা লাঠি—ভীম পালোয়ানদের সে অনুরোধটুকু রাখবারও সময় পেত না সে। অন্ধকার ফুঁড়ে, পথ-বেপথ তেড়ে একলাই ব্যাকুলভাবে যেত চলে সে উর্ধ্বশ্বাসে। কারখানার ফটক গোড়ায় ভুঁড়েল ভীম চাঁদ, গোঁফেল রাম সিং, পুরু গালপাট্টাওলা লাল বাহাদুর দাঁড়িয়ে থাকত পর পর সাজানো কাঠপুতুলগুলোর মত। বাবুর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া দেখা ছাড়া আর যেন তাদের কোন কাজ নেই।

কোনদিকে যেতে যে কোন দিকে যেত তাদের ত্রিশূল-বাবা কে জানে। কিছুক্ষণ পর আসত তাদের কানে ভূতনাথের সেই মন্ত্রবানী, — হে সূক্ষ্মদেহী, পরলোকবাসীগণ, পরমাত্মার অংশ তোমরা। স্বলোক ত্যাগ করে এসেছিলে তোমরা এই মরলোকে। মনুষ্য রূপে। এ রূপের খেলা যখন শেষ করে গেছ তোমরা তখন আর কেন মহীর মায়ার ঘেরা টোপে আবদ্ধ থাকবে? অংশকে তোমরা সেই মূল উৎসে মিলিয়ে জীবাবর্ত শেষ কর। দৈহিক মৃত্যুর পরও এভাবে আর জড় বন্ধনে আটকে থেকে নিজেদের আধ্যাত্মিক ?র মৃত্যু ঘটিও না। করো না সত্তাকে আর কালিমা লিপ্ত। আত্মাকে মোহ কুয়াশায় আচ্ছাদিত। দূর নীহারিকা পুঞ্জের দূরতম কারণ সমুদ্রে উৎস তোমাদের। সেই উৎসে যাও মিলিত হতে। সেখানে জগৎ জীবনের টুকরো সুখের চেয়ে, পিতা-মাতার হাল্কা আদর, ভ্রাতা-ভগ্নীর আলতো স্নেহ ও স্ত্রী-পুত্রের ঠুনকো প্রেমের চেয়ে গভীর সুখ, পরম প্রেম, চরম ভালবাসা পাবে সেখানে। সেই চরম শান্তি, পরম প্রাপ্তি, শাশ্বত আনন্দের দিকে যাত্রা কর। দেহ-বন্ধন মুক্ত হয়ে মনলোকে যখন গতি হয়েছে তোমাদের তখন এক বিশেষ শক্তির অধিকারী হয়েছ তোমরা। কেন সেই শক্তি জগৎ প্রবৃত্তি, মরলোকের স্বভাব ও ফেলে আসা জীবনের চর্বিত চর্বন করে নষ্ট করছো? কে তোমরা — কি তোমরা? দেখ ভেবে। পার্থিব রুচি-প্রকৃতির দাস নও তোমরা। পরম ব্রহ্ম তোমাদের পরম সত্তায় আসীন হতে আকর্ষণ করছেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অনু-পরামাণু সেই আকর্ষণেই আকর্ষিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ উর্ধ্বগতির পথে। বিকশিত হতে হতে কীট পতঙ্গ হয়ে, পতঙ্গ প্রাণী হয়ে, প্রাণী পক্ষী হয়ে পশু হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ উচ্চ পর্য্যায়ে। মানুষকে যেতে হবে ঈশ্বরের দিকে। পিছন ধারায় পশুর দিকে নয়। দেহ-বিলয়ের ক্ষেত্রে ভোগ-দেহটা পুনরায় ফিরে পাবার আশায় এখানে প্রেত-জীবনে ভূত-যোনিতে পড়ে থাকলে আত্মার মুক্তি হবে না তোমাদের। কামনা-বাসনার নীচ মনোভাব নীচ কুলে, হীন বংশে টেনে তোমাদের পশু মানবের জীবনে নামাবে। যার ফলে তোমাদের ক্রমোন্নতির ধারায় মানুষ থেকে মহামানব হবার গতি, মহামানব থেকে সত্তার দেবতা তথা ঈশ্বরে পরিণত হবার প্রবাহ অর্থাৎ জীবাত্মার তার পরমাত্মায় মিলিত হবার ধারা হবে ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত। সুতরাং মহীর মায়ায়, মিথ্যা আলেয়ার খেলায়, জগতের আশা মরীচিকার ছলনায় ভুলে থাকা উচিত নয় তোমাদের। নয় ঠিক সত্তাকে এখানে বেঁধে রাখার। আত্মানং বেত্তি। মনে-প্রাণে বল তোমরা—অহং ব্রহ্মাস্মি। ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্ম লোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতি।

বলতে বলতে আবার তেমনি নিজের কথায় নিজেই ওমনি চমকে উঠত ভূতনাথ। থেমে যেত তার বাক্যধারা। ভাবত সে অবাক হয়ে এসব কথা আসছে তার হৃদয়ের কোন উৎস-স্থল থেকে? কিসের ঘোরে বলছে সে এসব? পড়াশোনা তো দূরের কথা-জীবনে এসব ভাব—ভাষার সঙ্গেও কোন সম্বন্ধ নেই তার। তবে? বলছে কি সে এসব মন্ত্রবানী স্বয়ং—না তার মুখ দিয়ে বলছে অন্য কেও? বুঝতে-কিছু না পেরে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকত ভূতনাথ। যাদের উদ্দেশ্যে বলা এসব তাদের কিন্তু দেখতে পেত না সে। বলত

সত্তাহীন সত্ত্বা বা নীচাত্মারা শক্তিধর মানুষের কাছে নাকি দেহ ধরতে বা প্রকাশ হতে পারে না। তাই তারা অদৃশ্য হয়ে থাকত নাকি ভূতনাথের কাছে—কে জানে। তবে তার বলা কথাগুলো মনে হয় কানে যেত তাদের। কারণ তার বাক্য স্পন্দনের সাথে সাথে এধার-ওধার দু-একটা অলৌকিক দৃশ্য চোখে পড়ত তার। দেখতো ভূতনাথ কোন শ্মশানের বুক থেকে হঠাৎ একটা হলদে আলোর হাল্‌কা আভা উঠে গিয়ে মিলিয়ে গেল আকাশে। কোন চিতার উপর থেকে হঠাৎ একটা নীলচে রঙের আলোক-রশ্মি ফুটে উঠে ওমনি উর্ধ্বে উঠে হল অদৃশ্য। শুধু তার সামনে নদীর বুকেই নয়, অদূরে মড়া-ফেলার ডাঙ্গায়, ছেলে-পুঁতার চরে তার কথার কম্পনে মনে হয় উর্ধ্বে উঠত দু—একটা আত্মা। কেও গোলাপী আভার বিন্দুর মত, কেও পীতাভ রঙের ফিনকির মত। কেও আবার সবজে, মেটে, বাদামী রঙের আলোর স্ফুলিঙ্গের রূপ ধরে উঠে যেত শূন্যে। ঠিক তারাবাজির মত। তারপর মিলিয়ে যেত আকাশের অন্ধকার বুকে। বাক্যহারা মুখে, বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখত ভূতনাথ। কতকক্ষণ কে জানে। হয়তো কোনদিন ঘোর কাটিয়ে নিজের আপনা-আপনি কারখানায় ফিরে আসত ভূতনাথ। কিংবা কোনদিন বিলম্ব দেখে তার সেপাই-দারোয়ান ও লগ্‌দী বাবুরাই যেত তার কাছে। সম্বিৎ ফিরিয়ে তার নিয়ে আসত কারখানায়।

কারখানায় এসে তারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জানতে চাইত বাবুর কাছে তার হতভম্বের মত শ্মশান চিতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকার কারণটা। কিন্তু যে রহস্যের ভূতনাথ নিজেই পারত না ঠিক মত উদঘাটন করতে—সে রহস্যের কথা কি বলবে তাদের? কি বুঝিয়ে করবে ভীমচাঁদদের কৌতূহলের নিরসন সে?

তবে নিজে বাবু মুখ ফুটে কিছু বলুক বা না বলুক, তারা কিন্তু আশ-পাশ গ্রামে প্রচার করে দিয়েছিল যে ভূতনাথবাবু একজন মস্ত বড় ভূত-সিদ্ধাই। পিশাচ সাধক মহাপুরুষ। তার সিদ্ধাই শক্তির ফলেই নাকি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কারখানার ভিতর সব ভূতের নাচন, প্রেতের কোঁদন। নদীর মাঝে শ্মশানের বুকে চিতার মড়ার উপর কাঠগুলো নিয়ে ভূত ভূতনীদের ঠুনো-ঠুনি ঠুকো ঠুকি যে ঝগড়া-ঝাটির আওয়াজ শুনত তারা তাও গেছে বন্ধ হয়ে নাকি এই ভূতনাথবাবুরই মন্ত্রগুণে। মন্ত্র বলে বেঁধে দিয়েছেন তিনি নাকি নদী পাড়ের গাছ-গাছালিতে পেত্নী-পিশাচিনী, শাক্‌চুন্নীদের উপদ্রব। কারণ মাঝরাতে তাদের চিল চিৎকার বা শুকনি হাঁচির মত বিদঘুটে হাসির শব্দ আর আসে না তেমন কানে। আসে না ভেসে আর তেমন তাদের কাছে—দূরে মড়া-ফেলার চড়ার ভূতুড়ে কাশি বা ছেলে-পুঁতার চরের বাল-বাচ্চাকা মাফিক অর্থাৎ কচি-খোকার মত "টঁহা-টঁহা" কান্না। বাবু নাকি—"তুকতাক করিয়ে সব বিলকুল বন্ধ করিয়ে দিয়েছে।"

কি যে ভূতনাথ তা ভূতন[illegible]ই জানে। কি[illegible] [illegible]কে একজন মস্ত বড় ভূতের ওঝা বা গুণিন মন্ত্ররিয়া জেনে কারখানার লগদী বাহাদুররা পরম নিশ্চিন্তে কাটাতে লাগল দিন। এধারে পরোক্ষভাবে ভরসা করে ভূতনাথবাবুকে অবিনাশ চৌধুরীও অবিরাম তার কারখান[illegible] কাজের গতি দিলেন বাড়িয়ে। দেখতে দেখতে সেই মেশিন ঘরটার দেওয়াল উঠল মাথা অব্দি অর্থাৎ লিনটন সামাল পর্য্যন্ত। আর তখনই এল ভূতনাথের জীবনে এক চরম মুহূর্ত, পরম ক্ষণ ও চূড়ান্ত পরীক্ষার পালা। তার শক্তি-সাহস, বল ভরসা, সামর্থ্য-যোগ্যতা যাচাই করার যাকে বলে একেবারে অন্তিম পর্য্যায়।

আগেই বলা হয়েছে কারখানার মাঝের বট গাছটা কাটার পর থেকেই নাকি কারখানা গড়ার কাজে লেগেছে যত বিপত্তি ও ঝঞ্ঝাট। পরিকল্পনা মাফিক কাটা বট-গাছটার গোড়ায় মেশিন ঘরটা করতে যেতেই শুরু হয়েছে যত সব ভূতুড়ে ঝামেলা। যতবারই তুলতে [illegible] যা হয়েছে মেশিন ঘরের গাঁথনি তত বারই ফেটেছে ভিত, ভেঙ্গেছে দেওয়াল। এক অদৃশ্য অলৌকিক শক্তি অসাক্ষাতে সকলের তছনছ করে দিয়েছে সমস্ত কিছু। ছিদ-ছাতুর করে দিয়েছে ঘরটার আগা-গড়া। এ এমনিই এক শক্তি যা যাগ-যজ্ঞ মানে না, হোম-গীতা পাঠ, চণ্ডী পূজাকে পরোয়া করে না। সত্যি বলতে কি—এ সমস্যাটার সমাধান করবার জন্যই অবিনাশবাবুর ভূতনাথকে এখানে রাখা। আর আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে, এই মেশিন ঘরটার সম্পূর্ণ হওয়ার উপরই নির্ভর করছে ভূতনাথের ভবিষ্যৎ। তার চাকরি। শুধু এখানে তার মুখ রাখা নয়, ঘরে ফিরে মায়ার কাছে মুখ দেখানোটাও তার নির্ভর করছে এর উপরই। মনে পড়তে লাগল ভূতনাথের অবিনাশবাবুর সমস্ত কথা। হতে লাগল স্মরণ তার সেই সতীর মুখে শোনা এ জায়গাটার অতীত ইতিহাস।

বহুকাল আগে নাকি ছিল এ জায়গাটা 'মড়া ফেলার জঙ্গল'' মানুষ পোঁতার ডাঙ্গা'' বা ছেলে পোঁতার চর নামে পরিচিত। পরে গন্ধেশ্বরী নদী এ পাশটায় চড়া ফেলতে ফেলতে সরে যায় ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে। নদী সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদী পাড়ের এই মড়া ফেলা, পুঁতা ও পোড়ানোর ক্ষেত্রগুলোও যায় সরে। ফলে ক্রমশঃ ডাঙ্গায় রূপ নিতে থাকে এ চৌহদ্দিটা। কালে এ ডাঙ্গাটার সঙ্গে অদূরের ওই গায়ের মাথার শূন্য ডাঙ্গাটাও যায় মিশে। সরে যাওয়া নদীর চিহ্ন স্বরূপ দাঁড়িয়ে থাকে শুধু নাকি কারখানার মাঝের যে বট গাছটা কাটা হল নদী পাড়ের সেই বট গাছটা। গাছটা ডাল মেলে ঝুরি নামিয়ে একাই নাকি এই ডাঙ্গাটার শূন্যতাটাকে পূরণ করে চলেছিল। পরে তার তলায় এসে এক সাধু বেঁধেছিল ডেরা, গেড়ে ছিল আস্থানা। আস্থানাটা পরে পরিণত হয়েছিল আশ্রমে। আর সাধু থাকার ফলে বেনামী এই জায়গাটার নামকরণ হয়েছিল সাধুর ডাঙ্গা। সাধুর ডাঙ্গার সাধু বেশ জমিয়ে তুলছিল তার আশ্রমটাকে। আশ-পাশ গ্রামের লোককেও করছিল আকর্ষণ। ইচ্ছা ছিল ঝুপড়ির পরিবর্তে এখানে একটা পাকা খুপরি করবেন তিনি। আর করবেন—যেহেতু আশ্রমটা তার নদী ঘাটের প্রায় শ্মশান পাশেই অবস্থিত সেহেতু এখানে একটা শ্মশানেশ্বরের মন্দির।

শ্মশান বাবা সে পরিকল্পনাটাকে নাকি বাস্তবে পরিণত করবার জন্যে এগুচ্ছিলেন ক্রমশ। কোত্থেকে এক বয়স্ক শিক্ষিত, জ্ঞানী লোককে, বোধ হয় ভক্ত শিষ্যকে চেলা করে এনেছিলেন তার ডেরায়। লোকটাকে তার টুকটাক মেয়েলী চিকিৎসায় রপ্ত করিয়ে বসিয়ে ছিলেন আশ্রমে। পরিয়েছিলেন গেরুয়া, সাধুর আলখাল্লা। ''বৈদ্যি বাবা' নাম দিয়ে তার দিয়েছিলেন তাকে আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। নিজে তিনি নাকি বড় একটা আশ্রমে থাকতেন না। ঘুরতেন এধার ওধার। মন্দির করার। হঠাৎ নাকি চঙ্ উঠেছিল তার যাবেন কৈলাসে। সেখান থেকে শিব-লিঙ্গ ও মানস-সরোবরের জল এনে প্রতিষ্ঠা করবেন তার এখানের মন্দিরে সেই কৈলাসেশ্বরকে। গেলেন তিনি। রইলেন পড়ে আশ্রমে তার চেলাসাধু বৈদ্যিবাবা। বৈদ্যি বাবা আশ্রমটাকে কিন্তু আরো চালালেন জাঁকিয়ে। আশ-পাশ অঞ্চলের প্রায় সব গ্রাম থেকেই আসত তার কাছে মেয়ে বুড়ো ছেলে ছোকরার দল। কেও চিকিৎসার জন্য, কেও উপদেশ নিতে, কেউ বা তার কাছে ধর্মগ্রন্থ পাঠ শুনতে। নিজে প্রনামী না নিলেও বাবার মন্দির করার জন্য টাকা-পয়সা যে যা দিত নিতেন তিনি। মাঝে মধ্যে এধার ওধার যেতেনও আদায়ে। কিন্তু হঠাৎ একদিন বৈদ্যি বাবা হয়ে গেলেন উধাও। আশ্রম তার তছনছ! ঝুপড়ি পুড়ে ছাই। ব্যাপার কি?

ব্যাপারটার রহস্য কিন্তু উদঘাটন হলনা আর। হবে কি করে, এ অঞ্চলের পাতুড়ে রাজা, জমিদার, রায়—গঞ্জের চৌধুরী বাবুরা সব কিছু যেন ধামাচাপা দেবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তাদের কায়দা-কানন থমথমে ভাব দেখে মনে হল সকলের, যে সাধু বাবাকে বোধ হয় মারা হয়েছে। উধাও হয়েছে তার লাশ। পড়লে ধরা পাছে গোটা অঞ্চলটার উপর পড়ে তার ঝড় তাই এ নিয়ে আর কানাঘুষা করল না কেও। তাছাড়া সে সাধুবাবাও কৈলাস তীর্থ থেকে এলেন না আর ফিরে। ফলে যা হয় তাই হতে লাগল। আস্তে আস্তে আশ্রম, সাধু, সাধুর ডাঙ্গা। সব মানুষের মন থেকে যেতে লাগল মুছে। বছর বছর ঝড় বৃষ্টিতে মাটির সঙ্গে যতই মিশে যেতে লাগল সে স্থান ততই বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যেতে লাগল সেসব স্মৃতি। কালে কালে সে স্থানটাতে গজিয়ে উঠতে লাগল বাবলা গাছ। গাছগুলো পরে পরে সেখানে এমন করল ষোল আনা আধিপত্য বিস্তার যে সাধুর ডাঙ্গা নামটা পর্য্যন্ত কর্পূরের মত যেতে লাগল উবে। শেষ পর্য্যন্ত সাধুর ডাঙ্গা নামের পরিবর্তে নাম হল জায়গাটার—'বাবলা ডাঙ্গা।'

অনেকদিন পর সেই বাবলা ডাঙ্গার বাবলা গাছ সব উৎখাত করে সেই জায়গার মালিক চৌধুরীবাবুদের বংশধর অবিনাশবাবু করতে নামেন এখানের এই কারখানাটা। জায়গাটা বেছে দেন তার শ্বশুর মশায়ই এবং এ পরিকল্পনটাও নাকি তাঁরই। স্থান নির্বাচন অবশ্য ঠিকই করেছিলেন তিনি। কারণ সব দিক দিয়েই জায়গাটা ছিল সুবিধাজনক। পাশেই নদী—সুতরাং জল বালির অভাব ছিল না। পূর্বের পাকা রাস্তাটার সঙ্গে ডাঙ্গার সড়কটা ছিল যুক্ত। সুতরাং সে পথে বাঁকুড়ার বাজারের সঙ্গে যোগাযোগেরও কোন অসুবিধা ছিল না। ছিল না কুলি-কামিনের অভাব। কারণ দশ-বারোটা গ্রামের মধ্যে অবস্থিত ছিল বলে এটা। উপরন্তু কম মজুরীতে মজুর পাওয়া যেত এখানে। কিন্তু যাক গে ওসব কথা।

এধারে মেশিন ঘরটার দেওয়াল মাথা উঁচু পর্যন্ত উঠতেই কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল ভীম চাঁদদের। ভূতনাথকে তাদের ভয়ের কথা বলতে কেমন যেন ইতস্ততঃ করতে লাগল তারা। তাদের পান্ডুর মুখ দেখে একদিন ভূতনাথই জিজ্ঞেস করে উঠতে বলল তারা তাদের ভয়ের কারণ। কারণটা হল সেই একই। মেশিন ঘরটা লিনটন পর্য্যন্ত উঠলেই নাকি ভূতুড়ে তাণ্ডব শুরু হয় এখানে। অলৌকিক ভাবে দৈত্যের মত আসে একটা ঝড় ওই কাটা বট গাছটার মতই মূর্ত্তি ধরে, ভয়ঙ্কর গর্জন করে। দাপটে তারা কারখানায় টিকতে পারে না কেও। সেই দৈত্য-ঝড়টার হুঙ্কারেই ছুটে পালায় কারখানা ছেড়ে। সেই ঝড়টাই মেশিন ঘরটার দেওয়াল ভাঙ্গে , ভিত তছনছ করে। উঠতে দেয় না ঘরটা। বার বারই এরকম হয় অথচ এমন নাছোড়বান্দা বাবু কিছুতেই আর ছেড়ে দেন না মেশিন ঘরটার কাজ।

কেন এমন হয়? কোত্থেকে উঠে এ ঝড়? হয়ই বা সেটা কেমন ধারায়? এসব প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল তাদের গ্রাম মুরুব্বি, মুখ্যা-মাতব্বরদের মুখ থেকে শোনা কথা। কথাটা হল সেই এখানের সাধু ডাঙ্গার সম্বন্ধে। অর্থাৎ এই ডাঙ্গার সেই অতীত ইতিহাস সম্পর্কে। এ ইতিহাস কিন্তু গোপন, ধামা চাপা দেওয়া। বললেও ভূতনাথকে অনুরোধ নাকি তাদের একথা গোপন রাখতে হবে তাকেও। কারণ বাবু-বড়লোকদের বাপ-ঠাকুরদাদের কীর্ত্তি বিশেষ করে তাদের মুখ দিয়ে প্রকাশ পেলে নাকি চাকরি যাবে তাদের। কথাটা হল নাকি যখন এখানে একটা আশ্রম গড়ে উঠেছিল তখন সে আশ্রমের এক সাধুর সঙ্গে চৌধুরীবাবুদের এক ছেলের গণ্ডগোল হওয়াতে একদিন রাত্রে গোপনে সে বাবু খুন করে সাধুকে। খুন করার পর লাশটা তার এমনভাবে বেপাত্তা করে দেয় যে কোন হদিশ পাওয়া যায় নি তার। কেও বলে টুকরো টুকরো করে নদীর বুকে ছড়িয়ে দিয়ে মড়াখেকো শেয়াল কুকুরদের ভোগে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কেও বলে ওই বট গাছটার নীচেই নাকি পুঁতে ফেলে সে লাশ নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। সেই হয়েছে সাধুই নাকি ভূত হয়েছিল ওখানে। ছিল ওই বটগাছটাকে আশ্রয় করে। সাধু মহাত্মার প্রেতাত্মা তাই নাকি এদ্দিন শান্ত ছিল সে। কোন দৌরাত্মি করেনি। কিন্তু ভুল করেছেন অবিনাশবাবু তার আশ্রয় ওই বট গাছটাকে কেটে। নিরাশ্রয় হয়ে গেছো-ভূতটা নাকি এখন আশ্রয় নিয়েছে তার মাটির নীচে পুঁতা থাকা সেই লাশটাতে। যতই উঠছে মেশিন ঘরের দেওয়াল ততই পড়ছে নাকি চাপ তার লাশের উপর। ফলে উঠছে সে উত্তেজিত হয়ে। রেগে মাটি ফুঁড়ে উঠে কখনও দিচ্ছে ফাটিয়ে ঘরের ভিত, কখনও ঝড়রূপে এসে দিচ্ছে ভেঙ্গে দেওয়াল। মোটকথা আশ্রয়হীন করে তাকে তার আশ্রয়ের উপর কোন ঘর উঠা বরদাস্ত সে করবে না কিছুতেই। কিন্তু অবিনাশবাবু বুঝেও নাকি বুঝছেন না এসব , ঠকেও নাকি শিখছেন না তিনি কিছুতেই। বিপদ বাড়ছে শুধু লাল বাহাদুরদেরই। কারণ রাত্রে বেলায় কারখানা আগলে থাকতে হচ্ছে তো তাদেরকেই। অনুরোধ তাদের, ভূতনাথ যেন বুঝিয়ে বলে বাবুকে যে ভূতদের সঙ্গে ওভাবে জেদ করা উচিত নয়। কি দরকার সাধু-ভূতের আস্থানাটার উপর মেশিন ঘরটা দাঁড় করাবার? কুমীরের সঙ্গে বাদ করে জলে বাস করে কেও থাকতে পারে? ও জায়গাটা বাদ দিলে যদি ঠান্ডা থাকে ভূতটা তাহলে মেশিন ঘরটা অন্য জায়গায় তুললেই তো হল।

অদ্ভুত এদের ধারনা। কিন্তু ধারনাটা মিথ্যাই বা বলবে কি করে। কারন সত্যিই তো মেশিন ঘরের উঠলেই দেওয়াল হঠাৎ অলৌকিকভাবে যায় সেটা ভেঙ্গে। ফেটে পড়ে ভিত। গাঁথনি হয় তছনছ। যাই হোক—সত্যি মিথ্যা এর যাচাই করে দেখতেই হবে ভূতনাথকে। হল সে বদ্ধ-পরিকর। এ অলৌকিক কাণ্ডের আসল রহস্য উদঘাটন করবার জন্য হল সে দৃঢ়-মনা। ভূতনাথের সাহসে সাহসী হয়ে রইল অবশ্য কতকটা নির্ভয়ে সেই রাম, ভীম সিং ও লাল বাহাদুর। তবে দিনটা তাদের লোকজনের কাজে-কম্মে ভীড়-হাবড়ে যেমন করে হোক কাটলেও রাতটা যেন বাঘ হয়ে আসত তাদের কাছে। গা করত ছমছম—ভয়ে, ডরে।

সেদিন রাতে ঘুমটা ভূতনাথের ধরেছিল কি ধরেনি—কে জানে। হঠাৎ পেল শুনতে একটা ভয়ঙ্কর গর্জন। কারখানার মাঝে নয়—কারখানার ধারে পাশের চৌহদ্দিতেও নয়। মনে হল তার আসছে যেন অদ্ভুত একটা হুঙ্কার অদূরের ওই গন্ধেশ্বরী নদীর বুকটা থেকে। "হুঁ—যুঁ-যুঁ-হুঁ-উঁ-উঁ" —সে এক উদ্ভট শব্দ। উৎকট আওয়াজ। একটানা। ধড়ফড়িয়ে উঠল ভূতনাথ। বসল বিছানার উপর সোজা হয়ে। কানদুটোকে খাঁড়া করে শুনতে লাগল সে-সেই শব্দটার ধরন-ধারন। আগন্ত কাল-বৈশাখী, উঠন্ত টাইফুন, ছুটন্ত টর্নেডোর মত মনে

হল শব্দটা। হল মনে যেন ঠিক শেয়াল কুকুরের উপর দিকে মুখ করে একটানা চিৎকার করার মত। আবার মনে হল তার—না, তা তো নয়। এটা যেন মানুষের গোঙ্গানী। হঠাৎ কাকেও পেটে খোঁচা মেরে ফেলে দিলে তার যন্ত্রণা কাতর আর্ত্তনাদটা যেমন হয়—এ আওয়াজটা যেন ঠিক তেমনিই। যাই হোক, শব্দটার গতি-প্রকৃতি, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বেশ ভালভাবে অনুধাবন করার জন্য ভূতনাথ তার শ্রবন শক্তিটাকে রাখল তীক্ষ্ণ করে। মন-প্রাণ এক করে শুনতে লাগল সেটা।

হঠাৎ ভয়ে ভুঁড়ি কাঁপিয়ে ভীম চাঁদ, তার পিছনে গোঁফ কাঁপিয়ে রাম সিং ও আতঙ্কে অজ নন্দন হয়ে হন্তদন্তভাবে ছুটে এল লাল বাহাদুর। ভয়ে ভাল্‌সে মাছের মত চোখ তাদের, আতঙ্কে ফ্যাকাশে মুখ। কি ব্যাপার।

ব্যাপার বলবে কি কামার শালের হাঁফরটার মত হাঁসফাঁশ করতে লাগল তারা। কাঁপতে লাগল বলির পাঁঠার মত থর থর করে। হাল্কা করবার জন্য বিষয়টাকে নিজে যেন কিছু শুনতে পায়নি এমনি একটা ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ, —বলি ব্যাপারটা কি আগে বলবে তো?

বার কতক ঢোক গিলে প্রকৃতস্থ হবার চেষ্টা করে আধা হিন্দী আধা বাংলা কথায় বলে উঠল ভীমচন্দ্র, —হাপ্‌নি শুনতে পাচ্ছে না?

—কি?

—জিনকিআওয়াজ, প্রেতকা কান্না?

"—জিনের আওয়াজ প্রেতের কান্না মানে?" জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ।

"—আরে, ওহি তো সাধুভূতকা চিল্লাহট্‌ আছে বাবুজী।" ভয়ে বেবুনের মত চোখদুটো বিস্তারিত করে উঠল বলে লাল বাহাদুর, —তুরন্ত হিঁয়াসে ভাগিয়ে যাইতে হোবে বাবুজী।

—কেন?

"—কেন কা বাত এভি বিলকুল ছাড়িয়ে দেন বাবু।" বলে উঠল রাম সিং—"মালিক ফের ওহি জিন ভূতকা আস্থানা পর মেশিন ঘর তুলিয়েছে। মাট্টিকা নীচে উসকা লাশমে চাপ পড়িয়েছে। তকলিফ্‌ হোয়েছে। ইসলিয়ে ও চিৎকার কোরছে বাবু। ও আজ গুস্তাফি মাফ করবে না বাবু। নদীমে ঝড় ওঠাইয়ে ও এভি এখানে ছুটিয়ে আসবে বাবু। জলদি-সে-জলদি হিঁয়াসে চলিয়ে চলেন বাবুজী, ও বহুৎ খতরনক প্রেতাত্মা আছে।

বহু বলাবলির পর তার ঘর থেকে অবশ্য বাইরে বেরিয়ে এল ভূতনাথ। এল বেরিয়ে ব্যাপারটা কি স্পষ্ট ভাবে বুঝতে, নিজের চোখে দেখতে। পেল দেখতে সেটা অবশ্য ঠিক কারখানাটার গেটের সামনে এসে দাঁড়াতেই। শব্দটা অনুসরণ করে দূর নদীর মাঝ বুকে নজর ফেলতেই দেখল সে একটা ঘূর্ণিঝড়ের মত জিনিস। থমকে গেল ভূতনাথ। তার সঙ্গে চমকে গিয়ে থমকে দাঁড়াল লাল বাহাদুর, ভীম চাঁদের দলও। সেই বালি ধূ ধূ করা নদী বুকটার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বলে উঠল তারা — দেখেন বাবুজী দেখেন, জিন-ভূতকা মূরত দেখেন। কেমন চীৎকার করিয়ে উঠছে দেখেন।

দেখল ভূতনাথ কারণ অদ্ভুত শব্দটা আসছিল ওটার মধ্যে থেকেই। কাক জ্যোৎস্নার রাত। ফাঁকা সামনের ডাঙ্গাটা সুতরাং দৃষ্টি পথে তার বাধা সেরূপ কিছু ছিল না। কিন্তু তবুও এত দূর থেকে যা চোখে পড়া সম্ভব নয় তাও কিন্তু পড়তে লাগল তার নজরে, স্পষ্টভাবে। তা হল ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যেকার শ্মশানের ছাই-ভস্ম, চিতার পোড়া হাড় ও কাঠ কয়লার গুঁড়ি এবং তার সঙ্গে মড়া পোড়ানোর দু একটা খেঁচন দাড়ির টুকরো। ঘূর্ণিঝড়টা শুধু অদ্ভুত নয় অলৌকিক বলেও মনে হল তার। কারণ মাঝনদীর ওই ঘূর্নাবাতটার আশ-পাশে কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। এমন কি নিকটের নদী পাড়ের গাছপালা গুলোতেও ছিল না তার কোন প্রভাব। নিথর নিঝুম ছিল তারা। মাথা হেলা, ডাল দোলা তো দূরের কথা তাদের একটা পাতাও নড়েনি পর্য্যন্ত। শুধু তাই নয় একমাত্র সেখানটুকু ছাড়া আশ পাশ প্রকৃতির সমস্ত পরিবেশটাই ভূতনাথের নিঃসাড় নিস্তব্ধ মনে হল। অথচ ঘূর্ণিঝড়টা তার মধ্যেকার ওইসব টুকরো-টাকরা জিনিসগুলো নিয়ে ঘুরছিল এমন বন্‌-বন্‌ শন্‌-শন্‌ ভয়ঙ্কর শব্দে যে দেখে শুনে ভয়ে ভির্মি খাবার মত অবস্থা।

ন্যাড়া দিয়ে ভূতনাথকে বলে উঠল রাম সিং—তুরন্ত হিঁয়াসে ভাগ জানে হোগা বাবুজী। ওহি বায়ু ভূত আছে। জান খতরামে পড় যায়েগা।

ভয় কাটাবার জন্য তাদের বলে উঠল ভূতনাথ, —ওটা বায়ুভূত কেন হবে, ঘূর্ণঝড়। গ্রীষ্মকালে নদীর বুকে হামেসাই এমন উঠে। এতে ভয়ের কি আছে?

প্রতিবাদ করে উঠল রাম সিং, — নাহি বাবুজী, ওহি ঘূর্ণি ঝড়, ফুর্নি ঝড় কুছ নাই আছে। ভগবানকে কসম, ওহি বিলকুল সাচ ভূত আছে। ঘূর্ণি ঝড় হোইলে কি কভি মুরতটা ওমনি বট বৃক্ষটা মাফিক হোয়? ওহি কারখানাকা বট বৃক্ষকা ভূত আছে বাবুজী। গাছটা কাটিয়ে লইয়ে যাইবার সময় নদীর যে স্থান-পর ট্রাকটা ফাঁসিয়ে গিয়েছিল সেইখানেই ওটা গাছের মতন উঠ আছে দেখতাছেন না। ওহি কাটাহুয়া পেড়কা ভূত আছে বাবুজী।

"—হাঁ বাবু, "রাম সিংহের সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে বলে উঠল লাল বাহাদুরও —"ওই খানটাতেই গাছটার গদি নামাইয়ে দিয়ে ট্রাকটা চালিয়ে গেইছিলো। পরদিন নয়া ট্রাক লিয়ে গাছ উঠাইতে আইসে দেখে গদি গুম হইয়ে গেছে। ওহি পেড়কা গুঁড়িকো আর কোথাও খুঁজিয়ে পাওয়া যায় নাই বাবুজী, এ ভি তক। ওই ভূত গাছটাই আজ নদীকা মাঝে ঝড় হোইয়ে উঠছে বাবু। জলদি পালাইয়ে চলেন। ওহি বহৎ গুস্সামে আছে। ও ভূত কারখানামে জরুর আসবে বাবুজী এবং সব কুছ ভাঙ্গিয়ে দিবে। ইস বকত্ থাকলে হামাদেরও মারিয়ে ফেলিয়ে দিবে বাবু। ভগবানকে লিয়ে মিনতি করছি বাবু হিঁয়াসে নিকলে চলুন। জলদি।

কিন্তু তা কি যাওয়া যায় কখনও। বিশেষ করে ভূতনাথের পক্ষে। এযে দস্যুর মত বেইমানির কাজ হবে তার। বাবুর কাছে মুখ দেখাবে সে কি করে? কি করেই বা দাঁড়াবে সে সকলে [illegible] কাছে? তার উপর গড়ে উঠা এ অঞ্চলের বিশ্বাসটাকে তাহলে যে তার নিজের হাতে টুঁটি চেপে মারা হবে। সে যে তার পক্ষে মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক। না-না, তা সে পারবে না কিছুতেই। পারবে না সে কোনমতেই নিজের বিবেক, নিজের মনুষ্যত্ব, নিজের কর্ত্তব্য পরায়ণতাকে অপমানিত করতে, অমর্য্যাদা করতে। আপনার সৎ-সত্তাকে কালিমা লিপ্ত করতে।

বেশ কিছুক্ষণ চলল বাবু ও রাম সিংদের মধ্যে টানা পোড়েন। নানাভাবে বলে বুঝিয়ে সাহস দিয়ে ভূতনাথ যেমন তাদের প্রতিনিবৃত্ত করতে পারল না তেমনি ভূতনাথকেও তারা নানাভাবে হাতে পায়ে ধরে মিনতি করেও সে স্থান ত্যাগ করতে রাজি করাতে পারল না। থাক বাবু তার গোঁ নিয়ে। বাবুর কি—তার "মাগ না ছেল্যা—ঢেঁকি না কুলা।" কিন্তু তাদের ঘরসংসার আছে। ঘরে আওরৎ বাচ্চা আছে। তারা তো আর বাবুর মত ভূতের হাতে নিজেদের জীবনটাকে তুলে দিতে পারবে না। তাহলে তাদের দেশে মাগ ছেলেরাও না খেয়ে মরে যাবে। সুতরাং বাবুকে ফেলে পালিয়ে গেল তারা। যঃ পলায়তি-স জীবতী।

একা ভূতনাথ তার গোঁয়ার্তুমিটা নিয়ে ভূতের মত কারখানার গেটের গোড়ায় রইল দাঁড়িয়ে। পিছনে তার শব-শান্ত কারখানাটা। সারি সারি নিস্পন্দ ঘরগুলো যেন ভয়ার্ত চোখে বেবাক হয়ে নিমেষ গনছে তারা। আর সামনে, অদূরে তার, নদীর বুকে সেই ঝড়ো দৈত্যটা। ফুঁসছে যেন রাগে। ফুলছে যেন ক্রমশঃ ধরছে যেন বিরাট আকার। তারপর সেটা আসতে লাগল ক্রমশঃ মাঝ-নদীর বুক ছেড়ে পাড়ে। পাড় ছেড়ে তড়ায়। তড়া ছেড়ে ডাঙ্গায় অর্থাৎ অবিনাশবাবুর কারখানাটার দিকে। ঝড় তো নয়—যেন চলন্ত বিরাট একটা বটগাছ। তার বিশাল বপু নিয়ে চাঁই ঘুর ঘুর, ঘুরতে ঘুরতে আসতে লাগল যেন সেটা কারখানাটাকেই লক্ষ্য করে। সে কি বাজখাই আওয়াজ তার। কি প্রচণ্ড ঘূর্ণন। ঝাঁকড়া মাথা বিরাট একটা রাক্ষস যেন হাত বাড়িয়ে, হাঁও মাঁও করে খেতে আসছে ভূতনাথকে ছুটে। সত্যি বলতে কি—ওই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণা বাতটার প্রলঙ্কর মূর্তিতে অলৌকিক ভাবে তেড়ে আসার ভূতুড়ে প্রকৃতি দেখে ভয়শূন্য মনটা সভয় হল ভূতনাথের। শঙ্কাযুক্ত হল তার অন্তরটা।

কিন্তু অদ্ভুত সে। ভয়ে মানুষ ভগবানকে স্মরণ করে। কিন্তু ভূতনাথ করতে লাগল স্মরণ তার মৃতা স্ত্রী সতীকে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পোঁতা খুঁটির মত দাঁড়িয়ে সেখানে বোধ হয় একনিষ্ঠ প্রাণে, মনে মনে সে ডাকতে লাগল তাকে। হঠাৎ সামনে তার হল উদয় যেন আকাশ গঙ্গার এক ছিলকে আভা। আভাটা হল বড় হতে হতে যেন এক টুকরো ভাসমান মেঘ। মেঘপুঞ্জটার গা থেকে হাত-পা ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ধূঁয়োর মত বেরিয়ে রূপ নিতে লাগল সেটা আবছা কুয়াশার একটা মনুষ্য মুর্ত্তিতে। অস্পষ্ট সেই মনুষ্য মূর্ত্তিটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে হতে রূপ ধরল সতীর—তার সেই মিষ্টি মুখের সতীর, সরল মুখের সতীর, হাসিমাখা মুখের সতীর। ভূতনাথ তার অবাক চোখের বেবাক চাওনি নিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

কথা বলে উঠল সেই সতীর চেহারাটা তেমনি হাসিমাখা মুখে পরিচিত স্বরে,—ভূতনাথের আবার ভূতের ভয়। একি ভূতুদা?

কি যে বলবে তার ভূতুদা, খুঁজে পেল না। বলল সতী-ই,—বাবা ভূতনাথের অংশ তুমি, মহেশ্বরের শক্তি, তোমার আবার ভয় কিসের ভূতুদা? আর ভয়টা তুমি করবেই বা কাকে? এই তো তুমি সেদিন উপদেশ দিলে সকলকে—অহং ব্রহ্মাস্মি। তাছাড়া সেই ছোটবেলায় তোমাদের ঘরে গীতাপাঠ করতে করতে কি শ্লোকটা পাঠ করে বুঝাচ্ছিলেন তোমাদের গুরুমশায়,—অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়—স্থিতঃ।অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতনামন্ত এবচ...... ।" মনে নেই। তবে সেই একই পরমাত্মাই তো তোমার আমার, ওই ভূত-প্রেত সবার মধ্যেই রয়েছেন। ভয় করা তাহলে অজ্ঞানতা নয় কি? ভয়ের এখানে কিচ্ছু নেই ভূতুদা।

"—এমনিতে আমার ভয় হয়নি সতী।" বলে উঠল ভূতনাথ,—কিন্তু দেখছিস না অদূরে ওই নদীর বুক থেকে কেমন একটা অলৌকিক ঘূর্ণি ঝড় ভূতের মত এদিকে হা - হা করে ছুটে আসছে। ওই ভৌতিক ঝড়টা দেখেই মনটায় আমার হল হঠাৎ ভয়ের সঞ্চার।

"ভৌতিক ঝড়ই হোক আর ভূত-পেতনী রাক্ষস-পিশাচই হোক, ভাবছনা কেন সবই সেই একই পরমাত্মার রূপ।" বলে উঠল সতী,— যে অখণ্ড চৈতন্য তোমার আবরণে তুমি, আমার আচ্ছাদনে আমি হয়ে রয়েছেন সেই অখণ্ড চৈতন্যই তো ভূতের পোশাকে ভূত, প্রেত-পোশাকে প্রেত ও ঝড়ের আবরণে ঝড় হয়ে বিরাজ করছেন। তুমিও যা ও ভূত-প্রেতও তা। সুতরাং নিজেকে কখনও কি নিজে ভয় করে ভূতুদা?

"ভয় হয়েছিল বোধ হয় তোকে ভুলে থাকার জন্য সতী।" বলে উঠল ভূতনাথ,—ভূতনাথের শক্তি সতী কাছে থাকলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সে কাকেও কখনও ভয় করবে না। আমাকে ছেড়ে যাসনে তুই সতী, কখনও না, কোনদিনও না, এক মুহূর্ত্তের জন্যই না।

হেসে উঠল সতী, "—আবার সেই কথা।" 'বলে উঠল সে' —কখনও ছেড়ে আমি তোমাকে থাকতে পারি ভূতুদা? সব সময় তোমার কাছে কাছেই তো থাকি। ভূতনাথ ছাড়া পারে কি সতী থাকতে কখনও?

—ভুলাচ্ছিস আমাকে?

—সে কি কথা। ভূতনাথকে আবার সতী ভুলাবে কি। তার চেয়ে বল যে আমার থাকা তুমি জানতে পার নি। বুঝতে পারনি আমি তোমার সঙ্গে কখন কেমন ভাবে থাকি। বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি। সেদিন কুলদা বাবু, মানিক বাবুকে যে কথা বলছিলে সে কথার মধ্যে ছিলাম আমি। পাথরমুড়ি গ্রামের মন্দির দেবতা রসিক-নাগরের গহনা উদ্ধারের সময় তোমার কাজের মধ্যে ছিলাম আমি। প্রমীলা দেবীকে দেওয়া তোমার উপদেশের মধ্যে ছিলাম আমি। আর বলব?

"—আর বলতে হবে না। সবই এবার বুঝতে পারছি আমি।" বলে উঠল ভূতনাথ—তাই তো ভাবি এত বড় বড় কথা আমি তাদের বললাম কি করে। এত তত্ত্বকথা, হিতোপদেশ বেরুচ্ছে কি করে আমার মুখ দিয়ে। তাছাড়া আমার মত একটা সামান্য লোকের কথায় ওসব মান্য-গণ্য জ্ঞানীগুণী লোকগুলো সব বশই বা হচ্ছে কি করে। সব তাহলে তোর কাণ্ড?

"—তোমার মত আমারও যে পরোপকার করতে মন যায় ভূতুদা। পরোপকার যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ পূজা। বলে উঠল সতী,— কিন্তু সে পূজা করতে পারিনি আমি বেঁচে থাকতে। শুধু অসহায়া অসমর্থ সামান্য একটা বালিকা ছিলাম বলেই নয়—সৎ মায়ের ভয়ে, বাড়ীতে অশান্তি হবে বলে। কিন্তু মরে আমি স্বাধীন হলেও সেভাবে নিজের ইচ্ছা মত পরকল্যাণ করতে পারছি না ভূতুদা। স্থূল দেহীরা বিদেহী সত্তার উপস্থিতি ভয়-কাতুরে বিরূপ মনে দেখে। তাছাড়া নিজের পরোপকার চিন্তার কম্পন, পরমঙ্গল ভাবনার স্পন্দন অপরের মনে স্পর্শ করিয়ে পরোক্ষভাবে সে কাজ করব কি জগতে সেরকম পবিত্র আধার খুঁজেও পাই না আমি। তাই তোমার মাধ্যমেই পর কল্যাণ রূপ ঈশ্বর আরাধনার সুযোগ পেয়েছি আমি ভূতুদা। আমার মনের আশা পূর্ণ করছ তুমি।

সতীর কথায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভূতনাথ। বলে চলল তার সতীই, "— শুধু ভূলোকের স্থূলদেহীদেরই নয় ভূতুদা, ভুবর্লোকের সূক্ষ্মদেহীদেরও উপকার করতে মন-প্রাণ আমার আনচান করে উঠে।

ইহলোকের চেয়ে পরলোকের বাসিন্দারা বড় বেশী অসহায় ভূতুদা। এরা স্থূল ভোগ-মোহের লালসায় সূক্ষ্ম শুভ বাসনা কামনার অতৃপ্তি জ্বালা নিয়ে ছটফট করে। এত অজ্ঞান তারা যে তাদের শ্মশান, চিতা বা মৃত্যুস্থানে অর্থাৎ তাদের বাস্তব দেহটা বিলীন হওয়ার ক্ষেত্রগুলোতে আটকে পড়ে থাকে। পুনরায় তাদের ভোগ দেহটা সেখানে ফিরে পাবার আশায়। আত্মীয়-স্বজনের পিছনে ঘুরে আবার তাদের আপন করে পাবে বলে। আত্মার মুক্তি, সত্তার উদ্ধার, বা উর্ধ্বলোকের চিন্তা করে না তারা, জাগেন ইচ্ছা অন্তরে। উপকার করতে কাছে যাব কি আমি উচ্চ-আত্মিকের হাওয়া ওরা সহ্য করতে পারে না, দিব্যাত্মার আভায় তারা পাশ ঠেসে না। তাই তো মাঝ রাতে, ভর-আঁধারে কারখানা থেকে নিয়ে যাই তোমাকে আমি নদীর বুকে শ্মশান মাঝে, চিতার পাশে। যাই নিয়ে দূরের মড়া ফেলার ডাঙ্গায় ও ছেলে পুঁতার চরগুলোতে তোমার মুখ দিয়ে বলতে তাদের উদ্ধারের কথা। তোমাদের কারখানার কোণায় অতীত-শ্মশানের মাটি কামড়ে পড়ে থাকা প্রেতাত্মাদের আমিই তো শোনাই ভূতুদা তোমার মাধ্যমে তাদের আত্মমুক্তির বানী। উদ্বুদ্ধ করি তাদের উর্ধ্বলোকে যাওয়ার জন্য, জ্যোতির্লোকে গতিবান করার জন্য। এর পরও কি বলবে তুমি তোমাকে আমি ছেড়ে থাকি, ভুলে থাকি আমি তোমাকে?

ভূতনাথ হতভম্ব—বিস্মিত, বিমূঢ়, নিশ্চুপ সে। কারণ নিজের উপর নিজ কৌতূহলের এতদিনে নিরশন হল তার। পারল সে বুঝতে কোন শক্তিতে রাত-আঁধারে ছুটে যায় সে সাধারণের ওইসব ভয়াল ভয়ঙ্কর ক্ষেত্রগুলোতে। কোন সাহসে দাঁড়ায় সে চিতার মাঝে, শ্মশান পরে। বলে সে কার কথা। শোনায় সে কার মন্ত্রবানী। যে ভাবনায় ভাবিত নয় সে, নয় সে যে চিন্তায় চিন্তিত, কখনও, কোনোকালে —সেই অচিন্তিত পূর্বকথা, অভাবিত বাক্য রাশি বেরোয় তার মুখ দিয়ে হৃদয়ের কোন অন্তঃস্থল থেকে। আর কথা শুধু কথাই থাকে না তার—ফল ফলে। বুঝল ভূতনাথ সমস্ত কিছু। তাই টানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল সে সতীকে, —আমার মাঝে তাহলে তোরই এসব কারসাজি। সকলের কাছে তুই-ই আমাকে চলেছিস এভাবে মহাপণ্ডিত, মহান জ্ঞানী ক'রে। সব তাহলে তুই-ই।

"—এভাবে কেন বলছ তুমি।" বলে উঠল সতী তাকে, —তুমিই তো আমি ভূতুদা, আমিই তো তুমি। একই সত্তার এপিঠ ওপিঠ আমরা। তাই তো তোমরা চিন্তা-কম্পন আমার মাঝে, আমার ভাবস্পন্দন তোমার মাঝে জাগায় সাড়া সঙ্গে সঙ্গেই। দুটো তার যদি একই সুরে বাঁধা থাকে ভূতুদা তাহলে তো একটার ঝঙ্কারে অপরটা ঝঙ্কৃত হবেই। একের তানে হবেই অপরটা অনুরনিত।

'—তাহলে তোকে দেখতে পাইনা কেন?" ছেলে মানুষি প্রশ্ন ভূতনাথের।

"—স্থূল চোখে তোমার আসক্ত হলে তো বাস্তব রূপ ধরতে হয় আমাকে।" বলে উঠল সতী, "—বার বার পার্থিব দেহ ধারণ করলে পৃথিবীর মায়ায় পড়তে হয় ভূতুদা। আত্মার উপর যায় পড়ে জাগতিক ভোগ কামনার শেওলা, লালসা মোহের আচ্ছাদন। এতে আত্মার ক্ষতি হয় ভূতুদা। তাই তো অদৃশ্য হয়েই থাকি আমি তোমার কাছে। দৃশ্য এখন হতে হল আমাকে তোমার ইচ্ছায় শক্তিতেই, কামনার আকর্ষণেই।"

• "—আগান্তু ওই অলৌকিক ঘূর্নাবাতটার জন্যই তোকে আমি স্মরণ করতে বাধ্য হলাম সতী।" বলে উঠল ভূতনাথ, "—দেখছিস না আসছে কেমন ওটা এই কারখানার দিকে, অদ্ভুত ভাবে। এমন বজ্র-হুঙ্কার, প্রচণ্ড বেগ ও তীব্র গতি তার অথচ তার ছোঁয়ায় ডাঙ্গার খেজুর গাছগুলোর একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না, দুলছে না তাল-গাছগুলোর লম্বা বাইলের শুকনো পাতাগুলো পর্যন্ত। ব্যাপার কি? ওটা কি সত্যিই ঘূর্ণি-ঝড় না অন্য কিছু? মানে—ভূত-ভৌতিক অদ্ভুতুড়ে পেত্নী প্রেতুড়ে কাণ্ড?

দেখল সতীন আগান্তু সেই ঘূর্ণাবাতটাকে নিবিষ্ট মনে। কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ। বলল তারপর গম্ভীর হয়ে, —তোমার ধারনাই ঠিক ভূতুদা। ওটা সাধারণ ঝঞ্ঝাবর্ত নয়, এক আত্মার তড়িৎকণা। নদীর মাঝে যেখানটা থেকে সে কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রথম উঠেছিল সেখানটাতেই মনে হয় পোঁতা হয়েছিল তার জড় দেহটা। ঘূর্ণি মধ্যবর্তী ফিকে হলদে রঙের আভাটা দেখে মনে হচ্ছে ওনি কোন ভুঃ-স্বঃ লোকের মধ্যবর্তী সত্তা। দেহ-বিলয়ের ক্ষেত্রের বিশেষ আকর্ষণের বেগে নেমে এসে ওভাবে জড়ীকরণ করে নিজেকে দৃষ্টি গ্রাহ্য করছেন। আসলে ওটা ঝড়রূপী প্রেতাত্মা অর্থাৎ বায়ুভূতই বটে ভূতুদা।

"—বায়ু ভূত?" বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ, —ঝড়-ঝঞ্ঝা বায়ু এসব আবার ভূত হয় নাকি?

"—সূক্ষ্মাত্মারা শুধু পঞ্চতন্মাত্রাকেই অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করে না ভূতুদা। মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রেতাত্মারা পঞ্চমহাভূতেরও জড়কণাকে আহরণ করে অবয়ব ধারণ করতে পারে।" বলে উঠল সতী,—"নদীর বুকে উঠন্ত ওই ঝড়োভূত অর্থাৎ আগন্তি ওই ঘূর্ণিবায়ুরূপী প্রেতাত্মাটা মরৎ-মহাভূতের সূক্ষ্ম জড়কণাকে নিজের কেন্দ্র-শক্তিতে আকর্ষণ করে ওমনিভাবে রূপবন্ত হচ্ছে। অন্তরের রাগ-জ্বালা, হৃদয়ের ক্ষোভ-দুঃখ এবং তার মনে গাঁথা-থাকা বিশেষ ধরনের এক চিন্তা প্রবাহই তাকে ওমনি ঘূর্ণিঝড় রূপী দৃষ্টিগ্রাহ্য করছে।

—তার মানে?

উত্তরে তার বলে উঠল সতী, —আমাদের গ্রামে বাবা ভূতনাথের মন্দির দাওয়ায় একবার জড় ভরতের উপাখ্যান পাঠ হচ্ছিল মনে আছে ভূতুদা? সেই শিব চতুর্দ্দশীর দিন, রাত্রে তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে এসে বসে পড়েছিলে আসরে। কি শুনেছিলে সে উপাখ্যানে? হরিণের কথা চিন্তা করতে মহর্ষি ভরত হরিণ হয়ে গেছলেন। তেমনি এখানের সেই অতীতের এই সাধুর ডাঙ্গার আশ্রমের এক সাধু মৃত্যুর পর তোমাদের ওই কারখানার মাঝের বট-গাছটাকে আশ্রয় করে থাকতে থাকতে বট গাছের চিন্তায় সত্তাটাকে নিজের বটগাছের সঙ্গে একীভূত করে ফেলেছিলেন। তাই সূক্ষ্ম সত্তাটাকে তার বাস্তবে আনলেই আবছা ওমনি বটগাছের রূপ ধরা হয়ে যাচ্ছে তার। গাছের স্বভাব ধর্মে ঝোড়ো প্রকৃতিটাও তার বর্তে যাচ্ছে আপনা আপনি সত্তার জড়ীকরণে।

—কিন্তু রাগ, মনের ক্ষোভ, হৃদয়ের জ্বালার কথাগুলো বললি যে তুই?

"ওগুলোও ঠিক।" বলে উঠল সতী, "—আসলে কি জান ভূতুদা, মৃত্যু তো নিছক দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধই ছেদ করতে পারে। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ তো ছিন্ন করতে পারে না। দেহের বিনাশ হলেও তাই প্রাণকে নিয়ে মন বেঁচে থাকে। থাকে সে সূক্ষ্মস্তরে তার ফেলে-আসা জীবনের সমস্ত কামনা-বাসনা আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলোকে নিয়ে এবং ঈর্ষা-হিংসা আদি বিরূপ প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ে। জগত জীবনে স্থূল দেহের গণ্ডিতে, বাস্তবের নানা বাধায় মনের এসব স্বভাব-প্রকৃতি থাকে সংগুপ্ত সঙ্কুচিত হয়ে। কিন্তু মনলোকে ওসব দেহগত বাধা, জড়গত বিপত্তির হয় লোপ। ওসব প্রকৃতি নিয়ে মন হয় বাঁধন ছাড়া বাধা হারা। সত্তা তখন উদ্দাম গতিতে, বেপরোয়া মনোভাবে ঘুরে বেড়ায়। শুধু তাই নয় সঙ্গে তার অনুভূতির বেগ, ঈর্ষা-হিংসার প্রভাব, রাগ-দ্বেষের শক্তি যায় বহুগুণ বেড়ে। এসবের গতিও হয় তীব্র প্রচণ্ড। দেখছো যে সত্তাটার ঝোড়ো মূর্ত্তিটা, ওটা ওর মনের রাগ-দ্বেষ প্রতিহিংসারই বেগ-গতির বাস্তব প্রকাশ ভূতুদা।

—সত্যি কি আসছে ওটা এই কারখানাটার দিকে লক্ষ্য করে? শুনেছি যা অর্থাৎ ভেঙ্গে দেবে মেশিন ঘর, তছনছ করে দেবে কারখানা, লণ্ডভঙ্গ করে দেবে এখানের সমস্ত কিছু—এই কি উদ্দেশ্য ওর?

—লক্ষ্যটা তো তার তাই ভূতুদা। ওর নদীর মাঝে ঝড় হয়ে উঠার যেমন একটা কারণ আছে তেমনি অবশ্য উদ্দেশ্য আছে ওর কারখানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেশিন-ঘরটাকে ভেঙ্গে ফেলার, তছনছ করার।

"—না সতী না।" শুনেই ওমনি ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করে উঠল ভূতনাথ তাকে—ওভাবে ধ্বংসের মূর্ত্তিতে কারখানটায় আসাটা ওর বন্ধ তোকে করতেই হবে সতী। রক্ষা করতে হবেই তোকে মেশিন ঘরটাকে ওর ভেঙ্গে দেওয়ার হাত থেকে। নতুবা আমার মান-সম্মান যে এখানে আর কিচ্ছু থাকবে না সতী। আমার প্রতি সকলের গড়ে উঠা শ্রদ্ধা-ভক্তি, অবিনাশবাবুর আমার উপর বিশ্বাস ও আশা-ভরসা সব যাবে নষ্ট হয়ে। চিরকালের মত ফেলা যাব আমি। এ অঞ্চলের শুধু ওই মানিক বাবু প্রমীলা দেবীর কাছেই নয় সকলের কাছে আমি হয়ে যাব আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ছেঁড়া জুতোর মত।

"—কিন্তু ভূতুদা, বলে উঠল সতী, '— যার যেটা স্থান, যার যেখানে থাকার অধিকার—তাকে তার সে ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত-বঞ্চিত করবে কি করে? সে তো তার কর্মক্ষেত্রের আকর্ষণেই, অধিকার রক্ষার টানেই আসছে ওমনি তার সমস্ত শক্তি এক জায়গায় সন্নিবেশিত সন্নিবিষ্ট করে।

"—ওর এই শক্তির বেগ তোকে যেমন করেই হোক রোধ করতে হবেই সতী। ব্যস্ত হয়ে ভূতনাথ ব্যাকুল

চিত্তে বলে উঠল তাকে,—এতদিন যা করেছে-করেছে ওটা। তখন আমি ছিলাম না। কিন্তু এখন আমার উপস্থিতিতে সে ওমনি তাণ্ডব করলে যে — তুই বুঝতে পারছিস না সতী, ওই উঠতি মেশিন ঘরটা সম্পূর্ণ হওয়ার উপরই আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। মানে আমার চাকরি-বাকরি সমস্ত কিছু।

—কিন্তু—

মনের আকুলতায় ভুলে গেল ভূতনাথ যে সতী হল মৃত্যুলোকের সূক্ষ্মাত্মা আর সে হল একজন স্থূল-দেহধারী মানব। বাস্তবে আপনজনের মত অভিমানের সুরে বলতে লাগল সে সতীকে,—ওসব কিন্তু-ফিন্তু তোর জানি না আমি। তোর ভরসাতেই আমি কথা দিয়েছি অবিনাশবাবুকে। এই ঝোড়ো-ভূতটার দৌরাত্মি থেকে কারখানাটা তার রক্ষা করতেই হবে। যেমন করেই হোক আর যে ভাবেই হোক।

মহা মুস্কিলে পড়ল সতী। বলে উঠল সে—শোন ভূতুদা, তোমার কথায় না হয় ওই ঝড়রূপী প্রেতাত্মাটার আপাততঃ কারখানায় ঢুকা বন্ধ রাখছি আমি। থামিয়ে রাখছি না হয় সাময়িকভাবে তাকে অদূরে এই ফটকের বাইরেই, কিন্তু তারপর? সাধু ছিল সে এবং আশ্রম ছিল তার তোমার অবিনাশবাবুর কেটে দেওয়া সেই বটগাছটার তলাতেই অর্থাৎ নির্মীয়মান মেশিন ঘরটার জায়গাতেই। সেই আশ্রমের আকর্ষণেই আসছে তো সে, তার সাধন ক্ষেত্রটাতে। সৎ-আত্মাদের ইচ্ছা শক্তি রোধ করা একেবারে যাবে না ভূতুদা। কিছুক্ষণ পর, আস্থানায় তাকে ঢুকতে দিতে হবেই আমাকে।

—সাধু যদি সে তবে তো তাকে শান্ত রূপে সৌম্যভাবেই থাকা উচিত। সৎ আত্মা যদি সে তবে তো তার এই সমস্ত ভাঙচুর করা অর্থাৎ অসৎ প্রকৃতির আত্মার মত দৌরাত্মি করা উচিত নয়।" বলে উঠল ভূতনাথ।

—তোমাকে তো আগেই বললাম ভূতুদা এরও একটা কারণ আছে। আসলে কি জান? যে যেভাবেই জীবন কাটাক মৃত্যুর সময় যে যেমন মনোভাব নিয়ে মরে মৃত্যুর পর সে সেই রকম মনোভাব নিয়েই পরলোকে অবস্থান করে। বাস্তব পৃথিবীতে সন্ত সাধুর বেশে, যোগীর সাজে থাকতে পারে। পারে জ্ঞানের বুলি বলে, নিজে আচরণ না করে অপরকে নানা সৎ উপদেশের বাণী শুনিয়ে সাধু মহন্ত, গুরু, বৈষ্ণব ইত্যাদি হয়ে থাকতে। কিন্তু মৃত্যু-ছাঁকনিতে ছাঁকা যেয়ে পরলোকে আসে যখন সে তখন তার মনের যা আসল স্বভাব, অন্তরের যা মূল প্রকৃতি—সেই স্বভাব প্রকৃতি অনুসারেই গতি-মুক্তি বাস্তব অনুযায়ী অবস্থান হয় তার।

—এ সাধু কি তাহলে প্রকৃত সাধু ছিল না? ছিল সাধুর বেশে চোর বদমাশ, দুষ্ট-নষ্ট বা অসৎ প্রকৃতির কোন মহাপাপী?

"—না ভূতুদা, তা কিন্তু উনি ছিলেন না জীবনে। বলে উঠল সতী, "—তবে তুমি যেরূপ সৌম্য শান্ত ব্রহ্মমনা সাধুর কথা বলছ, মনটাকে তিনি সে স্তর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন নি জীবনে। আসলে তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়-মনা সাধু। তাই অপরের হাতে আঘাত পেয়ে মরার সময়, জীবনাবসানের প্রাক-মুহূর্ত্তে মনে তার প্রতিশোধ স্পৃহার ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার হয়েছিল সঞ্চার। অপরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা হিংসা নিয়ে মরেছিল বলেই মৃত্যুর পর সত্তাটা তার সেরূপ আত্মিক শক্তি থাকলেও উর্ধ্বলোকে গতিবান হতে পারে নি। বেড়ায় ঘুরে তাই ভুবলোকেই। মূর্ত্তি ধরে সে ওমনি ঝড়-ঝঞ্ঝা ঘূর্ণাবাত রূপেই।

শেষের কথাগুলো সতীর সেরূপ-ভাবে কানে না ঢুকলেও ভূতনাথের, ওই অপরের হাতে সাধুর মৃত্যুর কথাটা যেন চমক দিলে তাকে। আকর্ষণ করল তার মনটাকে চুম্বকের মত। তাই ভ্রূকুঁচকে সে বলে উঠল ওমনি সতীকে—থাম-থাম, কি বললি? অপরের হাতে আঘাত পেয়ে মরেছিল সাধু? কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি নানা লোকের মুখে নানা কথা শুনেছি যে। কেও বলে সাধু এখানে মন্দির করার টাকা পয়সা নিয়ে উধাও হয়েছিল, কেও বলে ওসব টাকা-কড়ির লোভেই এখানে মেরে সাধুকে মাটির তলায় পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। কেও বলে আবার নাকি তার মৃত্যুর কারণ মেয়ে ঘটিত ব্যাপার। তাই হত্যা করে তাকে ঝুপড়ির মধ্যে রেখে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোন্‌টা সত্যি?

"—আসল সত্যটা নানা লোকেব মুখে নানা রটনায় গুলিয়ে গেছে ভূতুদা। চাপা পড়ে গেছে নানা কল্প-কথায় ও রঙ চড়ানো গল্পে। তবে মারা হয়েছিল তাকে এটা সত্যি। এবং আজই তার সেই মৃত্যুদিন।

"—তাই নাকি?

"—হ্যাঁ ভূতুদা," বলে উঠল সতী, —আর দিন শুধু নয়, সেদিনের তার সেই মৃত্যুর যোগ ক্ষণ তিথি নক্ষত্রও এই মুহূর্তে সম্মুখে তার উপস্থিত। এমনিই একদিন শনিবার রাত্রে, সপ্তমী তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রে এক লম্পট, অসৎ চরিত্রের হাতে মৃত্যু হয় তার। একে ত্রিপুষ্কর যোগ দুষ্টে মৃত্যু তার—তার উপর আবার এক মহাপাপী বদমাশ লোকের হাতে। তাই সাধু হয়েও সত্তাটার তার উর্দ্ধগতি হয় নি। পুষ্কর ভূত হয়ে সে ওমনি ঝড়ো প্রকৃতি নিয়ে সূক্ষ্ম স্তরে করছে বিরাজ। আজ তার মৃত্যুর সেই বিশেষ দিন-ক্ষণ হওয়ায় সত্তাটা তার দেহ বিলয়ের ক্ষেত্র থেকে ওই রূপ ঝোড়ো মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়ে বিশেষ শক্তিতে তীব্রবেগে, প্রচণ্ড গতিতে তার মৃত্যুর স্থান অতীতের সেই আশ্রমটার দিকে ছুটে আসছে।

শুনে কথাটা তখন আর ওই ঘূর্ণি ঝড় রূপী পুষ্কর ভূতটার কারখানার দিকে তেড়ে আসাটা মনে ভূতনাথের তেমন আশঙ্কার সৃষ্টি করল না। মনটা হল তার কৌতূহলী। সাধুর হত্যাকারীকে জানবার জন্য জিজ্ঞেস করে উঠল সে সতীকে, —কে সেই নরাধম যে সাধুকে হত্যা করল? এমন কি দোষ করেছিল সাধু যে রাত্রে বেলায় তার আশ্রমেই তাকে মারা হল? আর সাধুই বা কেমন ছিল জীবনে? কে ছিল সে? সাধুই বা হল কেন? আর হলই যদি সাধু তবে এই নদীর ধারে, শ্মশান পাশে এমন একটা অখ্যাত অজ্ঞাত জায়গায়, আশ্রমে সে মরতেই বা এল কেন?

"—ওসব কথা তোমার না শোনাই ভাল ভূতুদা।" বলে উঠল সতী, —"শুনলে তুমি আর নিজেকে নিজে ঠিক রাখতে পারবে না। দুর্ব্বল মন তোমার, হয়ত উঠবে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে, না হয় আক্রোশে উঠবে ফেটে। অযথা মনটাকে বেদনা ভারাক্রান্ত করে কি লাভ ভূতুদা? তাছাড়া যাদের কাছে যে মন নিয়ে আছ তুমি, আছ তুমি যেটুকু শ্রদ্ধা-ভক্তি ও আস্থা-বিশ্বাস নিয়ে—তাও যাবে তোমার পাল্টে। আঘাত পাবে মনে, প্রাণে পাবে ব্যথা। অবিনাশবাবুর উপর তোমার ধারনাটাও যাবে পাল্টে। তার চেয়ে থাক ভূতুদা। চাপা পড়ে গেছে মাটির তলায় যে ইতিহাস—সে ইতিহাসকে চাপা পড়েই থাকতে দাও। যাচ্ছে যেমন কালের ধারায় সে সব কথা বিস্তৃতির অতল তলে তলিয়ে তেমনি আস্তে আস্তে যাক তা তলিয়েই।

"—না সতী, উঠল যখন এসব কথা তখন বলতেই হবে তোকে।" জেদ ধরল ভূতনাথ, "—জানিস তো তুই, কোন ব্যাপারে একবার কোন কিছু জানার কৌতূহল মাথায় চাপলে আমার সে সব না জানা পর্য্যন্ত মনে স্বস্তি, প্রাণে শান্তি পাই না আমি। অসোয়াস্তিতে ফেলে রাখিস না তুই আমাকে। তাছাড়া নানা লোকের কথায় মিথ্যে ধারনাটাকেই বা বইব কেন আমি মনে। আসল সত্য জানতে যখন ব্যগ্র হয়েছে আমার মন তখন বলতেই হবে তোকে ওই সাধুর কথা। কথা দিচ্ছি আমি—সব শুনেও আমি যেমন আছি তেমনি থাকব। কারো প্রতি কোন ধারনা আমার পালটাবে না। বলিস তো এসব কথা তোর কখনও, কাকেও আমি প্রকাশ করব না। মনটাকে কোনদিন বিরূপ হতে দেব না, ধৈর্য্য হারা হতে দেব না।

চুপ সতী। তাকিয়ে ভূতনাথের মুখটার দিকে ভাবতে লাগল যেন সে আকাশ পাতাল। মনে হয় সূক্ষ্ম-চোখের দৃষ্টিটাকে তাঁর ভবিষ্যতে ফেলে, দেখতে লাগল সে তার বলা কথাগুলোর ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া। বোধহয় মুস্কিলেই পড়ল সতী।

কিন্তু ভূতনাথের ভূত চাপলে একবার মাথায় নামে না সহজে, ধৈর্য্যও তেমন থাকে না তার। তাই বার বার করতে লাগল সে পীড়া-পীড়ি সব কথা তার জানবার জন্য—বল না সতী। বড় জানতে ইচ্ছা হচ্ছে আমার সমস্ত কিছু। দোহাই তোর আমার দিব্যি বল না আমায় এখানে হত্যা হওয়া ওই সাধুটার জীবন কথা।

কিন্তু বলবে কি সতী—এধারে তখন প্রলয় নাচনে, মত্ত মাতনে এসে গেছে সেই দুরন্ত ঘূর্ণাবাতটা। যেন মূর্ত্তিমান একটা ঝড়-রূপী বিরাট বট গাছ। ডালপালা, ঝুরি, শিকড় বাকড় নিয়ে ঘুরছে সে ভয়ানক রূপে ভয়ঙ্কর ভাবে, শত সহস্র বাজের গর্জন নিয়ে কাল-বৈশাখীর কাল চক্রটার দিকে তাকিয়ে সতী বলে উঠল ভূতনাথকে, —তোমার প্রশ্ন এখন থাক ভূতুদা। ঝড়রূপী পুষ্কর ভূতটাকে থামাই আগে। এস আমার কাছে। দাঁড়াও আমার পাশে। হাত জোড় করে বল আমার সঙ্গে তেড়ে আসা ওই ঘূর্ণি বায়ুটার দিকে লক্ষ্য করে, —ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। মন প্রাণ এক করে ভক্তি ভরে কর প্রণাম ওই বায়ুরূপী মহান সত্তাটাকে ওঁ নমঃ, ঘূর্ণাবর্ত্ত রূপায় ব্রহ্মনে। ওঁ নমঃ ঝঞ্ঝা রূপায় মহাত্মনে।

বেশ গম্ভীর স্বরে ঝড়টাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল সতী, —হে মহান সত্ত্বা। ঝড় রূপেই এসেছ যখন আমাদের কাছে তখন আমাদের সম্মুখে অদূরেই তুমি অবস্থান কর প্রভু। আমরা তোমার পুত্র কন্যা। তোমার আমরা স্নেহের অধিকারী। কথা তুমি রাখ আমাদের প্রভু। যে অবস্থাতে এসেছ তুমি সে অবস্থাতেই থাক দাঁড়িয়ে কারখানার এই গেটের বাইরে।

আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! কি শক্তি ছিল ওই মন্ত্রগুলোর মধ্যে কে জানে। কে জানে কি জাদু লুকিয়ে ছিল সতীর ওই কথাগুলোর ভিতর? আর এক পাও অগ্রসর হল না সেই দানবীয় মূর্ত্তির ঝোড়ো—প্রেতাত্মাটা তীব্র বেগে ছুটে আসা দুরন্ত কাল-বৈশাখী হঠাৎ যেন ব্রেক কষে গেল দাঁড়িয়ে তাদের সামনেই। দাঁড়াল বটে সেই মহাতাণ্ডব কিন্তু তার ভীষণাকারে ঘূর্ণন ও সে ঘূর্ণনের ফলে ভয়ঙ্কর আওয়াজ কিন্তু বন্ধ হল না—এক মুহূর্ত্তও, এব নিমেষের জন্যও।

দেখে শুনে তাজ্জব বনে গেল ভূতনাথ। চোখ হল যেন তার চড়কগাছ। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সে ঝড়-ঝঞ্ঝাও তাহলে কথা শুনে। ঘূর্ণাবাতও তাহলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরতে পারে। কিমাশ্চর্য্যংমতঃ পরম্।।

(সাতাশ)

সে এক অদ্ভুত পরিবেশ। কাক জ্যোৎস্নার অন্ধকার। বোধহয় মাঝ রাত। সামনে ব্রহ্মডাঙ্গা আর পিছনে—অবিনাশবাবুর কারখানা তার মাঝে দাঁড়িয়ে ভূতনাথ। দাঁড়িয়ে কারখানার ফটক গোড়ায়। পাশে তার পরলোকগতা স্ত্রী, সূক্ষ্মদেহী সতী। আর দুপাশে দু পরস্পর বিরোধী প্রকৃতি। সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। একে অপরের উল্টোপিঠ। অর্থাৎ সম্মুখে তাদের সেই ভয়াল-ভয়ঙ্কর ঘূর্নিঝড়রূপী প্রেতাত্মাটা আর পশ্চাতে তাদের শব-শান্ত মহা মৌন নিঝুম-নিস্তব্ধ কারখানাটা। যেন আতঙ্কে আড়ষ্ট, ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে গুপটি সুপ্‌টি মেরে আছে। ঠিক যেন একজন শিকারী অপরজন শিকার। শিকারী সেই ঘূর্ণাবাতটা টাইফুনের দাপট, টর্নেডোর ঝাপট নিয়ে মহাক্রোশে করছে পঁয়তারা ভয়ে কুঁকড়ে থাকা নিরীহ নিঃসাড় অসহায় কারখানা রূপ শিকারটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। কিন্তু পারছে না। পারছে না বলেই শিকলে বাঁধা মত্ত মাতঙ্গের মত মহাক্রোধে ফুঁসছে সে। ভয়ঙ্কর বৃংহনে আকাশ, বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে। কানের পর্দা ফাটানো সে। আওয়াজে ভূতনাথের হৃদকম্প হবার উপক্রম।

সতী কিন্তু নির্বিকার। নিরুদ্বেগ চিত্ত সে। দাঁড় করিয়ে রাখা সেই মহাতাণ্ডবটার দিকে তাকিয়ে লাগল সতী বলতে তার ভূতুদাকে ওই ঝোড়ো দৈত্য অর্থাৎ ভয়াল—ভয়ঙ্কর পুষ্কর প্রেতাত্মাটার জীবনকথা। সে কথা তার যেমনি ব্যথায় ভরা তেমনি বিচিত্র ও করুণ।

মৃত্যুর পূর্বে সাধুর ডাঙ্গার সাধু থাকলেও কিন্তু প্রথম জীবনে ছিলেন তিনি সংসারী। বীরভূম জেলার হুকনোপুর গ্রামে ছিল তার বাড়ী। স্ত্রী দামিনী এবং একমাত্র পুত্র চন্দ্রশেখরকে নিয়ে ছিল তার ছোট্ট সংসারটি। নাম ছিল তার ভীষ্মদেব সিংহ। নামেই শুধু নয় জাতিতে ছিলেন তিনি ভীষ্মের মত ক্ষত্রিয় ও বৈরাঘ্র গোত্রীয়। তাই ক্ষত্রিয়ের তেজ ও বৈরাঘ্রের জেদ—এই নিয়ে ছিল তার স্বভাব, চরিত্র বৈশিষ্ট্য। মোটামুটি সুখেরই ছিল তার সংসারটা। কারণ ছেলে তার বড় হয়ে এনট্রাস পাশ করে চলে গেছল সিউড়ী। সেখানে মামার বাড়ীতে থেকে কলেজে পড়াশোনা করতে। বড় আশা ছিল তার চন্দ্রশেখর একজন শিক্ষিত আদর্শ পরায়ণ ছেলে হয়ে পিতার কথা মত চলে তার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। চাঁদের মত আলো দেবে সে তার ও দামিনীর পরিণত জীবনে। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সে ভরিয়ে দেবে তাদের সংসারটাকে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। সে আশায় ভীষ্মদেবের বাজ হানল চন্দ্রশেখর। কলেজে পড়তে পড়তে হঠাৎ একদিন বিয়ে করে বসল সে তারই কলেজে পড়া এক মেয়েকে। লাভ ম্যারেজের মত হলেও তার মামা অবনীবাবু সামান্য কিছু আনুষ্ঠানিকের রঙ চড়িয়েছিলেন তাতে। তার দিদি দামিনী অর্থাৎ শেখরের মাকে একটু কৌশল করেই আনিয়েছিলেন তিনি তার বাড়ীতে। ভীষ্মদেব বাবুকে কোন কিছু না জানিয়েই। তারপর ভাই-বোনে শলা-পরামর্শ করে চট-জলদি তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীমান শেখর চন্দ্রের বিয়েটা। ভীষ্মদেব বাবুর অজান্তে অর্থাৎ তাকে সব দিক দিয়েই সম্পূর্ণ রূপে গোপন করে।

এ গোপনতার অবশ্য একটু কারণও ছিল। কারণটা হল ভীষ্মদেববাবু নাকি তার এক গ্রাম্য অন্তরঙ্গ বন্ধু কমলবাবুকে তার মৃত্যুর সময় হাত ধরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে তার মেয়ে অভয়ার সঙ্গে তার ছেলে শেখরের তিনি বিয়ে দেবেনই। বাল্যকালে গরীব অবস্থায় বন্ধু কমলের বাড়ীতে থেকে ভীষ্মদেববাবু তার এক ভাই-এর মতই খেয়ে, পরে, তার বাপের আদর মায়ের স্নেহ ভালোবাসা নিয়ে যখন তিনি বড় হয়েছিলেন তখন একথা তিনি তার রাখবেনই। অভয়াকে ছেলের বৌ করে ঘরে তুলে নিয়ে তার সে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা তিনি রক্ষা করবেনই। এ হল ভীষ্মদেবের ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা। বোধ হয় বন্ধুবরের সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনেই নিশ্চিন্তে প্রাণটা ত্যাগ করতে পেরেছিলেন কমলবাবু।

মৃত্যুকালীন এ কথাটা শুধু কমলবাবু ও ভীষ্মদেববাবুর দু পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেটা পাড়া থেকে গ্রাম অর্থাৎ ছেলে বুড়ো সকলের মধ্যেই চাউর হয়ে গেছল। শুধু তাদের গ্রামেই কেন, আশ-পাশ প্রায় সমস্ত গ্রামের সকলের মধ্যে অভয়া যে শেখরের অর্থাৎ পাত্র্য কন্যার বাঁধা বর কথাটা জানাজানি হয়ে গেছল। এমন কি উভয় পরিবারের দূর-নিকটের আত্মীয়-স্বজন কুটুম-বন্ধুদের মধ্যেও অভয়া শেখরের বাগদত্তা হয়ে থাকা ব্যাপারটা অবগত হতে কারো বাকী ছিল না। জানত সবাই বিয়েটা তাদের আটকে আছে মাত্র শেখরের পড়াশোনার জন্য। বি.এ. পরীক্ষার পরই বিয়ের পীড়িতে বসবে শেখর। গাঁট-জোড়া বেঁধে অভয়ার সঙ্গে। কুল-বধূ করে আনবে তাকে ভীষ্মদেববাবুর সংসারে। কিন্তু সে গুড়ে দিল বালি শেখর, সে আশায় হানল বাজ।

সত্যি বলতে কি বাগদত্তা হলেও অভয়া শেখরের তেমন পছন্দসই ছিল না। বাপের অপেক্ষায় সৎ মাকে গড় করার মত চলছিল বটে সে, কিন্তু শিবানী দিল তাকে বেপরোয়া করে। তার মিষ্টি কথা, হাসিমুখ, টানা চোখের চাউনি জয় করে নিল তার হৃদয় মন সকলই। বাজাতে লাগল প্রাণে তার বাঁশি। তুলতে লাগল অন্তরে তার ঝড়। সে ঝড়ে কোথায় উড়ে গেল তার বাবার ভাবের ঘোরে মুর্মূষু কমলবাবুকে দেওয়া কথা। কর্পূরের মত। অবশ্য উড়ে যাবারই কথা। কারণ শিবানীর সঙ্গে অভয়া কোন দিক দিয়েই তুলনীয় নয়। কোথায় গেঁয়ো ভূত আর কোথায় শহরের অপ্সরী। চাঁদের সঙ্গে ধান স্নিগ্ধ হাঁড়ির কালো তলার তুলনা হয় কখনও? সুন্দরী শিবানী হল তার মামীমার প্রিয় বান্ধবী সুনন্দার কন্যা। বিধবা সুনন্দা। অর্থাৎ অভয়ার মত শিবানীও পিতৃহারা। যাইহোক শিবানীর সঙ্গে শেখরের ভালবাসা জমতে জমতে এমন এক পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছুল যেখানে উভয় উভয়কে ছাড়া জীবনটাকে আর কল্পনাই করতে পারল না। শেখায় অবশ্য তার বাগদত্তা অভয়ার কথাটা জানায়নি শিবানীকে। বলেনি, বোধ হয় তাদের প্রেম ভালবাসার পথে বাধা ও পীরিতের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে বলে। মা সুনন্দার বেশ মনে ধরে গেছল শেখরকে। কার্ত্তিকের মত চেহারা, পড়াশোনাতেও ভাল। তাছাড়া বাপের একমাত্র ছেলে। সব চেয়ে বড় কথা হল শিবানীর শেখরকে মনে লাগা বা পছন্দ করা। তাই দুটি হাতকে এক করার জন্য, দুটো জীবনকে তাদের এক সাথে বেঁধে দিয়ে কন্যাদায় থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য ধরলেন তিনি তার বিশিষ্ট বান্ধবী শেখরের মামী-মাকে। শেখর অবশ্য মামী-মাকে ইতিপূর্বেই তার মনের কথা জানিয়ে ভিতটা তার পাকা করে এনেছিল। তাই বান্ধবী সুনন্দার অনুরোধে মামীমা তার ধরার মত ধরল তার মামাকে। অবনীবাবু পড়লেন মহা মুস্কিলে। কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা না করলে এই মহা মুস্কিলটা যে তার জীবনে মহাযুদ্ধে পরিণত হয়ে যাবে এটাও বুঝলেন তিনি হাড়ে হাড়ে। করলেন অনুধাবন এটা শুধু তার স্ত্রীর সম্মান রক্ষার প্রশ্ন নয় শেখরেরও জীবন মরণের সমস্যা। সুতরাং এ সমস্যার সমাধানের একটা উপায় বের করতে হবেই তাকে।

সেই উপায়টা হল দামিনী দিদিকে তার জামাইদার কাছ থেকে মিথ্যা অজুহাতে ছল করে নিজের বাসায় নিয়ে এসে গোপনে শেখর-শিবানীর বিয়েটা সেরে নেওয়া। দামিনী দেবী এসেই হঠাৎ শেখরসহ তার মামা মামীমার এ মতলব শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। যতই হোক বিয়ের মত একটা ব্যাপার, একমাত্র ছেলে তাদের, তার উপর বাপকে ফাঁকি দিয়ে —এ যে অসম্ভব। কিন্তু এ অসম্ভব সম্ভব করতে না পারলে শেখরকে যে হারাতে হবে তাদের। শেখর আর তো তাদের সে শেখর নেই। বড় হয়েছে সে, হয়েছে শিক্ষিত। তার মত একজন শহুরে মনা, আধুনিক রুচিশীল শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে অভয়ার মত একটা অশিক্ষিত, অজ পাঁড়া গেঁয়ে সেকেলে মনোভাবের বোকা মেয়েকে যদি জুড়ে দেওয়া হয় জীবনটা তাহলে তার বরবাদ হয়ে যাবে না?

শিবানী শুধু শিক্ষিতাই নয়, বেশ একজন অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে সে। মা-বাপের একমাত্র উত্তরাধিকারী। আক্কেল-বুদ্ধি জ্ঞান-গম্যি সব আছে তার। সিউড়ী শহরে বাপের বাড়ী-সম্পত্তি ছাড়াও তার মামার-বাড়ীর সমস্ত বিষয় আসয়ের হকদার সে। এমন মেয়েকে হাতছাড়া করা মানে মাথার লক্ষ্মীকে পায়ে ফেলা।

বুঝল দামিনী সবই কিন্তু স্বামী যে তার মস্ত রগচটা, একরোখা মানুষ। সৃষ্টি ছাড়া জেদ তার। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লয় হয়ে গেলেও কথার তার নড়চড় হওয়া কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না সে।

"—আমিও আমার কথার নড়চড় হতে দেব না মা।" হঠাৎ ধৈর্য্য হারা হয়ে মা-মামার কথার মাঝেই বলে উঠল শেখর, —শিবানী ছাড়া আমি আর অন্য কোন মেয়েকেই করব না বিয়ে। বরং অবিবাহিত থাকব আমি। এই আমার শেষ কথা।

দামিনী পড়ল মহা মুস্কিলে! বাপকা বেটা শেখর। জেদে সে-ও কোন অংশে কম নয়। একমাত্র ছেলে চিরকুমার থাকলে যে বংশটা তাদের লোপ হয়ে যাবে। স্বামী-শ্বশুরের ভিটিতে তার জ্বলবে না কখনও প্রদীপ। তার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী হবে যে দামিনীই। কিন্তু উপায় কি এর?

"—উপায় একটাই—চট্ জলদি গোপনে এখানে শিবানীর সঙ্গে শেখরের বিয়েটা দিয়ে দেওয়া।" বলে উঠলেন অবনীবাবু।

স্ত্রীও তার সায় দিল এই সঙ্গে। এতে ছেলেকেও তাদের হারাতে হবে না আর তাদের ঘর আলো করা বৌ-ও হবে। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করাই তো উচিত। ভীষ্মদেববাবুর অজান্তে, অজ্ঞাতে, গোপনে বিয়ে হলে তাকে কেও আর দোষ দিতে পারবে না। আর একবার হয়ে গেলে বিয়ে কারো কিছু করার বা বলার থাকবে ন। তাছাড়া ভীষ্মদেববাবু তো তার প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গছেন না। জীবন বেঁধে কর্ম। টিপে তো আর কাঁঠাল পাকানো যায় না। ছেলে যদি বড় হয়ে নিজের পছন্দ মত বিয়ে করে তা হলে সে কি করবে? অজ-পাড়া গাঁয়ে পড়ে আছে বলে অভয়ারা এসব বুঝতে পারছে না। দিন পালটাচ্ছে, যুগ বদলাচ্ছে। বাপের হাতের আর ধাঁধা কাঁকড়ি নয় এখনকার সব ছেলে মেয়েরা। আজ কাল হামেশাই এসব হচ্ছে। সুতরাং স্বামীর ছেলেমানুষী জেদও তার সর্বনেশে প্রতিজ্ঞা ধরে দামিনীর তো পড়ে থাকা উচিত নয়। তাছাড়া ছেলেকে নিয়েই তো তাদের যতসব উড়না পাড়ন। শেখরই যদি চলে যায় তাদের জীবন থেকে তবে প্রতিশ্রুতিটা নিয়ে কি ধুয়ে খাবে ভীষ্মদেববাবু? আর ছেলেই যদি না থাকে তার তবে স্বামীর গোঁয়ার্তুমিটাকে কি চিরকাল পুজো করবে দামিনী?

সত্যিই তাই। অবনীবাবু ও তার স্ত্রীর কথায় জ্ঞান-চক্ষু যেন খুলল দামিনীর। রাজি হয়ে গেল সে শেখরের মামা-মামীমার কথা মত সেইখানেই, সেই মুহূর্ত্তেই শিবানীর সঙ্গে ছেলের তার বিয়ে দিতে। বিনা আড়ম্বরেই হল শেখরের বিয়ে। আপনজন ও আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে দিয়ে পরকে আপন করে বাজল শেখরের মামাবাড়ীতে তার বিয়ের শাঁখ, তার শুভ পরিণয়ের উলুধ্বনি। অগ্নি, শালগ্রাম-শিলা ছাড়া এ বিয়ের রইল সাক্ষী শেখরের মামা-মামীমা ও মা সহ সিউড়ী অফিস পাড়ার অবনীবাবুর গণ্য-মান্য কতিপয় সহ-কর্মীসহ শেখর শিবানীর বন্ধু ও বান্ধবীর দল। আর ওধারে হুকনোপুরে রইল পড়ে আশায় শেখরের বাগদত্তা মেয়ে অভয়া ও অভয়ার মা-সহ পাড়া-পড়শী, আত্মীয়-স্বজন এবং ভীষ্মদেব বাবুর প্রতিজ্ঞাও তার প্রতিশ্রুতি।

তারপর?

তারপর সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। সে কাণ্ডের সব এমনভাবে পরিচয় দিতে লাগল সতী তার ভূতুদা'কে যেন সব কিছু তার নিজের চোখে দেখা। এবং সেসব ঘটনার সে শুধু সাক্ষীই নয় নিজেও যেন সে সব কাণ্ডের একজন সে। যেন কাণ্ডারী হয়ে সব কিছু তার প্রত্যক্ষভাবে অনুভব ও উপলব্ধি করা।

ভেবেছিলেন অবনীবাবু ভাগনে তার বৌকে নিয়ে গিয়ে বাপের সামনে দাঁড়ালেই রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী বৌমা পেয়ে ভুলে যাবেন ভীষ্মদেববাবু তার ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা। দামিনীরও হয়েছিল তাই ধারনা। অভয়ার চেয়ে রূপে গুণে শতগুণে সেরা সোনার প্রতিমা বৌমায়ের মুখ দেখলেই সব বুঝি হয়ে যাবে ঠিক। কিন্তু ভাবনা অনুযায়ীই যদি সবার সব কিছু হত তবে সংসারগুলো সমস্ত স্বর্গে পরিণত হয়ে যেত।

এক পাশে মামা অপর পাশে মামীমাকে নিয়ে মায়ের পিছনে পিছনে ঢুকল যখন শেখর তার স্ত্রী শিবানীকে নিয়ে, বাড়ীর উঠোনে তখন ভীষ্মদেববাবু বাড়ী বারান্দায় আরাম কেদারায় ছিলেন বসে, হঠাৎ ছেলের পাশে

সালংকারা চেলীর শাড়ি পরা নব-বিবাহিতা বধূকে দেখে যেন আঁৎকে উঠলেন তিনি। চক্ষু হল তার চড়ক গাছ। ছানাবড়ার মত চোখদুটো করে জিজ্ঞেস করে উঠলেন তিনি তার ধর্মপত্নীকে—ব্যাপার কি?

ব্যাপার সব কিছু বুঝিয়ে দেবার জন্য তার বামপাশে এসে দাঁড়াল শ্যালক শ্রীযুক্ত অবনী ভূষণ সিংহ এবং ডানপাশে এসে দাঁড়াল তস্যপত্নী অর্থাৎ শালাজ শ্রীমতী সুশোভনা দেবী। বুঝেই তো মাথা ঘুরে গেল ভীষ্মদেববাবুর। আকাশ থেকে পড়লেন যেন তিনি। হঠাৎ সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে যেমন অবস্থা হয়, হয় যেমন মনটা পুনরায় রূঢ় বাস্তবের দুঃখাগ্নিতে তেমনি অবস্থা হল তার। বাঃ। চমৎকার। এত সাহস হল কি করে? অবনীদের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হল। তারা যতই হোক পর। কিন্তু দামিনী। কি করে সে তাকে গোপন করে ছেলের বিয়ে দিতে গেল ওখানে। ছিঃ ছিঃ। এ যে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া।

নানা দিক দিয়ে নানাভাবে বুঝাতে লাগলেন অবনীবাবু। সুশোভনা দামিনী মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটাকে তলিয়ে একটু অনুধাবন করতে বলতে লাগলেন তাকে। অনুভব করে পরিস্থিতিটা সব কিছু বিচার বিবেচনা করে হৃদয়ঙ্গম করতে বললেন ব্যাপারটা। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কে কার কথা শুনে। ভীষ্মদেবের গোঁ সৃষ্টি ছাড়া। মহাভারতের ভীষ্মদেবের মতই। তার এক কথা—যে ছেলে বাপের কথা রাখে না তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই তার। যে পুত্র পিতার কথা শোনে না—ত্যজ্যপুত্র সে।

আর থাকতে পারল না দামিনী। সহ্যের বাঁধ ভাঙ্গল তার। ধরল সে নিজ মূর্ত্তি। বলে উঠল দাপটে সে তার স্বামীকে,—তোমার কথা শোনা মানেই তো তোমার ওই মরা বন্ধু কমলবাবুর মেয়ে অভয়াকে বিয়ে করা। কি আছে অভয়ার? না রূপ, না গুণ। না আছে তার ওই গরীব বিধবা মা-টার কোন কিছু দেবার ক্ষমতা, ইচ্ছা বা মন। চিরকালটা নাকে কেঁদে ভুলিয়ে রেখেছে তোমাকে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে এঘরে যে সে উড়ে এসে জুড়ে বসে শেখরের ঘাড়ে বসে খাবে সে খেয়াল আছে তোমার? গোয়ার্তুমিতে তোমার ওই মেয়েকে গলায় গেঁথে শেখর তার জীবনটা নষ্ট করুক, বরবাদ করুক তার ভবিষ্যৎটা এই কি ইচ্ছা ছিল তোমার?

"—আমার ইচ্ছা বুঝবার মত মানসিকতা থাকলে তোমারা, এভাবে আমাকে ছাপিয়ে গোপনে তুমি তোমার ছেলের বিয়ে দিতে ভাই এর বাড়ী যেতে না।" বেশ রাগত স্বরেই বলে উঠলেন ভীষ্মদেব বাবু,—আদর্শ ধর্মপত্নী হলে কখনও তুমি স্বামীর ধর্মে এমনভাবে আঘাত করতে পারতে না। প্রকৃত ছেলের মা হলে তুমি কখনও ছেলেকে তার বাপের সত্যরক্ষা থেকে বঞ্চিত করতে পারতে না। পারতে না কখনও ছেলের আদর্শ পরায়ণ ভবিষ্যৎটাকে এভাবে নষ্ট করতে, নস্যাৎ করে দিতে।

"ছেলের ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট করেছি না উজ্জ্বল করেছি সেটাই বুঝে দেখ আগে।" বলে উঠল দামিনী,—জান, শিবানী তার বাপের একমাত্র সন্তানই শুধু নয় মামা বাড়ীরও সে একমাত্র উত্তরাধিকারিনী। সিউড়ী শহরে বাপের বাড়ী, জমানো টাকার মালিক তো সে বটেই উপরন্তু মামাঘরের জোতজমা স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিও হবে তারই। শেখর শুধু নয় শেখরের ছেলে পুলে নাতি নাতনিরা পর্য্যন্ত এত সমস্ত ধন সম্পত্তি খেয়ে-পরেও কোনদিন শেষ করতে পারবে না। তোমার বন্ধুর মেয়েকে বিয়ে করলে কি পেত শেখর? নিজের চোখেই দেখ না বৌমার মা আমাদের বৌমাকে কত গহনা দিয়েছেন।

বলেই বোধহয় শিবানীর গায়ের গহনাগুলো দেখাতে যাচ্ছিলেন দামিনী দেবী। কিন্তু ভীষ্মদেববাবু এক ধমকে দিলেন তাকে থমকিয়ে—থাক তোমার গহনা। বুঝেছি, ওই সমস্ত টোপ ধরিয়েই ভুলানো হয়েছে তোমাকে। কিন্তু কি তুমি? এতদিন পরে এই বুঝলে কি আমাকে? আমি ধন-সম্পত্তি, টাকা কড়ি চাই? চাই সোনাদানা? পরের ধনে পোদ্দারী করা আমি কখনও পছন্দ করি না তা জান? জান, কখনও আমি কল্পনাও করিনি যে শেখর আমার শ্বশুরের ধনে ধনী হোক? আশীর্বাদ করে ছিলাম তাকে সে নিজের পায়ে দাঁড়াক, নিজের শ্রমোপার্জিত সম্পদে সে সম্পদবান হোক। নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সৎভাবে সে বিত্তবান হোক। অভয়ার সঙ্গে শেখরের বিয়ে দেওয়া আমার জিদ ছিল না, ছিল একটা আদর্শের পূজো। একটা গরীব অসহায়া বিধবার মেয়েকে ঘরে এনে আমি আমার বন্ধুর ঋণ শোধ করে কৃতজ্ঞতা পোষণ করতে চেয়েছিলাম। আমি পণ চাইনি, ধন চাইনি, শহরে মানী ঘরের ধনী মেয়েকে কুলবধূ করে আমি আমার মান-সম্মান সম্পদ সম্ভ্রমও বাড়াতে চাই নি।

"—কিন্তু জামাইদা," বলে উঠল শেখরের মামী,—"শেখরের নিজস্ব একটা পছন্দ অপছন্দ আছে তো? বড় হয়েছে সে। আছে তো একটা তার আপন রুচি বোধ? এ বোধে আপনার তো তাকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। নয় তো ঠিক আপনার তার অপছন্দের ঘাড়ে জোর করে আপনার এক-গুঁয়েমিটাকে চাপিয়ে দেওয়া। তাছাড়া কিছুতেই গাঁয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়নি সে। কথায় বলে গোঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না। গাঁয়ে বিয়ে দিলে কোনদিন সাধ-আহ্লাদ মিটত না তার। পেত না সে পাড়া-পড়শী পরিচিত প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কখনও কোনরূপ জামাই আদর বা দামাদের সম্মান। জিদটা আপনার, কিন্তু জীবনটাতো তার। বিয়ে দিয়ে আপনারা একদিন সরে যাবেন তাদের জীবন থেকে। কিন্তু কাল কাটাতে হবে তো শেখরকে আপনার ওই চাপিয়ে দেওয়া বৌকে নিয়েই। ভবিষ্যৎটা তার কি হবে ভাবুন তো? ভয়ে শেখর আপনাকে তার মনের কথা বলতে পারে নি। ছেলে হয়ে বাপকে এসব কথা তার বলাও সম্ভব নয়। কিন্তু সে বার বার বলেছে আমাদের তার ইচ্ছা ও মনের কথা। বলেছে সে আমাকে—মামী-মা গাঁয়ে বিয়ে করলে বিয়ের আমার কোন রোমান্সই থাকবে না। মনে প্রাণে মরে থাকব আমি। তবেই বুঝুন।

"—বুঝলাম সব"। বলে উঠলেন ভীষ্মদেববাবু, —কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি, আমার প্রতীজ্ঞা? আমি যে কথা দিয়েছিলাম তাদের।

"—কথা দিলে তো কি হবে? এবার উঠলেন বলে অবনীবাবু—তুমি তো তোমার নিজের ব্যাপারে কথা দাওনি, দিয়েছিলে ছেলের ব্যাপারে। তাও আবার তার ছোটবেলায়, তার অজ্ঞান অবোধ বালক বয়সে। ভাবের ঘোরে। অপরের সম্বন্ধে ওমনি হটকারিতা করে কথা দিয়ে তুমি ভুল করেছিলে। তখনই বুঝা উচিত ছিল তোমার যে বড় হয়ে ছেলে তোমার কথা নাও শুনতে পারে। বিয়ে হল ছেলের নিজস্ব ব্যাপার। চারাগাছটাকে যতই সার জল দিয়ে আর কুঁড়-খুস করে বড় কর তুমি সে কি তোমার কথামত ডালপালা মেলে, না শাখা-প্রশাখা গজায়? ফুলকে সে নিজের জীবনে আনে ইচ্ছেমত।

"—গাছ আর মানুষ এক হল?" বলে উঠলেন ভীষ্মদেববাবু,—"ছেলেবেলায় সে অজ্ঞান অবোধ থাকলেও বড় হয়ে, শিক্ষিত হয়ে, মানুষ হয়ে তার তো বাপের মানটা রাখা উচিত ছিল। রামচন্দ্র বড় হয়েই তো পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গিয়েছিলেন। বড় হয়েই তো শ্রবনকুমার পিতামাতার ইচ্ছাপূরণে জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছিলেন। তোমরা ওকে ফুঁস-মন্ত্র না দিলে আমার ছেলে হয়ে কখনও সে এ কাজ করতে পারত না। অসম্ভব।

"—কথাটা তোমার অবজেকসেনেল্ জামাইদাদা, উইদ্ড্র কর এক্ষুনি।" প্রায় রাগত স্বরেই বলে উঠলেন অবনীশবাবু — শেখর শুধু তোমার ছেলে নয় আমাদেরও। তার ভাল মন্দ বুঝবার বা করবার অধিকার আমাদেরও আছে। তোমার একগুয়েমির শিকার হয়ে জীবনটাকে তার নষ্ট হতে দিতে পারি না আমরা। পারি না আমরা তার হিতাকাঙক্ষী অভিভাবক হয়ে তোমার গোয়ার্তুমির বলিতে ভবিষ্যৎটা তার অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিতে ও হতাশায় ভরে দিতে তার জীবনটা।

"—তোর জামাইদার কথা ছাড়।" বলে উঠলেন দামিনী দেবী,—ভীমরতি ধরেছে ওর। সর্বনাশা একজিদে স্বভাবে চিরকালটা যেমন আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে তেমনি নষ্ট করতে চাইছে ও শেখরের জীবনটাকেও। কেন,—শেখর ছাড়া কি ওর ওই মরা বন্ধুর মেয়ে অভয়ার দেশ-দুনিয়ায় আর কোন পাত্র নেই। সেরকম একটা পাত্র ধরে দিক না ওর বন্ধু-পত্নী তার মেয়ের বিয়ে। যেমন বিছানা তেমনি পা মেলবে কোথায় ভাল মানুষ পেয়ে তোর জামাইদাকে কান্নায় ভুলিয়ে বশ করছিল ছুঁড়ি। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে গেছল সর্বনাশী আমাদের মাথা খেতে। তোর জামাইদাকেই আর কি বলব অবনী। মাঝ পাড়া ও সেদিন বামুন পাড়ায় তার নাকের ডগায় দু-দুটো ঘটনা ঘটে গেল। জোর করে বিয়ে দেওয়ায় মধু বাবুর ছেলে মরল গলায় দড়ি দিয়ে। পছন্দমত পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় নৃপেন ঠাকুরের ছেলে রজত মরল বিষ খেয়ে। দেখে শুনে আক্কেল হবে কি—জ্ঞান-গম্যি ওর থাকলে তো। সৃষ্টি ছাড়া ওর এক-গুঁয়েমিতে দেখবি ও একদিন সব কিছু নষ্ট করবে। এই আমি বলে রাখলুম।

ব্যাপারটাকে হাল্কা করবার জন্য বলে উঠলেন অবনীবাবু—ওসব অলুক্ষণে কথা ছাড়তো দিদি এখন।

ছাড় জামাইদা তুমিও তোমার গোঁ-টা। বৌ-বেটা এসে প্রণাম করবার জন্য তোমাকে দাঁড়িয়ে আছে। আর তুমি ভাদ্রমাসের ওলের মত গোমড়া মুখটা করে বসে আছ। কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ওরা বলতো? ওঠ, প্রণাম করে তোমাকে ঘর ঢুকুক ওরা।

কিন্তু সেই কথায় বলে না—অঙ্গার শত ধৌতনে মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। অর্থাৎ স্বভাব যায় না মলে আর ইজ্জত যায় না ধূলে—সেই হল ভীষ্মদেববাবুর। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন তিনি,— যে ছেলে বাপের সম্মান রাখতে জানে না সে ছেলের স্থান তার বাপের বাড়ীতে হবে না। যেখানে নিজের ইচ্ছায় করেছে সে বিয়ে সেখানেই যাক সে চলে তার বৌকে নিয়ে।

'—কেন যাবে সে? কি জন্য যাবে সে? এ বাড়ী কার?" উগ্রস্বরে চড়া মেজাজে উঠল বলে দামিনী,— নিজে রোজগার করে করনি যখন এ বাড়ী তখন এ বাড়ী তোমার নয়। এ বাড়ী শেখরের ঠাকুরদার। এ বাড়ী আমার শ্বশুরের। আমার শ্বশুরের বাড়ীতে শেখর তার ঠাকুরদার অধিকারে তাঁর নাতবৌকে নিয়ে ঢুকবে এ বাড়ীতে। থাকবে সে এ বাড়ীতে চিরকাল।

"—বেশ তাই থাকুক সে। আমিই চলে যাচ্ছি এ বাড়ী ছেড়ে।" বলে উঠল ভীষ্মদেববাবু। ওমনি চাপা ধমকে বলে উঠলেন অবনীবাবু,—কি ছেলে মানুষী করছ তুমি বলতো জামাইদা? যেমনি দিদি—তেমনি তুমি। মাথা ঠান্ডা করে সব কিছু জেনে বুঝে রয়ে সয়ে নিতে পারনি কি তোমরা? মেনে-মানিয়ে সব সংসারই চলছে। তোমাদের এমন কেন মতি-গতি বলতো?

"—না ভাই," বলে উঠলেন ভীষ্মদেব বাবু, "—শাগ দিয়ে মাছ ঢাকাতে আমি জানিও না—পছন্দও করি না। যেখানে আমার কথার খেলাপ হয় সেখানে আমার পক্ষে থাকা অসম্ভব। গ্রাম-সমাজের কাছে কোন মুখটা নিয়ে আর থাকব আমি। দাঁড়াব আমি কোন আদর্শ নিয়ে অভয়া ও তার মায়ের সামনে। এ বেইমানীর মুখ, এ অকৃতজ্ঞতার চেহারা আমি আর কাকেও দেখাতে পারব না অবনী। বাড়ী ছেড়ে, এ গ্রাম, সমাজ, আত্মীয় স্বজন সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবেই আমাকে। এ ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর নেই।

কাটা ঘায়ে ওমনি আবার নূনের ছিটা দিয়ে উঠল দামিনী,—কে তোমাকে আটকে রেখেছে? তোমার মত হতচ্ছাড়া লোকের ঘর-সংসার ছেড়ে সাধু হয়ে যাওয়াই উচিত। হাড়-মাসগুলো তাহলে জুড়োয় সকলের।

এত বড় কথা। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন ভীষ্মদেববাবু। হলেন তিনি যেতে উদ্যত। আর ওমনি শিবানী এসে জড়িয়ে ধরল তার পা জোড়াটা, "—না বাবা, আমি আপনাকে কিছুতেই যেতে দেব না। বিশ্বাস করুন আপনি, আমি বিন্দুমাত্র অবগত ছিলাম না যে শেখরদার বিয়ের আপনি অন্য জায়গায় বাগদান করে রেখেছেন। ভুলেও শেখরদা আমাকে বলেনি এসব কথা। জানতাম না আমি যে অভয়াদি শেখরদা'র বাগদত্তা। তাহলে এ বিয়ে আমার হত না বাবা। যদিও আমি ভালবেসেছিলাম শেখরদাকে তবুও নিজে একজন পিতৃহারা মেয়ে হয়ে অপর একজন পিতৃহারা অনাথ অসহায়া মেয়ের আমি সর্বনাশ করতে কিছুতেই যেতাম না বাবা।

ধমকে উঠলেন ভীষ্মদেববাবু—খবরদার তুমি আমার পা ছোঁবে না। আমার সামনে আমার ছেলেকে ভালবাসার কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার? অভিশাপ দিচ্ছি আমি তোমাকে, যে রূপের মোহে তুমি আমার শেখরকে ভুলিয়েছ সে রূপ কুরূপ হবে তোমার। করছি আমি অভিসম্পাত তোমাকে—যে ধনের লোভ ধরিয়ে তুমি ও তোমার মা ভুলিয়েছ শেখরের মামা, মামী ও মাকে সে ধন থেকে বঞ্চিত হবে তুমি, হবে তুমি বিচ্যুত তোমার মায়ের স্নেহ, আদর ও ভালবাসা থেকে।

শিবানী কিন্তু ঘাবড়াল না ভীষ্মদেববাবুর ধমকে। বলতে লাগল সে তেমনি তার মিনতি ভরা স্বরেই—সব অভিশাপ আপনার আমি মাথায় তুলে নিচ্ছি বাবা। যা অভিসম্পাত করবার করুন আপনি আমাকে। সত্যিই আমি দোষী। না জেনে বুঝে এমন একটা কাজ করে ফেলেছি। কিন্তু আপনি আপনার ছেলেকে ক্ষমা করে দেন বাবা। আমার জন্য আপনাকে বাড়ী ছাড়তে হবে না বাবা। তাহলে এ-কলঙ্ক আমার জীবনে কখনও মুছা যাবে না। বরং আমিই আপনার ঘর ছেড়ে চলে যাব। যাবার আগে আর একটা প্রার্থনা আমার রাখতে হবে বাবা—মা, মামা ও মামীমাকে এর জন্য আর কোন দোষারোপ করবেন না। কারণ এ সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী তো আমিই।

ভীষ্মদেববাবু চুপ দিয়ে রইলেন বটে কিন্তু গম্ভীর ভাবে। শিবানীই লাগল যেতে বলে বিনয়ের সুরে—এতক্ষণ ধরে সবকিছু আমি শুনেছিলাম বাবা। শুনে যা বুঝলাম তাতে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম আপনি মানুষ নন, দেবতা। দেবতা ছাড়া এত মহৎ হৃদয়, উদার প্রাণ, উন্নত চরিত্র হতে পারে না বাবা। অভয়াদির মত এমন একজন অসহায়া গরীব মেয়ের সঙ্গে আপনি যে বিনা-পণে, বিনা কোন দান যৌতুক গ্রহণ করে আপনার ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তা দেখে, শুনে, বুঝে সত্যিই আমার মাথা শ্রদ্ধায় আপনার পায়ে নত হয়েছে বাবা। আপনার মত এমন নির্লোভি, পরোপকারী, পরদরদী ব্যক্তি সত্যিই জগতে দুর্লভ। আপনার মত দেবতাকে রুষ্ট করে, মনে কষ্ট দিয়ে আমি থাকতে চাই না বাবা। বিশ্বাস করুন আপনি, আপনার প্রতিশ্রুতি প্রতীজ্ঞার কথা আমি যদি ইতিপূর্বে সামান্য মাত্রও জানতাম বা ঘূর্ণাক্ষরেও অবগত হতাম, এমন কি আভাসে ইঙ্গিতে পরোক্ষভাবেও যদি এসবের বিন্দুমাত্রও পরিচয় পেতাম তবে আপনার এই মহানুভবতার পথের কাঁটা আমি হতাম না বাবা। হতে দিতাম না শেখরদাকে আপনার এই মহামানবিক কর্মের বাধা হয়ে দাঁড়াতে।

শিবানীর এসব কথায় নরম হবেন কি ভীষ্মদেববাবু উল্টো উঠলেন গরম হয়ে। মেজাজ-চড়া কথায় বলে উঠলেন তিনি, —"তুমি যে একটি সাংঘাতিক ধুরন্ধর মেয়ে তা তোমার কথাতেই বুঝতে পারছি। তুমি তোমার বাহ্যিক রূপ-লাবণ্যে শেখরের মাথা খেয়েছো। গহনা-টাকা ধন-সম্পত্তির লোভ ধরিয়ে শেখরের মাকে ভুলিয়েছ। এখন আবার কথার ফুলঝুরি দিয়ে আমাকে ভুলাবার ধান্দা করেছ? সে গুড়ে বালি। আমার মন এত কাঁচা নয় যে পাকা পাকা এমন কথার প্যাঁচে কব্জা করতে পারবে তুমি আমাকে? ভেবেছো কি তুমি? কি মনে করেছ আমাকে? মান সম্ভ্রম সব ঘুচিয়ে আমার লম্বা লম্বা বাত্ ঝেড়ে গরু মেরে জুতো দান করতে এসেছো আমাকে?" ধমকে বলে উঠলেন ভীষ্মদেববাবু শিবানীকে—অনেক সহ্য করেছি। ভাল চাও তো ছেড়ে দাও আমার পা। সরে যাও আমার পথ থেকে। চেনো না বোধ হয় তুমি আমাকে। জেনে রাখ—ভীষ্মদেব সিংহ অন্যায় কারো সমর্থন করে না। প্রতিজ্ঞার মৃত্যু কখনও হতে দেয় না। তার প্রতিশ্রুতিকে যারা টুঁটি চিপে মারে তাদের মুখদর্শন করতেও সে ঘৃণা বোধ করে।

"—রেগে যাবেন না বাবা।" চোখের জলে শিবানী আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তার পা জোড়াটা। বলল উঠে প্রতিজ্ঞা রূঢ় কথায়, —আপনার প্রতিজ্ঞার মৃত্যু আমি হতে দেব না বাবা। দেব না কাকেও আপনার প্রতিশ্রুতিকে গলা টিপে মারতে। আপনার কথার খেলাপ আমি বরদাস্ত করব না বাবা। বিশ্বাস করুন আমাকে—শেখরদার সঙ্গে আমি আপনার বন্ধুর মেয়ে বাগদত্তা অভয়াদির বিয়ে দেবই দেব। কথা দিচ্ছি আমি বাবা। আমি নিজে অগ্রণী হয়ে, দাঁড়িয়ে থেকে শেখরদা'র হাত অভয়াদি'র সঙ্গে বেঁধে দেবই। আনবই তাকে আপনার সংসারে কুলবধূ করে। এই আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি বাবা। রামচন্দ্র আপনার না পারুক সীতা তার হয়ে তার পিতৃসত্য পালন করবেই।

কথাগুলো শুনে চমকে উঠল সবাই। আঁৎকে উঠল যেন শেখর। থমথমে হয়ে গেল সমস্ত পরিবেশটাই। শেখরের মা, মামা, মামীমা শিবানীর বোকার মত এরূপ অদ্ভুত আশ্চর্য্য কথায় খেয়ে গেল ভ্যাবাচ্যাকা। ভীষ্মদেববাবু কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরং। বক্রোক্তির স্বরে বলে উঠলেন তিনি, —দেখ মা, গেঁয়োভূত বটি ঠিকই। কিন্তু তোমাদের মত শহুরে মেয়েদের এসব সরষে-পড়া মন্ত্রে ভুলবার পাত্র নই। এসব ফালতু কথায় বোকা বানাতে পার তুমি অন্য সকলকে—আমাকে নয়। কচি খোকা আমি নই। কার পক্ষে কি করা সম্ভব, আর কি করা অসম্ভব সে জ্ঞান আমার আছে। আমার কাছে চালাকি কোরো না। ছাড়।

—কোন ভাবেই কি আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না বাবা? কাতর কণ্ঠে বলে উঠল শিবানী?

বজ্রকণ্ঠে উত্তর এল ভীষ্মদেববাবুর—বিশ্বাস করব যেদিন সত্যিই তুমি তোমার কথা রাখবে অর্থাৎ শেখরের সঙ্গে অভয়ার বিয়ে দিতে পারবে। আর তা যদি পার তবে সেদিনেই আমি শেখরের ঘরে ফিরে আসব। আসব তার সংসারে। নতুবা নয়। এখন ফাজলামি রেখে ভালয় ভালয় ছেড়ে দাও আমার পা। বলেছি যখন তখন আমি কিন্তু যাবই। ফের বেয়াদপি কর যদি তবে আমি কিন্তু তোমাকে পায়ে মাড়িয়ে যেতে বাধ্য হব।

পাশ থেকে ওমনি রেগে গেঁয়ো বুলিতে গালি দিয়ে বলে উঠল দামিনী—ছেড়ে দে মুখপোড়াকে। ঘাটের

মড়া যে ঘাটে ইচ্ছা যাক ভেসে, ওটা একটা পাথর। পাষাণের পায়ে মাথা ঠুকলে পাষাণ কি কখনও গলে মা, আয় চলে তুই আমাদের কাছে।

বলেই দামিনী হাত ধরে তুলে শিবানীকে টেনে নিল নিজের কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে স্প্রীং এর মত লাফিয়ে ভীষ্মদেববাবু সদর দরজার দিকে বাড়ালেন পা। অবনীবাবু, সুশোভনা, 'হাঁ হাঁ, না না করে যাচ্ছিলেন তাকে আটকাতে। কিন্তু ওমনি নিষেধ করে উঠলেন দামিনী দেবী—কোনো খোসামোদ করতে হবে না তোদের। লাই পেলে মিনসের বাই আরো বেড়ে যায়। ওর মুরোদ আমার জানা আছে। সাধুও হবে না, সন্ন্যাসীও হবে না। ছুঁচো মুখো বুচো করে আপনিই আবার ফিরে আসবে বাড়ী।

"— তোর বাড়ীতে আমি পাড়াই, তোর সংসারের মুখে আমি আগুন লাগাই।" যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে ওমনি রাগে ফেটে পড়ে বলে উঠলেন ভীষ্মদেববাবু।

যেমনি কত্তা তার তেমনি গিন্নি। হাঁড়িমুখো কত্তাকে জালামুখী গিন্নি ওমনি হাঁড়রে গলায় উঠল বলে,—মুখ পোড়া কোন নদীতে মরতে যাচ্ছিস যা, যেতে যেতে আবার অলুক্ষণে কথা কেন। তেজ দেখানোর দৌড়টা তোর কতদূর দেখি।

কথাটা যেন ব্রণে সূচ ফুটিয়ে দিল ভীষ্মদেববাবুর। তুমি ছেড়ে তুই। তাও আবার এত লোকের মাঝে। এর চেয়ে আর কি অপমান আছে তার। সুতরাং আর মুখ ফেরালেন না ভীষ্মদেববাবু। গটমট করে সদর দরজার চৌকাঠ ভেঙ্গে হন হন করে নামলেন তিনি বাইরের রাস্তায়। সামলাবার জন্য রাগটা তার দু-এক পা এগিয়ে গেলেন বটে অবনীবাবু কিন্তু নিষেধ করে উঠল তার দিদিই। তেমনি দাপটের সঙ্গে বলে উঠলেন দামিনীদেবী—কোন চিন্তা নেই তোদের। মল্লার দৌড় যে মসজিদ পর্য্যন্ত তা আমার জানা আছে। কিছুক্ষণ পরে গিয়ে দেখবি হয়ত বসে আছে গ্রামের মাথায় বকুল তলায় কিংবা পাড়ার শেষে মনসা মেলায়। চায়ের খেয়াল উঠলেই আপনি লক্ষ্মীছেলের মত বাড়ীতে ফিরে আসবে। আজ তো শুধু নতুন নয়—জীবন ভর চলে আসছে তার এমনি ধারা।

—কিন্তু ওভাবে তোর কথাগুলো বলা উচিত হয়নি দিদি?"

"—থাম তো তুই।" দাবিয়ে ভাইকে বলে উঠল দামিনী। কি করবে? রাগের মাত্রাটা বেশী হলে যাবে হয়তো পাশের গ্রাম করমশাল কিংবা হুট্রে গিয়ে উঠবে তার পাশের গ্রাম শালবনি। সীমা তো তার ওই মাসুতুতো ভাই ও পিসতুতো বোনের বাড়ী পর্য্যন্ত। তারপর, রাগ দেখিয়ে ও মিনসে যতই ডন-ডনে মাছির মত ভন-ভনিয়ে এধার ওধার উড়ে বেড়াক না কেন—দুদিন বৈ তো নয়।" গলাটা বেশ চড়িয়ে সেই উড়ন্ত ডন-ডনেটাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল সে,—বলি শুনছো, ভাল চাও তো ফিরে এস। আমি ছাড়া গতি নাই তোমার। বুঝলে? যেখানেই যাও, যার চুলোতে গিয়েই মুখ থুবড়ে পড় আমার মত কেও তোমার ফাইফরমাশ খাটবে না, ঢুকুর ঢুকুর চা করেও দেবে না। দু-দিন পর যদি নাজেহাল হয়ে ঘেয়ো মাছির মত তাড়িয়ে না দেয় তোমাকে তাহলে আমি দামোদর সিংহের বিটিই নই। ঢঙ্ করে আর রাগ দেখাতে পরের চালে কাকের মত 'কা-কা' করতে যেও না। এতে কেলেঙ্কারি বাড়বে বৈ কমবে না।

কথাগুলো ভীষ্মদেববাবুর বোধ হয় কানে গেল। তাই স্পীডটা গেল তার বেড়ে। মুহূর্ত্তে বৌ-বেটা ও স্ত্রী শ্যালকের চোখ থেকে হয়ে গেল সে অদৃশ্য। বুড়োর চলার গতি, মতি-প্রকৃতি দেখে থমকে অবশ্য রইল সবাই কিন্তু শ্রীমতি দামিনী দেবীই সে থমথমে ভাবটা দিলেন ভেঙ্গে। শেখরের মামীমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন তিনি, —ওর বেআক্কেলে ব্যাপার নিয়ে আমাদের তো আর দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। নূতন বৌকে নিয়ে কতক্ষণ শেখর আর ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে? জলধারা দিয়ে বৌমাকে বরং তুই ঘরের ভিতর নিয়ে যা। আমি ততক্ষণ পাড়াতে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি। ডেকে নিয়ে আসি প্রতিবেশীদের। নূতন বৌ আমার প্রথম শ্বশুর ঘরে ঢুকছে। লেগ-দস্তুর নিয়ম কানুনগুলো সব করতে হবে না?

শ্বশুর বাড়ীতে অবশ্য ঢুকল শিবানী কিন্তু যে মন নিয়ে সে শেখরদার সঙ্গে ঘর করবে বলে এসেছিল সে মনটা গেল তার ভেঙ্গে। গেল ভেঙ্গে তার ভেবে আসা সে সংসারের স্বপ্ন। শুকিয়ে গেল তার মন-কল্পনার ঘর বাঁধবার আশা-লতাটা। শেখরের প্রতি জমে উঠা প্রেম, সে ভালবাসা সব গেল তার চটকে, শাশুড়ীর প্রতি গড়ে

উঠা ভক্তি শ্রদ্ধাও গেল তার ছিটকে। বরং ঘরে ঢুকতেই যে শ্বশুর তাকে বিরূপ নজরে দেখল, দিল তাকে অভিশাপ—সেইশ্বশুরের উপরইউল্টো শ্রদ্ধা ভক্তি তার উঠল উপচে। সত্যিই মানুষটা দেবতা। দেবতা ছাড়া এমন নির্লোভ-নিঃস্বার্থ মনে অভয়ার মত একটা অনাথ, সহায়-সম্বলহীন গরীব মেয়েকে অকপটে এমন উদার, সরল, দরদী, সহানুভূতিশীল অন্তঃকরনে নিজের একমাত্র শিক্ষিত ছেলের বৌ করতে বদ্ধপরিকর হয় কখনও ? এ দেবতাকে রুষ্ট করে তুষ্ট হয়ে থাকতে কিছুতেই পারবে না সে এ সংসারে। যেমন করেই হোক এ মন্দিরের দেবতাকে তার মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেই। করে সে তাঁর থাকবে পূজক হয়ে, সেবক হয়ে। স্বামীর পিতৃ-সত্য স্ত্রী হয়ে সে করবে পালন। আনবেই সে অভয়াকে শেখরদা'র তার আর এক স্ত্রী করে। তার আশার ধন এরূপে অন্যায় ভেবে দখল করে সে স্বার্থপরের মত একা ভোগ করতে পারবে না। এ পাপ তার, অনুচিত। এতে জীবনে সুখী হতে পারবে না সে। তার ধনে অভয়াকেও ধনী করবে সে। থাকবে দুজনে একই বৃন্তের দুটি ফুল হয়ে। নারায়ণের উভয় পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মত।

শ্বশুর বাড়ীতে ঢুকেই তাই প্রধান কাজ হল শিবানীর অভয়াকে নিজের বোনের মত দেখা। তাদের বাড়ীতে কখনও নিজে গিয়ে, কখনও অভয়াকে নিজের ঘরে এনে তাকে তার প্রাণের স্নেহ, বোনের ভালবাসা উজাড় করে ঢেলে দিতে লাগল শিবানী। নিজে না সেজে সাজাতে লাগল তাকেই। মাথায় দিয়ে তার সুগন্ধি তেল, আঁচড়ে দিত তার চুল। পরিপাটি করে বেধে দিত তার খোঁপা। স্নো-পাউডার নানা প্রসাধনে শহরের বিউটি পার্লারের মত সাজাত তাকে মাঝে-মধ্যে। দিত পরিয়ে নিজের দামী দামী শাড়ি, গহনাগুলো সব। শুধু তাই নয়—তারপর করত সে অবাক কাণ্ড। অদ্ভুত ব্যাপার। শেখরদার ঘরে ঢুকিয়ে চমকে দিত তাকে। কখনও তার ড্রেসিং টেবিলের কাছে বড় আয়নাটার সামনে শেখরদার পাশে সালঙ্কারা অভয়াকে দাঁড় করিয়ে তাকেই অভয়াদিকে পাশে তাকে জিজ্ঞাসা করত মানিয়েছে কেমন ? রাধা-কৃষ্ণের মত, না লক্ষ্মী-নারায়ণের মত ?

কি বলবে শেখর ভাষা খুঁজে পেত না। শিবানীর মনের কথা বুঝত সে। অভয়ার কাছে সে বিশ্বাসঘাতক, বেইমান বলে বোবা হাবা-গোবার মত থাকত সে চুপ দিয়ে। শিবানীর স্নেহ-আদরে শেষ পর্য্যন্ত অভয়াই হয়ে গেল তার ছোট বোন। এমন বোন, যেন নিজের মায়ের পেটের মত। আপন বোনও বুঝি এতটা প্রাণের, মনের বা হৃদয়ের হয় না। দিদি যখন শিবানী তখন তার ছোট বোনটার বিয়ের দায়িত্ব তো তার-ই। প্রাণের বোনটাকে সে পরের বাড়ী পাঠিয়ে থাকবে কি করে ? সুতরাং রাখবে সে নিজের কাছেই। শেখরদা'র সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দু-সতীনে থাকবে তারা এমন এক মন, এক প্রাণ হয়ে যে সবাই তাদের মনে করে অভিন্ন সত্তা।

কিন্তু এ কেমন কথা। তাই কখনও হয় ? কেন হয়না ? দু চোখ, দুটো কান, দুটো হাত, দুটো পা নিয়েই তো একটা দেহ সুন্দর হয়। তারা দুজনে তাহলে শেখরদার জীবনটাকে সুন্দর করতে পারবে না কেন ? তাই শেখরদার বাড়ীতে আর বৌ হয়ে রইল না শিবানী। দামিনীদেবীর ঘোমটার বধূ না হয়ে, গেল সে হয়ে তার মেয়ের মত। শুধু দামিনীদেবীরই বা কেন অভয়ার সঙ্গে সে হয়ে গেছল অভয়ার মায়ের আর এক কন্যা-রত্ন। বড় মেয়ে। আচার আচরণ ও ব্যবহারে তার দুটো বাড়ীকে এক করে দিয়েছিল শিবানী। দুটো মাকেও করে দিয়েছিল যেন একাত্মা। হয়ে গেছেল সে সেই দু-মায়ের এমন আবদারে, আদুরে ও স্নেহের দুলালী যে দু-মায়ের কেও তাদের এই পাগলী মেয়ের কথার উপরে কথা, মতের উপরেও মত দিতে পারত না। পারল না তাই তার ইচ্ছায় শেখরের সঙ্গে অভয়ার বিয়ের ব্যাপারেও অমত প্রকাশ করতে। নারায়ণের লক্ষ্মী-সরস্বতীর মত যদি তারা শেখরের জীবন—বৃক্ষটাকে সুখ-স্বচ্ছন্দে, হাসি-আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারে তবে আপত্তিটা কিসের ? আর এই জন্যই তো নিরুদ্দেশ হয়েছে শেখরের বাবা। বুড়ো মানুষ ঘুরছে কোথায়, আছে কোনখানে কে জানে ? তবে যেখানেই থাক — হাওয়াতে কথা যায়, বাতাসে খবর দেয়। কানা-ঘুষা যেমন করেই হোক শেখরের সঙ্গে অভয়ার বিয়ের কথা নিশ্চয়ই পৌঁছুবে গিয়ে শেখরের বাবার কানে। শুনবে যখন সে হয়েছে পূরণ তার প্রতিশ্রুতি, থেকেছে তার কথা, রক্ষিত হয়েছে যখন তার প্রতীজ্ঞা তখন আর দামিনীর উপর রাগ করে সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে, ছেলের উপর অভিমান করে থাকা আর তার উচিত নয়। থাকবেও না সে। মনের আনন্দে আসবে ছুটে সে তার ঘরে।

হয়ে যেত হয়ত শিবানীর আন্তরিক ইচ্ছায়, প্রেরণায় শেখরের সঙ্গে অভয়ার বিয়ে কিন্তু অভয়ার মায়েই

হঠাৎ সে পরিণয়ের পূর্বে তুলল একটা আবদার। বলে বসল সে শেখরের বাবার সামনেই হতে হবে তার অভয়ার বিয়ে। কথাটা অবশ্য ঠিক। সায় দিল তার এ কথায় পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনেরাও। শেখরের মা-ও করল সমর্থন অভয়ার মায়ের কথাটা। কারণ স্বামী তার, তার দোষেই তো ছেলের প্রথমবারের বিয়েটা দেখতে পায় নি। তার ত্রুটিতেই তো হয়েছিল সেটা তাকে গোপন করে। শেখরের এই দ্বিতীয় বারের বিয়েটাও যদি অসাক্ষাতে হয় তাঁর তবে দুঃখ রাখতে আর জায়গা থাকবে না। মনস্তাপের তার সীমা থাকবে না। সুতরাং খোঁজাই হোক তাকে আগে। উদ্দেশ্য করে তাকে জানিয়ে দেওয়া হোক খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে যে তার কথা মতই শেখরের যখন হচ্ছে বিয়ে তখন যেন সে শীঘ্র বাড়িফিরে আসে। শুধু এসব প্রচার মাধ্যমকেই নির্ভর করে থাকা হল না। থানা, পুলিশও করা হল শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু দিনের পর দিন কালক্ষয় ছাড়া অন্য কিছু আর হল না। এলেন না ফিরে ভীষ্মদেববাবু তার বাড়ী। পাওয়া গেল না তার কোন হদিশ বা খবর। ছটফট করতে লাগল শিবানী। শুভস্য শীঘ্রম। এসব ব্যাপারে কাল হরণে যা হবার তাই হতে লাগল। অর্থাৎ বিরূপ কথা, কুরূপ মন্তব্য, ছিটে-ফোঁটা কেচ্ছা কেলেঙ্কারি এধার ওধার থেকে হতে লাগল বর্ষিত। কোনো মেয়েতো কখনও সতীন সহ্য করতে পারে না। এ আবার উল্টো। নিজেই নিজের সতীন ঘরে ঢুকাতে চায়! নিশ্চয় কোন রহস্য আছে এর পেছনে। আছে মেয়েটার কোন কু-মতলব, চারিত্রিক ত্রুটি বা শারীরিক কোন গোলমাল।

অসহ্য হয়ে উঠল শিবানীর। অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সে। চুপ দিয়ে আর পারল না সে থাকতে ঘরে। রাখতে অভয়ার মায়ের কথা, করতে দূর তার শেখরদার মায়ের ব্যথা প্রতীজ্ঞারূঢ় হয়ে সে নিজেই বেরিয়ে পড়ল একদিন তার আদর্শ শ্বশুর ভীষ্মদেব সিংহ মহাশয়ের খোঁজে।

—সত্যি? হঠাৎ সতীর কথার মাঝে বোকার মত জিজ্ঞেস করে বসল ভূতনাথ?

থমকে গেল সতী। তাকিয়ে তার দিকে অবাক হওয়া সুরে বলে উঠল সে, —সত্যি মানে? আমার এসব কথা তোমার কি অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে ভূতুদা?

যেন ঘাবড়ে গেল ভূতনাথ। থতমত খেয়ে বলে উঠল সে, —না, ঠিক অবিশ্বাস নয়। তাছাড়া তোর কথা অবিশ্বাস করার মত দুর্মতি আমার যেন না হয় সতী। তবে ভাবছি আমি, শিবানীর মত একটা শহুরে আধুনিকা মেয়ে এমন উন্নত হৃদয়, মহৎ প্রাণ হল কি করে? মেয়েরা সাধারণত এ ব্যাপারে অত্যন্ত স্বার্থপর সঙ্কীর্ণমনা হয়। নিজের স্বামীকে বরং যমকে দিতে পারে তারা তবু পরকে দিতে পারে না। কিন্তু মেয়ে হয়ে শিবানী স্ব-ইচ্ছায়, নিজেই অগ্রনী হয়ে এভাবে তার স্বামীর ভাগ, সিঁদুরের ভাগ, সোহাগের অংশ অভয়াকে দিতে বদ্ধ পরিকর হল কি করে? মেয়েদের চরিত্রে এরকমটা হওয়া যে অসম্ভব। তাই সন্দেহ জাগছে মনে। কিন্তু তুই যখন বলছিস তখন নিশ্চয়ই এসব সত্য কথা। সত্যিই শিবানী মহৎ, উদার, দরদী সহানুভূতিশীলা এবং খুবই ভাল মেয়ে?

—আর তার শেখরদা? পাল্টা প্রশ্ন করে বসল সতী?

—পাত্রী রূপে শিবানীর মত এমন একটা সৎ, চরিত্রবান, ভাল মেয়েকে নির্বাচন করা মোটেই শেখরের ভুল হয়নি। কিন্তু তবু আমি বলব অন্যায় করেছিল শেখর। ছোট থেকে অভয়ার মত ওমনি একটা পিতৃহারা অসহায়া সরলা গরীব মেয়েকে আশা দিয়ে রেখে হট্ করে ওম্নি শিবানীকে বিয়ে করা মোটেই উচিত হয়নি তার। তাছাড়া বাবা তার নিজে - - - -।

কথার মাঝে ভূতনাথের, হঠাৎ হেসে উঠল সতী। সে এক অদ্ভুত হাসি। ভূতনাথ তো হতভম্ব। যা বাবাঃ! কোন বেঁফাস কথা বলে ফেলল নাকি। সামলে নেবার জন্য জের টেনে তার নিজের কথায় বলে উঠল সে, —না, মানে, আমি সে কথা বলছি না। বলছি —অভয়া যে তার বাগদত্তা এ কথাটা শেখরের শিবানীকে জানানো উচিত ছিল। বলা উচিত ছিল তাকে যে এ কথা সে নয়, দিয়েছিল তার বাবা। তার নিতান্ত ছেলে-মানুষ বয়সে। তখন এসবের কোন জ্ঞান-গম্যি হয়নি তার। প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে এরূপ গোপনীয়তা আমি পছন্দ করি না সতী। প্রণয়ের ক্ষেত্রে কোন লুকো-ছাপা বা কোন বিষয় দাবিয়ে রাখা পাপ আমার মতে। মন পরিষ্কার করে সব কথা তো শেখর বলতে পারত শিবানীকে। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় যখন যুক্ত করতেই যাচ্ছে সে তখন অন্তরটা তার সাফ করা উচিত ছিল। সব কিছু খুলে বললে শিবানী নিশ্চয়ই এর একটা বিহিত কিছু করতে

পারত। ওই পবিত্রমনা শিবানীকে তার না জানিয়ে এসব ভুল করেছিল শেখর। লোভে পাপ করেছিল সে। ঢাকিয়ে রেখে নিজেকে শেখর এভাবে হটকারিতা করে শিবানীকে বিয়ে করা অন্যায় হয়েছিল তার। শুনতে শুনতে আবার ওমনি হঠাৎ হেসে উঠল সতী। এ হাসি আগের হাসির চেয়ে আরো অদ্ভুত। আরো ভূতনাথকে অবাক করা। এ সূক্ষ্ম দেহীর হাসি নয়। এ যেন বাস্তবের কোন ফুল্ল যৌবনার হাসি। হাসছে যেন কোন উদ্ভিন্ন যৌবনা তার প্রেমাস্পদ যুবকের দিকে তাকিয়ে। এমনি হাসিই কি হাসত শিবানী তাদের কলেজ মাঠে বকুল তলায় প্রেমিক শেখরের সঙ্গে গল্প করার সময়—ছল ছল খল খল উদ্বেল উচ্ছল? কে জানে।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য। এমন কি কথা বলল ভূতনাথ যে সতীকে হঠাৎ হাসতে হবে। কোন অযৌক্তিক তো বলে নি সে। বলেনি তো কোন অবান্তর অসংলগ্ন কথা। তার মতে শেখর ছেলেটা যে হটকারিতা করে শিবানীকে বিয়ে করে ঠিক কাজ করেনি—এটাই তো বলেছে সে। বলেছে তার ধারনা মত। এতে এত উৎফুল্ল হয়ে হেসে উঠার কি আছে?

যাক গে ওসব কথা। এ ধারা অন্য খাতে বহাবার জন্যই বোধ হয় প্রশ্ন করে উঠল ভূতনাথ—আচ্ছা সতী, শেখর শিবানীর এতসব জীবন ঘটনা জানলি কি করে তুই? জানলি কি করে তাদের মনের কথা এত খুঁটি-নাটি নিখুঁতভাবে।

—এসব কথা তুমিও জান ভূতুদা। উত্তরে তার বলে উঠল সতী।

—আমি জানি মানে?

—মানেটা তুমি পরেই জানতে পারবে ভূতুদা। কারণ উভয়েরই মন তো আমাদের এক। তাই আমার মনে যা আছে তোমার মনেও তাই আছে। আমার মনের যা এখন সংজ্ঞাপিত হচ্ছে তা আছে তোমার মনে সংগুপ্ত হয়ে। সময় হলে আপনিই তোমার মন থেকে আমার মত সব জানা, বুঝা ব্যাপারগুলো ব্যক্ত হবে ভূতুদা। অধীর হবার কোন প্রয়োজন নেই।

তা বললে কি ভূতনাথ শুনে? চণ্ড চেপেছে তার মাথায়। সুতরাং বলতেই হবে তাকে এসব কথা জানা বুঝার তার রহস্যটা কি? পড়ল সতী মহা মুস্কিলে। বোধ হয় বাইটা ভূতুদার ধামা চাপা দেবার জন্যই বলে উঠল সে, —শোন ভূতুদা, সবাই আমরা একই মন-সমুদ্রের উঠা নামা ঢেও। তাই সকলের সঙ্গে সকলের আমাদের অন্তরের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সকলের মন আমাদের একই সূতোয় বাঁধা। তাই সকলের মনের কথা ইচ্ছা করলে, মনঃ সংযোগ করলে অর্থাৎ মনের সঙ্গে মন যুক্ত করলে জানতে পারি সবাই আমরা।

—কিন্তু তুই যেমন পারছিস আমি তেমন পারছিনা কেন? বলে উঠল ভূতনাথ।

—পারছ না কারণ অনন্ত মন-সমুদ্রের বুকে আর সবার মত তুমি বাস্তবের তাড়নায় উঠা একটা ঢেউ। তাই বাইরের রূপ রস শব্দ স্পর্শগন্ধে মশগুল হয়ে আছে তোমার মন। মূল উৎসে মন নেই তোমার। কিন্তু আমি মৃত্যুর মাধ্যমে সে সমুদ্রের বুকে পড়া তরঙ্গ। মিশে আছি মন-সাগরে। তাই অথৈ সাগরের বুকেওঠা সব ঢেউয়ের মনের কথা বুঝতে পারি আমি। জানতে পারছ না তুমি কারণ বাইরের ঝড়-ঝঞ্ঝা মনটাকে তোমার বাস্তবে রেখেছে আটকে, বেঁধে, মশগুল করে।

আবার সেই তত্ত্বকথা। কল্পকথার মত শেখর-শিবানীর গল্প কথাটা জমে উঠেছিল বেশ সতীর মুখে। তত্ত্বের ধারা বইলে যে এসব ভেসে যাবে অন্যদিকে। না, তা হতে দেওয়া চলবে না। জানতে হবে সেই যুগল-জুটির পরিণতিটা এসে কোথায় দাঁড়াল? কি হল উদার, আদর্শ পরায়ণ ভীষ্মদেববাবুর? তাই সেই প্রসঙ্গে আবার ফেলবার জন্য সতীকে তার তত্ত্বধারা বন্ধ করবার জন্য উঠল বলে ভূতনাথ,— আচ্ছা সতী, ক্ষোভে দুঃখে অপমানে সেই যে ভীষ্মদেববাবু তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন—তার পরই কি সাধু হয়ে গেলেন তিনি সাধুর ডাঙ্গায় এসে?

"—না ভূতুদা।" কৌতূহলী মুখটার দিকে তাকিয়ে সতী উঠল বলে ভূতনাথকে —হুট্ করে তিনি সাধু হননি। সাধু হবার ইচ্ছাটাও তার ছিল না। বরং সাধুর জীবনকে বড় বেশী ভয় করতেন তিনি। কারণ এ জীবন নিঃসঙ্গ, একক। অনিশ্চিত ও অনির্দ্দিষ্ট। সংসারে কত নিশ্চিন্ত থাকে মানুষ। থাকে পুত্র কলত্র পরিবারের মধ্যে কত নিঃশঙ্কা, নিরুদ্বেগ ও নিয়তাশন অবস্থায়। কিন্তু সাধুর জীবনে, বিশেষ করে এই বুড়ো বয়সের একক

জীবনে যে মাঝ সমুদ্রের অথৈ-অতল জলে পড়ে হাবুডুবু খাওয়ার মত হবে তার। রোগ জ্বালা হলে কে করবে তার সেবা-শুশ্রূষা। পড়ে থাকলে জ্বর-বিকারে কে দেবে তাকে ঔষধ-পথ্য। মুখে দেবে কে তার জল?

শুরু করল বলতে সতী ভীষ্মদেববাবুর এমন কথা যেন মনের সঙ্গে মন ও প্রাণের সঙ্গে প্রাণ যুক্ত হয়েছিল তার। হাত পুড়িয়ে খান নি কখনও ভীষ্মদেববাবু। সুতরাং ঝুপড়ি-খুপড়িতে সাধু হয়ে পড়ে থাকলে খাবে সে কেমন করে? খাবারের যোগাড়-যন্ত্রই বা করবে কি করে সে? ভিক্ষা? মাগা-যাচা তো দূরের কথা ভুলেও জীবনে কখনও কারো কাছে লজ্জায় হাত পাততে পারেননি তিনি। আর "ভিক্ষাং দেহি" বলে ঘুরবে সে এর ওর দরজায় দরজায়—ফটকে, গেটে, দুয়ারে? অসম্ভব।

কিন্তু দামিনীর কথার খোঁচাগুলো বড্ড সূচের মত বিঁধছিল তাকে। বে—আক্কেলে সে, হতচ্ছাড়া সে, দামিনীর সে গলগ্রহ, সংসারের সে কাল। তার মত লোকের নাকি ঘর-সংসার ছেড়ে সাধু হয়ে যাওয়াই উচিত। না থাকলে সে হাড়-মাসগুলো নাকি সকলের জুড়োয়, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে, গায়ে বাতাস লাগে—ইত্যাদি ইত্যাদি। কুটুম-বন্ধু আত্মীয় স্বজনের বাড়ী যাবে কি পিত্তিজ্বালা কথাগুলো দামিনীর ঝাঁ ঝাঁ করে বাজতে লাগল তার কানে—ডন ডনে মাছি, পরের চুলোয় মুড় গুঁজা, ছুঁচো মুখ বুচো করা ইত্যাদি। না, যাবে না সে জ্বালাতে কারো বাড়ী। মাসতুতো ভাই, পিসতুতো বোন তো দূরের কথা চেনা, জানা, পরিচিতের নজরের বাইরে দূরে বহু দূরে চলে যেতে মনস্থ করল সে। বেরিয়ে পড়ল সে, যেদিকে তার দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যাবার জন্য। কিন্তু ভাগ্যেব এমনি পরিহাস, ভবিতব্যের এমন ভ্রূকুটি যে যে—সাধুর জীবনকে ভয় করেছিল সে "কানার পা খালে পড়ার মত" সেই সাধু জীবনে গিয়েই পড়তে হল তাকে।

বাউণ্ডুলে জীবনের সে ইতিহাস ভীষ্মদেববাবুর যেমনি বিচিত্র, তেমনি দুঃখের। ঘুরতে ঘুরতে উঠেছিলেন তিনি বীরভূম ছেড়ে বিহারে—দেওঘরে। সেখানে দারোয়া নদীর তীরে ক্ষুধায় ভির্মি খেয়ে না তৃষ্ণায় জল খেতে গিয়ে—কে জানে, মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেছলেন তিনি। হারিয়ে ছিলেন সংজ্ঞা। জ্ঞান ফিরতেই দেখলেন তিনি এক ঝুপড়ির মধ্যে সাধুর আশ্রমে শুয়ে। সাধু তাকে সুস্থ, প্রকৃতিস্থ শুধুই করলেন না, সব কথা শুনে তার রেখেছিলেন তাকে তাঁর কাছেই আশ্রমে। বুঝালেন তাকে সংসার অসার, জগৎ মায়া, পুত-পরিবার, কন্যা-কলত্র কেও কারো নয়। এসব মায়া প্রপঞ্চের পায়ের বেড়ি। এ জগতে কেও কারো উপকার করতেও পারে না, অপকারও করতে পারে না। যাকে দিয়ে যা করাবার সব সেই একমাত্র ভগবানেই করান। যন্ত্রী তিনি—তার হাতের যন্ত্র আমরা সবাই। সুতরাং প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি, তিনি না রক্ষা করালে মানুষের সাধ্য কি তা রক্ষা করার? এ জগতে যে যার ভবিতব্যের বশেই চলেছে। চালাচ্ছে তাকে সেই এক অদৃশ্য শক্তি। তাকে ভাগ্য, ভগবান, অদৃষ্ট যে যাই বলুন না কেন। তাকে ডিঙ্গিয়ে কারো কিছু করার বা কাকেও কিছু করে দেবার উপায় নেই। সুতরাং অভয়ার জন্য দুঃখ, ছেলের উপর ক্ষোভ বা স্ত্রী এর উপর রাগ করার তার কোন কারণ নেই। এটা তার নাকি একধরনের অহঙ্কার। এ অহঙ্কার আছে বলেই মনে কষ্ট পাচ্ছে সে। নিজে পাচ্ছে দুঃখ, অপরকেও করছে দুঃখিত। ওসব ক্ষোভ, অভিমান মনে পুষে রাখা উচিত নয় তার। এতে আত্মিক ক্ষতি হয়। সুতরাং "আমি, আমার" এসব অহঙ্কারকে মন থেকে তার মুছে দিতে হবে। ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে দূর করে। চিরকালের মত।

কথাগুলো সাধুর শুনছিলেন ভীষ্মদেববাবু আশ্রমের পিছনে দাওয়ায় বসে বিকেল বেলায়। ছোট্ট নদী দারোয়ার দূর-দিগন্তের ডুবন্ত সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে। শুনতে শুনতে মনের কপাটগুলো যেন খুলে গেল তার। সত্যিই তো—তার জীবন-সূর্য্যও অস্তমিত প্রায়। সাধুবাবার কথা মিথ্যে নয়। আর্য্য-সন্তান তিনি। জাতিতে ক্ষত্রিয়। সেই যুগে চতুরাশ্রমের এই পর্য্যায়েই তো তাঁর পূর্বপুরুষরা সংসার ত্যাগ করে বানপ্রস্থ তথা সন্ন্যাসের ব্রত গ্রহণ করতেন। সে আর্য্য রক্তের ধারা তো তার মধ্যেও প্রবাহিত। তবে ভীষ্মদেববাবুর জীবনে সেই অতীত আর্য্য-বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হবে না কেন? জীবন ধারায় চতুরাশ্রমের সংসার ত্যাগের পর্য্যায়েই এসেছে সে। কি পেল এতদিন সে সংসারের ঘানি টেনে? সাধুবাবার কথাই ঠিক—সংসারের তাকে আর কোনো প্রয়োজন নেই। সত্যি, সে সেখানে ফিরে গেলে ঝড় উঠবে তার পরিবারে। শুধু তার স্ত্রী দামিনীর ঘৃণা-অবহেলাই পাবে না সে সেখানে। পাবে সমাজের টিট্‌কারী, সম-বয়সীদের ঠাট্টা, বিদ্রূপ। পা দিলে তার সংসারে বৌ-বেটারও দুঃখের কারণ হবে সে। অভয়া ও তার মার মনঃকষ্ট বাড়বে বৈ কমবে না। সুতরাং ভগবান যখন দামিনীর

অবহেলা অনাদর ও রাগ-দেমাকের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাকে গৃহ-ত্যাগ করা করিয়েছেন এবং সংসার থেকে এনেছেন এ সন্ন্যাসীর কাছে তখন আর ফিরে যাবেন না সে বাড়ী। মিথ্যা মোহের বেড়ি যখন খুলেই এসেছে সে তখন রচে আবার ফিরে গিয়ে পারবে না সে আর মায়ার শিকল। পড়বে না আর সে, সে বন্ধনে। অতএব সাধুই হবে সে। এ ভীষ্মদেবসিংহের গঙ্গাপুত্র ভীষ্মদেবের মতই দৃঢ় সংকল্প—প্রতীজ্ঞা।

হল সে সাধু। সেই বৈদ্যনাথ ধামের দেওঘরে দারোয়া নদীর বৈদ্যিবাবা শিষ্য করলেন তাকে। পরিয়ে দিলেন সাধুর পোষাক। ধরিয়ে দিলেন হাতে দণ্ড-কমন্ডলু। থাকতে থাকতে ভীষ্মদেববাবুর বাড়ল দাড়ি, হল জটা। কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়ি আর জটার ভারে বেশ ভারিক্কি হয়ে উঠল তার চেহারাটা। চেহারাটাই শুধু ভারিক্কি হয়ে উঠল না ভীষ্মবাবুর। পেটে তার জ্ঞান দিল। ছিল বেদ্-উপনিষদ ধর্ম-শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ আলোচনার ফল ও চাপা থাকা বোধ। বৈদ্যি বাবার সাহচার্যে সে বোধের বিকাশ হল তার।

"—আচ্ছা," জিজ্ঞেস করে উঠল ভূতনাথ— ভীষ্মদেববাবুকে চেলা সাধুকরা এই বৈদ্যনাথ ধামের দারোয়া নদীর বৈদ্যবাবাই কি ছিল সাধুর ডাঙ্গার বৈদ্যিবাবা?

"—হ্যাঁ ভূতুদা।' বলে উঠল সতী—" এই বৈদ্যিবাবারই ভক্ত হয়েছিল তোমাদের এই কারখানার মালিক অবিনাশবাবুর এক পূর্ব পুরুষ। নাম ছিল তার বদ্যিনাথ চৌধুরী। তীর্থ করতে গিয়ে বৈদ্যনাথ ধামে প্রথম পরিচয় হয় তাঁর দেওঘরের বৈদ্যিবাবার সঙ্গে। কথা-বার্তায়, উপদেশে মুগ্ধ হয়ে তাঁর বৈদ্যনাথবাবুই গন্ধেশ্বরী নদীর এই অপরপাড়ে বাবুগঞ্জ গ্রামের বাড়ীতে তাদের পায়ের ধুলো দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন তাঁকে। ভক্তের অনুরোধ রক্ষা করতে আসেন তিনি এই বাবুগঞ্জ গ্রামে। বৈদ্যনাথবাবুর অর্থাৎ এই অঞ্চলের তৎকালীন নামজাদা জমিদারবাবুর বাড়ীতে। বাবুর সেবা যত্নে ও ভক্তি শ্রদ্ধায় বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন বৈদ্যিবাবা। তুষ্ট করতে তাকে থেকেও যান দু-একদিন বাড়ীতে তার। তাঁর সন্তুষ্টি ও প্রসন্নতার সূত্র ধরেই বৈদ্যনাথ বাবু করে বসেন তাঁকে আর একটি আবদার। সেটি হল চৌধুরী বাবুদের মুলুকের মধ্যে যে কোন জায়গায় তাঁর পছন্দমত স্থানে তাঁকে একটি আশ্রম করাতে হবে।

সেই বৈদ্যনাথ চৌধুরীরই প্রার্থনা মত সেই বৈদ্যিবাবা এখানে অর্থাৎ নাকি অবিনাশ চৌধুরীর এই কারখানাটার অতীত বুকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর আশ্রম। গন্ধেশ্বরী নদীর উত্তর পাড়ে, শ্মশান পাশের নিঝুম-নিরিবিলি শান্ত পরিবেশের এই স্থানটা বড় পছন্দ হয়েছিল তার। দেওঘরে তার দারোয়া নদীব পাড়ের আশ্রমটা তেমন সুবিধের ছিল না। জায়গাটা ছিল নোংরা, স্থানটাও ছিল সঙ্কীর্ন। তাই এরকম একটা খোলা-মেলা জায়গারই বিশেষ প্রয়োজন ছিল তার। ঈশ্বর যেন স্বকর্নে শুনেছিলেন আন্তরিক ইচ্ছাটা সাধুবাবার এবং এভাবেই সাধটা পূরণ করেছিলেন তার। তাছাড়া পাশ-পাশ ঘেরা গ্রাম-গঞ্জের মাঝে এমনি দু-একটা আশ্রম গড়ে উঠা ভাল। এতে লোক-কল্যাণ হয়, হয় প্রকৃত জনসেবা। কারণ আশ্রম তো সাধুদের শুধু একক মুক্তির বা উদ্ধারের জন্যই নয়। আর স্বার্থপরের মত এ মুক্তি আত্মার আসন্নমুক্তিও নয়। তারই আত্মা তো সর্ব্বভূতে বিরাজ করছেন। সুতরাং প্রকৃত মুক্তি বা আত্মোদ্ধার সকলের মুক্তি বা উদ্ধারের সঙ্গে জড়িত। সেই একই আত্মা বহুরূপে এই সংসারের মায়া প্রপঞ্চে পড়ে কত কষ্ট পাচ্ছেন। অর্থাৎ কত সৎ ব্যক্তি হচ্ছে অসৎ, অবস্থার চাপে পড়ে কত বিবেকবান হারাচ্ছেন তাদের বিবেক। নিঃস্বার্থ মনা হচ্ছে স্বার্থপর, দয়ার্দ্র চিত্ত হচ্ছে হৃদয়হীন। তাদের জ্ঞানের শিখা একটু বাড়িয়ে দেবার জন্য, বোধের সলতেটা একটু উস্কে দেবার জন্য, পবিত্রতার প্রদীপে একটু তেল দেবার জন্যই তো আশ্রম। প্রকৃত জনকল্যাণ বা জগন্মঙ্গলই তো হল আশ্রমের ব্রত। এই সেবাব্রতই হল প্রকৃত ঈশ্বর সাধনা। সে ব্রত-সাধনা যে গন্ধেশ্বরী নদীর তীরে গড়ে উঠা আশ্রমে সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব হবে তার সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ শুধু নয় দৃঢ় নিশ্চয় হলেন বৈদ্যিবাবা। কিন্তু এখানের মূল আশ্রম পূর্ণরূপে না গড়ে উঠে পর্য্যন্ত বৈদ্যনাথধামের আশ্রমটায় থাকা বিশেষ প্রয়োজন ছিল তার। তাহলে এই গন্ধেশ্বরীর আশ্রমে? চিন্তায় পড়েছিলেন তিনি। আর ঠিক এই মুহূর্তেই পরম চিন্তামনি ঈশ্বর তার হাতে ধরিয়ে দিলেন যেন ভীষ্মদেববাবুকে। লোকটার ধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞান ছিল ভালই। নানা ধর্মগ্রন্থ, বেদ উপনিষদ ইত্যাদি বিষয়ে ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। গীতা-চণ্ডী ছিল মুখস্ত তার। এরকম লোককে চৌধুরী বাবুদের আনুকুল্যে গড়ে উঠা আশ্রমটাতে সাধুর বেশে বসিয়ে দিলে যে তার চেয়েও ভাল কাজ হবে সে ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তিনি। তাই ভীষ্মদেববাবুকে তিনি সাধু করে, গেরুয়া পরিয়ে, হাতে চিমটা মুখে গোঁফ দাড়ি ও মাথায় জটা ধরিয়ে তার পাটে

বসাবার জন্য তাকে নিয়ে এসেছিলেন এই সাধুর ডাঙ্গায়। বাঁকুড়া জেলার প্রায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে, অপরিচিত জায়গায় নিরালা নির্জন পরিবেশে, আশ্রমটা তার-বেশ মনোমতই হয়েছিল। দিনকতকের মধ্যেই তিনি তার সাধু স্বভাব ও সৎ উপদেশের বলে, শান্ত-সৌম্য আচরণ ও মিষ্টি ব্যবহারের ফলে জয় করে নিয়েছিলেন এ অঞ্চলের প্রায় সকলের মন। আস্তে আস্তে জমেও উঠেছিল তার আশ্রমটা। প্রায় দিন বিকেলে তার আশ্রম-মাঝের বটগাছটার তলায় বসতেন তিনি আসন করে। হত ভাগবত পাঠ। কোনদিন রামায়ণ কোনদিন বা মহাভারত। তারপর সেই পাঠেরই জের টেনে চলত উপদেশ, হিতোপদেশ গন্ধেশ্বরীর পশ্চিম দিগন্তে অস্তে যেয়ে সূর্য্যদেব নামাতেন সন্ধ্যা। নামতেই সন্ধ্যা পাঠ শুনতে আসা কাছে-পিঠের গ্রামগুলোর আইবুড়ো ত্রয়োস্ত্রি মেয়েরা উঠে দেখাত সন্ধ্যা। ঠাকুরঘরে বাবার ঘরে মিটমিটিয়ে উঠত জ্বলে প্রদীপ। সেই প্রদীপ দেখানোর পালা শেষ করে সাধুবাবাকে প্রণাম জানিয়ে যেত চলে সব যে যার বাড়ী।

এধারা দিনের পর দিন চলত শুধু নয়—যেত বেড়ে। লোক আসত বলতে গেলে প্রায় কাতারে কাতারে। ছেলে মেয়ে, বুড়ো বুড়ী, এমন কি যুবক-যুবতী পর্য্যন্ত। বৈদ্যিবাবা ভাবতেই পারেনি যে সামান্য দিনের মধ্যে তার বুড়ো চেলা অর্থাৎ হালি সাধুটি এমনভাবে জমিয়ে তুলবে তার আশ্রমটিকে এবং জাঁকিয়ে বসবে তার পাটটাতে। যার পর নাই সন্তুষ্ট হয়ে তিনি মাঝে মধ্যে তার দেওঘরের আশ্রম থেকে আসতেন এখানে। থাকতেন দু-একদিন। তারিফ করতেন তার। উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রেরণা দিয়ে যেতেন তাকে। এভাবে এখানে সাধু হয়ে থেকে তার আত্মার মুক্তি ও জগম্মঙ্গল সাধন ব্রত সুষ্ঠুভাবে পালন করে যেতে বলতেন তাকে।

কিন্তু প্রশ্ন হল ভূতনাথের এভাবে সাধু হয়ে মহান ব্রতে নিজের জীবন উৎসর্গ করল যখন ভীষ্মদেব বাবু তখন তাকে মারা হল কেন? কার কোন উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য বরণ করে নিতে হল তাকে এমন নিষ্ঠুর নৃশংস অপমৃত্যু। অকালে, অনিচ্ছাকৃতভাবে। এক অসৎ, অধম, পাপীর হাতে?

"—সে আর এক অন্য ইতিহাস, ভূতুদা।' বলে ডঠল সতী,—"সে কথা বলার চেয়ে না বলাই ভাল। শুনলে সে কথা উত্তেজিত হবে তোমার মন। সে মনের কম্পন যেয়ে স্পর্শ করবে ওই ঝড়ো-প্রেতাত্মাটার সত্তাটাকে। ফলে প্রতিক্রিয়া তার বিরূপ হতে পারে ভূতুদা। পারে হয়ত অসংযমী মনের স্পন্দনে তোমার এই ঘূর্ণাবাতরূপী সত্তাটার মনবাহি ঈর্ষা-হিংসা-ঘৃণা-বিদ্বেষ আরো ভয়াল ভয়ঙ্কর ও ভীষণাকারে প্রকাশ হতে। উত্তেজনার হাওয়া লেগে তোমার হয়তো আরো বিধ্বংসী রূপে হতে পারে ওই প্রেতাত্মাটা প্রকটিত।

সত্যিই ভাবনার কথা। কারণ মনের উপর নিজের সত্যিই কোন কন্ট্রোল নেই ভূতনাথের। কিন্তু হঠাৎ ওমনি মুখ থেকে বেরিয়ে গেল তার,—তুই-ই তো আমার মন সতী। আত্মিক সত্তায় তুই—আমি যখন অভিন্ন তখন হতে দিবি কেন মনকে আমার উত্তেজিত। তোর বাঁধনে রাখবি আমাকে বেঁধে। তোর সংযমশীলতায় রাখবি আমাকে সংযমশীল করে।

হাঁসল সতী। মুক্তো-ঝরা, মনোহরা সে এক মধুর হাসি তার।

(আঠাশ)

ইহলোকবাসীদের সঙ্গে পরলোকবাসীদের পার্থক্য হল—ইহলোকের অধিবাসীরা যে যার যতই অধীন থাক, বশের হোক বা টানে পড়ুক তার কথা যে সে শুনে চলবেই তার কোন ঠিক নেই। শোনা বা না শোনা তার ইচ্ছাধীন। কিন্তু পরলোকবাসীরা একবার কারো টানে পড়লে, বশের হলে বা আকর্ষণে থাকলে সে তার কথার অবাধ্য কখনও হয় না। নিজের ইচ্ছা বা খেয়াল-খুশি কিছু না রেখে সে তার ইচ্ছার অধীন হয়, তার কথায় কথা বলে। ভূত-সিদ্ধ বা পিশাচ সাধকরা তাই তো তাদের বশ করা প্রেতাত্মাকে দিয়ে তাদের ইচ্ছামত নানা কাজ করায় অর্থাৎ সেই অশরীরী আত্মারা তাদের কথা মত চলে। এই কারণেই বোধ হয় সুরলোকবাসী দেবতারাও হন ভক্তাধীন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পর্য্যন্ত ইচ্ছা না থাকলেও তাই বুঝি অসুরদের খেয়াল-খুশি মত বর দিয়ে পরে পড়েন বিপদে। সূক্ষ্মলোকবাসী সতীও তাই এড়াতে পারল না ভূতনাথের কথা। সেরূপ ইচ্ছা তার না থাকলেও নাছোড়বান্দা ভূতুদার পাল্লায় পড়ে বলতে হল তাকে সামনে ফুসন্ত ঘুরন্ত ঘূর্ণিঝড়রূপী পুষ্করভূত ভীষ্মদেববাবুর অবশিষ্ট জীবনের কথা। সে কথা সতীর মুখে স্রোতের মত এমন শুরু করল বইতে যে বিস্ময়ে ভূতনাথ হয়ে গেল যেন উপলখণ্ড।

বাবুগঞ্জের জমিদার বৈদ্যনাথ চৌধুরীর আনুকুল্যে গন্ধেশ্বরী নদীর উত্তর পাড়ে এই সাধুর ডাঙ্গায় উঠল গড়ে অবশ্য বৈদ্যিবাবার আশ্রম। কিন্তু সে আশ্রমকে এক কথায় ডালে-পালায় ফুলে-ফলে-পল্লবে বিকশিত, বিলসিত করে তুললেন এই ভীষ্মদেববাবু অর্থাৎ সেই বৈদ্যবাবার চেলা-সাধু। মূল বাবারতো স্থায়ীভাবে থাকার অবসর হয় না কখনও আশ্রমে। তিনি আজ সাধুর ডাঙ্গা তো কাল বৈদ্যনাথধাম। পরশু আবার হয়ত অন্য কোন জায়গায়। উড়ন্ত পাখীর মত এধার ওধার ঘুরে বেড়ানই তার স্বভাব। কিন্তু এ স্বভাবটা পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করলেন তিনি একদিন সাধুর ডাঙ্গায় বসে। সত্যিই প্রচারে পশারে এমন জমিয়ে তুলেছিলেন ভীষ্মদেববাবু তার আশ্রমটাকে যে তিনি তাঁর সব ডেরা ছেড়ে সাধুর ডাঙ্গার আশ্রমটাতেই জাঁকিয়ে বসবার জন্য করলেন মনস্থ। কিন্তু দেওঘরের তার ওই দারোয়া নদীর তীরের আশ্রমটার মত শুধু তো এখানে বসা যাবে না। একটা কিছু অবলম্বন করে এখানে থাকতে হবে। কিন্তু কি হবে তার সেই অবলম্বন করে এখানে অবস্থান করার বস্তুটি?

হঠাৎ চঙ্ চাপল বৈদ্যিবাবার মাথায় এখানে একটা মন্দির করতে হবে। আর শ্মশানের পাশে যখন তার এই আশ্রমটা তখন এ মন্দিরে তার শ্মশানেশ্বর শিবের লিঙ্গ-মূর্ত্তি করতে হবে প্রতিষ্ঠা। এবং সে শিবলিঙ্গ যা-তা জায়গা থেকে আনবেন না তিনি। আনবেন শিবতীর্থ কৈলাসধাম থেকে স্বয়ং অর্থাৎ নিজে গিয়ে সেখানে। রাক্ষসরাজ রাবণ এ কাজ করতে পারেন নি। তিনিও নাকি ইচ্ছা করেছিলেন শিবধাম কৈলাস-পর্বত থেকে তার ইষ্টদেব মহাদেবের লিঙ্গ মূর্ত্তি আনয়ন করে প্রতিষ্ঠা করবেন তাঁর রাজ্য শ্রীলঙ্কায়। শর্ত ছিল নাকি এই মূর্ত্তি সংগ্রহ করেই তাকে একটানা সোজা চলে আসতে হবে কৈলাসধাম থেকে একেবারে তার রাজ্য শ্রীলঙ্কায়। মাঝে কোথাও, কোন অবস্থাতেই বা কোন কারণেই সে লিঙ্গ মূর্ত্তি নামানো চলবে না। যেখানেই নামাবেন তিনি সেইখানেই নাকি থেকে যাবেন তার ইষ্টদেব। আর যাবেন না। দৃঢ় নিষ্ঠায়, অদম্য ইচ্ছায় রাবণ রাজা নাকি তার সংকল্প পূরণে হয়েছিলেন বদ্ধ পরিকর। স্বর্গের দেবতারা গণলেন প্রমাদ। দেবাদিদেব মহাদেব যদি রাক্ষসপুরীতে বন্দী থেকে যান তবে সমূহ বিপদ তাদের। এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য চাললেন তারা নাকি এক মোক্ষম চাল। বরুণ দেবকে দিয়ে অসহ্য প্রস্রাবের বেগ দেওয়া হল রাক্ষস রাজকে। বাধ্য হয়ে রাবণ নামালেন তাঁর ইষ্টমূর্ত্তি। ব্যস, শিবলিঙ্গ আর নড়লেন না। সেইখানেই রয়ে গেলেন নাকি বাবা মহাদেব। সেই ধামেই হয়ে গেল নাকি বৈদ্যনাথধাম।

স্থির করলেন সাধুর ডাঙার বৈদ্যিবাবা যে রাবণের মত ভুল তিনি করবেন না। তাই বাহ্য-প্রস্রাবের দস্তুর মত সংযম অভ্যাস করে যাত্রা করলেন তিনি কেদারনাথের পথে কৈলাসধাম। মনে দৃঢ় প্রত্যয়, হৃদয়ে মহা সংকল্প নিয়ে। রাক্ষস রাজ রাবণ যা পারেন নি তা তাকে পারতেই হবে। হিমালয় তীর্থ কৈলাসধাম থেকে লিঙ্গ রাজ্যের মূর্ত্তি এনে করতেই হবে তাকে তাঁর সাধুর ডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠা। দেবাদিদেব মহাদেব থাকবেন বাঁধা তার আশ্রমে। কিন্তু হায়—মনের সাধ তার মনেই থেকে গেছল। কারণ কৈলাস পর্বত থেকে আর ফেরা হয়নি তার। সেই যাত্রাই তার নাকি শেষযাত্রা অর্থাৎ অগস্ত্য-যাত্রা হয়েছিল। কিন্তু কোথায় যে তিনি ছাড়লেন শেষ নিঃশ্বাস, কখন কিভাবে যে গেলেন তিনি মারা তা কিন্তু রইল সবার অজানা। এমন কি তাঁর মৃত্যুসংবাদ পর্য্যন্ত পৌঁছালো না এসে সাধুর ডাঙ্গায়।

এধারে আশ্রমে তাঁর রইলেন পড়ে প্রতিনিধি ভীষ্মদেব সিংহ। সাধুর ডাঙ্গার সাধু হয়ে। মন্দির, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদির আশায় রইল এখানের আশপাশের জনসাধারণ। বৈদ্যিবাবার মানস-মন্দির বাস্তবে রূপ দেবার জন্য করতে লাগল তারা সাধ্যমত দান। হতে লাগল সব নানাদিক থেকে আদায়পত্র। তার সঙ্গে নিত্য-নৈমিত্তিক চলতে লাগল আশ্রমের পূজো-পাঠ, সেবা-অর্চনা ইত্যাদি। হতে লাগল রোজ বিকেলে ধর্মালোচনা। উপদেশামৃত পরিবেশন ইত্যাদি চলতে লাগল কোন কোনদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত পর্য্যন্ত।

কিন্তু কুসুমের মধ্যেও যেমন কীট থাকে—থাকে যেমন রঙের মধ্যে রাংতা ও মেঘের মধ্যে বজ্র। তেমনি সাধুর ডাঙ্গারও হল একটি কীট। সে কীট বা রাংতাটি হল চৌধুরী বংশেরই এক কুল-প্রদীপ শ্রীমান রসিক নাগর চৌধুরী। বৈদ্যনাথ চৌধুরীরই মধ্যম পুত্র তিনি। তিনিই ক্রমশঃ সাধুর ডাঙ্গার ক্ষতিকারক কীট ও ধ্বংসকারক বজ্র উঠলেন হয়ে। সম্বন্ধে তিনি নাকি ছিলেন বর্তমান এই কারখানার মালিক অবিনাশ চৌধুরীরই পিতামহ।

সে যাই হোক—অনেক সময় দেখা যায় কারো কারো বাল্যে রাখা নাম পরিণত বয়সে তার আভিধানিক অর্থ নিয়ে ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে এমন খাপ খেয়ে যায় যে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অজান্তে বাল্যে রাখা শ্রীমান রসিক নাগর চৌধুরীর নামের ক্ষেত্রেও কিন্তু ঠিক তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ রসিক শব্দের অর্থ হল স্বাদগ্রাহী আর নাগর কথার অপর এক অর্থ টানলে দাঁড়ায় নারী-দেহ-সুখ-লোভী। মোদ্দা কথা হল—ভ্রমরের যেমন ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ান স্বভাব, রসিক চৌধুরীরও স্বভাবটা ছিল সেইরকমই। অর্থাৎ নারী-ফুল-মধু খেয়ে বেড়ানো। আর সেই অছিলাতেই আসত সে সাধুর ডাঙ্গা। আশ্রমে একটু নজর লাগা, দেখতে ভাল বা সুন্দরী মেয়ে এলেই তার পিছনে পিছনে ঘুরঘুর করত সে। উড়ো পোকার মত ফুরফুর করে উড়ে বেড়াত সে তার কাছে। আশ্রম বলে কথা, কাকেও তো নিষেধ করা যায় না। যায় না কাকেও এধার ওধার ঘুরোঘুরি করলে মানা করা। বিশেষ করে সাধুবাবার পক্ষে তো নয়-ই।

সাধুবাবা অবশ্য বুঝতেন রসিকবাবুর চরিত্রটা। তাই পরোক্ষভাবে করতেন তিনি চেষ্টা তার স্বভাবটা পরিবর্তনের। গল্পের ছলে উপদেশ দিতেন। উপদেশের ছলে বাস্তবের দু-একটা উদাহরণ দিতেন। কিন্তু সব কিছু ভস্মে ঘি ঢালা হত তার। এক কথায় লাই পেয়ে কুকুর যেমন মাথায় ওঠে তেমনি রসিক নাগর সাধুবাবার এই কাছে বসানো, বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি কাজ কারবারগুলোকে মনে করত তাকে তোয়াজ করা, খোশামোদ করা। তার প্রতি সাধুর এসব দুর্বলতা মনে করে রসিক বাবু নিজেকে একটা কেওকেটা ধরে নিয়েছিল। তাই এখানে আসা সব রাধাদেরই বেপরোয়াভাবে কৃষ্ণ হতে চাইত সে। চাইত সে ঠারে ঠোরে গোপনে তাদের সঙ্গে লীলা করতে।

রসিক বাবু একদিন ঘটাল এক কাণ্ড। কোন এক গ্রামের, মনে হয় কারো এক কুটুম্বের মেয়ে এসেছিল আশ্রম দেখতে। সুন্দরী যুবতীর যেন গায়ের গন্ধ পেয়ে এলেন রসিকনাগর তার কাছে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তাকে আশ্রমের পিছনে পেল একা। উদয় হল সামনে তার। বুঝাতে লাগল তাকে তাদের আশ্রমের কথা, এ আশ্রমে তার সাধুবাবাকে আনার কথা। মোট কথা রঙ্ চড়িয়ে, রস ফলিয়ে এমনভাবে নিজেকে সে জাহির করতে লাগল মেয়েটার কাছে যেন সে এ অঞ্চলের সূর্য্য। নানাভাবে ভুলিয়ে ফুসলিয়ে ভাবল রসিক বাবু মেয়েটা বুঝি তার টোপ ধরেছে। তাই হাত ধরে তাকেএকটু সোহাগ করতে গেছল সে। কিন্তু ও বাবাঃ। মেয়ে তো নয় যেন জাত সাপের ডেকা। ছোঁবা মাত্রই উঠল ওমনি সে ফোঁস করে। সম্মানে লাগল জমিদার পুত্রের। এমন বেয়াদব মেয়ে, তাদের আশ্রমে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ডাঁট দেখায়। জোর করে ডাঁটটা তার মুড়িয়ে দেবার জন্য ধরল তাকে সে জাপটে। মেয়েটা ওমনি করে উঠল চিৎকার।

তারপর সে কি কেলেঙ্কারি। ধর্মালোচনার আসর ছেড়ে চিমটা হাতে ছুটে এলেন বাবা। জমিদার পুত্র বলে রসিক বাবুকে কিন্তু তিনি ছেড়ে কথা বললেন না। যাচ্ছেতাই ভাবে করলেন তাকে অপমান। শুধু তাই নয়—সকলের সামনে সেই মেয়েটাকে তাকে "মা" বলাতে ও হাত জোর করে তার কাছে রসিকবাবুকে ক্ষমা চাওয়াতে করলেন তিনি বাধ্য। তবেই পেল সে অব্যাহতি।

কিন্তু সেই একটা কথা আছে না,—বাঁনর কি থাকে পুয়াল জাঁকা আর স্বভাব কি থাকে হুড়পি টাঁকা?" সেই হল রসিকবাবুর। যে গরু গু খায় সে কি তা ছাড়ে কখনও? তাই আর একদিন ঘটালেন তিনি আর এক কাণ্ড। অবশ্য সেটা আশ্রমে নয়। আশ্রমের বাইরে। নদী নামতি পথের মাঝে। মেয়েটা ছিল তাদের গ্রামেরই সর্দ্দার পাড়ার। মুরারী সর্দ্দারের শালিকার মেয়ে। নাম নাকি মালিনী। বাবুগঞ্জ এসেছিল সে তার মাসিমার বাড়ী—বেড়াতে। বেড়াতে এসে সে দেখতে এসেছিল সাধুর ডাঙ্গার আশ্রম। আশ্রম দেখে ফিরছিল সে মিষ্টি রোদের ঝিলিক লাগিয়ে গায়ে। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে হাসতে হাসতে, ঢলা-ঢলি করতে করতে। যৌবনোচ্ছলা হরিণী, চঞ্চলা লাবণ্যময়ী। রূপসীর রূপটা নজরে পড়তেই রসিক নাগরের জিবে সরল যেন লাল। ছিল সে অদূরে পথের পাশেই। নদী নামতি রাস্তাটার ধারে উঁচু পাড়টার উপর একটা পাকুড় গাছের তলায়। মুরারী সর্দ্দারের ঘরে যে একটি মাল নেমেছে কথাটা তার আগেই কানে এসে পৌঁছেছিল। সেটি কে, নামটি তার কি এবং এসেছে যে সে আশ্রম বেড়াতে সব খবরই ইতিপূর্বে সাঙ্গ-পাঙ্গরা কানে ঢেলেছিল তার। এবং বলা বাহুল্য সেই মালটিকেই দেখবার জন্য সে নদীর পাড়ে ছিল অপেক্ষা করে। কাছে আসতেই তার তাই সে নেমে এল সামনে

মেয়েটার। উদ্ভিন্ন যৌবনার ছলছলানি বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গী-সাথীদেরও কলকলানি হল স্তব্ধ। হাসি মুখগুলো সবাকার গাম্ভীর্য্যতায় হয়ে গেল পূর্ণ। রসিকবাবু এসেই তাকে উঠলেন বলে, —হয়ত তুমি আমাকে চিনতে পারছ না, আমি কিন্তু তোমাকে জানি। আচ্ছা, তোমার নামই তো মালিনী?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো? গম্ভীরভাবে বলে উঠল মালিনী।

—গায়ের সব আমার জুড়ি-পাটিরা বলাবলি করেছিল যে তোর সঙ্গে যে মেয়েটার বিয়ের সম্বন্ধের কথা হচ্ছিল সে মেয়েটা এসেছে নাকি নামপাড়ায়, মুরারী সর্দ্দারের বাড়ী। শুনেই তখন থেকে মনটা আমার তোমাকে দেখবার জন্য ছটফট করছিল। আশ্রম গিয়েছ শুনে এখানে ফিরতি পথে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই অপেক্ষা করে আছি।

অন্যান্য মেয়েগুলো তো শুনেই যেন আকাশ থেকে পড়ল। কিন্তু মালিনী তার বিয়ের কথা শুনে লজ্জিত হবে কি সকলের অবাক হওয়াটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে সে বলে উঠল,— "আমার বিয়ের কথা আমি জানলাম না আর আপনি জেনে গেলেন। তা ছাড়া আমার মা আছেন, বাবা আছেন, ঘর আছে। দেখা করতে গেলে সেখানে যাবেন। এখানে কেন? পথ ছাড়ুন আমাদের।"

"—পথ ছাড়তে তো আমি আসিনি।" বলে উঠলেন রসিক বাবু—তোমাকে যে আমার প্রথম দেখাতেই পছন্দ হল সে কথাটা জানাব না? ভাব-ভালবাসা যখন হলই তখন পরস্পর বিয়ের আগে দু-একটা আমাদের মনের কথা বললে ভাল হত না? চল না ওই পাকুড় গাছটার তলায়, দু-জনে একটু গল্প করি। সঙ্গীরা তোমার যাক না—আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।

—দেখুন, মিথ্যে এসব বিয়ের কথা বলে আমাকে ধাপ্পা দেওয়া দেখে আপনি যে কেমন লোক তা আমার জানা হয়ে গেছে। ভাল চান তো পথ ছাড়ুন।

কি এত বড় কথা। তার সামনে। মুখের উপর। এতগুলো মেয়েছেলের কাছে। সম্মানে যেন চাবুক মারল রসিক বাবুর। তাই ঝাঁঝকেরে গলায় বলে উঠল সে,— "এত বড় স্পর্ধা তোমার যে মিথ্যাবাদী বল আমাকে। দেমাক তো তোমার কম নয়। মিথ্যাই হোক আর সত্যিই হোক প্রথম দেখায় ভাল লেগেছে তোমাকে এটা বলতে আসায় তোমার এত অহঙ্কার। জান আমি কে?

"—রাগ করনা রসিকদা" উগ্রমূর্ত্তি দেখে রসিকের বলে উঠল তাদের গ্রামেরই দু-একটা মেয়ে, "—ও কি করে জানবে তুমি কে? সবেমাত্র এই তো দিন কয়েক হল এসেছে ও আমাদের পাড়ায়। কথা কাটাকাটি ঠিক নয় মালিনী। চল আমারা বাড়ি যাই।" বলেই তারা মালিনীকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল তাদের সঙ্গে। কিন্তু আবার বাধা দিয়ে দাঁড়াল রসিক, "—বললাম তো ওর সঙ্গে আমার কথা আছে। তোরা যা—আমি ওকে পৌঁছে দেব। এস আমার সঙ্গে ওই গাছের তলায়।"

কিন্তু ও বাবাঃ! হাত ধরতেই রসিক এক ঝটকায় তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ওমনি উঠল মালিনী গর্জে, — খবরদার বলছি হাত ধরবেন না আমার। অপরিচিতা মেয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে লজ্জা করে না আপনার? বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু চিৎকার করব আমি।

"—চিৎকার করবে? কর চিৎকার। দেখি কোন শালা আসে তোমার কাছে।" বলেই ওমনি কি যে শয়তানি বুদ্ধি ভর করল রসিক লালের মাথায় কে জানে। জাপটে সে ধরতে গেল মেয়েটাকে। মালিনীও ওমনি আচমকা মারল তাকে এক ধাক্কা। ফেলে দিল তাকে। পুরুষত্বে যেন ঘা দিল রসিক চাঁদের। হাত ঝেড়ে উঠেই সে মস্তানি কায়দায় রুখে দাঁড়াল মেয়েটার চিড়বিড়ানি ভাঙ্গতে। যেমন কুকুর তাকে তেমন মুগুর না দিলে ইজ্জতটা রসিকবাবুর যে সকলের সামনে ধূলোয় লুটোবে। তাছাড়া সামান্য একটা মেয়ে হিম্মতটাকে তার থুতু দিয়ে পালাবে। তাই কি কখনও হয়? শুনলে তার এ দুর্ব্বলতার কথা বন্ধুদের কাছে সম্মানটা তার খেতো হয়ে যাবে না? সুতরাং কাঁকড়ির মত দাড়াওয়ালা হাত দুটো বাড়িয়ে মালিনীকে ওমনি ধরতে গেল রসিকনাগর। শুরু হল চিৎকার, চেঁচামেচি। হল শুরু দু-জনের মধ্যে ঝাপ্টা-ঝাপটি সংগ্রাম। নিরুপায় হয়ে মেয়েরা ছুটল ফিরে সাধুর ডাঙ্গার দিকে—আশ্রমে।

রসিক চাঁদের কীর্ত্তি শুনে সাধুবাবা তো উঠলেন তেলে বেগুনে জ্বলে। আশ্রমের সব কাজ ফেলে তিনি

তখনই হাতের দণ্ডটা নিয়ে প্রায় ছুটে চললেন নদীর দিকে। আশ্রমে যে দু-চার জন ভক্ত বা শিষ্য-প্রতীম ছিল তারাও করল ধাওয়া তাঁর পিছনে পিছনে। কিন্তু সেই মেয়ে-ছেলেগুলোর সঙ্গে বাবা এসে পৌঁছলেন যখন সেখানে তখন চৌধুরী-পুঙ্গব উধাও। পদদলিতা সর্পিনীর মত একা দাঁড়িয়ে মালিনী ফুঁসছে। লজ্জায়, দুঃখে অপমানে সে দু-হাতে তার মুখ চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কাছে এসে সাধুবাবা মেয়ের মত বুকে টেনে নিলেন তাকে। মাথায় বুলোতে লাগলেন হাত। মেয়েরাই তো পারে মহিষাসুরদের মর্দন করতে। মনে দিয়ে তাকে সাহস, হৃদয়ে দিয়ে তাকে বল, করলেন তিনি আশ্বস্ত। বোধ-প্রবোধ দিয়ে করলেন তাকে প্রকৃতিস্থ। তারপর নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন-চিত্ত করে তাকে তার সাথী-সঙ্গি নীদের সঙ্গে নিজে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলেন বাড়ীতে। কিন্তু এভাবে লম্পটটার লাম্পট্য চলতে দিতে থাকলে তো আশ্রমটার মান মুরোদ সব নষ্ট হয়ে যাবে। পথের পাশে বসে থাকা রক্ত-খেকো বাঘটাকে দূরে করতে না পারলে মেয়ে-বৌদের আশ্রমে আসাটাই যাবে উঠে। সাধুবাবা তাই সেই পথেই এসে হাজির হলেন বৈদ্যনাথ বাবুর বৈঠকখানায়। সপার্ষদ্-পরিচরদের নিয়ে চৌধুরী মশায় তখন জমিয়ে তুলেছিলেন সান্ধ্য আড্ডাটা। আচমকা এসে সাধুবাবা তাদের সে আসরে ফাটালেন যেন বোমা। তার ছেলের অপকীর্ত্তি কুকাণ্ডগুলোর এমন পরিচয় দিলেন তিনি যে চৌধুরী বাবুর মান-সম্ভ্রমে গিয়ে লাগল ঘা। সকলের মাঝে এমন চোখছুলা কথা তাকে! তার সামনে! এত লোকের মাঝে বলা তো দূরের কথা—গোপনে তাকে একান্তে শোনাতেও কেও কখনও সাহস করত না। এটা শুধু তার অপমান নয়—তার বাপ-ঠাকুরদাও। এমন কি সমস্ত বংশটার অপমান। পূর্ব-পুরুষদের মুখে চুন-কালি দেওয়া। এক দিক দিয়ে যেমন ক্ষুণ্ন হলেন তিনি অপর দিক দিয়ে তেমনি ভীষণ রাগ হল তার সাধুবাবার উপর। মুখে কিছু না বললেও চটে গিয়ে মনে মনে গুম হয়ে তিনি হজম করলেন সাধুবাবার বেয়াদবিটা। লোকটার সত্যিই বাড় বেড়েছে। নইলে যার শিল তার নড়া—তারই আবার এভাবে দাঁতের গোড়া ভাঙ্গতে কখনও সাহস করে সে। এ যে দুধ-কলা দিয়ে কাল-সাপ পোষার মত তার।

প্রতিক্রিয়া একটা হল অবশ্য। রসিক বাবুর বন্ধ হয়ে গেল আশ্রমে আসাটা। তবে আড্ডাটা সে গাড়ল আশ্রম যাওয়া-আসা পথের পাশের গন্ধেশ্বরী নদীর উঁচু পাড়টাতে। যে পাকুড় গাছটার কথা আগে বলা হয়েছিল তার তলায়। ডেরায় তার সঙ্গী-সাথীরা হঠাৎ রসিক বাবুকে দিল একটা যুক্তি। সে যুক্তিটা হল—সাধুবাবাকে ডিট করতে হলে এই নদী পাড়ের পাকুর গাছটার তলায় তাকে একটা আলাদা আশ্রম করতে হবে। আর সে আশ্রমে আনতে হবে তাকে সাধুবাবার চেয়েও একজন বড়বাবাকে। এনে সে আশ্রমে তার করাতে হবে শ্মশানেশ্বর শিব নয়—শ্মশানেশ্বরী কালীর প্রতিষ্ঠা। সে কালীর পূজো হবে মদ্য-মাংসে। আর মদ-মাংস-মাগী মা-কালীর পঞ্চমকার সাধনার অঙ্গ। সুতরাং আশ্রমকে ঠেকনা রেখে এ তিন সাধন-অঙ্গে গা ভাসিয়ে দিলে কারো কিছু আর বলবার থাকবে না। অতএব মা-ভৈ।

উত্তম প্রস্তাব। তবে এ প্রস্তাবের বাস্তব রূপায়ন তাদের হোক বা না হোক সেই পাকুড় তলায় মা-কালীর পূজোর উপাচার মদ্য-মাংসের চলতে লাগল জোয়ার। রসিক বাবুর নন্দী-ভৃঙ্গীর অভাব ছিল না। তারাই তার ভাবী আশ্রমে আড্ডা জমাবার জন্য কেও আনত হাঁড়িয়া, কেও পাল থেকে ভাঁড়িয়ে আনত ছাগল, কেও গোয়াল থেকে চুরি করে আনত ভেঁড়া। ধূনি জ্বলত গাছ তলাতেই। সুতরাং মদের চাট করতে ওসব ভেড়া-ছাগলকে সঙ্গে সঙ্গে এমন বেপাত্তা করে দিত যে চুরি হওয়া ছাগল-ভেঁড়ার মালিক তাদের সেখানে সন্ধান নিতে এলে নিজেই ভেঁড়া হয়ে ঘরে ফিরে যেত। বোকা বানিয়ে লোককে এভাবে দিনের পর দিন মোজ উড়াতে বিন্দুমাত্র তাদের মনে কিছু লাগত না। বরং চুরি করার আনন্দে স্ফূর্তিটা জমে উঠত তাদের বেশীই। রসিক বাবুর আবার মধুপানি পেটে পড়লে মধুসূদন হবার ইচ্ছা জাগত। জাগত মদের টানে মাগীর কথা। মালের ঘোরে মালতীর স্মৃতি।

সেদিন ওমনি মাল টেনে রসিকবাবু বসেছিলেন পাকুড় গাছের তলায়, বুঁদ হয়ে। ভর্ত্তি দুপুরবেলা। হঠাৎ মাঝনদীতে নজর পড়তেই দেখল সে একটা মেয়ে। সামনে একটা বুড়ী। বুড়ীটা আসছে পুরানো একটা রং উঠা ছোট সুটকেশ মাথায় নিয়ে। আর মেয়েটা আসছে তার পিছু পিছু। ফুরফুরিয়ে রঙ্ ফলিয়ে। তার উদম মাথায় খোঁপায় ফুল গুঁজা। কঁচি বয়েস। পরনে চেলী। মনে হয় বিয়ের শাড়ীটা। ফাঁকা নদীর বাতাস আঁচলটাকে

তার বুক থেকে দিয়েছে সরিয়ে। ফুরফুরে হাওয়ায় উড়ছে সেটা ফরফর করে। মদের চোখে মনে হল রসিক বাবুর ওটা আঁচলা নয়—ডানা। আর মেয়েটা মেয়ে নয়—অপ্সরী। ডানা মেলে সুন্দর একটা পরী এগিয়ে আসছে যেন তার দিকে। ওমনি রাজরক্ত উঠল আর টগবগ করে। শিরায় শিরায় উঠল জ্বলে কাম-লালসার আগুন। অপ্সরী মেনকা রম্ভারা মুনির সামনে এলে তাদের মন টলে যায় আর কোথায় রসিকচাঁদ চৌধুরী। তাছাড়া পাখনা মেলে প্রজাপতি যদি পতপতিয়ে উড়ে আসে চোখের সামনে তবে কোন্ কেঁকলাস তাকে ভোগে না লাগিয়ে সাধু সেজে থাকে বসে? ছেড়ে দেয় কি টিকটিকি কখনও সামনে তার ঘুরঘুর করা ঘুরঘুরে পোকাকে? রসিক নাগর তাহলে দেবে কেন ছেড়ে চোখের সামনে আসা তার ভোগ্যা সুন্দরীটিকে? সুতরাং নদী-পথ ধরে পাড়ের নীচে আসতেই মেয়েটা, উপর থেকে রসিক বাবু প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর।

তারপর সে কি ঝাপ্‌টা-ঝাপটি লপ্‌টা-লপটি কাণ্ড। ছাড়াতে গিয়ে বুড়ী শাকরেদের হুঁড়ু নিতে কুপোকাত হল। ছিটকে পড়ল গিয়ে একপাশে চিৎপটাং হয়ে। পড়েই বুড়ী আর্তস্বরে করতে লাগল চিৎকার,-কে কোথায় আছো ছুটে এস-গো। মেয়েকে আমার উদ্ধার কর গো। বাঁচাও গো। রক্ষা করগো। মেয়েটাকে যে আমার মেরে ফেলল গো।

অদূরেই ছিল সাধুর ডাঙ্গা। বুড়ীর ভাগ্য ভাল যে সে-সময় সাধুবাবা ছিলেন আশ্রমে। শুনতে না শুনতেই ক্ষাত্র-তেজ তার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ওমনি আশ্রম-কোণায় ঠেসানো বাবার ত্রিশূলটা হাতে নিয়ে ভীষ্মদেব বাবু উঁচিয়ে সেটা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসতে লাগলেন নদীর দিকে। চিৎকার করতে করতে-কোন ভয় নেই, যাচ্ছি আমি। দেখছি কার কত বুকের পাটা।

সাধুবাবার ওমনি চিৎকার করতে করতে উগ্রমূর্ত্তিতে ত্রিশূল হাতে ছুটে আসার ধরণ দেখে ভেগে গেল রসিক বাবুর সঙ্গী-শাকরেদরা। দেখাদেখি রসিক নাগরও হয়ে গেলেন পগার পার। উধাও হলেও অবশ্য বুঝতে বাবার বাকী রইল না এ অকাল কুষ্মাণ্ডটি কে বা কারা? তাই অযথা তাদের পিছনে তিনি আর করলেন না ধাওয়া। ধূপসি্ রোদে মাঝনদীর উপর গরম বালিতে পড়ে থাকা মেয়েটাকে দেখে চট্ জলদি ওমনি তিনি এসে হাজির হলেন মেয়েটার কাছে। দেখলেন প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছে মেয়েটা। পাশে পড়ে থাকা বুড়ীকে টেনে তুললেন তিনি। হাতে দিলেন তার ত্রিশূলটা। তারপর পিছনে পিছনে তার সঙ্গে সঙ্গে আসতে বললেন তাকে। চ্যাংদোল্লা করে তুলে নিয়ে মেয়েটাকে সাধুবাবা চললেন আগে আগে। আশ্রমে এনে জল, বাতাস ইত্যাদি নানা কাণ্ড করে জ্ঞান ফেরালেন তার। সেবা-শুশ্রূষায় সুস্থ করলেন তাকে। করলেন বুড়ী, মেয়ে উভয়কেই প্রকৃতিস্থ। তার পর শুনলেন তাদের মুখে সমস্ত ঘটনা।

বুড়ীর নাকি বাড়ি পাশে গ্রাম চাপাতড়ায়। মেয়েটি নাকি তারই একমাত্র কন্যা। বড় গরীব তারা। সর্বস্ব খুইয়ে বুড়ী মেয়েটির তার দিয়েছিলেন বিয়ে দূর এক গ্রাম বাঁকীপুরে। অভাবের তাড়নায় বিয়ের পর আর আনতে পারেনি মেয়েকে। সামনের সংক্রান্তিতে চাপাতড়ায় তাদের ধর্মরাজের গাজন। এ বার হবে নাকি খুব জাঁক করে। গাঁয়ের দলের হবে যাত্রা-পালা। তাই মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী থেকে তার বাপের বাড়ীতে আনছিল বুড়ী। পথে এই বিপদ। এ বিপদ এমন তার যে জানাজানি হয়ে গেলে মেয়েকে তর আর শ্বশুর ঘরে নেবে না। বাদুড় খাওয়া ফল যেমন কেও নৈবিদ্যে নিতে দেয় না তেমনি শাশুড়ী তার এমন বদমাশ যে ইজ্জত ঠোকরানো মেয়েকে তার স্বামীর সঙ্গে কিছুতেই আর ঘর করতে দেবে না।

কিন্তু মেয়ের তো তার ইজ্জত নষ্ট হয় নি। বললেও সাধু বাবা কাঁদতে লাগল বুড়ী,—গরীবের কথা কেও বিশ্বাস করবে না বাবা। অভাবীদের যে কে [illegible]-বাপ হয় না বাবা। দজ্জাল বেয়ান আমার একেই মেয়ের উপর মা মনসা, এর উপর শুনবে যখন মেয়ের সতীত্ব খোওয়া গেছে তখন ধূনোর গন্ধ পাওয়ার মত সে আমার মিনতি মায়ের উপর মেতে উঠবে বাবা। মেয়েকে আমার ঘরে নিলে যে উপোস দিয়ে মরতে হবে বাবা। কি করব এখন বলে দাও বাবা। এ কেলেঙ্কারির কাণ্ডে কি হবে মেয়ের আমার।

"—কোন কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে না। আমি নিজে যাব আপনার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী। যা বলবার আমি গিয়ে বলব আপনার মেয়ের ওই শাশুড়ীকে। কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই আপনার। গাজনে আপনার জামাই এলে আমিই সব বুঝিয়ে দেব তাকে। আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরে যান।"

নানাভাবে বলে বুঝিয়ে অভয় দিয়ে সাধুবাবা আশ্রম থেকে বিদায় করলেন গরীব মা বুড়ী ও তার মেয়েকে। কিন্তু এরকম তো চলতে দেওয়া তার উচিত নয়। আশ্রমে কত মা-মেয়ে বৌ-বিটি ভরসা নিয়ে আসে। আর সেই আশ্রমের পথে-ঘাটে মেয়েছেলেদের উপর যদি এমনি অত্যাচার হয় তবে তো তা বরদাস্ত করা মোটেই মানুষের কাজ নয়। যেমন করেই হোক এর একটা প্রতিকার করতেই হবে তাকে। যতই সাধু হোন ভীষ্মদেব বাবু ভিতরে তো তিনি ভীষ্মগোত্রীয় ক্ষত্রিয় তেজা পুরষ। ক্ষত্র থেকে অপরকে ত্রাণ করাই তো ক্ষত্রিয়ের স্বভাব, ধর্ম ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য। বৈদ্যনাথ বাবুকে বলে সেরকম কোন ফল হবে না বুঝে নিলেন তিনি। কারণ এর আগে এরকম দু একবার বলে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাছাড়া যতই হোক তিনি তো পিতা। পুত্র স্নেহে অন্ধ থাকা তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্রম তো তার একার নয়, এ অঞ্চলের। এ অঞ্চলকেই রাখতে হবে তার আশ্রমের মান ইজ্জত। প্রতিকার একটা না করলে ওই লম্পট রসিকলালের লাম্পট্য দিনের পর দিন হবে মাত্রা ছাড়া। অন্যায় করা আর অন্যায় দেখেও তার প্রতিকার না করা অর্থাৎ মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়া তো একই দোষ, সমান পাপ। তাই উত্তেজনার বশে একলা ভীষ্মদেব বাবু নেমে পড়লেন রসিক নগরের কীর্তি-কলাপ আশে পাশের লোক জনকে জানিয়ে জনতার আদালতে তার বিচার করতে।

মৌচাকে যেন ঢিল ছুঁড়লেন ভীষ্মদেব বাবু। এইখানেই তিনি করে বসলেন ভুল। যতই হোক এ অঞ্চল তো চৌধুরী বংশের। সে বংশের মান-ইজ্জত মাটির ধূলোয় মেশাবে এমন বুকের পাটা আছে কার? কার ঘাড়ে আছে ক'টা মাথা যে তাদের অন্যায় কে বলবে অন্যায়? অবশ্য বিচার সভা একটা হল। হল সেটা চৌধুরী বাবুদেরই বৈঠক খানার সামনে। আসামী ফরিয়াদী অর্থাৎ রসিকবাবু আর সেই বাঁকী পুরের গরীব মা বুড়ী ও তার মেয়েটা হাজির হল সেই মেলায়। কিন্তু আশ্চর্য্য! ইতিপূর্বেই রসিক বাবু কি চালনেই যে চেলেছিলেন তাদের, কি কৌশলেই যে কব্জা করে রেখেছিলেন সেই মা বুড়ী ও তার মেয়েটাকে কে জানে! কিছুতেই তারা আর সত্য কথাটা বলল না। বলল তারা এমন সব কথা যার ফলে উল্টো দোষটা পড়ে গেল সাধুবাবারই উপর। ছিঃ ছিঃ!

অবশ্য সাধুবাবাকে কোন সাজা দেওয়া হল না। প্রথম বারের মত মাফ করে দেওয়া হল তাকে। তবে সাবধান করে দেওয়া হল যেন ঈর্ষার বশে বা রসিকবাবু কালী-আশ্রম করছেন বলে হিংসার বশবর্তী হয়ে তার উপর মিথ্যা এরূপ অপবাদ যেন সে আর না দেয়। ভদ্রলোকের ছেলেকে যোগ-সাজস করে মিথ্যা অজুহাতে এমনি করে যদি সে পুনরায় দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু সাধু বলে আর তাকে ক্ষমা করা হবে না।

অপমানিত হলেন ভীষ্মদেববাবু। মাথা নীচু করে ফিরে এলেন তিনি তার আশ্রমে। রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহলে কি করে করবেন তিনি এসবের প্রতিকার? না, এখানে আর থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে। চলে যাবেন তিনি বৈদ্যনাথধাম। সেখানে দেওঘরের সেই দারোয়া নদীর তীরের আশ্রমেই থাকবেন তিনি। বাবা এসে থাকবেন এখানে। কিন্তু সে বাবা কৈলাস তীর্থ থেকে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তো থাকতে তাকে হবেই এখানে। তার দায়িত্ব তাকে বুঝিয়ে না দিলে যাবেন তিনি কি করে?

তাই বাধ্য হয়ে বাবার অপেক্ষায় থাকতে তাকে হলই সাধুর ডাঙ্গায়। অবশ্য ব্যাপারটা যে মিথ্যা। চৌধুরী বাবুদের ভয়ে যে মা-বুড়ী ও তার মেয়ে বেঁফাস কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল এ গোপন সত্যটা জানতে আর কারো বাকী রইল না। তাই সাধুর প্রতি ভক্তি, তার প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রইল সবাকার। আশ্রমে যেমন আসত সবাই আসতে লাগল তেমনিই।

সেদিন এসেছিল ওমনি সিউড়ী থেকে শিবানী। নদীর ওপারে পাশের গ্রাম বল্লমপুরে ছিল তার মামা বাড়ী। মামা বাড়ী অবশ্য বেড়াতে বা উত্তরাধিকার সূত্রে তার জমি-জমা দেখতে আসেনি সে। এসেছিল সে অনুরোধ করতে তার মামাকে যেন তিনি তার শ্বশুর ভীষ্মদেব সিংহের একটু সন্ধান করেন। আত্মীয়-স্বজন কুটুম-বন্ধুর জাল তার প্রায় সমস্ত জায়গাতেই ছড়ান। তাই শুধু প্রত্যক্ষভাবেই নয় পরোক্ষভাবেও খোঁজ-খবর তার নিতে বা দিতে পারবেন তিনি। বহুদিন ধরে শ্বশুর মশায় তার নিরুদ্দেশ। শাশুড়ী-মাতা প্রায় পাগলের মত। সন্ধান তার না পাওয়া গেলে শ্বশুর বাড়ীর সুখ-শান্তি সব কিন্তু বিষ হয়ে থাকবে শিবানীর। মামা তার মনের অবস্থা বুঝে দিন কতক আটকে রাখলেন শিবানীকে তার কাছে।

মামা বাড়ীতে থাকতে থাকতেই হঠাৎ সেদিন খেয়ালের বসেই এসেছিল শিবানী সাধুর ডাঙ্গার আশ্রমে। সাধু বাবাকে দেখতে। কিন্তু দেখেই সাধুবাবাকে যেন আৎকে উঠল শিবানী। চক্ষু হল তার চড়ক গাছ! এযে জটাজুটওয়ালা সাধুর আলখাল্লা পরা অবয়বের মাঝে ভেসে উঠছে তার শ্বশুরের চেহারা। দাড়ি গোঁফ ভর্ত্তি মুখমণ্ডলে উঠেছে ছাপিয়ে তার শেখরদার বাবার মুখ! একবার নয় বার বার দেখতে লাগল শিবানী সাধুবাবাকে। লাগল দেখতে তাঁর পায়ের থেকে মাথা পর্য্যন্ত, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। সেই নাক, সেই চোখ। প্রতিজ্ঞারূঢ় তার সেই চেহারা! না, শিবানীর চোখ কখনও ভুল দেখে না। শেখরের পাশে সেদিন বৌ সেজে আধা ঘোমটায় ভয়-লজ্জায় যে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে তার শ্বশুরের দিকে সে দৃষ্টির ভুল হওয়া অসম্ভব তার। ইনি নিশ্চয়ই তার শ্বশুর। যতই সাধু হয়ে, সাধুর ডাঙ্গায় থাকুন না তিনি বীরভূমের হুক্‌নোপুর গ্রামের ইনি ভীষ্মদেব সিংহ না হয়ে যেতেই পারেন না।

সাধু কিন্তু চিনতে পারলেন না তাকে। না পাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সেদিন শেখরের পাশে কূলবধূর সাজে দেখেই তাকে উত্তেজিত হয়ে গেছলেন যার পর নাই। যদিও বা এক পলক নজরটা পড়েছিল তার উপর তবু দৃষ্টিটা ছিল তার রাগের। রাগের তাপে, হতাশা ভরা অন্তরে, ঘৃণা লজ্জায় চোখ দুটো তার তেমনভাবে দেখেনি শিবানীকে। সুতরাং কি মনে থাকবে তার চেহারা? আর সে বৌ যে তার আসবে এখানে—বাঁকুড়ার এই সুদুর প্রান্তরে এক অখ্যাত অজ্ঞাত জায়গায়—সেটাই বা তার ধারনা হবে কি করে? তাছাড়া ফেলে আসা সংসার, ছেড়ে আসা বৌ-বেটার উপর আর তো কোন হুঁশ দিশাই ছিল না তার। শিবানীর তো চেহারার কোন স্মৃতিই ছিল না তার মনে। তাই আর পাঁচটা আশ্রম আসা সাধারণ মেয়ের মত শিবানীকেও মনে করে সাধুবাবা তার সরল মুখে ছেলেমানুষী সহজ হাসি হেসে উঠলেন তাকে বলে,— কি গো মা, এমন ভাবে বুড়ো এ ছেলেটার দিকে তাকিয়ে কি দেখছিস এমন করে? ভাবছিস বুঝি মা হারা এ অসহায় ছেলেটাকে এবার কোলে তুলে নিবি? বলেই সাধুবাবা নিজের কথায় নিজেই উঠলেন হেসে—হো হো করে।

কি যে বলবে শিবানী খুঁজে পেল না। লজ্জায় মুখটা নীচু করে অবস্থাটা তার সামাল দেবার জন্যই পা ছুঁয়ে সাধু বাবাকেকরতে গেল প্রণাম। আর ওমনি লাগল তার আর এক চমক! সে চমকে যতটুকু সন্দেহ ছিল তার একেবারে গেল সমূলে বিনষ্ট হয়ে। নগ্ন-পদ-সাধু বাবার বা-পায়ের জোড়া লাগা আঙ্গুল দুটো হঠাৎ পড়ল তার চোখে। জটাজাল আর গোফ দাড়িতে ভীষ্মদেব বাবু মুখমণ্ডল তার ঢাকতে পারুক, পারেনি কিন্তু সে তার বাঁ-পায়ের তর্জনী ও অনামিকা আঙ্গুল জোড়াটা ঢাকাতে। কিন্তু চিনলেও শিবানী, বুঝলেও তাকে পরিচয়টা যে কি করে প্রকাশ করবে তার ভেবে পেল না সে। চুপ করে তাই প্রণাম সেরে সে আর পাঁচটা ভক্তিমতি মেয়ের মত বসল গিয়ে একধারে। শুরু হল ভাগবত পাঠ। কিন্তু সাধুবাবার মুখটার দিকে তাকিয়ে শিবানীর মনের মধ্যে চলতে লাগল যেন টর্নেডো। ঝাপটে তার উথাল-পাথাল করতে লাগল অন্তরটা। এ অন্তরকে শান্ত করতে হলে বলতে হবেই তাকে যে সে তার ছেলে শেখরের স্ত্রী, তার বংশের কূল-বধু। আর সেও যে নয় এই সাধুর ডাঙ্গার সাধুবাবা— সে যে হুকনোপুরের ভীষ্মদেব সিংহ অর্থাৎ তাঁর পূজনীয় শ্বশুর মশায়— এ কথাটাও জানাতে হবে তাকে।

কিন্তু জানাবে সে কেমন ভাবে? কেমন করে এত লোকের মাঝে, উপদেশের আসরে, ধর্ম-গ্রন্থ পাঠের কালে বলবে সে তার মনের কথা। বলতে হলে এসব গোপনতা চাই তার। জানাতে হলে তার ব্যাপারে একান্তে চাই তাকে। নির্জন নিরিবিলি ছাড়া এসব কথা বলা যেমন সম্ভব নয় তেমনি উচিতও নয় তার। শুনলে এসব কথা কি হবে তার প্রতিক্রিয়া, কিরূপে নেবেন তিনি, কেমনভাবেই বা করবেন গ্রহণ তাকে বলা তো মুস্কিল। তাই ভাবতে লাগল শিবানী।

হল শিবানী সাধুবাবার ভক্ত। আসতে লাগল সাধুর কাছে তাঁর প্রথম দেখা বধূর বেশে। মামা বাড়ীতে থাকার দিন গেল তার বেড়ে। গেল বেড়ে তার সাধুর ডাঙ্গায় আসার মাত্রটাও। কিন্তু আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে আশ্রমে এলে তো তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আসতে হবে তাকে দল ছাড়া হয়ে—একলা। একলা এলেই একা পাবে সাধু বাবাকে। সে সুযোগ হবে সন্ধ্যা নামলে। সাধুর ডাঙ্গাটা সূর্য্যটা আলো গুটিয়ে গন্ধেশ্বরীর পরপারে অস্ত গেলেই যে-যার গ্রামে ফিরে যায় সব মেয়ে-ছেলেরা। সন্ধ্যা তার আঁচল মেলতেই প্রায় নির্জন হয়ে যায়

আশ্রমটা। সন্ধ্যা-আহ্নিক সারতে বাবা হয়ে যান একা। থাকে শুধু শিবানীর মামার গ্রামের হাবুর মা, পাঁচার বৌ ও কালু গোয়ালার বিটি। তিন জনের তিন কামনা। একজনের ছেলে নিরুদ্দেশ—সে যেন ঘরে ফিরে আসে। একজন বন্ধ্যা, তার যেন ছেলে হয়। আর কালুর বিটির বিয়ের পর স্বামীটা নেয়নি তাকে—সুতরাং জামাই যেন তাকে গ্রহণ করে। এই তিন কামনা পূরনের আশায় রোজ সন্ধ্যায় বাবার থানে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিতে আসে তারা। শিবানী ধরল তাদের সঙ্গ। বিয়ে হয়েছে তার প্রায় বছর পাঁচেক। নিঃসন্তান শিবানী। মানতের কথা নাকি বলতে নেই তাই ধূলি-মুঠি কাপড়ের আশায় আশ্রমে যদি সন্ধ্যা দেখতে যায় শিবানী তবে তার মামা-মামীর কি বলার আছে? তাছাড়া ধর্মে-কর্মে কারো বাধা দিতে নেই। বরং উৎসাহ দিতে হয়—প্রেরনা যোগাতে হয়।

এই অছিলাতেই আসত শিবানী। পেতও সাধুবাবাকে একলা। কিন্তু শিবানী যদি যায় ডালে ডালে সাধু বাবা তবে যায় পাতায় পাতায়। নিজের পরিচয় গোপন রেখে যতই শিবানী জানতে চায় সাধুবাবার ব্যক্তিগত পরিচয় ততই সাধুবাবা এড়িয়ে যান তার কথা। সাধু-সন্ন্যাসীদের নাকি সংসার-আশ্রমের কথা বলতে নেই। পূর্বাশ্রমের কথা পরিচয় দিলে নাকি মোহে টানে তাদের। স্মৃতির আকর্ষণে মন হয় চঞ্চল, উদ্বিগ্ন। ফলে সাধন পথে বিঘ্ন ঘটে তাদের ইত্যাদি, ইত্যাদি।

একদিন সন্ধ্যা দিয়ে প্রণাম করে বাবাকে জিজ্ঞেস করে বসল শিবানী -''তাহলে কি বাবা সংসার জীবন খারাপ? সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনই যদি আদর্শ স্থানীয় হয় তাহলে তো এই জীবনই সকলের গ্রহণ করা উচিত। আর এই উচিতের পথে যদি সব মানুষই যায় তবে পরিণতিটা কি হবে তার? লোপ হবে না মানুষের সমাজ? ধ্বংস হয়ে যাবে না সৃষ্টিটা।'' কথা হল তার—সংসারে মা-বাবার কোল ধরেই তো জীবনে নামেন সাধু সন্ন্যাসীরা। কৃষ্ণ হয়ে নামেন তো ভগবান বাসুদেব-দেবকীরই মাধ্যমে। নন্দের সংসারে যশোদা মায়ের কোলেই তো হন তারা বড়। বেদ-পুরাণ গীতা উপনিষদের যে জ্ঞান স্ফুরিত হয় তাদের মুখ থেকে সে জ্ঞানের ভিত্তিতো এই সংসার। সে সব বুলির উৎস তো এই সংসারশ্রমেরই পরিবার পরিজন। তাছাড়া সাধু সন্ন্যাসী বা ভারত পথের পথিক গুরু মহন্তদের ও পথে যাবার পরোক্ষ ভাবে মনের বনিয়াদ গঠন করে তো সংসারই। স্বভাব রুচি প্রকৃতির ভিত্তি ভূমি তাদের তো এই সংসার জীবনই। তাই শুদ্ধ মনা, পবিত্র হৃদয়সম্পন্ন মানুষেরই তো সংসারে থাকা উচিত। বিশেষ করে ভগবান যাদের সংসারে পাঠিয়ে স্বামী-স্ত্রী করেন, মাতা-পিতার আসনে বসান, তাদের তো ঘর সংসার ছেড়ে স্বার্থপরের মত আত্মমুক্তির জন্য সাধুর জীবনে যাওয়া উচিত নয়। যেতে হলে তাদের সংসার ব্রত গ্রহণের আগেই যাওয়া উচিত।

সত্যি এসব যুক্তির প্রশ্ন, বিচারের প্রশ্ন, হৃদয় দিয়ে এসব অনুধাবন বা অনুভব করার প্রশ্ন। কিন্তু এমন প্রশ্ন অদ্যাবধি সাধুবাবাকে কেও কখনও করেনি, বলেনি তাকে কেও কোনদিন এমন ভাবেও। এ মেয়ে তো মেয়ে নয়—এ যেন সাক্ষাৎ জ্ঞান স্বরূপিনী সরস্বতী। হাবুর মায়ের মত ভাবে গদগদ হয়ে বোকার মত সে যা বলে যাবে তাই শুনে যাবার পাত্রী নয়। নয় মেয়ে পাঁচার-বৌ এর মত আঁচলের খুঁটে ভক্তিভরে ফুল-বেলপাতা বাঁধার। কালু গোয়ালার কন্যার মত নয় এ কন্যা সংস্কারান্ধ যে আশ্রমের ধূলো মাথায় নিয়ে তৃপ্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যাবে। এ কন্যা যুক্তির বন্যা, জ্ঞানের কনা। তাই জ্ঞান দিয়ে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে হবে তাকে।

সুতরাং চলল আলোচনা। উঠল জ্ঞান-যুক্তির তর্ক-বিতর্কের ঝড়। যেমন প্রশ্নকর্তা তেমনি উত্তর-দাতা। যেমন শ্রোতা তার তেমনি বক্তা। ওজনে উনিশ বিশ। ভারে কেও কারো চেয়ে কোন অংশই কম নয়। এসব আলোচনায় গরম খলার ভাজা খৈ-এর মত ছিটকে পড়ল কালুর বিটি ও হাবুর মায়ের দল। ওসব বড় বড় কথার তারা কি বুঝবে? তাই তারা কেও গাই দুইতে হবে বলে, কেও মুড়ির চাল করতে হবে বলে আশ্রম ছেড়ে ধরল তারা বাড়ীর পথ। শিবানী রইল একা।

এই একাটাই চাইছিল শিবণী। যুক্তি তর্ক আলোচনায় অনেকটা সহজ হয়েছিল সে। সাধুবাবার ভাব গাম্ভীর্য্যও অনেকটা গেছল কেটে। তাই সুযোগ পেয়ে শিবানী বলে উঠল তাকে,—সংসারেও তো আপনি সাধু সংসারী ছিলেন বাবা। ছিলেন মানবিকতার যে আদর্শ নিয়ে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ হয়ে তা সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনেও সম্ভব নয় বাবা। সংসার জীবনে রাজা জনকের মত আপনিও তো সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে পারতেন বাবা।

সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কথাটা অবশ্য ঠিক। তাই তো জনকের সম্বন্ধে বলা হয়—"জনক রাজা ভীষণ খাঁটি, এধার-ওধার বজায় রেখে খেয়েছিলেন দুধের বাটি।" অর্থাৎ রাজা জনক, রাজ-রাজত্ব তথা নিজ সংসার-পরিবারের মধ্যে থেকেও সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। মেয়েটার কথাটাই ঠিক। সত্যিই তো, আসল হল মানুষের মন। মনকে খাঁটি রাখতে পারলে অর্থাৎ লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত রাখতে পারলে, পারলে সকলের মাঝে ঈশ্বর আছেন মনে করে সকলের প্রতি যথাযথ কর্ত্তব্য ঈশ্বর সাধনা বলে পালন করতে তথা জগৎ জীবনের সমস্ত কর্ম ও করনীয় ভগবানের পূজা ও অর্চনা বলে ন্যায়-শুদ্ধ-পবিত্র মনে নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে তবে সংসারের মধ্যেও সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে পারা যায়। এবং সেটাই নাকি তার পক্ষে থাকা উচিত ছিল।

কথাগুলো ভীষ্মদের বাবুকে সত্যিই ভাবিয়ে তুলল। এ মেয়ে যেন তার ভুল ভাঙ্গছে বলে মনে হল ভীষ্মদের বাবুর। এ যেন সামনে তার জ্ঞান-দীপিকা। সত্যিই তো ভগবানেই এ সংসারে কাকেও পিতা করেছেন, কাকেও মাতা করেছেন। কাকেও বসিয়েছেন সাধুর আসনে, কাকেও বসিয়েছেন সংসারীর সিংহাসনে। কাকেও করেছেন যোগী, কারেও করেছেন ভোগী। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কেও কিছু হতে পারে না, তাঁর ইঙ্গিত ছাড়া কেও কিছু করতে পারে না। মানুষের উচিত যাকে তিনি যে আসনে বসিয়েছেন—সেই আসনে বসে তাকে তার যথা কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাওয়া। মনের উপর জোর খাটিয়ে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে রাগ-দুঃখ-অপমানে, ঝোঁকের মাথায় বা রোকের বশে ভগবানের দেওয়া স্বভাব-অধিষ্ঠিত আসন ছেড়ে নিজের জীবনকে অন্য খাতে বহানো তাঁর অনুচিত ও অন্যায়।

অদ্ভুত কথা। আশ্চর্য্যের কথা। এ কথা বলছে কে? শুনছেই বা কে? বক্তা-শ্রোতা হয়ে গেল যেন অভিন্ন। এ যে একের মনের সঙ্গে হচ্ছে যেন অপরের মনের কথা। মনের সঙ্গে মন যখন এক হয়ে যায় তখন বোধ হয় বক্তা-শ্রোতার কোন পার্থক্য থাকে না। তাই মনে হল মেয়েটার মুখে ভীষ্মদেব বাবুই যেন বক্তা হয়ে বলছেন এবং শ্রোতা হয়ে তিনিই যেন শুনছেন। বলছেন শুনছেন অন্য কারো কথা নয়—তার নিজের মনের গোপন গহন কথা। সে কথার নেশায় এমন হয়ে গেল উভয়েই বুঁদ যে কখন গড়িয়ে গেল সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে সরিয়ে, কখন এল যে রাত, এবং সে রাত হল যে কতটা—কারো কোন খেয়ালই রইল না। অবাক করা মেয়েটার মুখটার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের স্বরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে উঠলেন সাধু ভীষ্মদেব বাবু,—আচ্ছা মা, তোমার মামা বাড়ী তো এই পাশের গ্রাম বল্লভপুর শুনলাম কিন্তু তোমার আসল বাড়ী অর্থাৎ নিজের বাড়ী বা শ্বশুর বাড়ীটি কোথায়? তোমার শ্বশুর, স্বামীর নামই বা কি মা?

ঠিক এই প্রশ্নটিই চাইছিল শিবানী। চাইছিল তার শ্বশুর এই সাধুবাবা নিজের মুখে জিজ্ঞেস করুন তাকে এই সব কথা। সত্যি বলতে কি এই সব কথা বলবার জন্যই তো তার এই সাধুর ডাঙ্গার সন্ধ্যা-প্রদীপ দিতে আসা। এবং তার দিনের পর দিন শবরীর মত প্রতীক্ষা করে থাকা। উত্তরে প্রথমে বলে উঠল শিবানী—স্বামী-শ্বশুর পরম পূজনীয় গুরুজন। তাঁদের নাম উচ্চারণ করলে কোন পাপ হবে না তো বাবা?

শুনে কথাটা অত্যন্ত তুষ্ট হলেন বাবা। সত্যিই, আধুনিকা, শহুরে মেয়েরাও যে এমন সুন্দর আচরণ শীলা, স্বামী-শ্বশুর গুরুজনদের প্রতি এমন শ্রদ্ধাতুরা ও ভক্তি পরায়ণা হয় তা ছিল সাধুবাবার যেন কল্পনারও বাইরে। প্রসন্ন চিত্তে আশীর্বাদ করে তাকে বলে উঠলেন তিনি,-তোমার মত সতী-লক্ষ্মী মেয়েকে কোনদিন কোন পাপ স্পর্শ করতে পারবে না মা। স্বামী-শ্বশুরের নামটা বলতে পারলে হয়ত চিনলেও চিনতে পারি আমি। সাধু-গুরু জিজ্ঞেস করলে তাদের কথার উত্তরে গুরুজনদের নাম বললে কোন পাপ হয় না মা। আমি বলছি, বল তুমি।

"—বেশ তবে কোন অপরাধ নিবেন না বাবা। অভয় পেয়ে আপনার, অনুমতি নিয়ে আপনার বলছি আমি আমার স্বামী-শ্বশুরের নাম ও ধাম।" বলেই শিবানী মাথায় ঠেকিয়ে হাত উঠল বলে পরম শ্রদ্ধায়,—আমার শ্বশুর হলেন বীরভূম জেলার হুক্‌নোপুর গ্রামের শ্রীভীষ্মদেব সিংহ আর আমার স্বামী হলেন তাঁর একমাত্র সন্তান শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহ।

যেন চমকে উঠলেন বাবা। সেই চমকের সূত্র ধরে শিবানী প্রায় ধারাবাহিক ভাবে লাগল যেতে বলে তার ফেলে আসা জীবনের ইতিহাস ও ছেড়ে আসা সংসারের কথা। ভীষ্মদেব-সাধুকে যে এই সাধুর ডাঙ্গায় ভীষ্মদেব বাবুর কথা শুনাতে আসবে তারই পুত্রবধূ, কুল-লক্ষ্মী—এ কথা ছিল তার স্বপ্নেরও অগোচরে। শুনে উঠল

তার মনের মাঝে যেন ভীষণ একটা ঝড়। হৃদয়টা করতে লাগল উথাল পাথাল। এই তার ছেলের বৌ শিবানী। শেখর তাহলে মুক্তো চিনতে ভুল করেনি। আসল হীরে চিনতে ভুল করেছিল সে নিজে। ভুল করে সে ভীল রমনীর মত এ মহামূল্যবান মুক্তোটিকে বিষ-ফল মনে করে ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল সে সংসার রূপ বেনুবনের মধ্যে। মা লক্ষ্মীকে সে করে এসেছিল অপমান। সকলের অনাদর, অবহেলার, ঘৃণার পাত্রী। ছিঃ! ধিক তাকে।

সেই কুল-লক্ষ্মী তার ঘৃণা অপমান মাথায় করে ঘুরছে এধার ওধার। ভিখারিনীর মত, তারই খোঁজে। তাকে ফেলে আসার পর সেও বেরিয়ে এসেছে তার সংসার ছেড়ে। মনে নিয়ে ধনুক-ভাঙ্গা পণ যত দিন না সে তার শ্বশুরকে খুঁজে পাবে, ফিরিয়ে আনতে না পারবে তার সংসারে ততদিন আর এ সংসারে পা দেবে না সে। যে সংসারে তার জন্য তার শ্বশুর হয় ঘর ছাড়া, শাশুড়ী হয় স্বামী হারা, পুত্র হয় পিতৃপরিত্যক্ত, সে সংসারে থাকবে সে কোন মুখটা নিয়ে? তাই শ্বশুর-সন্ধানে বেরিয়েছে তার কুলবধূ। বিয়ের পর সংসারের সুখ, সাধ-আহ্লাদ, স্বামীর সোহাগ সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে। কে তাহলে আসল সন্ন্যাসী? প্রকৃত সাধু তাহলে কে? ভীষ্মদেবের চেয়ে এ ত্যাগ-তিতিক্ষায় ধর্মে-আদর্শে নয় কি বড় তার এই শেখরের বৌ, তার কুলবধূ? এ কুল-বধূ তার আরও মহত্বের পরিচয় দিয়েছে এখানে এসে। চিনেও তাকে, জেনেও তাকে করে গেছে সে সংযম রক্ষা। সকলের মাঝে হট্ করে তার পরিচয়টা দিয়ে করেনি সে তাকে বিব্রত। অপরের কাছে ফেলেনি সে তাকে অসুবিধায়। দিনের পর দিন থেকেছে সে শুধু শবরীর প্রতীক্ষায়। থেকেছে তাকিয়ে আশা-ভরা চোখে তার মুখটার দিকে। প্রতিদিন সে নিরাশ হয়ে বরং ফিরে গেছে আশ্রম থেকে তবু মুখে ফুটে কিছু বলেনি। এ লক্ষ্মী তার জন্য সহেছে অনেক ব্যথা, করছে অনেক কষ্ট। আর তার মনে দুঃখ দেওয়া উচিত নয় তার। আবেগ জড়িত কণ্ঠে তাই বলে উঠল সাধুবাবা, —"আমার জন্য তোকে তাহলে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে মা। এবার তোর জন্য আমাকে কি করতে হবে বল?

—আমার একটা মনের বহুদিনের ইচ্ছা আপনাকে পূরণ করতে হবে বাবা।

—কি ইচ্ছা মা?

—ছোটবেলায় বাপকে হারিয়েছি বলে বাপের কোন সেবা করতে পারিনি আমি। এখন যখন ভগবান আমাকে সেই বাপ জুটিয়ে দিয়েছেন তখন আপনার সেবা করতে চাই আমি। এ অভাগীকে সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে আর দুর্ভাগ্যের মধ্যে ফেলবেন না বাবা।

সাধুবাবা নিশ্চুপ থেকে কি যেন ভাবতে লাগলেন। শিবানী করে উঠল তাকে আর একটা অনুরোধ,—এ মেয়ের আপনার আর একটা আবদার রাখতে হবে বাবা। স্বামী-শাশুড়ীকে বড় মুখ করে বড় আশা দিয়ে তাদের আমি ঘর থেকে আপনার খোঁজে বেরিয়ে এসেছি বাবা। ঈশ্বর যখন কৃপা করে আপনাকে পাওইয়ে দিয়ে আমার সে মুখ রেখেছেন তখন দয়া করে আপনাকে তাদের কাছে ফিরে যেতে হবে বাবা।

"—কিন্তু মা, তা কি করে সম্ভব?" বলে উঠলেন সাধুবাবা,—সংসার ত্যাগ করে সাধু হয়ে আছি যখন তখন আর কি করে সংসারে আমি ফিরে যাব মা? তাছাড়া তোরও তো মা উচিত নয়, এ ছেলেকে তার সাধনপথ থেকে বিচ্যুত করে আবার সংসার টেনে নিয়ে যাওয়া।

"—কিন্তু আপনিই তো বাবা কথা দিয়েছিলেন।" বলে উঠল শিবানী, —ছেলে যদি আপনার সেই বন্ধু কমল বাবুর বাগদত্তা মেয়ে অভয়াকে তার স্ত্রী বলে গ্রহণ করে তাহলে আপনি ফিরে যাবেন সংসারে।

—কিন্তু তা কি করে হয়?

"—কেন হয় না বাবা?" বলে উঠল শিবানী,—রাম যদি আপনার পিতৃসত্য পালন করতে না পারে কিন্তু তার স্ত্রী সীতা যদি তার স্বামীর পিতৃসত্য পালনের জন্য বদ্ধপরিকর হয় তবে কি আপনি তাকে সাহায্য করবেন না বাবা। করবেন না তার স্বামীকে আপনার সে সত্য পালনের জন্য আশীর্বাদ।

—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি মা।

—আমি আপনার সত্যরক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছি বাবা। করেছি প্রতীজ্ঞা। আপনার প্রতীজ্ঞা জীবনে বাস্তবায়িত করবার জন্য। এ পথে আমি অগ্রসর হয়েছি অনেকটা। অভয়া শেখরদাকে ও শেখরদা অভয়াকে পরস্পর

বিয়ে করার জন্য রাজি করিয়েছি। এ ব্যাপারে আমার শাশুড়ী ও অভয়ার মাকেও করিয়েছি সম্মত। অভয়ার মায়ের শুধু একটি মাত্র ইচ্ছা আপনি দাঁড়িয়ে থেকে তার মেয়ের বিয়ে দিবেন এবং বিয়ের পর তার মেয়ে-জামাইকে নিজে আশীর্বাদ করে আসবেন। আপনার উপস্থিতিতে এ বিয়ে হলে শুধু আমার স্বামী, শাশুড়ী ও অভয়ার মায়েরই নয়—গ্রাম-সমাজের কারো কোন আপত্তি থাকবে না বরং প্রাণ-ভরা সমর্থন থাকবে। আমি সেই আশা নিয়েই আপনার খোঁজে বেরিয়েছি বাবা। পেয়েছি যখন দেখা আপনার তখন এ ইচ্ছাটা আমার পূরণ করে দিয়ে আসতেই হবে বাবা।

"—কিন্তু এযে অন্যায় মা।" বলে উঠলেন ভীষ্মদেব সাধু,—"তুমি থাকতে শেখরের তো আর বিয়ে করা উচিত নয়। এ অন্যায় আমি সমর্থন করব কি করে?

—কিন্তু এ বিয়ে যে আমি দেব বাবা। দেব, তার স্ত্রী হয়ে। এতে শেখরদার যেমন কোন দোষ নেই, অপরেরও তেমনি কোন কিছু বলার নেই। শুধু সাক্ষী স্বরূপ থাকবেন আপনি। এ সাধ জীবনে আমার পূরণ করতে দেন বাবা।

বাবা যেন মূক এবং বধির হয়ে রইলেন দাঁড়িয়ে। বলতে লাগল শিবানীই তাকে,—সরস্বতী যদি লক্ষ্মীকে নিয়ে নারায়ণের সঙ্গে সুখে থাকতে চায় তাহলে তো বাবা মহাদেবের এতে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয় বাবা। আমরা দু-বোন শেখরদা রূপ একটা বোঁটাতেই দুটো ফুল হয়ে ফুটে থাকতে চাই বাবা। এ আশায় আমাদের বাধা দেবেন না আপনি।

"—শোন মা", শান্তস্বরে, নম্রভাবে বলতে লাগলেন ভীষ্মদেব সাধু—জীবনে জেদের বশে চলে আমি অনেক কিছু নষ্ট করেছি। হারিয়ে এসেছি তোমার মত রত্নকে। আমার জেদের বলি হয়ে তুমি তোমার জীবনটা নষ্ট করতে যেও না মা। প্রতীজ্ঞা রক্ষার অহঙ্কারের ঘোর আমার কেটে গেছে মা। সংসার, কুরুক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলা বড় কঠিন। এভাবে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা উচিত নয়। তুমি বাড়ী ফিরে যাও মা। অভয়াকে ছেড়ে দাও তুমি তার ভবিতব্যের হাতে। ঈশ্বর যখন তোমার সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন শেখরকে তখন তার সঙ্গে সুখে তুমি ঘর-কন্না কর। সংসার জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠা কর। আমার আশীর্বাদ রইল তোমাদের উপর। নিশ্চিন্ত রইলাম আমি তোমার মত একজন লক্ষ্মী সংসারে থাকায়।

"—না বাবা, আমি আর যাব না ফিরে।" অভিমেনে স্বরে বলে উঠল শিবানী,—কোন্ মুখটা নিয়ে ফিরে গিয়ে দাঁড়াব আমি সংসারে? আশা নিয়ে থাকবেন অভয়ার মা, চোখের জল নিয়ে থাকবে অভয়া, মা থাকবেন হা-হুতাশ নিয়ে আর তার মাঝে আমি স্বার্থপরের মত শেখরদার সঙ্গে সুখে ঘরকন্না করব? না বাবা আমার দ্বারা তা কখনও হবে না। বাপ যদি ভীষ্ম প্রতীজ্ঞ হয় তবে কন্যাও তার বাপের মত ভীষ্ম প্রতীজ্ঞা নিয়েই থাকবে। হারানো চাঁদকে খুঁজে পেয়েও আমি যদি তাকে তার আকাশে উঠাতে না পারি তবে এ পাওয়ার আমার কি সার্থকতা? আর এক জীবনেরও বা আমার কি মূল্য?

শুনতে শুনতে হঠাৎ উঠলেন বাবা। বার দরজায় কে যেন এপাশ থেকে ও পাশে হট্ করে গেল সরে। বিদ্যুৎ গতিতে। ওমনি উঠেই বাবা "কে কে" বলে গেলেন দরজার বাইরে।

মানুষ নিশ্চয়ই। কিন্তু লোকটা যে কে সেটা আর ঠাওর করতে পারলেন না তিনি। দুপ-দুপিয়ে পা ফেলে দ্রুতগতিতে সে অদূরে নদীর পাড়টার দিকে হয়ে গেল অদৃশ্য। নিশ্চয়ই আড়িপেতে কেও শুনছিল তাদের কথা। যাক গে—। রাত হয়েছে অনেকটাই। মেয়েটার আর একলা থাকা এখানে সমীচীন নয়। বল্লভপুরে মামা বাড়ীতে তার পৌঁছে দিয়ে আসাই উচিত। ভেবে তাই আশ্রম ঘরের কোনায় রাখা ত্রিশূলটা নিয়ে পড়লেন তিনি বেরিয়ে। শিবানীও যেন চেয়েছিল এটাই। মামা-মামীর কাছে বাবা যদি স্বয়ং তাকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয় তবে পরিচয়টা তার তাদের কাছে পাকা হয়ে যায়।

কিন্তু বাবা যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। শিবনীও তার সঙ্গে তাই পারল না আর কোন কথা বলতে। আশ্রম থেকে নদী পর্য্যন্ত ডাঙ্গার পথটা চুপচাপই এলেন বাবা। নদীর বুকে কয়েক পা এগিয়ে এসেই ভঙ্গ করলেন তিনি গাম্ভীর্যতা। বলে উঠলেন তাকে,—" তোমার আমার এসব কথা বলনা কিন্তু কাকেও। আমাদের এ সম্পর্কটা আপাততঃ গোপন রাখাই ভাল। বদ্যিবাবা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধ আমাদের এখানের

কারোও কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়। মুস্কিল হতে পারে। সব কথা জানিয়ে বাবাকে এ অবস্থায় আমার করনীয় কি তা নির্ধারেণ করা যাবে।

"—আপনার কথার আমি অবাধ্য হব না বাবা।" বলে উঠল শিবানী "—কিন্তু জেনে রাখবেন আপনি আমার কথা না শুনলে কিন্তু হাতে পেয়েও আপনাকে হারানোর এই ব্যর্থ জীবন আমি আর রাখব না। আত্মহত্যা—"

কথাটা আর তাকে সম্পূর্ণ করতে দিলেন না সাধুবাবা। পিছন ঘুরে ওমনি নিজের হাতে মুখটা তার চেপে ধরে মুখের কথা মুখেই দিলেন রেখে তার,—"ছিঃ মা, নদীর বুকে, শ্মশান মাঝে মৃত্যুর কথা বলতে নেই। নদী-শ্মশান তাহলে অকালেই টেনে নেয় তাকে তার বুকে। তাছাড়া আত্মহত্যার কথা মুখে উচ্চারণ করাও মহাপাপ মা। সেখানে সংসারে থাকার তোমার অন্তরের জ্বালা আমি সব বুঝতে পারছি। আমার জন্য সহ্য করতে হচ্ছে তোমাকে অনেক কিছুই। কিন্তু মরতে তোমাকে আমি কিছুতেই দেব না। সংসারে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করে তোমার সব কষ্টের সমাধান আমি করবই করব।

"বাঃ। বাঃ। সাধুবাবা। বাঃ।" হঠাৎ তিনটে হাত তালির সঙ্গে তিনটা স্বর কানে আসতে চমকে উঠলেন ভীষ্মদেব সাধু! সঙ্গে সঙ্গে আঁৎকে উঠল শিবানীও। গেল দেখা তাদের পিছন পাশের বালিয়াড়িটার উপর দাঁড়িয়ে আছে মূর্ত্তিমান রসিক নাগর চৌধুরী, শ্রীমান বৈদ্যনাথ চৌধুরীর কুলাঙ্গার মধ্যম পুত্র। পাশের নদীর উপর পাড়ের পাকুড় গাছটার তলাটায় যে তার ডেরা জানতেন সাধুবাবা। কিন্তু এত রাত পর্য্যন্ত থাকবে যে তার আড্ডা খানায় এ নদীর মাঝে ধারনা করতে পারেন নি। আবছা চাঁদের আলতো আলোয় দেখা গেল সে শুধু একা নয়। ধার পাশে তার আরও দু-চারজন ষণ্ডা-গুণ্ডা মার্কা, শাকরেদ। ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসেছিল মনে হয় তারা পিছন পাশের বামদিকের বালিয়াড়িটার আড়ালে। ভাবনার ভারে আসছিল শিবানী। শিবানীর স্মরণ করিয়ে দেওয়া জীবন-স্মৃতির চাপে সাধু বাবারও মনটা ছিল বোধ হয় আনমনা। তাই এত কাছাকাছি হতেও লক্ষ্য হয়নি তাদের। কিন্তু এভাবে তাকে ঘিরে আসার উদ্দেশ্যটা কি?

থমকে দাঁড়াতেই সাধুবাবা তার দিকে শ্যেন-দৃষ্টি ফেলে বলে উঠল রসিক নাগর,—"তাহলে সাধুবাবা, তুমিও ডুবে ডুবে জল খাও? আর শালা আমি ঠারে ঠোরে দু-এক ঢোক খেতে গেলেই ওমনি ফোঁশ করে উঠ। গ্রামে গিয়ে ষোল-আনা ডেকে বিচার করতে যাও আমার। তাই তো ভাবি এত এত মেয়ে কি রস পেয়ে তোমার পিছনে পিছনে ঘুর ঘুর করে। এই মেয়েটাই বা হব-রোজ সন্ধ্যায় সেজেগুজে তোমার কাছে আসে কেন? তা বাবা বুড়ো-কেষ্ট হয়ে তুমি যদি গোপনে রাসলীলা কর তবে এই ধেঁড়ে- কেষ্টের বেলায় সে লীলাতে এমন দোষ ধরতে যাও কেন? এক গোয়ালের এঁড়ে যখন আমরা তখন গাভীতো আমাদের চাই-ই চাই। নইলে চলবে কেন? তাইনা—সাধু বাবা?

"—লজ্জা করছে না তোমার," ধমকে উঠলেন সাধুবাবা,—" বাপের বয়সী আমার সামনে এভাবে অশালীন কথা বলতে? অশ্লীল উক্তিগুলো করতে একটু মুখে বাঁধছে না তোমার? এমন অধঃপাতে গেছো তুমি।

"—খবরদার বলছি," বেশ ভারিক্কি গলায় বলে উঠল রসিক চৌধুরী—"চোখ আর রাঙ্গিয়ো না তুমি আমাকে। মুখোশ তোমার খুলে গেছে। আমার বন্ধু লাল মোহন গোপনে তোমার ঝুপড়িতে গিয়ে দরজার আড়ালে থেকে আড়ি পেতে সব তোমাদের ফষ্টি-নষ্টি দেখে এসেছে। কি গো রসবতী কন্যে, বলনি তুমি তোমার এই পেয়ারের রসকদম্ব বুড়ো নাগরটিকে 'আকাশের চাঁদ', হারানিধি, হাতে পেয়েছ যখন তখন স্বামী শাশুড়ীর কাছে আর মুখ দেখাতে ফিরে যাবে না, 'একে ছাড়া আর থাকতে পারবে না'—ইত্যাদি সব প্রেম-পীরিতের কথাগুলো?

"—লজ্জা করে না আপনার।" যেন গর্জে উঠল শিবানী—"বাপ-মেয়ের সম্বন্ধে এমন অসভ্য নোংরা কথা বলতে জিবটা আপনার খসে পড়ছে না?"

"—আঃ। চটছো কেন মাইরে?" বলে উঠল রসিক চৌধুরী,—"অন্য কিছু তো বলছি না তোমাকে। কেবল বলতে চাইছি আমাদের মত এমন কাঁচা কার্ত্তিক ছেড়ে দিয়ে ওর মত এমন রস চিমড়ে শুকনো

কার্ত্তিকটির দিকে ঢলতে গেলে কেন? অবশ্য তোমার এতে কোন দোষ নেই কারণ অন্যান্য মেয়েদের মত বুড়ো মন্ত্র বলে তোমাকও বশ করে নিয়েছে। ও শালা বশীকরণ জানে।

"—পথ ছাড়।" গম্ভীর হয়ে বলে উঠল সাধু,—নইলে কিন্তু আমি চিৎকার করে আশ-পাশ গ্রামের লোককে সব ডাকব।"

"—আরে এটাই তো আমি চাই।" বলে উঠল রসিক,—"লোকজন সব আসুক। তোমাদের যুগল-জুটিকে ঘিরে দাঁড়াক। দেখুক সবাই দুচোখ মেলে। এমন সুন্দরী একটা তরতাজা তরুণীকে ভুলিয়ে ফুসলিয়ে আশ্রমে এনে এত রাত পর্য্যন্ত লুকিয়ে কেমন লপটা-লপটি করছিলে দেখে যাক সবাই। মেয়েদের দিয়ে মোজ উড়াবার চনমনে মনটাকে তোমার বুঝে যাক। তুমিই বল, এমন সুন্দর প্রমাণ হাতে নাতে না পেলে সাধুকে সবাই বিশ্বাস করবে কেন?

ছি ঃ ছি ঃ। কি যে বলবেন সাধুবাবা খুঁজে পেলেন না। লজ্জায়, রাগে, ক্ষোভে, অপমানে ভিতরটা তার কাঁপতে লাগল। সাধু সত্তায় চাপা থাকা ক্ষত্রিয়ের তেজটা যেন তার অগ্ন্যুৎপাতের মত ফেটে উঠে জ্বলন্ত লাভায় তাকে জ্বালিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু ভিতরের তার সেই মদ-মত্ত মাতঙ্গটাকে বিবেক শৃঙ্খলে কে যেন বেঁধে রেখে বলতে লাগল তাকে বীতরাগ ভয়, ক্রোধঃ স্থিতধী হতে। লাগল বলতে,—ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহ ঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম ঃ।

স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ বিনশ্যতি।।

চুপ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে, সাধুবাবা ভয়ে ঘাবড়ে গেছে মনে করে মস্তানি কায়দায় রসিক লাল এগিয়ে এল বাবার কাছে-মাথা ঝাঁকরে, হেলে দুলে। দাঁড়াল সামনে তার দু-পা ফাঁক করে কোমরে হাত দিয়ে। ঘাড় দুলিয়ে ভ্রুকুঁচকিয়ে উঠল বলে গলা খাঁকরে,—শোন মহারাজ, আমরা দুজনে যখন একই রসের রসিক তখন কেও কারো মধুপানে বাধা দেব না।এবং এ ব্যাপারে আমরা কেও কাকেও বিপদে ফেলব না। তবে একটি শর্ত, যে ফুলের মধু তুমি খাবে সে ফুলের মধু আমাকেও খেতে দিতে হবে। কি, রাজি?

বাবা চুপ। মৌনেন সম্মতি লক্ষণ মনে করে রসিকলাল উঠল বলে,—তবে এই মালটা দিয়েই শুরু হোক আমাদের বন্ধুত্ব। মাইরি বলছি সাধুবাবা, মালটি তুমি ভালই চয়েস করেছ। মনে লেগেছে আমারও। বেশ লাভ-লোভে মুখ—

"—ডাব ডুবে বুক।" সুরে সুর মিলিয়ে তার বলে উঠল অপর একজন শাকরেদ। অন্যান্যরাও একে একে যোগ দিল তার সঙ্গে— "ফুলকো লুচির মত গাল", "ফুলো পাছার চাল."। ধেউ খেলানো চুল," ফুটন্ত যেন ফুল" ইত্যাদি বলে। জের টেনে তাদের কথায় বলে উঠল রসিক চাঁদ—"তবেই বুঝুন, এক বাক্যে সবাই আমরা তারিফ করছি তোমার মালটির। সুন্দরী যখন ভোগে লেগেই গেছে তোমার তখন ভক্ত শিষ্য হয়ে প্রভুর আমাকে তো প্রসাদ পেতেই হবে।

—আর আমরা গুরু? প্রায় সমস্বরে বলে উঠল তার সঙ্গী-সাথীরা।

"—সাধু-সন্তের প্রসাদ একলা যখন খেতে নেই তখন তোরাও নিশ্চয়ই তার ভাগ পাবি। তবে আমার পরে।" বলে উঠল রসিক চাঁদ— তাহলে সাধুবাবা, এবার ছাড়ুন আপনার এঁঠো মালটিকে —আমার ভোগে লাগাই।

এ কাম-পিপাসু নারী লোভী হিংস্র পশুটার হাত থেকে গৃহ-বধুকে তার রক্ষা করতে হলে একমাত্র উপায় বলপ্রয়োগ করা। বৈদ্যিবাবা তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন—সকলের মধ্যে ভগবান আছেন ঠিকই। কিন্তু যে ভগবান যখন যে রূপে যে ভাবে পূজো নিতে আসেন তখন তাকে সে রূপে সেই ভাবেই পূজো দিতে হয়। তাই বাঁনর ভগবানকে বাঁদরামির পূজো দিয়ে হয় বাড়ি। তেড়ে আসা কুকুর ভগবানের পূজো হল মুগুর আর ক্ষেপা শেয়াল ঠাকুরের পূজো হল লাঠি। নইলে সেবা অপরাধ হয়। সুতরাং ইজ্জত নষ্ট করতে আসা মেয়ে-মাংস-লোভী লম্পট নর-পশুদের ত্রিশূলের খোঁচাই হল উপযুক্ত পূজা। তাই রুদ্রমূর্ত্তিতে হাতের সেই ধারাল ত্রিফলা অস্ত্রটাকে তুলে ধরে ভীষ্মদেব-সাধু উঠলেন গর্জে—"আর এক পা যদি অগ্রসর হয়েছ আমার মায়ের দিকে তবে সবকটাকে এই ত্রিশূলের খোঁচায় আমি কিন্তু টুকরো টুকরো করে দেব।"

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উঠল রসিক চাঁদ। বলে উঠল শাকরেদদের দিকে মুখ ফিরিয়ে—পাঁকে পড়লে হাতী মশাকেও বাবা বলে জানি কিন্তু এযে আবার তার মাগকে মা বলছে রে। অভিনয়ে নামিয়ে দিলে সাধুবাবা তাহলে ভালই পাট করতে পারবে বল। কিন্তু সোজা আঙ্গুলে যখন ঘি উঠবে না তখন তো শালাকে একটু পাট করে দিতে হবে। যা, তোরা একটু বাবাকে দলাই-মলাই কর। আমি ততক্ষণ মেয়েটাকে একটু চেকে দেখি।

কিন্তু মেয়েটার দিকে হাত বাড়াতেই রসিক লাল, সাধুবাবা উঁচাল তার ত্রিশূলটা। ওমনি পিছন থেকে তার কোন এক বিশ্বাসঘাতক শাকরেদ আচমকা এমন মারল লাঠির বাড়ি যে ত্রিশূলটা সাধুর ছিটকে পড়ল হাত থেকে। "বেইমান, কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক", বলেই সাধুবাবা রুখে যেতেই ওমনি আর একজন শাকরেদ লাঠির ঘায়ে দিল তাকে ধরাশায়ী করে।

ওধারে বাবার হাত থেকে পড়া ত্রিশূলটা চট্-জলদি শিবানী তুলে নিয়ে ধরল সে এক মহিষাসুর মর্দ্দিনী মূর্ত্তি। রুদ্রানী রূপে সে উগ্রচণ্ডা ভৈরবীর মত বাগিয়ে ধরল ত্রিশূল রসিক লালের দিকে—ভাল চান তো চলে যান বলছি। নইলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে এ ত্রিশূলের খোঁচায়। যান বলছি নইলে কিন্তু খুন হবেন।

কিন্তু যাবে কি লম্পটটা কাঁকড়ির দাড়ার মত হাত দুটো বাড়িয়ে শিবানীকে আচমকা ধরবার জন্য ত্রিশূলের খোঁচার দূরত্ব রক্ষা করে ঘুরতে লাগল সে চারধার। শিবানীকে কেন্দ্র করে—চাঁই ঘুর ঘুর। শিবানী শক্ত করে ধরে ত্রিশূল তার দিকে লক্ষ্যটা স্থির রেখে ঘুরতে লাগল তার সামনে সামনে। ওধারে সাধুবাবার উপর বোধহয় পড়তে লাগল দুমা-দুম দুপা-দুপ লাঠির ঘা। পড়ে পড়েই বাবা চিৎকার করে বলতে লাগল শিবানীকে—আমার জন্য কোন চিন্তা নেই মা। আমি আমাকে নিজেই রক্ষা করতে পারব। তুই শুধু তোকে রক্ষা কর মা। আমার বংশের ইজ্জত, কুলের সম্ভ্রম তুই। বাপ-ঠাকুরদা তথা আমার পূর্ব-পুরুষদের মান-সম্মান সব আজ তোর উপর নির্ভরশীল মা। যেমন করেই হোক এই পাষণ্ডদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে তুই আমার কুল-গৌরব, বংশ মর্য্যাদা বাঁচা মা আমার।

চঞ্চল হয়ে উঠল শিবানী। দু-হাতে ত্রিশূলটা শক্ত করে ধরে বাঁই-বাঁই করে ঘুরাতে লাগল সে, তাব চারধার। ঘুরাতে ঘুরাতে হঠাৎ ত্রিশূলটা ছিটকে বেরিয়ে গেল তার হাত থেকে। পড়ল গিয়ে সেটা রসিক বাবুর উপর। রসিক বাবু হল চিৎপটা। সেই মুহূর্ত্তে শিবানী নদীর বিপরীত পাড়ের দিকে মেরে দিল ছুট। ছুট তো ছুট সে একেবারে বিদ্যুৎ গতিতে। দেখেই ওমনি উঠে দাঁড়িয়ে রসিক চিৎকার করে আদেশ দিল তার শাকরেদদের,—কবুতরীটা আমার হাত থেকে ফসকে ভেগে যাচ্ছে রে। সাধুর ব্যবস্থা আমি করছি। ছুটে গিয়ে তোরা ধরে আন চিড়িয়াটাকে। মাগীর ডানা দুটো ভেঙ্গে এমন দমন দেব যে ওর কলঙ্কও রাখতে কোথাও যেন জায়গা না থাকে। শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে নিজের স্বামীরও যেন অখাদ্য হয়ে থাকে সে। সাধুর খাতির ছেড়ে চট জলদি পাকড়াও কর মাগীকে।

ছুটল শম্ভু নিশম্ভুর দল। ওধারে শিবানীও প্রাণপনে তার বাড়িয়ে দিল বেগটা। পাঁচ-ছটা গুণ্ডা মস্তানের ছুট—মেয়ে হয়ে শিবানী পারবে কেন তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। তাছাড়া শহুরে মেয়ে গেঁয়ো পরিবেশে রাত্রেবেলায় নদীর বুকভরা বালির উপব ছুটেনি তো কোনদিন। তাই যত দ্রুতই দৌড়ুক না সে শাড়ির বাধায় ও বালির ভিতর পা ডুবে যাওয়া পারল না সে নদীর ওপারে উঠতে। মস্তানগুলো এসে ঘিরে ফেলল তাকে। কিন্তু ভগবানের রক্ষা—হঠাৎ একটা উপস্থিত বুদ্ধি এসে গেল তার মাথায়। আসতেই ওমনি মুঠোর পর মুঠো বালি নিয়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল সে বদমাশগুলোর চোখের দিকে। এলো পাথাড়ি।

কাজ হল। বালির ঝাপটায়, কানা হয়ে বেয়াদপগুলো এধার ওধার করতে লাগল। আর সেই ফাঁকে শিবানী নদীর উপর উঠে মেরে দিল ছুট। এ বোধহয় তার সেবারের সেই স্কুল জীবনের আটশ মিটার রাণে ফাষ্ট হওয়ার মত ছুটটা। বরং তার চেয়েও আরো অনেক—অনেক বেশী।

চলে গেল শিবানী। মুখের শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল রসিক বাবুর। অপদার্থ শাকরেদগুলো তার ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতেই যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। যত রাগ গিয়ে পড়ল বালির উপর পড়ে পড়ে গোঙ্গানো সাধুবাবার উপর। মাথার আর ঠিক রাখতে পারলেন না তিনি। ত্রিশূলের সেই ধারাল তিনটা ফলা দিয়ে এঁফোড়-ওঁফোড় করে দিতে লাগলেন তিনি বাবার নাড়ি-ভুঁড়ি গুলো। একবার নয়, আগুন

মুখো হয়ে বার বার তিনি খোঁচায় খোঁচায় ঝারা-বারা করে সাধুর পেটটা শেষ নিঃশ্বাসটুকু বের করে দিলেন তার। এভাবে আশ মিটিয়ে, গায়ের ঝালটা ঝেড়ে তবেই ক্ষান্ত হলেন রসিকবাবু।

ওধারে ছুটতে ছুটতে হাঁফাতে হাঁফাতে মামা-বাড়ীর পিছনের খিড়কি দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল শিবানী। ঢুকেই তো সে প্রায় আছড়ে পড়ল মেঝের উপর। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ার মত অবস্থা। মামা নির্ম্মল সিংহ চট-জলদি জল পাখা এনে করতে লাগলেন তার পরিচর্য্যা। কিছুক্ষণ পর প্রকৃতস্থ হল শিবানী। কিন্তু সুস্থ হতেই বলল সে যেসব কথা, বিবরণ দিল সে যেসব ঘটনার, পরিচয় দিল সে যেসব চৌধুরী বাবুদের ওই চণ্ডাল ছেলেটার কাণ্ড —তাতে দস্তুর মতো ঘাবড়ে গেলেন নির্ম্মল বাবু। পীলে গেল তার চমকে। ভয়ে মুখটা হয়ে গেল তার পাণ্ডুর, ফ্যাকাশে। শিবানী অবশ্য সাধুবাবার ব্যক্তিগত কোন পরিচয় দেয়নি তার মামাকে। তিনি-ই যে তার শ্বশুর, বীরভূমজেলার হুকনোপুর গ্রামের ভীষ্মদেব সিংহ —এসব কথা বলেনি তাকে। বলেনি কারণ সাধুবাবা নিষেধ করেছিলেন তাকে।

সব কথা শুনে শিবানীর ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন নির্ম্মলবাবু। সত্যিই ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেছেন। নইলে ভাগ্নীর তার ওই পাষন্ডগুলোর হাত থেকে জান-মান নিয়ে ফিরে আসা অসম্ভব ছিল। কিন্তু তার কথা থাক এখন। ব্যস্ত হয়ে উঠল শিবানী সাধুবাবার জন্য। যেরকম অবস্থায় ওই গুণ্ডাগুলোর মাঝে একলা ফেলে শ্বশুরকে তার পালিয়ে এসেছে শিবানী—এক্ষুনি মামা লোকজন নিয়ে সেখানে ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে না আনলে মনে হয় একেবারে মেরে ফেলবে তাকে তারা। কিন্তু শিবানীর কথায়, আকুলি-বিকুলিতে মামা তার এতটুকু বিচলিত হল না। দিব্যি নির্বিকার চিত্তে, নিরুদ্বেগভাবে বলে উঠল সে—সাধুর ডাঙ্গা আশ্রম চৌধুরী বাবুদেরই। তারাই সাধুকে আশ্রমে এনে বসিয়েছে। সুতরাং রক্ষক কখনও ভক্ষক হবে না। অতএব তার জন্য কোন চিন্তা নেই তার। চিন্তা নাকি শিবানীর জন্যই। কারণ ওই পাষাণ্ড রসিক চৌধুরীর একবার কোন মেয়ের দিকে নজর পড়লে সে তাকে সহজে ছাড়ে না। সুতরাং এখান থেকে শিবানীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়তে হবে।

—কেটে পড়তে হবে মানে?

মানে নাকি তাকে পালাতে হবে। কারণ মুখের শিকার একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে নাকি ওই হিংস্র নরপশুটা সাংঘাতিক রকমের একরোখা হয়ে উঠে। বাড়িয়েছে যখন সে শিবানীর ইজ্জতের দিকে হাত তখন লম্পটটা তার লালসাটা যেমন করেই হোক পূরণ করবেই করবে।

কিন্তু এত দুর্ব্বল তার মামা। এত ভীরু-কাপুরুষ তার পাড়া-প্রতিবেশী লোকজন। শিবানীর কথার উত্তরে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন নির্ম্মলবাবু এখানে কুমীরের সঙ্গে বাদ করে কেও জেলে বাস করার সাহস রাখবে না। যাবে না কেও উটকো বিপদ ডেকে আনতে অর্থাৎ খাল কেটে ঘরে কুমীর আনতে। তাছাড়া যে-ই প্রতিবাদ করতে যাবে তারই উপর এই মূর্ত্তিমান নর-রাক্ষসটা কখন যে তার সাঙ্গ-পাঙ্গ গুণ্ডাবদমাশদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার কোন ঠিক নেই। প্রকাশ্যে না পারলে নাকি চোরাগুপ্তা পথেও তারা নানা ভাবে ক্ষতি করতে এমনকি রাত্রেবেলায় ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হবে না সে। সুতরাং মামাকে তার আক্রোশের আগুন থেকে রক্ষা করতে এখুনিই, এই রাতেই শিবানীর মামার বাড়ী ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। কে জানে গুণ্ডাগুলো এই রাতেই তার ঘর চড়াও করবে কি না।

ভীরু মামার দুর্ব্বল কথাবার্তায় ভয় হল শিবানীর। পড়ল মনে লাঠির ঘায়ে নদীর বালির উপর সাধুবাবা অর্থাৎ তার শ্বশুরের পড়ে পড়ে আর্ত্ত স্বরে তাকে অনুরোধ করার দৃশ্যটা। কানের কাছে ঝাঁ ঝাঁ করে বাজতে লাগল বাবার সেই করুণ কাতর আকুলি বিকুল করা আকুতি,—"বংশের ইজ্জত, কুলের সম্ভ্রম তুই মা। আমার বাপ-ঠাকুরদা তথা পূর্ব-পুরুষদের মান-সম্ভ্রম সব আজ তোর উপর নির্ভরশীল মা। যেমন করেই হোক এই পাষণ্ডগুলোর হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে তুই আমার কুল গৌরব, বংশ মর্যাদা রক্ষা কর মা। কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচা আমার সংসারটাকে।"

বাঁচাতেই হবে তাকে, যেমন করেই হোক করতে হবে রক্ষা তাকে তার স্বামী-শ্বশুরের বংশের মান-মর্যদা, কুল গৌরব। না, আর, এক মুহূর্ত্তও নয়। হোক রাত। ছেড়ে যেতে হবেই তাকে মামা বাড়ী অর্থাৎ বল্লমপুর।

ভোর সাড়ে তিনটেয় ট্রেন। স্টেশন এখান থেকে প্রায় আট মাইল। আর কোন কিন্তু কোন দ্বিধা না করে শিবানী তার মামার নির্দ্দেশেই বাড়ীর মুনি দুজনকে সঙ্গে নিয়ে সেই মাঝরাতেই গোপনে লুকিয়ে রওনা হল স্টেশনের দিকে। অতি সন্তর্পনে, চুপিসাড়ে, চোরের মত।

আর এধারে সাধুবাবার লাশটা নিয়ে প্রথমটায় একটু চিন্তায় পড়ল বটে রসিক নাগর বাবু। কিন্তু সেই কথায় বলে না বেপরোয়ার বেমক্কা বুদ্ধি, আটপিটের আট—সেই হল তার। অর্থাৎ পরক্ষণেই বুদ্ধি গেল তার খুলে। নদীর বুকে যেখানটায় মরেছিল সাধু সেখানটাতেই বালি খুঁড়ে বেশ গভীর মত খাল করে পুঁতে দেওয়া হল তার মৃত দেহটাকে। তারপর আশ্রমে এসে তার সেই বৈদ্যিবাবার মন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদায়ীকৃত সমস্ত টাকা কড়ি হাতিয়ে নিয়ে আশ্রমের ঝুপড়িটাতে লাগিয়ে দেওয়া হল আগুন। পরদিন করে দেওয়া হল প্রচার যে মানুষ কে চিনতে পারে? সেই চোর বাটপাড় সাধুটা মন্দির করার সমস্ত টাকা বাগিয়ে নিয়ে আশ্রমটাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ভেগে গেছে। রাতারাতি দিয়েছে চম্পট। উধাও হয়ে গেছে সে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে—এ অঞ্চলের সবাইকার মাথায় ঘোল ঢেলে সকলকে বোকা বানিয়ে, ধোঁকা দিয়ে।

বাবুদের মুখের কথা—তাই মিথ্যেটাই সত্য বলে হয়ে গেল রাষ্ট্র। বৈদ্যনাথ চৌধুরীও নিজের মান বাঁচাতে, সম্মান রক্ষা করতে সায় দিল তার ছেলের কথায়। ব্যাস, কেল্লা ফতে। অবশ্য সাধুবাবার মৃত্যুর পর আর কোনদিন পা দেননি রসিকবাবু নদীর এপারে। তারপর কালেকালে সবই যেমন লয় পায় তেমনি লয় পেতে লাগল সাধুর ডাঙ্গার স্মৃতি। বছরের পর বছর ঝড় বৃষ্টি, বান-বাদল এসে সব কিছু করে দিতে লাগল লোপ। সেই লুপ্ত-ডাঙ্গায় তারপর বাবলা গাছ তাদের ষোল আনা আধিপত্য বিস্তার করে নামটাকেও মুছে দিয়ে করল সেটাকে বাবলা ডাঙ্গা।

(উনত্রিশ)

সতীর মুখে ঘূর্নিঝড় রূপী পুষ্করভূত ভীষ্মদেব সাধুর জীবন কথা শুনতে শুনতে যার পর নাই বিস্মিত হয়ে গেছল ভূতনাথ। হয়েছিল সে যেমনি স্তম্ভিত তেমনি অভিভূত। তবে একটা ব্যাপারে বড় খট্‌কা লাগতে লাগল ভূতনাথের মনে। ভূলোকের অধিবাসীরা ভূবর্লোকের, ভূবর্লোকের সত্তারা স্বঃলোকের অর্থাৎ এক স্তরের সত্তারা নাকি তদূর্ধ্ব স্তরের সত্তাদের সহজে দেখতে, তাদের কথা শুনতে বা তাদের সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে না। কিন্তু তৎ-নিম্নস্তরের সত্তাদের সে সহজে দেখতে শুনতে বা সেরকম ইচ্ছা করলে তাদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হতে বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। সে নিয়ম অনুসারে ভূবর্লোকের অধিবাসী এই সাধু-সত্তার তদুর্দ্ধলোকের অধিবাসী এই সতীর সূক্ষ্মাবয়ব দেখার বা তার কথা শোনার বা তাকে বুঝার ক্ষমতা না থাকতে পারে। কিন্তু তৎ নিম্ন ভূঃলোকের অধিবাসী অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ ভূতনাথ সম্বন্ধে তার তো সম্যক জানা বা বুঝা উচিত ছিল। কিন্তু না। দেখে শুনে মনে হতে লাগল ভূতনাথের সে সম্বন্ধে সে সম্যক অজ্ঞাত। ব্যাপার কি?

ব্যাপারটা তাকে বলল বুঝিয়ে সতী—এর কারণ দীর্ঘদিন সত্তাটাকে সাধু বৃক্ষসত্তায় আসীন করে রেখে বৃক্ষবৎ প্রায় জড়বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেছে তার সত্তাটাকে। তাই তার চৌহদ্দির বাইরে কোন কিছু জানা বা বুঝা তার সম্ভব হচ্ছে না। হচ্ছে না সম্ভব তার ফেলে আসা জীবনের ছেড়ে আসা সংসারের পুত্র-পরিবারকে স্মরণ করতে। একমাত্র মনে আছে তার সদ্য সমাপ্ত তার মানব জীবনটার মৃত্যুকালীন ঘটনা। সে ঘটনার স্মৃতি অর্থাৎ মৃত্যুপূর্বের তার দেহ যাতনা, মনোবেদনা, হৃদয়ের জ্বালা, যন্ত্রণা, অন্তর্দাহ, বৃক্ষের মত ঝোড়ো প্রকৃতির করে রেখেছে তার সত্তটাকে। সেই জন্যই তার এরূপ পরিণতি।

এ প্রকৃতি নাকি উত্তাল হয়ে উঠে মৃত্যুকালীন বার তিথি, যোগ-নক্ষত্রের আকর্ষণে। আকৃষ্ট হয় তখন আত্মাটা তার সেই মৃত্যুক্ষেত্রটাতে। শুধু নদীর বুকে পোঁতা থাকা জড় দেহটার টানেই সে নেমে আসে না। মৃত্যুক্ষেত্রের বায়ুমণ্ডলে মিশে আছে যে তার মৃত্যুকালীন জ্বালা যন্ত্রণার তড়িৎকণা। সে কণাসমূহ নাকি আকর্ষণ করে তাকে। যেখানে সঞ্চরণশীল তার ক্ষোভ-দুঃখ, মনো বেদনার অনুকনা আক্রোশ-অধীর করে তুলে তাকে। জাগিয়ে দেয় সত্তটায় তার প্রতিহিংসার আগুন ও প্রতিশোধ স্পৃহা। এই স্পৃহায় সেখানে সে তার

ওইসব সঞ্চরণ শীল তন্মাত্রবি অনুকণাকে অবলম্বন করে অবয়ব ধারনের চেষ্টা করে। কিন্তু বৃক্ষরূপে অভ্যস্ত হয়ে থাকা তার সত্তাটা মানবরূপে রূপায়িত হতে না পেরে ধরে সে নাকি ওমনি ঘূর্ণিঝড়রূপী মূর্ত্তি—বায়ুরূপী কায়াব্যূহ। বেগে আকর্ষণ করা তার এই তন্মাত্রার তড়িৎকণাগুলো সত্তার কেন্দ্রে তার দ্রুত বেগে আকর্ষিত হয়ে ঘুরতে থাকে চক্রাকারে। বাস্তবে তার রূপ হয় তাই ঘুরন্ত একটা বায়ুচক্রের মত।

অদ্ভুত! কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এর চেয়েও একটা অদ্ভুত কথা শুনাল সতী ভূতনাথকে। সে কথায় আরোও বেশী আশ্চর্য্যান্বিত হল তার ভূতুদা। তা হল—মানুষের যেমন স্মৃতিশক্তি থাকে তেমনি নাকি। থাকে স্মৃতি বিশেষ-বিশেষ বার তিথি যোগ ক্ষেত্রেরও। পরিবেশও নাকি পরিমণ্ডলে তার রাখে স্মরণ মানুষের মত নানা ঘটনার স্মৃতি, নানা মানুষের জন্মজন্মান্তরের ছাপ। এই যে হঠাৎ কোন অজানা অচেনা স্থানে গেলে মনে হয় মানুষের এ জায়গা যেন তার জানা, এ পরিবেশ যেন তার চেনা—এর কারণ কি? কারণ কি এর হঠাৎ হঠাৎ কোন কোন সময়ে মানুষের মন দুঃখ ভরাক্রান্ত বা বিষাদ গ্রস্ত হওয়ার? হঠাৎ কোন কালে মন খুশিতে ডগমগ, আনন্দে ভরপুর বা হর্ষে উৎফুল্ল হয় কেন? মাথা ঘামিয়েও এর কোন হেতু খুঁজে পাওয়া না গেলেও এর কারণ কিন্তু হল পূর্বাপর কোন জনমের ছাপ বা অতীত কোন জীবনের কোন ঘটনার স্মৃতি — যা সংগুপ্ত হয়ে আছে মনে বা সংপুটিত হয়ে আছে মনের কোন গোপন গহন গভীর অবচেতন স্তরে। স্থান-কাল বা যোগ ক্ষেত্রে সে স্মৃতির লাগলে দোলা ভেসে উঠে মনের চেতন স্তরে। আন্দোলিত করে স্থূল সূক্ষ্ম সত্তাদের। সেই রকমই একটা কিছু হয় মনে হয় ভীষ্মদেববাবুর সূক্ষ্ম সত্তার। বিশেষ যোগ-ক্ষণের বা ক্ষেত্রের আকর্ষণে নেমে আসেন যখন এই ভূঃ-লোকে—তখন।

কিন্তু যাক গে ওসব কথা। ভীষ্মদেব বাবুর জীবন-কাহিনী শুনে না জানি কেন ভূতনাথের মনটা হয়ে উঠল কেমন যেন বেদনা ভারাক্রান্ত। ব্যথাতুর হয়ে উঠল হৃদয়টা তার। তার ওই ঘূর্ণি-ঝড় রূপী প্রেতাত্মাটাকে ভয় হল না তার বরং ভক্তিতে তার প্রাণটা তার হয়ে উঠল আপ্লুত। "আচ্ছা সতী" বলে উঠল ভূতনাথ'—এমন আদর্শ পরায়ণ একটা আত্মা, মহৎ একটা সত্ত্বা কেবলমাত্র ত্রিপুষ্কর যোগ দুষ্ট হয়ে মৃত্যুর ফলে সূক্ষে এমন বায়ু-ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে? তুই এঁর কোন উপকার করতে পারবি না? পারবি না এর কোন প্রতিকার করতে?

—কি ভাবে প্রতিকার তাঁর করব ভূতুদা? বলে উঠল সতী, "—সত্তায় আছে তার ওই নদীর বুকে পোঁতা জড় দেহটার প্রতি টান। স্বভাবে আছে তার মৃত্যুর পূর্বেকার উগ্রতার গুরুভার। মনে আছে তার ক্ষোভ প্রতিহিংসা আর আক্রোশ তাছাড়া তোমার এই অবিনাশ বাবুর কারখানায় তার ওই ছেড়ে আসা আশ্রমটার স্থানে সেই বদ্যিবাবার মন্দির তথা সে মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কামনা-বাসনা নিয়ে সূক্ষ্মলোকে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উচ্চ গতির চিন্তা, মুক্তির আকাঙ্খা নেই তার মনে। কি করে তার উদ্ধারের চেষ্টা করব আমি? কোন সূত্র ধরে জাগাব তার মনে আমি উর্দ্ধোলোকের প্রতি আকর্ষণ বা আত্মোদ্ধারের বাসনা?

—তা বলে কি অনন্তকাল সে এ স্থানের বায়ুমণ্ডলে ওমনি নীচ-হীন প্রেতাত্মা হয়ে থাকবে? বেড়াবে ঘুরে চিরকাল বায়ুভূত হয়ে?

"—চিরকাল হয়ত ঘুরে বেড়াবে না সে।" বলে উঠল সতী—তবে নদীর বুকে বালির নীচে যতদিন পর্য্যন্ত তার পার্থিব দেহটার সামান্য মাত্র অবশিষ্ট থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত তাকে ওমনি ভৌতিক সত্তায় থাকতে হবে ভূতুদা। আক্রোশ, প্রতিশোধ স্পৃহাই সুচিন্তাটাকে তার আচ্ছন্ন করে রেখেছে ভূতুদা। উর্দ্ধগতির মৌলিক চিন্তা অন্তরে তার গভীরভাবে রেখাপাত না করলে মুক্তি তার ত্বরান্বিত হওয়া অসম্ভব। অসম্ভব তাকে আত্মোদ্ধারের পথে টেনে আনা।

—কিন্তু ওর যে এ অবস্থা আমি সহ্য করতে পারছি না সতী। অন্তরটা আমার না জানি কেন ব্যাথায় উঠছে মুচড়ে। মনটা আমার না জানি কেন দুঃখে হচ্ছে ভারাক্রান্ত। তার এই বিষাদময় পরিণতিটা দেখে হৃদয়টা করছে আমার হো-হো।

শুনে কথা ভূতনাথের কেমন যেন একরূপ মুচকি হাসির ঝিলিক খেলে গেল সতীর মুখে, —মনটা যে তোমার ওঁর দুঃখে ব্যথিত হয়ে উঠবে তা আমি জানি ভূতুদা। অন্ততঃ তোমার ক্ষেত্রে এ রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কি করে সত্তাটাকে তার এই মোহাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করব আমি বলত?"

"—তা আমি জানি না সতী। বলে উঠল ভূতনাথ, —"আমার মনের কথা বললাম আমি তোকে। তবে একথা ঠিক ওই সাধু সত্তার অবস্থা দেখে যে রূপ চঞ্চল হয়ে উঠেছে মনটা আমার তাতে ওর আত্মার শান্তির ব্যবস্থা না করে দিতে পারলে তুই, হৃদয়টা কিন্তু কিছুতেই আমার শান্ত হবে না সতী। তোর ওই হাসি দেখে অন্তরটা যেন আমার উঠছে বলে যে তোর দ্বারাই তাঁর আত্মোদ্ধার সম্ভব।"

কিন্তু তোমাকে তো আগেই বলেছি ভূতুদা, উচ্চ চিন্তার সংস্পর্শে ছাড়া কোন উচ্চ আত্মিকই পারে না কোন সত্তার উদ্ধার সাধন করতে। উচ্চাত্মারা মাত্র সাহায্য করতে বা পথ দেখতে পারেন। কিন্তু মুক্তি পেতে হবে তো আত্মাকে তার নিজের চেষ্টায়। সাধু-সত্তাটার তার উর্ধ্বলোকের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। আছে তার নিম্নলোক অর্থাৎ এই ভূঃ-লোকের দিকে টান। তাই উচ্চলোকের আত্মা হয়ে আমি যতটা না পারব তার সত্তার উদ্ধার সাধন করতে—ভূঃলোকের পবিত্র সত্তা হয়ে তুমি তার চেয়েও বেশী করতে পারবে তার আত্মোদ্ধারের চেষ্টা। অবশ্য তোমার সে চেষ্টার সহায়ক হতে পারব আমি। পারব, আমি এই ভৌতিক সত্তার মুক্তির উদ্দেশ্যে তোমার সর্বময় কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকতে। সুতরাং এ কাজে কিন্তু তোমাকেই অগ্রণী হতে হবে ভূতুদা।

—কি করতে হবে আমায় বল? ওমনি ভূতনাথ আগ্রহান্বিত হয়ে সতীর কথায় বলে উঠল ব্যস্ত সমস্ত ভাবে।

উত্তরে তার বলে উঠল সতী,—প্রথমতঃ, তার এই সত্তাটাকে বাস্তব আকর্ষণ ছাড়া করতে হবে। সাধন বলে তার উচ্চস্তরে গতি হলেও নেমে আসে সে ওই গন্ধেশ্বরী নদীর বুকে বালিতে পোঁতা তার জড় দেহটার টানে। সুতরাং এ দেহের কণা মাত্র অস্তিত্ব তার চলবে না রাখা এ পৃথিবীতে।

—কি ভাবে তা সম্ভব হবে বল? জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ।

—মৃত্যুর পর তাঁর কোন সংকার বা শেষকৃত্য করা হয় নি ভূতুদা। অবশ্য দেহ বলতে এখন তার অবশিষ্ট আছে গোটা কতক অস্থি অর্থাৎ কঙ্কাল ও করোটি। সেসব দেহাস্থি তার নদীর বুক থেকে উদ্ধার করে পুত্রজ্ঞানে তোমাকে তা দাহ করতে হবে ভূতুদা। করতে হবে তার সমুদয় পারলৌকিক কর্ম নিষ্ঠাভরে। অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের যা করণীয় কর্ম অর্থাৎ শ্রাদ্ধ, শান্তি, পিণ্ডদান, ইত্যাদি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সব করতে হবে তোমাকে? পুত্রই তো পিতার সত্য রক্ষা করে সৎ ইচ্ছাপূরণ করে? তোমাকেও তাই ভীষ্মদেব সাধুর এ অঞ্চলের সকলকে মন্দির গড়ার ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কথা রক্ষা করতে হবে তোমাকেই। কি, পারবে তো পুত্ররূপে তাকে পিতার মত ভেবে এসব ইচ্ছা তার পূরণ করতে? তবেই ওই ভীষ্মদেবের সত্তা মুক্তির দিকে হবে গতিবান।

চিন্তায় পড়ল ভূতনাথ। ভাবতে লাগল গম্ভীরভাবে। বলল উঠে তারপর—পুত্র স্থানে তার পারলৌকিক কর্ম বা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অর্থাৎ যা যা বললি তুই, সেসব অবশ্য পারব করতে আমি। কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠা বা বিগ্রহ স্থাপন? সে সব করার সামর্থ কোথায়? কোথায় পাব আমি এত টাকা? চাঁদা-পাঁচা করে এসব করা কিংবা দান সংগ্রহ বা ভিক্ষে করা হবে না কিন্তু আমার দ্বারা। তাছাড়া যে কাজের জন্য এ অঞ্চলের লোক একবার টাকা দিয়ে ঠকেছে তারা আবার সে কাজের জন্য দেবে কেন টাকা? বিশ্বাসই বা করবে কেন আমাকে?

সৎইচ্ছার কখনও মৃত্যু হয় না ভূতুদা। সৎচেষ্টারও হয় না কখনও বিনাশ বা বিলুপ্তি। আন্তরিকভাবে শুভকর্মের দিকে ঝুঁকলে দেখবে কাকে দিয়ে, কখন, কিভাবে যে ভগবান তাকে সাহায্য করবেন তা ভেবে ঠিক করতে পারবে না। তুমি শুধু হেতু মাত্র হয়ে থাকবে ভূতুদা শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনের মত। জগতে সমস্ত রকমের সৎ ইচ্ছাই জানবে জগন্নাথের। হাত দুটো তিনি মানুষকে দিয়ে নিজে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন ঠিকই কিন্তু ইচ্ছেটা তার বসে নেই জানবে। তুমি শুধু তার হাত হয়ে কাজ করে যাবে ভূতুদা।

ঠিক আছে তাই হবে। সহায় থাকবি যখন তুই তখন জগতের কোন কাজে আমি পিছু পা হব না কখনও। কিন্তু একটা কৌতূহল এখন জাগছে আমার মনে। পারবি না তুই সে ইচ্ছাটা আমার পূরণ করতে?

—ইচ্ছেটা কি বল? জিজ্ঞেস করল সতী।

—ভীষ্মদেব সিংহ, তার সাধু হওয়ার কথা সবই তো শুনলাম তোর মুখে। কিন্তু তার ওই ঘূর্ণি বায়ুরূপী মূর্তি ছাড়া আর সংসারী রূপ বা সাধুর চেহারা দেখলাম না তো আমি চোখে। তাই মনটা আমার তার আসল চেহারাটা দেখবার জন্য বড় উদ্‌গ্রীব হয়েছে সতী। পারবি না আমার তার আসল রূপটা দেখাতে?

কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করল সতী। তারপর উঠল বলে, "—এখানে এ অবস্থায় তার সে চেহারাতে আসা, বোধ হয় সম্ভব হবে না ভূতুদা। আসল রূপে আনতে গেলে তাকে তার সাধন ক্ষেত্র অর্থাৎ সেই সাধুর ডাঙ্গার আশ্রমের মাঝে নিয়ে গিয়ে তাকে অবস্থান করাতে হবে। এস আমরা উভয়ে তাকে ভক্তি করে শান্ত রূপে তার আশ্রমে আসবার জন্য অনুরোধ করি।" বলেই সতী হাত জোড় করে সেই ঘূর্ণিঝড় রূপী সত্তাকে উদ্দেশ্য করে উঠল বলে, —ওঁ নমঃ শান্ত রূপায় মহান সত্তায়। নমঃ সৌম্য রূপায় সাধু সত্তায়।"

সতীর দেখাদেখি ভূতনাথও তেমনি জোড় হাত করে সুরে সুর মিলিয়ে তার বলতে লাগল সামনের সেই বায়ুরূপী পুষ্করভূত ভীষ্মদেবের সত্তাটাকে, —"তুমি যেমন তোমার জীবৎকালে শান্ত রূপে, সৌম্য মূর্ত্তিতে আসতে ফিরে তোমার আশ্রমে তেমনি সৌম্য ভাবে শান্ত রূপে তুমি এস তোমার এই সেই সাধন ক্ষেত্র সাধুর ডাঙ্গায়। আমাদের এই আহ্বান তুমি স্বীকার কর বাবা। ভক্তি প্রণতি গ্রহণ করে আমাদের মনের আকুতি, প্রাণের প্রার্থনা পূরণ কর প্রভু।"

এই প্রাণের কথার মনের স্পন্দনের কি কম্পন লাগল গিয়ে ওই ঘুরন্ত বায়ুরূপী সত্তাটায় কে জানে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল তার সেই ব্রজ্রের আওয়াজ, বাজের চিৎকার। ফুসন্ত ঘুরন্ত সেই ঝোড়ো মূর্ত্তিটা আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হল ধোঁয়াটে-ধূসর বৃহৎ এক বটবৃক্ষ রূপে। তারপর সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। চলতে লাগল সেই ছায়ারূপী বট গাছটা। নিস্তব্ধ নিঝুমভাবে তার ডাল পালা ও ঝুমন্ত ঝুরি নিয়ে। আসতে লাগল সেটা আসমানে ভেসে ভেসে, কারখানার দিকে। আর এর চেয়েও আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল তার চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অদ্ভুতভাবে আসতে লাগল ভূতনাথের কানে খড়মের শব্দ ও চিমটের আওয়াজ। সে আওয়াজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল কারখানার ঘর-প্রাচীর ইত্যাদির দেওয়ালগুলোতে। এ যেন খড়ম পায়ে কোন সাধু বা সন্ন্যাসীর তার হাত চিমটের আওয়াজ করে আগমনের মত। ছায়ারূপী সেই চলন্ত বট গাছটা এসে দাঁড়াল ঠিক সেই উঠন্ত মেশিন ঘরটার প্রায় মধ্যিখানে। ফাটল না তার ভিত ভাঙ্গল না দেওয়াল। এমন কি অবস্থানে তার কোথাও একটু চিড় ধরল না পর্য্যন্ত। অবশ্য এসব না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ ছায়ার তো আর বাস্তবে সেরূপ করার মত কোন শক্তি নেই। অবাক হল ভূতনাথ বাস্তব অস্তিত্ব বিহীন এই ছায়ারূপী বট গাছটার আকার প্রকার দেখে। এ ছায়া যেন তার সেই ভোজুবন্ধুর সঙ্গে কারখানায় এসে প্রথম দেখা সেই বট গাছটার অবিকল নকল। হুবহু ঠিক তার সেই প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এ বট গাছের মূর্ত্তিতে ভূতনাথ চায়নি দেখতে তো ভীষ্মদেববাবুর সূক্ষ্ম সত্তা। খড়মের আওয়াজ চিমটার ধ্বনি কানে এলেও তার সাধুরূপটা চোখে এল না। তাই ভূতনাথ কৌতূহলী মনটা নিয়ে তার তাকাল সতীর মুখটার দিকে। ওমনি সঙ্গে সঙ্গে সতী বুঝল বুঝি তার ভূতুদা'র মনের কথা। তাই ইচ্ছাটা তার পূরণ করবার জন্য তেমনি আবার মিনতি ভরা গলায় করে উঠল সেই ছায়ারূপী গাছটাকে অনুরোধ, —আপনি তো বট বৃক্ষ নন প্রভু। আত্মা তো আপনার এ রূপ নিয়ে জগৎ জীবনে আসেনি। ছিলেন আপনি মানুষ। সেই মানব রূপেই আমাদের সামনে প্রকটিত হোন প্রভু। আমরা আপনার সেই মনুষ্যমূর্ত্তি দেখে ধন্য হই।

সতীর প্রার্থনার বাতাস বুঝি লাগল গিয়ে সেই ছায়া কায়া-রূপী গাছটাতে। দুলতে লাগল সেটা। আন্দোলিত হতে লাগল তার ডালপালাগুলো। নড়তে লাগল তার ঝুলন্ত ঝুরিগুলো। তারপর হঠাৎ যেমন দমকা বাতাস এসে ঝড় লাগিয়ে গাছের গায়ে শব্দ উঠায় ঝড় ঝড় খড় খড় করে—ছায়া রূপী সেই পাতাগুলো পরস্পর তেমনি ঠোকাঠুকি করে উঠল ওমনি একটা ঝটকা লাগার মত আওয়াজে। সে আওয়াজ ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে হতে পরিণত হল মানুষের কণ্ঠস্বরে। সে কণ্ঠস্বরে গাছটার কাছ থেকে ভেসে এল ভাষা—"এই মাটিতে তো গাছ হয়েই ছিলাম আমি। ডালপালা মেলে সূর্য্যের তাপ নিজে সহ্য করে অপরকে দিতাম শীতল ছায়া। ক্লান্ত পথিক এসে বিশ্রাম নিত আমার তলায়। মৃদু-মন্দ সমীরণে করতাম তার ক্লান্তি দূর। পশু-পক্ষী মানবাদি প্রাণীকে দিতাম আমি আশ্রয়। সাধ্যমত করতাম রক্ষা তাদের ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টিপাত বান-বাদলে। ক্ষতি তো আমি করিনি কারো কোনোদিন। তবে কেন আমাকে কাটা হল? নিষ্ঠুরভাবে কেন আমাকে পৃথিবীর বুক থেকে করা হল নস্যাৎ চিরকালের মত? সকলের জন্য আমার শান্ত শীতল আশ্রয়স্থল নষ্ট করে গড়ছে যারা ইমারত তাদের আমি ক্ষমা করব না। নিজ লাভ লোভে যারা নষ্ট করেছে আমার জীবন তাদের মনের আশা আমি পূরণ হতে দেব না। স্বার্থপরদের ইমারত আমি ধ্বংস করে দেবই দেব।

"—শান্ত হোন প্রভু'। বলে উঠল সতী—ক্রোধান্মত্ত হওয়া তো আপনার স্বভাব নয়। নয় আপনার বৃক্ষের মত জড়-প্রকৃতি হওয়া। আপনি মৃত্যুর পর বটবৃক্ষকে আশ্রয় করে থাকতে থাকতে ওই বৃক্ষ সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। মৃত্যুর পূর্বের অবস্থা আপনার স্মরণে আনুন প্রভু। দেখুন আপনি চিন্তা করে জীবনে আপনি মানুষ ছিলেন। ছিলেন মানুষের মহান আদর্শধারী, বিবেকবান, আদর্শ-পরায়ণ এক সাধু। জগন্মঙ্গল ও পরোপকারের সংকল্প নিয়েই সাধু জীবনে এসেছিলেন আপনি। আঘাতকারীকে প্রত্যাঘাত করা, আক্রোশে আত্মাকে আচ্ছাদিত করে রাখা, প্রতিহিংসা পরায়ণ হওয়া তো সাধু জীবনের ব্রত নয় বাবা। কেন আপনি আপনার সেই জীবনের সাধক আদর্শকে এইভাবে অনাচরণীয় কর্ম দ্বারা অবমাননা করবেন? কেন করবেন অমর্য্যাদা আপনার সাধু সত্তার?

—জীবনে যে আমি সাধু ছিলাম তা আমি বুঝতে পারছি না কেন? গম্ভীরভাবে বলে উঠল সেই বৃক্ষসত্তা, কেন আমি পারছি না জানতে মানব আধারের কথা?

"—দীর্ঘদিন বৃক্ষ সত্তায় আসীন হয়ে থাকাতেই অভ্যস্ত প্রকৃতি আপনার সে জীবনের বিস্মরণ ঘটিয়েছে বাবা।" বলে উঠল সতী—"অন্তররাজ্যে স্মৃতির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাক প্রভু। বাড়ুক আপনার স্মরণ শক্তির প্রখরতা। ভগবান বুদ্ধের জাতক শক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠুকআপনার মধ্যে। মনকে আপনার অতীতের দিকে নিয়ে যান প্রভু। যান নিয়ে সত্তাকে আপনার মৃত্যুর পূর্বের বিশেষ পর্য্যায়ে। বিস্মরণের ঘোর কাটিয়ে ভাবতে আপনি চেষ্টা করুন আপনি এই বটবৃক্ষ নন, মানুষ। আপনার এই শাখা প্রশাখা আপনার হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ঝুলন্ত-ঝুরি আপনার মাথার জটা। চিন্তার আলোকে আলোকিত করে তুলুন বাবা আপনি আপনার অতীত স্মৃতিকে।

হঠাৎ যেমন থমকে গেল মানুষের অবস্থা হয়—সতীর কথায় তেমনি যেন থমকে গেল সেই ছায়া-রূপী বট বৃক্ষটা। তার সেই কথা, খস খস, খড়-খড় আওয়াজ এমনকি ঝুলন্ত ঝুরির দুরন্ত ডাল পালাগুলোর নড়ন-চড়নও মুহূর্ত্তে গেল বন্ধ হয়ে। যাকে বলে—টোটেলি স্টপ। বেশ কিছুক্ষণ কাটল ওমনি চুপচাপ নিঃসাড়ভাবে। হঠাৎ মনে হল ভূতনাথের বটগাছের সেই ছায়া-ঘন কায়াটা আস্তে আস্তে যেন হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে যেন সেটা বিলীন হয়ে অর্থাৎ উপরে উঠা ধোঁওয়া যেমন আস্তে আস্তে মিশে যায় আকাশের বুকে তেমনি যেন মিশে যাচ্ছে সেটা। যেতে যেতে সেই হাল্কা ধোঁয়ার মধ্যে থেকে, না সেই বটগাছটার দাঁড়িয়ে থাকা স্থানটা থেকে—কে জানে, পরিবেশটার সেই থম-থমে ভাবটা ভঙ্গ করে এল একটা আশা ভরা মানুষের খুশি ভরা কণ্ঠস্বর,—মনে পড়েছে মা। গাছ আমি নই। নয় আমার এই গাছের আধার। আশ্রমের এই গাছের তলাতেই ছিল একটা ঝুপড়ির মত আমার ঘর। সেই ঘরই ছিল আমার সাধন ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে সাধু হয়েই ছিলাম আমি। বলত সবাই আমাকে সাধুবাবা।

—মনের আপনার মনিকোঠায় আরো নাড়া দিয়ে চলুন বাবা। স্মৃতিতে আপনার উঠুক জেগে সে জীবনের আরো ছবি, আরো ঘটনা।" বলে উঠলো সতী।

বলতে লাগল সেই কণ্ঠস্বর—সাধু বাবা হয়ে আমি এখানে আমার সাধু-গুরু বদ্যিনাথবাবার ইচ্ছাপুরণ মানস নিয়ে ছিলাম মা। আশ্রমটা সত্যি যাতে একটা আদর্শ পীঠস্থান হয়ে গড়ে উঠে, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় মানুষ এখানে এসে যাতে একটু শান্তি পায়। পায় যেন মা-বোন, বৌ-মেয়েরা এখানে এসে হতাশায় একটু আশা, নিরাশার অন্ধকারে একটু আলো, তাদের ব্যথা ব্যাকুল, বেদনা-ভরা মনটাতে যাতে একটু শান্তির প্রলেপ দিতে পারি তার জন্যই আমি চেষ্টা করতাম মা। করতাম তার জন্য রোজ বিকেলে গীতা চণ্ডী রামায়ণ পাঠ। মহাভারতের মহান কথায় উপদেশ দিতাম সকলকে। কিন্তু সে আনন্দে, সে সুখে, সে তৃপ্তিতে আমার আগুন দিল ওই চৌধুরী বংশের কুলাঙ্গার, ওই রসিক নাগর চৌধুরী। আমাকে অসহায়ভাবে, নৃশংসভাবে নিষ্ঠুর ভাবে, ত্রিশূলের খোঁচায় অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে করতে হল প্রাণত্যাগ। আমি ওই নরাধমটাকে সমুচিত শিক্ষা দেব। ওকে আমি.......

বাধা দিয়ে সেই স্বরটাকে বলে উঠল সতী,—উত্তেজিত হবেন না বাবা, তাহলে শান্ত হয়ে আসা সত্তায় আপনার আবার উঠবে ওমনি ঈর্ষার ঝড়। হিংসা, ঘৃণা-বিদ্বেষের কনাগুলো পরস্পর আকর্ষিত হয়ে সত্তায়

আধারটাকে আপনার ওর্মনি আবার জড়ীকরণ করবার চেষ্টা করবে ঘূর্ণিবায়ুরূপে। ওই নীচ আক্রোশ, হীন প্রতিহংসা-পরায়ণতা আপনার স্বভাব বৈশিষ্ট্য নয় বাবা। মনে করুন আপনার সাধু জীবনের কথা। সেই জীবনে আসীন হয়ে এখানের এই আশ্রম বটতলায় বসে কি উপদেশ দিতেন আপনি আপনার সেই ভক্ত, অনুরাগী, শিষ্য-প্রতীমদের? স্মরণ করুণ সেসব কথা। স্মৃতিতে আপনার আনুন বাবা বিকেলের সেই পড়ন্তবেলায় আপনার সেই আশ্রমের ছবি। করুণ মনে সেই আশ-পাশের গ্রাম থেকে আসছে সব ধর্ম-পিপাসু বুড়ো-বুড়ীরা আপনার কাছে ধর্মালোচনা করতে। শুনতে আপনার মুখে মহাভারতের কথা, ভাগ্বতের উপাখ্যান। মনকে আপনার নিয়ে যান বাবা আপনার সেই পরিবেশে যেখানে ভক্তি ভরে সামনে আপনার বসে আছেন সব ধর্ম-পিপাসু জন-সাধারণ। আছেন বসে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আপনার মুখে ধর্মোপদেশ শোনবার জন্য। আপনি তাদের গীতা পাঠ করে শোনাচ্ছেন—

"—দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্ন মনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহ।
বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধী র্মুনিরুচ্যতে।।"

যঃ সর্ব্বত্রা নভিস্নেহ স্তত্তঃ প্রাপ্য শুভাশুভম — —"ইত্যাদি ইত্যাদি সতীর কথার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল গীতা পাঠ। পাঠ হতে লাগল সেই মিলিয়ে যাওয়া বটগাছটার শূন্য স্থানে। আশ্চর্য্য! পাঠক বা তার পাঠ্য-পুস্তক শ্রীমদ্ ভাগবত্-গীতা কোন কিছুই চোখে পড়ল না ভূতনাথের। অথচ মনে হতে লাগল তার যেন সে পাঠের সামনেই আছে দাঁড়িয়ে। কি চমৎকার সেই পাঠ। যেমনি ভাব-গম্ভীর ভক্তি-ব্যঞ্জক সুরেলা গলা তেমনি তার যতির জমক ছন্দের গমন। আহা! মেঘমন্ত্র স্বরে যেন সে-পাঠ আপ্লুত করতে লাগল কারখানার সমগ্র চৌহদ্দিটাকে। ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে তার যেন মুখরিত হয়ে উঠতে লাগল সমস্ত কারখানার প্রাচীর দেওয়াল সমেত পরিবেশটা। কিন্তু সুস্পষ্ট কণ্ঠে অতি নিকটে পাঠ হলেও তাঁর পাঠক অদৃশ্য। অদ্ভুত কাণ্ড। অবাক ব্যাপার!

ব্যাপারটা কি? কৌতূহলী চোখে জিজ্ঞাসা করতেই ভূতনাথ, সতীর মুখে ভেসে এল তার জবাব,—এ তোমার সেই আগের দেখা কুমার খুলির কুলদা ঘোষের স্ত্রীর মত হীন সত্তা, বা পাথর মুড়ির গোবিন্দ গোসাই-এর মত নীচ আত্মা নয় ভূতুদা। নয় এ তোমার সেই প্রহ্লাদ পরামানিকের প্রেতাত্মা বা ননীবালার ভৌতিক সত্তা যে সহজেই তুমি দেখতে পাবে তাঁকে। এতক্ষণ তিনি রূপ-তন্মাত্রার বাস্তব অনুকণাকে আকর্ষণ করে ঝোড়ো-মূর্ত্তিতে ছিলেন বলেই তুমি তার বায়ু-ভূত রূপে কায়া-ব্যূহটা ও বট-বৃক্ষরূপে ছায়া-দেহটা দেখতে হয়েছিলে সমর্থ। কিন্তু এখন তিনি আছেন আধ্যাত্মিক ভাবে ভাবিত হয়ে দিব্য-সত্তায়—উচ্চ আত্মিকরূপে। উচ্চ আত্মিকদের সাধারণ চোখে দেখা যায় না ভূতুদা। যায় না দেখা দিব্যাত্মাদের দিব্যদৃষ্টি ছাড়া।

"—তবে কি আমি দেখতে পাব না উনাকে?" ভূতনাথের মুখে হতাশা-ভরা স্বর।

সতী নিরুত্তর। পরক্ষণেই আবার আশা ভরা স্বরে বলে উঠল ভূতনাথ, —আচ্ছা সতী, সেবারে তো আমার স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহটাকে আকর্ষণ করে দেখিয়েছিলি ভুবর্লোকের প্রেতাত্মাদের। দেখিয়েছিলি আমার সত্তাটাকে তোর সত্তায় আসীন করে নিম্নলোকের ভৌতিক সত্তাদের। তেমনি ভাবে অন্ততঃ স্বপ্নের মতও দেখাতে আমাকে পারবি না তুই গীতা পাঠরত ভীষ্মদেব সাধুর ওই দিব্য-সত্তাটাকে?

"—বাবাঃ! সে ভুল আমি আবার করি! না ভূতুদা।" শুনে কথা তার উঠল বলে সতী,—কি মুস্কিলেই না ফেলেছিলে তুমি আমাকে সেদিন। বাবা ভৈরব নাথের আমার প্রতি অশেষ কৃপা ছিল বলে তাই সেদিন আমি তোমার সেই আকর্ষিত সূক্ষ্মদেহটাকে পুনরায় তোমার সূক্ষ্মদেহে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছিলাম। নইলে তোমাকে আর কিন্তু বাচানো যেত না। কি সর্ব্বনাশ হোত বলতো! জগৎ-জীবনে তোমার সত্তাকে আর সংস্থাপন করতে পারতাম না।

—তার মানে?

—মনে নেই সেবার লালবাহাদুর, ভীম চাঁদ ও রাম সিংদের পিছনে ওই ব্রহ্ম-ডাঙ্গায় রাত্রেবেলায় ভূতের তাড়া দেখে উর্ধ্বস্তরে সূক্ষ্মসত্তায় থাকতে থাকতে হঠাৎ তুমি চঞ্চল হয়ে উঠলে। আমার সত্তায় আসীন হয়ে থাকা সত্ত্বেও ছেড়ে আমাকে ওই উর্ধ্বস্তর থেকে হঠাৎ নিম্নস্তরে পড়লে ঝাঁপিয়ে।

"—হাঁ, পড়েছিলাম তো ঝাঁপিয়ে।" বলে উঠল ভূতনাথ,—তাতে হয়েছিলটা কি?

—ওভাবে হট্‌কারিতায় ছেড়ে যাওয়া তোমার সূক্ষ্মসত্তার পক্ষে স্থূলদেহে প্রবেশ করা আর সম্ভব হত না ভূতুদা। ফলে জীবনে মারা যেতে তুমি। আর ওই সূক্ষ্মস্তরে সূক্ষ্মদেহ নিয়ে তোমাকে ভের্সে বেড়াতে হত ওইসব ভৌতিক সত্ত্বাদের মত। থাকতে হত ওই নিম্নস্তরের প্রেতাত্মাদের সঙ্গে তোমার পার্থিব পরমায়ুর শেষ দিন পর্য্যন্ত। সে অবস্থা বড় কষ্ট-কর হত তোমার পক্ষে ভূতুদা। বড় দুর্বিষহ মানসিক যাতনা নিয়ে থাকতে হত তোমাকে সে স্তরে। এমন ঘোরে থাকত তোমার সত্ত্বা যে কিছুতেই তোমাকে সে অবস্থা থেকে মুক্ত করা যেত না। এভাবে অকাল-মৃত্যুর ঘোরেই জন্ম নিতে হত তোমাকে পৃথিবীতে। সে জীবনে তোমাকে ওই নীচাত্মাদের সঙ্গে থাকা অভিজ্ঞতা ভুলিয়ে দিত তোমার জীবনের আদর্শ, জনমের সার্থকতা। অবচেতন মনে থাকা সূক্ষ্ম অবস্থার মানসিক যাতনার অভিজ্ঞতা অধীর অস্থির চঞ্চল করে রাখত তোমার জীবনটাকে। শান্তি পেতে না তুমি। থাকতে হত পাগলপারা, ছন্নছাড়া এক যে থাকের মানুষ হয়ে তোমাকে জীবনে।

—তাই নাকি?

"—হ্যাঁ ভূতুদা।" বলে উঠল সতী।—বাবা ভৈরব সেদিন আমার আকুল মনের ব্যাকুল প্রার্থনা শুনেছিলেন বলেই দয়া করে তিনি সত্ত্বাকে তোমার ওভাবে ভেসে যেতে দেন নি। জড়দেহে তোমার সূক্ষ্ম-দেহটার পুনঃ-প্রবেশ ঘটিয়ে অসীম কৃপা করেছেন তিনি আমার উপর। রক্ষা করেছেন সত্ত্বাটাকে তোমার ওই দুর্বিষহসহ অবস্থাটার হাত থেকে। তাই বলছি ভূতুদা, ওভাবে আর সত্ত্বাটাকে তোমার সূক্ষ্ম-দর্শন করাতে বোলো-না আমাকে। বিপদ ঘটতে পারে।

"—তবে কি আমার ওই ভীষ্মদেব-সাধুর সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি দর্শন অদেখা হয়ে থাকবে জীবনে?" বিষাদস্বরে উঠল বলে ভূতনাথ—"তুই থাকতে সঙ্গে আমার আমাকে তার ওই অদৃশ্য গীতা পাঠ শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে? ঝোড়ো রূপ ছাড়া আর তার কোন চেহারাই চোখে পড়বে না আমার? সত্যিই কি আর অন্য কোন প্রকারেই পারবি না তুই আমাকে ওই সূক্ষ্ম-সত্তার দর্শন করাতে? ইচ্ছাটা আমার তাহলে অপূর্ণই থেকেযাবে?

পড়ল সতী মহামুস্কিলে। কি ভাবে ভূতুদার রাখবে অনুরোধ বোধহয় ভাবতে লাগল সে। ওধারে গীতার সুর-লহরী ভূতনাথের দেহে, মনে, প্রাণে জাগাতে লাগল যেন অনুরণন। যতই শুনতে লাগল সে ওই অদৃশ্য কণ্ঠ ততই যেন উদগ্রীব হয়ে লাগল উঠতে তার মনটা। সমান বেগে লাগল বইতে সামনে তার গীতার শ্লোক-ধারা,—

বীত রাগ ভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতা।
বহবো জ্ঞান তপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।। ইত্যাদি।

সত্যি, এমন সুন্দর গীতাপাঠ ভূতনাথ শুনেনি কখনও জীবনে। সুর-লয়ের যে এমন আকর্ষণ থাকতে পারে অনুভবও করেনি সে কোনদিন। নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সতীকে, আবার ভূতনাথ করে উঠল তাকে অনুরোধ,—"সেবারের ভুল আর আমার হবে না সতী। কথা দিচ্ছি তোকে ও রকম হটকারিতা করব না আমি আর। কিছুতেই, কোন অবস্থাতেই, কোন মতেই ছেড়ে আমি যাব না তোকে। যেমন করেই হোক, স্থূল-সূক্ষ্ম যে রূপেই হোক ওই জ্ঞান-তপস্বীর দর্শন লাভ করা আমাকে।

"—কিন্তু সাধারণ চোখে তো দেখা তাকে এখন যাবে না ভূতুদা। এ অবস্থায় তোমার স্থূল নজরে পড়বেন না তিনি।" বলে উঠল সতী,—"দেখতে হলে তাকে এখন সূক্ষ্ম-শক্তি চাই, দিব্য-দৃষ্টি চাই, চাই সাধকের সাধন-লব্ধ-ক্ষমতা।

"—ওসব সূক্ষ্ম শক্তি, দিব্য-দৃষ্টি বুঝি না আমি সতী।" কেমন যেন একরূপ অভিমানের সুরে উঠল বলে ভূতনাথ,—"আমি বুঝি তোকে। তুই আমার সূক্ষ্ম-শক্তি, তুই আমার দিব্য-দৃষ্টি, তুই আমার সাধন-ক্ষমতা, বলে-ভরসা সব কিছুই তুই আমার। মন বলছে আমার তুই ইচ্ছা করলে কোন অসম্ভবই থাকবে না আমার জীবনে কখনও অসম্ভব হয়ে। থাকবে না আমার কোন সখ-সাধ অপুরণ হয়ে। তোর চোখে চোখ, তোর দৃষ্টিতে দৃষ্টি, তোর শক্তিতে শক্তিমান করে আমাকে দেখা ওই সাধু সত্ত্বাকে। মনটা আমার সত্যিই তাকে দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছে সতী।

তাকাল সতী ভূতনাতের দিকে। সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি তার। সে দৃষ্টিতে বুঝি সে ভূতনাথের হৃদয়-মন-

প্রাণের গভীর গহন সব কিছুই করল নিরীক্ষণ। বলল তারপর গম্ভীর গলায়,—ঠিক আছে ভূতুদা, তোমার কৌতূহলেরই নিরশন হোক। সব চিন্তা থেকে মনকে এখন মুক্ত করে তুমি স্মরণ কর আমাদের গ্রাম সেই ভূত-গ্রামের বাবা ভূতনাথের মন্দিরটাকে। চোখ মুঁদে শুধু কর চিন্তা সে মন্দিরের অভ্যন্তরে থাকা বাবা ভূতনাথের লিঙ্গ-বিগ্রহটাকে। ধ্যান কর সেই লিঙ্গ-রাজের মূর্ত্তির পাশে শিব-সতীর যুগল-বিগ্রহটাকে। ধ্যান-মুদ্রিত নয়নে সে বিগ্রহের ছবি চিন্তা করতে করতে স্পর্শ কর তুমি আমাকে। করে স্পর্শ আমার ভাবনার সঙ্গে মিলাও তোমার ভাবনাটা। ভাব, তুমি শিব, আমি সতী। উভয়ে আমরা শিব-সতী।

তাই করল ভূতনাথ। চোখ মুঁদে সে তাদের গ্রামের বাবা ভূতনাথের মন্দিরটা আনল তার স্মৃতিতে। করল স্মরণ ভক্তিভরে সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে রাখা শিব-সতীর যুগল মূর্ত্তিটা। তারপর রাখল সে হাত তার সতীর সূক্ষ্ম-দেহে। ওমনি কেমন যেন একটা বিদ্যুতের শক লাগার মত লাগল একটা ঝটকা তার সমগ্র দেহে-মনে-প্রাণে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল সতীর কণ্ঠস্বর, "—হে মহাযোগী মহেশ্বর, তোমার কৃপায় আমার ভূতুদার মধ্যে তার "শিব-সতী" গ্রন্থীর জাগরণ হোক প্রভু। উঠুক জেগে এই মুহূর্ত্তে তার মধ্যের মহৎ-গ্রন্থীব। যার ফলে সম্ভব হয় তারপক্ষে সূক্ষ্ম দর্শন ও দিব্য অবলোকন করা। তার জাগ্রত চৈতন্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম-চৈতন্যের হোক মিলন প্রভু। সঞ্চারিত হোক আমার সূক্ষ্মশক্তি তার মধ্যে। যার ফলে ভূতুদা আমার মত সূক্ষ্ম-সত্তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হয় সমর্থ। তোমার দয়ায় ভূতুদার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হোক প্রভু।

সতীর প্রার্থনায় কি শক্তি লাভ করল ভূতনাথ কে জানে।, চোখ খুলতেই দেখল সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! সামনে তার সেই ডাল-পালা মেলা ঝুলন্ত ঝুরির বটগাছটা! তলায় তার বাঁধানো বেদীর উপর বসে আছেন এক সাধু। বেশ ভাব-ভারিক্কি চেহারা তার। মাথায় জটা, কপালে ফোঁটা, পরনে গেরুয়া। গোঁফ-দাড়ি-ভর্ত্তি মুখটা তার বেশ গাম্ভীর্য্যে ভরা। ভরা গলাতেই গীতা পাঠ করে চলেছেন তিনি। সামনে তার ছায়া-ছায়া নানা কায়ার ভক্তজন আবাল বৃদ্ধ-বনিতা। নর-নারীরা সব নিশ্চুপ হয়ে বসে যেন শুনছে তার পাঠ। কারখানার ঘব বাড়ীগুলোতেও পড়েছে আশ্রমের ছায়া। আশ্রম-কুটির, ফুলগাছ, বেল-কুড়চি, টগর-চাপা, ঝুমকো-লতা ইত্যাদির বাস্তব অস্তিত্ব কোথায় যে আছে কে জানে। কিন্তু ছায়াগুলো তাদের আলতো ভাবে, এমন সুন্দর রূপে পড়ছে এসে কারখানার আশপাশ দেওয়ালগুলোর উপর যে দেখতে দেখতে মাথা যেন ঘুরে যেতে লাগল ভূতনাথের। এসব অলৌকিক দৃশ্য, তাজ্জব ব্যাপার বেবাক করে দিল ভূতনাথকে।

এই নাকি ভীষ্মদেব সাধুর ফেলে আসা অতীত সাধুজীবনের ধর্মালোচনার সভা ও উপদেশ দানের আসর। প্রতিদিন নাকি বিকেলে তিনি বসতেন এমনিভাবে ধর্মগ্রন্থ পাঠে। সামনে জ্বলত তার প্রদীপ ও ধূপকাঠি। আর ওমনি তার ডান পাশে থাকত গাদা বৈদ্যিবাবার দেওয়া হাতের ত্রিশূল ও ডান পাশে চিমটেটা। তাকিয়ে কিছুক্ষণ দেখাবার পরই হঠাৎ গীতা পাঠটা বন্ধ হয়ে গেল সাধুবাবার। চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। তার সৌম্য-শান্ত চেহারাটাও আচমকা গেল যেন পাল্টে। হঠাৎ ক্রোধোদীপ্ত কণ্ঠে মহা-শূন্যের দিকে রক্তচক্ষু করে বলে উঠলেন তিনি,—কি লাভ করলাম আমি সাধু জীবনে এসে? কি ফল হল আমার গীতা পাঠ ও ধর্মে। নরপশু রসিকনাগর চৌধুরীর হাতে আমাকে মরতে হল কেন? কেন? কেন?

তার ওই "কেন?" চিৎকারটা উদারা থেকে মুদারা, মুদারা থেকে তারা, ধাপের পর ধাপ উঠতে লাগল ক্রমশঃ যেন উপরে। ঝঙ্কারে তার কাঁপতে লাগল সমস্ত পরিবেশটা। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ের মত শব্দের চেয়ে শব্দের সেই প্রতিধ্বনিটাই হতে লাগল যেন জোরালো। সে জোর কম্পনে তার কাঁপতে লাগল যেন নীচের বাতাস, উপরের আকাশ। প্রকম্পিত হতে লাগল আশ-পাশের সমস্ত স্তর-মণ্ডলটা। চিৎকারের ধাক্কাটা তার সামলাতে না পারার জন্য যেন কারখানার প্রাচীর সহ এধারের ওধারের ঘরগুলো লুফোলুফি করতে লাগল তার প্রতিধ্বনিটাকে। তবে এর চেয়েও আশ্চর্য্য ঠেকল ভূতনাথের অন্য একটা ব্যাপার। ওই "কেন" শব্দটার এক একটা আওয়াজে একের পর এক অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল তার সামনে থেকে সেই শূন্যলোক থেকে পড়া আশ্রমে ছায়া-পরিবেশটা। অর্থাৎ সেই ছায়ার ফুলগাছ, ছায়ার কুটির, এমনকি সাধুবাবার সামনে বসা ভক্ত-শ্রোতাদের ছায়া-ছায়া কায়া-ব্যু হগুলো পর্য্যন্ত।

মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল সব। রইল টিকে শুধু সাধুবাবার সেই সূক্ষ্মদেহটা। শূন্যতার মাঝে জটাজুট

সমান্বিত, ত্রিশূল হস্ত ধৃত, চিমটা-দণ্ডধারী রুদ্র-ভৈরব কালমূর্ত্তিতে রইলেন তিনি দাঁড়িয়ে। আর তাকে কেন্দ্র করে তার সেই বজ্র হুঙ্কারের "কেন" শব্দটা যেন ঘুরতে লাগল পোঁ-পোঁ বোঁ বোঁ তার ধ্বনি প্রতিধ্বনি নিয়ে।

সাধু-সত্তার সেই গগন-বিদারী "কেন?" চিৎকারের মাঝে সাধুর সামনে এগিয়ে গেল সতী। বলে উঠল তার ঝঙ্কারের মাঝে, ভক্তি ভরা বিনম্র স্বরে, —একি বাবা! সাধু আপনি শান্ত হোন। বীত রাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধী হবার ব্রত গ্রহণ করবার জন্যই তো এসেছিলেন আপনি সাধু জীবনে। সত্তাকে তো এ আদর্শ ছাড়া করা উচিত নয় আপনার। নিজের জীবনাচরনের শোক-দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত না হয়ে থাকলে আপনার অপরকে দেওয়া গীতা পাঠের উপদেশ যে ফলপ্রসূ হবে না বাবা। সংযত হোন আপনি। নিজেকে ক্রোধ-রিপুর দাস করে, উত্তেজনার আগুনে নিজ সত্তাকে দগ্ধ করে অযথা আর আত্মাকে আপনার কালিমা লিপ্ত করবেন না বাবা। ভগবান আপনাকে অনন্ত উন্নতির সম্ভাবনা দিয়ে জীবনে পাঠিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন সাধুর ডাঙ্গার বৈদ্যিবাবার মত এক মহৎ সাধকের সঙ্গ। সেই মহৎ সঙ্গের প্রভাবে ও তাঁর সৎ শক্তির আলোকে উর্ধ্বলোকে আপনার গতি ও উচ্চলোকে আপনার আকর্ষণ হওয়ার কথা।

—কিন্তু এভাবে আমার সে উন্নতি রুদ্ধ ও ব্যাহত করল কেন রসিক নাগর চৌধুরী। ঘটাল কেন এমন নিষ্ঠুরভাবে আমার সাধু জীবনের পরিসমাপ্তি? কেন?

—সব কেন-র উত্তর আছে বাবা আপনার অন্তরে। কে রসিক নাগর চৌধুরী আর কে-ই বা আপনি; আপনার দেওয়া সেই গীতার উপদেশ ভাবুন না আপনি মনে। সেই শ্রীকৃষ্ণে কথা—অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশ্রয় স্থিত অহম আদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামঞ্চ এবচ। সুতরাং সবই তো সেই তিনি। সেই একই পরম সত্তার সবাই আমরা অংশ বাবা। তিনি কাকে দিয়ে যে কি করান কেও তা বুঝতে পারে না। না পারলেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যা কিন্তু করেন তিনি সবই আত্মোন্নতি ও সত্তার মঙ্গলের জন্য। সাধু-সন্ত মহাত্মাদের পূর্ব-পূর্বাপর জীবনের সমস্ত কর্মফলভোগ একজন্মেই শেষ করবার জন্য তিনি তাদেব বিশেষ করে এরূপ আঘাত দেন। অর্থাৎ তাদের শরীরের উপর দিয়ে অতীতাতীত জন্মার্জিত কর্মফল যায়। একেই আত্মা সর্ব সত্তায় বিরাজিত বলে যুগের ভোগ, সমাজের ভোগ বা অপরের পাপের কিছুটা ফল ভোগের অংশ বর্ত্তায় সাধু জীবনে অর্থাৎ নিতেহয় তাকে। ভগবান কৃপা করে সর্ব কর্মফল ভোগ সাধুর সেই জীবনেই সমাপ্ত করে কোলে তার টেনে নিতেচান বলেই যীশু খৃষ্টেদের কাঁটার মুকুট পরান, ক্রুশ-বিদ্ধ করেন। বুদ্ধদেবদের দেন রক্তামাশায়ের জ্বালা। রামকৃষ্ণদের দেন ক্যানসারের কষ্ট। আপনাকেও তেমনি নৃশংস মৃত্যুর যন্ত্রণা দিয়ে হয়ত তিনি টানতে চেয়েছিলেন আপনাকে আপনার গুরু বাবা-বৈদ্যনাথ সাধু মৃত্যুর পর যে লোকে অবস্থান করছেন সেই পরম লোকে।

শুনে সতীর কথা, যেন উঠল চমকে সাধু ভীষ্মদেবের সেই সূক্ষ্ম সত্তাটা, "—বৈদ্যিবাবা দেহ রেখেছেন? ইহালোক ছেড়ে গেছেন পরলোকে? কখন?

"—বহুদিন আগে বাবা।" বলে উঠল সতী, "—কৈলাসধামে বাবা লিঙ্গরাজের মূর্ত্তি আনতে গিয়ে তুষার ঝড়ে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। শিব-চিন্তায় মৃত্যু হয়েছিল বলে তাঁর শিবলোকে করেছেন তিনি গমন। সেখান থেকে প্রতিনিয়ত তিনি করছেন আপনাকে আকর্ষণ। ফলে সত্তাটা আপনার সে আকর্ষণে অজান্তে কিছুটা উর্ধ্বলোকে গতিবান হলেও মর্তের কামনা-বাসনা আপনাকে টেনে রেখেছে বাবা। মনটাকে আপনি আক্রোশ, প্রতিশোধ স্পৃহায় ভারাক্রান্ত করে রেখেছেন বলেই মনের গতি আপনার সে-মুখী হচ্ছে না। কুচিন্তা ও সাত্ত্বিক চিন্তা পরস্পর ভিন্ন-মুখী চিন্তার দোলায় পড়ে মনটা আপনার উর্ধ্বলোক ও অধঃলোকের মধ্যে পড়ে দোলকের মত দুলচ্ছে বাবা।

সতীর কথা শুনতে শুনতে সাধুবাবার সেই রুদ্রমূর্ত্তি, ক্রোধোদীপ্ত রূপ, রুক্ষভাব আস্তে আস্তে গেল যেন মিলিয়ে। পরিবর্তে তার ভেসে উঠল এক ভাবগম্ভীর, ভাবনা-ভারাক্রান্ত, চিন্তাগ্রস্ত চেহারা। সে চেহারার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল সতী,—জগৎ পরিবর্তনশীল বাবা। সে কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পরিবর্তনের গতির ধারায় সে জন্ম-জীবনের সব কিছু মাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। বর্তমানকে অতীত, ভবিষ্যৎকে বর্তমান করে ক্রমশঃ নূতনত্বের পথে সে বিকশিত, বিলসিত হতে হতে চলে

এগিয়ে। ফেলে আসা জীবনের যে স্মৃতি ধরে আপনি যে স্থানে আছেন দাঁড়িয়ে বাবা—সে স্থান, কাল, পাত্র বর্তমানের বুকে আর নেই। পরিবর্তনের স্রোত-ধারায় ভেসে গেছে সে চলে অজানা অতীতের কোন এক অতল তলে। বহুকাল আগে। যে হন্তারক রসিক চৌধুরীর কথা ভাবছেন আপনি সেও তার আর সেই জীবনে নেই বাবা।

"—নেই।" যেন চমকে উঠলেন বাবা, "—নেই মানে? তাহলে কোথায় সে?"

—আছে সে এই লোকেই। তবে মনুষ্য-জন্মে সে আর নেই বাবা। উঠল বলে সতী,—ত্রিশূলের খোঁচায় আপনাকে হত্যা করার মহাপাপে দীর্ঘদিন অসহ্য শূল-রোগের যন্ত্রণা ভোগ করে হয়েছে তার রসিক নাগর জীবনের অবসান। তারপর তাকে তার মানব জীবনের কু-প্রবৃত্তি, হীন প্রকৃতি, নীচ স্বভাব ও বদ চরিত্রের জন্য ঘুরতে হয়েছে নানা জীবন। ওই রূপ স্বভাব-প্রকৃতির প্রাণী হয়ে জীব রূপে জন্ম নিয়ে।

প্রসঙ্গক্রমে লাগল বলতে সতী মৃত্যুর পর রসিক নাগরের ওইরূপ নানা জীবাবর্তে পড়ার কাহিনী। প্রথমে নাকি তাকে ক্রুরমতি ও খল স্বভাবের জন্য জন্ম নিতে হয় সাপ রূপে। মায়ার টানে থাকে সে চৌধুরী বাড়ীতেই। সে বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরার ফলে একদিন চাকরদের হাতে পড়ে হয় তার মৃত্যু। মৃত্যুর পর আবার তাকে জন্ম নিতে হয় তার ক্রোধ পরায়ণ প্রকৃতির জন্য মহিষরূপে। সেই মায়ার টানেই আসে সে তার সেই চৌধুরী পরিবারেই। বাগানের পাঁচন বাড়ির মারের জ্বালায় ছুটতে গিয়ে সে হঠাৎ গর্ত্তে পড়ে হাড়গোড় ভাঙ্গিয়ে করে মৃত্যুবরণ। তারপর নাকি তাকে কাম-প্রবৃত্তির জন্য নিতে হয় জন্ম ছাগলরূপে। পাঁঠা-ছাগলের পাট চুকিয়ে দেয় তার চৌধুরী বাড়ীরই পুরোহিত। মানতরক্ষায় কালীবাড়ীতে তাকে বলিদান দিয়ে। এরপর মানব জীবনের লম্পট স্বভাবের জন্য হয় তাকে নিতে জন্ম গোরুরূপে। চৌধুরী বাড়ীরই ষাঁড় হয়ে আসে সে। সে ষাঁড়ের একদিন বোঝাই গাড়ী সমেত মুনিসের হেলে বাড়ির গুঁতোর চোটে ছুটতে গিয়ে আচমকা এক খাদে পড়ে হয় মৃত্যু। বর্তমানে আছে নাকি সে বানর হয়ে। খুব ভদ্র বানর। থাকে মায়ার টানেই চৌধুরী বাড়ীর খিড়কি পাশের পুরানো এক তেঁতুল গাছের মাথায়। কোন দৌরাত্মি করে না। তাই চৌধুরী বাড়ীর নোকর-চাকর, মুন্সি মান্দারও বিরক্ত করে না তাকে। ক্ষিদে পেলেই নেমে আসে সে চৌদুরী বাড়ীর বারান্দায়। পাকা মাথা চৌধুরী গিন্নি মালতী দেবীর নাকি বানরটার প্রতি খুব টান। বানরটাও তেমনি তার বশ। মালতী দেবী হাতে তুলে ভাত, রুটি, ফল মূল, আনাজ তরকারি যা দেন তাই খেয়ে বানরটা আবার উঠে যায় তার সেই আস্থানায় অর্থাৎ বাড়ীর পাশের সেই বুড়ো তেঁতুল গাছটার মাথায়। সেখান থেকে সে তাকিয়ে থাকে চৌধুরী বাড়ীর দিকে। নজরটা তার সব সময় থাকে পড়ে মালতী দেবীর উপর।

"—কেন?" জিজ্ঞেস করতেই ভূতনাথ বলে উঠল সতী তাকে সে এক অতি আশ্চর্য্যের কথা। এই মালতী দেবীই হচ্ছেন নাকি ওই বুড়ো বাঁদরটাব স্ত্রী। অর্থাৎ তার সেই রসিক নাগর জীবনের ধর্ম-পত্নী। শুনে কথাটা আশ্চর্য্যান্বিত শুধু ভূতনাথই হল না, হল বিস্ময়ান্বিত নিশ্চুপ হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় শুনে যাওয়া ভীষ্মদেববাবুর সূক্ষ্ম সাধু সত্তাটাও। উঠল ফুটে মুখে তার কৌতূহলের স্বর—মালতী দেবী! মানে, এ কোন মালতী দেবী?

"—এ আপনার সেই মালতী দেবী বাবা, বলে উঠল সতী, —যাকে আপনি ওই রসিক নাগর চৌধুরীরই হাত থেকে করেছিলেন একবার উদ্ধার। করলে স্মরণ জাগবে উঠে মনে আপনার সেদিনের স্মৃতি। পড়ন্ত বেলার প্রণাম সেরে আপনাকে যাচ্ছিল মালতী আশ্রম থেকে ফিরে তার মেশোমশায়ের বাড়ী বাবুগঞ্জে। গঙ্গেশ্বরীর উপর পাড় থেকে দেখেই রসিক বাবু নেমে এসে তাকে আগলাল পথে। করল পাকড়াও। খবর পেয়ে আশ্রম থেকে ত্রিশূল হাতে ছুটে এসে করলেন তাকে তার কবল থেকে মুক্ত। রেগে আপনি বৈদ্যনাথ চৌধুরীর বৈঠকখানায় গিয়ে শুনালেন তাকে তার ছেলের কু-কীর্ত্তি। তারপর .....

"—পড়েছে মা মনে আমার সেদিনের সব কথা।" উঠল বলে সেই সূক্ষ্মদেহী সাধু সত্তা, —কিন্তু মা, বিস্ময়ে যেমনি ফেলছে ব্যাপারটা তেমনি করছে আশ্চর্য্য আমাকে। শেষ পর্য্যন্ত ওই লম্পটটার সঙ্গে মালতীর বিয়ে হল কি করে? এত কাণ্ডের পর তারা বিবাহ বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ হয়েছিল কি ভাবে?

"—হয়েছিল বাবা। এবং সেটা আপনার দেহত্যাগের পর।" বলে উঠল সতী, —তাদের এ অসম্ভব

সম্ভব হয়েছিল আপনারই সেদিন বৈদ্যনাথ বাবুকে তার ছেলে রসিক নাগরের মালতীর প্রতি অসদাচারণ করার অপমানের ফলে। এবং ত্বরান্বিত করেছিল তাদের পরিণয়টাকে আপনার ওভাবে হঠাৎ মরে যাওয়াটা।

ব্যাপারটা হয়েছিল কি,—চৌধুরী বাবুরা যতই সাধুর সে মৃত্যুটা তার আশ্রমের অর্থ অপহরণ করে বেপাত্তা হয়ে যাওয়ার মিথ্যা কাহিনী বলে প্রচার করুক না কেন, —অঞ্চলের কেও তা বিশ্বাস করে নি। তাই চৌধুরী বাবুদের প্রতি একটা সন্দেহ, চাপা রাগ, ঘৃণা ও ক্ষোভ জনমানসে আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। উঠছিল একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া গুঞ্জনের আকার নিয়ে। এ সমস্তের হাত থেকে বৈদ্যনাথবাবু চৌধুরী বংশের মান বাঁচাতে, তার কুলকে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করতে, বাপ ঠাকুরদা'র মর্য্যাদা টিকিয়ে রাখতে ও ছেলের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি ঢাকাতে দিয়েছিলেন তিনি বিয়ে ওই মালতীরই সঙ্গে। বিনা পণে—যেচে। বলতে গেলে এক প্রকার মেগেই নিয়েছিলেন তিনি মালতীকে তার বাবার কাছ থেকে পুত্রবধূ করবার জন্য। অবশ্য চিন্তাটা তিনি ঠিকই করেছিলেন বিচারে হয়নি তার ভুল।

কারণ এই মালতী দেবীই তার চরিত্রের বলে, সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তার শক্তিতে এনেছিলেন নাকি রসিক নাগরের জীবনে পরিবর্তন। শক্ত হাতে তিনি স্বামীর জীবনের হালটা ধরে চালিয়ে ছিলেন তাকে সৎ পথে, শুদ্ধাচার ও পবিত্র-পরায়ণতার দিকে। বলতে গেলে, ইতিপূর্বেজানা রসিক নাগরের স্বভাবচরিত্রের সংশোধনের ব্রত নিয়েই এসেছিলেন তিনি তার সংসারে। এবং অসৎ সংসর্গসহ সর্বদোষ মুক্ত করে স্বামীকে তিনি জীবনে করেছিলেন সৎ ও চরিত্রবান। কিন্তু কথায় বলে না— পাপ বাপকেও ছাড়ে না। তাই ছাড়েনি রসিক নাগরকেও। ফলে মৃত্যু হল তার সেই সাধুর পেটে মারা ত্রিশূলের খোঁচা ব্যুমেরাং হয়ে তার পেটে শূলের ব্যামো রূপে এসে।

কিন্তু কর্মফল ভোগ যাই হোক, রসিক সত্তার উপর সতী সাবিত্রী পতিব্রতার টান, সে টানকে তো আর রোধ করবার বা বাধা দেবার কারো ক্ষমতা নেই। তাই পতিব্রতা মালতীর আকর্ষণে রসিক নাগরকে তার জন্মে-জন্মে বিভিন্ন রূপে আসতে হতে লাগল তারই কাছে। চৌধুরী বাড়ীরই গৃহ-সর্প, মহিষ-ছাগল-গরু-বানর হয়ে পরস্পরের অজান্তে, অজ্ঞাতে ও পূর্ব সম্পর্কবিস্মৃত হয়ে। সতী নারীব জীবন কামনা—এই জন্মেই যেন তার মানব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এবং মৃত্যুব পর সে যেন স্বামীর আত্মার সঙ্গে মিশে এক সঙ্গে উর্দ্ধগতি লাভ করে। এই জন্যই মালতী দেবীর জীবন-ভর নানা বার-ব্রত সেবা পূজা, ধর্ম-কর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন। নব্বই বছরের বুড়ী হয়েও এমন একজন সাধিকার মত শিব-চতুর্দ্দশী, সাবিত্রী, মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি ব্রত উপবাস পরম নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে করে চলেছে সে পালন যে দেখলে সবাই হয় বিস্মিত। বয়সের ভার জীবনের তার এসব দেব-কর্মে কোন শৈথিল্য, গাফিলতি বা অনীহা আনতে পারে নি। বলতে গেলে তারই শুভ-কর্ম ও পুণ্যের ফলে রসিক নাগরের বিভিন্ন জন্ম জীবনের ভোগ ক্ষণিকে সমাপ্ত হয়ে ক্রমশঃ পাপস্খালন করে সত্তাকেতার যাচ্ছে নিয়ে ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বগতির পথে। কাক -ভূষণ্ডি যেমন্ ভগবানের নর-বিগ্রহ রাম-রূপের সঙ্গে মিলবার জন্য মুনির অভিশাপকে দ্রুত গতিতে বিভিন্ন জীব জীবনে ক্ষণিক জন্ম নিয়ে খণ্ডন করে এগিয়ে গেছলেন এও যেন তার ঠিক তেমনি ধারা। এ ধারা অবসান হবে তার এই বানর জীবনেই। জীবাবর্তের শেষ পর্য্যায়ে এসে তাই অপেক্ষা করে আছে সে চৌধুরী বাড়ীর তেঁতুল গাছটার মাথায়। বছর কতক পরেই নাকি মৃত্যু হবে মালতি দেবীর। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তেঁতুল গাছের আগা থেকে হঠাৎ পড়ে মরবে সেই বানর রূপী রসিক নাগর চৌধুরী। মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রীর উভয় আত্মা এক হয়ে হবে গতিবান উর্ধ্বলোকের পথে। বিস্ময়ে হয়ে হতবাক ভূতনাথ রইল দাঁড়িয়ে সতীর পাশে যেন একটা খোদাই করা মূর্ত্তির মত। শুনে ওসব সতীর কথা সাধু সত্তার মুখে পর্য্যন্ত উঠল ফুটে পরম বিস্ময়ের ছাপ। অবাক হওয়া স্বরে তিনি জিজ্ঞেস করে উঠলেন। সতীকে,—তুমি কে মা? কোন্ শক্তিতে সত্তার এমন ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান অবগত হলে তুমি?

—এসব কথা ইচ্ছা করলে আপনিও জানতে পারবেন বাবা। কারণ একই শক্তি আপনার আমার মধ্যে আছেন বিরাজমান হয়ে। তফাৎ শুধু আপনার মধ্যে সে শক্তি আছেন সুপ্ত অবস্থায় আর আমার মধ্যে আছেন জাগ্রত রূপে। শক্তি স্বরে নম্র মুখে লাগল যেতে বলে সতী,—একই জলধির বুকে আমরা সবাই উঠা নামা তরঙ্গ বাবা। এ জলধির যেখানেই যেমন বুদবুদ উঠুক, ফুটুক ফাটুক মিশুক অঙ্গে তার হিন্দোল কি তার অংশে আন্দোলিত না হয়ে পারে থাকতে কখনও বাবা? সব ঢেও-য়েরই স্পর্শ লাগে তার সর্ব্বাঙ্গে। মন-জলধির

আপনি আমি তেমনই তো অঙ্গ-স্বরূপ বাবা। সুতরাং বুকের তার কোন আঁচড়ই অজানা হয়ে থাকতে পারে না আমাদের।

—কেন তবে এসব কথা জানতে পারিনি আমি?

—পারেন নি জানতে কারণ জগৎ-জীবনের ক্ষত্রিয় জন্মজাত ভাব, স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছেন আপনি আপনার মনের সঙ্গে এই পরলোকে। উত্তেজনা, ক্রোশ প্রতিশোধ স্পৃহা সত্তাকে আপনার আচ্ছন্ন করে রেখেছে বাবা। আর এ আচ্ছন্ন করার সুযোগ পেয়েছে সেই শনিবার, সপ্তমী তিথি, বিশাখা নক্ষত্রে অর্থাৎ ত্রিপুষ্কার যোগে দুষ্ট আপনার মৃত্যু। তবে মৃত্যুকালে মনে আপনার ঈশ্বর চিন্তন থাকলে এ যোগ-দোষ স্পর্শ করতে পারত না আপনাকে। পারত না কখনও আপনাকে ক্ষত্রিয় সুলভ মোহ সত্তাকে আপনার এমনিভাবে আড়ষ্ট করে রাখতে যদি মৃত্যুর সময় সাধু সুলভ ইষ্ট স্মরণ বা ভগবান নির্ভরতা হত জাগ্রত আপনার মনে। সাধু জীবনের সাধন ভজন ভুলে আপনি তখন বড় বেশী অহমিকা গ্রস্থ হয়ে গেছলেন বাবা। গেছলেন হয়ে অত্যন্ত উদগ্রীব কুলবধূর মান-সম্ভ্রম ও ইজ্জত রক্ষার চিন্তায়।

"—তোমার কথা ঠিক মা।" বলে উঠলেন সাধুবাবা,—সাধু হয়েও আমি উত্তেজনার মুখে গেছলাম ভুলে যে স্বয়ং ভগবানই কৌরব সভায় দ্রৌপদির লজ্জা-সম্ভ্রম রক্ষা করেছিলেন। সতীর পতি শিবই যে একমাত্র সতীদের সতীত্ব রক্ষা করতে সমর্থ সে চিন্তাটা আমার গুলিয়ে গেছল তখন মন থেকে ওই পাষণ্ড রসিকবাবুটার প্রতি রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে ও অপমানে। মৃত্যুর পরও সে ইষ্ট চিন্তন, স্মরণ মনন নিধিধ্যাসন ও নির্ভরতার চিন্তা আসেনি তখন আমার মনে। শুধু কুলবধূকে আমার রক্ষা করতে না পারার যন্ত্রণা, অনুশোচনা দগ্ধ করছে প্রতিনিয়িত আমার অন্তরকে। তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মনে নিয়ে রাগ, ঝড়ের মত ছুটে বেড়াচ্ছি আমি এই সূক্ষ্ম স্তরে।

"—ওসব চিন্তা মন থেকে আপনার মুছে ফেলুন বাবা, বলে উঠল সতী,—ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রও আপনার মত ঘরসংসার রাজ-রাজত্ব ছেড়ে সাধকের জীবনে এসেছিলেন। ঋষি হয়েছিলেন তিনি কিন্তু ব্রহ্মর্ষি হতে পারেন নি। পারেন নি কারণ তার মনের মধ্যে ক্ষত্রিয় সুলভ ওমনি রাগ, হিংসা, আক্রোশের আগুন ছিল বলে। যখন তিনি বশিষ্টের ক্ষমা-গুণে নিজ সত্তাকে করলেন ভূষিত, বশিষ্টের প্রতি রাগ-হিংসা-দ্বেষ-আক্রোশ সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে তার মত হলেন যখন ব্রহ্ম-মনা তখনই তিনি ঋষি থেকে হতে পারলেন ব্রহ্মর্ষি। আপনাকেও সেই ব্রহ্মর্ষি হতে হবে বাবা। ক্ষোভ অভিমানের আবরণ থেকে মুক্ত করে সত্তাকে আপনার ক্ষমা গুণে করতে হবে ভূষিত। তাই বলছি বাবা করুন ক্ষমা আপনি ওই রসিকসত্তাকে। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় চালিত হচ্ছে মনে রেখে ক্ষমার দৃষ্টিতেই দেখুন আপনি আপনার ফেলে আসা জীবনের সমস্ত শত্রু সত্তা ও বিরাগ ভাজনদের। সূক্ষ্ম ভূমির এই মনোলোকই তো মন গঠনের আসল ক্ষেত্র বাবা। এলোকে এসে সত্তা হঠাৎ জীবনের কর্মফল ভোগ শেষ করে, ফেলে আসা জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মনকে, শুদ্ধ-সত্ত্ব ও পবিত্র করে আবার ভূঃলোকে যায়। যায় পরম লোকে যাবার জন্য সাধনা করতে। সত্তাটাকে তার সুকর্ম্ম ও সদাচারের মাধ্যম পরামুক্তির জন্য উপযুক্ত করতে। সেভাবে আপনিও বাবা রাগ অভিমান বর্জন করে সত্তাটাকে আপনার সে মানসিকতায় মর্ত্তলোকের এই ব্রাহ্ম্য-ভূমিতে পুষ্ট করুন।

—সবই বুঝছি মা। তবু না জানি কেন আমাব সেই শিবানী বধূ মাতার করুণ আবেদন ভরা মুখটা স্মৃতিতে আমার জেগে উঠে মনটাকে বড় তোলপাড় কবে দেয়। বড় আশা নিয়ে মা শিবানী এসেছিল আমার কাছে। কিন্তু এমন হতভাগ্য শ্বশুর হয়েছিলাম আমি তার যে জীবনে তো আমি তাকে শান্তি দিতে পারিই নি এমনকি আমার সামনে লুণ্ঠিত ইজ্জতটাও তার রক্ষা করতে সমর্থ হইনি।

"—সমর্থ আপনি হয়েছিলেন বাবা।" বলে উঠল সতী,—"আপনার তীব্র ইচ্ছা শক্তি ও আশীর্বাদ সেদিন রক্ষা করেছিল আপনার কুলবধূর মান ইজ্জত। বরং অনুশোচনার আগুনে সেই দগ্ধ হয়েছিল জীবনে ওই মুর্মূষু অবস্থা থেকে আপনাকে সে রক্ষা করতে পারেনি বলে। তার মামার তাড়ার তাগিদে ও পীড়া পীড়িতে সেদিন সেই রাত্রেই কুলবধূকে আপনার বংশের মান ইজ্জত নিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হতে হয়েছিল আপনার বাড়ী। সসম্মানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সে আপনার স্ত্রী ও পুত্রের মাঝে। কিন্তু আপনার নিষেধ এমন মূক করে রেখেছিল

তাকে যে, কোন কথাই সে আপনার পারেনি এসে বলতে তার স্বামী, শাশুড়ী, এমনকি নিজের মায়ের কাছেও। আপনার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে আশ্রমে আসার খুবই ইচ্ছা হয়েছিল তার। কিন্তু বেরুবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই বল্লমপুর থেকে মামা এসে তার দিল সে যাত্রা তাদের বানচাল করে। জানাল সে চৌধুরীবাবুদের রটানো সেই মিথ্যা গুজবটা। সাধুবাবা মন্দিরের জন্য আদায় করা সমস্ত টাকাকড়ি ঝাগিয়ে নিয়ে নাকি হয়েছেন উধাও। গেছেন ভেগে সেই গুণধর সাধু অঞ্চলের লোকগুলোকে সব উল্লু বানাবার জন্য নিজের হাতে আশ্রমে তার আগুন লাগিয়ে। এবং রাত্রেবেলায় সকলের চোখে ধূলো দিয়ে। পুলিশ নাকি খুঁজছে সেই নিরুদ্দেশ সাধুবাবাকে। খানাতল্লাসী করছে তার ভক্ত শিষ্যদের বাড়ী। সুতরাং এ সময় নাকি শিবানীর সেখানে যাওয়া উচিত নয়। কারণ গেলেই পুলিশ বাবার সেই উধাও হয়ে যাওয়া সন্ধ্যায় শিবানীর আশ্রমে যাওয়ার অজুহাতে ধরবে তাকে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাবে থানায়। করবে হয়ত নাস্তানাবুদ। কি দরকার সেখানে গিয়ে উটকো ঝামেলায় পড়ে বিপদ ডেকে আনার। পুলিশ হল ঘেয়ো মাছির জাত।

যায়নি তাই আর শিবানী। না গেলেও হাঁরিয়ে যাওয়া শ্বশুরকে সাধু রূপে খুঁজে পাওয়ার কথাটা স্বামী শাশুড়ীকে বলতে না পারার ব্যথায় মনে মনে গুমরে মরতে লাগল সে। অভয়ার বিয়ের ইচ্ছাও আর পূরণ হল না তার। শেষে কালরূপে তার এল রক্তামাশায়। সেই রোগেই শেষ করল তার জীবনের আয়ু।

সূক্ষ্মাত্মাদেরও দীর্ঘশ্বাস পড়ে। পড়ল তাই সেই সাধুসত্তার বধূমাতার তার শেষ পরিণতি শুনে যেন বুকফাটা একটা দীর্ঘশ্বাস। কিছুক্ষণ যেন শোক স্তব্ধ হয়ে রইল দাঁড়িয়ে সেই ত্রিশূল হস্তধারী জটাধারী সন্ন্যাসী। তার পর মুখে তার ফুটে উঠল স্বর। বজ্র গম্ভীর, দেমাক ভরা নয়—ভক্তিনম্র শ্রদ্ধায় ভরা। বিস্ময় বিহ্বল আবেগ ভরা। তাকিয়ে সতীর মুখটার দিকে উঠলেন তিনি বলে—তুমি তো সামান্য সত্তা নও মা। সাধারণ সত্তারা এমন সবজান্তা তো হতে পারে না। একমাত্র উচ্চাত্মারাই পারেন সকলের সব মনের কথা জানতে, আত্মার এভাবে জন্ম-রূপান্তর ব্যক্ত করতে। আচ্ছা মা, —তুমি কি ইহলোকেরই কোন মহান আত্মা বা পুন্য সত্তা? না উর্ধ্ব কোন স্তর থেকে আসা কোন দিব্যাত্মা? তোমার পাশে পুরুষ রূপে স্থূল দেহধারী সত্তাটিই বা কে মা? জানবার জন্য মন আমার বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মা। আপত্তি কোন না থাকলে পরিচয় দিয়ে তোমাদের কৌতূহলের আমার নিরশন করে দাও মা।

সতীও তেমনি ভক্তি নম্রস্বরে উঠল বলে সেই সাধু সত্তাকে, —এমন ভাবে কথা বলে লজ্জা সঙ্কুচিত করবেন না বাবা আমাদের। আমরা আপনারই পুত্রকন্যা। চেতন মনে যখন ভাসিয়ে উঠাতে পেরেছেন আপনি আপনার সাধু জীবনের স্মৃতি তখন স্মৃতির সাগরে সাঁতার কেটে আর একটু আপনি আপনার অতীত জীবনের দিকে যান বাবা। যান আপনার সাধু জীবনের পূর্বে সেই সংসার জীবনে। যে জীবনে ছিলেন বীরভূম জেলার হুকনোপুর গ্রামের ভীষ্মদেব সিংহ নামে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। স্মরণ করুন বাবা আপনার সেই ছোট্ট সংসারটির কথা। মনে করুন আপনার সেই স্ত্রী-পুত্রের কথা। সেই স্মৃতির টানেই বাবা পাবেন আপনি আমাদের সম্যক পরিচয়। জাগান বাবা স্মৃতিতে আপনার সেই ফেলে আসা জীবনটাকে।

"—এসেছে মা, স্মরণে আমার এসেছে সে জীবনের কথা। বলে উঠল সাধু সত্তা —হ্যাঁ স্ত্রী ছিল আমার জীবনে। নাম ছিল তার দামিনী। আর ছিল আমার একমাত্র পুত্র। নাম ছিল তার শেখর, চন্দ্রশেখর সিংহ। পড়েছে মা মনে।"

"—সে শেখর আপনার এনেছিল সংসার অমতে আপনার বিয়ে করে এক মেয়েকে।" বলে উঠল সতী,—"সে মেয়ের কথা পড়ছে আপনার মনে বাবা?

"—সেই তো আমার সতী-লক্ষ্মী মা। তার কথা তো আমার আগেই জেগেছে স্মৃতিতে।" পারিনি মা। অন্ধ অহঙ্কারে, সর্বনাশা জেদে সে মাকেআমি আমার গৃহ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার আগেই বিসর্জন দিয়ে এসেছিলাম। আমাদের নিয়ে সংসারটা তার পূর্ণ করার সদিচ্ছাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, অভিশাপ দিয়ে তাকে চলে এসেছিলাম আমি। কুপুত্র হলেও কুমাতা তো কখনও হয় না। তাই মা আমার সে আঘাতের ব্যথা সহ্য করেও সন্তান হারা গাভীর মত খুঁজে বেড়িয়েছিল আমাকে। এধার ওধার। শেষে এসেছিল ছুটে এই সাধুর ডাঙ্গায় আমার কাছে। মায়ের সে আকুতি-ভরা প্রার্থনা পূর্ণ করতে ভেবেছিলাম মনে যাব ফিরে একবার সংসারে। করেছিলাম মনস্থ

দুঃখিনী মায়ের কথা রাখবার। কিন্তু চৌধুরী বংশের ওই কুলাঙ্গার নরাধম রসিক চৌধুরী বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে নিতে এল মাকে আমার। তার লালসার শিকার করবার জন্য। এই নদীর বুকে, ফেরার পথে এমনি একদিন শনিবারের সপ্তমী তিথির রাতে।" বলতে বলতে ক্রোধোদীপ্ত হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর গর্জে উঠলেন তিনি,—অকালে এই অপগণ্ডটার হাতে মৃত্যুর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না আমি। আক্রোশের আগুন প্রতিশোধ স্পৃহার লেলিহান শিখা নিয়ে........

"—শান্ত হোন বাবা। উত্তেজনার বিষ বাষ্প তাহলে আবার আচ্ছন্ন করে ফেলবে আপনার সৌম্য ভাবটাকে।" কথার মাঝে থামিয়ে তাকে সতী উঠল বলে মধুর স্বরে—"আপনার সেই সংসার ছেড়ে আসার বিশেষ মুহূর্ত্তটা করুন না বাবা স্মরণ। তাকান না আমাদের দিকে সেই বিশেষ মুহূর্ত্তের স্মৃতি নিয়ে। সে চোখের দৃষ্টিতে আমাদের দেখার একটু চেষ্টা করুন বাবা।

সতীর মধু-মাখা কথার স্পর্শ লেগে যেন গেল নিভে সেই সাধু-সত্তার পুনঃ উঠা উত্তেজনার আগুন। হল শান্ত সে। উগ্রতার পরিবর্তে উঠল ফুটে সত্তায় তার তেমনি আবার ক্ষমা সুন্দর সৌম্যভাব। কিন্তু তাকাতেই সতীর দিকে কেমন যেন দেখা গেল তার একটা আঁৎকে উঠার ভাব। ভাব দেখা গেল চমকানির তার ভূতনাথের দিকেও তাকাতে। চোখের তারা দুটো তার অবাক বিস্ময়ে বার বার ঘুরতে ফিরতে লাগল সতী-ভূতনাথ ও ভূতনাথ সতীর উপর। শেষে স্থির নিবদ্ধ হল তার নেত্র যুগল উভয়ের মুখ মণ্ডলে। হল পলকহীন পরম বিস্ময়ে। এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাদের দিকে উঠল বলে সে কৌতূহলী স্বরে, একি দেখছি মা। তোমার মুখে সেই আমার ছেড়ে আসা গৃহ বধু ও ফেলে-আসা কুল লক্ষ্মীর ছাপ। দেখছি আমি তোমার পাশে দাঁড়ান পুরুষ মূর্ত্তিটার উপর আমার সেই ছেড়ে আসা ছেলে শেখরের ছবি। সেই মুখ সেই চোখ। মুখে আমাকে সেই যেতে নিষেধ করার কাতরতা—চোখে আমাকে সেই অনুরোধ করার করুন চাওনি। এমনি ভাবে নব বধূ শিবানীকে নিয়ে শেখর আমার দাঁড়িয়েছিল এসে সম্মুখে। রাধা কৃষ্ণের মত। আমাকে প্রণাম করতে। বল মা বল চোখ দুটো আমার ঠিক দেখছে তো মা? তুমিই কি আমার সেই গৃহ-লক্ষ্মী শিবানী ও তোমার পাশে দাঁড়ানো এই আমার সেই শেখর?

"—হ্যাঁ বাবা।" বলে উঠল সতী,—আমিই সেই শিবানী এবং আমার পাশে দাঁড়িয়ে আপনারই সেই ছেলে শেখর। যোগীর দৃষ্টিতে আপনি আপনার সেই ফেলে আসা অতীতকে সত্যই দেখছেন বাবা। তবে আমরা আপনার সে জীবনে আর নেই। রক্তামাশয়ে মরে আমি শিবানীর জীবন ছেড়ে নিয়েছিলাম জন্ম শাশ্বতী নামে এই সতীরূপে ভূতগ্রামে, রাখহরি চাটুজ্জের বাড়ীতে। আর শেখর আপনার সে জীবন করেছিল ত্যাগ কালাজ্বরে। আমারই পরে। বর্তমান জীবনে ভূতগ্রামের সে বলাই বাড়ুজ্জের ছেলে। নাম এখন শেখরদার শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সতীর কথার ঝট্‌কা লেগে যেন চমকে উঠল ভূতনাথ। হল সে যেমনি আশ্চর্য্য তেমনি স্তম্ভিত। বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে সতীর দিকে কৌতূহলী চোখে বিহ্বল চিত্তে তাকাতেই ওমনি বলে উঠল সতী,—হ্যাঁ ভূতুদা এর আগের জন্মে তুমি ছিলে এই সাধু সত্ত্ব ভীষ্মদেব সিংহেরই ছেলে চন্দ্রেশেখর সিংহ এবং আমিই ছিলাম তোমার সেই ভালবেসে বিয়ে করা স্ত্রী শিবানী। পবিত্র প্রেম, পরস্পর পরস্পরর প্রতি শাশ্বত আকর্ষণ, আন্তরিক ভালবাসা কোন জন্মেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হতে দেয়নি ভূতুদা। স্থান-কাল পিতা-মাতা পরস্পর ভিন্ন হলেও আমাদের জন্ম জন্মান্তর একই টানে মিলেছি আমরা দুজনে। শিবানী শেখরের পূর্ব জন্মে ছিলাম আমরা বিহারে বৌলিয়া জেলার রোটাস পর্বতে। পাহাড়ী ছেলে মেয়ে হয়ে। আহারীটোলা গ্রামে জ্বালা প্রসাদের ছেলে ছিলে তুমি। নাম ছিল তোমার শঙ্কর। আর আমি ছিলাম কুসুম টিকরীর গেঁয়ো গঙ্গারাম এক আহীর গোয়ালার মেয়ে উমা। সে জন্মের জীবন দৃশ্য দেখেছো তো তুমি অবচেতন মনের স্মৃতির টানে তোমার বন্ধু ইটভাটায়। পড়ন্ত বিকালে গন্ধেশ্বরী নদীর বুকে গ্রাম ফিরতি মহিষ রাখালদের মষের পিঠে চড়ে বাড়ী ফিরে যাবার দৃশ্যে। তারও আগের জন্মে ছিলাম আমরা এই প্রেমিক প্রেমিকা রূপেই। তবে জন্ম হয়েছিল তখন আমাদের ভিন্ন গ্রামে পরস্পর বিপরীত ধর্মী জাতে, কুলে ও বংশে। আমি হয়েছিলাম চণ্ডীপুরের কুলীন ব্রাহ্মণ বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে গৌরী। আর তুমি হয়েছিলে বারুইপুরের এক অন্তজ সম্প্রদায়ের ছেলে শিবপ্রসাদ মণ্ডল। জাত-ধর্মের

ভিন্নতায় সে জন্মে যেমন শিব-গৌরীর মিলন হয়নি। পরজন্মেও তেমনি পিতা-মাতার অভিশাপে উমা-শঙ্করের বিবাহ বন্ধন জীবনে আসেনি। সতী-ভূতনাথ পর্য্যায়ে সে বন্ধন স্থাপিত হলেও অন্যান্য জন্মের মত বিরহ এসে এ জীবনের প্রেমকেও দৈহিক মিলনে দিয়েছিল বাধা। বিরহের আগুনে পুড়ে প্রেম আমাদের জন্ম-জন্মান্তর পরিশুদ্ধ হয়ে এসেছে ভূতুদা। এসেছে হয়ে মাধুর্য্য মণ্ডিত খাদবিহীন খাঁটিসোনা। দৈহিক পঙ্কিল কামনা বাসনা ভালবাসাকে ঠুকরিয়ে আমাদের আবিলতা যুক্ত করতে পারে নি ভূতুটা। আত্মিক আকর্ষণে শুদ্ধসত্ত্ব একনিষ্ঠ প্রেম অজান্তে অমাদের নিয়ে গেছে পরস্পরকে সাধক-সাধিকার পথে। অন্ত সলিলা ফল্গুধারার মত।

"—আচ্ছা মা," হঠাৎ বলে উঠল ভীষ্মদেবের সেই সূক্ষ্ম সত্তা, —'তোমার দেহ জ্যোতিকণায় পূর্ণ অথচ শেখরের দেহ ক্ষিতিপ্রধান কেন?

—আপনার শেখর এখনও ভূতনাথের জীবনে জড় দেহেই আছে বাবা। তাই অন্নময় গড়া তার বাস্তব দেহ ক্ষিতিপ্রধান। কিন্তু আপনার আশীর্বাদে আমি মরদেহ ত্যাগ করে মহঃ-লোকে আছি বাবা। তাই বিজ্ঞানময় কোষে গড়া আমার এই সূক্ষ্ম দেহ জ্যোতি প্রধান। মহৎ আধার আপনার এই শেখর- ভূতনাথ। আপনি-আমি উভয়ে এখন মহৎভাবে ভাবিত হয়ে আছি বাবা। তাই আমাদের সকলের পক্ষে এখন পরস্পরের দৃশ্য হয়ে অবস্থান কবে থাকা সম্ভব হচ্ছে বাবা। নইলে যেতাম মিলিয়ে।

—মহৎ সত্তা বলে আর আমাকে লজ্জা দিওনা মা। অজ্ঞান আমি তাই তোমাদের ইহজীবনে চিনতে পারি নি। অবোধ আমি তাই তোমাদের পবিত্র স্বামী-স্ত্রীর জীবনকে দিয়ে এসেছি অভিশাপ। আমার জেদের মূর্খতায়, এক গুঁয়েমির গোঁয়ার্তুমিতে বলি দিয়েছি আমি তোমাদের সাংসারিক সুখ, পারিবারিক শান্তি, জীবনের সাধ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্খা সমস্ত কিছু। আমার এ অপরাধের যে ক্ষমা নেই মা। তোমার মত দেবীর জীবনকে আমি বিপর্য্যয়ে ফেলে ——

"মনটাকে আর ক্ষুব্ধ করবেন না বাবা।" বলে ডঠল সতী—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনার সে অভিশাপ তিনি আমার উপব দিয়েই বিগত জীবনে শেষ করেছেন। নইলে আপনার ওই ক্ষোভ-অভিমান, রাগ-অভিশাপ বংশের আর কারো উপর গিয়ে পড়ত। মনের ভাল-মন্দ, কুভাব-সুভাব, সৎ-চিন্তা অসৎ চিন্তা কোন কিছুই তো নষ্ট হয় না বাবা। জগতের বায়ুকণাকে আশ্রয় করে তারা ঘুরে বেড়ায়। সম-মনা বা সম-ভাবের ভাবুক পেলে সেগুলো আকর্ষিত হয় এবং সেভাবে তার জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। তাই সাধুজন সব সময়েই মনে সৎচিন্তা সু-ভাব নিয়ে থাকেন বাবা। থাকতে দেন উপদেশ সকলকে ঈর্ষা হিংসা বর্জিত হয়ে। মনে পবিত্র, অন্তরে শুদ্ধ ও হৃদয়ে জগৎ কল্যাণ ভাব নিয়ে। যাতে তার কু-ভাবনা বিচ্ছুরিত অনুকণা উপরের বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে না রাখতে পারে।

বিস্ময়ে সেই ভীষ্মদেব সত্তা রইল তাকিয়ে সতীর মুখটার দিকে। উঠল বলে তারপর সে অনুতাপের সুরে—জীবনে তোমাকে আমার কষ্ট দেওয়ার অনুশোচনা যে ভুলবার নয় মা। তোমাকে বিনা দোষে দিয়ে আসা অভিশাপের যাতনা যে আমাকে দগ্ধ করছে মনে-প্রাণে।

"—অভিশাপ তো আপনার আমি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিয়েছিলাম বাবা। আশীর্বাদ ভেবেই তা আমি নিয়ে এসেছিলাম আমার পরবর্তী জীবনে। সুতরাং এতে আপনি অযথা মনকে আপনার অনুতাপ ও অনুশোচনার ভারে ভারাক্রান্ত করবেন না বাবা।" বলে উঠল সতী, —বরং মানসিকভাবে তৃপ্তি পেয়েছি আমি সতীর জীবনে আপনার অভিশাপের মর্য্যাদা রাখতে পেরেছিলাম বলে। সেজন্য আমার ক্ষোভ নেই বাবা। ভাগ্য দেবতাকে আমার ধন্যবাদ যে তিনি আমার কাটিয়ে আসা জীবনেই আপনার অভিশাপকে ভোগ করিয়ে সত্তাকে আমার মুক্ত করিয়েছেন। সতী জীবনে আপনার সে সত্য পালিত না হলে আবার হয়ত আমাকে জন্ম-জীবনে নামতে হত বাবা। আপনার আশীর্বাদে তার থেকে আমি অব্যাহতি পেয়েছি।

"—কি ভাবে মা?" জিজ্ঞেস করে উঠল ভীষ্মদেব সত্তা।

"—গত জীবনে আপনার কথা মত কুরূপা হয়েই আমার জন্ম হয়েছিল বাবা।" বলতে লাগল সতী, —মায়ের স্নেহ ভালবাসা পাই নি আমি। পাইনি আমি জীবনে বাবার আদর যত্নও। ধন-সম্পত্তি থেকেও জীবনে আমি বঞ্চিত হয়েছিলাম বাবা। কিন্তু পরম ধন জন্ম-জন্মান্তরের স্বামী আপনার চন্দ্র শেখরকে পেয়েছিলাম

আমি জীবনে পতি রূপে। এই ভূতুদা জীবনে আমাকে শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও পত্নী হিসাবে গ্রহণ করে আমার পূর্বাপর জন্মের সাধ পূরণ করেছিলেন বাবা। জীবনের তাই কোন দুঃখই, কোন কষ্টই, এমনকি সৎ-মায়ের লাঞ্ছনা বা বাবার অবহেলা মনে কোন আমার আঁচড় কাটতে পারেনি বাবা। দুঃখই যে জীবনের স্পর্শমনি সতী জীবনে আমি বুঝেছিলাম বাবা। দুঃখ কষ্ট না পেলে হয়ত বিশ্বনাথের সেবা পূজায় মন আমার লগ্ন হত না বাবা। বিশ্বম্ভরের প্রতি বিশ্বাসই সত্তাকে আমার সর্ব্বংসহা ও আত্মাকে আমার সর্ব্ব সুখ-ভোগ নিস্পৃহ করেছিল বাবা। মৃত্যুকালেও তার প্রতি নির্ভরতা সর্ব্ব ক্ষোভমুক্ত করেছিল আমাকে। শিব-চিন্তনে মৃত্যু আমার শিবলোকে গতিবান করেছিল সত্তাকে। মা বাবার অভিশাপ যদি আশীর্বাদ না হত বাবা তা হলে হত কি আমার এ অবস্থা লাভ?

"—তুমি মহৎ হৃদয় মা।" আবেগ জড়িত কণ্ঠে উঠল বলে সাধু"—তুমি মহাদেবী—মহাসতী মা। তাই মহাদেবের মত সংসার সাগর মন্থনের এত হলাহল পান করেছ তুমি অমৃতের মত। কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগছে আমার মনে মা—দেবস্তরের সত্তা হয়ে এই নিম্নলোকে অর্থাৎ এই ভূর্ভবর্লোকের মধ্যস্তরে রয়েছ কেন পড়ে মা?

"—আপনার ছেলে এই শেখরের জন্য বাবা।" বলে উঠল সতী,—"একলা আমি মুক্ত হতে চাইনে বাবা। যুক্ত হয়ে মুক্ত হতে চাই উভয়ে আমরা একই সঙ্গে সেই পরমাত্মার সঙ্গে। তাই মৃত্যুর পর মহোর্দ্ধলোকে না গিয়ে আপনার এই ভূতনাথরূপী শেখরের সঙ্গে আমি আত্মিক সম্বন্ধ রেখে চলেছি বাবা। চলেছি বাবা মহাদেবেরই ইচ্ছাতে অর্থাৎ শিব-শক্তিতেই। ভূতুদাও আমার জন্য জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করে এসেছে বাবা। শেষে কর্মের মাধ্যমে তার জীবিকার সন্ধানে এসেছে বাবা আপনার-থানে—এই সাধুর ডাঙ্গায়। অর্থাৎ বর্তমানের এই বাবলা ডাঙ্গায়। অবিনাশ চৌধুরীর কারখানাতে কাজ করতে।

—তাই নাকি!

"—হ্যাঁ বাবা। আশীর্বাদ করুণ আপনি যেন তার মনের ইচ্ছা পূরণ হয় এবং এই জীবনেই যেন তার জীবাবর্ত শেষ হয়।' বলে উঠল সতী—'আপনার মত আদর্শ পরায়ণ পিতার আশীর্বাদ পেলে এই জীবনেই তার জীবন-ধর্ম সার্থক হতে পারে বাবা। হয় যেন তার এই জীবনেই কাটিয়ে আসা পূর্বাপর জীবনের ও বর্তমান জনমের সমস্ত কর্মফল অর্থাৎ প্রারব্ধ ও ক্রিয়ামান কর্মের ফল-ভোগের পরিসমাপ্তি। আত্মা যেন তার সর্ববন্ধন মুক্ত হয়ে, কামনা -বাসনা শূন্য হয়ে লাভ করে উচ্চ গতি। আমি এই উদ্দেশ্যেই সত্তার সঙ্গে তার গাঁথা আছি বাবা। আছি তার শাশ্বতী হয়ে শাশ্বত লোকে যাবার জন্য তাকে উপযুক্ত করতে। উভয়ের যতে আমাদের শিবলোকে গতি হয় বাবা তার জন্যই এলোকে আমি ছায়ার মত থাকি তার সঙ্গে। অদৃশ্য হয়ে ঘুরি তার পিছু পিছু। উর্ধ্বলোকে থেকে এসে তার টানে থাকি তার কাছে কাছে।

"—তোমার মত উচ্চআত্মিক যখন আমার এই শেখরের সহায় তখন তার আত্মোদ্ধারের জন্য কোন চিন্তা নেই মা। কিন্তু কি হবে আমার মা।?' বলে উঠল সাধু।

—ভগবান আপনাকেআত্মমুক্তির শক্তি দিয়েই জীবনে পাঠিয়েছিলেন বাবা। তাই সংসারে জীবনে ছিলেন আপনি সহ্যশীল ন্যায়পরায়ণ সমব্যথী, পর-দরদী ব্যক্তি। জীবনে দুঃখকষ্ট দিয়ে ভগবান আপনার পূর্বাপর জন্মের সমস্ত কর্মফল ভোগের অবসান ঘটিয়ে চলেছিলেন বাবা। জীবনেব শেষ পরিণতি নিষ্ঠুর মৃত্যুটাও আপনার ভগবানের ইচ্ছা রূপে ধরে নেন বাবা। ধবে নেন এটা আপনার অতীতাতীত কোন জীবনের কর্মফল ভোগের পরিসমাপ্তি। ব্রহ্মচক্রে সবই অবর্তিত হচ্ছে বাবা। হচ্ছি আবর্তিত আমরা সবাই। সবই সেই ব্রহ্মেরই খেলা। ক্রোধ রূপে যিনি আপনাকে সংসার ছাড়িয়ে সাধু জীবনে নিয়ে গেছেন—তিনিই আবার নিয়ে এসেছেন আপনাকে ওই নৃশংস মৃত্যুর মাধ্যমে এই পরলোকে। সবই সেই তাঁরই লীলা ভেবে মন থেকে আপনার ঈর্ষা-হিংসা, ঘৃণা-বিদ্বেষ, আক্রোশ-অভিমান ঝেড়ে দেন ফেলে। মুক্ত করুন মনকে বাবা। বাস্তব প্রবৃত্তির আচ্ছাদনে আত্মাকে আর আবৃত্ত করে রাখবেন না। ক্রোধ-কুয়াশায় আবরণ ভেদ করে আত্মার জ্যোতিকে আপনার প্রকাশ পাবার সুযোগ দেন। চেষ্টা করুন সত্তাকে আপনার মোহ-বন্ধন থেকে মুক্ত করার।

—কি আমায় করতে হবে মা? জিজ্ঞাসা করে উঠল সেই সূক্ষ্ম-সত্তা।

ক্ষাত্রিয় মনা মনটাকে আপনার ব্রহ্মমনা করার চেষ্টা করুন বাবা। প্রতিশোধ স্পৃহার ঘোর থেকে মুক্ত করুন নিজেকে। আপনি বুঝতে পারছেন না বাবা —এই যে সত্তায় আপনি বার র ঈর্ষা, হিংসার ঝড় উঠিয়ে সাধনক্ষেত্র আপনার ওই সাধুডাঙ্গার আশ্রমে এসে কারখানার সব ভাঙ্গ-চুর করছেন। মেশিন-ঘর ইত্যাদির সব ভিত, দেয়াল ভাঙ্গছেন—এতে আপনার সেই সাধু জীবনের তপঃ লব্ধ সাধন ক্ষমতার অপচয় হচ্ছে বাবা। এমনিভাবে বার বার আপনার সাধন শক্তি ক্ষয় করে যান যদি তবে তো আর কোনকিছু করার আপনার কোন ক্ষমতাই থাকবে না বাবা। তখন ভূঃ-উর্ধ্ব স্তরের সাধারণ একটা বায়ুভূত বা তুচ্ছ একটা প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে আপনাকে। মনে থাকবে তীব্র আক্রোশের জ্বালা, জ্বলবে প্রাণ প্রতিহিংসার আগুনে দাউ দাউ করে। অথচ অতি সামান্য একটা ঘাসেরও ক্ষতি করতে পারবেন না আপনি। এ শক্তিহীন অবস্থা সেই খোঁচা-মারা অবস্থার চেয়েও আরো অসহ্য জ্বালায় যন্ত্রণাকাতর করে রাখবে আপনার সত্তাটাকে। আত্মোদ্ধার হবে আপনার ব্যাহত।

শুনে এসব কথা সাধু সত্তায় দেখা যেতে লাগল যেন ভয়ের আভাস। অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত সেই সত্তাটার দিকে তাকিয়ে সতী লাগল যেতে বলে,—ভেবে দেখুন মনে—কার উপরই বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবেন আপনি। সেই রসিক চৌধুরী, আপনি, আমি ও এই শেখরদা সবই তো সেই পরমাত্মারই অংশ। একই দেহের বিভিন্ন অংশ তার কিঅন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর সঙ্গে হিংসা বা রাগ করে থাকতে পারে? সুতরাং অযথা আপনি কেন আপনারই এক অংশের উপর আক্রোশ নিয়ে থেকে আত্মাকে আপনার কলুষিত করে রাখবেন। যা ঘটবার ঘটেছে সব ভবিতব্যেরই ইঙ্গিতে। সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই হয়েছে সব কিছু ভেবে মনকে আপনার রাগ-দ্বেষ মুক্ত রাখতে বদ্ধ পরিকর হোন বাবা।

'—সত্তাকে আমার কিভাবে সর্ব্ব কালিমামুক্ত করব বুঝতে পারছি না মা।" বলে উঠল সাধু, "—দাও বলে আমাকে কি আমার করণীয়? আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার উপায় কি বলে দাও তুমি আমাকে মা।

—আপনাকে আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে বাবা।

বলতেই সতী যেন আঁৎকে উঠলেন সাধু সত্তা। মুখে বেরুল তার চম্‌কানির সুর,— সে কি মা। জন্ম নিতে হবে মানেই তো—" বলেই তিনি শুরু করলেন শ্লোক-গাথা ঝরনার ধারার মত—

যাবজ্জনং তারন্মরণং তাবজননী জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ, কথা মিহ মানঃ তব সন্তোষ।।
দিন যামিন্যো সায়ং প্রাতঃ শিশির বসন্তো পুনরায়াতঃ।
অঙ্গং গালিতং পলিতং মুণ্ডং দন্ত বিহীনং জাতং তুণ্ডম্।।

করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং তদলিন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম—"ইত্যাদি বলতে বলতে ওমনি ফেটে পড়লেন তিনি মিনতিতে,— না মা, না। জন্ম নিতে আর বলিস না আমাকে। বলিস না আমাকে আর জীবনে নামতে মা।

—কেন বাবা?

"—জন্ম জীবনের বড় জ্বালা মা।" বলে উঠল সাধু —জগৎ জীবনে নামলেই ঘৃণা, অপমান, দম্ভ-দ্বেষ, মান-মোহ ইত্যাদি অষ্ট পাশের অক্টোপাশ বন্ধনে পড়তে হবে আমাকেআচ্ছন্ন করে রাখবে সত্তাকে আবার মায়া। শোক-দুঃখ, ভয়-ত্রাশ, নিরাশ প্রনয় আবৃত করবে আত্মাকে। কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি ষড়-রিপুরা বশ করবার চেষ্টা করবে আবার মনটাকে আমার। সুতরাং জীবনজ্বালায় পড়তে আমাকে আর বলিসনে মা।

—কিন্তু বাবা জগৎ জীবনের ভোগ ছাড়া যে প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না। বলে উঠল সতী—কামনার কালি বাসনার কাদা এখনও যে লেগে আছে আপনার সত্তায় এসব ঘুচাতে আপনাকে যেতে হবে জীবনে। মনের থেকে প্রতিহিংসার দাগ ও আক্রোশের ছাপ উঠাতে প্রেম-প্রীতি ভালবাসা নিয়ে যে নামতে হবে জনমে আপনাকে বাবা। বাস্তবে জীবনের শেওলা যে বাস্তব জীবনে গিয়ে ঘষে মেজে উঠাতে হবে বাবা। তাছাড়া কোন উপায় নেই। ঘাত-প্রতিঘাত তো এই জন্যই। আগুনে পুড়েই তো সোনাকে খাঁটি হতে হয় বাবা। সত্তাকে আপনার আঘাত খেয়েই নবীন হতে হবে জীবনে। সংসারের সহস্র বন্ধন মাঝেই লাভ করতে হবে আপনাকে মুক্তি। মায়ার মধ্যে থেকেই হতে হবে আপনাকে মায়াতীত।

সাধুসত্তা না জানি কি ভাবতে লাগল সতীর মুখ চেয়ে। প্রসঙ্গক্রমে উঠল বলে সতী তার শিবানী জীবনে মামার মুখে শোনা এক তত্ত্ব কথা। ঈশ্বর নাকি তাঁর সব সৃষ্টির শেষে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে সৃষ্টি করলেন এই মানবকে। তার মধ্যে তাঁর সমস্ত গুণ দিয়ে করলেন ভূষিত। তারপর দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, আদি সমস্ত সৃষ্টিকে ডেকে তিনি তার স্বরূপ এই মানব রূপকে বললেন প্রণাম করতে। কিন্তু ইব্লিশ বিনা প্রমাণে নাকি ঈশ্বর আদেশ মানতে চাইলেন না। অর্থাৎ তিনি যাচাই করে দেখতে চাইলেন সত্যি মানুষের মাঝে রাগ-দ্বেষ, ঈর্ষা-হিংসা বর্জিত ঈশ্বর গুণ সন্তোষ, সহনশীলতা স্নেহ-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা—স্বার্থশূন্যতা আছে কিনা। সেই থেকে ইব্লিশ হয়ে গেল শয়তান। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর-দত্ত গুণ বিকশিত হয়ে উঠলেই তাকে প্রণাম করতে হবে তাই সেই শয়তান মানুষ যাতে ঈশ্বর-ভাব সম্পন্ন হয়ে উঠতে না পারে তার জন্য তাকে ঈশ্বরের বিপরীত বদগুণ অর্থাৎ ঈর্ষা হিংসা আক্রোশ আদি কামক্রোধ লোভ ইত্যাদি রিপু দিয়ে জীবনে করতে লাগল তাকে বিপর্য্যস্ত। যাতে মানুষ প্রকৃত মানুষ না হয়। নর-পশু হয়ে থাকে। না পারে যেন সে ভগবদ্-ইচ্ছা পূরণ করতে জীবনে।

কিন্তু, গল্প শেষে বলে উঠল সতী,—শয়তানের ওপর শয়তানি চাল বানচাল করতে ভগবান তাকে দিয়েছেন এক বিশেষ প্রকার শক্তি বাবা। তা হল তার বোধ বুদ্ধি, বিবেক। এর বলে সে মনুষ্যত্বে আসীন হয়ে মন থেকে পশুত্বকে দূর করে নিয়ে আত্মচেষ্টায় নিজেকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আপনি জীবনে তাই করতে পারবেন বাবা। মানুষ নিজেকে যখন দেহ-সর্ব্বস্ব বলে ভাবে তখনই তো জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতগুলো বড় বলে মনে হয় বাবা। মন-সর্ব্বস্ব বলে ভাবলে মান-অভিমান আত্ম-অহঙ্কারের হয় সে পিণ্ড। নিজেকে আত্মা বলে ভাবলে তখন আর এসবের কোন বালাই থাকে না। দেখে সে ভয় ভালবাসা, ঘৃণা-অবহেলা, পাপ-পুণ্য সবই সেই একই আত্মার প্রতিফলন। প্রতিফলক হচ্ছে মন। মন দর্পণ নিম্নস্তরের বা অপরিষ্কার হলে বিরূপভাবে জীবনে ওসব প্রকাশ পায়। আর স্বচ্ছ বা পরিষ্কার হলে সব ব্যাপারে সে পরমাত্মার শুভ ইঙ্গিত উপলব্ধি করে সৌম্য শান্ত সদানন্দময় অবস্থায় পারে থাকতে।

'সবই তো বুঝছি মা, বলে উঠল সাধু সত্তা',—কিন্তু জগৎ সংসারে জন্ম নিতে তবু আমার বড় ভয় হয় মা।

—ভয় কি বাবা? লাগল সতী বলতে তাকে, —মা বসুমতীর কোলে গিয়ে তো অষ্টবসুরা মুনি শাপ মুক্ত হয়েছিলেন। দেবতারাও মাঝে-মধ্যে অভিশাপগ্রস্থ হলে তো তা মোচন করবার জন্য নেমে আসেন মা বসুধার কোলেই। জগৎ-জননী পরম স্নেহে তাদের শাপ-কালিমা দূর করে দিয়ে শুদ্ধ-সত্ত্ব-বুদ্ধ করে আবার পাঠান তাদের স্ব-লোকে। পৃথিবীর মায়ের কোলে অবতার হয়ে ঈশ্বর আসেন বার বার। রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ শঙ্কর হয়ে মা-মাটির বুকে বাল্য-কৈশোর-যৌব· ইত্যাদি জীবন খেলা-খেলে স্বস্থানে আবার প্রস্থান করেন। মা ছাড়া তো সন্তানের মন ময়লা, সত্তা-কালিমাকেও তেমনভাবে আর ঘুচাতে পারবে না বাবা। যান আপনি পবিত্র মা-মহীর কোলে জীবনে মহা মহীয়ান হতে।

—কিন্তু মা, বলে উঠল সেই সূক্ষ্ম সত্তা,— জীবনে নেমে যদি আমি জীবনের এ ধারনা ভুলে যাই। ইব্লিশ শয়তানের ওই মায়ার ফাঁদে পড়ে হয় যদি আমার মোহ। তাহলে তো সাধু জীবনের যোগ- তপস্যা আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে মা। তাছাড়া জীবাবর্তের ঘুরপাকে বিরূপ পরিবারে বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে যদি জন্ম নিতে হয় আমাকে তবে তো আমার সব কিছু হবে বানচাল, হবে নস্যাৎ।

—সে ভয় আপনার নেই বাবা। বলে উঠল সতী—জীবনে অর্জিত শাশ্বত ধন কখনও কারো যায় না ফেলা, হয় না ব্যর্থ বা পণ্ড। তাছাড়া বাবা আন্তরি সৎ-সংকল্প বা সৎ-ইচ্ছার হয় না, কখনও বিকাশ বা বিলুপ্তি। যেখানে যে জীবনেই যাক সে, মনের গোপন-গহন অবচেতন স্তরে থাকে সে সংগুপ্ত ও সম্পুটিত হয়ে। মহর্ষি ভরত হরিণ জন্মে গেলেও তার সাধনার স্মৃতি হয়নি বিস্মরণ বাবা। বুদ্ধ-সত্তা বিভিন্ন জন্মে নামলেও তার সৎ-ইচ্ছায় যে বিনাশ হয়নি তা তো তার জাতক-কাহিনীতেই আপনি পড়েছেন বাবা। রামায়ণ মহাভারতেও তো অবগত হয়েছেন আপনি জন্ম-জন্মান্তরের সৎ-সংকল্পের পরিপূরণের এমন অনেক কথা।

—কিন্তু মা, সামান্য সত্তা হয়ে আমার জীবনে।—

বাধা দিয়ে বাবাকে বলে উঠল সতী, — নিজেকে কখনও সামান্য ভাববেন না বাবা। জীবন সাধনার পথে আপনি যে স্তর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন সে স্তর আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে বাবা। অবচেতন মনে

আপনার সঞ্চিত সাধক জীবনের অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে আপনার ঠিক পরিণত কালেই অন্তর থেকে আপনিই স্ফুরিত হয়ে উঠবে বাবা। এ জীবনে যতদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে ছিলেন আপনি ঠিক তারপর থেকেই সাধক-জীবনের যাত্রা হবে আপনার শুরু। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র অবশ্য এক জনমেই ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ তথা ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন। আপনি এজীবনে ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করে জীবনে হবে ব্রাহ্মণ। মনকে যে ক্ষত থেকে ত্রাণ করতে পারে সেই তো ক্ষত্রিয় বাবা। সূক্ষ্মলোকের বোধে আমি জানতে পারছি কামনা-বাসনার ক্ষত থেকে মন আপনার ত্রান পেয়েছে বাবা তাই ব্রাহ্ম-মনা হয়েই জন্মাবেন আপনি। নবজীবনে আপনার এই বেদ পাঠ ধর্মনিষ্ঠা, তপস্যা, বিদ্যা-বিনয়-সমাচার, আদি-ব্রাহ্মণের নবধা কুললক্ষ্মণ হবে বিকশিত। এবং উক্ত লক্ষণেই প্রতিষ্ঠিত হবেন আপনি জীবনে। তাই বলছি ধর্ম সাধনার ভিত্তি ভূমি পৃথিবী মায়ের কোল আপনি সাদরে গ্রহণ করুন বাবা। মৃত্যুলোকে গিয়ে নিজের পুরষকারকে অবলম্বন করে নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে নিজ সত্তাকে আপনার ঊর্ধ্বলোকের উপযুক্ত করুন গিয়ে বাবা। জীবনে আপনি আত্মস্থিতি তথা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করুন। আত্মা আপনার শাশ্বত মিলনের পথে যাবার জন্য ইন্ধন সংগ্রহ করুক।

—তবে তাই হোক মা। বলে উঠল সাধু সত্তা,—কিন্তু জগৎ জীবনে তুই আমার মা হবি চল। তোর কোলে জন্ম নিয়ে আমি মানবজীবন সার্থক করি গে, তোর মত মায়ের সন্তান হতে পারলেই সত্তাকে আমার দেহাতীতের পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে পারব। পারব জগদাতীত হতে।

—কিন্তু বাবা, বলে উঠল সতী—আমি যে পরমলোকের যাত্রী। সত্তা আমার শিবলোকে আকর্ষিত। তাছাড়া জগৎ জীবনের আমার কোন কামনা নেই। নেই কোন বাস্তবের বাসনার আকর্ষণ যা সত্তাকে আমার পারবে নামাতে পার্থিব জীবনে। ইচ্ছা বলতে আমার যা কিছু ছিল তা সব ভগবানের পায়ে সমর্পন করেছি বাবা। তাঁর ইচ্ছা না হলে শুধু আমি এই পৃথিবী গ্রহেই কেন অন্য কোন গ্রহেই জন্ম নিতে পারব না। এ গ্রহে বাবা-ভূতনাথের উপর নির্ভরতায় আমার অভিন্ন সত্তা আপনার এই শেখর-ভূতনাথের আকর্ষণেই নেমে আসি। আসি নেমে, করিও অবশ্য বিচরণ ভূর্ভুবলোকের মধ্যস্তরে। কিন্তু মহেশ্বরের মহৎ চিন্তায় মনকে আমি বাঁধা রাখি বলে এ স্তরের আসক্তির কোন আকর্ষণ আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। একই সত্তা আমরা স্বামী-স্ত্রী রূপে নেমেছিলাম জগৎ-সংসারে। সে সংসারের খেলা আমার শেষ হয়েছে কিন্তু ভূতুদার এখনও বাকি আছে বাবা। এ জীবনে তার খেলা শেষ করিয়ে উভয় সত্তা আমরা তেমনি যুক্ত হয়ে মুক্ত হতে যাব ফিরে সেই আবার উৎসে। পূর্ণ-ব্রহ্ম পরম সত্তায় হব আমরা লীন। আমার এই অন্তিম ইচ্ছা পরিপূরণের অভিলাষেই ঈশ্বর আমাকে এভাবে আসা যাওয়ার শক্তি দিয়েছেন বাবা। ভূতুদার জীবন শেষেই এ আসা যাওয়া আমার শেষ হবে। পিতা হয়ে আর আমাকে জগৎ জীবনে পতিত হতে বলবেন না বাবা। বরং সন্তানকে আপনার আশীর্বাদ করুন যেন এ অভিলাষ আমার পূরণ হয়।

—তাহলে জন্মে নামব আমি কোন পিতা-মাতা ধরে মা? উঠল করে জিজ্ঞাসা সেই সাধু সত্তা—"জগতের কার পবিত্র ঔরস ধরে কোন মাতার শুদ্ধ গর্ভে গিয়ে আশ্রয় নেব আমি জন্মের জন্য? সম-ভাবের ভাবুক জন্ম দাতা এবং সেভাবে পুষ্ট করার মত সম-মনা জন্ম-দাত্রী না পেলে যে আমার জন্ম-জীবন বৃথা হয়ে যাবে মা।

কথাটা অবশ্য সত্যি। তাই সতী ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর সে উঠল বলে বাপ-দরদী মেয়ের মত আদুরে সুরে—এ মেয়েকে যে আপনি শিবানী জীবনে একটা কথা দিয়ে এসেছিলেন বাবা। মনে আছে আপনার? অবশ্য সেটা আপনার নিছক কথার কথা ছিল না। ছিল প্রতিশ্রুতি। ভীষ্মদেব জীবনে ছিল সেটা আপনার দৃঢ় ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞার মত বাবা।

চিন্তায় পড়ল ভীষ্মদেব সত্তা। ভাবনা ভারাক্রান্ত মনে, কৌতূহলী স্বরে জিজ্ঞেস করে উঠল সে,—এমন কি কথা মা! যা প্রতীজ্ঞা স্বরূপ বলেছিলাম আমি তোমাকে?

—চিন্তার স্তরে, মনকে আর একটু নিয়ে গিয়ে স্মরণ করুন বাবা। বলে উঠল সতী,—মন-চিত্তকে আর একটু অন্তর্মুখী করলেই উঠবে ভেসে অন্তরে আপনার সেদিনের সেই কথা। আত্মস্থ হয়ে একটু স্মরণ করার চেষ্টা করুন বাবা। বর্তমানে এখন উভয়ে আমরা একই মনোলোকের স্তরে অবস্থান করছি। এ অবস্থায় আমার চিন্তার তরঙ্গ অবশ্যই করবে স্পর্শ স্মৃতিকে আপনার। সে স্মৃতির টানে উঠবে ভেসে চেতন মনে আপনার সেদিনের সেই বধূ শিবানীকে ত্যাগ করে আসার বিশেষ মুহূর্ত্তটা। দেখুন মনে করে।

সতীর মুখের চিন্তার রেখায় চোখ পড়তেই ওমনি হঠাৎ বলে উঠল ভীষ্মদেব সত্তা, —হয়েছে স্মরণ। পড়েছে মনে মা, সেদিনের সেই বিরূপ পরিবেশও বিপর্য্যয়ের মুখে পড়া তোমার সেই ছবি। পা দুটো জড়িয়ে ধরে করেছিলে আমাকে কাতরস্বরে অনুরোধ ঘরে ফেরার জন্যও বলেছিলে বিনয় করে যে তুমি আমার কথা অবশ্যই করবে রক্ষা। কিন্তু কি নিষ্ঠুর রূপ তখন নিয়েছিলই না আমার প্রকৃতি। ধিক নিজেকে। পিতা হয়ে আমি তোমার মত মেয়ের করুণ আকুতি ধমকে তাচ্ছিল্য করেছিলাম। বলেছিলাম— সত্যি যদি তুমি কোনদিন আমার কথা মত পার শেখরের সঙ্গে অভয়ার বিয়ে দিতে। দিয়ে বিয়ে পার যদি রাখতে কখনও আমার দেওয়া কথার মান— তবেই তখন আসব ফিরে আমি শেখরের সংসারে—নতুবা নয়।

—সে কথা আপনার আমি রেখেছি বাবা। বলে উঠল সতী।

লাগল চমক ভীষ্মদেব সত্তায়। এমন কি ভ্যাবা গঙ্গারাম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই শেখর ভূতনাথের চোখ দুটো সতীর মুখের দিকে তাকিয়ে হল যেন ছানাবড়া। বিস্ময়ে। হতবাক হয়ে থাকা সেই ভূতুদা ও সাধু সত্তার দিকে দৃষ্টি ফেলে উঠল বলে সতী, —অভয়ার ভবিতব্য শিবানী জীবনে আমাকে শেখরদার সঙ্গে অভয়ার বিয়ে দিতে দেয়নি বাবা। তাই ইচ্ছা তখন হয়নি আমার পূরণ। কিন্তু সে জীবনের আমার আন্তরিক কামনা সতী জীবনে এসে মৃত্যুর পর তা আমাকে এই জাগতিক জীবনে করিয়েছে বাবা। পেরেছি আমি আশীর্বাদে আপনার এ জীবন পার থেকে অভয়ার সঙ্গে শেখরদা রূপী এই ভূতুদার বিয়ে দিতে। বিয়ে দিয়ে একবার আপনাকে স্মরণ হয়েছিল বাবা। সেই জন্যই আজ বুঝি ঈশ্বর দিলেন আপনার সঙ্গে মিলিয়ে। তাজ্জ্ব ব্যাপার। কথাটা শুনে ভূতনাথ হল যেমন স্তম্ভিত। সূক্ষ্মদেহী সেই ভীষ্মদেব সত্তাও হল তেমনি বিস্মিত। বিস্ময়ের স্বরেই বলে উঠলেন তিনি, — তাই নাকি মা।

হাঁ—বাবা। বলে উঠল সতী, —শিবানী জীবনে যে ক'টা দিন বেঁচেছিলাম বাবা, ছিলাম বড় অসোয়াস্তিতে, অশান্তিতে। আমার জন্য আপনার সেই ভর ভরন্ত সংসার ছেড়ে চলে যাওয়া অভয়ার জীবন বয়ে যাওয়া ইত্যাদির খোঁচা মনটাকে বড় মোচড়াত আমার দিনরাত। তাই যার জীবনের আশা আমি মাড়িয়ে দিয়ে সংসারে ঢুকেছিলাম গেলাম সেই অভয়ার কাছে। সমব্যথী হয়ে মনটাকে তার করলাম জয়। দিদির আদর দিয়ে টানলাম তাকে নিজের কাছে। তার হতাশায় দিলাম আশা। আশা দিয়ে তার ভুলালাম মনের ব্যথা। ভুলিয়ে তাকে রাখলাম নিজের কাছেই। স্থান দিলাম তাকে নিজের বুকে ছোট বোনটির মত। অবশ্য এক জীবনে অভয়া আমার নিজের ছোট বোনই ছিল বাবা।

প্রসঙ্গক্রমে এল সতীর মুখে আবার সেই অতীতের বিহারের কৌলিয়া জেলার রোটাশ পর্বতে জন্মান তার পাহাড়ী-জীবনের কথা। সে জীবনের স্মৃতি টেনে বলতে লাগল সতী,—অভয়া সে জীবনে ছিল আমার নিজেরই সহোদরা ছোট বোন, বাবা। কুসুম টিকরী গ্রামের আহেরীকন্যা ছিলাম আমরা নাম ছিল তখন অভয়ার পার্ব্বতী। জগৎ জীবনে বৈষ্ণবী মায়ায় অতীত জীবনের স্মৃতি ভুলিয়ে রাখে বলে শিবানীরূপে বেঁচে থাকা অবস্থায় তা আমি জানতে পারিনি বাবা। বিস্মরণের জের সতী রূপের জীবদ্দশাতেও তা আমাকে দেয় নি জানতে। অবগত হই অভয়ার পূর্বাপর এসব জীবন-কাহিনী সতী জীবনের অবসানের পর। এই মৃত্যুলোকে এসে। মায়ার দিকে সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ফেলার পর। পারি বুঝতে ও অভয়া-রূপী পার্ব্বতীর শেখরদা-রূপী শঙ্করকে পাবার ইচ্ছা থাকলেও পাওয়া হয় নি তার। যাই হোক, জন্মান্তরের সেই স্নেহের টানে শিবানী জীবনে অভয়া আমার আপন ছোট বোনটির মতই হয়ে গেছল বাবা। আর সেই স্নেহের টানেই আপনার বন্ধু কমলবাবুর মেয়ে সতী জীবনে আমার হয়ে আসে নিজের ছোট বোন মায়ারূপে। সেই মায়ারূপী অভয়ার সঙ্গে দিয়েছি বাবা আমি আপনার ছেলের এই পরজীবনে আসা ভূতুদার বিয়ে। পাশে আমার দাঁড়িয়ে থাকা আমার এই ভূতুদাই আপনার সেই ছেলে চন্দ্রশেখর, বাবা। আর আপনার সেই বন্ধুর মেয়ে অভয়াই স্ত্রী হয়ে আছে এখন ভূতুদার সংসারে মায়া নামে। তাই তো বলছি বাবা— আপনার কথা রেখেছি আমি।

বিস্ময়-বিমূঢ় সাধু-সত্তা কি যে বলবে বোধ হয় খুঁজে পেল না। আবেগে সে হল দিশাহারা—আনন্দে হল সে বাক্যহারা। নিষ্পলক নয়নে কিছুক্ষণ রইল তাকিয়ে সে সতী-ভূতনাথের দিকে। তারপর আবেগ জড়িত কণ্ঠে উঠল বলে সে, —জীবনে তোমাদের আমি বড় কষ্ট দিয়ে এসেছি মা। এসেছি আমি তোমাদের মনে বড় ব্যথা

দিয়ে। আমায় তোমরা ক্ষমা কর মা! ক্ষমা করে তোমরা দুজনে আমার বুকে এস। আমার অনুতপ্ত ভীষ্মদেব হৃদয়ে স্নেহ-হারা পিতৃসত্তা পেয়ে তোমাদের শান্ত হোক মা। আত্মা আমার তোমাদের স্পর্শে তৃপ্তি পাক।

বুকে জড়িয়ে নিতে এগিয়ে আসতেই ওমনি সূক্ষ্মদেহী সাধুসত্তাকে নিষেধ করে উঠল সতী,—না বাবা, এ অবস্থায় সূক্ষ্ম অবয়বের ছোঁওয়া আপনার স্থূলদেহী ভূতুদার ক্ষতি সাধন করতে পারে। স্পর্শ করলে আমাকে হয়ত এ মূর্ত্তিটা ধারন করে রাখতে সমর্থ নাও হতে পারেন আপনি। তার চেয়ে এই স্নেহ-ভালবাসা ভরা সত্তা নিয়ে যান আপনি জন্ম নিতে আপনার সেই মায়ারূপী অভয়ার গর্ভে। নামুন আপনি ভূতুদারূপী আপনার সন্তানের কোলে, ছেলে হয়ে। পূর্ব জীবনের কথা রাখতে আপনার, করতে পালন ভীষ্মদেব সত্তার প্রতীজ্ঞা, রাখতে আপনার ক্ষত্রিয় জীবনের প্রতিশ্রুতি ফিরে যান আপনি আপনার সেই ছেলের সংসারে, পিতা হয়ে ধন্য হোক ভূতুদা'র জীবন। মা হয়ে সার্থক হোক মায়া-অভয়ার নারী জন্ম। সংসারটা তাদের আপনার কচি মুখের মিষ্টি হাসিতে পূর্ণ হয়ে উঠুক বাবা।

—তাই হোক মা। শান্ত মুখে সৌম্যভাবে বলে উঠল সেই ভীষ্মদেব সত্তা,—ফেলে আসা জীবনে আমি তোমার কথা না শুনে অনেক কষ্ট দিয়ে এসেছি তোমায়। বিপর্য্যস্ত করেছি জীবন। আর তোমার কথার অবাধ্য হব না মা। থাকব না আর এখানের মায়ার সূক্ষ্মটানে। যাব আমি আমার শেখর-রূপী ভূতনাথের সংসারেই। ছেলের কোলে ছেলে হয়ে জন্ম নিতেজগতে। তাহলে এবার আমায় বিদায় দাও মা। তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে যাই আমি জীবনে। ওঁম শান্তি.....।

ওঁম শান্তি কথার মধু-ঝঙ্কারের রেশটা সমস্ত পরিবেশটাতে অনুরণন জাগিয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতেই দেখল ভূতনাথ এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। অদ্ভুত এক মায়া-ভরা মিষ্টি-মধুর দৃষ্টি রেখে ভূতনাথের মুখের উপর সেই সাধুসত্তা সরে যেতে লাগল ক্রমশ যেন তার থেকে পিছনের দিকে। যেতে যেতে দূরে গিয়ে হল পরিণত সেটা সুন্দর একটা ফুটন্ত সাদা-ফুলে। হাসতে হাসতে ফুলটা যেন তার দিকে তাকিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যেতে লাগল দূরে, বহুদূরে দিগন্তরেখা পেরিয়ে মহা-শূন্যের দিকে। ঠিক স্রোতে ভেসে যাওয়া ফুলের মত। যেতে যেতে সেটা বিন্দু হয়ে অন্ধকার-আকাশ-সিন্দুর বুকে মিলিয়ে গেল।

তারপর সে এক অদ্ভুত নীরবতা। নিস্তব্ধ-নিঝুম প্রকৃতি। অন্ধকারে ঢাকা নীচের পৃথিবীর দিকে উপরের মিটমিটে তারাগুলো মৌন-স্তব্ধ এক রহস্য-ভরা চাওনি নিয়ে রইল যেন তাকিয়ে। দেখতে লাগল যেন তারা ভূতনাথকেই। দাঁড়িয়ে রইল ভূতনাথ সেই অন্ধকারে ভূতের মত। অস্তিত্ববান হয়েও যেন অস্তিত্ব হীন সে। মুখ যেন তার বাক্য হারা, চোখ তেমনি তার পলক-হারা। মাটির পৃথিবীর বুকে গাদা যেন সে একটা পাথর। সম্বিৎ ফেরাল তার সতীই। হাসি মুখে উঠল বলে সে,—কি ভূতুদা? ভাবছ কি তুমি? আর তো কোন চিন্তা নেই তোমার। পূর্ণ হয়েছে তো উদ্দেশ্য? বাবা তোমার আসবে না আর এখানে ঘূর্ণিবায়ুরূপী ঝোড়ো ভূত হয়ে, তোমার মালিকের মেশিন-ঘর ভাঙ্গতে বা কারখানা তছনছ করতে। নিশ্চিন্ত থাক তুমি।

—সে সব চিন্তা মন থেকে আমার মুছে গেছে সতী। বলে উঠল ভূতনাথ,—ভাবছি আমি....

কিন্তু কি যে ভাবছে সে বলবে কি সতীকে নিজেই যেন খুঁজে পেল না সে। পরিবর্তে সতীর মুখটার দিকে তাকাতেই সমস্ত ভাবনা-চিন্তা মুহূর্তে যেন কর্পূরের মত উবে গেল। ফুটে উঠল সতীর মুখে তেমনি সরল মধুর হাসি,—ভাবতে তোমায় কিছু আর হবে না ভূতুদা। যাও এবার তুমি বাড়ী। দেখা করে এস একবার মায়ার সঙ্গে। বোনটা আমার তোমার জন্য মনে বড় কষ্ট নিয়ে আছে ভূতুদা। রাগ করে আর থেকো না তার উপর। চাকরির খোঁচায় খুঁচিয়ে তোমার মনটাকে, ঘরছাড়া করে তোমাকে অনুতাপের আগুনে পুড়ছে সে, জ্বলছে অনুশোচনায়। তোমায় ছেড়ে থাকা ব্যথা মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে দিনরাত। আর চোখের জল তাকে ফেলিও না ভূতুদা। এত বড় একজন মহাপুরুষের পিতা হতে চলেছ তুমি—তোমার কি আর মনে রাগ-অভিমান নিয়ে থাকা চলে? মায়ার মনে একটু শান্তি দিয়ে এস ভূতুদা।

—তা না হয় যাচ্ছি। উঠল বলে ভূতনাথ,—কিন্তু তুই?

—মায়ার মধ্যেই তো আমি আছি ভূতুদা। বলে উঠল সতী,—আছি তোমার আশার সঙ্গে, আকাঙক্ষার মধ্যে। সংসার জীবন তোমার পূর্ণ হয়ে উঠুক ভূতুদা। হোক পূর্ণ মা হয়ে মায়ার মধুর জীবন। তোমাদের সেই খুশির আলায় আলোকিত হোক আমার পথ। সে পথে হোক মুক্ত আমার আত্মার গতি।

—তুই কি তাহলে ছেড়ে আমাকে চলে যাবি সতী? ত্বরিতে ওমনি ব্যথা ভরা স্বরে বলে উঠল ভূতনাথ— তোকে ছাড়া আমি কিন্তু পারব না থাকতে এ পৃথিবীতে।

—কেউ আমরা কাউকেছাড়া থাকতে পারব না ভূতুদা। বলে উঠল সতী, —"তবে আমার লোকে থেকে আমি অপেক্ষা করে থাকব তোমার জন্য। জগৎ জীবনের কাজ সেরে আসবে যখন তুমি পরলোকে তখন তোমার সঙ্গে তোমার ছেলের হাতের পিণ্ড নিয়ে আমি হব গতিবান উভয়ে আমরা পরমলোকে।

হঠাৎ দূর-দিগন্তের আঁধার-ঢাকা গ্রাম-গঞ্জের গাছ-গাছালিগুলো থেকে ভেসে এল পাখ-পাখালি ও কাক-কোকিলার স্বর। বোধ হয় রাত পোহাবার ইঙ্গিত দিল তারা। দিল আভাষ শেষ প্রহরের। চঞ্চল হয়ে উঠল সতী,—এবার আমায় বিদায় দিতে হবে ভূতুদা। রাত সরাতে পূবের আভা আকাশে ফুটে উঠার আগেই চলে যেতে হবে আমাকে। তুমিও কিন্তু বাড়ী ফিরে যাবে ভূতুদা। জানবে মায়ার মনের গোপন ব্যথা লাগছে এসে আমার প্রাণে। একটি কথা সর্বদা তুমি রাখবে মনে ভূতুদা—ভগবান শান্তিস্বরূপ। সকলের মনে শান্তি দেওয়াই তার আসল পূজা। প্রকৃত আরাধনা তার নিজে সন্তুষ্ট চিত্তে থেকে অপরের সন্তুষ্টি বিধান করা।

বলতে বলতে হঠাৎ ওমনি কোত্থেকে একটা দমকা বাতাস এল। সে বাতাসে মিষ্টি মধুর পারিজাতের গন্ধ ভেসে এল। সে-গন্ধে যেন ভরপুর হয়ে গেল ভূতনাথের পরিবেশটা। সে পরিবেশের মধ্যে রেখে ভূতনাথকে বলে উঠল সতী,—তাহলে এবার চললাম আমি ভূতুদা। বিদায় দাও আমাকে।

না জানি কোন বশে বিদায় দিতে সতীকে অজান্তে ভূতনাথের উপরে উঠল হাতটা। সঙ্গে সঙ্গে হাসি-মুখে সেই সতী-সত্তা তাকে ছেড়ে উপরে, উর্ধ্বকাশের দিকেউঠতে লাগল। তারা বাজির মত। উঠেই রূপ ধরল তার অবয়বটা অতি অপরূপ সুন্দর নীলোজ্জ্বল একটা আলোর ফুলকিতে। ফুলকিটা দুলতে দুলতে উর্ধ্ব থেকে ক্রমশঃ উর্ধ্বস্তরে যেতে যেতে হল পরিণত একটা আলোর বিন্দুতে। তারপর সেই বিন্দুটা মহাশূন্যের বুকে অসংখ্য তারকা-রাজির মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। সতীর মিলিয়ে যাওয়া সেই দিকটার দিকে তাকিয়ে ভূতনাথ দাঁড়িয়ে রইল একটা প্রতিমূর্ত্তির মত। অবাক বিস্ময়ে। নির্বাক-নিস্পন্দে। নিথর-নিশ্চল ভাবে।

(ত্রিশ)

কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্।

রাত আঁধারে কারখানার এই অভ্যন্তরে নির্মীয়মান ঘর-বাড়ীর প্রেক্ষাপটে প্রেক্ষিত হল ভূতনাথের যেসব দৃশ্যাবলী, আকর্ষিত হল তার যে সব বিষয়রাজি, অধিগত হল তার যে সব বস্তুনিশ্চয়—এর চেয়ে আর আশ্চর্য্যের কি হতে পারে? কি হতে পারে আর এর চেয়ে তাকে অবাক করার, বিস্ময়াবিষ্ট করার বিষয়? অভিভূত ভূতনাথ কেমন যেন এক রূপ ঘোরে রইল দাঁড়িয়ে সেখানে। ভোর হওয়া কারখানায় ভূতের মত। রইল অবশ্য দাঁড়িয়ে সে, কিন্তু মনটা তার সদ্য দেখা সদ্য শোনা স্মৃতিগুলোর বার বার করতে লাগল রোমন্থন। মানস পটে বার বার হতে লাগল উদয় তার নদী বুক থেকে উঠে আসা সেই ঘূর্ণি-ঝড়। আগন্তু সেই ঘূর্ণি-ঝড়ের বটগাছের মূর্ত্তিতে পরিবর্তন। সেই মূর্ত্তির আবার চলমান অবস্থায় কারখানায় প্রবেশ। প্রবেশের পর আবার সে বট-গাছের সাধুরূপে পরিণত হয়ে যাওয়া। শুধু তাই নয়—সাধুর সঙ্গে সঙ্গে আবার চারধার তার পরিবেশটার আশ্রম রূপ ধারণ। অর্থাৎ উঠতি মেশিন-ঘর ও কারখানার আশ-পাশ বাড়ী-ঘর বেড়-প্রাচীরের দেওয়ালগুলোর উপর শূন্য থেকে অলৌকিকভাবে আশ্রমের ছায়া-রূপ পড়া। জমাট ছায়ার ফুল বাগিচা, ছায়ার ফুলেল লতা, গাছ-পালা, ঝুপড়ি কুটির সব কিছু ছায়ার আকারে প্রতিভাত হয়ে সমগ্র পরিমণ্ডলটাকে আশ্রমিক পরিবেশে রূপান্তরিত করা। সত্যই এ— মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত ব্যাপার। এর চেয়েও আরো হতভম্ব হওয়ার ব্যাপার হল—সে পরিবেশে সাধুবাবার সামনে বসা সেই ছায়া-কায়ার ভক্তজন মণ্ডলী। থিতিয়ে বসা সে সব জন-মণ্ডলীকে আবার সেই গাছ-সাধুর গীতাপাঠ করে শোনানো। সতীর সঙ্গে কথোপকথন। তারপর অবার সে সব অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। এযে কোন অদৃশ্য শক্তির জাদুর খেলা, কোন ইন্দ্রজালিকের অলৌকিক ক্রিয়া বুঝতে কিছুই পারল না ভূতনাথ। তাই হাবা গঙ্গারাম বা ভেবা গোবিন্দের মত রইল দাঁড়িয়ে সে মহাশূন্যের বুকে মিলিয়ে যাওয়া সতীর সেই দিকটার দিকে তাকিয়ে। অপলক দৃষ্টিতে, নির্বাক নিস্পন্দ পাথরের একটা মূর্ত্তির মত। ভাবতে লাগল ভূতনাথ এতক্ষণ ধরে দেখল কি সে?

তবে দেখার চেয়ে আরোও বেশী আশ্চর্য্যজনক, আরো আরো বেশী বিস্ময়কর মনে হতে লাগল তার কাছে,—এতক্ষণ ধরে শুনল কি সে? শুনল যে সে তারই অতীতাতীত জীবন-কাহিনী। তারই পূর্বাপর জনমের ইতিহাস। তারই জন্ম-জন্মান্তরের গাঁথা, কথা। নিজ জীবনের এসব কথা-কাহিনী তার যে এখানে, এভাবে, এ অবস্থায় শুনতে হবে তাকে—স্বপ্নেও কখনও ভাবেনি ভূতনাথ। কল্পনাতেও সে করেনি কোন দিন ধারনা যে এরূপ বিরূপ বিরুদ্ধ স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে শুনতে হবে তাকে তার ফেলে আসা সব জীবনের কথা সতীর মুখ দিয়ে। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ভূতনাথ। সত্যিই, এসব অভাবনীয়, অকল্পনীয়, অচিন্তনীয়, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবে সে যাই হোক—চোখে ভূতনাথ দেখল যা, দেখে ভূতনাথ শুনল যা, শুনে ভূতনাথ জানল যা, জেনে ভূতনাথ বুঝল যা, বুঝে ভূতনাথ করল যা হৃদয়ঙ্গম—তা কিন্তু জ্ঞানী-গুণী, বেদ-বিদ, বিদ্বান-পণ্ডিতদের চেয়েও কোন অংশে কম নয়। বরং তার এসব প্রত্যক্ষজ্ঞান ওসব বই-পড়া জ্ঞানের ধরা-ছোঁওয়ার অনেক বাইরে, বহু উর্ধ্বে।

মোদ্দা কথা হল—চোখে দেখা এই জগৎটাই আসল জগৎ নয়। নয় সব কিছু বা সমস্ত কিছু। এই যে দৃশ্য জগতের বুকে ফুটে উঠা ও ঝরে যাওয়া বা বুদ-বুদের মত ভেসে উঠা ও খানিক পরেই আবার ফেটে মিলিয়ে যাওয়া এই ক্ষণিক জীবনই একমাত্র জীবন নয়। এই দৃশ্য জগতের অন্তরালে আছে বিরাট বিশাল এক অদৃশ্য জগৎ। পশ্চাতের সেই অদৃশ্য জগতই জীবনের ঢেউগুলোকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সামনের এই দৃশ্য জগতের দিকে। সমুদ্রের কোন ঢেউ যেমন কোন ঢেউ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। নয় যেমন তার ওঠা-নামা কোন তরঙ্গই কোন তরঙ্গ থেকে বিশ্লিষ্ট বা বিমুক্ত। এই জগৎ-সংসারেও তেমনি কোন জীবন কোন জীবন থেকে পৃথক বা ভিন্ন নয়। অর্থাৎ সবাই আমরা একে অপরের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও জড়িত। গাঁথা আছে তেমনি এক লোকের সঙ্গে অপর লোকও। মাঝে ভূলোককে রেখে ভূর্বস্ব মহাজন-তপ-সত্য ইত্যাদি উর্ধ্বলোক ও অতল-বিতল-সুতল-তলাতল-পাতাল ইত্যাদি নিম্নলোক একে অপরের সঙ্গে আছে পরস্পর সংশ্লিষ্ট সংপুটিত ও অনুস্যুত হয়ে। অনুস্যুত হয়ে আছে তেমনি মানুষের এক জনমের সঙ্গে অপব জনমও। প্রারব্ধ, সঞ্চিত ক্রিয়ামান ইত্যাদি ত্রয়ী কর্মফল, ধর্মাধর্ম ইত্যাদির ভোগ জন্ম বা জীবনকে যেরূপ পরিবেশ, যেরূপ অবস্থা বা যেরূপ আধারের মধ্যেই ফেলুক না কেন সত্তার পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ কিন্তু সেই একই সূতায় থাকে বাঁধা। থাকে আত্মার সঙ্গে আত্মা পরস্পর সংযুক্ত, সংপৃক্ত ও সংস্থিত হয়ে।

এই সূত্রেই অবগত হল ভূতনাথ যে তার এই মানব আধারে আসাই একমাত্র জনম নয়। শিব প্রসাদ-মণ্ডল থেকে তার জীবন-ধারা বয়ে আসছে পাহাড়ী ছেলে শঙ্কর, ভীষ্মদেব তনয় শেখর ও বলরাম নন্দন ভূতনাথ হয়ে। আর সব জীবনেই সঙ্গে তার পবিত্র প্রেম-বন্ধনে আছে বাঁধা তার সতী-শাশ্বতী। কখনও চণ্ডীপুর তনয়া গৌরি হয়ে। কখনও পাহাড়ী-কন্যা উমা হয়ে কখনও আধুনিকা শহুরে শিক্ষিতা মেয়ে শিবানী হয়ে। এবং ভূতনাথ জীবনে ভূতগ্রামের রাখহরি নন্দিনী সতী হয়ে। কিন্তু সব সতীর জীবনেই বিরহ এসে প্রেমকে যেমন মধুর করে, তাকে বাস্তবতার পঙ্কিল আবর্ত থেকে মুক্ত করে স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত করার জন্য যেমন শকুন্তলার জীবনে আসে দুর্ব্বাসার অভিশাপ, সাবিত্রীর জীবনে আসে যেমন দৈব অভিসম্পাত, বেহুলার জীবনে যেমন আসে মা মনসার আক্রোশ তেমনি সতীর জীবনেও এসেছিল অভিশাপ। এক জীবনেই নয়—জন্মজন্মান্তর পরোক্ষ-প্রত্যক্ষভাবে সে অভিশাপ মাথায় নিয়ে তাই পেয়েও ভূতনাথকে প্রকৃতভাবে পায় নি সে। সব জীবনেই এসেছে তার পাশে পাশে বিরহ-বিধুরা আশা-হতা প্রণয়িনী হয়ে। রামের জীবনে সীতার মত এলেও সতী তার জীবনে শুধু অগ্নিপরীক্ষাই দিয়ে গেছে। পাতাল প্রবেশ করানো ছাড়া তাকে সে দিতে পারেনি অন্যকিছু। বেহুলার মত এলেও লখীন্দরের মত ক্ষণিকের জন্যও সে তাকে জীবন-বাসরে না নিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে ভেলায়। সত্যবান হয়েও তার নিজে যমের সঙ্গে না গিয়ে উল্টো সে তার সাবিত্রীকেই তুলে দিয়েছে যমের হাতে। এখনও মনে পড়ে ভূতনাথের সেই দিনটার কথা। বিয়ের পর সতী আসতে চেয়েছিল তার সঙ্গে তাদের বাড়ী। বড় ইচ্ছা ছিল তার ভূতুদা তাকে তার বাপ-মায়ের কাছে রেখে যাবে আসানসোল, তার কাজে। আর সে তার সংসারে থেকে করবে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা। প্রাণ ভরে, ভক্তি ভরে। কিন্তু সে সাধ তার পূরণ করেনি ভূতনাথ। শুনেনি সে সতীর কথা। তার প্রতি তার সৎ মায়ের দুর্ব্যবহার জেনেও, রাত দিন সেই দস্যি মেয়েটার তার

সতীর প্রতি শাসন তাড়ন পীড়ন-গঞ্জন শুনেও প্রায় জোর করেই সে রেখে গেছল তাকে তার সৎমায়ের খোঁয়াড়ে। যেন ওই দজ্জাল জহ্লাদ মেয়েটার হাতে বিষ খেয়ে তাকে মরবার জন্যই। ছিঃ।

এই হল ভূতনাথ—তার গুণধর স্বামী। আর ওই হল তার সতী, সত্যিই লক্ষ্মী স্বরূপা ধর্মপত্নী ছিল তার। কিন্তু জীবনে কি দিয়েছিল সে তার সতীকে? তার এই প্রেম-কাঙ্গালিনী মহান সত্তা লক্ষ্মী সতী, সরস্বতী সতী জনমে-জনমে জীবনে জীবনে এসেছিল যে তার পাশে, এসেছিল যে তার মনের মন, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয় হয়ে—কি দিতে পেরেছিল সে তাকে? হায়। কি পেয়েছিল সতী তার কাছ থেকে? বিষাদভাবে হতাশ ভূতনাথ তারা-ভরা সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সে সব কথা।

ভাবতে ভাবতে এমন হয়ে গেল সে তন্ময় যে কখন রাত পোহাল ফর্সা হল, ফুটলো দিনের আলো কোন খেয়ালই হল না তার। হুঁশ হল হঠাৎ তার অবিনাশ বাবুর ডাকে,—আরে ভূতনাথবাবু, আপনি এখানে। তবে যে রাম সিং ভীমচাঁদ—ওরা বলল আপনি নাকি পাথর মুড়িতে আপনাদের গ্রামের সেই উজ্জ্বলা নামে মেয়েটার শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে উঠেছেন।

ভূতনাথ স্বপ্নাবিষ্টের মত তাকাতে লাগল তার দিকে। বলতে লাগলেন অবিনাশ বাবু,—আমরা তো সকলে মিলে গেছলাম সেখানে। আপনার সন্ধানে। না দেখতে পেয়ে—মানিক বাবুর ঘর, কুমার খুলি, পলাস ডাঙ্গা ইত্যাদি আশপাশ গ্রামগুলোতে খুঁজলাম আপনাকে তন্ন তন্ন করে। কোথায় গেছলেন মশায় আপনি? গিয়ে আবার ফিরে এলেনই বা কখন? তাজ্জব ব্যাপার।

ঘোর তখনও বুঝি সম্যক কাটেনি ভূতনাথের তাই ভাসা চোখে ফ্যাল-ফ্যালিয়ে রইল তাকিয়ে সে অবিনাশবাবুর দিকে। বলে উঠলেন অবিনাশ বাবু,—অবশ্য চলে যাওয়ার জন্য আমি আপনাকে কিছু বলছি না। কারণ লাল বাহাদুরের মুখে যা শুনলাম তাতে চলে গিয়ে আপনি ভালই করেছিলেন। হঠাৎ একটা কিছু অঘটন ঘটে গেলে বিপদে পড়তে হত আমাকেই। যাক-গে ওসব কথা। জানতে চাইছি-আমি, ওসব চেনা-পরিচিত ঘর ছাড়া রাত কাটাতে আপনি কোন গ্রামে, কার বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলেন শুনি?

এবার বোধ হয় সম্বিৎ ফিরে এল ভূতনাথের। ভালভাবে অবিনাশ বাবুর কৌতূহলী মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখল সে চেহারায় তার অবিশ্বাসের ছায়া। আর সঙ্গে শুধু তার সেপাই-দারোয়ান রাম-সিং ভীম চাঁদই নয়, সঙ্গী-শাকরেদ, তোষামোদ-খোশামোদকী সহ বেশ একটা মোটা দল। কিন্তু এত বোকা কেন তারা? কাকে কান নিয়ে গেছে শুনে এধার-ওধার সে-কাকের সন্ধানে ছুটার চেয়ে আসলে নিজের কানটাতেই তো হাত দিয়ে দেখতে পারত সে কানটা তার আছে কি নেই। আসতে পারত তো সে প্রথমেই তার কারখানায়। থেমে একটু উঠল বলে ভূতনাথ,—কারখানা ছেড়ে যে আমি চলে যাব এধারনাটা হল কি করে আপনার?

"—কেন?" বলে উঠলেন অবিনাশ বাবু—"তাহলে কি আপনি বলতে চান রাম সিং, ভীম চাঁদদের কথা মিথ্যা? ওরা সাত-সকালে আমার ঘরে গিয়ে উঠিয়ে আমাকে বলল যে সব কথা—সব ধাপ্পা, ভাওতা? বুজরুকি? নদীর বুক থেকে হঠাৎ উঠে আসা একটা ভেঁড়ুল (ঘূর্ণিবায়ু) দেখে ভয়ে আপনি যান নি পালিয়ে কারখানা ছেড়ে? আপনার মত সাহসী লোককে ছুটে পালাতে দেখেই তো গেছল ওরা ভেগে। কারখানা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল গদার ডিহির শিব মন্দিরে। রাত কাটিয়ে গেছল তারা রায়গঞ্জে। আমাকে খবরটা জানাতে। এসব পরিচয় কি মিথ্যা? গুল ঝেড়েছিল তারা আমার কাছে গিয়ে?

কি যে বলবে ভূতনাথ খুঁজে পেল না। রাম সিং-এর দিকে তাকাতেই মুখটা নীচু করে নিল সে। ভীমচাঁদের চোখে চোখ পড়তেই মাথা হল তার হেঁট। লাল বাহাদুরের অবস্থাও তথৈবচ। অর্থাৎ দৃষ্টি ফেলতেই তার দিকে লজ্জায় ও ভয়ে যেন শামুক হয়ে গেল সে। বুঝতে ব্যাপারটা বাকি রইল না ভূতনাথের। সত্যি বললে যে বিপদ হবে তাদের সে-কথাটা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করেই চুপ দিয়ে থাকতে বাধ্য হল সে। কথায় আছে—ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম। তবে মনে বড় দুঃখ হল ভূতনাথের। রামসিং, লাল বাহাদুররা না হয় নিজেদের গলা বাঁচাবার জন্য ওসব আজে-বাজে কথা বলতে পারে। কিন্তু অবিনাশবাবু? সে কি করে ধারনা করল তাকে ওমনি ভীতু, কাপুরুষ নিমক হারাম, অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক বলে? চাপা ক্ষোভে গুম হয়ে রইল ভূতনাথ।

—কি ? চুপ করে রইলেন যে ? যাই হোক—আমাকে না জানিয়ে এখানে কারো বাড়ী যাওয়া যেমন উচিত নয় আপনার তেমনি বিনা অনুমতিতে আমার এখান কারোর সঙ্গে কোন সম্বন্ধতা স্থাপন, ঘনিষ্ঠতা বা মেলামেশা করাও ঠিক নয় আপনার। আমি এসব মোটেই পছন্দ করি না। কারণ কোন শত্রু কখন যে কি রূপ নিয়ে ভুলিয়ে আপনাকে দুষমনি করবে তার তো কোন ঠিক নেই। মিত্র সেজে সব ক্ষতি করতে আমার ওৎ পেতে আছে। তাই এসব ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত বলে আমি এসব কথা বলছি। তাছাড়া ভীত হলেও যে সাহসের উপর ভর করে একলা আপনি পাথরমুড়ি যেতে পেরেছিলেন—সে সাহসের উপর নির্ভর করে এই সেপাই-দারোয়ানগুলোকে সঙ্গে করে আর একটু দূর—আমার বাড়ী যেতে পারলেন না ? কাজটা কিন্তু আপনার মোটেই ঠিক হয়নি ভূতনাথবাবু। বললেন অবিনাশবাবু

শুনে কথাটা ভূতনাথবাবুর বোধ হয় একটু সম্মানে লাগল। তাই একটু কর্কশ কণ্ঠেই ভেসে এল তার উত্তর,—তাহলে কি আপনি বলতে চান আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরই আমার ব্যক্তিগত আত্মীয় বন্ধু সম্পর্ক-সম্বন্ধ সব নির্ভর করবে ? আপনার খেয়াল-খুশির নিক্তি ধরে চলতে হবে আমাকে ?

"—চটছেন কেন ?" বলে উঠলেন অবিনাশ বাবু,—"নিজের বিবেকের উপর নির্ভর করে আচরণটাকে আপনার বিচার করুন দেখি। কি ছিল আপনার কর্ত্তব্য ? আপনার মত লোককে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখলে সেপাই-দারোয়ানগুলো তো পালাবেই। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চিন্তা করে একটু দেখুন দেখি আপনি, আপনার উপর ভরসা করেই তো আমার কারখানা ছেড়ে নিশ্চিতে ঘরে থাকা। সেই আপনি, কারখানার এতসব জিনিস-পত্র ফেলে গেলেন কি করে ? রাত্রে বেলায় ? গেট খোলা অবস্থায় ?

ঝড়ের মত অবিনাশ বাবু লাগলেন যেতে বলে আরো অনেক কথা। কিন্তু ভূতনাথের মুখে সরল না কোন রা। টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত সে করল না বটে কিন্তু চোখদুটো দিয়ে তার প্রতিবাদের আগুন যেন পড়তে লাগল ঠিক্‌রে। হুড়পির ভিতর আটকে থেকে সাপ যেমন ফুঁসতে থাকে তেমনি ফুঁসতে লাগল যেন ভূতনাথের অন্তর-সত্তাটা।

সামাল দেবার জন্য একজন শাকরেদ এল এগিয়ে অবিনাশবাবুর কাছে। হাল্কা করবার জন্য ব্যাপারটাকে তাচ্ছিল্যের স্বরে উঠল বলে সে চৌধুরী খুড়োকে,—ছাড়ো তো খুড়ো ওসব কথা। জিনিষ তো তোমার কিছু যায় নি। লাল বাহাদুরের মুখে ওই প্রেতুড়ে ঝড়টার যে বিবরণ শুনলাম তাতে তো কারখানাটার তল মাটি উপর—উপর মাটি তল হয়ে যাবার কথা। কিন্তু এযে দেখছি এধারের কুটোটি ওধারে নড়েনি পর্য্যন্ত। মেশিন-ঘরের ভিত ভাঙ্গা তো দূরের কথা উঠতি দেওয়ালে একটু চিড় পর্য্যন্ত ধরেনি কোথাও।

"—ধরবে কি করে ?" পাশ থেকে ওমনি একজন তোষামোদকারী চোখ ঠেরিয়ে মুখ বাঁকিয়ে বেশ ভারিক্কিভঙ্গীতে লাগল অবিনাশ বাবুকে বলতে,—কি সাঙ্গাত ? বলেছিলাম না দেজুড়ির ওই দেবেন দেওয়াশীকে দিয়ে কারখানাটায় একটু শান্তি-স্বস্ত্যয়ণ করাও। হোম-যজ্ঞ হোক। ঘি পুড়ুক একটু। দু-এক প্রস্থগীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠও হোক। ওসব ভূত-প্রেতনী, প্রেত-শাকচুন্নী লেজ গুটিয়ে তোমার কারখানার চৌহদ্দি ছেড়ে পালাবে। দেখ এবার, কথাটা তখন আমার শুনেছিলে বলে ফলটা এখন পাচ্ছো কি না ? আত্মীয়-স্বজনরা তখন সবাই তোমাকে টিট্‌কারী করেছিল—বাজে খরচ, ভস্মে ঘি ঢালা, গাজু চট্টরাজের গাঁজা-খোরি কথা শুনে কতকগুলো টাকাকে জলে ফেলা। এখন দেখ, এ শর্ম্মা কখনও ফালতু কথা বলে না। মিলিয়ে নাও এবার কথাটা আমার সত্যি কি না।

গাজু খুড়োর কথাটা যে সত্যি, মিথ্যে নয়,—তা কারখানাটার আশ-পাশে চোখ ফেলেই বুঝতে পারলেন অবিনাশবাবু। মিথ্যে নয় যে বায়ু-ভূতটার কথাও তাও পারলেন বুঝতে অবিনাশ বাবু রাম-ভীম চাঁদদের মানসিক অবস্থা দেখে। তাছাড়া ব্যাপারটা তো নূতন নয়। সব কিছু দেখে, শুনে, বুঝে এই ধারনাই হল তার যে হোম-যজ্ঞ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কখনও বৃথা যায় না। যজ্ঞের ধোঁওয়া, গীতা পাঠের স্বর, চণ্ডীপাঠের ঝঙ্কার যদ্দূর যায়—তদ্দূর থেকে নাকি নীচ সত্তা, অসৎ আত্মারা সব তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালায়। অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরেব বায়ুভূত বা ঝোড়ো-প্রেতগুলো অর্থাৎ যারা পবনদেবকে আশ্রয় করে থাকে, তারা চট-জলদি না গেলেও কোন ক্ষতি করতে পারে না। কারণ যজ্ঞের আগুন ও শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ধূপ-ধুনায় তাদের সে শক্তি যায় নষ্ট

হয়ে। ইন্দ্রের বজ্রে পাখা কাটা পাহাড়-পর্বতগুলোর মত। সেই রকমই একটা কিছু হয়েছিল মনে হয় দেবুড়ির দেবেন দেওয়াশীর দিব্যকর্ম ও ধর্ম-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। নইলে নদীর বুক থেকে অন্যান্য বারের মত গর্জে আসা ওই ঝোড়ো-ভূতটা বা ঘূর্ণিবায়ু রূপী প্রেতাত্মাটা তারক্কারখানার সামান্য ঘাসটাও উপড়াতে পারবে না কেন। সব তাহলে তার ওই হোম-যজ্ঞেরই ফল। ফলতে তা দেরী হলেও ধর্ম-কর্ম কখনও বৃথা যায় না। এর প্রমাণ এদ্দিন পর প্রত্যক্ষ করলেন অবিনাশবাবু।

যাই হোক, দীমাকটা একটু ঠাণ্ডা হল অবিনাশবাবুর। কাজে কাজেই ভূতনাথের উপর উঠতি রাগের মিটারটাও গেল একটু নেমে। ঠাণ্ডাস্বরে তাই জিজ্ঞেস করে উঠলেন তিনি তাকে,—আচ্ছা ভূতনাথ বাবু, যা হবার হয়ে গেছে—ছেড়ে দিলাম না হয় ওসব। গতস্য শোচনা নাস্তি। ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। আপনার স্ত্রীর আত্মা বা ভূত প্রেতাত্মাদের সম্পর্কে আপনি তো অনেক কিছু জানেন। এখন বলুনতো আপনি, ঘূর্ণিঝড়ের রূপ ধারন করে এদ্দিন যে প্রেতাত্মাটা আমার কারখানার সর্বনাশ করতে আসছিল সেটা কোন শ্মশান চিঁয়ানো ভূত না সাধনায় বশ করা কোন প্রেতাত্মা। কি না? কে বা কারা কোন ভূত সিদ্ধাই বা পিশাচ সাধককে দিয়ে এদ্দিন আমার কারখানার ক্ষতি করে আসছিল বলতে পারেন?

"—কেও আপনার কোন ক্ষতি করেনি।' বলে উঠল ভূতনাথ।, —তবু যদি জানতে চান তবে বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি, এদ্দিন ধুরে চলে আসা আপনার এই কারখানার ক্ষতির জন্য দায়ী হচ্ছে আপনার ঠাকুরদা। অর্থাৎ ওই লম্পট চরিত্রহীন লোকটার নীচ, হীন, জঘন্য কর্মের ফলই—

"—খবরদার বলছি।' ধমকে উঠলেন অবিনাশবাবু। তার নির্বাপিত হয়ে আসা অগ্নি শিখাটায় যেন হঠাৎ ঘি ঢেলে দিল ভূতনাথ। দপ্ করে তাই উঠলেন জ্বলে তিনি। বললেন ক্রুধোন্মত্ত অবস্থায়—আমার ঠাকুরদা'র সম্বন্ধে আর কনা-মাত্র অবান্তর কথা উচ্চারণ করেন যদি আপনি তবে জিবটা আপনার টেনে ছিঁড়ে দেব। জানেন আপনি আমার ঠাকুরদাকে?

ভূতনাথ চুপ।

—যাকে জানেন না। বুঝে না তার সম্বন্ধে এমন অশালীন উক্তি করেন কোন লজ্জায়? এত সাহস আপনার হল কি করে?

ভূতনাথ তবু নির্বাক। ভাবতে লাগল বোধ হয় এভাবে বলাটা তার ঠিক হয়নি।

"—কে আপনাকে আমার ঠাকুরদার সম্বন্ধে বলেছে এসব কথা? কেন হারামজাদা, হারামজাদী ঢুকিয়েছে আপনার মগজে আমার ঠাকুরদা'র সম্পর্কে এসব মিথ্যা নীচ-হীন জঘন্য ধারনা?" ধাপের পর ধাপ রাগটা অবিনাশবাবুর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে র্জনটাও তার ক্রমশঃ হয়ে উঠতে লাগল মাত্রা ছাড়া। কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত ভূতনাথ যে হঠাৎ এমন একটা ব্যোম্ বাস্ট করবে তা ছিল তা সকলের ধারনার বাইরে। তাই সঙ্গী শাকরেদরা সবাই হল হতভম্ব, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়। সাত পাঁ বুঝিয়ে এই অগ্নিগর্ভ ব্যাপারটার মোড়টা অন্যদিকে ঘুরিয়ে শান্ত করবে কি তারা। হঠাৎ ভূতনাথ বাবুর হল উক্তি,—বলবে আবার কে আমাকে? শুনব আবার আমি কার কথা? মগজ আমার ছ্যাঁদা নয়, যে যে-যাই বলবে তাই যাবে ঢুকে। তা ছাড়া আমার তো একটা নিজস্ব বোধ-বুদ্ধি আছে। আমি কখনও পরের মুখে ঝাল খাই না। নিজে যা জানি, যা বুঝি—তাই বলি।

"—কি জেনেছেন? কি বুঝেছেন আপনি আমার ঠাকুরদা সম্বন্ধে? এক একটা গোলার মত ছুঁড়ে মারতে লাগলেন প্রশ্নগুলো অবিনাশবাবু ভূতনাথকে '—বলুন আপনি কি এমন জঘন্য কাজ করেছিলেন আমার ঠাকুরদা। লম্পট তাকে আপনি বলবেন কেন? দি তার প্রমাণ। থমকে গেল ভূতনাথ। কিন্তু ধমকে তেমনি লাগলেন বলতে অবিনাশবাবু, —চুপ দিয়ে রইলেন কেন—বলুন? বলতেই হবে আপনাকে। বলুন তো আপনি কি নাম ছিল আমার ঠাকুরদার? উত্তর দেন—

"—রসিক নাগর চৌধুরী।" ছোট্ট একটা উত্তর বেরিয়ে এল ভূতনাথের মুখ দিয়ে। উত্তরটাকে তার টেনে বলতে লাগলেন অবিনাশবাবু, —জানেন এই রসিক নাগর চৌধুরী এ অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন? জানেন, এই রসিক নাগর চৌধুরীর দানে এখানের অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে? জানেন, সেবায় ধর্মে ত্যাগে তার কত মঠ মন্দির আশ্রম পুষ্ট হয়েছে? কত গরীব মা বাবা তাদের কন্যাদায় থেকে মুক্ত হয়েছেন?

এই রসিক নাগর চৌধুরীর মহত্ব কতজানেন আপনি? জানেন আপনি জীবিতকালে বাড়ীতে তার ছিল সদাব্রত, ছিল দান-ছত্র? সব ধরনের সাধু সন্ন্যাসী, অতিথি ফকিরদের সেবা-যত্ন দান দক্ষিণার জন্য সব সময়ে যে তার বাড়ীর দরজা খোলা থাকত জানেন তা আপনি?

ভূতনাথ শুধু শ্রোতা হয়েই রইল দাঁড়িয়ে। 'হুঁ বা না কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর করল না সে কিছুই। অবিনাশবাবু তার বাক্যধারার গতিটা যেন ফাস্ট গীয়ারে চালাতে লাগলেন, —জেনে নেবেন আপনি আপনার কান ভারী কর। এ অঞ্চলের চেড়া-চামুণ্ডাদের কাছ যে প্রতি থেকে পূর্ণিমায় একশ আটজন সাধু-বৈষ্ণব সেবা করতেন কিনা আমার ঠাকুরদা।"

"—এ কথা কেও অস্বীকার করলে মুখে তাদের পোকা পড়বে হে খুড়ো।" শাকরেদ শিরোমণি শ্রীমান গাজু চট্টরাজ উঠল বলে অবিনাশ বাবুকে।'

"—আর নবমীর ভোজটার কথাও বল।" উঠল বলে তার আর এক পাশ ফেংড়া শ্রীমান ক্ষুদিরাম বাড়ুজ্জে,—এমন ঠেসে খাওয়াতো যে তিনি দিন ধরে গায়ের অলিতে গলিতে শুধু হেও হেও—হেও হেও ঢেকুরের শব্দ শোনা যেত।"

"—আর তার বৈঠকখানায় বিষ্ণুপুরের তামাকের ঢেলা যে হাতীর লাদের মত সব সময় নামানো থাকত সে কথাটাও বল।" উঠল বলে বংশী বাড়ুজ্জে,—"যে যত পার দেওয়ালে ঠাঙ্গানো হুকো নামাও, কলকে সাজ, যত পার খেয়াল মেটাও, কোন আপত্তি নেই। এমন দাতা দানবীর পুরুষ দুনিয়ায় আর দুটি হবে না হে।"

কেড়ে নিয়ে তার মুখের কথা উঠল বলে তার আর এক তোষামোদকারী,—আর সে মহাপুরুষকে বলে কিনা লম্পট চরিত্রহীন। জিব খসবে না তাদের? পড়বে না মাথায় বজ্রাঘাত? সীতারাম সীতারাম। এসব কথা শোনাও মহাপাপ।

. পাঁচমুখের পাঁচ রকম সমর্থন পেয়ে বলার মাত্রাটা আরো চড়ালেন অবিনাশবাবু, চালাতে লাগলেন তিনি তার পিতামহের গুণধারা,—যারা আপনাকে আমার ঠাকুরদা সম্বন্ধে এমন যা-তা মন্ত্রনা দেন তাদের বাপ-ঠাকুরদাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিবেন আপনি যে এ অঞ্চলের লোক যাতে ধর্মপ্রাণ হয়, পুণ্যবান হয় তার জন্য কতবার কত বড় বড় পণ্ডিতকে দিয়ে গ্রামের মাঝে আসর করে গীতা-পাঠ, চণ্ডীপাঠ, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ইত্যাদি পাঠ তিনি করিয়েছেন কিনা। এসব কথা শুধু আমার মা ঠাকুরমার কাছেই শোনা নয় আপনাকে যারা কান ফিসফিসানি দিয়ে আমার ঠাকুরদা সম্বন্ধে ওরূপ বিরূপ মন্তব্য করতে বাধ্য করিয়েছে তাদের দাদু-দিদিমা, ঠাকুরদা-ঠাক্‌মাদের কাছেই শুনেছি আমি। একবার নয় বহুবার এবং বহুভাবে তা জানেন?

"—ভুল করেছেন অবিনাশ বাবু।" বলে উঠল ভূতনাথ—কেও আমার কানভারী করেনি বা কানে আমার ওরকম বিষও কেও ঢালেনি। তাছাড়া পরের কথা ধরে চলা বা বলা বা বিশ্বাস করা আমার ধাত নয়।

—তবে আমার ঠাকুরদার মত এমন গন্যমান্য লোক সম্বন্ধে আপনি এমন অবান্তর কথা বললেন কেন? কেন আপনি আমার সামনে নীচহীন জঘন্য বলবেন তাকে? এত বড় স্পর্ধা আপনার হল কি করে? এ বলার সাহস আপনি পেলেন কোত্থেকে?

ব্যাপারটা বোধহয় ঘোরালো হয়ে দাঁড়াবে বলে শাকরেদরা অবিনাশবাবুকে নানাভাবে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কেও বলল ভূতনাথ বাবু পাগল, মাথা খারাপ, ঘিলু গোলমেলে লোক। কেও বলল রাত জেগে হয়তো তার মগজের কোন ঠিক নেই। আমার কেও বলল হয়তো রাম সিং, ভীম চাঁদদের মত সিদ্ধি গাঁজা-আফিঙ খোরদের সঙ্গে থেকে ওসব অভ্যাস করার ফলে ভোর—দিকে মাত্রাটা একটু চড়িয়েই বসেছেন তিনি। তাই কথাবার্তার মাথা মুণ্ডু যেমন তার কোন ঠিক নেই তেমনি ঘোরে মুখ ফসকে তার কখন কি বেরিয়ে যাচ্ছে তারও কোন হুঁশ নেই। সুতরাং নেশাখোর লোকের ফালতু ওসব বাজে কথায় মাথা গরম করা ঠিক নয় অবিনাশবাবুর।

কিন্তু অবিনাশবাবু ছাড়বার পাত্র নন। তাছাড়া শাকরেদদের কথার উপর টেক্কা দিয়ে বলে উঠল ভূতনাথ যে তার নেশা-ভাঙ করাও যেমন অভ্যাস নয় তেমনি তাদের মত খোশামোদ করে কাকেও কিছু বলাও তার

প্রকৃতি বা স্বভাব নয়। নয় সে পাগল বা ক্ষেপা। মাথা খারাপ হয়নি তার। কোন কিছু না জেনে বুঝে ফালতু বা বাজে কথা বলার লোক নয় সে। সাফ্ কথা হল তার, বলেছে— ়ই বলেছে। তবে কেন বলেছে? কি করে বলেছে সেসব কথা নাকি না শোনাই ভাল অবিনাশবাবুর।

কিন্তু সে ভাল বললে কি হবে—তার ভালটা শুনছে কে? তাছাড়া এসব হল অবিনাশবাবুর বংশের মান-সম্ভ্রমের প্রশ্ন। চৌধুরী পরিবারের দস্তুর মত ইজ্জতের প্রশ্ন। প্রশ্ন তার পূজনীয় ঠাকুরদার আত্মসম্মানের। সুতরাং ফালতু বাত, খেলো কথা বলে ভূতনাথবাবুর বক্তব্যটাকে পাশ কাটিয়ে ফেলে চলে গেলে বা তার সঙ্গী শাকরেদদের কাছে এর একটা প্রতিকার না করে কথাটাকে তার চেপে বা দেবে দিলে বা বাজে ফালতু বাত বলে নিছক উড়িয়ে দিয়ে ফেলা যাবেন তো অবিনাশ চৌধুরী নিজেই। ঠাকুরদার উদ্দেশ্যে তার প্রয়োগ করা ওই সমস্ত অশালীন কথাগুলোকেই সমর্থন করা হয়ে যাবে তার। অতএব সহজে ভূতনাথকে ছাড়লেন না অবিনাশ চৌধুরী। বিনাশ করতে তার স্পর্ধাটাকে, নিকুচি করতে তার সাহসটাকে এবং হাড়ে হলুদ দিতে তার আজে-বাজে কথা বাহাদুরিটাকে চেপে ধরলেন তিনি। এতো আর তার যাকে তাকে যা তা কথার জাবর কাটা নয়। পড়েছে সে অবিনাশবাবুর পাল্লায় এবং দিয়েছে সে তার পরম পূজনীয় স্বর্গীয় ঠাকুরদাকে ঠোক্কর। সুতরাং ফালতু কথার ফুলঝুরি ছুটানো তার বন্ধ করে দেবে সে চিরকালের মত। তাই কোন রকমেই আর গোলা পিছ্‌কিয়ে যেতে দিলেন না অবিনাশবাবু ভূতনাথকে। টিপে কাঁঠাল পাকানোর মত প্রায় জোর করেই বলতে বাধ্য করালেন ভূতনাথবাবুকে তার ঠাকুরদার সম্বন্ধে ওসব যা তা কথা বলার কারণ।

কাজেই নাছোড়বান্দা অবিনাশবাবুর কাছে মুখ খুলতে হল ভূতনাথকে। মুখ খুললে একবার এমন ভূত চাপে ভূতনাথের মাথায় যে তার তখন কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। থাকে না কোন মালিক—প্রভু বোধ অথব. ভয়-ডর, লজ্জা-সরম বা সমীহ সঙ্কোচের কোন বালাই। জানা-বুঝা সত্যটাকে তার বলার ধারায় এমন তোড়ে বহিয়ে নিয়ে যায় সে যেন বাঁধ-ভাঙ্গা কোন স্রোত। মুখে কোন কাঁটা-খোঁচা—মানে যাকে বলে আগল মানামানি সে সবের কোন তখন ধার ধারে না সে। অবিনাশবাবুর অক্টোপাশের মত ধরে বসা কথার চাপে সেই ধারাই তখন শুরু হল ভূতনাথের। দিতে আরম্ভ করল সে তার পূজনীয় ঠাকুরদার যতসব কীর্তি-কলাপের পরিচয়।

সে অনেক কাণ্ড। তবে অবিনাশবাবু তার ঠাকুরদার সম্বন্ধে গেলেন বলে যেসব কথা, সেগুলো কিন্তু স্বীকার করল ভূতনাথ। তবে এ চরিত্রের পরিবর্তন তার হয়েছিল নাকি পরিণত বয়সে। তার ধর্ম-পত্নী মালতী-দেবীর খপ্পড়ে পড়ে। তারই চেষ্টায় অমনি আদর্শপ্রাণ, ধর্মপরায়ণ, চরিত্রবান এবং দানপুণ্য সেবাব্রতে ওমনি উৎসর্গীকৃত প্রাণ হতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু প্রথম জীবনে ছিলেন তিনি এসবের সম্পূর্ণ উল্টো, বিপরীত। অর্থাৎ অসৎ, অধার্মিক, বদ চরিত্র ও কু-স্বভাব পরায়ণ ব্যক্তি। তিনি যে লম্পট ছিলেন তার নাকি জাজ্জল্যমান প্রমাণ তার ঠাক্‌মা অর্থাৎ মালতী দেবী স্বয়ং। কারণ এই অনূঢ়া ঠাকুরমা তার যুবতী বয়সে এসেছিলেন একবার যখন তার মাসীর বাড়ী এই রায়গঞ্জে তখন নাকি তাকে আশ্রম ফেরার পথে পাকড়াও করেছিলেন তার সেই গণ্যমান্য ঠাকুরদা, রসিক নাগর চৌধুরী। দলবল নিয়ে। নদীর ঘাটে। প্রকাশ্যে দিবালোকে। নির্লজ্জভাবে। ভাগ্যে নাকি সাধুর ডাঙ্গা থেকে সাধুবাবা ত্রিশূল হাতে ছুটে আসেন তাই নাকি তার ঠাকুরমার যুবতী ধর্ম হয় রক্ষা।

শুনতে শুনতে হেসে উঠলেন অবিনাশবাবু। হাসবারই কথা। কারণ বিয়ে হওয়ার আগে কোন ছোকরা যদি তার ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে একটু মজা-মসকরা করেই থাকে—তাতে দোষের কি আছে?

কিন্তু তার পরের ব্যাপার? মুখের শিকারকে তার ছিনিয়ে নেবার রাগে সেই সাধুবাবার উপর আক্রোশটার? সেটা তো আর হাসি মসকরা করার ব্যাপার নয়।

সে আক্রোশের কথা বলতে বলতে এল যখন ভূতনাথ তার শিবানীকে রোক করা ওই লম্পটটার কথায় তখন ধৈর্য্যহারা হল সে। ভাঙ্গল যেন তার সংযমের বাঁধ। কথায় যেমন বলে "চোখ ছুলে বলা" বা "ছাল ছুলে দেখানো" তেমনি যেন দুচোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চাইল ভূতনাথ তার মালিক অবিনাশ চৌধুরীর গুণবান ঠাকুরদার চরম কুকীর্ত্তি। তার ওই মস্তান গুণ্ডা ঠাকুরদা রাত্রেবেলায় সঙ্গী-শাকরেদ নিয়ে নদীর মাঝে তার লাম্পট্যের তৃষ্ণা চরিতার্থ করবার জন্য কেমনভাবে ছোবল মারতে এসেছিল তার শিবানীকে সেসব কথা

ভূতনাথ খুলে তাকে লাগল বলতে। যেন ঝেড়েকাপড় পরিয়ে দিতে লাগল সে তার ঠাকুরদার চরিত্রটার। সেই মালতী দেবীকে না পাওয়ার আক্রোশের জেরের সঙ্গে শিবানীকে ভোগ করতে না পারার রাগ যুক্ত হয়ে পরিণত করল রসিক নাগর চৌধুরীকে একটা হিংস্র নরমাংস ভুক্ পশুতে। সে পশুটার পাশবিক কাণ্ড বলতে বলতে ভূতনাথের চোখ ফেটে এল জল। কণ্ঠে এল কান্না। কান্না-চাপা কাঁপা—দাবা গলায় বলতে লাগল যখন ভূতনাথ সাধুর ডাঙ্গার সেই সাধুকে পেটে ত্রিশূলের খোঁচা মেরে তার হত্যার কাহিনী তখন অবিনাশবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। সহ্য করার কথাও নয়। কারণ কোন্ সাধের নাতি ঠাকুরদাদাকে তার সকলের মাঝে লম্পট-লোফার, লুচ্ছার-নচ্ছার, নারী লোলুপ বা নরহত্যাকারী বললে সহ্য করতে পারে? তাও আবার চাকর হয়ে তার মালিকের সামনে! কুকুরই তার ইচ্ছা মত লেজটাকে দেয় নাড়া। কিন্তু এযে লেজ হয়ে কুকুটাকেই দিচ্ছে সে নাড়া।! আস্পর্ধা তো কম নয়! তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন অবিনাশ বাবু। ক্রোধে হলেন অগ্নিশর্মা। ধমকে উঠলেন ভূতনাথকে—সাবধান বলছি! মুখ সামলে কথা বলুন। ঠাকুরদার সম্বন্ধে এরূপ শত্রুর মুখে শোনা বাজে কথা, মিথ্যে কথা বলেন যদি তাহলে কিন্তু কিছুতেই আর ক্ষমা করা হবে না আপনাকে। লজ্জা করে না আপনার একজন এ অঞ্চলের সবার মান্য-গণ্য, সকলের শ্রদ্ধেয় পূজনীয় ও স্বর্গতঃ মহাপুরুষের সম্বন্ধে এসব ফালতু কথা বলতে? ছিঃ। ধিক আপনাকে।

"—জানি আমি," নম্রস্বরে বলে উঠল ভূতনাথ,—"বললে এসব রাগ হবে আপনার। অযথা উত্তেজিত হয়ে উঠবেন বলেই তো আমি চাই নি এসব কথা বলতে আপনাকে। কিন্তু একটা কথাও আমার মিথ্যে নয়। হয়ত আপনার পূজনীয় পূর্বপুরুষের সম্পর্কে এসব কথা বলা আমার ঠিক হবে না তবু কিন্তু জেনে রাখুন আপনি—আমি কখনও বাজে বকি না, ফালতু বলি না।

—তাহলে কি বলতে চান আপনি, আমার ঠাকুরদা, যিনি এ অঞ্চলের একজন সবার সম্মানীয়, সকলের নমস্য প্রাতঃস্মরণীয় নামজাদা জমিদার ছিলেন তাকে আপনার কথায়, শত্রুপক্ষের শেখানো বুলিতে একজন বাউণ্ডুলে মস্তান বলে, একজন লম্পট, চরিত্রহীন, গুণ্ডা-বদমাশ ব্যক্তি বলে মেনে নিতে হবে? স্বীকার করে নিতে হবে আমাকে আপনার বিকৃত মস্তিষ্কের কথায় যে তিনি একজন খুনারু ছিলেন? এবং খুন করেছিলেন তিনি অন্য কাকেও নয় আমাদেরই আশ্রিত, পালিত সাধুডাঙ্গার আশ্রমের সাধুকে? গুল ঝাড়তে আর জায়গা পাননি?

"—সূক্ষ্মাত্মারা কখনও অসত্য কথা বলে না অবিনাশবাবু," ধীর গম্ভীর স্বরে বলে উঠল ভূতনাথ—উচ্চ সত্তাদের মাধ্যমে জানা বুঝা কোন কথা কখনও আমার মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং রসিকবাবুর সম্বন্ধে বলা হল যা, তা সব সত্যি।

জ্বলন্ত আগুনে যেন ঘি পড়ল অবিনাশবাবুর। তাই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন তিনি,—কি মনে করেছেন আপনি? আমি আপনার গোপাল ডাঙ্গার গোরাচাঁদ বাবু, না গদারডিহির মানিক চাঁদ? তাদের আপনি ওসব ফালতু প্রেতুড়ে ভৌতিক অবান্তর অবাস্তব কথা বলে ভুলাতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার কুমোর খুলির কুলদাঘোষের স্ত্রীও নই বা পলাসডাঙ্গার প্রহ্লাদ পরামানিকের বিধবা-স্ত্রী পত্নী প্রমীলা দেবীও নই। ভেবেছেন কি আপনি? আমার বংশ ও পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে খুনারু, লম্পট, সাধু হত্যাকারী ইত্যাদি যা-তা কথা বলে যাবেন আপনি আর আমি সে সমস্ত আপনার অম্লান বদনে সহ্য করে যাব? গুরুবাক্য বলে হজম করে যাব?

ফোড়ন কেটে ওমনি পাশ থেকে তার বলে উঠল গাজু চট্টরাজ,—এই জন্যই বলে হে, যার শিল, তার নড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।

অন্য একজন তোষামোদকারী তার চেয়ে একটু মাত্রা চড়িয়ে ঝাড়ল আর একটা প্রবচন—বকঃ পরমদারুণঃ। তখন তো শুননি আমার কথা। কতবার বলেছিলাম উড়নচণ্ডী একটা ছোকরাকে এভাবে লাই দিয়ে মাথায় তুল না। কথায় বলে—আঁটকুড়ের পুত যারা, আঁতে ঘা দেওয়ার ভূত তারা। আমার ছেলেটাকে কারখানায় রাখ, সব কিছু তোমার নিজের মত দেখবে, বাগিয়ে গুছিয়ে রাখবে। কিন্তু ভায়া, গরীবের কথা বাসি হলে ভাল লাগে। এখন দেখছো তো কি চীজটিকে রেখেছো তুমি। এর জন্যই তো মহাপুরুষরা বলে

গেছেন,—দুধ কলা দাও যত, সাপের বিষ বাড়ে তত। আর বিষ বাড়লেই তো তার বিষদাঁতটা ছোবল মারবার জন্য শির শির করবেই। এতে আবার বিচিত্র কি।

ঠোঁট কামড়ে মুখ চিমড়ে চাপা রাগে গর গর করতে করতে বলে উঠলেন অবিনাশবাবু,—কার বিষদাঁত কি ভাবে ভাঙ্গতে হয় তা আমার ভালোভাবেই আছে জানা। শুনুন ভূতনাথবাবু যদি ভাল চান আপনি তাহলে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে আমার ঠাকুরদার সম্বন্ধে যে সব অশালীন উক্তি করলেন আপনি তার জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আপনাকে। প্রতীজ্ঞা করতে হবে আপনাকে এরূপ মিথ্যা কথা জীবনে কখনও আর বলবেন না আপনি। আর থাকতে হলে এখানে কর্মচারীর মতই থাকতে হবে আপনাকে। মালিকের মুখের উপর মুখ দেওয়া, কথার উপরে কথা বলা চলবে না আপনার। অনেক বেয়াদপি আপনার সহ্য করেছি—আর নয়।

ভূতনাথ রইল দাঁড়িয়ে গুম হয়ে। সে শুধু লাগল যেতে শুনে। মাথাটা নীচু দিকে করে। উত্তর-প্রত্যুত্তর করল না কিছু। অবিনাশ বাবু লাগলেন যেতে চালিয়ে তার বাক্যধারা,— সব সময় মনে রাখবেন আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। কোথায় পাথরমুড়ি গ্রামে কাকতালীয়ভাবে ঠাকুর মন্দিরের গোবিন্দ গোঁসাই এর রাধা-গোবিন্দজীর চুরি করা গহনা উদ্ধার কবেছেন বলে বাহাদুরী দেখাবেন তা আমার কাছে চলবে না। প্রভুর কাছে ভৃত্যের মত থাকতে হবে আপনাকে। গোলাম হয়ে মালিককে অপমান জনক কথা বলা বা তার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করা চলবে না আপনার।

"—এটা কিন্তু ভুল ধারনা আপনার।" বলে উঠল ভূতনাথ,— আমি আপনার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করিনি বা কোন অপমানজনক কথাও বলিনি আপনাকে। যা সত্য তাই বলেছি। ঠাকুরদার সম্বন্ধে বলা কথাগুলো আমার অশালীন কথা নয়। কিন্তু স্পষ্ট কথায় যদি কষ্ট হয় আপনার তবে আমি কি করব? বলতে বললেন আপনি, তাই তো বললাম। আর সত্য কথা বলার সঙ্গে প্রভু-ভৃত্য, শ্রমিক-মালিকের কি সম্পর্ক? অবশ্য বিশ্বাস করা বা না করা সেটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখবেন আপনি আপনার ঠাকুরদা যতই পরম পূজনীয় মহাপুরুষব্যক্তি হোন আর আপনি যত বড়ই মালিক প্রভু দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর হোন জিজ্ঞেস করলেই কিন্তু যা সত্য তা আমি এখন যেমন স্পষ্ট করে বললাম তেমনি স্পষ্ট চিরকাল বলে যাব। আমার জ্ঞানত সত্যকে আমি মিথ্যা দিয়ে কখনও ঢাকিয়ে রাখতে পারব না বা রঙ চড়িয়ে ফালতু কথা বলে আপনার এই সমস্ত চাটুকার বা তোষামোদকারীদের মত মন যোগাতেও পারব না। সাফ কথা।

এই হল বদ-স্বভাব ভূতনাথের। খুললে একবার মুখ তার আর কোন আগল বাঁধন নেই। যার সম্বন্ধে যা ধারনা হয় তার তাই ওমনি দেয় সে চটাপট বলে। এ বলা তার কার যে কোথায় লাগবে এবং ফল তার কি হবে সেসব কোন ভাবনা চিন্তা নেই তার। মস্ত ঠোঁট-কাটা মানুষ সে। চাঁছা ছোলা মুখ তার। এরকম মানুষদের সাধারণত যেমন বিপদে পড়তে হয় তেমনি বিপদে পড়ল ভূতনাথ। অর্থাৎ অবিনাশবাবুর সাঙ্গ-পাঙ্গরা কথা শুনে তার বেজায় গেল চটে। খচে গেল মেজাজ সকলের ওই সব 'চাটুকার তোষামোদকারী' ইত্যাদি শব্দে। বলে উঠল তারা অবিনাশবাবুকেই,—একটা যা-তা লোকের কাছে সাত-সকালে আপনি কি আমাদের গালি-গালাজ খাওয়াতে আনলেন। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনারই কর্মচারী অপমান করবে আর আমরা তাই সহ্য করতো?

সত্যিই অসহ্যেরই ব্যাপার আর অপমানেরই কথা। ধমকে উঠলেন অবিনাশ বাবু ভূতনাথকে—বেরিয়ে যান আপনি। যান বেরিয়ে আমার কারখানা থেকে। কাজ করা তো আপনার এখানে দূরের কথা। কোনদিন আমার কারখানায় যদি পা ফেলতে দেখি তবে সেপাই দারোয়ান দিয়ে সে পা আপনার চিরকালের মত খোঁড়া করে দেওয়া হবে। মনে রাখবেন।

বুঝতে পারল ভূতনাথ, ওসব কথা বলা তার ঠিক হয়নি। সত্যিই বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তার। রাগের তাপে মুখ ফসকে বেরিয়ে কথাগুলো যে ওমনি করে অপরের মনে আঘাত দেবে এতটা বুঝতে পারেনি সে। কিন্তু ছোঁড়া তীর তো ফেরানো মুস্কিল। এখন উপায়?

উপায় চিন্তা করবে কি ওমনি এল অবিনাশবাবুর এক ঝটকা ধমক,—কি ভালভাবে বেরিয়ে যাবেন না রাম সিং, ভীম চাঁদের লাঠিদিয়ে পেটা করে কুকুর তাড়া করতে হবে আপনাকে?

"—তার দরকার হবে না অবিনাশ বাবু বেরিয়ে আমি আপনা থেকেই যাচ্ছি।" বলে উঠল ভূতনাথ "—তবে একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি আপনাকে। সে অনুরোধটা রক্ষা করলে আপনারই কল্যাণ হবে। মঙ্গল হবে আপনার এই কারখানাটার। ঘূর্ণিঝড়রূপী এখানের ওই সাধুর আত্মাটার বড় ইচ্ছা ছিল—সাধুর ডাঙ্গায়, আশ্রমে তার একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করা। তাতে একটি লিঙ্গ-রাজের মূর্ত্তি স্থাপন করা। আপনার কারখানার কোন এক পাশে সাধ্যমত সামান্য একটা মন্দির নির্মাণ করে সাধু বাবার যদি সেই অন্তিম ইচ্ছেটা পূরণ করেন আপনি তবে তাঁর আশীর্বাদে ভালই হবে আপনার।

—আমার ভালমন্দ আমি বুঝব। সে চিন্তা করতে হবে না আপনাকে মানে মানে আপনি কেটে পড়বেন তো পড়ুন—নইলে বাধ্য হয়েই ঘাড় ধরে আপনাকে ঘরের রাস্তাটা দেখিয়ে দেওয়া হবে।

বলতেই অবিনাশবাবু ওমনি তার সঙ্গে ফোঁড়ন দিয়ে উঠল গদাধর চাটুজ্জে,—দরদ ওহে দরদ। কোদর দেখাচ্ছে তোমার কারখানাটাকে। ইচ্ছে পূরণ ঠাকুরের ইচ্ছে পূরণ না করলে তোমার সমূহ বিপদ কিনা তাই সাবধান করে দিচ্ছে।

"—সাবধানের আর কোন প্রয়োজন নেই অবিনাশবাবু", বলে উঠল ভূতনাথ—ভৌতিক ঝড় বা প্রেতুড়ে ঘূর্ণিঝড় রূপে যে আত্মা আক্রোশে তাঁর ধ্বংসমুখী প্রকৃতি নিয়ে আসতেন, তিনি আর কখনও আসবেন না আপনার এই কারখানায়। চিরকালের মত বিদায় নিয়েছেন তিনি তার এই ক্ষেত্র থেকে। তার সে অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করুন বা না করুন—সেটা আপনার খুশি। তবে আর কখনও কোনরূপে ক্ষতি হবে না আপনার কারখানার। মহাপুরুষদের রেখে যাওয়া কাজ বা অন্তিম কামনা পূরণ করলে তাঁদের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। এই সাধু-সত্তার সৎ সংকল্প পূরণ করলে সেই মহৎ আত্মার আশীর্বাদ পাবেন আপনি। ফলে কারখানার আপনার উত্তরোত্তর উন্নতি হবে। উন্নতি লাভ করবেন আপনি।

"—আর কি হবে?" বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করে উঠতেই অবিনাশ বাবু ফোঁড়ন কেটে উঠল তার একজন শাকবেদ—শাগ দিয়ে মাছ ঢাকা হচ্ছে হে সাঙ্গাত, বুঝতে পারছো না?

অপর একজন জুড়ি, জুড়ে দিল তার সঙ্গে একটা টিপ্পনি, —'এযে গরু মেরে জুতো দান হে খুড়ো। কান মলে ফু দেওয়া। ছোকরা কায়দা জানে বটে।" বলেই সুর করে সে উঠল কেটে একটা ছড়া—

"কত রঙ্গ দেখব প্রভু সত্যনারাযণ,
কলির মশা কামড়ে কানে শোনায় রামায়ণ।।"

তিরিক্ষি মেজাজে ওমনি বলে উঠলেন অবিনাশবাবু,—শুনুন মশায়, আপনার নাম ভূতনাথ যখন তখন আপনার মাথায় ভূত চাপতে পারে, আমার মাথায় নয়। ঘা করে আমাকে আর প্রলেপ দিতে হবে না। আমার কারখানা যখন তখন কিসে তার উন্নতি অবনতি আমি বুঝব। আপনাকে ও নিয়ে আব মাথা ঘামাতে হবে না। ওসব ভূত-প্রেতইত্যাদি নীচাত্মা বা হীন সত্তাদের কথা বলে আমাকে আর ভুলোতে পারবেন না। আমি পাগল নই যে বলা মাত্রই আপনি কথা শুনে আপনার কতকগুলো বৃদব্যয় করতে যাব। ওসব মন্দির মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে হয় আপনি করুন গে। ফালতু ওসব বাত ঝেড়ে এখানে আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না। কেটে পড়ুন।

—যাকে আপনি নীচ আত্মা বা হীন সত্তা বলে ভাবছেন! উনি তা আদৌ নন অবিনাশবাবু।" বলে উঠল ভূতনাথ,—ত্রিপুষ্কর যোগ দোষে এক অসৎ মানুষের হাতে অকালে উনাকে দেহত্যাগ করতে হয়েছিল বলেই উনি ওমনি স্বভাব বিরুদ্ধ প্রকৃতির বশে পড়ে গেছলেন। আসলে কিন্তু উনি উচ্চাত্মা।

ধমকে উঠলেন অবিনাশবাবু—আবার সেই পাগলামি। দেখুন মশায়, মাথাটা আমার আর খারাপ করবার চেষ্টা করবেন না। আপনার বাপের ভাগ্যি ভাল যে এখনও পিঠের চামড়া নিয়ে আপনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। চৌধুরী বংশের মুখে আপনি যেভাবে মিথ্যা কুৎসা—কলঙ্ক রটিয়ে চুন কালি দিয়েছেন তাতে ছালটা আপনার ছাড়িয়ে নেওয়া উচিত। যে ঠাকুরদাকে আমার লম্পট, চরিত্রহীন, সাধু-হত্যাকারী বলে তার মুখ দেখাও পাপ। আর দাঁড়িয়ে থেকে, কারখানাতে আপনার ছায়া ফেলে জায়গাটাকে আর অপবিত্র করবেন না। এখানে আপনার গায়ের বাতাস বইলেও পূর্ব-পুরুষদের অভিশাপে পড়তে হবে আমাকে। আপনাকে আর এক মুহূর্ত্তও সহ্য করতে পারছিনা আমি। কেটে পড়ুন আমার চোখের সামনে থেকে, নইলে—জমিদারী কায়দায়

আদেশ করে উঠলেন তিনি তাঁর সেই সেপাই লগদীটাকে—রাম সিং, ভীমচাঁদ, দে-তো হারামজাদাকে আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে কোনদিকে তার যাবার পথটা দেখিয়ে। তাছাড়া বেটার বকর বকর যাবে না।

রাম সিং, ভীম চাঁদরা অবশ্য করল না কিছুই। যেমন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিলেন তারা তেমনি রইল দাঁড়িয়ে। চোখ তুলে তাকাল না পর্য্যন্ত। কিন্তু ভূতনাথ আর এক মুহূর্তও রইল না দাঁড়িয়ে সেখানে। অবিনাশ বাবুর এ কথার পর থাকাও অবশ্য আর সম্ভব নয় তার। তাই ছাড়ল সে কারখানা। বাড়াল পা সামনের শূন্যডাঙ্গার পথটার দিকে। তার সেই চলে যাওয়া দিকটার দিকে তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নীরব নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। ঝড় উঠল রাম সিং লাল বাহাদুরদের মনে। কারণ আসল দোষে দোষী তো তারাই। তারাই নিজের নোকরি বাঁচাবার জন্য বলেছিল বাবুকে ঝুটা বাত। কিন্তু সে ঝুটা বাত যে তাদের ইস্ মাফিক সব কুছ্ গড় বড় করে দেবে, বিলকুল ভাবেনি তারা। এ যে 'উল্টা সমঝিলি রাম'' হয়ে গেল তাদের। গেল হয়ে বহুৎ বুরা-কাম্।'' ত্রিশূল বাবা না থাকলে তো তারা পারবে না থাকতে এখানে কিন্তু রাখা যায় তাকে কি ভাবে? ইয়াদ হল তাদের বুড়ীমার কথা অর্থাৎ অবিনাশবাবুর ঠাকুরমার কথা। একমাত্র তিনিই পারেন তাদের মুস্কিল আসান করতে। তাই ঠিক করল তারা—তার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে কবুল করবে তারা সব কথা। বিলকুল সাচ বাত বোলবে বুড়ীমাকে। অন্দর বাহার সমুচা সাফ কোরতে না পারলে যে শান্ত হোতে পারবে না তারা। তাই ছুটল তারা বাবুর ঠাক্‌মার কাছে।

এধারে ভূতগ্রামের ভূত ফিরে এল তার গ্রামে। দেখে ভূতনাথকে তার বন্ধু-বান্ধবেরা তো খুশিতে হল ডগমগ। বাবা বলরাম বাড়ুজ্জের বুক আনন্দে উঠল ভরে। মা কমলাদেবী তো তার হারাধন ফিরে পেয়ে খুশিতে হলেন দিশেহারা। পাড়া-প্রতিবেশী, ভূতনাথের সমস্ত মাসি-পিসিদের ছেলের ফিরে আসার খবরটা বার বার বলেও যেন খেদ মিটল না। আর মায়া? তার কথা তো বলাই বাহুল্য। আকাশের চাঁদ পেল যেন সে হাতে। কিন্তু সকলের এত খুশি, এত আনন্দ, এত হর্ষোৎফুল্লের মধ্যে থেকেই ভূতনাথ কেমন যেন রইল গম্ভীর হয়ে। চাঁদের মুখে হাসি নেই। ভাবনার মেঘ, চিন্তার কুয়াশা সব সময় রইল ঢেকে তাকে। ব্যাপার কি?

কি যে ব্যাপার তার—পারল না কেও তার রহস্য উদ্ধার করতে। মা-বাপ্ তো দূরের কথা। সঙ্গীসাথীরাও পেল না তার কুল-কিনারা। এমনকি মায়া পত্নী তার না পেয়ে তার মনের খবর চালাতে লাগল তার মান অভিমানের পালা। অষ্টম প্রহর, চব্বিশ ঘন্টা। কিন্তু বললে তো ভূতনাথ।

না বললেও ভূতনাথ খারাপ খবরের কিন্তু পাখা আছে। সুসংবাদের মত সে কিন্তু শম্বুক গতি নয়। তাই গুম হয়ে থাকার কারণটা এল তার কাছে তিল যেন তাল হয়ে। চাকরির জন্য সে শ্মশানের মাঝে গড়ে উঠা কারখানাটার ভূতপ্রেতদের নাকি তাড়ানোর জন্যই মাঠে কাক তাড়ুয়ার মত রাখা হয়েছিল তাকে। পারে নি বলে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে।

শুনেই তো কমলাদেবী সরলা হয়ে প্রতিবেশীনীদের সঙ্গে খুব এক চোট নিলেন অবিনাশবাবু সহ তার ঘরগোষ্ঠিকে। বাবা গাল মন্দ না করলেও বেশ কড়া স্বরে জানিয়ে দিলেন দারোয়ান গিরি করার জন্য তোকে আমি বড় করিনি। বংশের মান ইজ্জত খোয়াতে তোকে ওখানে চাকরি করতে যেতে কে বলল? আর কোনদিন ও মুখো হবি না।

মায়া ধরল পায়ে,—দোষ আমার স্বীকার করছি ভূতুদা। এবারের মত ক্ষমা কর আমাকে। ক্ষুদ-কুঁড়া ঘরে যা জুটে তাই পরমান্ন মনে করে খেয়ে দিন কাটাব। তবু কিন্তু আর তোমাকে কোথাও চাকরি করতে যেতে দেব না। আমার দিব্যি।

''চাকরি করার ওর দরকারটা কি?'' বলে উঠলেন মা,—''বাপ-শ্বশুরের যা আছে তা ওর ছেলের [illegible] খেলেও ফুরোবে না। পরের দুয়োরে ওকে পড়ে থাকতে হবেই বা কেন?''

হায় ভগবান! চাকরির জন্য যে সে লালায়িত নয়। নয় দুঃখিত সে কাজ চলে যাওয়ার জন্য, এ কথাটা কি করে বুঝাবে ভূতনাথ। কি করে বুঝাবে সে যে মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে আছে সেদিন রাতের তার সতীর কথাটা না রাখতে পারার জন্য। বার বার নিষেধ করেছিল সতী—ওসব রসিক নাগরের কথা, সাধু হত্যার কেলেঙ্কারির ইতিহাস না বলতে কাকেও। জানাতে শুধু নয়, নিজে জেনে বুঝেও তার প্রতিক্রিয়ায় কারোর প্রতি

বিরূপ হতে। উত্তেজিত হতেও নিষেধ করেছিল সে। সূক্ষ্মের কথা বাস্তবে বলা, বলে খুঁচিয়ে ব্রণ তোলা মোটেই উচিত হয়নি ভূতনাথের। ভাবতে গেলে তার প্রতি বিরূপ হওয়া অবিনাশ বাবুর মোটেই অন্যায় নয়। নয় তার দোষ তার প্রতি ক্রোধোন্মত্ত হওয়ার বা তাকে ওমনিভাবে দূর দূব করে কারখানা থেকে কুকুর তাড়া করে বের করে দেওয়ার। ক্রটি তো তারই। ওভাবে কেও যদি কারো বংশের কেচ্ছা কেলেঙ্কারি, পূর্ব পুরুষদের ক্রটি-বিচ্যুতি, চরিত্রহীনতা সকলের কাছে তুলে ধরে, সত্য মিথ্যা যাই হোক ফাঁস করে যদি প্রকাশ্যে তবে কার না রাগ হয়? কাকেও কখনও পূর্ব-পুরুষদের শ্রদ্ধার আসন থেকে, পূজনীয়দের সম্মান মানসিকতা থেকে ঠেলে ফেলে দিতে নেই। অবিনাশ বাবুকে তাই তার ঠাকুরদার প্রতি সৎ ধারনা থেকে বিচ্যুত করায় মহা অপরাধ করেছে ভূতনাথ। শান্ত-শীতল নির্ম্মল পুষ্করিনীর জলকে ঘোলা করে পাঁক উঠিয়েছে সে-ই। সে-ই বিষিয়ে দিয়ে মনটাকে তার অবিনাশবাবুর শ্রদ্ধাশীল, সদ্ভাবনাযুক্ত মনটার মাথায় মেরেছে কুড়ুল। অনুতাপে, অনুশোচনায় দিনের পর দিন দগ্ধ হতে লাগল ভূতনাথ। পুড়তে লাগল সে নিজের মনের আগুনে নিজেই।

কিন্তু এখন উপায় কি তার? কি তার প্রায়শ্চিত্ত এ অপরাধের? নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে যাবে কি সে অবিনাশ বাবুর কাছে—উল্টো বুঝবে সে। ভাববে চাকরির জন্য হয়তো সে তোষামোদ করতে এসেছে। তার সাঙ্গ-পাঙ্গ চেড়া চামুণ্ডাদের কাছে সে যে সত্যিই 'পাগল', মাথা খারাপ', নিজের থেকেই তার প্রমাণ দেওয়া হয়ে যাবে। তাহলে? অথ কিম্?

সেই কথাটাই ভাবতে ভাবতে ভূতনাথ কুলি ছেড়ে এল গ্রামের মাথায়, মাথা ছেড়ে এল আনমনে ঘুরতে ঘুরতে ভূতগ্রামের সেই বাবা ভূতনাথের মন্দির গোড়ায়। খেয়াল ছাড়া যেন। হুঁশ হল তার মন্দির দাওয়ায় নীচে সেই সাদা পাথরটার কাছে এসে। দেখেই পাথরটাকে উঠল মনে জেগে ভূতনাথের বহুদিন আগের তার সেই স্মৃতিটা। সাইকেলে চড়ে পাথরটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ভূতনাথ। সামনে মন্দির দাওয়ায় অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে পূজো দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে সতী। সদ্য স্নাত। শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা সে। হাতে তার থালা ভর্তি পূজো নৈবেদ্য। মুখে তার ভক্তি-নম্র পূজারিনী ভাব। হঠাৎ তাড়কা রাক্ষসীর মত তার সৎ-মায়ের আবির্ভাব। রণ্ রণ্ দন্ দন্ করে সে দাপিয়ে এসেই যেন লাফিয়ে ধরল সতীর খোলা চুলের গুছিটা। খামচে ধরেই চুল মুঠিটা তার সে কি টানা হিঁচড়া। শুধু তাই নয়, তার সই সয়লা সঙ্গী সাথীর মাঝে এতবড় মেয়ে সতীকে মারতে লাগল কিল চড়-চাপড়। তারপর আচমকা দিল তাকে এমন এক রাম ধাক্কা যে টাল সামলাতে আর না পেরে সতী তার সেই পূজোর থালা সমেত মন্দিরের ওই উঁচু দাওয়াটা থেকে পড়ল সোজা এই গাদা পাথরটার উপরেই। ভাগ্যে এই পাথরটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল ভূতনাথ। নইলে সৎমায়ের তার ধাক্কার চোটে ফেটে মাথাটা সতীর চৌচির হয়ে যেত। তবু ছোট লেগেছিল সতীর কপালে। কেটে গিয়ে গড়িয়েছিল রক্ত। তারপর সে মহা কেলেঙ্কারির কাণ্ড।

কিন্তু সেসব কথা এখন থাক। আসলে এই তো তাদের গ্রামের বাবা ভূতনাথের মন্দির। ঘূর্ণি বায়ুরূপী ভীষ্মদেব সত্তার সূক্ষ্ম সাধু-অবয়ব দেখতে যখন পাচ্ছিল না ভূতনাথ তখন সতী এই মন্দিরেরই কথা করিয়েছিল তাকে স্মরণ। করিয়ে বলেছিল তাকে মন্দিরাভ্যন্তরের শিব-লিঙ্গের পাশে শিব-সতীর মূর্ত্তিটা চিন্তা করতে। শিব-সতীর সেই যুগল মূর্ত্তি চিন্তা করতেই হয়েছিল তার না কি শিব-সতী গ্রন্থির জাগরণ। যার ফলে হয়েছিল সে সমর্থ বিগত জন্মের তার পিতৃদেব ভীষ্মদেব সত্তার সূক্ষ্ম সাধু রূপ দর্শন করতে, তাঁর কথা শুনতে। আজ তাদের সেই ভূতগ্রামের বাবা ভূতনাথের মন্দিরে সামনে হাজির ভূতনাথ। সুতরাং সেদিনের মত আজ আর পরোক্ষভাবে নয় প্রত্যক্ষভাবে লিঙ্গরাজ মূর্ত্তির সামনে গিয়ে বসে যদি সে। করে যদি ধ্যান সে মূর্ত্তির পিছনের সেই শিব-সতীর যুগল বিগ্রহকে। তাহলেও কি হবে না উদয় সামনে তার সেই সূক্ষ্মাবয়ব নিয়ে? বলবে না কথা তার সঙ্গে?

মনের জিজ্ঞাসার উত্তর মনেই পেল ভূতনাথ। শিব-সতী বিগ্রহের মাধ্যমে করলে চিন্তন তাকে ফল তার বৃথা যাবে না। কারণ এযে সতীরই তাকে শিখিয়ে দেওয়া সূক্ষ্ম শ্রবণ-দর্শনের পন্থা। জোর পেতেই মনের ঢুকল ভূতনাথ সেই মন্দিরাভ্যন্তরে। ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে বসল গিয়ে সেই গম্ভীরের বিগ্রহের সম্মুখে। করল নিবেদন তার মনের প্রার্থনা সেই যুগল মূর্ত্তির সামনে,— হে বাবা মহেশ্বর দাও করিয়ে দেখা আমার সতীর সঙ্গে, হে মা

মহেশ্বরী দাও মিলিয়ে একবার আমাকে সতীর সাথে। আমি মহাদোষে দোষী হয়ে আছি মা তার কাছে। নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সতীর সেদিনের সূক্ষ্ম শ্রবণ, দর্শন, মননের সমস্ত কথা বাস্তবে দিয়েছি ব্যক্ত করে। মানা করা সত্ত্বেও সতীর, হয়েছি আমি উত্তেজিত। ক্রোধান্বিত হয়ে আমি করেছি প্রকাশ সকলের কাছে অবিনাশ বাবুর ঠাকুরদার জীবনের সব কেচ্ছা-কাহিনী। সতীর কাছে তাই আমি মহা অপরাধে অপরাধি মা। তার কাছে সব দোষ স্বীকার করে ক্ষমা না চাওয়া পর্য্যন্ত অন্তরে আমি শান্তি পাচ্ছি না। পাচ্ছি না মনে আমি তৃপ্তি। প্রাণের আমার এ যাতনা দূর করতে মাত্র একটি বারের মত সতীর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও মা। দাও বাবা ভূতনাথ আমার হটকারিতার জন্য মাফ চেয়ে তার কাছে জ্বালা জুড়াতে মনের। হে মহাদেব মহাদেবী, দূর করে দাও আমার উপর থেকে সতীর রাগ ও অভিমান। দাও দূর করে প্রভু আমার উপর তার বিরূপ হয়ে থাকা অবস্থাটা।

হৃদয়ের আকুতি ও প্রাণের একান্ত প্রার্থনার কোন শক্তি আছে কি না কে জানে। তবে ঘটল ভূতনাথের সামনে এক অদ্ভুত কাণ্ড। সেই মন্দিরাভ্যন্তরে গমগমিয়ে উঠল সতীর কণ্ঠস্বর "আমি কি কখনও তোমার উপর রাগ করে থাকতে পারি ভূতুদা? পারে কি কখনও ভূতনাথের উপর সতী বিরূপ হতে? উমা কখনও শঙ্করের প্রতি, শিবানী কখনও শেখরের প্রতি পারে না থাকতে অভিমান নিয়ে।

কিন্তু তা তো হল! সতী কোথায়? চোখ খুলে ভূতনাথ এধার ওধার লাগল তাকাতে ব্যাকুল হয়ে। কিন্তু কণ্ঠস্বর ছাড়া সতীর অবয়ব এল না চোখে তার। আশ্চর্য্য! শূন্য মন্দির। অচল অনড় শিবলিঙ্গ, নিথর নিশ্চল শিব-সতীর যুগল বিগ্রহ! তবে? আসছে কোত্থেকে সতীর গলা? মন্দিরের আনাচে কানাচে ঘুরে ফিরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলেও যখন ভূতনাথ পেলো দেখতে সতীর অবয়ব তখন মুচড়ে উঠল তার হৃদয়টা। কেঁদে উঠল যেন তার প্রাণটা সেই যুগল মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে। ব্যকুলভাবে উঠল বলে ভূতনাথ— তুই আমাকে ক্ষমা কর সতী। এভাবে আমার দৃষ্টির আড়ালে থেকে কষ্ট আমাকে দিস না তুই। সত্যিই আমি তোর অপরাধি।

"—অপরাধি তুমি নিজের কাছে ভূতুদা।" শূন্যে আবার উঠল ভেসে সতীর গলা,—দোষী তুমি নিজ সত্তার কাছেই। ক্ষমা চাইতে হয় তুমি তোমার নিজের বিবেকের কাছে ক্ষমা চাও ভূতুদা। তোমার অন্তরেই রয়েছেন ঈশ্বর স্বরূপ আত্মা। এই আত্মার কাছে আত্মদোষ, আত্মত্রুটি স্বীকার করে যারা তা সংশোধনে হয় ব্রতী, হয় তৎপর, অনুরূপ পাপের জীবনে আর পুনরাবৃত্তি না করে যারা নিজ অন্তরকে আর তাপিত হতে দেয় না ভগবান তাদের নিজ গুনে ক্ষমা করেন ভূতুদা। অনুতাপ অনুশোচনার আগুনে পুড়ে তোমার সত্তা হয়েছে এখন খাঁটি সোনা। আমার কাছে বা অপরের কাছে তোমার আর ক্ষমা চাইবার কোন প্রয়োজন নেই ভূতুদা। স্বয়ং ঈশ্বরই তোমাকে মার্জনা করেছেন।

"—তবে তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন?" উঠল ভূতনাথ জিজ্ঞেস করে,—"কোথায় তুই?"

"— আমি তো তোমার কাছেই আছি ভূতুদা।" উত্তরে তার এল কানে অদৃশ্য সতীর কণ্ঠস্বর,—পাছে পড়তে হয় জীবাবর্তের আকর্ষণে তাই আশ্রয় নিয়ে আছি এই মন্দিরে। সত্তার উপর তার গত জীবনের জন্ম-কর্মক্ষেত্রের এক বিশেষ আকর্ষণ থাকে। সে আকর্ষণ সত্তাকে টেনে নামাতে পারে আবার পুনর্জন্মে। তোমাকে তো আগেই বলেছি ভূতুদা, জন্মচক্রের আকর্ষণে পড়ে আমি পুনরায় আর জন্ম-জীবনে নামতে চাই না। বুড়ী ছুঁয়ে থাকলে যেমন কেও ফুঁড়ি করতে পারে না- —আমিও তেমনি বাবা লিঙ্গরাজকে ছুঁয়ে আছি। তাহলে জীবাবর্তের আকর্ষণ পুনরায় আমাকে জন্মগ্রহণ করাতে পারবে না। বাবাকে ধরে আছি বলে মূর্ত্তি ধারণ করা আমার পক্ষে এখন অসম্ভব ভূতুদা। নাই বা আমি হলাম তোমার দৃষ্টিগোচর। কি দরকার তোমার আমাকে দেখার? তার চেয়ে এ খন বাড়ী ফিরে যাও তুমি। দেখ গে গিয়ে সেখানে—কেমন একজন সীতা স্বরূপিনী, সাবিত্রী রূপিনী, সতী তপস্বিনী এসেছেন তোমাদের বাড়ীতে। অপেক্ষা করে আছেন তিনি তোমার জন্য। তোমার এক্ষুনিই বাড়ীতে যাওয়া দরকার ভূতুদা।

ভূতুদা অবাক! কে এই সীতা স্বরূপনী! সাবিত্রী রূপিনী! কৌতূহলী মনটা ভূতনাথের উঠল ওমনি আনচান করে। বাড়ীতে তাদের সতী শিরোমণি তপস্বিনী আসবেই বা কেন?

"—-বাড়ীতে গেলেই সব বুঝতে পারবে তুমি।" উঠল বলে অদৃশ্য সতীর সেই কণ্ঠস্বর—তবে হয়তো সাধারণ বোধবুদ্ধিতে তিনি সেরূপ সতী বলে প্রতিপন্ন নাও হতে পারেন। কারণ অকালে পুত্র হারা তিনি এক বিধবা। তাছাড়া জীবনে তিনি স্বামীর ছায়া বা অন্ধ-অনুগা হয়েও পারেননি চলতে। কিন্তু নিছক স্বামীর দেহ ক্ষুধা মেটানো বা তাদের বাহ্যিক বাসনার ইন্ধন যোগানো বা তাদের অন্যায় কামনার দাসী হয়ে থাকাই তো সতীর একমাত্র উদ্দেশ্য নয় ভূতুদা। স্বামীর অসৎ-সত্তার বিনাশ সাধন করা, স্বামীর মন-মতি ও জীবনের গতি প্রকৃতিকে সত্য ধর্মে, ন্যায় পথে পরিচালিত করাই হচ্ছে সতীর জীবনের ব্রত ও তার পরম ধর্ম। তাই তো সে ধর্মপত্নী। ধর্মপত্নীর উক্ত বৈশিষ্ট্যে আসীন থেকে তিনি স্বামীকে তার জীবনের পাপ পথ থেকে পুণ্যের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন ভূতুদা। মৃত্যুর পরও স্বামীর আত্মার যাতে মঙ্গল হয়, তার সত্তার যাতে কল্যাণ হয় তার জন্য তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও নিজের সুখ-সুবিধা ও অসামর্থ্য বিসর্জন দিয়ে সমানে নিজেকে সৎ-ধর্ম পুণ্য কর্ম ও সেবা পূজায় নিয়ত নিযুক্ত করে রেখেছেন ভূতুদা।

বিস্ময়ে ভূতনাথ প্রশ্ন-ভরা মনটাকে নিয়ে রইল তাকিয়ে সামনের শূন্যতার দিকে। জিজ্ঞাসা তার—কে সে? ভাবতেই মনে সোচ্চার হল আবার সেই কণ্ঠ,—তার পরিচয় বাড়ীতে গেলেই পাবে তুমি। কিন্তু একটা কথা রাখবে মনে তুমি ভূতুদা যে সতীর ইচ্ছাই ভগবানের ইচ্ছা। সুতরাং তার কথা শুনবে তুমি। তোমাকে তিনি আত্মার আত্মীয়রূপে পেতে এসেছেন। নিতে এসেছেন তোমাকে। তুমি অবাধ্য হয়ো না তার কথার। মনের মধ্যে কোন রাগ, অভিমান, ক্ষোভ, দুঃখ এনে হতাশ করনা তাঁকে। যাবে তাঁর সঙ্গে। এতে অভিষ্ট তোমার পূন হবে ভূতুদা। মঙ্গল হবে সকলের।

মনে নিয়ে কৌতূহল এল ভূতুনাথ বাড়ীতে। সদর দরজায় পরিচিত তার টেক্সি দেখতেই প্রথমে হল সে অবাক। তারপর উঠল হকচকিয়ে সে। সদর দরজা ডিঙ্গিয়ে ঢুকল যখন ভিতরে সে দেখল তখন উঠোন আলো করে তাদের আছেন বসে অবিনাশবাবু, তার স্ত্রী ও তাদের কারখানার সেই সেপাই দারোয়ান অর্থাৎ ভীমচাঁদ, রাম সিং ও লাল বাহাদুরের দল। আর তাদের সকলের মাঝে সাদা কাপড়ে, পাকা চুলে আছেন বসে এক বৃদ্ধা। বয়েসের ভারে লোল চর্ম কুঞ্চিত কপোল হলেও মুখে চোখে তার দিব্যজ্যোতি ও পবিত্র ভাব। মূর্তিমতী তপস্যা যেন তিনি। দেখেই ভূতনাথকে উঠে দাঁড়ালেন অবিনাশবাবু। স্ত্রীও তাঁর দেখা মাত্রই তাকে দাঁড়াল উঠে হাত জোড় করে। আর রামসিং ভীম চাঁদরা দেখেই তাকে দাঁড়াল অপরাধির মত, মাটির দিকে নজর রেখে, মাথা হেট করে। যেন মুখ তুলে ভূতনাথের দিকে তাকাবার মত কোন ক্ষমতাই নেই তাদের।

একপাশে অবিনাশবাবু অপর পাশে তার স্ত্রী, দুজন দুদিকে ধরে দাঁড় করালেন সেই বুড়ীকে। দাঁড় করিয়েই তাকে পরিচয় দিয়ে উঠলেন অবিনাশ বাবু,—এই আমার ঠাকুমা ভূতনাথবাবু। আমার স্বর্গীয় পিতামহ রসিক নাগর চৌধুরীর স্ত্রী। শ্রীমতী মালতী দেবী।

মালতী দেবী। রসিক নাগর চৌধুরীর স্ত্রী। যেন আকাশ থেকে পড়ল ভূতনাথ। এর কথাই ভূতনাথ এল শুনে বাবা ভূতনাথের মন্দিরে। অদৃশ্য সতীর কণ্ঠস্বরে। ইনিই তাহলে সেই পরম সতী—চরমভাবে অধঃপাতে যাওয়া পতিকে পরম পথে গেছলেন নিয়ে নিজের সৎ চরিত্র ও ধর্মের বলে, সাধনায় ও নিষ্ঠায়। এমন ভাবে তাকিয়ে ভূতনাথ লাগল দেখতে সেই বুড়ী মালতী দেবীকে যেন কোন প্রতিমা দর্শন করছে সে। মুখে নেই তার কথা। চোখে ভক্তির ভাব। মানে, চরম বিস্ময়াবিষ্ট সে। সদ্য শোনা সতীর কণ্ঠ এভাবে যে হঠাৎ সত্যে পরিণত হবে ভাবতেই পারেনি ভূতনাথ। পারেনি সে মোটেই চিন্তা করতে যে এভাবে হঠাৎ কুঁড়ে ঘরে আসবে তার রাজ-প্রতিমা। কুটিরে আসবে তার তাড়িয়ে দেওয়া মালিক। ভেবে তাই বোধ হয় ঠিক করতে পারছিল না সে যে দেখছে যা সে তা কি সত্যি? নয় তো এ তার স্বপ্ন বা আলেয়া? আছে তো সে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে? কোন অলৌকিক বা অবাস্তব দর্শন হচ্ছেনা তো তার? ভূতনাথের অবাক হওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে অবিনাশবাবু বলে উঠলেন তাকে,—ঠাকুমা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ভূতনাথবাবু।

ওমনি ভূতনাথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধা, সতী তপস্বিনী মালতী দেবী উঠলেন ধমকে অবিনাশ বাবুকে—"সত্য বলতে এখনও সঙ্কোচ তোর? এত করে বলে-বুঝিয়ে আসার পরও তোর অহঙ্কারটা গেল না? যাবে কি করে। চৌধুরী বংশের দূষিত রক্ত যে বইছে তোর মধ্যে। বাপ-ঠাকুরদার দেমাক-দাপটের ধাত-ধারাটা তাই

যাবে কোথায়। বলেই বুড়ী মুখ ফেরাল ভূতনাথের দিকে। বলতে লাগল তাকে বিনয় করে—অবিনাশের কথা সত্য নয় বাবা। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি বাবা। এসেছি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে, মার্জনা ভিক্ষে করতে।

—ক্ষমা। মার্জনা। বিনীতভাবে ওমনি উঠল বলে ভূতনাথ,—এসব কথা কি বলছেন মা আপনি আমাকে?

"—আমি ঠিকই বলছি বাবা।" উঠল বলে বুড়ী,—অবিনাশ তোমার সঙ্গে যা ব্যবহার করেছে তার কোন ক্ষমা নেই বলেই পারছে না সে তা নিজের মুখে বলতে। তাই তার হয়ে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি বাবা। নিজের ছোট একটা অবোধ-অজ্ঞান ভাই মনে করে তুমি তাকে নিজ গুণে ক্ষমা করে দাও বাবা। বৌমাকে সঙ্গে করে আমি অবিনাশকে নিয়ে তোমার কাছে সেই প্রার্থনাই জানাতে এসেছি।"

"—ছি মাঃ। এভাবে কথা বলবেন না আমাকে।" অনুনয় করে বলে উঠল ভূতনাথ—মা হয়ে ছেলেকে যদি প্রার্থনা, কৃপা ভিক্ষার কথা বলেন তাহলে যে মহাপাপে পড়ব আমি। হবে যে আমার মহা অপরাধ মা।"

"—না বাবা, অপরাধি করতে তোমাকে আমরা আসিনি। অপরাধ স্বীকার করে অপরাধ মুক্ত হতে এসেছি আমরা তোমার কাছে।" বলে উঠল বুড়ী,—ভীম চাঁদ, রাম সিংদের মুখে তোমার উপর অবিনাশের উদ্ধত ব্যবহার, অসংগত আচরণ, উচ্চ-বাচ্য কটূকথা শুনা অবধি মনটা আমার হো হো করছে বাবা। কাঁদছে আমার অন্তরটা। জানি না বাবা তুমি কে? বুঝিনি বাবা তোমাকে এদ্দিন। কিন্তু সেদিনের তোমার অবিনাশকে বলা সব কথা এই সেপাই দারোয়ানদের মুখে শুনে চোখ আমার খুলে গেছে বাবা। সত্যকে এভাবে অপমান করায় আমি যৎপরোনাস্তি অপমান করেছি অবিনাশকে। তাকে ধমকে, বকাবকি করেও পাইনি আমি স্বস্তি। অবিনাশকে নিয়ে তাই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি বাবা। যতক্ষণ না নিজের কানে তোমার মুখ দিয়ে অবিনাশকে আমরা ক্ষমার কথা শুনব ততক্ষণ মনে শান্তি পাব না আমি।

"—সত্যিই ভূতনাথবাবু" বলে উঠল মিনতি-কাতর স্বরে অবিনাশ চৌধুরী,—আপনার কাছে আমি মহা অপরাধে অপরাধি। না বুঝে আপনাকে নানা কটুকথা বলেছি। না জেনে আপনার উপর নানা রূঢ় আচরণ করেছি। মহাভুল করেছি আমি। হঠাৎ সেদিন সাতসকালে সেপাই দারোয়ানদের মিথ্যে কথায় বিশ্বাস করে কেন যে আমি আপনার উপর ওমনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম জানি না। আমি একজন আহাম্মক। তাই কাকে কান নিয়ে গেছে শুনেই ওমনি বোকার মত কাকের পিছনে পিছনে ছুটেছিলাম। নিজের কানে হাত দিয়ে সত্যতা যাচাই করবার অর্থাৎ প্রত্যক্ষে আপনাকে কারখানায় দেখেও সম্যক ভাবে আপনাকে অবগত হবার মত সাধারণ বুদ্ধিটুকুও আমার তখন লোপ হয়ে গেছল। মহা অন্যায় করেছিলাম আমি। আর কখনও অনুরূপ ভুল হবে না। এবারের মত ক্ষমা আপনাকে করতেই হবে ভূতনাথবাবু।

স্বামীর সুরে সুর মিলিয়ে পাশ থেকে ওমনি উঠল বলে তার স্ত্রীও—ঠাকুমা ঠিকই বলেছেন, স্বামীর আমার অপরাধের সীমা নেই। তাই স্ত্রী হয়ে তার জন্য আমিও আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। এ ছোট বোনটার মান আপনাকে রাখতেই হবে দাদা। করতেই হবে স্বামীকে আমার মার্জনা।

বলবে কি ভূতনাথ ওমনি কাটা গাছের মত আছড়ে পড়ল পায়ে তার তিন দিক দিয়ে তিন অবতার—রাম সিং, ভীম চাঁদ ও লাল বাহাদুর। সবার মুখে একই অনুরোধ, গুস্তাফি তাদের মাফ করতে হবে। কসুর তাদের ক্ষমা করতে হবে। ওই ভূতুড়ে ঝড়ের মুখে এক গুঁয়ে ভূতনাথকে কারখানার মাঝে একলা ফেলে জান নিয়ে ভেগে গেছল তারা—ঘরের অসহায় বিবি আওরং ও বাল-বাচ্চাদের কথা নাকি চিন্তা করে। তাদের কথা চিন্তা করেই নাকি মালিককে তারা ঝুটা বাত বলেছিল। বলেছিল নোকরি রাখার ভয়ে। সাচ বাত বোললে নাকি বাবুজী তাদের তাড়িয়ে দিত। কাম কাজ চলে গেলে নাকি ঘরে তাদের সমস্ত পরিবারকে ভুখায় মরতে হত। ইসলিয়ে নাকি তারা নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্য মালিককে গিয়ে তাদের ভূতনাথের ভয়ে ভেগে যাওয়ার ওমনি ঝুটা বয়াঁন দিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই গলতি বাতে সবকুছ যে গড়বড় হয়ে যাবে, বাবুজী যে তাদের ত্রিশূল বাবাকে বরখাস্ত করে দেবে—এটা নাকি তারা হনুমানজীকা কসম, বিল কুল ভাবে নাই। গুস্সামে বাবুজী ভূতনাথবাবুকে কারখানা থেকে নিকাল দেবার পরই নাকি তারা চারিদিক অন্ধাকার দেখে। অন্য কোন উপায় না দেখে তারা যায় ছুটে বুড়ীমা অর্থাৎ মালতী দেবীর কাছে। খুলে বলে সব সত্য কথা। ভূতনাথ বাবু তাদের ফেলে দৌড়ে পালায়

নি। তারাই নদীর বুক থেকে আগাস্ত ওই ভূতুড়ে ঘূর্ণি ঝড়টাকে দেখে ভয়ে নাছোড়বান্দা ভূতনাথবাবুকে ফেলে গেছল পালিয়ে। রাত আঁধারে ওই কারখানার অভ্যন্তরে তাকে একা রেখে সুতরাং দোষ তাদেরই। গলতি তাদের স্বীকার করে বুড়ীর পায়ে ধরে তারা মাফ চায়। করে অনুরোধ যেন তাদের মিথ্যার সাজা ভূতনাথবাবুকে ভোগ করতে না হয়। তাদের অন্যায়ের ফল যদি নির্দোষী ওই ভূতনাথ বাবুর উপর বর্তায় তাহলে মহাপাপ হবে তাদের। ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করবেন না। দণ্ড তাদের পেতেই হবে। অতএব অনুরোধ তাদের যেমন করেই হোক বুড়ী মা যেন ভূতনাথ বাবুকে ফিরিয়ে এনে দেন তাদের। ইসমাফিক গলতি জীবনে নাকি তারা দুসরি বার ফির কভ্‌ভি করবে না। রামজীকা কসম। ব্রজরঙ্গ বালী কা কসম।

শুনে তাদের সব কথা, দেখে তাদের কাতর কাকুতি-মিনতি, ব্যাকুলতা ভরা অনুরোধ আসে বুড়ী ভূতনাথদের বাড়ী। সঙ্গে নিয়ে তাদের। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে কারখানায় তাদের ত্রিশূল বাবাকে। না ফিরলে সে তারাও নাকি আর ফিরবে না কারখানায়। না খেয়ে এখানে থাকবে পড়ে, দেবে জান। ভূতনাথ পড়ল মহা মুস্কিলে। শেষ পর্যন্ত নানাভাবে বুঝিয়ে তাদের ছাড়াল তার পা-জোড়াটা। ধরে তাদের হাতগুলো জড়িয়ে নিল বুকে তার। দেখে তাই তৃপ্ত হল বুড়ীর হৃদয়টা। খুশিতে ভরে উঠল তার মুখ। উঠল বলে সে,—জানি বাবা, উদার তুমি। কাছে এলে তোমার ভীম চাঁদদের ভুলের অপরাধ ক্ষমা হয়ে যাবে। যাবে হয়ে মাফ ক্ষণিকের উত্তেজনায় অবিনাশের সমস্ত দোষ-ত্রুটি অসৎ আচরণের। কিন্তু আমার? আমি যে ওই লালবাহাদুরদের চেয়েও অপরাধি বাবা। দোষী যে আমি অবিনাশের চেয়েও মহাদোষে। জীবন ভর যে সত্যকে গোপন করে মিথ্যাকে প্রসয় দিয়ে এসেছি আমি আমার সে অপরাধের ক্ষমা, অন্যায়ের মার্জনা, দোষ-ত্রুটির মাফ কি করে হবে বাবা? হবে কি করে আমার সে মহাপাপ থেকে মুক্তি, অধর্ম থেকে উদ্ধার—দাও বাবা বলে তুমি আমাকে।

হঠাৎ বুড়ীর এমন খেদোক্তি শুনে অবাক সবাই। আশ্চর্য্য অবিনাশ। বিস্মিত তার স্ত্রী। কারণ আজীবন জানে সবাই বুড়ী হচ্ছেন একজন ধর্ম-প্রাণা পুণ্যবতী, পবিত্র-হৃদয়, শুদ্ধ-সাত্ত্বিক মহিলা। তার মহাপাপ, মহা-অপরাধ, মহা অন্যায়-অধর্ম কি থাকতে পারে? সকলের সঙ্গে ভূতনাথেরও চোখে-দুটো বেবাক-বিস্ময়ে গেল বুড়ী-মার মুখের উপর আটকে। শুধু তারাই নয় হা-হুতাশ ভরা শুনে কথা তার সেই সেপাই-দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে উপস্থিত ভূতনাথের মা-বাবা এবং মায়া সহ পাড়া-পড়শীরা সবাই হল বিস্ময়ারূঢ় হতভম্ব! যা বাবাঃ। এত বয়স্কা, পাকা-মাথা, শুচি-শুভ্র ভাব-ভারিক্কি চেহারার মা-বুড়ী থুরথুরিরে কাঁপা গলায় বলছে এসব কি কথা?

কৌতূহলী মুখগুলোর মাঝে ভূতনাথকে উদ্দেশ্য করে ধীর-গম্ভীর শান্ত স্বরে লাগল বুড়ী বলতে, — "সেদিন তোমার অবিনাশকে বলা একটা কথাও মিথ্যে নয় বাবা। সত্যি ওর ঠাকুরদা ছিল লম্পট, অসৎ-চরিত্র, মস্তান, গুণ্ডা ও বদমাশ। আমিই তার প্রমাণ বাবা। আমিই সেই মালতী দেবী—যাকে সে যৌবনের উত্তেজনায় অনূঢ়া অবস্থায় করেছিল পাকড়াও। ধরে ছিল অসহায়া আমাকে জাপটে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে একেবারে সঙ্গী-সাথীদের মাঝেই। সাধুর ডাঙ্গা থেকে ফেরার পথে, গন্ধেশ্বরী নদীর নীচ-পাড়ে, ঘাট-গোড়ার রাস্তাটায়। খবর পেয়ে সাধুবাবা আশ্রম থেকে ত্রিশূল হাতে ছুটে এসে করেন আমাকে উদ্ধার। শুধু আমিই নই বাবা গুণ্ডা-বদমাশের একটা দল নিয়ে সে যে তার যৌবনের উন্মাদনায় এমনি ভাবে জীবনে কত মেয়ের ইজ্জতের দিকে হাত বাড়িয়েছিল, তার কোন ঠিক নেই।

ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জার কথা! সরমে মুখটা লাল হয়ে গেল অবিনাশ বাবুর স্ত্রীর। অবিনাশ বাবুও যেন মুখ ঢাকতে আর জায়গা পেলেন না। অর্থাৎ হল তার জিবকাড়া দেওয়া, কানে আঙ্গুল দেওয়ার মত অবস্থা। জীবনের তিন-কাল খেয়ে শেষ-কালে ঠেকেছে বুড়ীর। কিন্তু অকালে অসময়ে অজায়গায় এসে এসব বেআক্কেলে কথা, লাজ-লজ্জার মাথা খাওয়ার কথা বলছে কি করে বুড়ী? নিজের মরা স্বামীর কেচ্ছা-কাহিনী ফাঁশ করে সকলের মাঝে যে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারছে বুড়ী, সে খেয়াল নেই? এর সঙ্গে যে চৌধুরী বংশের মান-সম্ভ্রম জড়িত—সে বোধটুকুও কি লোপ পেয়েছে ঠাকুমার? ইসারা ইঙ্গিতে নাত-বৌ বুড়ীর নানা চেষ্টা করতে লাগল তাঁর বলা মুখটা বন্ধ করার জন্য। অবিনাশ চৌধুরী নানা কথায় প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল বুড়ীর রোকটাকে। কিন্তু না, পারল না কিছুতেই সে তার ঠাকুমার বলা মুখটা বন্ধ করতে।

এ যেন মাটির গর্ভে চাপা থাকা কোন স্রোত। ফাঁক পেয়ে যেন হঠাৎ উপচে উঠেছে তার ফোয়ারা। এ ফোয়ারার এমন তোড় যে ভূতনাথেরও —"ওসব কথা এখন থাক মা" বলার অনুরোধটাকেও হটিয়ে দিয়ে কথার ঝট্‌কায় লাগল বলতে তেমনি বুড়ী বেপরোয়াভাবে,—"বংশের এসব নিন্দা, কুৎসা, অবিনাশরা বলতে নিষেধ করতে পারে বাবা। কিন্তু সত্যের তুমি পূজারী। এসব সত্য বলতে তুমি আমাকে বাধা দিও না বাবা। তুমি জান না বাবা, এ বংশের কত কেলেঙ্কারি, কত মিথ্যা, কত অন্যায় ও কত বড় মহাপাপকে জীবনে আমি রেখেছি চেপে। চেপে রাখতে বাধ্য হয়েছি, শ্বশুর-শাশুড়ী দিব্য দিয়ে আমাকে নিষেধ করে গেছলেন বলে। গেছলেন তাঁরা পায়ে হাত দিয়ে শপথ করিয়ে আমাকে মুখ বন্ধ করে রাখতে। গুরুজন বলে তাদের কথা আমি মেনে চলতে বাধ্য হলেও কিন্তু মনটা আমার সত্যকে গোপন রেখে চলার জন্য থাকত সর্বদা অসুখী, অতৃপ্ত ও নিরানন্দ হয়ে। নিজেকে কেমন যেন অপরাধি বলে মনে হত আমার। হত মনে নিজেকে একজন মহাপাপী, অধার্মিক, মহা অপরাধি ও অন্যায়কারী বলে।

লাগল বলতে বুড়ী যে তার বাবা নাকি ছিলেন একজন মহা আদর্শ প্রাণ, ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তি। ছোট মালতীকে মানুষ করেছিলেন তিনি তারই চরিত্র-মাধুর্যে ও বৈশিষ্ট্যে। শিক্ষা দিয়েছিলেন মেয়েকে তার জীবনে কখনও মিথ্যার দাস হয়ে না থাকতে। মিথ্যা বলতে বা মিথ্যাকে কখনও প্রশ্রয় না দিতে। সাধের মেয়েকে দিতেন তিনি উপদেশ সদা-সর্বদা সত্যকে জয়ী করতে, জীবনে সত্যাশ্রয়ী ও সত্যশীল হতে। সত্যই ধর্ম, সুতরাং একে যারা অবমাননা করে তারাই নাকি অধার্মিক। সত্যই ব্রহ্ম। সুতরাং এর মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে না যারা-তারাই মহাপাপী। বলতেন নাকি তিনি তাকে,—সত্যের উপর মিথ্যাকে আধিপত্য বিস্তার করতে দেওয়া মহা অপরাধ, মস্ত বড় অন্যায়।

কিন্তু এমন মালতী দেবীর দুর্ভাগ্য, এমনি নাকি তার জীবনের পরিহাস যে শেষপর্য্যন্ত পড়তে হল তাকে সেই মহাপাপেই, সেই অন্যায়ে ও অপরাধেই। জীবন ভর সত্যের টুঁটি চেপে রেখে মিথ্যাকে জয়ী করে অধর্মাচরণ করেছে সে।

অসত্যকে লাই নিয়ে সে করে আসছে মহা দোষের কাজ। হায় ভগবান! কি অন্তর-দ্বন্দ্বে পড়ে কাটছে যে তার জীবনের কাল বলে বুঝাবে সে আর কাকে। একদিকে তার সেই পিতার উপদেশ, অপরদিকে তার শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা। একদিকে পিতৃসত্য পালনের স্পৃহা অপরদিকে উক্ত গুরুজনদের দিব্য দেওয়া নিষেধ। দু-টানায় পড়ে কি যে দুঃসহ জ্বালা ভোগ করছে সে তা তার অন্তর্য্যামীই জানেন।

তবে ভূতনাথের সেদিনকার কথা শুনে মনে হয়েছে নাকি তার এ যেন তার সেই পিতারই আপ্তবাক্যের অনুরণন। সেই সত্য সাধকেরই ঝঙ্কার। বুঝেছে সে—সত্য কখনও গোপন থাকে না। মিথ্যাকে কখনও চেপে রাখা যায় না। শরীরে কোন দূষিত পদার্থ ঢুকলে তা যেমন বের করে না দিলে আপনা থেকে তা একদিন ঘা, ফোঁট, বিষফোঁড়া ইত্যাদি হয়ে দেহকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে, কষ্ট দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—জীবনেরও তেমনি। মনে কোন অসত্য, অধর্ম প্রবেশ করলে জোর করে তা বের করে না দিলে গোটা জীবনটাকে সে শোকে-দুঃখে জর্জরিত করে দিয়ে আপনা থেকেই একদিন বেরিয়ে যায়। মালতী দেবীর জীবনটাই নাকি তার প্রমাণ। মনে ঢোকা তার মিথ্যেটাকে শ্বশুর-শাশুড়ীর দেওয়া শপথে জোর করে সে তা বের করে দিতে পারেনি বলেই অকালে গেছে তার একমাত্র পুত্র অনিরুদ্ধ। গেছে তার পিছনে সাবিত্রী সমা তার বৌমা। একা বুড়ী-মালতী এ সংসার-শ্মশান মাঝে ফেলে যাওয়া তাদের সেই সাধের দুলাল অবিনাশকে নিয়ে আছে আটকে। আছে টিকে তাদের সেই রেখে যাওয়া গচ্ছিত ধনকে আগলে। স্বামী-পুত্রবধূর শোককে সহ্য করে।

কিন্তু আর নয়। যা গেছে— গেছে তার। সত্যকে রেখে গোপন আর মিথ্যার দাসত্ব পারবে না করতে সে। ভূতনাথের কথাই নাকি দিয়েছে খুলে চোখ তার। দিয়েছে মনে সত্য বলার বল-বীর্য্য, শক্তি-সাহস ও প্রেরণা। শ্বশুর-শাশুড়ীর শপথ রক্ষা করতে যেয়ে আর সে খোয়াবে না তার জীবনের সর্বস্ব। দিব্যের দোহাই দিয়ে তাদেব দেবে না নিভতে চৌধুরী বংশের সেই মিট-মিটে প্রদীপ-শিখাকে। বলবে সে তার স্বামীর সব কেলেঙ্কারী। করবে প্রকাশ সে তার চৌধুরী বংশের সব কেচ্ছা-কাহিনী। মনে চাপা সেই নিষ্ঠুর সত্যটাকে প্রকাশ করে রাখবে সে সত্যের মর্য্যাদা। জলাঞ্জলী দেবে মিথ্যেটাকে সে তার জীবন থেকে।

বলেই বুড়ী করল শুরু সবার মাঝেই আবেগে বলতে ভূতনাথকে,—তুমি জান না বাবা, জেনে-শুনে আমি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়ে কি মানসিক যাতনায় আছি। আছি কিরূপ অন্তর্দাহে। কি বিবেকের দংশন জ্বালা অহরহ আমি আসছি করে ভোগ। কুরে কুরে খাওয়া এ জীবন-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত আমি ঈশ্বরের কাছে করে এসেছি প্রার্থনা,—হে ভগবান এমন একজন মানুষ দাও, দাও এমন একজন সৎ সত্তা বা মহান আধারকে যার কাছে আমি আমার জীবনের সব কথা বলে হতে পারি হাল্কা। প্রাণকে করতে পারি মুক্ত। পারি মন থেকে আমার মিথ্যের বোঝাটা নামিয়ে অন্তরটাকে শুদ্ধ ও পরিষ্কার করতে। এতদিনে বোধ হয় পরমেশ্বর আমার সে প্রার্থনা শুনেছেন বাবা। তাই তিনি পাঠিয়েছেন তোমাকে আমার কাছে। কিন্তু তোমাকে প্রথমে আমি চিনতে পারিনি বাবা। এই সেপাই-দারোয়ান মার্ফৎ তোমার সেদিনের ঘটনার পরিচয়ই জানিয়ে দিয়েছে আমাকে যে তুমি হলে সত্যের দূত। নইলে তুমি চৌধুরী বাড়ীর এসব গোপন কথা, চাপা সত্য, জানলে কি করে? কোন সাহসেই বা অবিনাশের মত এমন একজন বদ্-রোখা, ঝাঞ্চাল লোকের সামনে বললে তুমি ওসব কথা? কি করেই বা বললে তুমি এমন দৃঢ়-নিশ্চয় ও বদ্ধপরিকর হয়ে। তুমি যদি ভয়-লজ্জা, শঙ্কা-সঙ্কোচকে ওভাবে তোয়াক্কা না করে সত্যকে এভাবে প্রকাশ করতে পার বাবা, তবে আমি কেন মিথ্যাকে সত্যের আচ্ছাদনে থাকতে দেব আচ্ছাদিত?

বলতে বলতে হঠাৎ কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল বুড়ী,—বলতে আমায় হবেই বাবা। আর কোন ভয়-কুণ্ঠা, লজ্জা-সঙ্কোচন নয়। সত্যের আর আমি পারব না করতে অবমাননা। বলতে আমায় দাও বাবা।

কি যে বলবে বুড়ী কে জানে। রইল সবাই কাঠ-মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে। তার নাতি-নাত-বৌয়ের ও তাকে মুখ বন্ধ-করার ইঙ্গিত-ইসারাগুলো হল বন্ধ। ঠাকুমার ভাব-গতি দেখে হল তারা থ। ভূতনাথ ও হল বাক্যহারা। তার মা-বাবা সমেত পড়শীর দল বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে রইল দাঁড়িয়ে সেই তেজোদীপ্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে। সবার চোখেই কৌতূহল। সবার মনেই উৎসুকতা। সে সবের মাঝেই বুড়ী করল শুরু বলতে তার আদ্যপ্রান্ত সমস্ত কথা।

বুড়ী নাকি ছিলেন নিকুঞ্জপুরের কালীপদবাবুর মেয়ে। গরীব হলেও কালীপদবাবু ছিলেন ধর্মপ্রাণ, সাত্ত্বিক-প্রকৃতিক মানুষ। বাড়ীর পাশে কালী-মন্দিরে জপ-ধ্যান নিয়েই পড়ে থাকতেন তিনি। "সকলেই মায়ের ইচ্ছা" বলে কাটিয়ে দিতেন তিনি সবকিছু। সুতরাং বাবুগঞ্জের পাতুড়ে রাজা বৈদ্যনাথ চৌধুরী যখন যেচে তার মেয়ে মালতীর সঙ্গে তার ছেলে রসিক নাগরের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাত পেতে এসে দাঁড়ালেন তখন সেটা তার তারা-ব্রহ্মময়ীরই ইচ্ছা বলে ধরে নিলেন তিনি। এত বড় জমিদার যদি বিনা পনে মেয়েকে তার কুলবধূ করতে চান— সে তো তার হাতে চাঁদ পাওয়ারই মত। যাচা বর, মাগা কনে ছাড়তে নেই। তাই রাজি হয়ে গেলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বেঁকে বসল তার মেয়ে স্বয়ং। কারণ মালতী তো জানে মালটি কেমন। তাকে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে নদীর ঘাটে জাপটে ধরার পর লোকটার স্বভাব চরিত্র সম্যকভাবে অবগত হয়ে এসেছে সে। সুতরাং ওই লম্পট-নচ্ছার চরিত্রহীন লোকটাকে সে স্বামী বলে বরণ করবে কি করে? কিন্তু সেকেলে পন্থী, ভাবুক মানুষ কালীপদ বাবু। শক্তির সাধক সে। তাই নারীদের তিনি শক্তিময়ী ব্রহ্মময়ী-মা তারার অংশ বলেই মনে করতেন। এবং সে বিশ্বাসে ধারনা ছিল তার যে পুরষরা যত দুর্মুখ দুশ্চরিত্র, দুঃশীল ও অসুর প্রকৃতির হোক না কেন নারীশক্তির কাছে তারা চিরকাল পদানত। নানা উপদেশ উপাখ্যানে সে সব কথা তিনি বুঝিয়েছিলেন মালতীকে। সতীরাই পারে পতিকে তার পতন থেকে উদ্ধার করতে তাকে দেবত্বে আসীন করতে। তার জন্যই তো তাদের ধর্ম-পত্নী বলা হয়। তার মেয়ে হয়ে মালা যদি তা না পারে তবে তো তার কালীর সাধনাই বৃথা।

বাপের কথায় মালতী ইচ্ছা না থাকলেও রসিক নাগরকে করল পতিত্বে বরণ। সতী-সাধ্বী স্ত্রীর শক্তিতে সৎ পথে আনতে সমর্থ হল সে তার স্বামীকে। কু-সঙ্গ, কু-নেশা, কু-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়ে তাকে দিনের পর দিন চলল নিয়ে পবিত্রতার পথে, ধর্মের রাস্তায়। দুঃশীল রসিক নাগর সত্যি-একদিন হয়ে উঠল নাকি সুশীল। সুচরিত্র, সদাচারী, ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠল সে তার স্ত্রী মালতী দেবীর নিষ্ঠায়, সাধনায় ও একাগ্র ইচ্ছায়। কিন্তু পাপ তো কখনও পাপীকে ছাড়ে না। পূর্বাপর জীবনের পুণ্যের ফলে হয়ত তার ফল ফলতে দেরী হতে পারে কিন্তু

ভোগ না করিয়ে সে বোধ হয় ভগবানকেও অব্যাহতি দেয় না। ধরল তাই সে রসিকনাগরকে শূল-রোগ রূপে। বৈদ্যনাথ চৌধুরী হেন কাণ্ড নেই যে তার ছেলের রোগ-মুক্তির জন্য তা করতে তিনি বাকী রাখলেন। হোম-যাগ,শান্তি-স্বত্যয়ন, গ্রহ-পূজা, গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ ইত্যাদি বাদ গেল না কোন কিছুই। মা-ও তার ধন্না দিতে কোন দেবস্থান, পূজা-আচ্চা করতে কোন ঠাকুর মন্দির, দান-ধ্যান করতে কোন মেলা-মণ্ডপ রাখলেন না আর অবশিষ্ট। কিন্তু শিবের অসাধ্য শূল-রোগ তার কমবে কি—দিনের পর দিন উল্টো যেতে লাগল বেড়ে। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা। কাটা ছাগলের মত ছটফট করতে লাগল রসিক নাগর। দেখে তাই আর ঠিক থাকতে পারলেন না মালতী দেবী। ভেবে পেলেন না তিনি এমন রোগ তার হঠাৎ হল কেন। অবশ্য স্বামী তার চলেছিলেন প্রথম জীবনে ভুল পথে। কু-সঙ্গের কবলে পড়ে করেছিলেন অনেক কু-কর্ম, অন্যায় ও অধর্ম। কিন্তু স্ত্রী হয়ে জীবনে তার আসার পর থেকে আর তো স্বামীকে তিনি পাপাচারে লিপ্ত হতে দেন নি। দেন নি আর তাকে তিনি অসৎ সঙ্গীদের কবলে পড়তে। উল্টো বরং নিয়ে চলেছেন তিনি তাকে সৎ ধর্ম-ন্যায়ের পথে, সদাচার ও পবিত্রতার রাস্তায়। নানা পুণ্য কর্ম, সেবা-ধর্ম, পরহিত-সাধন ও পরোপকার ব্রতেই শুধু লিপ্ত রাখেন নি তাকে। এর সঙ্গে করিয়ে চলেছেন তিনি তাকে পূর্ব-পাপস্খালনের জন্য নানা পূজো-উপবাস; প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রাজাপত্য, চান্দ্রায়ণ, চাতুর্মাস্য ইত্যাদি ব্রত পালন। শুধু তাই নয়—স্বামীর পাপ-মুক্তির জন্য ধর্ম-পত্নী হয়ে তিনি নিজেও করে চলেছেন নানা ব্রত-উপবাস, পূজা-পার্ব্বন, বার-তিথি ইত্যাদি পালন। তাছাড়া স্বামীর মঙ্গলের জন্য জীবন-ভর সঙ্কল্প করে গ্রহণ করেছেন তিনি সাবিত্রী, মঙ্গল-চণ্ডী, শিবচতুর্দ্দশী ইত্যাদি ব্রত। তবু স্বামীর তার এত কষ্ট কেন? কেন তার এই অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা?

মালতী দেবী তখনও পর্য্যন্ত নাকি জানতেন না যে স্বামী তার সাধু হন্তারক। জানা শুধু নয়—তিনি নাকি তখনও পর্য্যন্ত কল্পনাও করতে পারেননি যে চৌধুরী বাড়ীর আশ্রিত সাধুর ডাঙ্গার সাধুবাবাকে হত্যা করবে চৌধুরী বংশের এই কুলাঙ্গার তার স্বামী। নিজের হাতে। এদ্দিন সবাই যা জানতেন—তিনিও জানতেন তাই। অর্থাৎ সে সাধু পলাতক। পালিয়ে গেছে সে সাধুর ডাঙ্গার শিব-মন্দির করার জন্য আদায়ীকৃত সমস্ত টাকা-কড়ি বাগিয়ে নিয়ে। যাবার সময় সকলের চোখে ধুলো দেবার জন্য জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে সে তার আশ্রমটাকে। সাধু ধাপ্পাবাজ, চোর, বদমাশ। কিন্তু হঠাৎ সেদিন এ ভুল ভাঙ্গল নাকি মালতী দেবীর। ভাঙ্গাল তা আবার তার পতি-পরম গুরুর নিজের মুখেই।

সারারাত সেদিন রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করছিল তার স্বামী। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা তার। যেমনি চিৎকার তেমনি ধড়ফড়ানি। ঘুম-বিহীন চোখে শয্যার পাশে বসে তার স্থির করলেন তিনি যাবেন বাপের বাড়ী। কারণ বাবা কালীপদ বাবু বলেছিলেন তাকে,—"তোর কোন ভয় নেই মা, সামান্য রোগ যাতনা ভোগ করিয়ে রসিকের আমার পাপ খণ্ডন করাচ্ছেন মা কালী। জামাইকে আমার ছিনিয়ে নেবার এত বড় সাহস নেই কালের। আজীবন আমি কি কালী সাধনা করছি মেয়েকে আমার বিধবা দেখবার জন্য? কখনও না। তুই শুধু তোর পরম কর্ত্তব্য স্বামী সেবা করে যা মা।"

কিন্তু রাত্রে সেদিন স্বামীর অবস্থা দেখে মালতী দেবী নাকি আর স্থির থাকতে পারলেন না। সংকল্প করলেন তিনি বাপের বাড়ী গিয়ে কালী মন্দিরে স্বামীর রোগ মুক্তির জন্য ধন্না দেবেন। নিকুঞ্জপুরের কালী জাগ্রতাকালী। সে কালীর সাধক স্বয়ং তার বাবা। বাবা আর ... উপদেশ দিতেন ভক্তদের,—কালকে মা আমার হরণ করতে পারেন বলেই তো তিনি কালী, কৈবল্য দায়িনী। দুর্গতি থেকে সন্তানকে রক্ষা করেন বলেই তো মা আমার দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী। শোক-তাপ-রোগ-জ্বালা সমস্ত কিছু তাড়ন করেন বলেই তো মা আমার তারা।

তাছাড়া সেদিন রাত্রে হঠাৎ স্বামীর রোগ-শয্যার পাশে বসে মালতী দেবীর সেই ছোটবেলার তাদের গ্রামের মাকালীর একটা মাহাত্ম্যের কথা গেছল পড়ে মনে। নাম পাড়ার রামু জ্যেঠার হয়েছিল এমনি শূলের ব্যামো। সাধু-বদ্যি, ডাক্তার-কবরেজ তাদের জড়ি-বুটি, ওষুধ-পালা কোন কিছুতেই যখন সে রোগ ভাল হল না তার তখন বড়-মা অর্থাৎ রামু-জ্যেঠার স্ত্রী পড়ল গিয়ে কালীর থানে। দিল ধন্না। তিন দিনের দিন রাত্রে মা নাকি স্বপ্নে

তাঁকে বাংলে দিলেন এক ওষুধ। কাকেও না জানিয়ে বড় মা সে ওষুধ খাওয়াতেই নাকি গেছল সম্পূর্ণ ভাল হয়ে রামু-জ্যেঠা। শিবের অসাধ্য রোগও মায়ের কৃপায় যে সারতে পারে এর চেয়ে আর প্রকৃষ্ট প্রমাণ কি থাকতে পারে? সুতরাং শ্বশুর-শাশুড়ীকে বলে-বুঝিয়ে উদ্যত হলেন মালতী দেবী বাপের বাড়ী যাবার জন্যই। কিন্তু স্বামীর কাছে বিদায় নিতে এসে পড়লেন তিনি মহা ফ্যাসাদে। রসিক নাগর আঁচলাটা তার আঁকড়ে ধরে উঠল করে তাকে অনুরোধ,—এ অবস্থায় তুমি একলা ফেলে আমাকে যেয়ো না মালা।

—ওমা সে কি কথা। মা রইলেন, বাবা রইলেন—একলা কোথায় তুমি?

যন্ত্রণা-কাতর স্বরে স্বামী তার করতে লাগল তাকে মিনতি,—কোন দিন আমি তোমার কোন কাজে বাধা দিইনি মালা। জীবনে যা কখনও করিনি, করব বলে কল্পনাও করিনি—ব্রত, উপবাস, পূজো, প্রায়শ্চিত্ত সব করে এসেছি আমি তোমার কথায়। অবাধ্য কখনও হইনি। সব সময় শুনে এসেছি তোমার কথা। আজ তুমি আমার কথা শুন মালতী। ছেড়ে আমাকে যেওনা তুমি। চলে গেলে তুমি বাঁচব না আমি।

"—বালাই ষাট!" চট্ করে মুখটা চাপা দিয়ে তার বলেছিল তখন তাকে মালতী, "—ছিঃ ছিঃ। এমন অলুক্ষণে কথা কখ্খনও বল-না তুমি। যাচ্ছি তো আমি তোমার জন্যেই। তোমার যন্ত্রণা উপশম, রোগ মুক্তি ও শান্তির জন্য মাকালীর কাছে ধন্না দিতে। অবোঝ হয়ো-না লক্ষ্মীটি। সৎ সঙ্কল্পে কখনও বাধা দিতে নেই।"

দেবে পেটের যন্ত্রণাটাকে কষ্ট-কাতরস্বরে লাগল বলতে রসিক নাগর, —অবোঝ হয়ে বলছি না আমি মালা। বলছি আমি বোধে থেকেই। যতকর তুমি, এ রোগ আমার সারবে না কখনও। অযথা মাকালীর কাছে রোগ-মুক্তির আমার বৃথা প্রার্থনা জানাতে গিয়ে বাবার তোমার ইষ্ট দেবীর মাহাত্ম্য নষ্ট করতে যেয়ো না তুমি?

"—সে কি কথা!" যেন আঁংকে উঠল মালতী,—"এমন কথা বলছ কেন তুমি?"

"—ঠিক বলছি মালা আমি।" উঠল বলে রসিক নাগর,—"এ রোগ আমার আসলে রোগ নয়। এ আমার মহাপাপের ফল। সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে কিন্তু এ মহাপাপের প্রাযশ্চিত্ত নেই মালা। এর থেকে মুক্তি শুধু তোমার বাবার কালী কেন—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সমস্ত শক্তি এক হলেও পারবে না কখনও দিতে। বেঁচে থাকতে শুধু নয়, মরার পরও বোধ হয় এ মহাপাপের শাস্তি যাবে না আমার।

মালতী হল যার পর নাই বিস্মিত! উঠল বলে সে,—জীবনের কুকর্ম অপকর্ম, অন্যায়, অধর্ম সব পাপের কথাই তো বলেছ তুমি আমাকে। কুণ্ঠা না রেখে মন উজাড় কবে বলেছে সব কিছু। এর উপরও আর কি মহাপাপ আছে তোমার?

"—আছে মালা আছে।" উঠল বলে রসিক নাগর,—অকপটে আমি আমার জীবনের বদ-স্বভাব জনিত সমস্ত অপরাধ তোমার কাছে স্বীকার করে গেলেও সে মহপাপের কথা আমি কিন্তু তোমাকে গোপন করে গেছি।

"—কেন?" বল উঠল মালতী,—আমি তো তোমাকে কথা দিয়েছিলাম যে জীবনের সব কথা নিঃসঙ্কোচে, কুণ্ঠাহীনভাবে তুমি আমার কাছে প্রকাশ কর। আমি তোমার প্রতি সে সবের জন্য কখনও বিরূপ হব না বা তোমাকে কখনও ঘৃণ্য জঘন্য বা নীচ হীন বলে ভাবব না। সতীর দেবতা পতি। স্ত্রী হয়ে এসেছি যখন আমি জীবনে তোমার তখন আমি তোমাকে পতি পরম গুরু বলেই মেনে চলব আ-মরণ। আমার দেওয়া কথায় কি আস্থা ছিল না তোমার? না তুমি অবিশ্বাস করেছিলে আমাকে?

"—তোমার প্রতি আস্তাহীন হওয়া আমার কল্পনারও বাইরে মালা।" বলে উঠল রসিক নাগর,—"আর তোমাকে অবিশ্বাস করা? শুধু আমি কেন বোধ হয় আমার মা-বাবা সহ এই সাত-সংসারের অপর কারোরই সাধ্য নেই, সামর্থ্যেরও বাইরে সকলের।

—তবে, কেন আমাকে তোমার ওই মহাপাপ গোপন রেখেছ তুমি? চাপা ধমকে উঠল বলে মালতী তাকে,—"কেন? কেন বল?"

"—তোমার ভয়ে মালা।" যন্ত্রণা কাতর স্বরে স্বামী নাকি তার বলে উঠেছিল তখন তাকে, —"বিশ্বাস

কর তুমি, অন্য কোন কারণে নয়—তোমাকে হারাবার ভয়ে। পাছে এ মহাপাপের কথা শুনে আমাকে তুমি ত্যাগ কর। চিরকালের মত ছেড়ে চলে যাও এই ভয়ে মালা—এই আশঙ্কায়। পাছে স্বামীর আসন থেকে ঘৃণায় তুমি আমাকে ঠেলে ফেলে দাও, দাও পাছে মুছে আমাকে তুমি তোমার হৃদয়-মন-অন্তর থেকে। তাহলে যে জীবনে আমি বড় একা হয়ে যাব মালা। তোমাকে ছাড়া এক দণ্ডও পারব না আমি বেঁচে থাকতে।

"—এমন কথা পারলে ভাবতে কি করে তুমি?" বিরক্তির ভরা স্বরে তখন উঠেছিল বলে এই মালতী,—তোমার স্বভাব চরিত্র সব কিছু জেনে বুঝেই তো বাপ-মায়ের কথায় করেছিলাম বিয়ে আমি তোমাকে। হিন্দু নারী আমি। শালগ্রাম শিলার সম্মুখে, অগ্নি-সাক্ষী করে জীবনে আমি তোমাকে পতিরূপে গ্রহণ করে পারি কখনও ছেড়ে যেতে? এ অমূলক ধারনা তোমার আমার উপর হল কি করে? বল তুমি, কি তোমার সেই মহাপাপ?

"—বলতে সে পাপের কথা কর না আমায় অনুরোধ মালা।" মিনতি ভরা কণ্ঠে রসিক উঠল তাকে বলে,—শুধু এইটুকুই জেনে রাখ তুমি, যে স্বামী তোমার সব পাপের কথা উজাড় করে গেলেও তার জীবনের একটি মাত্র পাপের কথা গোপন রেখে ছিল। পারবে না তুমি মালা, এ মহাপাপের কথা পারবে না তুমি কিছুতেই সহ্য করতে।

"—পারব।" বেশ জোরের সঙ্গেই তখন উঠল বলে মালতী,—"এর আগে তোমার অকপটেবলা সমস্ত দুষ্কর্ম, অপকর্ম, কুকাণ্ড, কদাচার সহ্য করেছি যেমন অম্লান বদনে, হজম করেছি যেমন নিরুদ্বেগ চিত্তে তেমনিই সহ্য করব আমি। বল তুমি। কথা দিচ্ছি আমি—ভ্রূণ হত্যা, নারী হত্যা ইত্যাদি সে-পাপ তোমার যতই ভয়ানক, যতই মারাত্মক, যতই সাঙ্ঘাতিক হোক না কেন বিরূপ আমি হব না কিছুতেই তোমার উপর। বাবা বলতেন—পাপং কুর্বং প্রকাশয়েৎ। পাপ করে তা প্রকাশ করতেহয়। তাহলে পাপের ফল-ভোগ কাটে। দোষ তার স্খালন হয়। বলতেন তিনি যে স্ত্রী শিবের মত স্বামীর জীবনের সব হলাহল পান করে তাকে বিষ-জ্বালা মুক্ত করে, শুদ্ধ-পবিত্র পুণ্যতার পথে পরিচালিত করতে পার—সেই প্রকৃত ধর্ম- পত্নী। আমি তোমার সেই ধর্ম-পত্নী, সেরূপ অর্ধাঙ্গিনী হয়েই চাই থাকতে তোমার পাশে চিরকাল, অনন্তকাল। আগে বলা তোমার সব পাপের কথার মত নিঃসঙ্কোচে, নিরুদ্বেগ চিত্তে, কোন দ্বিধা-কুণ্ঠা-সন্দেহ না রেখে বল তুমি তোমার সেই মহাপাপের কথা আমাকে।

বোধ হয় মনে সাহস পেয়েই বলতে তখন যাচ্ছিল রসিক নাগর। হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন তার বাবা, বৈদ্যনাথ চৌধুরী। পিছনে তার মা কুমুদিনী দেবীও এসে দাঁড়ালেন ঠিক ধূমকেতুর সঙ্গে তার পুচ্ছের মত। মনে হয় দরজার বাইরে এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন তাঁরা তাদের স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন। স্বামী যে তার স্ত্রীর অনুরোধে যাচ্ছে বলতে কি গোপন রাখা মহাপাপের কথা, তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন বৈদ্যনাথ বাবু। তাই ধৈর্য্য ধরে আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে প্রায় হন্ত-দন্ত হয়েই করলেন প্রবেশ তিনি বেটা-বৌ-এর ঘরে। ঢুকেই উঠলেন গম্ভীর কণ্ঠে নিষেধ করে, তিনি রসিক নাগরকে,—না বাবা, সে মহাপাপের কথা করো না তুমি প্রকাশ। আর তুমিও বৌ-মা করো-না তোমার স্বামীকে আর অনুরোধ সে-কথা বলতে। যা বলবার নয়, যা জানবার নয়—তা জানতে বা বলতে পীড়াপীড়ি আর করো-না তুমি রসিককে। যেমন আছে তেমনি গোপনেই থাক সে কথা। গুপ্ত হয়েই লুপ্ত হয়ে যাক তোমার স্বামীর সে মহাপাপের কাহিনী।

"—না বাবা," আপত্তি করে উঠল মালতী,—স্বামীকে তার পাপ গোপন রেখে জন্ম-জন্মান্তর তার ফল ভোগ করতে দেব না আমি। তাছাড়া যাচ্ছি আমি মাকালীর কাছে, মন্দিরে তাঁর ধন্না দিতে। স্বামীর আমার রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে। জগতে এমন কোন মহাপাপ নেই, মা জগদম্বার কাছে যার ক্ষমা নেই। ছেলে যদি মায়ের কাছে অকপটে তার সব অপরাধ স্বীকার করে তবে মা হয়ে কি ছেলেকে তার ক্ষমা না করে থাকতে পারে? স্বামীর হয়ে আমি মাকালীর কাছে তার সব মহাপাপের কথা স্বীকার করব বাবা। স্বামীর হয়েই চাইব আমি ক্ষমা মা জগদম্বার কাছে। ছেলেকে আপনার নিষেধ আপনি করবেন না বাবা। জেনে তার পাপের কথা মায়ের মন্দিরে তা প্রকাশ না করে ধন্না দিলে—উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হবে না বাবা। প্রার্থনা আমার শুনবেন না মাকালী।

চুপ শ্বশুর, চুপ শাশুড়ী, নির্বাক তার স্বামী রসিক নাগর চৌধুরী। মিনতিতে আবার ফেটে পড়ল মালতী,—আমার অবস্থা চিন্তা করে স্বামীকে আমার বলতে অনুমতি দেন মা। নিকুঞ্জপুরের কালী আমাদের জাগ্রতা দেবী। সে কালীর সেবাইত হলেন আমার বাবা। বাবার আমার সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে মা যদি না তিনি স্বামীকে আমার ভাল করে তুলতে পারেন। আমাদের কালীর নিয়ম মা, শ্রীপদে তাঁর জ্ঞানের পাপ, অজ্ঞানের পাপ নিবেদন করে তবে প্রার্থনা করতে হয় বা চরণে তাঁর ধন্না দিতে হয়। অকপটে সব পাপ, তাপ তাঁর কাছে স্বীকার করলে নিজগুণে মা তার সন্তানের সব কিছু দুঃখ কষ্ট ফল-ভোগ হরণ করেন। ছেলেকে আপনারা বাঁচান মা। মেয়েকে আপনার বিধবা হবার হাত থেকে রক্ষা করুণ বাবা। স্বামীর আমার মহাপাপ মা কালীর কাছে নিবেদন করে তাঁর কাছে স্বামীর আমার রোগ-মুক্তি ও প্রাণ-রক্ষা ভিক্ষা করতে যেতে দেন মা। দোহাই আপনাদের।

শুনে মালতীর কথা গলল মন শাশুড়ীর কিন্তু শ্বশুর রইলেন তার সেই গাম্ভীর্য নিয়ে। হল কথা কাটাকাটি। চলল তর্ক-বিতর্ক। শেষে অবশ্য হলেন রাজি বৈদ্যনাথ বাবু। তবে এক শর্তে। সে শর্ত হল রসিক নাগরের মহাপাপের কথা প্রকাশ করবে না সে কখনও, কারোও কাছে, কোনদিনই। শুধুমাত্র মা কালীর কাছে এ কথা নিবেদন করবে সে মনে মনে। সে ছাড়া একথা যদি অপর কাকেও জানাতে যায় সে তবে এই মুমূর্ষু স্বামীরই দিব্য রইল তাকে। পা ছুঁয়ে শ্বশুর শাশুড়ীর শপথ নিতে হল তাকে — এ কথা তার কাক-পক্ষীতেই জানবে না। করতে হল নিজ বাপ-মায়ের নাম নিয়েই প্রতিজ্ঞা তাকে যে—এজানা থাকবে তার কাছে চিরকাল অজানা হয়ে। এত কাণ্ডের পর তবে স্বামী তার মত পেয়েছিল মালতীর কাছে তার পাপের কথা প্রকাশ করতে।

কিন্তু এ কি কথা শুনল মালতী। কানে ঢুকতেই তার স্বামীর কথা আঁৎকে উঠল সে। এযে ভ্রূণ-হত্যা, নারী হত্যার চেয়েও ভয়ানক! মারাত্মক। এ হত্যার চেয়ে যে আর মহাপাপ নেই জগতে। একি করেছে তার স্বামী। নিজের হাতে খুন করেছে সে সেই সাধুর ডাঙ্গার সাধুকে। করেছে হত্যা তারই হাতের ত্রিশূল দিয়ে পেটে তার খোঁচার উপর খোঁচা মেরে, নাড়ি-ভুড়ি ছিঁড়ে। নির্মম নিষ্ঠুর, নৃশংস ভাবে। তারপরও ক্ষান্ত হয়নি সে। দলবল নিয়ে লুট করেছে সে গিয়ে তাঁর আশ্রমের সব কিছু। মন্দির করার সংগৃহীত অর্থ তার মদে-মাসে দিয়েছে উড়িয়ে। জ্বালিয়ে দিয়েছে তাঁর আশ্রম কুটির। তারপর মিথ্যে করেছে রটনা যে সাধু তার নিজ হাতে আশ্রমে আগুন লাগিয়ে মন্দিরের সব আদায়ীকৃত অর্থ বাগিয়ে নিয়ে হয়েছে পলাতক—দিয়েছে গা ঢাকা। ছিঃ ছিঃ। একি কাণ্ড করেছে সে! করেছে সে একি সর্বনাশ। এ যে শোনার চেয়ে না শোনাই ছিল তার অনেক ভাল। জানার চেয়ে এ মহাপাপ অজানা থাকাই ছিল যে তার পক্ষে মঙ্গলের।

মুচড়ে উঠল মালতীর হৃদয়। আঁচড়ে উঠল তার অন্তর। সাধু-বাবার সেই স্নেহ-ভরা চোখ, পিতৃ সুলভ সুখ, বিপদে তাকে উদ্ধার করে বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়ার তার সেই অভয় দেওয়া চেহারা মনে পড়ে তার সমস্ত মন-প্রাণ উঠল হাহাকার করে। পারল না রুখতে মালতী চোখের জল, পারল না করতে সংযত তার কান্নাটাকে। না শুনে আর, কানদুটো দু-হাতে চেপে কান্না জড়ানো গলায় উঠল বলে সে,—একি মহাপাপ করেছো তুমি? আশ্রিতকে রক্ষা করা যাদের মহাধর্ম—সেই চৌধুরী বাড়ীর ছেলে হয়ে হত্যা করেছো তুমি তাকে? জমিদার পুত্র হয়ে রক্ষক হয়ে ভক্ষক হতে গেলে তুমি। যে কাজ কোন পশুতে পর্য্যন্ত করতে পারে না সে কাজ করলে তুমি! এত বড় মহাপাপ তুমি করলে কি করে? কি মন নিয়ে? কোন হৃদয়ে?

বৈদ্যনাথ বাবু পারলেন না আর দাঁড়িয়ে থাকতে। স্ত্রীও বোধ হয় তার পারলেন না আর সহ্য করতে। তাই স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তারা লজ্জায়, শঙ্কায় হেট মুণ্ড হয়ে গুটি গুটি পালিয়ে গেলেন সে ঘর ছেড়ে।

বলে উঠল রসিক নাগর—জানি আমি মালা, এ মহাপাপের কথা আমার সহ্য করতে পারবে না তুমি। তাই আমি বলিনি তোমাকে এসব কথা। আর এও জানি আমি, এ মহাপাপেরই ফল হল আমার এই শূল রোগ। এ হল সেই সাধুর পেটে খোঁচা মারার প্রতিফল। ব্যুমেরাং হয়ে সে আঘাত আমার এসে লেগেছে পেটে। এ রোগ আমার আর সারবে না মালা। এর জন্য ঈশ্বরের কাছে আমি ক্ষমা চাইতে পারিনি। তোমাকেও মাকালীর কাছে ক্ষমা চাইতে পাঠাবার আমার মুখ নেই। এ পাপের ক্ষমা নেই মালা। তাই আমার আর রোগমুক্তির কামনা নিয়ে

যেও না তুমি বাপের বাড়ী, মা জগদম্বার কাছে। ব্যর্থ হলে মনোরথ মাকালীর প্রতি ভক্তি যাবে তোমার টুটে। ঈশ্বরে হবে অবিশ্বাস। আমি তা চাই না মালা। আর এও চাই না আমি—বিফলে আমার তোমাদের মা তারার মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন হোক। সাধক বাবার তোমার যশ-খ্যাতি লোপ পাক। তাই বলছি—নাই বা গেলে তুমি নিকুঞ্জপুর।

কিন্তু শুনল না মালতী তার স্বামীর কথা। রোগ শয্যায় ফেলে রসিক নাগরকে এল সে তার বাপের বাড়ী, নিকুঞ্জপুরে। হল বদ্ধপরিকর সে মা কালীর মন্দিরে ধন্না দেবার জন্য। বসল গিয়ে শুদ্ধ স্নাত অবস্থায় সেই মহেশ্বরীর কাছে। বাবা তার যথারীতি পুজো-হোম সমাপন করে যেই তাকে সংকল্প গ্রহণ করাতে গেলেন ওমনি মায়ের মূর্ত্তিটার দিকে তাকাতেই মালতীর মনটা কেমন বাধা দিয়ে উঠল। একজন মহা তপস্বী, সিদ্ধ সাধক সাধুকে হত্যা করতে পারে যে তার জন্য ক্ষমা চাইবে সে কোন মুখটায়? পারে যে সাধু মহাত্মার সৎ-সংকল্প নস্যাৎ করে দিতে, তার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে অন্যায়ভাবে ব্যয় করে দিতে, অপবাদে তার লোকের মন থেকে শ্রদ্ধা কেড়ে নিতে—স্বামী হলেও সে মহাপাপী। তার পাপের দণ্ড হওয়া উচিত। দণ্ড ভোগ না করলে পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয় না। যায় না কেটে জীবন থেকে অসৎ কর্মের ফল। সুতরাং একরকম অজান্তেই যেন তার বেরিয়ে এল মুখ থেকে, যথাভিসন্ধং কুরু কল্যাণম।" ব্যক্ত হল মাকালীর মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক প্রার্থনা তার। হে মা জগদম্বা, আমার এই জীবনেই যেন স্বামীর কর্মফল ভোগ সব শেষ হয় মা। পারি যেন মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আমরা পরমলোকে যেতে। তার সব যন্ত্রণার অবসান কবে দাও মা তারা ব্রহ্মময়ী। আমি যে স্বামীর কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না মা। নিজের প্রার্থনায় নিজেই সেদিন চমকে উঠেছিলেন মালতী দেবী। হয়েছিলেন তিনি হতভম্ব। হায়—একি। এসে কি চাইতে গিয়ে কি চেয়ে বসল সে মা কালীর কাছে। কি ঘোরে সে কোন মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় করল এমন প্রার্থনা। সত্যিই তখন কোন হুঁশ ছিল না মালতী দেবীর। হুঁশ হল তখন, যখন তার শ্বশুর বাড়ী বাবুগঞ্জ থেকে এল খবর যে স্বামীর তার গঙ্গা যাত্রা হয়েছে। ভোর রাতেই নাকি রসিক বাবু পেটে নিয়ে শূলের অসহ্য যন্ত্রণা গেছেন মারা।

শুনেই কান্না আর চেপে রাখতে পারলেন না মালতী দেবী। হায় মাকালী একি করলি? এভাবে স্বামীর রোগ মুক্তি করলি তুই? দিলি তুই এভাবে তাকে যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি? কিন্তু এভাবে যে তোর কাছে রোগ উপশমের জন্য আমি আসিনি মা। আসিনি যে তোর কাছে এভাবে আমার চির জীবনের মত হাতের শাঁখা খুলতে, সিঁথির সিঁদুর তুলতে। তোর কাছে এসে আমাকে বিধবা হতে হল মা। একি সর্বনাশ করলি আমার তুই মা,—মা, মাগো,।

মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝাতে লাগলেন তার বাবা, কালীপদ বাবু,—কালের উপর কারোর হাত নেই মা। নেই কারো সাধ্যি নিয়তিকে বাধা দেবার। যাকে যখন বিধি যেভাবে টানবেন তাকে তখন সেইভাবেই যেতে হবে মা। অনিরুদ্ধ তোর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মা, ছেলের দিকে তাকিয়ে, তুই তোর শোক সংবরণ কর। স্বামীর তোর এখনও শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়নি মা। সেখানে উঠোনের তুলসী তলায় নাকি মৃতদেহটা তার বের করে সবাই অপেক্ষা করে আছে তোর জন্য। বাবুগঞ্জ থেকে তোকে নিতে আসা গাড়ীটা মা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সদর দরজার বাইরে। ছেলে অনিরুদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে এক্ষুনি রওনা হয়ে যা মা। নইলে 'স্বামী যে তোর 'বাস মড়া' হবে। অনিরুদ্ধকে নিয়ে সেখানে তার বাপের মুখাগ্নি না করা পর্য্যন্ত সে মড়াটা যে তার দাহ করা হবে না মা।

সেই যে শোক সংযম করে শ্বশুর বাড়ী এসেছিলেন মালতীদেবী তারপর থেকে তার সংযমের ধারার আর বিচ্যুতি ঘটেনি। শুধু স্বামীর মৃত্যু নয়—শ্বশুর শ্বশুড়ীও চলে গেলেন তার একে একে। গেল অনিরুদ্ধ ও তাঁর স্ত্রীও। তাদের ছেলে এই অবিনাশকে তার কোলে ফেলে দিয়ে চিরকালের মত। সেদিন যেমন অনিরুদ্ধের দিকে তাকিয়ে স্বামীর শোক হজম করেছিল সে, পরে তেমনি চৌধুরী বংশের একমাত্র প্রদীপ এই অবিনাশের দিকে তাকিয়ে সহ্য করেছিল সে বৌ-বেটার শোক-বহ্নিজ্বালা। সে জ্বালায় জ্বলে এখনও বেঁচে আছে সে একমাত্র অবিনাশের জন্যই। আছে বেঁচে সে বয়েসটাকে তার শ'এর কোঠা ছুঁইয়েও। হা-হুতাশ ভরা কণ্ঠে বুড়ীর ভেসে উঠল খেদ—যম আমাকে নেয় না, মৃত্যু আমাকে ছোঁয় না—তার একমাত্র কারণ হল বাবা, সেই সত্যকে এখনও আমি গোপন রেখেছি বলে। সে মিথ্যাকে এখনও আমি ব্যক্ত করিনি বলে। অপ্রকাশ রেখে সত্যকে

আমি ধর্মকে অবমাননা করে চলেছি বলে। চৌধুরী বংশের ঠুনকো মান যশ, সম্মান-সম্ভ্রম চলে যাবে বলে আমি অধর্মের দাসত্ব করে চলেছি বাবা। আমি মহাপাপী।

বলতে বলতে হঠাৎ বুড়ী উঠল ঢুকরে চাপা কান্নায়। নির্বাক অবিনাশবাবু, নিশ্চুপ তার স্ত্রী। নিঃসাড় তাদের সেপাই দারোয়ানগুলো পর্য্যন্ত। বুড়ীর বলা জীবন কাহিনী তাদের মাথা হেঁট করে দিয়েছিল মাটির সঙ্গে। তাদের দৃষ্টিগুলোও গেছল হয়ে স্থির। তারাই যে শুধু মূক বধির, নির্বাক নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই নয়। ভূতনাথের মা-বাবা সহ উপস্থিত তাদের পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনেরাও গেছল হয়ে বুড়ীর নাতি-নাতবৌয়ের সঙ্গে তাদের মহা-মৌনতার সামিল। বলে উঠতে হল তাই ভূতনাথকেই,—মহাপাপী নন আপনি মা, আপনি মহাসতী। সত্যকে আপনি গোপন রেখে ধর্মকে আপনি অবমাননা করেননি মা। বরং পাপেরই তাপ থেকে বংশকে আপনি রক্ষা করেছেন। আপনি তো কোন কিছুর জন্যই দায়ী নন মা। তবে কেন নিজেকে এমন পাপী বলে ভাবছেন? আপনাদের মত সীতা-সাবিত্রী ও সতী বেহুলাদের পাপ কখনও স্পর্শ করতে পারে না মা। অধর্ম কখনও পারে না আসতে আপনাদের কাছে।

"—ছিঃ বাবা, উঠল বলে বুড়ী—ওসব পুণ্য শ্লোকা, সতী সাবিত্রী দেবী সীতাদের সঙ্গে তুলনা করে আমাকে, আমার পাপের বোঝা আর বাড়িয়ে দিও না বাবা। মা সীতা স্বামী রামচন্দ্রের সামনে পাতাল প্রবেশ করে নিজের ইহজীবন অবসান করেছিলেন। কিন্তু আমি? স্বামীর কোলে মাথা রেখে পারলাম কি মরতে? সতী সাবিত্রী যমের হাত থেকে তাঁর স্বামীর জীবন ফিরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু আমি? পারলাম কি স্বামীকে আমার বাঁচাতে? দেবী বেহুলা মরা স্বামীর কঙ্কালের উপর জীবন সঞ্চার করাতে বাধ্য করেছিলেন মা মনসা তথা স্বর্গের দেব-দেবীদের। কিন্তু আমি? স্বামীর প্রাণ সঞ্চার তো দূরের কথা সামান্য রোগ মুক্তিটুকু পর্য্যন্ত করতে সমর্থ হলাম না মাকালীর কাছে। তাদের মত সতী হলে কি বিধবা হতে হত আমাকে বাবা?

—স্বামী বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়ার উপরই তো সতীর সতীত্ব নির্ভর করে না মা। জন্ম মৃত্যু বা মৃত্যু জন্ম তো সত্তার স্থূল সূক্ষ্ম, পরলোক ছেড়ে ইহলোক অর্থাৎ এঘর ছেড়ে ওঘর, ওঘর ছেড়ে এঘরে যাওয়া আসার মত। নিজের সত্তা পতির। পতির সত্তা নিজের মনে করে যারা তাকে পুত-পবিত্র ও সত্যে আসীন করে রাখতে সচেষ্ট হয়, সমর্থ হয় তারাই তো মা প্রকৃত সতী। সে বিচারে আপনি সীতা সাবিত্রীদের চেয়েও সতীত্ব মহিমায় অনেক উন্নত মা। কারণ সীতা-সাবিত্রীরা জীবনে তাদের মনোমত, সৎ, চরিত্রবান ও আদর্শ পরায়ন পতি পেয়েছিলেন। পেয়েছিল তারা সতীত্ব মহিমায় মহিমান্বিত হওয়ার মত অনুকুল অবস্থা, পরিবেশ, ঘর সংসার, শ্বশুর শাশুড়ী ইত্যাদি। কিন্তু আপনি? প্রায় জোর করে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক অসৎ, লম্পট, চরিত্রহীন ব্যক্তিকে স্বামীরূপে আপনার জীবনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আপনার ঘর সংসার শ্বশুর শাশুড়ীও ছিল বিরূপ পরিবেশের ও বিরুদ্ধ প্রকৃতির। এর মধ্যেও যে আপনি নিজে সৎ থেকে স্বামীকে আপনার সৎ-চরিত্র আদর্শ পরায়ণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার তুলনা সত্যিই বিরল। তাই আপনি শুধু সতীই নন মা, মহাসতী, পরমসতী, সতীর চূড়ামণি আপনি।

"—বুড়ী বিধবাকে আর ওসব বলে লজ্জা দিওনা বাবা।" চোখ মুছতে মুছতে বলে উঠলেন মালতী দেবী, আমি এসেছি শূন্য কোলে ছেলে পেতে। মা বলে ডেকেছ যখন, তখন বল বাবা তুমি, আমার সেই শূন্য কোল ভরাতে প্রকৃত ছেলে আমার হতে পারবে কি না?

—আপনার মত মায়ের ছেলে হওয়া পরম সৌভাগ্য মা।

"—তোমাকে আমার হতে হবে বাবা চৌধুরী বংশের ভগীরথ।' ভূতনাথের কথায় উঠল বলে বুড়ী—ভগীরথ যেমন শাপ-দগ্ধ সগর বংশের করেছিলেন মুক্তি সাধন—তোমাকেও তেমনি পাপগ্রস্ত চৌধুরী কুলের করতে হবে বাবা উদ্ধার সাধন। এ বংশের মুক্তি গঙ্গাকে তুমিই ভগীরথের মত পারবে বাবা আনয়ন করতে।

এটা আমার মন বলছে বাবা। বল বাবা, দাও কথা আমাকে যে এ কাজ করবে তুমি।

—কি আমায় করতে হবে মা ? জিজ্ঞেস করল ভূতনাথ।

—তোমায় করতে হবে বাবা সেই সাধুভাঙ্গার সাধুবাবার সৎসংকল্প পূরণ, তার রেখে যাওয়া ইচ্ছা, ফেলে যাওয়া কাজ সমাপন।

বলতেই বুড়ী ভূতনাথ যেন উঠল চমকে ! বুড়ী কিন্তু লাগল যেতে বলে, পিতার ইচ্ছা পূরণ করাই সন্তানের প্রকৃত ধর্ম। নিজেকে আমি সেই সাধুবাবার সন্তান মনে করি। তুমিও সেই মহা সাধুকে তোমর পিতৃ-প্রতীম বলে মনে কর না বাবা। তাহলে উভয়ে আমার বাবার সেই সৎসংকল্প পূরণে যত্নবান হব। তুমি জান না বাবা, সাধুর ডাঙ্গার মন্দির প্রতিষ্ঠা, লিঙ্গরাজের মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য দিন-রাত তিনি কি পরিশ্রমই না করতেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংগ্রহ করতেন তিনি অর্থ। বুকের রক্ত জল করে ঘুরতেন তিনি গ্রামের পর গ্রাম, ছুটতেন অঞ্চলের পর অঞ্চল। প্রণাম করে তাকে একটা টাকা দিতেই পরম আগ্রহে তিনি সেটা মাথায় ঠেকিয়ে বলেছিলেন আমাকে—মায়ের ষোলআনা যখন পেয়েছি বাবার মন্দির আমার প্রতিষ্ঠা হবেই।

বলতে বলতে ঢুকরে কেঁদে উঠল বুড়ী,—কিন্তু সে বাবার স্বপ্ন আমার নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন আমার স্বামী। সে সংগৃহীত অর্থ তার মেরে তাকে দলবল নিয়ে অসৎ উপায়ে মৌজ উড়িয়ে করেছিলেন তছনছ। আমি স্বামীর সেই উড়িয়ে দেওয়া অর্থের খেসারত দেব বাবা। আমার টাকা-কড়ি, গহনা গাটি যথা সর্বস্ব দিয়ে আমার বাবার সেই মনের ইচ্ছা আমি পূরণ করবই। সাধুর ডাঙ্গায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তাতে লিঙ্গরাজের মূর্ত্তি স্থাপন করে করবই বাবার আমি অন্তিম ইচ্ছা পূরণ। তুমি আমার সহায়ক হবে বাবা। হবে আমার সে সঙ্কল্পের সাহায্যকারী।

আচমকা বুড়ির এই সঙ্কল্পের কথা শুনে অবিনাশবাবু হলেন হতবাক। স্ত্রী হল তার হতভম্ব। আর ভূতনাথ ? তার তো বিস্ময়ের আর সীমাই রইল না। কানের কাছে উঠল বেজে সেই সূক্ষ্ম সতীর কথাগুলো, কারো কোন সৎ-ইচ্ছা কখনও বিফলে যায় না ভূতুদা। সৎ-সঙ্কল্পের বিনাশ নাই। মানুষ শুধু হেতু মাত্র। ভগবান যে কাকে দিয়ে কার কি কর্ম করান কেও তা বুঝতে পারে না। নিজ আধারকে ঠিক রাখাই হল মানুষের কর্তব্য। কারণ সৎ আধারে সৎ ইচ্ছা ও অসৎ আধারে অসৎ ইচ্ছা হয় পূরণ।

ধ্যান ভেঙ্গে ভূতনাথের উঠল বলে বুড়ী,—স্বামীর যে কলঙ্ক আমার বাতাসেরও জানবার কথা নয়। দীর্ঘদিন গুপ্ত থেকে যা লুপ্ত হয়ে বসেছিল—তা কি করে জানলে বাবা তুমি জানি না আমি। তবে শুনে তোমার কথা মনে হয়েছে আমার তুমি আমার সেই সাধুবাবারই প্রেরিত ইঙ্গিত। আমার এতদিনের বার ব্রত পূজো আচ্চা, উপোশ কাপাশের ফল। সাধু মহাত্মারা ক্ষমার অবতার। তাঁরা পাপকে কখনও কারো উপর দীর্ঘদিন চেপে থাকতে দেন না। চৌধুরী বংশের পাপ বোধহয় মুক্ত হবে সাধুর সেই সৎ-সংকল্প পূরণ হলেই। কিন্তু এ সদিচ্ছা পূরণ করবার জন্য তো চাই সেরূপ সৎ কর্মী, সৎ আধার। তুমিই সেই সৎ আধার বাবা। সত্যকে যখন প্রকাশ করতে পিছু পা হওনা তুমি। মিথ্যাকে যখন কোন অবস্থাতেই দাওনা তুমি প্রশ্রয় তখন তুমিই হলে প্রকৃত সৎ কর্মী। তোমার মত সত্যসাধক, ধর্ম-প্রেমী মহান সত্তার দ্বারাই পূর্ণ হবে সেই মহা সাধকের অন্তিম ইচ্ছা। মুক্ত হব আমি।

বুড়ীর কথায় সমস্ত পরিবেশটাই কেমন যেন হয়ে গেল থমথমে, ভাব গম্ভীর। এক কথায় যেন বোবার মত দাঁড়িয়ে রইল সবাই। ভূতনাথের মুখেও কথা নেই। নেই কথা অবিনাশবাবু বা তার স্ত্রীর মুখেও। কিছুক্ষণ থেমে আবার বুড়ীই উঠল বলে,—আমার মনে হচ্ছে বাবা, সাধুর সেই সৎ-সংকল্প পূরণ ছাড়া আমার স্বামীর আত্মার যেমন মুক্তি নেই, আমারও তেমনি মৃত্যু-নেই। তাঁর সৎ-ইচ্ছাটাকে বাস্তবে রূপ না দেওয়া পর্য্যন্ত যম আমায় নেবে না বাবা। আমি শরীরের ভার, বয়েসের বোঝা আর বইতে পারছি না বাবা। ছেলে হয়ে মাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবেই বাবা।

''—হাঁ ভূতনাথবাবু, ''বুড়ীর কথার সঙ্গে যোগ দিয়ে উঠলেন বলে অবিনাশ বাবু- - ''আমরা তাই সকলে মিলে আপনাকে নিতে এসেছি।

—যদি আপনি না যান, বুঝবে তবে স্বামীকে আপনি আমার ক্ষমা করেন নি।" অবিনাশবাবুর সঙ্গে স' দিয়ে ওমনি বলে উঠল তার স্ত্রীও—বুঝব, এ ছোট বোনটার প্রতি আপনার কোন করুণা নেই। নেই কো' মমতা আপনার আমাদের উপর।

"—এভাবে কথা বলে আর আমাকে লজ্জা দেবেন না আপনারা।"

বলতেই ভূতনাথ উঠল বলে বুড়ী,—ওরা ঠিকই বলেছে বাবা। বলেছে আমার মনের কথাই। ওদের অধার্মিক ঠাকুরদার অনাচার দুষ্ট স্থান তোমার মত সত্যবাদী, ধর্মপ্রেমী, পবিত্র হৃদয় আধার ছাড়া শুদ্ধ হবে না বাবা। হবে না বাবা তুমি ছাড়া ওখানে কারখানা গড়ার কাজ সম্পূর্ণ।

থেমে একটু আবার বলল বুড়ী,—তবে কারখানার আর কর্মচারীরূপে তোমাকে আমি নিয়ে যাব না বাবা। মালিক হয়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে যখন অবিনাশ তখন শ্রমিক হয়ে আর তোমাকে আমি থাকতে দেব না সেখানে। থাকবে তুমি আমার ছেলের মতই সে কারখানার একজন অংশীদার হয়ে।

"—ও কথা বলবেন না মা আমাকে।" উঠল বলে ভূতনাথ—পরিশ্রম লব্ধ অর্থ ছাড়া সেখানের আমি কিচ্ছু গ্রহণ করতে পারব না। থাকব আমি অবিনাশ বাবুর কাছে কারখানার একজন কর্মচারী হয়েই। এবং দিচ্ছি কথা আমি—ভাই-এর মতই আপনভাবে দেখব আমি তার কারখানার সমস্ত কাজ।

"—কারখানার কথা থাক বাবা এখন। পরের কথা পরে হবে।" বলে উঠল বুড়ী,—ওসব কাজ বন্ধ থাকবে এখন। আগে সেখানে মন্দির নির্মাণ, তারপর সেখানে বাবার লিঙ্গ রাজের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, তারপর অন্য কিছু। মোট কথা সাধুবাবার সংকল্প পূরণ ছাড়া সেখানে আর কোন কাজ হতে দেব না আমি।

রইল বুড়ীর নাতি-নাতবৌ তার সেই আবেগ আকুল মুখটার দিকে তাকিয়ে। আর ভূতনাথ, লাগলে ভাবতে সদ্য শুনে আসা বাবা ভূতনাথের মন্দিরে অদৃশ্য সতীর সেই কণ্ঠস্বরটা।